

দ্বি খিখখ টু ডি



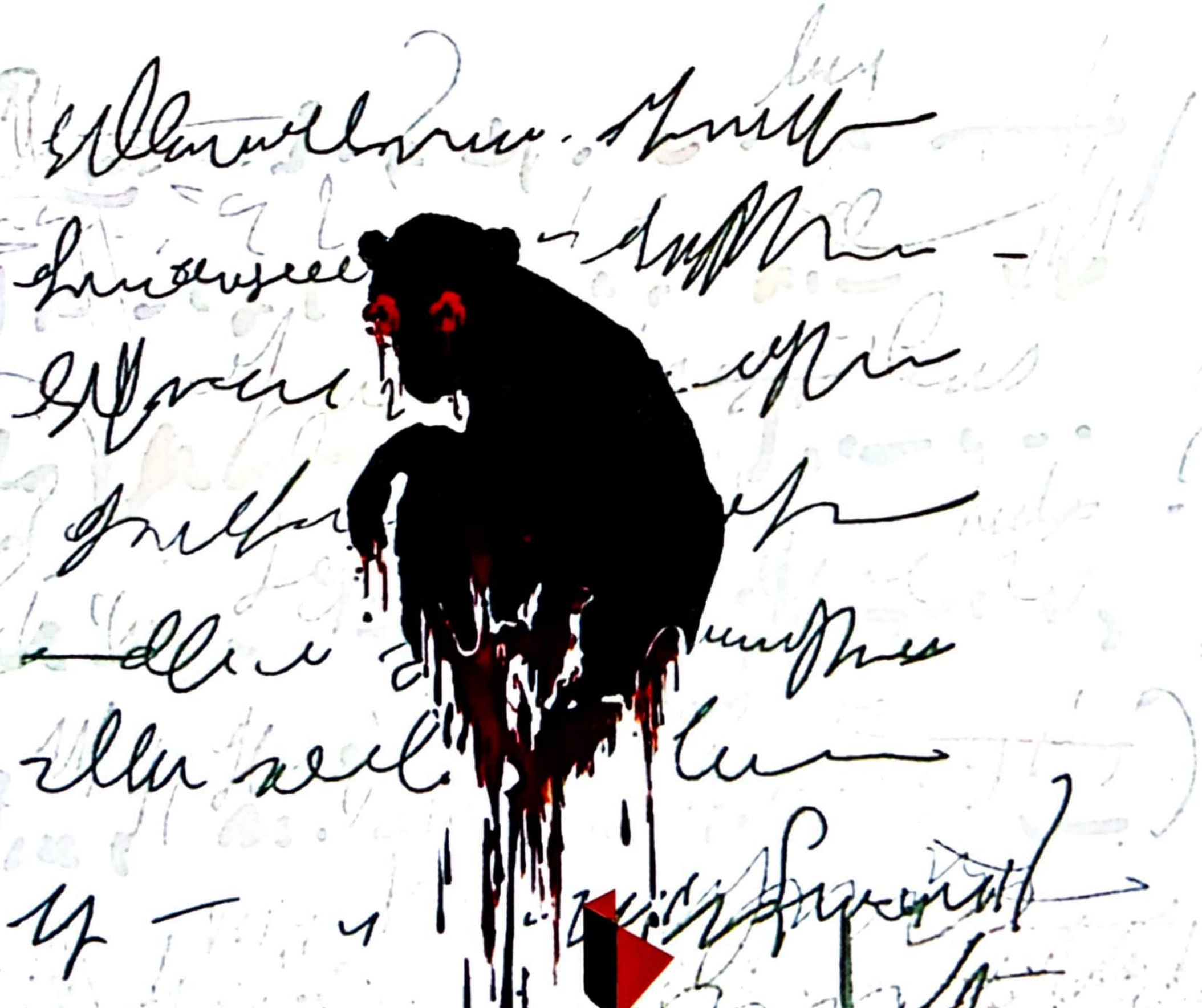
জে. ডি. বারকার

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

অরাজকতা



তবে কি নতুন একজন সিরিয়াল কিলারের আবির্ভাব ঘটেছে শিকাগোতে?
নইলে জ্যাকসন পার্ক লেগুনের পানির নিচে ওটা কোন যুবতীর লাশ?
মেয়েটা কি সত্যিই সপ্তাহ তিনেক আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল?
কিন্তু... লেগুনের পানি তো জমাট বেঁধেছে কয়েক মাস আগে?
তা হলে ওই জায়গায় মেয়েটার মরদেহ গেল কী করে?
আরও বড় কথা, অন্য একটা মেয়ের কাপড় কেন সেই লাশের গায়ে?
শিকাগো মেট্রোর ডিটেকটিভরা ব্যস্ত নতুন এই কেস নিয়ে।
শুধু স্যাম পোর্টার এখনও ধাওয়া করে চলেছে
ফোর মাস্কি কিলারকে।
শান্তিস্বরূপ বরখাস্ত করা হলো ওকে।
কিন্তু দমে যেতে নারাজ সে।
একটাই প্রশ্ন ওর সামনে এখন।
মাস্কি কিলারের নাগাল কি পাবে সে শেষপর্যন্ত?



ডিটেকটিভ

ISBN 978-984-92382-5-6



9 789849 238256

আজকা



পুরো নাম জনাথন ডায়লান বার্কার। আমেরিকান। আন্তর্জাতিকভাবে বেস্টসেলিং একজন লেখক। রোমহর্ষক থ্রিলার, ভৌতিক ও অতিপ্রাকৃত কাহিনি এবং রহস্য-সাহিত্যের জন্য দারুণ জনপ্রিয়।

ইলিনয়ের লম্বার্ডে ১৯৭১ সালের ৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। অন্তর্মুখী একজন মানুষ। বই ছাড়া খুব কমই দেখা গেছে তাকে। বয়স ছয় হওয়ার আগেই রীতিমতো গিলে ফেলেছিলেন হার্ডি বয়েজ আর ন্যাঙ্গি ড্রিউ'র বইগুলো। এরপর পড়তে শুরু করেন ডিকেন্স আর টোয়েনের মতো লেখকদের ক্লাসিক কাহিনিগুলো। আরও পরে খুঁজে পান মেরি শেলি, ব্রাম স্টকার এবং অ্যালান পো-কে। হাতে কলম তুলে নেয়ার ইচ্ছেটা আর দমিয়ে রাখতে পারেননি তিনি তখন। লিখতে শুরু করেন নিজের জীবনের গল্প। সেগুলো ভাগাভাগি করে নেন বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। তাঁর প্রথমদিকের এসব গল্প ছিল ডাইনি আর ভূতদের নিয়ে।

১৯৮৯ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর কাজ করতে শুরু করেন সার্কাস ম্যাগাজিনে। ১৯৯২ সালে ভূতুড়ে স্থান এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা নিয়ে “রিভিল্ড” নামের কলাম লিখতে শুরু করেন একটি পত্রিকায়। ২০১২ সালে লেখেন নিজের প্রথম উপন্যাস “ফরসেকেন”। এই বই প্রকাশিত হওয়ার আগে বইটির কিছু অংশ পড়েছিলেন বিশ্বখ্যাত লেখক স্টিফেন কিং। এবং এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজের একটি বিশেষ চরিত্র ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন বার্কারকে ওই বইয়ে।

আরেক বিশ্বখ্যাত লেখক জেমস প্যাটারসনের সহযোগী হিসেবেও একাধিক বই লিখেছেন বার্কার। এককালে গোস্ট রাইটার হিসেবেও লেখালেখি করেছেন প্রচুর।

২০১৬ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর সিগনেচার কপি “দ্য ফোর্থ মাস্কি”। বিভিন্ন মহল থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছেন বইটির জন্য এবং এই বই তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত বানিয়ে দিয়েছে।

স্ত্রী ডায়নাকে সঙ্গে নিয়ে ইঙ্গলউড, ফ্লোরিডা এবং পিটসবার্গে সময় কাটিয়ে দেন বার্কার।

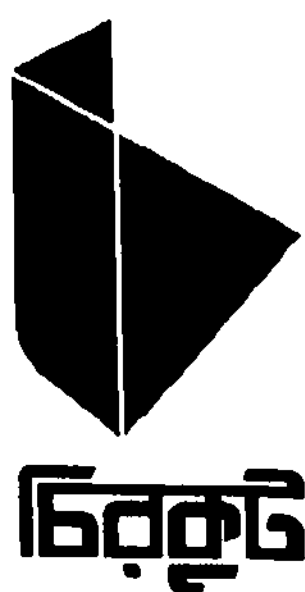




দ্য ফিফথ টু ডাই

জে. ডি. বার্কীৰ

ৰূপান্তৰ: সায়েম সোলায়মান



দ্য ফিফথ টু ডাই

মূল | রূপান্তর
জে. ডি. বার্কার | সায়েম সোলায়মান

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২৪

প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন
চিরকুট প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
চিরকুট প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে

মূল্য
নয় শত টাকা

The Fifth to Die by J.D. Barker
Translated by Sayem Solaiman
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 900.00 only



অরাজকতা



বাবার জন্য

১.
পোর্টার
প্রথম দিন, রাত ৮:২৩

অন্ধকার।

এই অন্ধকার যেন পোর্টারের চারপাশে ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে। যেন পুরু হয়ে জমে আছে। আলো বলতে যা কিছু আছে, সব গিলে ফেলছে যেন। কালির মতো একটা শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই রেখে যাচ্ছে না। একটা কুয়াশা যেন শ্বাসরুদ্ধ করে মেয়ে ফেলছে ওর সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে। কিছু শব্দ একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করছে ওর ভেতরে। চেষ্টা করছে, একটা কোনো সংযোজক বাক্য গঠন করার। কোনো অর্থ খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করছে যেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওসব শব্দ কাছাকাছি চলে এসেছে, ঠিক তখনই কিছু একটা গিলে ফেলছে ওগুলোকে। হারিয়ে যাচ্ছে শব্দগুলো। এবং সেসব শব্দের বদলে মনের ভেতরে জায়গা করে নিচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভীতি। ভারী একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে ওর মন। ওর শরীরটা যেন ডুবে যাচ্ছে অস্পষ্ট এক গভীরতায়... যে-গভীরতা সে ভুলে গিয়েছিল বহুকাল আগে।

কেমন আর্দ্র একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ফুসকুড়ি গজিয়েছে কোথাও যেন।

সঁাতসেঁতে একটা গন্ধ।

দুই চোখ খুলতে চাইছে স্যাম পোর্টার।

করতে হবে কাজটা।

কিন্তু চোখ দুটো যেন লড়াই করছে ওর বিরুদ্ধে... শক্ত হয়ে আটকে আছে যেন।

ব্যথা করছে মাথাটা। দপদপ করছে।

ডান কানের পেছনদিকে একটা ব্যথা স্পন্দিত হচ্ছে। হুবহু একই একটা ব্যথা চাঁদিতেও টের পাচ্ছে সে।

‘স্যাম, নড়ার চেষ্টা করবেন না। চাই না, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ুন।’

কণ্ঠটা যেন অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে এসেছে। কেমন যেন জড়ানো বলে মনে হলো ওটা। কিন্তু পরিচিত ঠেকছে।

শুয়ে আছে পোর্টার।

আঙুলের ডগায় শীতল ইস্পাতের স্পর্শ পাওয়ার অনুভূতি হচ্ছে যেন।

মনে পড়ে যাচ্ছে সেই শট-টার কথা। ঘাড়ের ভিত্তিমূলে হুট করেই ঢুকে গেল একটা সুঁই। যে-ই করে থাকুক না কেন ওই কাজ, দ্রুত করেছে। মনে পড়ে যাচ্ছে, শীতল একজাতের তরল চামড়ার নিচ দিয়ে ছুটে গিয়েছিল মাংসপেশীর দিকে। আর তারপর...

জোর খাটিয়ে দুই চোখ খুলল পোর্টার। ভারী হয়ে আসা পাতা দুটো যেন লড়াই করছে ওরই বিরুদ্ধে। শুষ্ক হয়ে গেছে ওগুলো। জ্বালাপোড়া করছে।

ডলবার চেষ্টা করল চোখ দুটো। পারল না। খানিকটা উঠেই থেমে গেল ডান হাতটা। একটা শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটা, টান পড়েছে সেই শেকলে।

কেমন যেন আটকে আসছে দম। আরও একবার নিজের ওপর জোর খাটাল সে, উঠে বসল। অকস্মাৎ রক্তপ্রবাহের কারণে চরকির মতো পাক খেয়ে উঠল মাথাটা। আরেকটু হলে পড়ে গিয়েছিল সে।

‘আরে আরে করেন কী, স্যাম, আস্তে। জেগে উঠেছেন আপনি, এটোরফিনের প্রভাব আপনার শরীর থেকে দ্রুত কেটে যাবে এখন। কিন্তু একটা মিনিট সময় তো দিতে হবে, নাকি?’

মিটমিট করে জ্বলে উঠল আলো। উজ্জ্বল একটা হ্যালোজেন সরাসরি তাক করা হয়েছে পোর্টারের চেহারার দিকে। চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সে। কিন্তু অন্য কোনোদিকে তাকাতে চাইছে না। ওই আলোর পেছনে দেখতে পাচ্ছে একটা লোককে, সোজা তাকিয়ে আছে সেদিকে। অবয়বটা কেমন যেন ভোঁতা। ছায়াময়।

‘বিশপ?’ নিজের কণ্ঠ নিজেরই চিনতে কষ্ট হলো পোর্টারের।

‘কেমন ছিলেন, স্যাম?’ এক কদম ডানে সরল ছায়াটা। পাঁচ গ্যালনের খালি একটা রঙের বালতি উপুড় করল, বসল।

‘আমার চোখের ওপর থেকে ওই জঘন্য আলোটা সরাও।’

কজিতে বাঁধা শেকলে হ্যাঁচকা টান মারল পোর্টার। হাতকড়ার অন্য প্রান্তটা ঝনঝন আওয়াজ তুলল মোটা একটা পাইপের গায়ে। পাইপটা পানির হতে পারে, গ্যাসেরও হতে পারে। ‘এসব কী?’

লাইটের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল অ্যানসন বিশপ। ওটা কিছুটা সরিয়ে দিল বাঁ দিকে। এ-ধরনের বাতিকে বলে শপ লাইট। বসিয়ে দেয়া হয়েছে কোনো একজাতের স্ট্যান্ডের ওপর। আলো গিয়ে যেন আঘাত করল সিভার-ব্লকের একটা দেয়ালে। দূরের এককোণায় দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াটার হিটার। সেইসঙ্গে আছে একটা ওয়াশিং মেশিন আর একটা ড্রয়ার।

‘কেমন লাগছে এখন? ভালো?’

হাতকড়ার শেকলে আবারও টান মারল পোর্টার।

ওর উদ্দেশে একটুখানি হাসল বিশপ। কাঁধ ঝাঁকাল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

শেষ যে-বার বিশপকে দেখেছিল পোর্টার, তখন তার চুল ছিল গাঢ় বাদামি। খুব ছোট করে কাটিয়ে রেখেছিল। এখন বড় হয়ে গেছে। একটুখানি যেন পাতলাও দেখাচ্ছে। চিরুনির শাসন বলতে কিছু নেই সেখানে। তিন-চারদিন ধরে নোংরা হয়ে আছে ছেলেটা, চেহারায় কেমন একটা দাগ পড়ে গেছে। ক্যাজুয়াল যেসব পোশাক পরত, সেসব গায়েব হয়ে গেছে যেন। সে-জায়গা দখল করেছে জিন্স আর গাঢ় ধূসর একটা হুডি।

‘তোমাকে কেমন যেন হুঁদুরের মতো দেখাচ্ছে,’ বলল পোর্টার।

‘এখন আমার বাঁচা-মরা অবস্থা তো, তাই।’

নিজের চোখ দুটো বদল করতে পারেনি ওই ছেলে। সেখানে যে-শীতলতা ছিল, সেটা আগের মতোই আছে।

এই ছেলের চোখ কখনও বদলাবে না।

পেছনের পকেট থেকে ছোট একটা চামচ বের করল বিশপ। ওটা আঙুলের ফাঁকে পাক খাওয়াচ্ছে বার বার, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। চামচটার প্রান্তভাগ করাতের মতো খাঁজকাটা; আলো ঠিকরে আসছে সেখান থেকে।

জিনিসটা ঠিক চিনতে পারল না পোর্টার। তাকাল নিচের দিকে। শরীরের নিচে কোনো একজাতের ধাতুর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে; তর্জনীর সাহায্যে টোকা দিতে লাগল সেটাতে। ‘ঠিক এ-রকম কোনো গার্নিতেই এমোরিকে বেঁধে রেখেছিলে নাকি?’

‘মোটামুটি একই রকম।’

‘খাট-টাট কিছু খুঁজে পাওনি বোধহয়?’

‘খাট ভেঙে যায়।’

গার্নির নিচে দেখা যাচ্ছে গাঢ় লাল রঙের একটা দাগ। মেঝেটা কঙ্কিটের, নোংরা। সেখানে যেন বড় রকমের একটা কলঙ্কের মতো দেখাচ্ছে ওই দাগ। দাগটা কীসের, জানতে চাইল না পোর্টার। গার্নির নিচের দিকের একটা অংশ স্পর্শ করেছিল সে আঙুলের সাহায্যে, চটচটে কিছু একটা অস্তিত্ব টের পেয়েছে। সেই “কিছু একটা” কী, জানতে চায়নি তা-ও। ওর হাতের বাঁ দিকের দেয়ালে সারি করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কয়েকটা তাক। সেখানে স্তূপাকারে ঠেসে রাখা হয়েছে রঙ করার কিছু জিনিস... ক্যান, ব্রাশ, তারপিন। মাথার ওপরের ছাদটা কাঠে বানানো। ষোলো ইঞ্চির ব্যবধান রেখে বসিয়ে দেয়া হয়েছে দু’ফুট বাই ছ’ফুটের কতগুলো তক্তা। ইলেকট্রিকাল ওয়্যারিং যেন মুখব্যাদান করে আছে; সেইসঙ্গে আরও আছে পানির পাইপ এবং বাতাস চলাচল করার নল। তক্তাগুলোর মাঝখানে যেসব শূন্যস্থান আছে, সেসব যেন পূরণ করে দিয়েছে ওই পাইপ আর নলগুলো। ‘এটা কোনো একটা রেসিডেনশিয়াল বেসমেন্ট। বাড়িটা বেশি বড় না। বরং একটু সেকেলে ধাঁচের। তোমার মাথার ঠিক ওপরে যে-পাইপ আছে, সেটা ঢেকে দেয়া হয়েছে অ্যাসবেস্টসে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এসব নিয়ে তেমন একটা মাথা না ঘামানোরই পরামর্শ দেবো। আমার ধারণা, এই জায়গা পরিত্যক্ত। কেন বললাম কথাটা, জানো? যে-আলো তুমি জ্বালিয়েছ, একটা এক্সটেনশন কর্ডের সাহায্যে জ্বলছে সেটা, আর ওই কর্ড দেখতে পাচ্ছি চলে গেছে ওপরতলায়। কোথায় গেছে... কোনো একজাতের ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নাকি? জেনারেটর চালাচ্ছ না তুমি। যদি চালাতে, আওয়াজ শুনতে পেতাম। দেয়ালে কিছু প্লাগ দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কাজে লাগানোর কোনো চেষ্টাই করেনি তুমি। তার মানে হচ্ছে, এই জায়গায় বিদ্যুতের সংযোগ নেই। আরও কথা আছে। জায়গাটা

ভীষণ ঠাণ্ডা। দম যে ছাড়ছি আমি, সেটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। তার মানে হচ্ছে, ঘর গরম রাখার কোনো ব্যবস্থাও চালু নেই। অর্থাৎ সবকিছু ইঙ্গিত করছে পরিত্যক্ত কোনো বাড়ির দিকে।’

বিশপকে দেখে মনে হচ্ছে, পোর্টারের এসব কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে। পাতলা একটা হাসি দেখা দিয়েছে ওর ঠোঁটের কোনায়।

‘এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালের দূরত্ব যদি চিন্তা করি,’ বলে চলল পোর্টার, ‘তা হলে এই বাড়ি সুরুই বলতে হয়। অর্থাৎ যাকে বলে কিনা শটগান হোম। তোমাকে যতদূর চিনেছি... কেতাদুরস্ত একদল প্রতিবেশীর মধ্যে থাকার মতো মানুষ তুমি না। তুমি এমন কোনো জায়গায় থাকতে চাও, যেখানে স্টারবাকস নেই, ইন্টারনেট নেই। এমন কোথাও থাকতে চাও না, যে-জায়গার প্রতিবেশীরা চেনা কোনো অপরাধীকে দেখতে পাওয়ামাত্র খবর দেয় পুলিশে। কাজেই আমি বলবো, তুমি শিকাগোর পশ্চিম প্রান্তে চলে এসেছ। উড স্ট্রিটের মতো কোনো জায়গায় হবে হয়তো। এখানে কাঠে-বানানো খালি বাড়ির দেখা মেলে প্রচুর।’

খালি হাতটা পুরু কোটের নিচে ঢুকিয়ে দিল পোর্টার। উদ্দেশ্য, পিস্তলের স্পর্শ অনুভব করবে। কিন্তু শূন্য হোলস্টার ছাড়া আর কিছু ঠেকল না ওই হাতে। ওর মোবাইল ফোনটাও গায়েব হয়ে গেছে।

‘পুলিশের একজন অফিসার পুলিশগিরি না করে বোধহয় থাকতে পারে না কখনও।’

রাস্তায় যদি গাড়ি তেমন একটা না থাকে, তা হলে ওয়াব্যাশে পোর্টারের যে-বাসা আছে, সেখান থেকে গাড়িতে সওয়ার হয়ে উড স্ট্রিটে হাজির হতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না। ঘাড়ে কিছু একটার খোঁচা যখন অনুভব করেছিল সে, তখন নিজের বাসা থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে ছিল। একটু আগে যা-যা বলেছে, সবই ওর অনুমান। আসলে চাইছে, কথা যাতে চালিয়ে যায় বিশপ। যত বেশি কথা বলবে ছেলেটা, হাতেধরা চামচটার কথা ভুলে থাকবে তত।

পোর্টারের মাথার ভেতরটা দপদপ করছিল। এখন সে-অনুভূতি স্থির হয়েছে ওর ডান চোখের পেছনে।

‘পুলিশের কাছে যাতে ধরা দিই আমি, সে-ব্যাপারে আমাকে উদ্ধুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন না? বলবেন না, আমি যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই আপনাদের উদ্দেশ্যে, তা হলে আমাকে কীভাবে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দেবেন আপনারা?’

‘না।’

এবার সত্যিই হেসে ফেলল বিশপ। ‘কিছু একটা দেখবেন নাকি?’

জবাবে “না” বলার ইচ্ছা ছিল পোর্টারের। কিন্তু জানে, যা-ই বলুক না কেন, তাতে তেমন কিছু যায়-আসে না। এই ছোকরার মনে কোনো একটা পরিকল্পনা আছে। কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে। যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া শিকাগো মেট্রোর

একজন ডিটেকটিভকে রাস্তার থেকে ছোঁ মেরে তুলে আনার মতো নাকি নেবে না কেউই।

ডান দিকের সামনের পকেটে চাবির রিঙের অস্তিত্ব ঠাণ্ডা করতে পারছে পোর্টার। ওর পিস্তল আর মোবাইল ফোন যখন বের করে নিয়েছিল বিশপ, তখন রিঙটা নেয়নি। ওই রিঙে হ্যান্ডকাফের একটা চাবি আছে। বেশিরভাগ হ্যান্ডকাফ একই চাবি দিয়ে খুলে যায় সাধারণত। পুলিশের চাকরিতে যখন নতুন ঢুকতিল সে, তখন ওকে বলা হয়েছিল এই কথা। কারণ আর কিছুই না... বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুলিশের যে-অফিসার কোনো অপরাধীকে হাতকড়া পরাচ্ছে, সেটা সে খোলে না, বরং খোলে অন্য কোনো অফিসার। পুলিশি কাজকর্ম যখন চলে, তখন একজন সন্দেহভাজনকে “হাতবদল” করতে হয় কমপক্ষে দুই কি তিনবার। বিশেষ এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে পুলিশের সব অফিসারকে বলে দেয়া হয়, কাউকে সার্চ করার সময় তার কাছে চাবি বলতে যা-যা পাওয়া যায়, সব নিয়ে নিতে হবে। এখন পোর্টারকে যা করতে হবে তা হলো, চাবির রিঙটা বের করতে হবে ডান দিকের পকেট থেকে। তারপর সেটা যেভাবেই হোক না কেন চালান করে দিতে হবে বাঁ হাতে। খুলে ফেলতে হবে হ্যান্ডকাফ। সবশেষে পাকড়াও করতে হবে বিশপকে... ওর এবং ছেলেটার মাঝখানে পাঁচ ফুটের যে-দূরত্ব আছে, সেটা ওই ছোকরা অতিক্রম করার আগেই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, ছেলেটার কাছে শুধু ওই চামচ ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই।

‘সামনের দিকে তাকান, স্যাম,’ বলল বিশপ।

ছেলেটার দিকে তাকাল পোর্টার।

উঠে দাঁড়াল বিশপ। খানিকটা এগিয়ে হাজির হলো ওয়াশিং মেশিনটার কাছে, ছোট একটা টেবিলের সামনে। কিছু একটা তুলে নিল সেখান থেকে, তারপর ফিরে এল যে-চেয়ারে বসে ছিল সেখানে। ওর হাতে কাঠের একটা বাক্স দেখা যাচ্ছে। সেটার ওপর আছে পোর্টারের গ্লকটা। নিজের পাশে, মেঝেতে নামিয়ে রাখল পিস্তলটা। ছোট একটা হুড়কো আছে বাক্সটাতে, আলাগা করল সেটা। খুলে ফেলল ঢাকনা।

লাল ভেলভেটের লাইনিং থেকে ছ’টা অফিগোলক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পোর্টারের দিকে।

তার মানে বিশপের আগের ছয় শিকার।

নিজের পিস্তলটার দিকে তাকাল পোর্টার।

‘সামনের দিকে তাকাতে বলেছি কিন্তু,’ একই কথার পুনরাবৃত্তি করল বিশপ, মৃদু হেসে উঠেছে।

পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। বিশপ সবসময় একটা ছক অনুসরণ করে কাজ করেছে। সবসময়ই আগে কেটে নিয়েছে ওর শিকারের কান।

তারপর উপড়ে ফেলেছে বেচারীর চোখ। শেষে কেটে নিয়েছে মেয়েটার জিহ্বা। এবং ওসব জিনিস একটা একটা করে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছে শিকারের পরিবারের কাছে। সঙ্গে দিয়েছে একটা করে চিরকুট। ডাকযোগে পাঠানোর কাজে প্রতিবারই ব্যবহার করেছে সাদা রঙের বাক্স। সেই বাক্স আবার বেঁধেছে কালো দড়ি দিয়ে। সবসময়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেনি কখনও। সিরিয়াল কিলারদের বেলায় “ট্রফি” বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কিছু রাখেনি নিজের জন্য। তার বিশ্বাস, যেসব মেয়েকে হত্যা করেছে, তাদের পরিবারের কেউ-না-কেউ জড়িত ছিল কোনো-না-কোনো অপকর্মের সঙ্গে— হতভাগী মেয়েটাকে খুন করে শাস্তি দিয়েছে তার পরিবারকে। এই পদ্ধতি আসলে একধরনের বিকৃত ন্যায়বিচার। শিকারের চোখ কখনও নিজের কাছে রাখেনি সে। কখনও রাখেনি...

‘শুরু করে দেয়াটাই ভালো হবে,’ বাক্সের ওপর হাত বোলাল বিশপ, যেন আদর করছে ওটাকে। ওটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে, গ্লকের পাশে। আলোয় ধরল চামচটা।

গার্নির ওপর গড়ান খেল পোর্টার। হাতকড়া যেন কামড় বসাল কজির মাংসে, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। টান লেগেছে পাইপে। ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল। অদ্ভুত এক কায়দায় বাঁ হাতটা চালান করে দিল ডান দিকের পকেটে। উদ্দেশ্য, চাবির রিঙটা বের করে আনবে। একইসঙ্গে লাথি মারছে গার্নিতে, ওটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশপের দিকে। কৌশলে সংঘর্ষ এড়াল বিশপ, একটা পা বাড়িয়ে লাথি মারল পোর্টারের বাঁ পায়ে। মেঝেতে আছড়ে পড়ল পোর্টার। ডান হাতে পরনো হ্যান্ডকাফ আটকে গেল গার্নির পাইপে, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল সে; এত জোরে যে, আলাগা হয়ে গেল কাঁধের অস্থিসন্ধি।

কিন্তু কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই আরেকটা সুঁইয়ের খোঁচা টের পেল সে। এবার সে-সুঁই গঁথে দেয়া হয়েছে ওর একদিকের উরুতে। নিচের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। ওর চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছে বিশপ, মাথাটা কাত করে রেখেছে পেছনদিকে।

পোর্টার টের পাচ্ছে, ওর চেতনা বিলুপ্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে। এই ব্যাপারটার বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করছে সে... নিজের সবটুকু দিয়ে। একসময় দেখতে পেল, ওর বাঁ চোখের দিকে এগিয়ে আসছে বিশপের হাতেধরা সেই ছোট চামচ। টের পেল, ওর অক্ষিগোলকের নিচে টার্সাল প্লেটে যেন কামড় বসাল চামচের খাঁজকাটা অংশটা। ওর অক্ষিকোটরে চাপ বাড়াচ্ছে বিশপ, চামচটা ঢুকিয়ে দিতে চাইছে ভেতরে...

‘মেয়েটা মনে হয় সেক্সি?’

সিটে বসে থাকা অবস্থায় ঝাঁকুনি খেল পোর্টারের শরীর। সিটবেল্টটা আঁকড়ে ধরে রাখল ওকে। লম্বা করে দম নিল সে। মাথাটা যেন বাড়ি খেল একবার

এপাশে, পরেরবার ওপাশে। চোখ খুলল, দেখতে পেল ন্যাশকে... বসে আছে ড্রাইভারের সিটে। ‘কী? কে?’

দাঁত বের করে হাসল ন্যাশ। ‘স্বপ্নে যে-মেয়েকে দেখাছিলে, তার কথা বলছি আর কী। তুমি রীতিমতো গোঙাচ্ছিলে।’

ছ’টা অফিগোলক।

এখনও দিশেহারা একটা ভাব ফুটে আছে পোর্টারের চেহারায়ে। বুঝতে পারল, ন্যাশের শেভি গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে সে। মডেলটা বেশ পুরনো... সেই ১৯৭২ সালের, নোভা। মাস দু’-এক হলো এই গাড়ি কিনেছে ন্যাশ। তার আগে বেশ দামি একটা ফোর্ড ফিয়েস্টা ছিল ওর। একদিন রাত তিনটার সময় ওই গাড়ি বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ তুলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল ইন্টারনেট হাইওয়ে টু নাইন্টিতে। হেডকোয়ার্টার্সে খবর দিতে বাধ্য হলো ন্যাশ তখন। যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল পোর্টারের সঙ্গে, পারেনি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পোর্টার। রাস্তার ময়লা আর পাতলা ভূষারে ঢেকে আছে গাড়িটা। ‘আমরা কোথায় আছি এখন?’

‘হেইস-এ, পার্কটা কাছিয়ে আসছে,’ জবাবে বলল ন্যাশ। চালু করল গাড়ির ইভিকেটর। ‘আমার মনে হয় তোমার এই কেসটা বাদ দেয়া উচিত।’

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘আমি ঠিক আছি।’

বাঁ দিকে মোড় নিল ন্যাশ, ঢুকে পড়ল জ্যাকসন পার্কে। প্রবেশপথের মাটিতে কোদাল চালানো হয়েছে যেন... বেশ কয়েকটা গাড়ি গেছে জমিনের ওপর দিয়ে, গভীর দাগ দেখা যাচ্ছে টায়ারের। পুলিশের গাড়ির লাল আর নীল আলো জ্বলছে। আশপাশের ঘন গাছগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে সে-আলো। ‘চার মাস হয়ে গেল, স্যাম। ঘুমানোর সমস্যাটা যদি থাকে এখনও, আমার মনে হয় কারও সঙ্গে কথা বলা উচিত তোমার। সেসব কথা যে আমার অথবা ক্রেয়ারের সঙ্গে বলতে হবে, এমন না... কোনো একজনের সঙ্গে বললেই হলো।’

‘আমি ঠিক আছি,’ পুনরাবৃত্তি করল পোর্টার।

হাতের ডানদিকে বেসবল খেলার একটা মাঠ আছে। ওটা পার হলো ওরা। এখন শীতকাল, তাই কেউ আর খেলতে আসে না ওখানে। পথের দু’পাশে নগ্ন গাছের সারি। এগিয়ে চলল ওরা, ঢুকে পড়ছে পার্কের আরও গভীরে। অনতিদূরে কয়েকটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাটা আধ ডজনের মতো হবে। আরও বেশিও হতে পারে। পেট্রোল ভেহিকেল আছে চারটা। হাজির হয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স। আরও আছে দমকলবাহিনীর একটা ভ্যান। এগুলো ছাড়িয়ে একটা লেগুন দেখা যাচ্ছে। সেটার কিনারা ঘেঁষে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বড় কয়েকটা ফ্লাডলাইট। কাজ করছে কয়েকটা প্রোপেন হিটারও। হলুদ রঙের ক্রাইম সিন টেপ দিয়ে ঘেরাও করে দেয়া হয়েছে জায়গাটা।

ওই ভ্যানটার পেছনে গাড়ি থামাল ন্যাশ, পার্ক করল সুবিধাজনক জায়গায়। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। থুতু ফেলার মতো আওয়াজ করল ওটা দু'বার, শুনে মনে হলো এখনই বোধহয় ব্যাকফায়ার করবে, তবে শেষপর্যন্ত চুপ হয়ে গেল। পোর্টার খেয়াল করল, পুলিশের কয়েকজন অফিসার তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। গাড়ি থেমে নামল ওরা দু'জন। আশপাশে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে শীতের বরফশীতল বাতাস।

‘আমার গাড়িতে সওয়ার হয়েও এখানে আসতে পারতাম আমরা,’ ন্যাশকে বলল পোর্টার, ওর জুতোর নিচে মচমচ আওয়াজ তুলেছে কিছুক্ষণ আগে-পড়া তুষার।

২০১১ সালের একটা ডজ চার্জার আছে পোর্টারের।

ওর সহকর্মীদের অনেকেই ওই গাড়ির নাম দিয়েছে “মধ্যজীবনের সঙ্কটকালের গাড়ি।” আজ থেকে দু'বছর আগে, ওই গাড়ি যখন ছিল না, তখন একটা টয়োটা ক্যামরি চালাত পোর্টার। ওর পঞ্চাশতম জন্মদিনে সেই ক্যামরির জায়গা দখল করে চার্জারটা। ওর মৃত স্ত্রী, হিদার, ওই স্পোর্টস কার কিনে দিয়েছিল ওকে। এবং এই উপহার ছিল পোর্টারের জন্য একটা চমক। শহরের সাউথ সাইডে, পুলিশের সঙ্গে জনতার “বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা” যেখানে তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে ভাঙচুরের শিকার হয়েছিল ওই টয়োটা ক্যামরি। ওটা ওভাবেই পড়ে থেকে একদিন নষ্ট হয়ে যাবে চিরতরে, ভেবে ফেলে রেখেছিল পোর্টার।

কিন্তু হিদার করল কী... নতুন কেনা চার্জারের চাবিটা কৌশলে ঢুকিয়ে দিল পোর্টারের জন্মদিনের কেকের ভেতরে। কেকে কামড় বসাতে গিয়ে একটা দাঁত আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিল পোর্টারের।

তারপর ওর চোখ বেঁধে, ওর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমেছিল হিদার, হাজির হয়েছিল ওদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায়। গেয়ে উঠেছিল “হ্যাপি বার্থডে” গানটা।

সেদিনের সেই ঘটনার পর এই গাড়িতে যতবার চড়েছে, ততবার হিদারকে মনে করেছে পোর্টার। কিন্তু আজকাল ওর মনে হয়, হিদারের ব্যাপারে খুঁটিনাটি অনেককিছু আর মনে করতে পারছে না যেন। সময় যত যাচ্ছে, ওর মনের ভেতরে আস্তে আস্তে ঝাপসা থেকে আরও ঝাপসা হয়ে আসছে হিদারের চেহারাটা।

‘তোমার ওই গাড়িও কিন্তু এসব ঝামেলার একটা অংশ। দেখা যায়, সবসময় তোমার গাড়িতেই সওয়ার হচ্ছি আমরা। ফলে কনি পচে পচে মরতে শুরু করে ড্রাইভওয়ায়েতে। আমি যদি ওই গাড়ি চালাই, তা হলে আমার মনে পড়ে যায়, ওটার খোলনলচা বদলে নেয়ার সময় হয়েছে। মনে পড়ে যায়, ওটা গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া দরকার, কিছু কাজ করানো দরকার।’

‘কনি মানে?’

‘প্রতিটা গাড়িরই একটা করে নাম থাকা উচিত। ওই যে, ক্রেয়ারও এসে গেছে...’

মাথা নিচু করে হলুদ সেই ক্রাইম সিন টেপ পার হলো ওরা। পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে লেগুনের তীরের উদ্দেশে। একটা হিটারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্রেয়ার, কানে চেপে ধরেছে মোবাইল ফোন। ওদেরকে যখন দেখতে পেল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল তীরের দিকে। মোবাইলের মাইক্রোফোন হাত দিয়ে ঢেকে বলল, ‘আমাদের ধারণা, লাশটা এলা রেনল্ডসের।’ তারপর আবার মনোনিবেশ করল ফোনকলে।

পোর্টার টের পেল, ওর হৃৎপিণ্ডটা যেন চুপসে গেছে।

এলা রেনল্ডসের বয়স ছিল পনেরো। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে হারিয়ে যায় বেচারী। ঘটনাটা ঘটেছিল লোগান স্কোয়ারের কাছে, সপ্তাহ তিনেক আগে। শেষ যে-বার দেখা গেছে মেয়েটাকে, তখন সে স্কুলের বাস থেমে নামছে। বাসা থেকে মাত্র দু’ব্লক দূরে ছিল। সে যে হারিয়ে গেছে, সেটা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে কোনো সময় অপচয় করেনি তার বাবা-মা। সেই নিখোঁজের ঘন্টাখানেকের মধ্যে জারি করে দেয়া হয় অ্যাম্বার অ্যালাট। এই একটা ভালো কাজই করতে পেরেছিল পুলিশ। কিন্তু তারপর সে-কাজের কোনো পুরস্কার পায়নি তারা।

পানির কিনারার উদ্দেশে হাঁটা ধরেছে ন্যাশ। ওকে অনুসরণ করতে লাগল পোর্টার।

লেগুনের পানি জমে গেছে।

কমলা রঙের চারটা শঙ্কু যেন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বরফ-হয়ে-যাওয়া পানির ওপর, হলুদ টেপ বহন করছে ওগুলো। একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছে নিজেদের মধ্যে। বিশেষ সেই জায়গার তুষার সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

বরফের ওপর আলতো করে পা রাখল পোর্টার; আসলে লেকের বরফ ঠিক কতখানি পুরু, পরখ করতে চাইছে। কান পেতে রেখেছে... বরফে ফাটল ধরার কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। লেগুনের এই জমাট বরফের ওপর এর আগে জুতোর যত চিহ্নই পড়ে থাকুক না কেন, ব্যাপারটা সবসময়ই নার্ভাস করে তোলে ওকে... নিজে যখন হাজির হয় এ-রকম কোনো জায়গায়, তখন।

ওই আয়তক্ষেত্রের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র মেয়েটাকে দেখতে পেল সে। এখানকার বরফ কাচের মতো স্বচ্ছ।

বরফের সেই দেয়াল ভেদ করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

ভয়ঙ্কর পাণ্ডুর হয়ে গেছে তার চামড়া। শুধু চোখের আশপাশে দেখা যাচ্ছে নীল ছোপ ছোপ দাগ। গায়ের রঙ কোথাও কোথাও বেগুনি হয়ে গেছে। একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো, যেন কিছু একটা বলতে চাইছে বেচারী। কিন্তু সেই না-বলা কথাগুলো আর বলা হবে না কখনোই।

আরেকটু ভালোমতো দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পোর্টার।

মেয়েটার পরনে লাল রঙের কোট, সঙ্গে কালো জিন্স। মাথায় দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের নিট ক্যাপ। হাতে ম্যাচিং-করা গ্লাভস। পায়ে, দেখে মনে হচ্ছে, গোলাপি রঙের টেনিস শূ। হাত দুটো আলগাভাবে আছে শরীরের দু'পাশে। দুই পা খানিকটা বাঁকা হয়ে আছে শরীরের নিচে, হারিয়ে গেছে গাঢ় রঙের পানিতে। ডুবে গেলে লাশের শরীর সাধারণত ফুলে যায়, কিন্তু এই তাপমাত্রায় মনে হচ্ছে ঠাণ্ডার কারণে রেহাই পেয়ে গেছে মেয়েটা। পানিতে ডুবে যাওয়া লাশ যদি ফুলে যায়, তা হলে সেটা দেখতে স্বস্তি বোধ করে পোর্টার। কারণ আর কিছুই না, ওই মানুষটাকে তখন আর মানুষের মতো মনে হয় না অত বেশি। কাজ বলতে যা-যা করা লাগে, সেগুলো সারতে তেমন একটা কষ্ট হয় না... আবেগের তাড়না সেভাবে কাজ করে না মনে।

এখন এই মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন কোনো একজনের খুকি... অসহায়, একাকী। কাচের কোনো একটা কন্ডল গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন।

পোর্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশ, তাকিয়ে আছে লেগুনের ধারের গাছগুলোর দিকে।

‘এই লেগুনের পানি কবে নাগাদ জমে যায়, জানো?’ পার্টনারকে জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভাবল ন্যাশ। ‘সম্ভবত ডিসেম্বরের শেষদিকে। আবার জানুয়ারির শুরুর দিকেও হতে পারে। কেন?’

‘এই মেয়ে যদি এলা রেনল্ডস হয়ে থাকে, তা হলে সে বরফের নিচে গেল কী করে? সে তো কেবল সপ্তাহ তিনেক আগে গায়েব হয়েছে। ওই সময় নাগাদ লেগুনের পানি জমে বরফে পরিণত হয়ে যাওয়ার কথা।’

নিজের মোবাইল ফোনে এলা রেনল্ডসের একটা ফটো লোড করল ন্যাশ। দেখাল পোর্টারকে। ‘এই মেয়েকে দেখে তো ওই মেয়ের মতোই মনে হচ্ছে। তবে পুরো ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। এমনও হতে পারে, লেগুনের পানি যখন ততটা জমাট বাধেনি, তখন এখানে পড়ে গিয়েছিল অন্য কোনো মেয়ে।’

ন্যাশের মোবাইলের ছবির ওপর নজর বুলিয়ে নিল পোর্টার। ‘এই মেয়েকে দেখতে কিন্তু এলা রেনল্ডসের মতোই লাগছে।’

ওদের পাশে এসে দাঁড়াল ক্রেয়ার। ফুঁ দিল হাতে, তালু দুটো ডলল একটা আরেকটার সঙ্গে। ‘মিসিং চিলড্রেন বিভাগে একজন মহিলা আছে, নাম সোফি রডরিগুয়েজ। তাঁর কাছে একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম আমি। তিনি কসম করে বলেছেন, যে-মেয়েকে এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমরা, সে এলা রেনল্ডস ছাড়া আর কেউ না। কিন্তু কথা হচ্ছে, পরনের কাপড় মেলেনি। মানে... এলা যখন হারিয়ে গেল, তখন তার পরনে ছিল কালো রঙের একটা কোট। তিন-তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে, স্কুলের বাসে যখন ছিল মেয়েটা, তখন কালো কোট পরে ছিল, লাল না। ওই মেয়ের মাকে ফোন করেছিলেন সোফি। মহিলা

জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের নাকি লাল রঙের কোনো কোটই নেই। এমনকী সাদা হ্যাট অথবা সাদা গ্লাভসও নেই।’

‘তার মানে হচ্ছে, এই মেয়ে হয় সম্পূর্ণ আলাদা কেউ, নয়তো ওর কমপক্ষে বদল করে দিয়েছে কেউ একজন,’ বলল পোর্টার। ‘এলা যে-জায়গা থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে পনেরো মাইল দূরে আছি আমরা এখন।’

নিচের ঠোঁটে কামড় দিল ক্রেয়ার। ‘এই মেয়ের একটা পজিটিভ আইডি খুঁজে বের করতেই হবে মেডিকেল একজামিনারকে।’

‘মেয়েটার লাশ সবার আগে দেখতে পেয়েছে কে?’

দূরের একটা পেট্রোল কার দেখিয়ে দিল ক্রেয়ার ইঙ্গিতে। ‘ছোট একটা ছেলে আর তার বাবা। ওই ছেলের বয়স বারো।’ নোট করেছিল সে, সেটা দেখার জন্য তাকাল মোবাইলের দিকে। ‘ছেলেটার নাম স্কট ওয়াটস। বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল সে। উদ্দেশ্য ছিল, লেগুনের পানি ঠিকমতো জমাট বেঁধেছে কি না দেখা। এখানে স্কেটিং শেখার ইচ্ছা তার। বাবার নাম ব্রায়ান। তিনি বলেছেন, তুমি সাফ করার কাজটা নাকি করেছে তাঁর ছেলেই। আর তখন এই মেয়ের একটা হাতের অংশবিশেষ দেখতে পায়। ওকে তখন সরে দাঁড়াতে বলেন ব্রায়ান বাকি তুমি সাফ করেন নিজেই। নিশ্চিত হন, বরফের নিচে যাকে দেখা যাচ্ছে, সে একজন মানুষ। তিনি তখন ফোন করেন নাইন ওয়ান ওয়ানে। ঘটনাটা ঘণ্টাখানেক আগের। সাতটা উনত্রিশ মিনিটে আমাদের কাছে আসে সেই ফোনকল। বাপ আর ছেলেকে একটা পেট্রোল কারে বসিয়ে রেখেছি আমি, ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো কথা বলতে চাইবেন তাঁদের সঙ্গে।’

বরফের ওপরটা তর্জনির সাহায্যে আরও পরিষ্কার করল পোর্টার। তাকাল তীরের দিকে। ওদের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশনের দু’জন অফিসার। সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওদের তিনজনের দিকে।

‘তুমি পরিষ্কার করার কাজটা তোমাদের মধ্যে কে করেছে?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

ওই দু’জনের মধ্যে একজন মেয়ে, তুলনামূলক কম বয়সী... বড়জোর ত্রিশ হবে; মুখ তুলে তাকাল। মাথায় খাটো সোনালি চুল। চোখে চশমা। গায়ে পুরু গোলাপি কোট। হাত তুলল। ‘আমি করেছি, স্যর।’

তার পার্টনার শরীরের ভার বদল করল এক পা থেকে অন্য পায়ে। দেখলে মনে হয়, ওই লোকের বয়স মেয়েটার বয়সের চেয়ে পাঁচ বছর বেশি। ‘আমি দেখভাল করেছি। কেন?’

‘ন্যাশ? আমার হাতে ওটা দাও তো?’ লম্বা সাদা ব্রিসলযুক্ত একটা ব্রাশ দেখিয়ে দিল পোর্টার ইঙ্গিতে। সিএসআই অফিসারদের একটা কিটের ওপর আছে ব্রাশটা।

ইঙ্গিতে সিএসআই-এর দুই অফিসারকে কাছে ডাকল পোর্টার। ‘ভয়ের কিছু নেই। আমি সাধারণত কামড়াই না।’

গত বছরের নভেম্বর মাসে স্থানীয় একটা কনভেনিয়েন্স স্টোরে ডাকাতির ঘটনা ঘটে, আর তাতে মারা পড়ে পোর্টারের স্ত্রী হিদার। সে-সময় একটা ছুটি একরকম জোর করেই চাপিয়ে দেয়া হয় ওর ওপর। কিন্তু ছুটিটা কাটাতে পারেনি সে, ফিরে আসতে হয়েছিল চটজলদি। আসলে সে-ও চেয়েছিল কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে। প্রধান কারণ হচ্ছে, কাজে ডুবে থাকলে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে মন... হিদারের চিন্তা তখন আর অত ভোগাবে না। যা ঘটে গিয়েছিল, সেটা ভুলে থাকতে পারবে সে।

হিদার মারা যাওয়ার পরের কয়েকটা দিন নিজেকে ওদের সেই অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে বলতে গেলে বন্দি করে ফেলেছিল পোর্টার। তাতে অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর। অ্যাপার্টমেন্টের যেখানেই চোখ পড়ছিল, হিদারকে দেখতে পাচ্ছিল যেন।

বাসার ভেতরে প্রায় প্রতিটা শেক্বে ছবি আছে হিদারের; মনে হচ্ছিল, ছবির মানুষটা যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাতাসে যেন ভাসছিল ওই মহিলার গায়ের গন্ধ। প্রথম সপ্তাহটা ঘুমাতেই পারেনি সে। তারপর একসময় বিছানায় টান টান করে মেলে দেয় হিদারের কিছু কাপড়। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে বসে থেকে সারাটা সময় শুধু একটা কথাই ভেবেছে... তার স্ত্রীকে খুন করেছে যে-লোক, তাকে কী করা যেতে পারে। চিন্তাটা রীতিমতো পেয়ে বসেছিল ওকে। অথচ মাথার ভেতরে ও-রকম কোনো চিন্তা ঠাঁই দিতে চায়নি সে।

ওকে শেষপর্যন্ত ওই অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসে ফোর মাস্কি কিলার।

এবং ওর স্ত্রীকে হত্যা করেছিল যে-লোক, তার ওপর শোধও নেয় সেই খুনি। এই যে এখন সিএসআই-এর দু'জন অফিসার অদ্ভুত আচরণ করছে পোর্টারের কাছে হাজির হয়ে, এটার কারণও সেই ফোর মাস্কি কিলার। ভয় পাওয়া বলতে যা বোঝায়, শুধু যে সে-রকম কিছু ঘটেছে ওই দু'জনের বেলায় তা না; নির্ভেজাল আতঙ্ক গ্রাস করে নিয়েছে তাদেরকে।

ফোর মাস্কি কিলারের বিরুদ্ধে তদন্তের কাজে পোর্টারই হচ্ছে পুলিশের সেই অফিসার, যাকে সাহায্য করার জন্য সিএসআই টেকনিশিয়ানের বেশ ধরে হাজির হয়েছিল বিশেষ কেউ একজন। পোর্টারই সেই পুলিশ অফিসার, যাকে ওর নিজের বাসায় ছুরি মেরেছিল ফোর মাস্কি কিলার নিজে। পোর্টারই সেই পুলিশ অফিসার, যে নাগাল পেয়ে গিয়েছিল ওই খুনির, কিন্তু লোকটাকে শেষপর্যন্ত চলে যেতে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ওর।

আজ চার মাস পরে সবাই কথা বলছে বিশেষ সেই ঘটনা নিয়ে। শুধু পোর্টারের সঙ্গে কথা বলছে না কেউ।

সিএসআই-এর দুই অফিসার এগিয়ে এল।

মেয়েটা বসে পড়ল পোর্টারের পাশে।

ব্রাশ কাজে লাগিয়ে আরও কিছু তুষার সরিয়ে ফেলল পোর্টার। তথাকথিত এলার লাশ যেখানে পাওয়া গেছে, সে-জায়গায় একটা বৃত্ত কল্পনা করে নিয়ে বৃত্তটা দু'ফুটের মতো চওড়া করল... তুষারশূন্য করে ফেলল জায়গাটা। নামিয়ে রাখল হাতেধরা ব্রাশ। বরফের ওপরটা হাতের তালু দিয়ে ঘষছে এখন। শুরু করছে কাল্পনিক সেই বৃত্তের কেন্দ্রভাগ থেকে, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে দূরে। তুষার যেখানে জমে আছে এখনও, সে-জায়গা থেকে ইঞ্চি চারেক দূরে এসে থামল। 'ওই যে। দেখো তো, ঠাহর করতে পারো কি না।'

সিএসআই-এর মেয়েটা নিজের গ্লাভস খুলে ফেলল। যেভাবে বরফের ওপর হাত চালিয়েছে পোর্টার, সেই একই কায়দায় হাত বোলাতে আরম্ভ করল। আঙুলের সাহায্যে বরফের উপরিভাগ ঝাড়ু দিচ্ছে যেন।

পোর্টারের হাত থেকে যখন ইঞ্চিখানেক দূরে আছে মেয়েটার তালু, তখন থামল সে।

'ঠাহর করতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'ছোট একটা গর্ত আছে। অত গভীর কিছু না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি।'

মেয়েটার হাতে একটা শার্পি মার্কার ধরিয়ে দিল পোর্টার। 'চেষ্টা করে দেখো গর্তটা অনুসরণ করতে পারো কি না। যদি পারো, এই মার্কারের সাহায্যে দাগ দিয়ে রেখো।'

মিনিটখানেক বাদে ওই মেয়ের লাশের ওপর একটা বর্গক্ষেত্র ঐঁকে দিল সিএসআই-এর মেয়েটা। ছোট ছোট আরও দুটো বর্গক্ষেত্র ঐঁকেছে, সেগুলো চওড়ায় চার ইঞ্চির মতো হবে।

'জবাবটা অনুমান করে নাও তো দেখি এবার,' বলল পোর্টার।

ভ্রূ কুঁচকে গেছে ন্যাশের। 'আমরা আসলে কী দেখছি?'

উঠে দাঁড়াল পোর্টার, দাঁড়াতে সাহায্য করল মেয়েটাকেও। 'তোমার নাম কী?'

'সিএসআই লিভসি রোফস, স্যর।'

'সিএসআই রোফস, যা দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে, সেটার কোনো ব্যাখ্যা করতে পারবে?'

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভাবল মেয়েটা। একবার তাকাচ্ছে পোর্টারের চেহারার দিকে, পরেরবার তাকাচ্ছে পায়ের নিচের বরফের দিকে। বুঝতে পারল হঠাৎ করেই। 'লেগুনের পানি জমে গেছে। কেউ একজন সম্ভবত কর্ডলেস চেইন-স' ব্যবহার করে বরফ কেটেছে। তারপর ওই মেয়ের লাশ নামিয়ে দিয়েছে লেগুনের পানিতে। মেয়েটা যদি দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে যেত লেগুনে, তা হলে বরফে এবড়োখেবড়ো চিড় ধরত, এ-রকম বর্গাকৃতির কোনো ফাটল দেখা যেত না। কিন্তু এসবের তো কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না আসলে...'

'কী?'

ক্রু কুঁচকে গেছে মেয়েটার। হাত বাড়িয়ে দিল নিজের কিটের উদ্দেশে। বের করে আনল একটা কর্ডলেস ড্রিল। এক ইঞ্চির একটা বিট লাগাল সেটাতে। দুটো ছিদ্র করল... একটা নিজের সেই লাইনের বাইরে, অন্যটা লাশের কাছাকাছি একজায়গায়। এবার হাতে নিল একটা রুলার। দুটো ছিদ্রেরই বরফ ঠিক কতখানি পুরু, মাপল। ‘বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা... এই মেয়ে তো ফ্রিজিং লাইনের নিচে আছে।’

‘আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না,’ বলল ক্লেয়ার।

‘পানি বদল করে দিয়েছে খুনি,’ বলল পোর্টার।

মাথা ঝাঁকাল রোফস। ‘কিন্তু কেন? ওই লোক তো অনায়াসেই একটা গর্ত করে মেয়েটার লাশ নামিয়ে দিতে পারত বাকি বরফের ওপর। তাতে গর্তের বরফ আপনাআপনিই আবার জমাট বেঁধে যেত। ফলে লোকটার কাজও সহজ হয়ে যেত, এবং কাজটা জলদি শেষ করতে পারত সে। শ্রেফ গায়েব হয়ে যেত মেয়েটা... সম্ভবত চিরতরে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেয়ার। ‘আমাদের দু’জনকে কি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন, স্যাম?’

ইঙ্গিতে রুলারটা দেখিয়ে দিল পোর্টার। ওটা ওর হাতে দিল রোফস। ‘এখানে বরফ কম করে হলেও চার ইঞ্চি পুরু। ওয়াটার লাইনটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে।’ রুলারের একটা দাগ দেখিয়ে দিল ইঙ্গিতে। ‘এখানকার বরফ থেকে যদি বর্গাকৃতির কোনো অংশ কেটে আলাদা করে নাও, বরফের উপরিভাগ থেকে পানি পর্যন্ত চার ইঞ্চির একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে। মনে করো, ও-রকম কোনো একটা গর্ত তৈরি করলে তুমি। তারপর সেখান দিয়ে নিচের দিকে চালান করে দিলে ওই মেয়ের লাশ। ডুবে গেল মেয়েটা। এবার তুমি চাইছ, গর্তটা যাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই কাজ করার উপায় আছে মাত্র একটা। অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে... মেয়েটার আশপাশে যে-পানি আছে, সেটা জমে কখন পরিণত হবে বরফে— অন্তত পাতলা একটা আস্তরণে। তারপর তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, যে-গর্ত করেছে, সেটাতে পানি ঢালতে হবে... পূরণ করে দিতে হবে শূন্যস্থানটা।’

‘এবং সেই পানি জমে বরফে পরিণত হতে কমপক্ষে দু’ঘণ্টা সময় লাগবে,’ বলল রোফস। ‘কিছু কম সময়ও লাগতে পারে। ইদানীং যে-তাপমাত্রা চলছে এখানে, সে-অনুযায়ী বললাম।’

মাথা ঝাঁকাচ্ছে পোর্টার। ‘স্বীকার করতেই হবে, আমাদের সেই অচেনা লোকটার ধৈর্য আছে। পুরো ব্যাপারটা খুবই সময়সাপেক্ষ।’ সিএসআই সুপারভাইজারের দিকে তাকাল। ‘বরফের এই নমুনা দরকার হবে আমাদের। মেয়েটার ওপর যা-যা আছে... অন্তত এই বর্গক্ষেত্র ঘিরে থাকা কয়েক ইঞ্চি বরফ লাগবে আমাদের। সম্ভাবনা আছে... পানিতে কিছু একটার চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল,

তারপর সেটা জমে গিয়ে পরিণত হয়েছে বরফে। আমাদের অচেনা সেই লোক লম্বা একটা সময় ধরে বিচরণ করেছে এখানে।’

সুপারভাইজার লোকটাকে দেখে মনে হলো, তর্ক করতে চাইছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত করল না সে-রকম কিছু। অনিচ্ছুক কায়দায় মাথা ঝাঁকাল। জানে, পোর্টার যা বলেছে, ঠিকই বলেছে।

পানির ধারে ঘন হয়ে জন্মে-ওঠা গাছপালার জঙ্গলের দিকে তাকাল পোর্টার। ‘আমি যা বুঝতে পারছি না তা হলো, যে-ই করে থাকুক এই কাজ, মেয়েটার লাশ ওই জঙ্গলে ফেলল না কেন সে। সে যা করেছে তা হলো, লাশটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এসেছে এখানে... এই খোলা জায়গায়। বরফ কাটার জন্য সময় খরচ করেছে। তারপর ওই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। অপেক্ষা করেছে... কখন জমাট বাঁধবে সে-জায়গার পানি। তার মানে হচ্ছে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে সে। এতকিছু না করে অচেনা সেই লোক চাইলেই মেয়েটার লাশ বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারত ব্রিজে, তারপর যেখানে-খুশি-লাগে সে-জায়গায় ফেলে রাখতে পারত লাশটা। ফলে কী হতো? ফলে বসন্তকাল আসার আগে... মানে, এই পার্কে লোকজন কাজ শুরু করার আগে কেউ খুঁজেই পেত না ওই লাশ। তার বদলে লোকটা কী করেছে? মেয়েটাকে কায়দা করে পানির ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় খরচ করেছে। তা-ও আবার কোথায়... যে-জায়গা দিয়ে লোক চলাচল বেশি, সেখানে। ধরা পড়ে যাওয়ার বড় একটা সম্ভাবনা ছিল তার। প্রশ্ন হচ্ছে, কাজটা কেন করল সে? পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চাইছিল? নাকি বোঝাতে চাইছিল, মেয়েটা যত সময় ধরে ছিল এই লেগুনের পানির নিচে, প্রকৃত সময়টা তার চেয়ে বেশি? আমরা যে সেই ধোঁকাবাজি ধরে ফেলবো, জানা উচিত ছিল তার।’

‘লাশ পানিতে ভাসে না,’ বলল ন্যাশ। ‘অন্তত কয়েকদিনের জন্য না। একবার তাকিয়ে দেখো মেয়েটাকে। মনে হচ্ছে না, নিখুঁত কোনো কায়দায় সংরক্ষণ করা হয়েছে বেচারীকে? মেয়েটা ভাসছে কেন, সে-ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত না আমি।’

বর্গক্ষেত্রের কিনারা বরাবর আঙুল চালান পোর্টার। ছোট যে-দুটো বর্গক্ষেত্র আছে, ওগুলোর একটার প্রান্তভাগে পৌঁছে থামল। বরফের দিকে খানিকটা নিচু করল চেহারা। একপাশ থেকে তাকিয়ে আছে মৃত মেয়েটার দিকে। ‘আরে!’

‘কী?’ ঝুঁকে পড়ল রোঙ্কসও।

বরফের ওপর, মেয়েটার কাঁধ বরাবর হাত বোলাচ্ছে পোর্টার। যা খুঁজছিল তা যখন পেয়ে গেল, একটা হাত ধরল রোঙ্কসের, ওটা রাখল বরফের গায়ে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। বড় বড় হয়ে যাচ্ছে চোখ। বরফের অন্য দিকে, একই রকম একটা জায়গার খোঁজে হাতড়াতে শুরু করেছে। ‘মেয়েটার লাশ যাতে ডুবে না যায়, সেজন্য এই গর্তে কিছু একটা দিয়েছে ওই লোক। এখানে যেসব চিহ্ন আছে, সে-অনুযায়ী যদি বলি, সেই বিশেষ কিছু একটা দু’ফুট বাই চার ফুটের

মতো হবে সম্ভবত। তারপর লোকটা করেছে কী... কোনো একজাতের তার অথবা পাতলা দড়ি পেঁচিয়ে দিয়েছে মেয়েটার শরীরে, কাঁধ বরাবর। সবশেষে সেই তার বা দড়ি আটকে দিয়েছে বোর্ডের সঙ্গে। ততক্ষণে আন্তে আন্তে জমে বরফে পরিণত হয়েছে গর্তের পানি। কাজ শেষ হওয়ার পর দড়ি কেটে দিয়েছে সে। এখানে বরফের গায়ে একটুখানি জায়গা চাঁইয়ের মতো হয়ে আছে, চাইলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে ঠাহর করে নিতে পারো তোমরা। বরফ ভেদ করে যদি সমকোণে তাকাও মেয়েটার দিকে, পাতলা একটা দড়িও দেখতে পাবে।’

‘তার মানে ওই লোক চেয়েছিল আমরা যাতে খুঁজে পাই মেয়েটার লাশ?’ বলল ক্রেয়ার।

‘লোকটা চেয়েছিল, মেয়েটার লাশ যদি আবিষ্কৃত হয়, তা হলে সে-ঘটনার একটা প্রভাব যাতে পড়ে,’ জবাবে বলল পোর্টার। ‘এখন চোখের সামনে যা দেখছি আমরা, এসব ঘটনা মঞ্চস্থ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। উদ্দেশ্য একটাই... দেখলে যাতে মনে হয়, মেয়েটা কয়েক মাস আগে এই লেগুনের পানিতে জমে গেছে। আসল কথা হচ্ছে, মেয়েটা বড়জোর কয়েক দিন ধরে আছে এখানে... সময়টা আরও কমও হতে পারে। যা হোক, ওই লোক কেন এত কষ্ট করতে গেল, খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।’

‘লোকটা আমাদেরকে নিয়ে খেলছে,’ বলল সিএসআই রোব্বস। ‘ক্রাইম সিনে বড় রকমের অদল-বদল ঘটিয়ে দিয়েছে সে। উদ্দেশ্য, কোনো একজাতের কাহিনি যাতে খাপ খেয়ে যায় ওই লাশের সঙ্গে।’

মানুষের দুটো শক্তিশালী প্রবৃত্তি হচ্ছে আত্মরক্ষা এবং ভয়। যে-লোকের ও-দুটোর কোনোটাই নেই, তার সঙ্গে দেখার করার ইচ্ছা আছে কি না পোর্টারের, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না সে। ‘মেয়েটাকে বের করো এখান থেকে,’ বলল শেষপর্যন্ত।

২.
পোর্টার
প্রথম দিন, রাত ১১:২৪

‘কী চাও তুমি? আসবো তোমার সঙ্গে?’

ওয়ারব্যাসে যে-অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থাকে পোর্টার, সেটার সামনে গাড়ি পার্ক করেছে ওরা। কনি-টা যাতে স্থবির হয়ে না যায়, সেজন্য গ্যাসপেডালে কয়েকবার চাপ দিল ন্যাশ। রাতটা সাংঘাতিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘বাসায় যাও। বিশ্রাম নাও। আগামীকাল সকালে আবার কাজ শুরু করবো আমরা।’

ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন দলটা চেইন-স’ ব্যবহার করে ওই মেয়ের আশপাশের বরফ কেটে ফেলেছে... বড় একটা বর্গের আকৃতিতে। তারপর যাতে কাজ চালানো যায় সেভাবে সাবধানে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে সে-বরফ। কয়েকটা বালতিতে তোলা হয়েছে ওসব টুকরো। পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্রাইম ল্যাবে। মেয়েটার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে মর্গে... শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে। টম আইজলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পোর্টার। লোকটা রাজি হয়েছে, আগামীকাল সকাল সকাল চলে যাবে মর্গে। কথা দিয়েছে, কোনো রকম পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশন পাওয়ামাত্র যোগাযোগ করবে পোর্টারের সঙ্গে। পোর্টার আর ন্যাশ যখন চলে আসে, ইউনিফর্ম-পরিহিত টহল পুলিশেরা তখনও খোঁজ চালাচ্ছে পার্কে। কিন্তু তখন পর্যন্ত কোনোকিছুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পার্কের প্রবেশমুখে একটামাত্র সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে; পার্কে থেকে যেতে রাজি হয়েছে ক্লেয়ার, বলেছে ওই ক্যামেরার মাধ্যমে যেসব ফুটেজ পাওয়া গেছে সেসব খতিয়ে দেখবে। আসলে কী খুঁজছে, সে-ব্যাপারে নিজেই নিশ্চিত না সে; ওদিকে পোর্টারও বিশেষ কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি ওকে... গত তিন সপ্তাহে পার্কে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নজরবন্দি করা ছাড়া, বিশেষ করে দর্শনার্থী-প্রবেশের-সময়ের পর। পার্কটা বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যায়। তারপর, খুব সাধারণ কিছু জায়গার অল্প কয়েকটা বাতির কথা বাদ দিয়ে বললে, পুরো পার্ক ঢাকা পড়ে থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে। ওদিকে লেগুনে স্থায়ী কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর বিশেষ কেউ যদি পার্কে আসে অথবা বেরিয়ে যায়, তা হলে তাকে সহজেই দেখতে পাওয়ার কথা।

‘আগের কথা যদি বলি, লেগুনে যাওয়ার পথে...’ শুরু করল পোর্টার।

ওকে থামিয়ে দিল ন্যাশ। ‘ব্যখ্যা করার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে।’

বাতাসে একটা হাত নাচাল পোর্টার। ‘আমি যে খুব একটা ঘুমাতে পারছি, তা কিন্তু না। তা-ও আবার কী... হিদার মারা যাওয়ার পর থেকে। যতবার আমাদের এই অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে পা রাখি, জায়গাটা কী যে ভীষণ ফাঁকা লাগে, বুঝিয়ে

বলতে পারবো না। আমি প্রতিবার কী আশা করি, জানো? আশা করি, অন্য কোনো একটা ঘর থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসবে সে আমার দিকে। অথবা সামনের দিকের দরজাটা দিয়ে ঢুকবে... বাজার-সদাইয়ে ভর্তি থাকবে হাত। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটে না কখনও। বিছানার যে-পাশটাতে ঘুমাত সে, সে-পাশ এখন খালি; সেদিকে তাকাতে চাই না আমি। বাথরুমে ওর টুথব্রাশ আছে এখনও, দেখতে চাই না সেটা। কিন্তু ওটা যে ছুঁড়ে ফেলে দেবো, সে-সামর্থ্যও নেই আমার। একই কথা ওর কাপড়চোপড়ের বেলায়ও প্রযোজ্য। সপ্তাহখানেক আগে ওর সব কাপড় বাক্সবন্দি করে ফেলেছিলাম প্রায়... উদ্দেশ্য ছিল গুডউইল নামের প্রতিষ্ঠানটাতে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু প্রথম একটা ব্লাউজ বাক্সে ঢোকানোর পরই থেমে যেতে হয় আমাকে। ওর ওসব কাপড় ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে মনে হলো, ওর সুঘ্রাণ যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম, সে ফিরে এসেছে... কিছু সময়ের জন্য হলেও। আমি জানি, সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাকে, কিন্তু পারবো কি না, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না। অন্তত, এখনও না।’

হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ, আলতো ডলে দিল ওর বন্ধুর কাঁধ। ‘পারবে তুমি। সময়ের নিয়ম অনুযায়ী একদিন ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু, তখন পারবে তুমি। কেউ তাড়া দিচ্ছে না তোমাকে। শুধু একটা কথা জানা থাকা দরকার তোমার। আমরা সবাই আছি এখানে... তোমার পাশে, তোমার জন্য। কোনোকিছু যদি দরকার হয়, শুধু জানিয়ো।’ স্টিয়ারিং হুইলটা কিছুক্ষণ হাতড়াল ন্যাশ। কৃত্রিম চামড়ায় মোড়ানো আছে ওটা, একদিকের একটা প্রান্ত ছিঁড়ে গেছে, ওই জায়গাটা ধরে টানাটানি করল কিছুক্ষণ। ‘একটা কথা বলি তোমাকে, হয়তো সেটা কাজে লাগতে পারে তোমার। নতুন কোনো জায়গা খুঁজে নাও নিজের জন্য। তারপর নতুনভাবে শুরু করো সবকিছু।’

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘ওই কাজ করা সম্ভব না আমার পক্ষে। আমরা দু’জনে মিলে খুঁজে বের করেছিলাম এই জায়গা। এটা আমাদের বাসা।’

‘তা হলে ছুটি নাও?’ পরামর্শ দেয়ার কায়দায় বলল ন্যাশ। ‘হাতে প্রচুর সময় আছে তোমার।’

‘হ্যাঁ, দেখি।’ বিল্ডিংয়ের দিকে তাকাল পোর্টার।

নড়ল না। স্থবির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর একসময় টান দিল শেভির দরজার হাতল ধরে। ক্যাচকোঁচ করে উঠল ওটা। ‘ইস্‌স্‌, কী ঠাণ্ডা এটা!’

‘লগু জন হুইস্কির একটা বোতল খোলার সময় হয়েছে আর কী।’

গাড়ির ছাদে দু’বার ঢোকা দিল পোর্টার। ‘এটার পেছনে যদি কিছু সময় খরচ করো, এটাতে চড়তে নেহাত মন্দ লাগবে না।’

একটুখানি হাসল ন্যাশ। ‘আগামীকাল সকাল সাতটায় চলে এসো জায়গামতো?’

‘হ্যাঁ, সাতটাই ভালো।’

চলে গেল ন্যাশ।

রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল পোর্টার। তারপর হাঁটা ধরল ওর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথের উদ্দেশ্যে। শুরুতেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি, সেখানে কুকুরের মল জমে আছে ঠাণ্ডায়, সাবধানে এড়িয়ে গেল। পাশ কাটিয়ে এল মেইলবক্সটা। হাজির হলো প্রধান সিঁড়ির কাছে, উঠতে লাগল। এলিভেটর আর ব্যবহার করে না আজকাল।

টুকে পড়ল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। বাতাসে কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ। দোকান থেকে রান্না-করা খাবার কিনে এনে খাওয়া হয়েছে কম করে হলেও বারোবার। কিচেন টেবিলের ওপর স্তুপ জমে গেছে পিজা বক্সের। বাসি পনির আর পুরনো পেপারনির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

কোট খুলে একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখল পোর্টার। টুকে পড়ল বেডরুমে। লাইট জ্বালল।

ঘরের দূরের এক কোনার দিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বিছানাটা। সেটার দু’পাশে দুটো নাইটস্ট্যান্ড আছে।

ওই বিছানা যে-জায়গায় ছিল, সেখানকার দেয়ালে এখন ঝুলছে শত শত ছবি আর নোট, পোস্ট-ইট, নিউজপেপার আর্টিকেল। কোনো কোনোটার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে দড়ির সাহায্যে। দড়ি যখন ফুরিয়ে গেছে পোর্টারের, কালো একটা মার্কার দিয়ে লাইন টেনেছে।

এসব আর কিছু না... ফোর মাক্সি কিলারের ব্যাপারে যা যা ছিল ওর কাছে, তার সব। অথবা ওই লোকের নাম অ্যানসন বিশপও বলা যেতে পারে। অথবা বলা যেতে পারে পল ওয়াটসন। সব নামই একজন মানুষের। বিশপের অতীত অপরাধের ব্যাপারে এখন বিস্তারিত তথ্য আছে পোর্টারের কাছে। তবে সে যে-ব্যাপারে নিজের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে তা হলো, পালিয়ে ঠিক কোথায় গিয়েছে বিশপ।

ঘরের এককোণায় মেঝের ওপর একটা ল্যাপটপ আছে। উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওটা থেকে। জিনিসটা তুলে নিল পোর্টার। ডিসপ্লে দেখল। গুগল অ্যালাট ব্যবহার করে সে (বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কম্পিউটারের বেসিক জ্ঞান নেই বললেই চলে, এ-রকম লোকও কাজে লাগাতে পারবে ওই অ্যালাট)। এবং সেটা ব্যবহার করে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। বিশপ বা ওয়াটসন বা ফোর মাক্সি কিলারের ব্যাপারে ইন্টারনেটে যদি কিছু বলে কেউ, যদি কোনো কাহিনি ছাপানো হয়, অথবা ওই লোককে কোথাও দেখা গেছে বলে কোনো খবর যদি আসে, তা হলে রেজাল্টটা সরাসরি চলে আসে পোর্টারের ব্যক্তিগত ই-মেইল অ্যাকাউন্টে। কখনও কখনও এই কাজে সময় লেগে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু পোর্টার প্রতিটা মেসেজ ঘাঁটে। যেসব তথ্য সে সাজিয়ে রেখেছে ওই দেয়ালে, সেগুলোর ঠিক

মাঝখানে সাঁটিয়ে দিয়েছে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ; সে-ম্যাপে নতুন কোনো তথ্য সাহায্যে যাচাই করার চেষ্টা করে ফোর মাক্সি কিলারের অবস্থান। ম্যাপ আছে আরও অনেক। ডজনখানেক হবে। বিস্তারিত, বড় বড় সব শহরের।

এসব তথ্যউপাত্ত গত চার মাসের।

ওসব ম্যাপের জায়গায় জায়গায় গঁথে দেয়া হয়েছে থাম্বট্যাক। লাল রঙেরগুলো বোঝাচ্ছে কোথায় কোথায় দেখা গেছে ফোর মাক্সি কিলারকে। নীলগুলো বোঝাচ্ছে, কোন জায়গায় বসে কাহিনিটা লিখেছে রিপোর্টার। হলুদ রঙের কতগুলো ট্যাকও আছে। ওগুলো দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, ফোর মাক্সি কিলারের পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিক কোন জায়গার কোন বাসা থেকে নিখোঁজ হয়েছে কেউ অথবা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। কপিক্যাট খুনিরা সবজায়গায়ই ছিল, আছে। শিকাগোকে কেন্দ্র করেই গাঁথা হয়েছে বেশিরভাগ থাম্বট্যাক, তারপরও কোনো কোনোটা চলে গেছে সুদূর ব্রাজিল এবং মস্কো পর্যন্ত।

একটা হলুদ থাম্বট্যাক তুলে নিল পোর্টার। শিকাগোর ম্যাপে যে-জায়গায় জ্যাকসন পার্ক লেগুন আছে, সেখানে গঁথে দিল সেটা। ‘এলা রেনল্ডস, ২২ জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে নিখোঁজ ছিল। খুব সম্ভব তার খোঁজ পাওয়া গেছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এ,’ বিড়বিড় করে বলল নিজের উদ্দেশ্যেই। এ-হত্যাকাণ্ডের দায় যে ফোর মাক্সি কিলারের, এ-রকম বিশ্বাস করার কোনো কারণই নেই ওর। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হচ্ছে ফোর মাক্সি কিলার করেছে খুনটা, ততক্ষণ ট্যাকটা রয়ে যাবে ওই লেগুনের ওপরই।

টের পাচ্ছে, ঘুমে ভারী হয়ে এসেছে দু’চোখ।

মাথাটা সাংঘাতিক ব্যথা করছে।

বসে পড়ল মেঝের মাঝখানে। আজ যতগুলো গুগল অ্যালাট এসেছে, ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল সব। সেগুলোর মোট সংখ্যা ১৫৯।

ঘণ্টা দু’-এক পর বেজে উঠল ওর ফোন। প্রথমে ভাবল, পাত্তা দেবেন না। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করল। রাত দেড়টার সময় কোনো কারণ ছাড়া ফোন করে না কেউ।

কল রিসিভ করে বলল, ‘পোর্টার।’

গভীর রাতে ওর কণ্ঠ এত জোরালো শোনায কেন?

প্রথমে নীরবতা। তারপর:

‘ডিটেকটিভ? আমি সোফি রদ্রিগেজ। মিসিং চিলড্রেন থেকে বলছি। ক্রেয়ার নর্টনের কাছ থেকে পেয়েছি আপনার নম্বর।’

‘আমি আপনার জন্য কী করতে পারি, মিসেস রদ্রিগেজ?’

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। ‘আরও একটা মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর এসেছে আমাদের কাছে। আপনার এবং আপনার পার্টনারের একবার আসা দরকার আমাদের এখানে।’

৩.
পোর্টার
দ্বিতীয় দিন, রাত ২:২১

“এখানে” বলতে যা বোঝানো হয়েছিল, সেটা প্রকৃতপক্ষে কিং ড্রাইভের ব্রাঞ্জভিলে অবস্থিত গ্রেস্টোনের একটা বাড়ি।

রদ্রিগেজ যখন ফোন করেছিল, বিস্তারিত কোনোকিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, পার্ক থেকে যে-মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে, সে-মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই কেসের। আরও বলেছিল, এখানে নাকি আসতে চাইবে পোর্টার।

রাস্তায়, ন্যাশের শেভির পেছনে নিজের চার্জার গাড়িটা পার্ক করল পোর্টার, নামল। তুষার জমে আছে রাস্তার ধারে, পা টেনে টেনে এগোতে লাগল। কোনার একটা বাসার দিকে এগিয়ে চলেছে। নক করার কোনো দরকার নেই। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন অফিসার। পোর্টারকে চিনতে পারল সে, ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। ন্যাশের দেখা পেল পোর্টার। দেখতে পেল একজন মহিলাকেও। চিনতে পারল না তাকে। প্রবেশপথের বাঁ দিকে, একটা পার্কারে বসে আছে ওই মহিলা। ন্যাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লোক। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। মাথার চুল বালিরঙা। শক্তসমর্থ। পরনে টুইডের স্পোর্ট কোট আর জিন্স। দেখা মিলল আরও একজন মহিলার। সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় এই মহিলা, ন্যাশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকের স্ত্রী। একটা কাউচে বসে আছেন তিনি। হাতে দলাপাকানো টিস্যু।

পোর্টার ঘরে ঢোকামাত্র উঠে দাঁড়াল প্রথম মহিলা। ‘ডিটেকটিভ পোর্টার? আমি মিসিং চিলড্রেনের সোফি রদ্রিগেজ। আসার জন্য ধন্যবাদ। জানি এখন অনেক রাত।’

মহিলার সঙ্গে হাত মেলাল পোর্টার। ঘরটা দেখছে।

এসব গ্রেস্টোনের বেশিরভাগই বানানো হয়েছে বিশ শতকের গোড়ার দিকে। আর এই বাড়ি বানানো হয়েছে অনেক যত্ন সহকারে। আদি ছাঁট এবং স্থাপত্যশৈলির ছোঁয়া রয়ে গেছে এখনও। মেঝের রাগ দেখলে অকৃত্রিম বলে মনে হয়। কিন্তু ওগুলো প্রকৃতপক্ষে নকল... অনুকরণ করা হয়েছে আসল জিনিসকে। অ্যান্টিক আসবাবপত্রের দখলে আছে ঘরটা।

ন্যাশের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে-লোক, পোর্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। ‘আমি ডক্টর র্যান্ডাল ডেভিস। আর এ হচ্ছে আমার স্ত্রী, গ্রেস। এই সময়ে এসেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’

কাউচের পাশে থাকা একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি ইঙ্গিতে।

মানা করে দিল পোর্টার। ‘আজকের রাতটা বেশ লম্বা কাটছে আমাদের। মনে হয় দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভালো হবে আমার জন্য।’



‘কফি খাবেন?’

‘প্লিজ। কালো হলে ভালো হয়।’

ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডক্টর ডেভিস, অদৃশ্য হয়ে গেলেন হল ধরে।

রদ্রিগেজের দিকে তাকাল পোর্টার।

কাউচে বসে পড়েছে মহিলা। বলল, ‘আজ মাঝরাতের কিছুক্ষণ পর মিসেস ডেভিসের পক্ষ থেকে একটা ফোনকল রিসিভ করে আমার অফিস। তখনও বাসায় ফিরে আসেনি তাঁর মেয়ে।’

মুখ তুলে তাকালেন মিসেস ডেভিস। চোখ ফুলে আছে, লাল হয়ে গেছে। ‘শহরের কেন্দ্রস্থলে একজায়গায় কাজ করে লিলি, একটা আর্ট গ্যালারিতে। প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুল শেষ করে সোজা ওখানে চলে যায়। তারপর এগারোটার সময় যখন বন্ধ হয়ে যায় ওই গ্যালারি, একটা উবার নিয়ে ফিরে আসে বাসায়। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় বাসায় পাওয়া যায় ওকে। যদি কখনও কোনো কারণে আসতে দেরি হয় ওর, টেক্সট মেসেজ করে জানিয়ে দেয় আমাকে। জানে, আমি আর ওর বাবা দুশ্চিন্তা করি এই ব্যাপারটা নিয়ে। তাই সবসময়ই টেক্সট করে আমাকে। ওর বয়স কম হলেও দায়িত্বজ্ঞান আছে। আর এটাই ওর প্রথম চাকরি। তা ছাড়া, জানে, আমরা দুশ্চিন্তা ভুগি...’ হাতেধরা টিস্যু দিয়ে চোখ মুছলেন। ‘আজ এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বেজে যাওয়ার পরও ওর কোনো খবর পেলাম না। তাই ফোন করলাম। কলটা সরাসরি চলে গেল ভয়েস মেইলে। তখন ফোন করলাম সেই গ্যালারিতে। কথা বললাম ওর সুপারভাইজার মিসেস এডউইন্সের সঙ্গে। তিনি বললেন, যে-শিফটে কাজ করার কথা ছিল লিলির, সেখানে নাকি তখন দেখা যায়নি মেয়েটাকে। মিসেস এডউইন্সও কয়েকবার চেষ্টা করেছেন লিলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ফলাফল একই: ভয়েস মেইল। কোনো রিং হয় না, শুধু ভয়েস মেইল। আমি জানি, ব্যাপারটার মানে হচ্ছে, মেয়েটার মোবাইল ফোন বন্ধ। এই ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। সে কখনও ওর ফোন বন্ধ করে না। জানে, আমি দুশ্চিন্তা করতে থাকি। যা হোক, আমি তখন ওর সবচেয়ে ভালো বন্ধু গ্যাবিকে ফোন করলাম। তারপর...’

‘গ্যাবির নামের শেষ অংশটা কী?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

‘ডিগান। গ্যাব্রিয়েল ডিগান। আপনার পার্টনারকে ইতোমধ্যেই লিলির কন্ট্যাক্ট ইনফর্মেশন দিয়েছি আমি।’ কথাটা বলে রদ্রিগেজের দিকে তাকালেন মিসেস ডেভিস। ভুলটা শুধরে দিল না পোর্টার।

‘গ্যাবি বলল,’ বলছেন মিসেস ডেভিস, ‘সে নাকি সারাদিনেও দেখা পায়নি লিলির। আমার মেয়েটা নাকি স্কুলেও যায়নি। কারও কোনো টেক্সট মেসেজেরও কোনো জবাব দিচ্ছে না সে। বোধহয় বুঝতে পারছেন, এসব কাজ মোটেও মানানসই হয়নি আমার মেয়েটার সঙ্গে। স্ট্রাইট-“এ” ছাত্রী বলতে যা বোঝায়, আমার মেয়ে ঠিক সে-রকম... মানে, সব পরীক্ষায় সেরা ফলটাই করে। ফোর্থ

গ্রেডের পর থেকে একদিনের জন্যও স্কুল কামাই দেয়নি।' থামলেন, জরিপ করছেন পোর্টারের চেহারাটা। 'আপনিই কি সেই গোয়েন্দা, যিনি ধাওয়া করেছেন... ঈশ্বর... কী মনে হয় আপনার... ফোর মাস্কি কিলারই কি তুলে নিয়ে গেছে আমাদের মেয়েটাকে? সে-কারণেই কি এখানে এসেছেন আপনি?' বড় বড় হয়ে গেছে তাঁর চোখ, পানিতে ভরে গেছে।

'এই কাজ ফোর মাস্কি কিলারের না,' নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে মিসেস ডেভিসকে বলল পোর্টার, যদিও এ-ব্যাপারে নিজেই নিশ্চিত না সে। 'আমার মনে হয় এখনও এ-রকম অনুমান করে নেয়ার কোনো কারণ নেই, আপনার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে কেউ।'

'কিন্তু ওর তো এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার কথা না।'

প্রসঙ্গ বদল করার চেষ্টা করল পোর্টার। 'কোন স্কুলে পড়ে লিলি?'

'উইলকক্স অ্যাকাডেমি।'

ফিরে এলেন ডক্টর ডেভিস। ধোঁয়াওঠা কফির একটা কাপ ধরিয়ে দিলেন পোর্টারের হাতে। স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'আমি জানি কী ভাবছেন আপনি। আপনার পার্টনারদেরকে কিন্তু ইতোমধ্যে বলেছি আমরা, লিলির কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। স্কুল বাদ দেয় না সে। আর কাজ তো বাদ দেয়ই না। ওই গ্যালারি রীতিমতো ভালোবাসে। কাজেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। "ফাইন্ড মাই আইফোন" ফিচারটা চালু করা আছে ওর মোবাইলে, কিন্তু ওটা এখন কাজ করছে না আমাদের অ্যাকাউন্টে। অ্যাপল-এ ফোন করেছিলাম আমি, ওরা বলেছে, লিলির ফোন নাকি অফলাইনে আছে। কিন্তু আমাদের মেয়ে কখনোই নিজের ফোন বন্ধ করে না।'

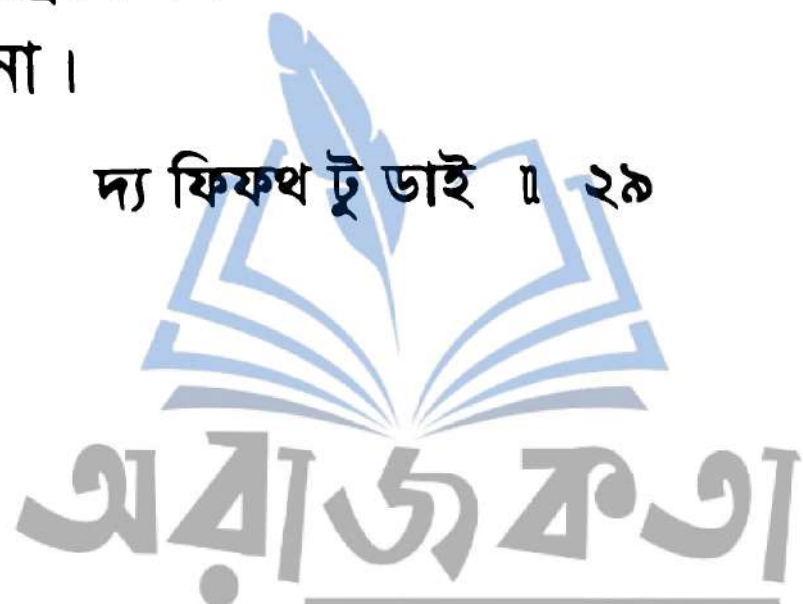
খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ন্যাশ। 'মিসেস ডেভিস, আজ লিলির পরনে কী ছিল, সেটা কি ডিটেকটিভ পোর্টারকে বলতে পারবেন আপনি? মানে... বোঝাতে চাইছি... শেষবার কোন কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে মেয়েটাকে?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ডেভিস। 'ওর প্রিয় একটা কোট আছে... লাল রঙের পেরো পার্কা... ওটা পরে ছিল। সঙ্গে ছিল সাদা হ্যাট, ম্যাচ-করা গ্লাভস। আর গাঢ় রঙের জিন্স। ঠাণ্ডার দিনগুলোতে লিলি ক্যাম্পাসে যাওয়ার পর কাপড় বদল করে ইউনিফর্ম পরতে পছন্দ করে। যা হোক, আজ সকালে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কিচেনের দরজায় দাঁড়ায় সে, আমাকে গুডবাই বলে। তারপর বেরিয়ে পড়ে স্কুলের উদ্দেশে। ওই কোটটার কথা বললাম না... ওটা ওর প্রিয় কোট। চাকরিতে প্রথমবার বেতন পেয়ে বার্নিস থেকে কিনেছিল জিনিসটা। ওটা নিয়ে খুব গর্ব করত।'

ঠোটে ঠোটে চাপল রদ্রিগেজ।

পোর্টার কিছু বলল না।

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ২৯



অরাজকতা

৪.
পোর্টার
দ্বিতীয় দিন, রাত ৩:০২

‘ব্যাপারটা সম্ভব হলো কী করে, সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না আমার।’

‘আমরা এক কাজ করতে পারি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওই জ্যাকেটের একটা ছবি দেখাতে পারি তাঁদেরকে,’ পরামর্শ দিল ন্যাশ।

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘ওই মৃত মেয়ের কোনো ছবি আমরা দেখাতে পারি না তাঁদেরকে।’

ডেভিসদের গ্রেস্টোন বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। নিঃশ্বাসের কারণে বরফশীতল একজাতের কুয়াশা বার বার দেখা দিচ্ছে ওদের মাঝখানে।

‘একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে। লিলি ডেভিসকে অপহরণ করা, এবং তারপর ওই মেয়ের কাপড় এলা রেনল্ডসের গায়ে পরিয়ে দেয়া, এবং তারপর এলাকে পার্কের বরফের নিচে কবর দেয়ার মতো সময় কিছুতেই থাকতে পারে না একটা লোকের হাতে। কোনোভাবেই সম্ভব না ব্যাপারটা। যথেষ্ট সময় বলতে কিছুই নেই এক্ষেত্রে।’ শরীরের ভার একপায়ের ওপর থেকে আরেক পায়ে বদল করল পোর্টার। তাপমাত্রা নিশ্চয়ই নেমে এসেছে এক অঙ্কে। ‘এর মানে হচ্ছে, যখন দিনের আলো ছিল, যখন লেকটা খোলা ছিল, তখন লেকে থাকতে হয়েছে লোকটাকে। সেক্ষেত্রে কারও না কারও দেখে ফেলার কথা ওই লোককে।’

এই ব্যাপারটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল ন্যাশ। ‘এ-রকম আবহাওয়ায় ওই পার্ক বলতে গেলে জনশূন্য। সত্যিকারের ঝুঁকি বলতে যদি কিছু থাকে, তা হলো, অচেনা সেই লোক নিজের গাড়ি থেকে লাশটা বের করে পানির কাছে যে নিয়ে গেছে, সেটা। কেউ যদি সে-লোকের কাছাকাছি গিয়ে না থাকে, তা হলে বিপদসঙ্কেত জানাতে যেভাবে ছুট করে লাল পতাকা ওঠানো হয়, সেভাবে কোনোকিছু লাফিয়ে হাজির হয়ে যাবে না তার সামনে। সেক্ষেত্রে অচেনা সেই লোককে কেমন দেখাবে, জানো? লেগুনের ধারে হাজির হওয়া অন্য যে-কোনো লোকের মতোই। প্রত্যক্ষদর্শীরা ভাববে, আইস-ফিশিং করতে গেছে সে। একটা ফিশিং পোল যদি বসিয়ে দিয়ে থাকে সে, বাজি ধরে বলতে পারি, সারাটা দিন সে-জায়গায় কাটিয়ে দিয়েছে, অথচ কেউ তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকায়নি।’

‘কীভাবে কাজটা করল ওই লোক, তা না হয় পরে আলোচনা করা যাবে,’ বলল রদ্রিগেজ। ‘এ-রকম কোনো কাজ করার কী যুক্তি থাকতে পারে?’

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল পোর্টার আর ন্যাশ। ওরা জানে, যুক্তি বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কিছু আসলে খুব কমই থাকে সিরিয়াল কিলারদের বেলায়। অন্তত এমন কোনো যুক্তি, যার কোনো মানে নেই কারও কাছেই... শুধু পোর্টার আর ন্যাশ বাদে। এখন পর্যন্ত মাত্র একজন শিকারের খোঁজ পাওয়া গেছে।

ওই মেয়ের সঙ্গে যদি লিলির কোনো যোগসূত্র থাকে, তা হলেই কেবল ধারাবাহিকতার কথাটা আসে।

‘এলা রেনল্ডস আর লিলি ডেভিস কি চেনে একজন আরেকজনকে?’ রদ্রিগেজকে জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

মাথা নাড়ল রদ্রিগেজ। ‘লিলির বাবা-মা এলার নামটা জেনেছেন টেলিভিশন থেকে।’

‘লিলির বন্ধু গ্যাবির ব্যাপারটা একটু চেক করা দরকার আমাদের,’ পরামর্শ দেয়ার কায়দায় বলল পোর্টার। ‘স্কুলের উদ্দেশে বাসা থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল লিলি?’

নিজের নোটের ওপর নজর বুলিয়ে নিল রদ্রিগেজ। ‘সোয়া সাতটায়।’

চোখ বুজে ফেলল ন্যাশ। মনে মনে হিসেব কষছে। ‘তার মানে হচ্ছে, লিলির গায়েব হয়ে যাওয়ার পর থেকে, লেকে এলার জমাট-বাঁধা লাশ পাওয়ার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান বারো ঘণ্টা।’

‘আরে তুমি দেখছি অঙ্ক করছ,’ বলল পোর্টার, চাপা হাসল।

‘এসব কাজ যদি একজন লোকের হয়ে থাকে, স্বীকার করতেই হবে, দ্রুত কাজ করতে পারে সে। সেইসঙ্গে দক্ষও,’ বলল ন্যাশ।

রদ্রিগেজের দিকে ফিরল পোর্টার। ‘সোফি, ঠিক না?’

মাথা ঝাঁকাল মহিলা।

‘আপনি বরং এক কাজ করুন। বাসার ভেতরে যান আবার। লিলির ঘরটা ভালোমতো খুঁজে দেখুন। অস্বাভাবিক যে-কোনোকিছুর খোঁজ করবেন। পারলে মেয়েটার কম্পিউটার ঘাঁটবেন। ই-মেইল চেক করবেন। সেভ-করা ডকুমেন্টগুলো দেখবেন। খুঁজে দেখবেন কোথাও কোনো ডায়েরি পাওয়া যায় কি না। ছবিটবি পেলেও দেখবেন একটু। যদি সে-রকম কোনোকিছু পান, ফোন করবেন আমাকে। কোন পথে স্কুলে যেত মেয়েটা, চেষ্টা করে দেখুন জানা যায় কি না। হেঁটে যেত? নাকি কোনো যানবাহনে সওয়ার হতো? বন্ধুদের সঙ্গে যেত? নাকি একা যেত? বুঝতে পেরেছেন?’

নিচের ঠোঁটে আলতো কামড় বসিয়ে দিল রদ্রিগেজ। ‘লিলির জন্য এসব কাজের মানে কী?’

বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য পোর্টার ঠিক প্রস্তুত না। ঘুরল ন্যাশের দিকে। ‘চলো গিয়ে ঘুম থেকে তুলি আইজলিকে।’





দ্বিতীয় দিন, ভোর ৪:১৮

দ্য কুক কাউন্টি মেডিকেল একজামিনার'স অফিস এবং মর্গটা শিকাগো শহর কেন্দ্রস্থলে, ওয়েস্ট হ্যারিসন থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। এই কাকডাকা ভোগে সেখানে পৌছাতে তেমন কোনো ট্র্যাফিক জ্যাম পোহাতে হলো না পোর্টার আর ন্যাশকে। মর্গের পার্কিং স্পেসটাও তুলনামূলক ফাঁকা। ফ্রন্ট ডেস্কে থাকা গার্ড মুখ তুলে কেমন মাতালের দৃষ্টিতে একবার তাকাল ওদের দিকে। মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানাল। 'স্বাক্ষর করুন, প্লিজ।'

পোর্টার ক্লিপবোর্ডে লিখল বার্ট রেনল্ডস। তারপর ওটা ধরিয়ে দিল ন্যাশকে হাতে। ন্যাশ লিখল ডলি পার্টন। বোর্ডটা নামিয়ে রাখল ডেস্কে। দু'জনে চলে এল লবির পেছনদিকে। এখানে একধারে কয়েকটা এলিভেটর আছে। এসব আবার তেমন একটা পছন্দ না পোর্টারের। আবার সিঁড়ি বেয়ে অনেক ওপরে উঠতে অপছন্দ করে আরও বেশি।

বাঁ দিকের দ্বিতীয় এলিভেটরটা হাজির হলো আগে। ন্যাশকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল পোর্টার, নিজের মত বদল করার আগেই।

৩ লেখা বাটনটা টিপে দিল সে। কিছুদূর ওঠার পর খুলে গেল দরজাটা। শূন্য একটা হলওয়ে দেখা যাচ্ছে। নামল ওরা।

একটা ভেভিং মেশিনকে পাশ কাটাল ন্যাশ। হলওয়ের শেষপ্রান্তে থাকা একটা ডাবল ডোরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে।

টম আইজলিকে তার ডেস্কেই খুঁজে পাওয়া গেল। পোর্টার আর ন্যাশকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে একঝলক। তারপর, যা পড়ছিল, মন দিল সে-কাজে।

পোর্টার ভেবেছিল, আইজলি হয়তো সময়ের ব্যাপারে কিছু একটা বলবে কিন্তু তার বদলে লোকটা জানতে চাইল, 'আপনাদের কেউ কখনও মহাসাগর দেখেছেন?'

দৃষ্টি বিনিময় করল পোর্টার আর ন্যাশ।

ডেস্কের ওপর রাখা বইটা বন্ধ করল আইজলি, উঠে দাঁড়াল। 'কিছু মনে করবেন না। এই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি এখনও প্রস্তুত কি না, নিজেই নিশ্চিত না।'

'কী বুঝে নেবো তোমার কথা থেকে, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল পোর্টার 'ওই মেয়ের ব্যাপারে কাজ করছ তুমি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আইজলি। 'চেষ্টা করছি। মেয়েটার লাশ এখানে নিয়ে আসার পর থেকে তার শরীরটাকে গরম করছি আমরা। বললে বুঝতে পারবেন হয়তো...

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৩২

মেয়েটার শরীর কিন্তু পুরোপুরি জমে যায়নি। স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কিছু নিচে নেমে গিয়েছিল। মেয়েটা ঠিক কখন মারা গেছে, সেটা নির্ণয় করা কঠিন একটা কাজ হয়ে দাঁড়াবে।’

‘কারণ জানা আছে তোমার?’

মুখ খুলল আইজলি, কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু বলল না শেষপর্যন্ত... না বলাটাই ভালো মনে করল। ‘এখনও জানতে পারিনি। আমার আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। যদি চান তো অপেক্ষা করতে পারেন।’

পোর্টার বা ন্যাশ কেউ কিছু বলার আগে হাঁটা ধরল আইজলি, যে-ঘরে ময়নাতদন্ত করা হয় সে-ঘরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পোর্টারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।’

ওই দরজার পাশে হলুদ ভিনাইলের একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল পোর্টার। ঘুমের অভাবে ভারী হয়ে গেছে ওর দু’চোখ।

‘জেন্টলমেন?’

যেন এক ঝাপটায় খুলে গেল পোর্টারের চোখ। সে যে মর্গে আছে, আইজলির অফিসে আছে, সেটা ঠাহর করতে একটা মুহূর্ত লেগে গেল। হলুদ রঙের সেই ভিনাইল চেয়ার থেকে পিছলে নামল। এতক্ষণ একদিকে অদ্ভুত এক কায়দায় বাঁক হয়ে থাকার কারণে হালকা ব্যথা করছে ঘাড়টা। ন্যাশকে দেখে মনে হচ্ছে যে ছমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়েছে আইজলির ডেস্কে। একগাদা কাগজের একটা স্তুপের ওপর আলগোছে নামিয়ে রেখেছে মাথাটা।

মেডিকেলের একটা টেক্সট বুক হাতে তুলে নিল আইজলি। ডেস্ক থেকে ফুট তিনেক ওপরে তুলল সেটা, তারপর ছেড়ে দিল। শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল জিনিসট ডেস্কের ওপর। জোরালো আওয়াজ হলো। ঝট করে মাথা সোজা হয়ে গেল ন্যাশের, চেয়ারে সিঁধে হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বেতের বাড়ি খেয়েছে যেন লাল গড়িয়ে নামছে খুঁতনি বেয়ে। ‘কী সব...’

‘আসুন আমার সঙ্গে,’ বলে উঠল আইজলি।

নজর তুলে দূরের দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটা একবার দেখে নিল পোর্টার। প্রায় সাড়ে সাতটা। ওরা দু’জন এখানে আসার পর তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পার হয়েছে। ‘ধেং, ঘুমিয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার,’ বলল বিড়বিড় করে পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোন। তিনটা মিস কল এসেছে, ক্রেয়ার করেছিল। কোনো ভয়েস মেইল নেই।

নিজের ডেস্ক ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল আইজলি, নিশ্চিত হলো তাকে অনুসরণ করছে পোর্টার আর ন্যাশ। ডাবল ডোরটা অতিক্রম করে হাজির হলো অফিসের পেছনদিকে। এই জায়গাকে বড় একটা একজামিনেশন রুম বলা চলে। দরজার কাছে, দেয়াল থেকে ঝুলছে বাক্স; সেখান থেকে যার যার গ্লাভস জোগাড় করে নিল পোর্টার আর ন্যাশ দু’জনই।

এখানে প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এ-ঘরে যতবার ঢুকেছে পোর্টার, ততবার ওই চিন্তাটাই সবার আগে খেলা করে গেছে ওর মাথায়। মেঝেতে বিছানো আছে হালকা হলুদ টাইলস, দেয়ালেও সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে একই জিনিস; আর সে-কারণে এখানকার সব শব্দ অন্যরকম শোনায়। দ্বিতীয় যে-চিন্তা খেলা করে গেছে ওর মাথায় তা হলো তাপমাত্রা। এই ঘরের প্রকৃত তাপমাত্রা কত, সেটা জানে না সে। তবে মনে হয়, ওটা যেন নেমে গেছে প্রায় বিশ ডিগ্রি। এখানে ঢুকলেই ওর ঘাড়ের পেছনের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে। তৃতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে, গন্ধ। বিশেষ এই ব্যাপারটার

সঙ্গে কখনোই ধাতস্থ হতে পারেনি সে। এমন না যে, গন্ধটা খারাপ লাগে ওর। অন্তত এখন আর না। কিন্তু কথা হচ্ছে, কড়া একটা গন্ধ আছে এই ঘরে। ওর কেবলই মনে হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লিনাররা ভারী একটা গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে এখানে... আসলে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে অন্য কিছু একটার গন্ধকে... এবং সেই অন্য গন্ধটার ব্যাপারে ভাবতে চায় না সে।

মাথার ওপর থেকে উজ্জ্বল আলো বিলাচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট লাইট। সে-আলোয় চকচক করছে স্টেইনলেস স্টিলের কেবিনেটগুলো। বড়, গোলাকার একটা সার্জিকাল লাইট যেন খিলানের আকার গড়ে তুলেছে একজামিনেশন টেবিলের ওপর। ওই টেবিলে নিখর শুয়ে আছে লেক থেকে তুলে আনা লাশটা।

আইজলি দু'চোখ বন্ধ করে দিয়েছে মেয়েটার।

স্লিপিং বিউটি।

একটা ইলেকট্রিক কম্বল এবং চারটা বড় ল্যাম্প দেখা যাচ্ছে একপাশে।

আইজলি খেয়াল করল, ওসব জিনিসের দিকে তাকাচ্ছে পোর্টার। 'আমাদের কপাল একদিক দিয়ে ভালো। লেকের পানিতে খুব বেশি সময় ধরে থাকতে হয়নি মেয়েটাকে। ফ্রিজ লাইন বলতে যা বোঝায়, সেটার চেয়ে নিচে ছিল মেয়েটার শরীর। সে যদি জমে যেত পুরোপুরি, তা হলে তার ময়নাতদন্ত করতে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হতো আমাদেরকে। আর এই মেয়ের বেলায় আমাদের সময় লেগেছে কয়েক ঘণ্টা... কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য তার শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে নিয়েছি আমরা।'

'দেখা যাচ্ছে তোমরা এখনও মেয়েটাকে কাটাছেঁড়া করোনি,' বলল ন্যাশ। 'দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা এখনও কাজ শুরুই করোনি।'

'ঠিক কোন জায়গাটা ঘেঁটে দেখতে হবে, যদি জানা থাকে, তা হলে একটা লাশ কী কী তথ্য দিতে পারে আপনাকে, জানলে বিস্মিত হবেন,' জবাবে বলল আইজলি। 'আগামীকালের আগে এই মেয়েকে কাটাছেঁড়া করা সম্ভব না আমার পক্ষে। এখনও অনেক ঠাণ্ডা তার শরীর। যদি তার শরীরটা খুব দ্রুত গরম করি, তা হলে দুটো ঝুঁকি রয়ে যাবে। এক, স্ফটিক দেখা দিতে পারে মেয়েটার শরীরে। দুই, শরীরের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু তার মানে এ-ই না, আমরা যতক্ষণ অপেক্ষা করবো, ততক্ষণ আমাদেরকে কিছুই জানাতে পারবে না লাশটা। আপনারা ব্যস্ত না-ও থাকতে পারেন, কিন্তু আমি ব্যস্ত ছিলাম এই লাশ নিয়ে।' চুলে হাত বোলাল সে। 'কথা বলছিল মেয়েটা। আর আমি শুনছিলাম।'

'তোমার কথা শুনে তো গা ছমছম করছে আমার,' বলল পোর্টার, কণ্ঠ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত।

একচিলতে হাসি দেখা দিল আইজলির ঠোঁটের কোনায়। টেবিলের পেছন থেকে এককদম আগে বাড়ল। 'আমি কী খুঁজে পেয়েছি, জানতে চান?'

'জানতে পারলে তো খুব ভালো হয়।'

টেবিলের একটা পাশের দিকে এগিয়ে গেল আইজলি। মেয়েটার হাত তুলল। ‘ঠাণ্ডা পানি খুব ভালো সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। তারপরও পানি থেকে যেসব লাশ পাওয়া যায়, সেগুলোর প্রিন্ট জোগাড় করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। দেখা যায়, চামড়া প্রসারিত হতে শুরু করেছে। প্রিন্ট জোগাড় করার আগে বিশেষ ওই প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী করতে হয় আমাদেরকে। গোসল করার সময় ফ্রনিং করি না আমরা, অনেকটা তা-ই... বলা ভালো, সে-রকম কোনো কাজের এক্সট্রিম ভার্সন আর কী।’

‘আমি আবার সময় নিয়ে গোসলের পক্ষপাতী নই,’ বলল পোর্টার। ‘যাকে বলে কিনা শাওয়ার, আমি সবসময় সেটাই নিই।’

মন্তব্যটা উপেক্ষা করল আইজলি। ‘ওই লেকের বরফশীতল পানির কারণে কী হয়েছে, জানেন? মেয়েটার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে। সম্ভবত সারা বসন্তকাল ধরে ও-রকমই রয়ে যেত।’ নামিয়ে রাখল মেয়েটার হাত। ‘রেজাল্ট পেয়েছি ঘণ্টা দু’-এক আগে। নিশ্চিত হতে পেরেছি, এই মেয়ে এলা রেনল্ডসই। তার মানে হচ্ছে, মেয়েটা সেই মেয়ে, যে সপ্তাহ তিনেক আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোর্টার। এ-রকমই কিছু একটা আশা করেছিল সে। এইমাত্র যা বলেছে আইজলি, সেটা যেন চুপসে দেয়ার মতো। ‘কখন মারা গেছে মেয়েটা, কিছু জানতে পেরেছ? মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা গেছে?’

‘আগেও বলেছি, মৃত্যুর সময়টা আমাদেরকে একটু ধোঁকায় ফেলতে পারে। কারণ, বরফশীতল পানি। আপাতত যা বলতে পারি, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে ওই মেয়ে। সময়টা চব্বিশ ঘণ্টাও হতে পারে। মেয়েটার লিভার এবং অন্যান্য অঙ্গ ভালোমতো দেখার পর কমবেশি নিশ্চিত হওয়া যাবে। যা হোক, একটু আসবেন এদিকে? মেয়েটাকে উপড় করা দরকার, সাহায্য করবেন?’

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল পোর্টার আর ন্যাশ। ন্যাশ আলগোছে একটুখানি পিছিয়ে গেল। পেশায় সে হোমিসাইড ডিটেকটিভ হলেও মরদেহের প্রতি অদ্ভুত একজাতের বিতৃষ্ণা আছে ওর।

এগিয়ে গেল পোর্টার, ধরল মেয়েটার দুই পা। আইজলি ধরল কাঁধ। দু’জনে মিলে উপড় করল মেয়েটাকে।

লাশের পিঠের ওপর বার বার আঙুল বোলাচ্ছে আইজলি। গাঢ় রঙের কতগুলো দাগ বসে গেছে সেখানে। ‘এসব দাগ কেন তৈরি হয়েছে, জানেন? মেয়েটা যাতে পানিতে ডুবে না যায় সেজন্য তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সে-কারণে। মেয়েটার মৃত্যুর পর যে তৈরি হয়েছে দাগগুলো, সন্দেহ নেই সে-ব্যাপারে। এসব দাগ বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে, মেয়েটার পরনে মোটা একটা কোট থাকার পরও,’ মাথা ঝাঁকিয়ে ওই মেয়ের কাপড় দেখিয়ে দিল সে। স্টেইনলেস স্টিলের একটা কাউন্টারের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওসব।

অরাজকতা

সেদিকে এগিয়ে গেল ন্যাশ। তুলল লালা রঙের কোটটা। পকেট হাতড়াচ্ছে।
'মেয়েটার কাপড় থেকে তাকে শনাক্ত করার জন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না,
খোঁজ করে দেখেছিলে?'

'ওসব কাপড় এই মেয়ের না, তা-ই না?' যতটা না একটা প্রশ্ন, তার চেয়ে
বেশি একটা তথ্য হিসেবে কথাটা বলল আইজলি।

তার দিকে ঘুরল পোর্টার। 'সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছ এই ব্যাপারে?'

'আমারও সন্দেহ হয়েছিল সে-রকমই। তবে এ-রকম বলবো না, আমি
কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি। প্রতিটা কাপড় দেখে মনে হয়েছে,
মেয়েটার গায়ে যেন টাইট ফিটিং হয়েছে। সাধারণ কোনো অবস্থা যদি হতো, তা
হলে ধরে নিতাম, পানিতে ডুবে থাকার কারণে হয়েছে ও-রকম। কিন্তু কথা হচ্ছে,
পানিতে যে অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে হয়েছে মেয়েটাকে, তা না। আর তাই
ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে আমার। তার অন্তর্বাস আর জিন্স দেখে মনে হয়েছে,
ওসব অন্তত এক কি দুই সাইজ ছোট। মেয়েটাকে যেন জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া
হয়েছিল ওসবের ভেতরে। যা হোক, মূল কথা হচ্ছে, তার পরনে যে-কাপড় পাওয়া
গেছে, সেটা টাইট ছিল। অস্বস্তিকর ছিল। হ্যাটটা একটু দেখুন,' ইশারায় ওই
কাউন্টার দেখিয়ে দিল আইজলি। 'ট্যাগে কয়েকটা অক্ষর লেখা আছে। দেখলে
মনে হয়, কারও নামের আদ্যক্ষর।'

কোট নামিয়ে রাখল ন্যাশ। হাতে তুলে নিল সাদা হ্যাটটা। ভেতরের দিকটা
ওল্টাল। 'এল.ডি.। ফিকে হয়ে গেছে লেখাটা। কিন্তু পড়া যায়।'

'লিলি ডেভিস,' বলল পোর্টার।

'হ্যাঁ, সম্ভবত।'

'কে ওই মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল আইজলি।

'আরেকটা মেয়ে,' বলল পোর্টার। 'গতকাল কোনো এক সময়ে হারিয়ে
গেছে।'

'তার মানে হচ্ছে, এই মেয়েকে যে-ই খুন করে থাকুক না কেন, অন্য সেই
মেয়ের কাপড় পরিয়ে দিয়েছে একে?'

'দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

'হাহ্।'

পোর্টার জানতে চাইল, 'মৃত্যুর কারণ কিছু জানা গেল? লাশের শরীরর দেখে
কিন্তু বিশেষ কোনো কিছু মনে হচ্ছে না আমার। কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই।
মেয়েটাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, এ-রকম কোনো দাগ নেই।'

এই কথা শুনে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল আইজলির চেহারা। 'ও, হ্যাঁ। ব্যাপারটা
অদ্ভুত লাগবে আপনাদের।'

'কীভাবে মারা গেছে এই মেয়ে?'

'পানিতে ডুবে।'

জু কুঁচকে গেল ন্যাশের। ‘কথাটা শুনে তো তেমন একটা আশ্চর্য লাগছে না আমার। আমরা একটা লেকের জমাট বরফের নিচে খুঁজে পেয়েছি মেয়েটাকে।’

একটা হাত তুলল পোর্টার। ‘একটু আগে তুমি বললে, মেয়েটার পিঠে যেসব দাগ দেখা যাচ্ছে, সেগুলো নাকি তার মৃত্যুর পর তৈরি হয়েছে। তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ, খুনি যখন মেয়েটাকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়, তখনও বেঁচে ছিল বেচারী?’

‘না। সে-সময় নাগাদ মরে গিয়েছিল সে। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, মেয়েটা ডুবে মরেছে আগেই। তারপর তার লাশ নিয়ে গিয়ে লেকের পানিতে ডুবিয়েছে ওই লোক।’ আইজলির হাতের বাঁ দিকে একটা টেবিল আছে, সেটার ওপর রাখা আছে একটা মাইক্রোস্কোপ, সেদিকে এগিয়ে গেল সে। ‘এদিকে একটু দেখুন।’ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে যন্ত্রটা।

এগিয়ে গেল পোর্টার। চোখ রাখল আইপিসে। ‘কী দেখছি আমি, বলো তো?’

‘মেয়েটাকে যখন প্রথমবার নিয়ে আসা হলো আমার এখানে, সাপ যেভাবে ঐকেবঁকে চলে সে-কায়দায় একটা নল ঢুকিয়ে দিতে পারলাম আমি তার ফুসফুসে। পানিতে ভরে গিয়েছিল ফুসফুস দুটো, বের করে আনলাম সে-পানি। আপনি এখন ওই পানিই দেখতে পাচ্ছেন।’

এবার জু কোঁচকানোর পালা পোর্টারের। ‘পানির এই নমুনায় ফুটকি ফুটকি এসব কী ভেসে বেড়াচ্ছে?’

আইজলির মুখের একটা কোনা কুঁচকে গেল। ‘ওটা, বন্ধু আমার, লবণ।’

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, মারা যাওয়ার আগে লবণাক্ত পানিতে ডুবে গিয়েছিল এই মেয়ে?’

‘অবশ্যই।’

ন্যাশের চেহারা দেখে একবার মনে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে, পরেরবার মনে হচ্ছে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যেন। ‘আমরা আছি শিকাগোতে... এখান থেকে সবচেয়ে কাছে সাগরটাও কত দূরে হবে? এক হাজার মাইল?’

‘আমাদের এখান থেকে সবচেয়ে কাছে আছে আটলান্টিক মহাসাগর,’ বলল আইজলি। ‘বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড। সাত শ’ মাইলের মতো।’

বেজে উঠল পোর্টারের মোবাইল ফোন। জবাব দেয়ার আগে স্ক্রিনটা একঝলক দেখে নিল সে। ‘হ্যাঁ, ক্লেয়ার, বলো।’

‘ফিরেছেন তা হলে? কম করে হলেও বারোবার ফোন করেছি আপনাকে।’

‘কই, না তো, মাত্র তিনবার ফোন করেছি।’

‘ও, আপনার ফোন তা হলে কাজ করছে,’ বলল ক্লেয়ার। ‘একজন মেয়েমানুষকে কিন্তু কখনোই উপেক্ষা করা উচিত না আপনার, স্যাম। সে-কাজের ফল ভালো হয় না।’

চোখ উল্টানোর ভঙ্গি করল পোর্টার, ধীর পায়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতরে। ‘মর্গে আছি আমরা, আইজলির সঙ্গে। সে নিশ্চিত করেছে, লেক থেকে

যে-মেয়ের লাশ পেয়েছি আমরা, সে-মেয়ে এলা রেনল্ডস। লাশটা দেখে আমাদের আরও যা মনে হচ্ছে তা হলো, এলা রেনল্ডসের গায়ে লিলি ডেভিসের কাপড় ছিল।’

‘লিলি ডেভিস কে?’

পোর্টারের একবার মনে হলো, লিলির ব্যাপারটা ক্লেয়ারকে বলেছিল সে। কিন্তু সহসা ঠাহর করতে পারল, বলেনি আসলে। পার্ক থেকে চলে আসার পর ক্লেয়ারের সঙ্গে আর কথা হয়নি ওর। বুঝতে পারল, ঘুম দরকার। কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে মাথার ভেতরটা। মনে হচ্ছে, কেউ যেন কুয়াশার একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে সেখানে। ‘ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের অফিসে দেখা করতে পারবে আমার আর ন্যাশের সঙ্গে? কাজের গতি বাড়ানো দরকার আমাদের সবার।’

‘অবশ্যই পারবো,’ বলল ক্লেয়ার। ‘আপনাকে কেন ফোন করছিলাম বার বার, জানতে চাইবেন না?’

চোখ বুজে ফেলল পোর্টার। চুলে আঙুল চালাল। ‘আমাকে কেন ফোন করছিলে, ক্লেয়ার?’

‘পার্কের ভিডিয়োতে কিছু একটা দেখতে পেয়েছি আমি।’

‘ত্রিশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে যাও জায়গামতো। কথা হবে তখন। ক্লোজকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো।’



‘এক গ্লাস দুধ খাবে নাকি?’

লোকটাকে দেখার আগে তার কণ্ঠ শুনতে পেল লিলি ডেভিস। বলা ভালো, লোকটাকে সত্যি সত্যি দেখার আগে।

এই লোক ধীরে ধীরে কথা বলে। কোমল কণ্ঠে কথা বলে। শুনলে মনে হয়, শ্বাস ছাড়ছে যেন। মনে হয়, সর্বোচ্চ যত্ন নিয়ে উচ্চারণ করছে প্রতিটা শব্দ। যা বলতে চায়, সে-শব্দগুলো মুখ দিয়ে ছেড়ে দেয়ার আগে সে যেন চিন্তাভাবনা করছে অনেক, তারপর বলছে। তার সেই উচ্চারণ কিছুটা আধো আধো। যেমন গ্লাস (glass) বলার সময় “এস”-টা একটু কষ্ট দিয়েছে তাকে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছে সে মিনিট পাঁচেক আগে। কাঠের তক্তা তার ওজনের ভারে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলেছিল। কিন্তু যখন হাজির হয়েছিল সিঁড়ির তলদেশে, যখন দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, নড়ছিল না একটুও। গাঢ় কিছু ছায়া যেন গ্রাস করে নিয়েছিল তাকে। লিলি কিছুই ঠাহর করতে পারেনি ওই লোকের ব্যাপারে। শুধু ঠাহর করতে পেরেছিল, একজন পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে।

হ্যাঁ, ওই লোক সত্যিই একজন পুরুষমানুষ, কোনো ছোকরা না।

তার দাঁড়িয়ে থাকার সেই ভঙ্গির মধ্যে কিছু একটা আছে। দুই কাঁধ চওড়া। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর। এসব ব্যাপার লিলিকে জানিয়ে দিয়েছে, ওই লোক একজন পুরুষমানুষ, স্কুলপড়ুয়া কোনো ছেলে না। লিলির পরিচিত এমন কেউ না, যে কিনা ওই মেয়ের সঙ্গে অসুস্থ কোনো রসিকতা করছে। সে-লোক এমন একজন পুরুষমানুষ, যে তুলে নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে।

হ্যাঁ, দুধ খেতে চায় লিলি।

ওর মনে হচ্ছে, গলাটা শুকিয়ে গেছে বালির মতো।

খিদেও লেগেছে।

পাকস্থলী থেকে কেমন অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। কতখানি ক্ষুধা যে লেগেছে, জানিয়ে দিচ্ছে ওটা।

তারপরও কিছু বলল না মেয়েটা। উচ্চারণ করল না একটা কোনো শব্দ। বরং যে-কোনায় ছিল, আরও খানিকটা গাদাগাদি করে সেখানে ঢুকে গেল। সঁাতসেঁতে দেয়ালে চাপ সৃষ্টি করেছে ওর পিঠ। সবুজ একটা লেপ জড়ানো আছে ওর শরীরে, গন্ধ আসছে ওটা থেকে, শরীরের সঙ্গে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওটা। নিরাপত্তার একটা অনুভূতি ঘিরে ধরল ওকে। মনে হলো, ওর মায়ের বাহুবন্ধনে আছে যেন।

লোকটা কোথায় যেন গিয়েছিল। ঘন্টাখানেক পর ফিরে এসেছে। সময়টা আরও বেশিও হতে পারে। এ-সময়টা কাজে লাগিয়েছে লিলি। ভেবে ভেবে বের করার চেষ্টা করেছে, কোথায় আছে সে। ভয় পেতে দেয়নি নিজেকে, ভয় পাওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন দিতে পারে না নিজেকে। আসলে সে একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। এবং সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে ওর দক্ষতা ভালো।

পুরনো একটা বাসার বেসমেন্টে আছে মেয়েটা।

কথাটা জানে, কারণ ওদের নিজেদের বাসা পুরনো। সে-বাসার বেসমেন্ট সংস্কার করার জন্য ঠিকাদার এবং নির্মাণকাজের মিস্ত্রিদের নিয়ে এসেছিলেন ওর বাবা-মা। তবে তার আগেই ওই জায়গা দেখে নিয়েছিল সে। এখানকার ছাদ নিচু। মেঝে অসমতল। সবজায়গায় কেমন ছাতলাপড়া গন্ধ। এখানে-সেখানে মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি। মেয়েটার বাবা-মা যখন তাঁদের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকাদারদের, তারা খুঁড়ে খুঁড়ে বলতে গেলে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলেছিল বেসমেন্টের। মেঝে সমতল করে দিয়েছিল। নতুন আস্তরণ লাগিয়ে দিয়েছিল দেয়ালে। টাটকা রঙে ঢেকে দিয়েছিল সেখানকার সবকিছু। ফলে বিদায় নিয়েছিল মাকড়সার দল... অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও।

লিলির বন্ধু গ্যাবি থাকে আনকোরা নতুন একটা বাড়িতে। মাত্র দু'বছর আগে বানানো হয়েছে ওই বাড়ি। সে-বাড়ির বেসমেন্ট আবার সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানকার ছাদ উঁচু। মেঝে সমতল। বেসমেন্টটা উজ্জ্বল। আলোবাতাসে ভরপুর। সেখানে গ্যাবির কাপেট বিছিয়েছে। আসবাব কিনে এনে রেখেছে। পুরো বেসমেন্টকে বদল করে একটা মজার ফ্যামিলি রুমে পরিণত করেছে। কিন্তু কোনো পুরনো বাসার বেসমেন্টকে ও-রকম কোনো রুমে পরিবর্তিত করা সম্ভব না, মেরামতির কাজ যতই করা হোক না কেন। পুরনো কোনো বাড়ির বেসমেন্টের আর্দ্রতা হয়তো ঢেকে দেয়া সম্ভব। মেঝে সমতল করে নেয়া সম্ভব। রঙও করে নেয়া যায় ইচ্ছামতো। কিন্তু মাকড়সার দল কী করে যেন ফিরে আসে বার বার। এগুলো তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না কিছুতেই।

এই বেসমেন্টেও মাকড়সা আছে। প্রচুর।

লিলি যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে অবশ্য কোনো মাকড়সা দেখতে পাচ্ছে না। তবে জানে, ওগুলো ঠিক ওর মাথার ওপরই আছে। মেঝের কড়িকাঠের ফাঁকফোকর দিয়ে গুড়ি মেরে আসা-যাওয়া করছে। নিজেদের হাজারটা চোখ দিয়ে নজর রেখে চলেছে ওই মেয়ের ওপর। সেইসঙ্গে জাল বুনেছে।

ওই লোক লিলিকে কিছু কাপড় দিয়েছে। কিন্তু সেসব কাপড় মেয়েটার না।

যখন জেগে উঠেছিল মেয়েটা, টের পায়, সবুজ একটা লেপ জড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওর শরীরে। চট করে ঠাহর করতে পারে, ওর সারা শরীর থেকে সব কাপড় খুলে ফেলা হয়েছে। তারপর ওকে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে... এই খাঁচায়। কোনো একজন অচেনা মানুষের কিছু কাপড় সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে

ওর মাথার কাছে। ওগুলো ঠিকমতো গায়ে লাগেনি মেয়েটার। ওসব কাপড় ওর তুলনায় কম করে হলেও দুই সাইজ বড়। তারপরও ওগুলো পরে নিয়েছে সে। কারণ আর কিছু ছিল না। কারণ সবুজ এই লেপের তুলনায় ওসব কাপড় ভালো। যা হোক, নিজেকে লজ্জাহীনতা থেকে বাঁচিয়ে সবুজ লেপটা আবারও জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে।

একটা সঁাতসেঁতে বেসমেন্টে আছে সে। আলো আছে এখানে, তবে সেটা অনুজ্জ্বল। আরও নির্দিষ্টভাবে যদি বলা হয়, চেইনলিঙ্কের একটা ঘেরের ভেতরে আছে মেয়েটা। সেই ঘের বা খাঁচা স্থাপন করা হয়েছে অনুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, সঁাতসেঁতে একটা বেসমেন্টে।

বিশেষ সেই খাঁচা উঠে গেছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। এটার প্রতিটা টুকরো ঝালাই করে জোড়া দেয়া হয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে। আসলে এই জিনিস বানানো হয়েছিল কুকুর রাখার উদ্দেশ্যে। এই কথা লিলি জানে, কারণ গ্যাবিদের পরিবারে একটা কুকুর আছে। জাতে হাফি। নাম ডাকোটা। এই যে খাঁচা, হুবহু এটার মতো না হলেও, এটার মতো দেখতে একটা কুকুরের-ঘরও আছে গ্যাবিদের বাসার পেছনদিকের উঠানে। হোম ডিপো থেকে ওই খাঁচা কিনেছিল গ্যাবিরা। লিলি আর গ্যাবি দেখেছে, গ্যাবির বাবা নিজের হাতে জোড়া দিয়েছেন খাঁচাটা। কাজটা করতে যে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল তাঁর, তা না, বড়জোর ঘণ্টাখানেক; কিন্তু কথা হচ্ছে, ঝালাই করেননি তিনি।

উঠে দাঁড়াল লিলি। নিজেকে জড়িয়ে নিল সবুজ সেই লেপ দিয়ে। এগিয়ে গিয়ে আঙুল চালান খাঁচার হরেক রকম পাইপ আর পুরু ধাতুর তারের গায়ে... যেসব জিনিস দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই খাঁচা। কোথায় কোথায় জয়েন্ট আছে, বের করার চেষ্টা করছে। সেইসঙ্গে মনে করার চেষ্টা করছে, জোড়া দেয়ার কাজটা কীভাবে সেরেছিলেন গ্যাবির বাবা। কিন্তু আঙুলের নিচে যখন ঝালাইয়ের উঁচু-নিচু জায়গাগুলো খুঁজে পেল মেয়েটা, রীতিমতো চুপসে গেল ওর হৃৎপিণ্ড। খাঁচার সামনের দিকে একটা দরজা আছে। তালা দেয়া আছে সেখানে। তা-ও আবার একটা না, দুটো প্যাডলক। একটা ঝুলছে উঁচুতে। অন্যটা নিচের দিকে, মেঝের কাছাকাছি। দরজাটা ধরে ঝাঁকাল মেয়েটা। বলা ভালো, ঝাঁকানোর চেষ্টা করল, কারণ বলতে-গেলে নাড়াতেই পারেনি ওই দরজা। পুরো খাঁচা নাট-বল্টুর সাহায্যে যেন গেঁথে দেয়া হয়েছে বেসমেন্টের কঙ্কিট মেঝেতে। এখান থেকে পালানোর সব পথ বন্ধ। এবং ওই মেয়ে যেন আটকা পড়ে গেছে কোনো একটা ফাঁদের ভেতরে।

‘কিছু একটা পান করা উচিত তোমার,’ বলল লোকটা। ‘সামনে যা ঘটতে চলেছে, সেটার জন্য গায়ে শক্তি রাখতে হবে।’

লিলি কিছু বলল না। কিছু বলবে না। ওই লোকের সঙ্গে কথা বলার মানে হচ্ছে তাকে শক্তি জোগানো। এবং সে-রকম কোনো কাজ করার জন্য প্রস্তুত না মেয়েটা। ওর কাছ থেকে কোনোকিছু পাওয়ার কথা না লোকটার।

সিঁড়ির উঁচুতে, শেষমাথায়, একটা দরজা আছে এবং সেটা সম্ভবত গোলাঃ আলো বলতে যা-কিছু আছে বেসমেন্টে এখন, তা ওই জায়গা দিয়েই আসছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, একটুও নড়ছে না।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুঝছে লিলির চোখ দুটো। মানিয়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে।

এখনও ফোকাসের বাইরেই রয়ে গেছে লোকটা। অন্য আরও কিছু ছায়ার মধ্যে তুলনামূলক গাঢ় একটা ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের দেয়াল একটা ছায়ামূর্তি গড়ে দিয়েছে তার।

‘ঘোরো। দেয়ালের দিকে মুখ করো। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না বলি, ততক্ষণ মুখ ঘোরাবে না আমার দিকে,’ আদেশ জারি করল লোকটা।

একচুল নড়ল না লিলি। কেমন শক্ত হয়ে গেছে ওর অঙ্গভঙ্গি।

‘প্লিজ ঘোরো,’ এবার আরও কোমল গলায় বলল লোকটা। মিনতি করছে যেন।

লেপ আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। নিজের ছোটখাটো শরীরের সঙ্গে আরও শক্ত করে জড়িয়ে নিল ওটা।

‘ঘোরো বলছি!’ এবার চিৎকার করে উঠল ওই লোক। বন্ধ বেসমেন্টে গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ, দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

টোক গিলল লিলি, খাবি খেল যেন। এককদম পেছনে সরল। দেখে মনে হলো, হেঁচট খেয়েছে।

সবকিছু আগের মতো চুপচাপ হয়ে গেল আবার।

‘প্লিজ, আমাকে চিৎকার করতে বাধ্য করো না। আমি চেষ্টাতে পছন্দ করি না।’

লিলি টের পেল, দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করেছে ওর হৃৎপিণ্ড। বুকের ভেতরে ভারী একটা ধুকপুক টের পাচ্ছে।

আরও এককদম পেছনে সরল সে। তারপর আর এক পা। এরপর আরও এককদম। খাঁচার পেছনদিকে, দেয়ালের কাছে পৌঁছে ঘুরল। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল।

শুনতে পেল, হেঁটে এগিয়ে আসছে লোকটা। ওই লোক জলজ্যান্ত কোনো একটা ছায়া যেন। তার হাঁটাচলার মধ্যে অন্যরকম কিছু একটা আছে। শুনে লিলির মনে হলো, প্রথমে একটা পা ফেলার আওয়াজ পেল। তারপর দ্বিতীয় পা-টা ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে আসা হলো কঙ্কিটের মেঝের ওপর দিয়ে। পরবর্তী পদক্ষেপে আবারও করা হলো একই কাজ। ওই লোক মনে হয় হাঁটার সময় লেংচায়। অথবা খোঁড়া। আবার এমনও হতে পারে, একটা পা একটু টেনে টেনে হাঁটতে হয় তাকে। নিশ্চিত হতে পারল না মেয়েটা।

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে চোখ বুজে ফেলল সে। কাজটা করতে চায়নি। কিন্তু যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, করল ওই কাজ। করল, কারণ আশপাশে

শব্দ বলতে যা-কিছু আছে, মনোযোগ দিতে পারবে সেসবের ওপর। পেছন থেকে যেসব আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, সেসবের একটা ছবি ঐকে নিতে পারবে নিজের মনের পর্দায়।

চাবির ঝনঝনানি শুনতে পেল মেয়েটা। তারপর শুনল, ক্লিক শব্দ তুলে খুলে গেল একটা প্যাডলক। শুনে মনে হলো, ওপরের তালাটা খোলা হয়েছে। এক মুহূর্ত পর খোলা হলো দ্বিতীয়টা। শুনল, তালা দুটো সরিয়ে নিল ওই লোক দরজা থেকে। তারপর হাতল তুলে দরজা খুলে দিল।

কী ঘটতে চলেছে, অনুমান করে নিয়ে আশঙ্কায় কঁকড়ে গেল লিলি।

আশা করেছিল, নিজের শরীরের কোনো জায়গায় ওই লোকের হাতের স্পর্শ পাবে। অথবা লোকটা হয়তো পেছন থেকে জাপ্টে ধরবে ওকে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। তার বদলে শুনতে পেল, লোকটা দরজা লাগিয়ে দিল, তারপর দুটো তালাই আটকে দিল আগের জায়গায়।

কাজ শেষে অদ্ভুত সেই পদক্ষেপে সরে গেল খাঁচা থেকে দূরে।

‘এবার তুমি আমার দিকে ঘুরতে পারো।’

যেমনটা বলা হয়েছে, করল লিলি।

সিঁড়ির গোড়ায় আবারও ফিরে গেছে লোকটা। প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে গাঢ় সেই ছায়ায়।

খাঁচার ভেতরে, দরজার কাছেই, মেঝেতে রাখা হয়েছে এক গ্লাস দুধ। পুঁতির মতো একটুখানি পানি নামছে গ্লাসের একপাশ বেয়ে।

‘ড্রাগ মেশানো হয়নি ওই দুধে,’ বলল লোকটা। ‘তোমাকে জাগিয়ে রাখা দরকার আমার।’

‘তোমার সঙ্গে অফিসে দেখা হবে,’ বলল ন্যাশ। ‘আগে একটু বাথরুমে যাওয়া দরকার আমার।’ এলিভেটরে সওয়ার হয়ে মিশিগান অ্যাভিনিউ’র শিকাগো মেট্রো হেডকোয়ার্টার্সের বেসমেন্টে হাজির হয়েছে ওরা। হলওয়ায়ে ধরে এগিয়ে গেল সে, মোড় নিল ডানদিকে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বাথরুমের দরজার আড়ালে। পোর্টার গেল বাঁ দিকে।

বিশপ পালিয়ে যাওয়ার পর এফবিআই হাজির হয়েছে; ফোর মাস্কি কিলারকে ধরার নামে যে-মানুষশিকার চলছে, সে-দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজেদের কাঁধে। সে-সময় চিকিৎসা-ছুটিতে ছিল পোর্টার। তবে ন্যাশ ওকে যা বলেছে, যে-ঘরটা নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করত পোর্টাররা, সেটা প্রথমেই দখল করার চেষ্টা করেছিল এফবিআই-এর লোকেরা। ন্যাশ তখন নিজস্ব কিছু কৌশল প্রয়োগ করে। এমনকী মারামারি করার হুমকিও দেয়। এবং শেষপর্যন্ত ওই লোকগুলোকে হলের আরেক প্রান্তে অবস্থিত একটা রুমে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অদ্ভুত একটা গন্ধের কারণে ওই ঘর বিশেষভাবে পরিচিত। এই ঘটনার পর থেকে দুটো দল পাশাপাশি অবস্থান করছে ঠিকই, তবে কাজটা করছে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শিষ্টাচার বজায় রেখে।

এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, এফবিআই-এর সেই রুমে কোনো লাইট জ্বলছে না।

বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে ন্যাশ, সেখানকার দরজাটা লক করে দিল সে ভেতর থেকে, এই শব্দ শোনার অপেক্ষায় এতক্ষণ কান পেতে ছিল পোর্টার। চটজলদি এগিয়ে গেল এফবিআই-এর রুমের উদ্দেশে। দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল।

দরজাটা খোলা।

চট করে হলের এদিকে-সেদিকে নজর বুলিয়ে নিল পোর্টার, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। লাইট জ্বালাল না।

ছ’টা অক্ষিগোলক।

শিকারের সংখ্যা সাত। এমোরিকে-সহ যদি গণনা করে, তা হলে আট।

পোর্টারের অবচেতন মন কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে ওকে।

রুমের সামনের দিকে দুটো হোয়াইটবোর্ড আছে। সেদিকে এগিয়ে গেল সে। ফোর মাস্কি কিলারের শিকারদের বেশকিছু ফটোগ্রাফ ঝুলছে ওই বোর্ড দুটোতে, সেগুলো দেখতে লাগল। পরিচিত চেহারাগুলো দেখলে মনে হয়, সেসব চেহারার মানুষগুলো যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকেই। কোনো একটা খুশির মুহূর্তে অচেনা একটুখানি হাসি দেখা দিয়েছিল এসব মেয়ের চেহারায়, সে-হাসিকে ক্যামেরার সাহায্যে যেন আটকে ফেলা হয়েছে অনন্তকালের জন্য।

অরাজকতা

মনে পড়ে যাচ্ছে আনসন বিশপের কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে, ৩১৪ পাশ্চিম বেলমন্টের একাদশ তলায় শেষবারের সেই দেখায় কী কী বলেছিল সে। আবেগঘন একটা আবেদন জানিয়েছিল পোর্টারের কাছে। নিজের হাতেধরা সব কার্ড যেন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল পোর্টারের জন্য। নিজের পরিকল্পনার সমর্থনে বিকৃত এক যুক্তি ছিল তার কাছে, জানিয়ে দিয়েছিল সেটা। ‘শাস্তি পাওনা এসব লোকের,’ বলেছিল সে পোর্টারকে। কথাটা কিন্তু একদিক দিয়ে সত্যি। যেসব লোককে নিজের নিশানা বানিয়ে নিয়েছিল বিশপ, তারা সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু অন্যায় করেছিল। সেসব কাজ আসলেই শাস্তির দাবি রাখে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওসব লোককে সরাসরি কোনো শাস্তি দেয়নি বিশপ। বরং তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাদের সম্মানদের। কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরেছে ওই মেয়েগুলোকে। কাজটা করেছে, যাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ওসব মেয়ের বাবা-মা সারাটা জীবনের জন্য কষ্ট পেতে থাকে। মেয়েগুলোর নিজেদের কোনো দোষ ছিল না, বরং তা ছিল তাদের পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের। অন্য কারও অপরাধের মূল্য চুকিয়ে গেছে সুন্দর চেহারার অধিকারিণী এই মেয়েরা।

প্রথম বোর্ডটার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াল পোর্টার। ক্যালি ট্রেমেলের ছবির ওপর আঙুল বোলাচ্ছে। এই মেয়ে ছিল বিশপের প্রথম শিকার। বয়স ২০। তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২০০৯ সালের ১৫ মার্চ। ফোর মাস্কি কিলার হিসেবে এটাই ছিল বিশপের প্রথম হত্যাকাণ্ড। তার খুন করার ধরন দেখলে বোঝা যায়, মানুষের প্রাণ আগেও হরণ করেছে সে... বছরের পর বছর ধরে চর্চা করে বিশেষ একটা পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে প্রকৃতপক্ষে।

বিশপের আগমন আসলে ঠিক কোথেকে, সে-ব্যাপারে আজও কোনো স্পষ্ট ধারণা পায়নি পোর্টার। একটা ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল, সেটা পড়ে ওই ব্যাপারে খানিকটা জানতে পেরেছে সে, কিন্তু সে-তথ্য যথেষ্ট না। বরং একটা ঝলক বলা যায়। পেছন ফিরে তাকালে পোর্টারের মনে হয়, কোনো একটা জানালার পর্দা সরানো ছিল যেন, সেখান দিয়ে চট করে বাইরে তাকিয়ে কিছু একটা দেখে ফেলেছে সে, কিন্তু তারপরই ওই পর্দা আবার জায়গামতো নামিয়ে দিয়ে গেছে বিশপ।

ক্যালি ট্রেমেলের বাবা-মা যেদিন পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেন নিখোঁজ হয়ে গেছে তাঁদের মেয়ে, সেদিন ছিল মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার তাঁদের কাছে ডাকযোগে হাজির হয়ে যায় মেয়েটার একটা কান। শনিবার চলে আসে ওই মেয়ের চোখ দুটো। পরের মঙ্গলবার আসে জিহ্বাটা। প্রতিবারই হাজির হয়েছিল একটা করে ছোট সাদা বাক্স। কালো দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল ওগুলো। কোন ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে বাক্সগুলো, তা লেখা ছিল হস্তাক্ষরে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলতে কিছুই পাওয়া যায়নি কখনও। বিশপ কখনও তার আঙুলের ছাপ রাখেনি কোথাও।

যা হোক, শেষ বাস্কেট আসার তিন দিন পর এক সকালে একজন জগার আমন্ড পার্কের একটা বেঞ্চে খুঁজে পায় ওই মেয়ের নিখর দেহটা। বিশেষ এক কায়দায় মেয়েটাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে। তার হাতের সঙ্গে আঠার সাহায্যে সঁটে দেয়া হয়েছিল একটা কার্ডবোর্ড। সেটাতে লেখা ছিল: খারাপ কোনো কাজ করবে না।

এল বর্টন, ফোর মাস্কি কিলারের দ্বিতীয় শিকার, নিখোঁজ হয়েছিল ২০১০ সালের ২ এপ্রিল। তার মানে, প্রথম শিকারের এক বছরেরও বেশি সময় পর। মিসিং চিলড্রেন থেকে ওই কেস আসে পোর্টারদের কাছে। মেয়েটার বাবা-মা জানান, তাঁরা ডাকযোগে একটা কাটা-কান পেয়েছেন। এক সপ্তাহের কিছু বেশি সময় পর আবিষ্কৃত হয় ওই মেয়ের মরদেহ। তখন দেখা যায়, মেয়েটার হাতে কায়দা করে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে তার দাদীর ট্যাক্স-রিটার্নের একটা কাগজ। ২০০৮ সালের কর-বছরের কাগজ ছিল ওটা। কিছুটা “খোঁড়াখুঁড়ির” পর জানা যায়, ওই মেয়ের দাদী মারা গেছেন ২০০৫ সালে। ফিন্যানশিয়াল ক্রাইমস-এ এক লোক আছে, নাম ম্যাট হসম্যান; সে জানতে পারে, এল বর্টনের বাবার তত্ত্বাবধানে একটা নার্সিং হোম আছে, সেখানকার ডজনখানেকেরও বেশি অধিবাসীর জন্য ট্যাক্স-রিটার্ন ফাইল তৈরি করছেন তিনি, অথচ ওই মানুষগুলো মারা গেছেন আরও আগেই। প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে তেইশ বছর বয়সী এল বর্টনকে মরতে হলো কেন? জবাব একটাই: ওই মেয়ের বাবা যা করছিলেন, তা পছন্দ হয়নি অ্যানসন বিশপের।

ফোর মাস্কি কিলারের মোটিভ যখন পরিষ্কার হয়ে যায়, পোর্টার আর ওর দল তখন পেছন ফিরে তাকায়। নজর দেয় ক্যালি ট্রেমেলের পরিবারের ওপর। জানতে পারে, ওই মেয়ের মা মানি লন্ডারিং করছেন। তা-ও আবার কোথেকে... যে-ব্যাংকে তিনি কাজ করতেন, সেখান থেকেই। গত দশ বছরে ওই কায়দায় ত্রিশ লক্ষ ডলার এদিক-সেদিক করেছিলেন মহিলা।

ডানদিকে একটুখানি সরল পোর্টার। নজর দিল ফোর মাস্কি কিলারের তৃতীয় শিকারের ওপর। মিসি লুম্যাক্স। অপহরণ করা হয়েছিল ২০১১ সালের ২৪ জুন। এই মেয়ের বাবা জড়িত ছিলেন পর্নোগ্রাফি ব্যবসার সঙ্গে। তা-ও আবার কী... বাচ্চাদের দিয়ে যেসব পর্নোগ্রাফি নির্মাণ করা হয়, সেসবের সঙ্গে।

সুজ্যান ডেভোরোর... মাস্কি কিলারের চতুর্থ শিকার... বাবার ছিল একটা গহনার-দোকান। সেখানে আসল হীরার বদলে নকল জিনিস গছিয়ে দিতেন তিনি খদ্দেরদের কাছে। এই মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২০১২ সালের ৩ মে।

পঞ্চম শিকারের নাম বারবারা ম্যাকিনলে। বয়স সতেরো। হারিয়ে গিয়েছিল ২০১৩ সালের ১৮ এপ্রিল। এ-ঘটনার ছ'বছর আগে ওই মেয়ের বোন গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল এক পথচারীকে। শাস্তি হিসেবে বারবারাকে শেষ করে দেয় বিশপ।

অ্যালিসন ক্র্যামারের ভাইয়ের ছিল একটা কারখানা, ফ্লোরিডায়। সেখানে করুণ এক পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কম বেতনে কাজ করানো হতো শ্রমিকদের। এদের বেশিরভাগই আবার অবৈধ। ভাইয়ের দুষ্কর্মের মূল্য চুকাতে হয় বোনকে, মাক্সি কিলারের ষষ্ঠ শিকারে পরিণত হয় সে, তবে তার আগে গায়েব হয়ে যায় ২০১৩ সালের ৯ নভেম্বর। সে-সময় মেয়েটার বয়স মাত্র উনিশ।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাস পর আবারও ছোবল দেয় মাক্সি কিলার... এবার জোডি ব্রুমিংটনের ওপর। ২০১৪ সালের ১৩ মে গায়েব হয়ে যায় মেয়েটা, বাইশ বছর বয়সে। এই মেয়ের বাবা একটা চক্রের হয়ে কোকেন আমদানি করত।

শেষ যে-ছবি দেখা যাচ্ছে বোর্ডের গায়ে, সে-মেয়েকে ভালোমতোই চেনে পোর্টার। একমাত্র ওই মেয়ের সঙ্গেই সরাসরি দেখা হয়েছিল ওর। এবং একমাত্র ওই মেয়েই মাক্সি কিলারের অপহরণের শিকার হওয়ার পরও খুন হয়নি। এমোরি কনার্স। বয়স পনেরো। গত বছরের নভেম্বর মাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মেয়েটাকে। ওর একটা কান কেটে নেয়া হয়েছিল। টানা কয়েকটা দিন বন্দি অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হয়েছিল বেচারী। তারপরও বিশপ হত্যা করেনি মেয়েটাকে। হয়তো করত, যদি না পোর্টার জেনে যেত বিশপের আসল পরিচয়। একটা কথা ভালোমতোই জানা ছিল পোর্টারের... মেয়েটাকে শেষপর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে বিশপ। আসলে বিশপই চেয়েছিল, তাকে খুঁজে বের করে ফেলুক পোর্টার। সে আসলে নিজেকে ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ খুঁজছিল। ব্যাখ্যা করতে চাইছিল তার উদ্দেশ্য। একটা ঘোষণাপত্র দিতে চাইছিল প্রকৃতপক্ষে। বিশেষ সেই কাজ যেইমাত্র শেষ করল, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিল আর্থার ট্যালবটকে। তারপর গায়েব হয়ে গেল নিজে।

এমোরির কেসটা নিয়ে যখন কাজ করছিল পোর্টাররা, তখন একপর্যায়ে জানা যায়, আর্থার ট্যালবট ওই মেয়ের বাবা। জঘন্য একজন অপরাধী ছিলেন লোকটা। বিশপ এমোরিকে কিডন্যাপ করেছিল ঠিকই, কিন্তু ট্যালবটকেও শাস্তি দিতে ছাড়েনি... এবং শেষপর্যন্ত লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় একটা এলিভেটর শ্যাফটের ভেতরে। খুন করে ওই লোককে, ছেড়ে দেয় এমোরিকে।

বাবার অকাল মৃত্যুতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি পেয়ে যায় এমোরি উত্তরাধিকারসূত্রে। ওই মেয়ের মা সে-রকমই একটা শর্ত দিয়ে গিয়েছিলেন আজ থেকে অনেক বছর আগে।

যা হোক, মোদা কথা হচ্ছে, এমোরি বেঁচে গেল, আর বিশপ পালিয়ে গেল।
ছ'টা অক্ষিগোলক।

ফোর মাক্সি কিলারের শিকারদের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে পোর্টার।
খুন হয়েছে সাতজন। একটা মেয়ে বেঁচে গেছে।

ফোর মাক্সি কিলারকে ধরতে যে-টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল, সে-দলের নেতৃত্বে ছিল পোর্টার; সেখানে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছিল অ্যানসন বিশপ। গত

বছরের নভেম্বর মাসে একজন ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেটরের বেশ ধরে হাজির হয়েছিল সে। তখন এমোরিকে খুঁজছিল পোর্টাররা। বিশপকে সে-সময় পুরো কেসের সবকিছুর ব্যাপারে হালনাগাদ তথ্য জানিয়ে দেয়া হয়। ফোর মাস্কি কিলারের আগের সব শিকারকে নিয়ে খুঁটিনাটি অনেককিছু আলোচনা করা হয় ওর সঙ্গে। মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় অভিনয় করে লোকটা সে-সময়। পোর্টাররা যা-যা জানত, সব যেন নিজের ভেতরে গুঁষে নেয় সে। এমন একটা ভান করে, ওসব তথ্য তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

পোর্টার প্রায়ই পেছন ফিরে তাকিয়ে ওই মুহূর্তগুলো দেখে। এমন কিছু একটার খোঁজ করে, যার মাধ্যমে জানা যেতে পারে বিশপের আসল পরিচয়। কিন্তু সে-রকম কোনোকিছুর সন্ধান পায়নি আজও। কোনো সন্দেহ নেই, এই বোর্ডের দিকে যখন তাকিয়েছে বিশপ, তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য সন্তুষ্টির একটা অনুভূতি কাজ করেছে তার ভেতরে। অথচ সে-সময় এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল চেহারা, যেন নিদারুণ এক আতঙ্ক ঘিরে ধরেছিল ওকে। একইসঙ্গে দেখিয়েছিল প্রচণ্ড এক কৌতূহল। সবই তার অভিনয় আসলে। যখন কিছু বলেছিল, ঠিক প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করেছিল। যেসব তথ্য জোগান দিয়েছিল, সেসব অতিরঞ্জিত করা থেকে বিরত ছিল।

বেলমন্টে শেষ যে-বার দেখা হলো, তখন বিশপ যেন টগবগ করে ফুটছিল... যা-যা জানা ছিল তার, সেসব ভাগাভাগি করে নিতে চাইছিল পোর্টারের সঙ্গে। নিজেকে আসলে ব্যাখ্যা করতে চাইছিল সে। এই বোর্ড দুটোর সামনে যখন দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, যখন কান পেতে শুনছিল পোর্টার আর ওর দলের লোকেরা কী কী জানতে পেরেছে মাস্কি কিলারের প্রতিটা শিকারের ব্যাপারে, তখন বিশেষ সেই তাড়না সামাল দেয়াটা নিশ্চয়ই দুর্নিবার হয়ে পড়েছিল তার জন্য।

তবে একটা কথা সত্যি, বিশপ কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছিল। এবং সেসব যুক্তি থেকে জানা গেছে বিস্তারিত আরও অনেক তথ্য।

চোখ বুজে ফেলল পোর্টার। বিশপকে নিয়ে ভাবছে। বিশপের বলা কিছু কথা নিয়ে ভাবছে।

ইনফর্মেশন অ্যাকসেস বলতে যা বোঝায়, সে-রকম বিশেষ কিছু একটার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল বিশপ, মনে পড়ে গেল পোর্টারের। ওরা তখন খুঁজতে খুঁজতে জেনে গিয়েছিল, মাস্কি কিলারের শিকারে পরিণত হয়েছিল যারা, তাদের পরিবারের সদস্যরা যেসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল, সেসব তথ্য জানা ছিল কার। আর্থার ট্যালবটের। বিশপ শুধু ওই তথ্যগুলো চুরি করেছিল ট্যালবটের কাছ থেকে। পোর্টার এবং ওর দলের লোকেরা তখন বিশ্বাস করে নিয়েছিল, ফোর মাস্কি কিলার মরে গেছে। ওদের কাছে সে-সময় শুধু যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হচ্ছে, এমোরিকে খুঁজে বের করা।

তারপর একসময় অনেকটা যেন হঠাৎ করেই জানতে পারা যায় চুলের রঙে ব্যাপারটা।

বারবারা ম্যাকিনলের ছবির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কীভাবে তাকিয়ে ছিল বিশপ, মনে পড়ে যাচ্ছে পোর্টারের। ফোর মাস্কি কিলারের শিকারদের মধ্যে একমাত্র ওই মেয়ে ছিল স্বর্ণকেশী। পোর্টারের ভাষায়, ব্যতিক্রম। মাস্কি কিলারের বাকি শিকারদের সবারই ছিল আকর্ষণীয় কালচে বাদামি চুল... ও-রকম চুলের একটু দল ছিল তারা যেন। বিশপ সে-সময় জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছিল, যৌননিপীড়ন বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনোকিছু করা হয়েছে কি না কোনো মেয়ের সঙ্গে না, হয়নি। আরও জানতে চাইছিল, কোনো পুরুষ-শিকার আছে কি না ওই খুনির জিজ্ঞেস করেছিল, যেসব মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে মাস্কি কিলার, তাদের কারও কোনো ভাই আছে কি না। বলেছিল বিশেষ একটা কথা... “ওই খুনি যে ছেলেদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, কোনো না কোনো কারণ আছে সেটার। এবং সেটা জানা নেই আমাদের।” পোর্টারের বিশ্বাস, কারণটা আর কিছুই না... পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী কোনো মেয়েকে যতটা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, একই বয়সের কোনো ছেলেকে কজার মধ্যে রাখা তত সহজ না। ছেলেরা পাল্টা আঘাত করতে পারে।

ছ’টা অফিগোলক।

খুন হওয়া মেয়েদের সংখ্যা সাত।

বারবারা ম্যাকিনলের ছবির দিকে আবারও নজর ফেরাল পোর্টার। কেন শাস্তি দেয়া হয়েছিল এই মেয়েকে? কারণ তার বোন গাড়িচাপা দিয়ে মেরেছিল কোনো একজনকে। পোর্টার যখন ওর দলের সদস্যদের সঙ্গে মাস্কি কিলারের শিকারদের নিয়ে কথা বলছিল, একমাত্র ম্যাকিনলেকে নিয়েই কৌতূহলের কোনো শেষ ছিল না বিশপের। এখনও সেই দৃশ্য যেন ভাসছে পোর্টারের চোখের সামনে। আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে ম্যাকিনলের ছবিতে। দ্রুত গতিতে ঘুরছে মনের চাকাটা।

দরজার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিল পোর্টার। কান পাতল... হলওয়াতে কারও আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। না, সে-রকম কিছু শুনতে পেল না।

ওর হাতের বাঁ দিকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা টেবিল। সেখানে উঁচু হয়ে আছে ফাইল বক্সের একটা স্তুপ... ফোর মাস্কি কিলারের ব্যাপারে যেসব তথ্যউপাত্ত জোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল, সেসব। বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর বাক্সের গায়ে লাল মার্কারের সাহায্যে ইংরেজিতে লেখা আছে “ভিক্টিম” শব্দটা। ওই হাতের-লেখা পোর্টারের নিজের। সেদিকে এগিয়ে গেল সে। বাক্সের ঢাকনা সরাল। ভেতরের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। একসময় পেয়ে গেল বারবারা ম্যাকিনলের ফাইলটা। ফাইলের গায়ে সে নিজেই লিখেছিল ওই নাম।

এসব ফাইল একসময় ছিল ওর নিজের। একসময় ছিল ওর দলের। এসব ফাইলের ওপর একসময় কোনো অধিকার ছিল না এফবিআই-এর।

‘ধেং, নিকুচি করি!’

বিশেষ সেই ফাইল কোটের সাহায্যে জড়িয়ে নিল পোর্টার। ফাইল বক্সের ঢাকনা লাগিয়ে দিল জায়গামতো। এগিয়ে গেল দরজার উদ্দেশে। দরজাটা খুলে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিল হলওয়েটা এখনও খালি। তারপর চুপিসারে বেরিয়ে এল ওই রুম থেকে। দরজা লাগিয়ে দিল নিঃশব্দে।

দ্রুত পায়ে হাজির হয়ে গেল হলের শেষপ্রান্তে। এবার ঢুকে পড়ল নিজেদের অফিস-কামরায়। জ্বালিয়ে দিল মাথার ওপরের ফ্লুরোসেন্ট বাতিটা।

‘আমি কী ভাবছিলাম, জানেন? আমি ভাবছিলাম, আজ সকালে বোধহয় আসবেন না আপনি।’

কথাটা বলেছে এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট স্টুয়ার্ট ডিনার।

ন্যাশের ডেস্কে বসে আছে লোকটা, পা তুলে দিয়েছে ডেস্কের ওপর। এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল নিজের মোবাইলের ছোট স্ক্রিনের দিকে, এবার তাকিয়ে আছে পোর্টারের দিকে।

বড়সড় টাক পড়ে গেছে লোকটার মাথায়, যেটুকু চুল বাকি আছে তা দিয়ে সে-টাক ঢেকে রাখার চেষ্টা করে সে সবসময়; পোর্টার আশা করল, খোলা দরজা দিয়ে একটুখানি বাতাস ঢুকে পড়বে ভেতরে, এলোমেলো করে দেবে ওই লোকের চুল, বেরিয়ে পড়বে টাকটা।

কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো না পোর্টারের।



ডিনারের দিকে তাকিয়ে আছে পোর্টার। ‘একটা লাশ পেয়েছি আমরা। ওদিকে আরেকটা মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমি বলতে গেলে সারাটা রাতই জেগে ছিলাম। কী চান আপনি?’

এই লোক সারাটা রাত ধরে এখানেই বসে আছে নাকি?

‘খুব ভালো কাজ দেখিয়েছেন আপনারা, স্বীকার করতেই হবে আমাদের,’ ব্যঙ্গ করে পড়ল ডিনারের কণ্ঠে। ‘খুবই সফলতার সঙ্গে গোপন রাখতে পেরেছেন খবরটা।’ ভাঁজ-করা একটা শিকাগো ট্রিবিউন ছুঁড়ে দিল পোর্টারের ডেস্কে।

হেডলাইনের ওপর নজর বুলিয়ে নিল পোর্টার:

ফোর মাস্কি কিলার কি ফিরে এসেছে?
আমাদের মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে?

নিচে একটা ছবি ছাপা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এমোরি কনার্সকে। কোনো একটা ফুটপাথ ধরে হাঁটছে মেয়েটা। মাথা ঝুঁকে আছে। যেভাবে ভাঁজ করা হয়েছে পত্রিকাটা, তার ঠিক ওপরে আছে ওই খবর আর ছবি। প্রধান শিরোনাম। ভাঁজের নিচে দেখা যাচ্ছে আরও দুটো ছবি। টেলিফটো লেন্স কাজে লাগিয়ে তোলা হয়েছে জ্যাকসন পার্ক লেগুনের ঘটনাটার ছবি। অন্য ছবিটা ডেভিসদের বাসার।

উঠে দাঁড়াল ডিনার। এগিয়ে এসে দাঁড়াল পোর্টারের ডেস্কের ধারে। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে খবরের কাগজটা। ‘পত্রিকাওয়ালারা এমনকী মেয়ে দুটোর নামও ছেপে দিয়েছে। এলা রেনল্ডস আর লিলি ডেভিস।’

‘কীভাবে সম্ভব সেটা? আমরা কাউকে কোনোকিছু বলিনি এখন পর্যন্ত। মাত্র যেক ঘণ্টা আগে লিলি ডেভিসের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকান ডিনার। ‘আপনাদের দলে যেসব গোয়েন্দা আছে, তাদের কেউ না কেউ পেট-পাতলা স্বভাবের।’

‘যন্তোসব হাস্যকর কথাবার্তা,’ বিড়বিড় করে বলল পোর্টার। নজর বোলাচ্ছে খবরটার ওপর।

খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, জ্যাকসন পার্ক লেগুনে একটা লাশ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই লাশ খুব সম্ভব নিখোঁজ টিনএজার এলা রেনল্ডসের। রিপোর্টার আরও বলেছে, আরেকজন মেয়েরও কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার নাম লিলি ডেভিস। গতকাল স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়ার সময় শেষবার দেখা গিয়েছিল তাকে। কিন্তু মেয়েটা নাকি স্কুলে যায়নি। খবরের শেষাংশে জুড়ে

দেয়া হয়েছে ফোর মাস্কি কিলারের আগের শিকারদের বিস্তারিত বিবরণ। এবং একেবারে শেষে দাবি করা হয়েছে, আগেরবার যেনতেনভাবে পাকড়াও করার চেষ্টা করা হয়েছিল অ্যানসন বিশপকে, ফলে সাবধান হয়ে গেছে সে এবার, এবং বাধ্য হয়ে নিজের কার্যপদ্ধতি বদল করেছে।

‘ওই বিচি-টা এখানে কী করছে?’ দরজার কাছ থেকে শোনা গেল ন্যাশের খিস্তি।

পত্রিকাটা উঁচু করে দেখাল পোর্টার। ‘এই খবর দেয়ার জন্য এসেছেন।’

এগিয়ে এল ন্যাশ। ডিনার যে-চেয়ার ছেড়ে উঠেছে একটু আগে, নিজের কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলল সেখানে। আলগা কিছু একটা লেগে ছিল ওই লোকের কাঁধে, হাতের সাহায্যে ঝেড়ে সাফ করে দিল সেটা। ‘আপনার ক্যারিয়ার আরও কীভাবে বিকশিত হতে পারে, সে-ব্যাপারে যে চেষ্টাচরিত্র করছেন আপনি, দেখে ভালো লাগল। আপনি যদি ভালো ব্যবহার করেন আমাদের সঙ্গে, তা হলে আজ অফিস ছুটি হওয়ার পর এক কাজ করতে পারি আমরা। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ওয়ালমাৰ্টে। সুন্দর দেখে একটা বাইক কিনে দিতে পারি আপনাকে। তার ফলে কী হবে, জানেন? তার ফলে আপনার ঘুরে বেড়ানোর পরিধিটা আরও বড় হবে।’

ন্যাশের ডেস্কের ওপর ওই পত্রিকা রেখে দিল পোর্টার। লেগুন আর ডেভিসদের বাসার ছবিটা দেখিয়ে দিল ইঙ্গিতে। ‘এই কাজ বিশপের না। ডেভিস দম্পতিও যে যেচে পড়ে এমন একটা খবর জানিয়ে দেবেন পত্রিকাওয়ালাদের, মনে হয় না। আমার যা মনে হচ্ছে তা হলো, পত্রিকার লোকেরা শ্রেফ চাইছে, তাদের কাঁটতি বাড়ুক।’

ডিনার বলল, ‘আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে? এমনও তো হতে পারে, বিশপ নিজের কর্মপদ্ধতি বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসলেই... যেমনটা দাবি করা হয়েছে এই খবরে।’

‘সিরিয়াল কিলাররা নিজেদের কর্মপদ্ধতি বদল করে না, ভালোমতোই জানেন আপনি। এসব কাজে সিগনেচার বলতে যা বোঝায়, সেটা অবিকৃত থাকে সবসময়ই।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডিনার। ‘বিশপ সাধারণ কোনো সিরিয়াল কিলার না। যেসব হত্যাকাণ্ড সে ঘটিয়েছে, সেসবের প্রতিটা খুন আসলে কী, জানেন? বদলা নেয়ার কোনো একটা বিস্তারিত পরিকল্পনার অংশবিশেষ। এবং সে-পরিকল্পনার সমাপ্তি সে টেনেছিল আর্থার ট্যালবটকে খুন করার মাধ্যমে। এমনও হতে পারে, ওই লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার পর অবসর নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। তারপর একসময় ছুট করেই ঠাহর করতে পারে, যুবতী মেয়েদের প্রতি রুচি এখনও বাকি রয়ে গেছে তার ভেতরে। তাড়নাটা যখন আর কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না সে, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল এলা রেনল্ডসকে। শেষ করে দিল মেয়েটাকে। তারপর উঠিয়ে নিল লিলি ডেভিসকে।’

দরজার উদ্দেশে হাঁটা ধরল লোকটা। ‘যদি আমার কথা বুঝতে না পারেন, তা হলে একটা উপদেশ দেবো। এককদম পেছনে সরে যান। আরও একটু দূর থেকে দেখুন পুরো ঘটনা। সবকিছুর মানে তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে।’

নিজের কোটটা ডেস্কের ওপর রাখল পোর্টার। বারবারা ম্যাকিনলের ফাইল এখনও ঢাকা পড়ে আছে কোটের নিচে। ধুকপুক করছে ওর বুকের ভেতরে।

‘ওই লোক একটা বোকার হদ্দ,’ বলল ন্যাশ।

‘মন্তব্যটা কিন্তু শুনে ফেলেছি আমি,’ হলওয়ে থেকে শোনা গেল ডিনারের চিৎকার। ‘যদি ভুল হয়ে থাকে আপনাদের, যদি এই মেয়ে দুটো সত্যিই ফোর মাস্কি কিলারের শিকার হয়ে থাকে, তা হলে তাকে লাথি মেরে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে ভুল করবেন না যেন!’

‘ওই লোকের পার্টনার কিন্তু আবার কিছুটা ভালো... অন্তত ওই লোকের তুলনায়,’ বলল পোর্টার। ‘কী যেন নাম তার... স্টুল, ডুল, মিউল...?’

‘পুল। ফ্র্যাঙ্ক পুল। কীসের ভালো? সে-ও আরেক হাঁদারাম। তাদের সারাটা ঘর ভর্তি হয়ে আছে মাথামোটা সব লোক দিয়ে।’ কথা বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ন্যাশ, ওটা দড়াম করে লাগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্লেয়ার। হাতে একটা আইপ্যাড। ওর ঠিক পেছনেই আছে ক্রোজ, হাতে ল্যাপটপ।

কনফারেন্স টেবিলের পাশে একটা ডেস্ক আছে, ওটা সাধারণত ব্যবহার করে ক্রোজ। সেখানে গিয়ে বসে পড়ল সে।

উঠে দাঁড়াল পোর্টার, আর মাত্র একটা হোয়াইটবোর্ডে লেখা বাকি আছে, এগিয়ে গেল সেদিকে। বোর্ডের একেবারে ওপরের দিকে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লিখল: এলেন রেনল্ডস।

‘নামটা কিন্তু এলা রেনল্ডস,’ মনে করিয়ে দেয়ার কায়দায় বলল ন্যাশ।

ঘোং ঘোং করে উঠল পোর্টার। নামের প্রথম অংশটা মুছে ফেলল একহাতের উল্টো পিঠের সাহায্যে। সেখানে লিখল “এলা”। ‘ঠিক আছে। এবার বলো, আমরা কী কী জানি এখন পর্যন্ত?’

ক্লেয়ার বলল, ‘জানুয়ারি মাসের বাইশ তারিখে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়, কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না এলা রেনল্ডসের। গতকাল, মানে ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখে খুঁজে পাওয়া যায় মেয়েটাকে। জ্যাকসন পার্ক লেগুনের বরফের নিচ থেকে পাওয়া গেছে ওই মেয়ের লাশ।’

‘কিন্তু জমে যায়নি মেয়েটা,’ বাধা দিয়ে বলে উঠল ন্যাশ। ‘মানে... পুরোপুরি আর কী। আইজলি সেটাই বলেছে আমাদেরকে। ওদিকে লেগুনের পানি কিন্তু জমে গিয়েছিল।’

‘হ্যাঁ, দুঃখিত,’ বলল ক্লেয়ার। ‘পার্ক কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যে-তথ্য দিয়েছে সে-অনুযায়ী যদি বলি, এ-বছর জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে সম্পূর্ণ জমে যায়

লেগুনের পানি। তার মানে হচ্ছে, এলা হারিয়ে যাওয়ার বিশ দিন আগে। আমার কাছে একটা ভিডিও ফুটেজ আছে। বোর্ডটা আপডেট করা হলে সেটা দেখবো আমরা।’

মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। ‘যখন পাওয়া গেল এলাকে, তার পরনে নিজের কোনো কাপড় ছিল না। বরং এমন একজনের কাপড় পরে ছিল সে, যে-মেয়ে, আমাদের বিশ্বাস, লিলি ডেভিস... নিখোঁজ।’ লিলির নামটা লিখল বোর্ডে। তারপর ফিরে গেল এলার কলামে। ‘এলাকে শেষবার দেখা গেছে কোথায়? তার বাসার কাছেই... নির্দিষ্ট করে বললে, বাসা থেকে মাত্র দু’ব্লক দূরে। তখন বাস থেকে নামছিল সে। পরনে ছিল কালো একটা কোট। এই ঘটনা ঘটেছে লোগান স্কোয়ারের কাছে। যেখানে পাওয়া গেছে মেয়েটার লাশ, সেখান থেকে ওই স্কোয়ারের দূরত্ব প্রায় পনেরো মাইল। আমার মনে হয়, আমরা যদি বলি, লেগুনটাকে কোনো একটা নাটকের মঞ্চ হিসেবে সাজিয়েছে আমাদের সেই অচেনা লোক, তা হলে ভুল হবে না। সে বোঝাতে চেয়েছে, এলার লাশ সেখানে পড়ে ছিল গত কয়েক সপ্তাহ ধরে। ব্যাপারটা অসম্ভব, জানি আমরা, বিশেষ করে এলার শরীরে যে-কাপড় পাওয়া গেছে সেটা যদি সত্যিই লিলির হয়ে থাকে।’

ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ন্যাশ। এগিয়ে গেল কনফারেন্স টেবিলের দিকে। বসে পড়ল হোয়াইটবোর্ডের সামনের একটা চেয়ারে। ‘কিন্তু এ-রকম কোনো কাজের পেছনে যুক্তিটা কী? বরফের নিচে এলাকে ঢোকাতে কাঠখড় কিন্তু কম পোড়াতে হয়নি ওই লোককে। যা হোক, ধরে নিলাম ওই কাজ করতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে সে। কিন্তু এই যে লিলির কাপড় পরাল সে এলাকে... এটা কেন করল? এই কাজের তো কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না আমার কাছে।’

‘আমাদের কাছে মানে না দাঁড়ালেও ওই লোকের কাছে কোনো না কোনো মানে আছে নিশ্চয়ই,’ বলল পোর্টার। ‘সবকিছুরই কোনো না কোনো মানে আছে। যেমন এটারও...’

বলতে বলতে এলার নামে নিচে সে লিখল:

লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গেছে

‘আপনি কি সিরিয়াস?’ জানতে চাইল ক্রোজ।

‘আইজলি বলেছে, এলার ফুসফুস আর পাকস্থলীতে লবণাক্ত পানি পাওয়া গেছে। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, পানিতে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে মেয়েটার।’

‘পানিতে ডুবে মৃত্যু,’ পুনরাবৃত্তি করল ক্রোয়ার। ‘তা-ও আবার লবণাক্ত পানিতে।’

ন্যাশ বলল, ‘আমাদের এখান থেকে সবচেয়ে কাছের মহাসাগরের দূরত্ব প্রায় সাত শ’ মাইল।’

‘অ্যাকুয়ারিয়াম জোগান দেয়, এ-রকম স্থানীয় কিছু দোকানে গিয়ে খোঁজখবর করতে হবে আমাদের। আমার মনে হয় আমরা যদি ধরে নিই উপকূলের কাছে কোনো জায়গায় যায়নি এলা, তা হলে ভুল হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে টাইমলাইনটা ঠিক মেলে না।’

মাথা নাড়ছে ক্লেয়ার। ‘আমার আসলে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। তাই মাথা খাটাতে পারছি না ভালোমতো।’

‘আমাদের প্রায় সবারই একই অবস্থা,’ বলল পোর্টার। ‘এবার দেখা যাক দ্বিতীয় মেয়েটা, মানে লিলি ডেভিসের ব্যাপারে কী কী জানি আমরা।’

নিজের ছোট নোটবুকটা খুলল ন্যাশ। ‘ওই মেয়ের বাবা-মায়ের নাম যথাক্রমে ডক্টর র্যান্ডল ডেভিস এবং গ্রেস ডেভিস। ওই মেয়ের সবচেয়ে ভালো বন্ধুর নাম গ্যাব্রিয়েল ডিগান। মেয়েটা উইলকক্স অ্যাকাডেমিতে পড়ালেখা করে। শেষ যে-বার দেখা গেছে মেয়েটাকে, তখন তার পরনে ছিল লাল একটা কোট। এ-কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন ওই মেয়ের মা। আরও নির্দিষ্ট করে যদি বলি, কোটটা একটা হুডওয়ালা পার্কা। লাল রঙের নাইলন দিয়ে বানানো হয়েছিল সেটা। সামনের দিকে হীরার মতো খুপরি করা ছিল বেশকিছু। মেয়েটার পরনে আরও ছিল সাদা একটা হ্যাট, সাদা গ্লাভস, গাঢ় রঙের জিন্স, এবং গোলাপি টেনিস শূ। গতকাল স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সে, কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে পারেনি শেষপর্যন্ত। তার মানে হচ্ছে, সম্ভাবনা অনেক বেশি... ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েটাকে। ওই মেয়ের মা আমাদেরকে বলেছেন, তিনি নাকি নিজচোখে স্কুলের উদ্দেশে রওনা হতে দেখেছেন তাঁর মেয়েকে। ঘটনাটা সকাল সোয়া সাতটার। ক্লাস শুরু হয় আটটা বাজার দশ মিনিট আগে। এবং ডেভিসদের বাসা থেকে সেই স্কুলে পায়ে হেঁটেই যাওয়া যায়।’

‘আমার প্রশ্ন হচ্ছে,’ বলছে পোর্টার, ‘মেয়েটা কি স্কুলে যাওয়ার সময় কাউকে সঙ্গে নেয়?’

মাথা নাড়ল ন্যাশ। ‘লিলির মা বলেছেন, স্কুলটা নাকি তাঁদের বাসা থেকে মাত্র চার ব্লক দূরে। আর তাই মেয়েটা একাই যায়।’

ক্লোজ বলল, ‘চার ব্লকের দূরত্ব আসলেই খুব বেশি না। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। যে-ই তুলে নিয়ে গিয়ে থাকুক না কেন লিলিকে, হাতে তেমন একটা সময় পায়নি সে-লোক।’

ন্যাশের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ক্লেয়ার। ‘ধরে নিচ্ছি, মেয়েটা ডানে-বাঁয়ে কোনোদিকে না গিয়ে সোজা রওনা দিয়েছিল স্কুলের উদ্দেশে। একইসঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করে নিচ্ছি, এ-রকম কোনোকিছু অনুমান করে নেয়াটা আসলে সম্ভব না আমাদের পক্ষে। যা হোক, লিলি হয়তো ওর কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। হতে পারে, ওই বন্ধুর গাড়িতে সওয়ার হয়েছিল সে। জানি, লিলিদের বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব মাত্র কয়েক ব্লক। তবে আমি নিজে যখন স্কুলে পড়তাম

তখন করতাম কী... আমাদের স্কুলটা বাসা থেকে হাঁটাপথের দূরত্বে হলেও গাড়িতে উঠে পড়তাম।’

‘ভেতরে আসতে পারি?’

মুখ তুলে তাকাল ওরা। সোফি রদ্রিগেজ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। পোর্টার খেয়াল করল, ডেভিসদের বাসায় তামাটে রঙের যে-সোয়েটার পরে গিয়েছিল মহিলা, এখনও সেটাই পরে আছে সে। খুব সম্ভব ওই মহিলাও বাসায় যায়নি।

‘প্লিজ,’ বলল পোর্টার, ‘বসুন। আমরা সবকিছু খতিয়ে দেখছিলাম।’

‘আহ, স্যাম?’ সোফির দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল ক্রোজ। ‘গতবার বিশপকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন আপনি, তারপর কী ঘটেছিল, মনে আছে তো?’

ক্রোজের কাঁধে আলতো এক চাপড় বসিয়ে দিল ক্রেয়ার। ‘প্রায় চার বছর ধরে চিনি আমি সোফিকে।’ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল নিজের বাঁ পাশের খালি একটা চেয়ার।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল সোফি, কোট খুলল। তারপর বসে পড়ল চেয়ারে। তাকিয়ে আছে বোর্ডের দিকে। ‘আমি জানি, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে এই কেস নিয়ে কাজ করছেন আপনারা। এখনও যেহেতু লাশ পাওয়া যায়নি, সেহেতু লিলিকে নিখোঁজ হিসেব গণ্য করলেই ভালো হয় বেশি। তবে একইসঙ্গে এ-কথাও সত্যি, এলার লাশের সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে লিলির। কাজেই সবচেয়ে ভালো হয়, আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করতে পারি, তা হলে... অন্তত আগামী কয়েকটা দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারছি ঠিক কী ঘটছে, ততক্ষণ।’

‘আমাদের দলে আপনাকে স্বাগতম, সোফি,’ বলল পোর্টার।

ওর দিকে ক্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ন্যাশ। কিন্তু কিছু বলল না।

এই ঘরে এখন যারা উপস্থিত আছে, তাদের সবার চেহারা দেখে নিল সোফি। ‘এলার নিখোঁজ হওয়ার খবরও কিন্তু আমাদের কাছে এসেছিল। সে-হিসেবে ওই মেয়েকেও আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই বলা চলে। সবসময় ভালোটাই আশা করা ভালো, কিন্তু কথা হচ্ছে, একজন মানুষ, বিশেষ করে একটা মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর যদি আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে যায়, এবং তার কোনো হৃদিস পাওয়া না যায়, তা হলে সাধারণত ধরে নেয়া হয়, মেয়েটা কোথাও পালিয়ে গেছে। অথবা আরও খারাপ কিছু একটা হয়েছে। এলা আর লিলির কথা যদি বলি... তাদের পারিবারিক জীবনে কিন্তু কোনো সমস্যা ছিল না। কাজেই একটা সময়ে এসে আমার মন কেন যেন বার বার বলতে লাগল আমাকে, “আরও খারাপ” কিছু একটাই ঘটেছে। আপনারা যখন কাপড়ের ব্যাপারটা বললেন আমাকে, আমার সেই সন্দেহ পাকাপোক্ত হয়ে গেল। তারপরও আশা করছি, লিলিকে সময়মতোই খুঁজে বের করতে পারবো আমরা।’

‘কাপড়ের ছবিগুলো কি দেখিয়েছিলেন লিলির বাবা-মাকে?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার। ওসব ছবি মর্গ থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে সোফির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে।

মাথা ঝাঁকাল সোফি। ‘লিলির মা বলেছে, ওসব কাপড় তাঁর মেয়েরই। আরও বলেছেন, হ্যাটের গায়ে হস্তাক্ষরে যা পাওয়া গেছে, সেটা নাকি তিনি নিজেই লিখেছিলেন।’

আরও একবার বোর্ডের দিকে মনোযোগ দিল পোর্টার। এলা রেনল্ডস নামটার নিচে লিখল: লিলি ডেভিসের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তারপর ঘুরল সোফির দিকে। ‘এলার ব্যাপারে আর কী কী বলতে পারেন আপনি আমাদেরকে?’

মুখ খোলার আগে একটা মুহূর্ত ওই বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল সোফি। মেয়েটা হারিয়ে যাওয়ার পর, যে-জায়গা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সে, সেখানে নিজে গিয়েছি আমি... তা-ও আবার পায়ে হেঁটে। বাস থেকে এমন একজায়গায় নেমেছিল সে, যে-জায়গা ওর বাসা থেকে মাত্র দু’ব্লক দূরে। জায়গাটা লোগান স্কোয়ার নামে পরিচিত। ওই মেয়ের বাবা-মা আমাকে বলেছেন, মেয়েটা নাকি মাঝেমধ্যে স্টারবাকসে যেত... হোমওয়ার্ক করার জন্য। দুটো পথেই হেঁটেছি আমি। বাস স্টপ থেকে ওই মেয়ের বাসায় যেতে আমার সময় লেগেছে চার মিনিট। আবার স্টারবাকস থেকে সেই বাসায় যেতে লেগেছে নয় মিনিট। পুরো জায়গাটা একটা লোকারণ্য বলা চলে। সবজায়গায় শুধু মানুষ আর মানুষ। আর তাই একটা কথা আমার মাথায় কিছুতেই খেলছে না। কেউ একজন কীভাবে তুলে নিয়ে গেল ওই মেয়েকে, অথচ অন্য কেউ দেখলই না তাকে?’

ন্যাশ বলল, ‘স্টারবাকসের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?’

মাথা ঝাঁকালেন সোফি। ‘আমি একটা ছবি দেখিয়েছিলাম তাঁকে। সেটা দেখে এলাকে চিনতে পারেন তিনি। তবে যেদিন অপহরণ করা হলো মেয়েটাকে, সেদিন সে গিয়েছিল কি না ওখানে, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারলেন না। যা হোক, একটা তথ্য জানা গেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। বিল যা আসত স্টারবাকসে, এলা সাধারণত নগদে পরিশোধ করে দিত সব। কোনো ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করত না। ফলে ও-রকম কোনো রশিদও পাওয়া যায়নি।’

‘কোনো সিকিউরিটি ক্যামেরা ছিল না ওখানে?’

‘একটা ছিল। কিন্তু ওটা আবার প্রতিদিনই রিসাইকেল করা হয়। ফুটেজ সংরক্ষণ করে না ওরা। আমরা যতক্ষণে গিয়ে পৌঁছেছি সেখানে, আগের দিনের ফুটেজ শ্রেফ গায়েব হয়ে গেছে।’

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ক্রোজ। ‘আমার কি একবার দেখা উচিত? এমন কোনো সিকিউরিটি সিস্টেমের কথা জানা নেই আমার, যেটা কিনা আগের দিনের ফুটেজ সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলে। ওই সিস্টেম যদি হার্ড-ড্রাইভ ভিত্তিক হয়ে থাকে, কিছু না কিছু ফুটেজ এখনও হয়তো রয়ে গেছে। ম্যানেজার ভদ্রলোক যদি ভেবেও থাকেন পুরো ফুটেজ গায়েব হয়ে গেছে, তবুও।’

মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। বোর্ডে লিখল:

স্টারবাকস ফুটেজ (১ দিনের?) ... ক্রোজ

তারপর বলল 'আর কী?'

'ওই মেয়ের কম্পিউটার এবং ই-মেইল ঘেঁটে দেখেছি আমরা। কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো কিছুই খুঁজে বের করতে পারিনি,' বলল সোফি। 'মেয়েটার ফোনও তার সঙ্গে গায়েব হয়ে গেছে। লোগান স্কোয়ারের সঙ্গে যে-টাওয়ার আছে, সেটার সঙ্গে শেষবারের মতো যোগাযোগ ঘটেছিল ওই ফোনের। যে-বাসে সওয়ার হয়েছিল মেয়েটা, সেটা যে-সময় নাগাদ থেমেছিল, তার মিনিট চারেক পর বন্ধ হয়ে যায় মোবাইলটা।'

'ক্রোজ?'

ইতোমধ্যেই মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে দিয়েছে ক্রোজ। কী একটা নোট নিচ্ছে ওর ল্যাপটপে। 'এটাও দেখবো আমি।'

সোফির দিকে তাকাল পোর্টার। 'লিলির রুমে কিছু খুঁজে পাওয়া গেল?'

'এবারও বলবো, অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। এখানে-সেখানে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় পাওয়া গেছে প্রচুর কাপড়। কোনো ড্রয়ারের নিচে লুকানো অবস্থায় কিছু পাওয়া যায়নি। ম্যাট্রেসের নিচেও পাওয়া যায়নি কিছু। তবে আয়নার সঙ্গে টেপ-মারা অবস্থায় পাওয়া গেছে একটা ছবি। সে-ছবিতে লিলি আছে, আর ওর সঙ্গে আছে আরেকটা মেয়ে। ওর মা বললেন, দ্বিতীয় মেয়েটা নাকি লিলির বন্ধু গ্যাবি। আর লিলির বাবা বললেন, তাঁর মেয়ের কাছে নাকি একটা মোবাইল ফোন আর একটা ল্যাপটপ ছিল। কিন্তু কোনোটাই ওই মেয়ের ঘরে ছিল না। ওর মা বললেন, জিনিস দুটো স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল মেয়েটার। আরও বললেন, স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ওই মেয়ের সঙ্গে নাকি একটা ব্যাকপ্যাক ছিল।' একটা মুহূর্তের জন্য থামল সোফি। টেক্সট মেসেজ এসেছে তার মোবাইলে, পড়ল সেটা। 'আমার অফিস থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়েছে মেয়েটার মোবাইল নম্বরে। কিন্তু সেটা বন্ধ পাওয়া গেছে। সেই মোবাইলের সঙ্গে শেষ যে-বার সংযোগ ঘটেছে কোনো টাওয়ারের, সেটা ওর বাসার কাছেই অবস্থিত। সাতটা তেইশ মিনিটে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় মোবাইলটা। তার মানে হচ্ছে, মেয়েটা বাসা থেকে বের হওয়ার আট মিনিট পর।'

'ক্রোজ, চেষ্টা করে দেখো তো, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে লিলির যে-অ্যাকাউন্ট আছে, সেটা থেকে কিছু বের করা যায় কি না। সম্ভব হলে ওর ই-মেইল অ্যাকাউন্টও চেক করো।'

'ঠিক আছে,' বলল ক্রোজ।

নিজের ব্যাগ থেকে টেনে একটা ফোল্ডার বের করল সোফি। ওটার ভেতরে যা-যা আছে, ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর। এলা আর লিলি দু'জনের ছবিই দেখা

যাচ্ছে। ‘একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, মেয়ে দুটো দেখতে অনেকটা একই রকম। তার মানে, এমনও হতে পারে, কেউ একজন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তাদের প্রতি। আবার পুরো ব্যাপারটার পেছনে কোনো সেক্সুয়াল মোটিভও থাকতে পারে তবে মেডিকেল একজামিনার বলেছেন, এলার ওপর নাকি ও-রকম কোনো নিপীড়ন চালানো হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা কাকতালীয় হিসেবে বাদ দিতে এখনও রাজি না আমি।’

‘ভালো একটা পয়েন্ট বলেছেন। নিতে পারি?’ ইঙ্গিতে টেবিলের ছবিগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে পোর্টার।

ওর হাতে ওসব ছবি তুলে দিল সোফি। পোর্টার টেপ দিয়ে ছবিগুলো আটকে দিল বোর্ডের সঙ্গে। ‘লিলির বয়স কত?’

‘সতেরো,’ জবাবে বলল সোফি।

‘দু’জনের চুলই সোনালি। সে-চুল, দেখতে পাচ্ছি, কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে কি নামেনি। এলার চোখ নীল। লিলির সবুজ। দু’জনের মাঝখানে বয়সের ব্যবধান দু’বছরের। এলা কোন স্কুলে পড়ত?’ জানতে চাইল পোর্টার।

সঙ্গে করে আনা নোট ঘাঁটাঘাঁটি করছে সোফি। ‘কেলভিন পার্ক হাই স্কুল। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল সে।’

‘এলা আর লিলি একজন আরেকজনকে চিনত... এ-রকম কোনো কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ আছে?’

‘সে-রকম কোনো কিছু জানা নেই আমার,’ জবাবে বলল সোফি। ‘আলাদা আলাদা স্কুলে পড়ত ওরা দু’জন। ওদের সামাজিক যে-বলয়, সেটাও ছিল আলাদা। বয়সের ব্যবধানও ছিল দু’বছরের। কোনো কিছুই তো মিলছে না।’

‘ওই গ্যালারির কী খবর?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার। ‘এমন কি হতে পারে, সেখানে দেখাসাক্ষাৎ হতো এলা আর লিলির মধ্যে?’

‘আমি এখনও সেখানে যাইনি। দশটার আগে খোলে না ওটা।’

গাল চুলকাল পোর্টার। ‘এক কাজ করুন। ক্রেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে লিলির স্কুলে যান আপনি। লিলির সেই বন্ধু গ্যাব্রিয়েল ডিগানের সঙ্গে কথা বলুন। আমাদের ন্যাশের আবার একটা খারাপ স্বভাব আছে। স্কুলের বাচ্চাকাচ্চাদের ভয় পাইয়ে দেয়।’

হাসল ন্যাশ। ‘ওই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।’

ওর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। ‘তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাবো গ্যালারিতে।’

‘আপনাকে ওই গ্যালারির ঠিকানাটা টেক্সট করে দেবো আমি,’ বলল সোফি। ‘নর্থ হলস্টেডে অবস্থিত ওটা।’

ঘাড় ঘুরিয়ে বোর্ডের দিকে তাকাল পোর্টার। ‘আর কী?’

চুপ হয়ে গেল পুরো দলটা।

‘ভিডিয়োটো কি এখন দেখবো আমরা?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

‘হ্যাঁ। চালু করো।’

আইপ্যাডের স্ক্রিনে ট্যাপ করল ক্লেয়ার। তারপর ওটা নামিয়ে রাখল টেবিলের মাঝখানে। ইমেজটা আপাতত স্থির হয়ে আছে। পিচ-ঢালাই-করা কালো একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। তবে যে-অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিয়ো ধারণ করা হয়েছে, সেটা এককথায় ভয়াবহ। সময় দেখা যাচ্ছে ভিডিয়ার এককোণায়। সকাল ৮:৪৭। ১২ ফেব্রুয়ারি।

প্লে-তে চাপ দিল ক্লেয়ার। দুটো গাড়িকে অতিক্রম করতে দেখা গেল। একটা হলুদ টয়োটা। অন্যটা একটা সাদা ফোর্ড। স্ক্রিনে যেইমাত্র ধূসর একটা পিকআপ ট্রাককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, পজ-এ চাপ দিল ক্লেয়ার। ‘এবার ধীরে ধীরে আগে বাড়বো আমি।’ ইমেজটা এবার একবারে মাত্র কয়েকটা ফ্রেম অনুযায়ী আগে বাড়ছে।

ট্রাকের পেছনদিকটা নজরে পড়ছে এখন। সঙ্গে সঙ্গে যা বুঝবার বুঝে গেল পোর্টার। ‘পজ করো,’ বলল সে।

পিকআপ ট্রাকের পেছনদিকে বড় একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। যারা পুল ক্লিনিঙের কাজ করে, তাদের সঙ্গে এ-রকম জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

‘ওই পার্কে কোনো পুল নেই,’ বলল ক্লেয়ার। ‘আবার এত শীতে কেউ পুল পরিষ্কার করার কথা বলবেও না।’

‘অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলের ভিডিয়ো আছে?’ জানতে চাইল পোর্টার।

মাথা নাড়ল ক্লেয়ার। ‘এই একটা ক্যামেরাই আছে।’

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ক্লেয়ার। ‘এই ফুটেজ নিয়ে করার মতো খুব বেশি কিছু আছে বলে মনে হয় না। ইমেজটা পরিষ্কার। কিন্তু বারোটা যা বাজানোর তা বাজিয়ে দিয়েছে ওই অ্যাঙ্গেল।’

‘কয়েক ফ্রেম পেছনে যাও তো,’ বলল পোর্টার।

রিউইন্ড-এ চাপ দিল ক্লেয়ার।

‘থামো,’ বলল পোর্টার। ‘আলোর একটা ঝলকানি দেখতে পেলাম বলে মনে হলো না?’

সত্যিই, নিদারুণ এক অ্যাঙ্গেলে বসানো হয়েছে ক্যামেরাটা। কোনো পার্কের প্রবেশপথে যদি ক্যামেরা বসানো হয়, তা হলে সাধারণত সেটা তাক করা থাকে রাস্তার দিকে। ফলে কোনো গাড়ির আসা-যাওয়ার ভিডিয়ো ধারণ করা সম্ভব হয় সবচেয়ে ভালো উপায়ে।

ফুটেজটা পজ করা আছে এখন। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে পিকআপ ট্রাকের উইন্ডশিল্ড। কিন্তু পোর্টার যা বলেছে ঠিকই বলেছে... ওদের দৃষ্টিপথে যেন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলোর উজ্জ্বল সাদা একটা ঝলকানি।

ড্রাইভারের একটা গড়ন অনুমান করে নিতে পারছে পোর্টার। কিন্তু সেটা ও লোককে শনাক্ত করার জন্য মোটেও যথেষ্ট কিছু না। ‘ক্লোজ, কী মনে হয় তোমার বলো তো? প্রথমে বড় বানিয়ে তারপর পরিষ্কার করে নিতে পারবে এই ইমেজ?’

‘হয়তো... বলা মুশকিল। চেষ্টা করে দেখবো।’

‘পার্কের ম্যানেজার বলেছেন, তাঁরা ওই ক্যামেরার ফুটেজ বলতে গেলে চের করেন না। ক্যামেরাটা আসলে ওখানে যতটা না কাজের জন্য বসানো হয়েছে, তা চেয়ে বেশি বসানো হয়েছে প্রতিবন্ধক হিসেবে... লোক দেখাতে। কোনো একটু সময়ে আলাদা হয়ে গেছে ওটা, ফলে শুরুতে তাক করা ছিল রাস্তার দিকে, আর এখন তাক করা আছে জমিনের দিকে। আবার এমনও হতে পারে, কেউ একজন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাত করে দিয়েছে ওই ক্যামেরা, তাক করে দিয়েছে জমিনের দিকে। সে-রকম কিছু যদি ঘটেও থাকে, কবে ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে... সেসব ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই তাঁর।’ ব্যাখ্যা করার কায়দায় বলল ক্লেয়ার। ‘ম্যানেজার ভদ্রলোক বললেন, ক্যামেরাটা তাক করা ছিল রাস্তার দিকে। ফলে যেসব গাড়ি পার্কের দিকে আসত, সেগুলোর পরিষ্কার ছবি দেখা যেত। দেখা যেত ওসব গাড়ির ড্রাইভারকেও।’

ক্লোজের দিকে তাকাল পোর্টার। কিন্তু পোর্টার কিছু বলার আগেই ওকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিল ক্লোজ। ‘হ্যাঁ, জানি। পুরনো ফুটেজ ঘাঁটতে হবে আমাকে। নিশ্চিত হতে হবে, ক্যামেরা কাত করার কাজটা কবে নাগাদ করা হয়েছে, তা-ই তো? কপাল যদি ভালো থাকে আমাদের, এমনও হতে পারে, আমাদের সেই অচেনা লোককে একটা রেঞ্চ হাতে নিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকতে দেখবো ক্যামেরার দিকে।’

‘কখনও কখনও বেশি বেপয়োরা হতে গিয়ে মারাত্মক কোনো ভুল করে ফেলে ও-রকম লোকেরা,’ বলল পোর্টার।

‘হ্যাঁ।’

‘আপাতত যা অগ্রগতি হয়েছে আমাদের, তা এককথায় ভালো বলা যেতে পারে। আমরা অন্ততপক্ষে ওই ট্রাকটা কোন মডেলের, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবো। পুল পরিষ্কার করার কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান, তাদের সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি আমরা ব্যাপারটা, তা হলে কপাল আসলেই ভালো হতে পারে আমাদের,’ আবারও বোর্ডের দিকে তাকাল পোর্টার। ‘এখানে যোগ করার মতো আর কিছু আছে আমাদের হাতে?’

আরও একবার চুপ হয়ে গেল সারা ঘর।

কালো মার্কারটার মাথায় ক্যাপ পরিয়ে দিল পোর্টার। বসে পড়ল কনফারেন্স টেবিলের একধারে। ‘দুটো মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে; দুটো ঘটনার বেলাতেই আরও ভালো একটা ধারণা পেতে চাই আমি। আমাদের সেই অচেনা লোক যা

করে, দ্রুত করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, পাবলিক প্রেস থেকে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যেতেও কোনো অসুবিধা নেই তার। অর্থাৎ, ঘাপটি মেরে থাকায় একজন ওস্তাদ সে। আবার এমনও হতে পারে, এলা আর লিলির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল তার। ফলে ওই লোককে মোটেও কোনো হুমকি বলে মনে করেনি মেয়ে দুটো। লোকটা এমন কোনো অবস্থায় মেয়ে দুটোকে তুলে নিতে পারে না নিজের পিকআপ ট্রাকে, যখন গলা ফাটিয়ে চেষ্টাচ্ছে তারা, মুক্তি পাওয়ার আশায় পা ছুঁড়ছে। কারণ এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটলে কারও না কারও নজরে পড়বেই সেটা। কাজেই আমার ধারণা, যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, এলা আর লিলিকে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে নিজের সঙ্গে আসতে বাধ্য করেছে লোকটা।’

‘এমনও হতে পারে, অন্য কারও গাড়িতে কোনো না কোনো ধরনের প্রবেশাধিকার আছে ওই লোকের,’ পরামর্শ দেয়ার কায়দায় বলল ন্যাশ। ‘যেমন পাবলিক ওয়ার্কস। আবার ইউটিলিটি কোম্পানির ভ্যানও হতে পারে। মোদা কথা, এমন কোনো গাড়ি, অন্য আর এক শ’টা গাড়ির ভিড়ে সহজেই হারিয়ে যেতে পারে যেটা।’

নিজের ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিল ক্রোজ, যাতে দেখতে পায় সবাই। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে শিকাগো এবং আশপাশের এলাকার একটা বিস্তারিত ম্যাপ। লোগান স্কোয়ারের কাছে একটা লাল ডট চিহ্ন আছে। একই রকম একটা চিহ্ন আছে জ্যাকসন পার্কে। তৃতীয় চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে ব্রোঞ্জভিলের কিং ড্রাইভে। ‘যে-দু’জায়গা থেকে অপহরণ করা হয়েছে এলা আর লিলিকে, সে-জায়গা দুটোর মাঝখানে দূরত্বের ব্যবধান প্রায় দশ মাইল। শিকারের জায়গা বলতে যা বোঝায়, শিকাগোর মতো একটা বড় শহরের জন্য ওই দূরত্বটা সে-রকম একটা চলনসই জায়গা। জ্যাকসন পার্ক, মানে এলাকে পাওয়া গেছে যেখানে, সে-জায়গা এলার বাসা থেকে যতটা না কাছে, লিলির বাসা থেকে তার চেয়ে বেশি কাছে।’

ম্যাপটা কিছুক্ষণ দেখল পোর্টার। ‘তোমার কথার মানে হচ্ছে, এলার লাশ যেখানে পাওয়া গেছে, সে-জায়গার কাছাকাছি এক এলাকা থেকে অপহরণ করা হয়েছে লিলিকে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।’

‘এলা কি সত্যিই লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গেছে?’ ড্র কুঁচকে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে সোফি। ‘কথাটার কিন্তু কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না।’

‘আচ্ছা, এমন যদি হয়, লবণাক্ত পানির কোনো সুইমিং পুলে ডুবে মারা গেছে মেয়েটা, তা হলে?’ বলল ক্রোজ। ‘ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে ওই ট্রাকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কিন্তু।’

‘লবণাক্ত পানির সুইমিং পুল?’ ড্র কুঁচকে গেছে ন্যাশের।

মাথা ঝাঁকাচ্ছে ক্রোজ। ‘ফ্লোরিডায় আমার এক আন্টি আছে। তাঁর ও-রকম একটা পুল আছে। ক্লোরিনে অ্যালার্জি আছে তাঁর। তা ছাড়া পানিতে লবণ মেশানোর খরচও কিন্তু তুলনামূলক কম।’

‘শিকাগোতে ও-রকম কোনো পুল আছে বলে তো শুনিনি?’ বলল পোর্টার।
‘কী মনে হয় তোমার? একটা লিস্ট জোগাড় করতে পারবে এই ব্যাপারে?’

ক্লোজ বলল, ‘বিল্ডিং পার্মিটের সূত্র ধরে কিছু একটা দাঁড় করাতে পারবো বলে মনে হয় আমার।’

টেবিল ঘিরে বসে থাকা বাকিদের চেহারা একে একে দেখে নিল পোর্টার।
সোফি রদ্রিগেজকে ছাড়া বাকি সবাইকে গত কয়েক বছর ধরে চেনে সে। ন্যাশের
ডেস্ক থেকে তুলে নিল খবরের কাগজটা, রাখল কনফারেন্স টেবিলের ওপর।
‘সাংবাদিকদের ব্যাপারে সাবধানে থেকো তোমরা সবাই। কেউ একজন আমাদের
গোপন খবর ফাঁস করে দিয়েছে কোনো একজন পত্রিকাওয়ালার কাছে। তারপর
তারা সে-খবরে রঙ মাখতে দ্বিধা বোধ করেনি।’

পত্রিকাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল ক্লোজ, যাতে হেডলাইনটা দেখতে পারে
ভালোমতো। ‘আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না আমাদের কেউ মুখ খুলেছে
সাংবাদিকদের কাছে, তা-ই না?’

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘আমার যা মনে হয় তা হলো, পত্রিকার কাটতি বাড়াতে
ওই লোকগুলো যা খুশি তা-ই ছেপে দিতে পারে। কথা বলার জন্য আমাদের
কাউকে যদি না পায় তারা, খবর বানিয়ে নিতে অসুবিধা কী তাদের? যা হোক,
আমরা মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর একটা বিবৃতি জানিয়ে দেবো আমি।
ততক্ষণ পর্যন্ত, লিলির ব্যাপারে জারি হওয়া অ্যান্ডার অ্যালার্টের কথা যদি বাদ দিয়ে
বলি, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা সম্পূর্ণ বন্ধ আমাদের।’

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এসেছে পুরো দলের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ
পর সোফি মুখ খোলায় কেটে গেল সেটা। ক্লোজ কিছু ডোনাট নিয়ে এসেছিল,
একটা বাদে সব খাওয়া হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ডোনাটটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে মহিলা
বলল, ‘আপনাদের কেউ কি খাবেন ওটা?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লোজ। ‘খেয়ে নিন।’

এন্টিডেন্স বোর্ড

এলা রেনল্ডস (বয়স ১৫)

নিখোঁজ হয়েছিল: জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে
লাশ পাওয়া গেছে: ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে,
জ্যাকসন পার্ক লেগুনে
সেখানকার পানি জমে বরফে পরিণত হয়েছে: জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে
(মেয়েটা হারিয়ে যাওয়ার ২০ দিন আগে)
এই মেয়েকে শেষবার দেখা গেছে: লোগান স্কোয়ারে বাস থেকে নামছিল।
(ওদের বাসা থেকে ২ ব্লক দূরে/জ্যাকসন পার্ক থেকে ১৫ মাইল দূরে)
শেষ যে-বার দেখা গেছে মেয়েটাকে, তখন তার পরনে ছিল:
কালো কোট
লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গেছে মেয়েটা
(তার লাশ পাওয়া গেছে স্বাদু পানিতে)
পরনে ছিল লিলি ডেভিসের কাপড়
বাস স্টপেজ থেকে এলাদের বাসায় যেতে সময় লাগে: ৪ মিনিট
কেডজি'র স্টারবাকসে ঘন ঘন যেত মেয়েটা।
ওদের বাসা থেকে সেখানে যেতে সময় লাগে: ৭ মিনিট

লিলি ডেভিস (বয়স ১৭)

বাবা-মা = ডক্টর র্যান্ডল ডেভিস এবং গ্রেস ডেভিস
সবচেয়ে ভালো বন্ধু = গ্যাব্রিয়েল ডিগান
পড়ত উইলকক্স অ্যাকাডেমিতে (গ্রাইভেট)
ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে ক্লাসে যায়নি।
শেষ যে-বার দেখা গেছে: স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিল (পায়ে হেঁটে)
ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে, সকাল ৭:১৫ মিনিটে
তখন পরনে ছিল: হীরার নকশা-করা লাল নাইলনের হুডওয়ালা পেরো পার্কা,
সাদা হ্যাট, সাদা গ্লাভস, গাঢ় রঙের জিন্স, গোলাপি টেনিস শূ
(এসব পাওয়া গেছে এলা রেনল্ডসের গায়ে)
লিলিকে খুব সম্ভব তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ সকালে
(স্কুলে যাওয়ার পথে)
স্কুলে যেতে সময় লাগে: সর্বোচ্চ ৩৫ মিনিট (স্কুলের উদ্দেশে বের হয়েছিল ৭:১৫
মিনিটে, ক্লাস শুরু হয় ৭:৫০ মিনিটে)
স্কুলটা ওই মেয়ের বাসা থেকে মাত্র ৪ ব্লক দূরে

মেয়েটা যে নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেটা মাঝরাতে আগে পুলিশকে জানানো হয়নি
(ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে গভীর রাতে জানানো হয়েছে)
বাবা-মা ভেবেছিলেন মেয়েটা কাজে গেছে (আর্ট গ্যালারি), স্কুল শেষ করে
(কিন্তু স্কুলেও যায়নি মেয়েটা)

অচেনা সেই লোক

- * খুব সম্ভব একটা ধূসর পিকআপ চালাচ্ছিল। সেটার পেছনে ছিল একটা ওয়াটার
ট্যাঙ্ক
- * হয়তো কোনো সুইমিং পুলে কাজ করে (ক্লিনিং/সার্ভিসিং)

অ্যাসাইনমেন্টস

- * স্টারবাকস ফুটেজ (১ দিনের) ... ক্রোজ
- * এলার কম্পিউটার, ফোন, ই-মেইল ... ক্রোজ
- * লিলির সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, ফোন রেকর্ডস, ই-মেইল
(ফোন এবং কম্পিউটার দুটোই হারানো গেছে) ... ক্রোজ
- * অচেনা সেই লোক হয়তো পার্কে ঢুকছিল; ফুটেজ বড় করে দেখা ... ক্রোজ
- * পার্কের ক্যামেরা কি টিলে করে রাখা হয়েছিল? আগের ফুটেজ দেখা ... ক্রোজ
- * লিলি যে-পথে স্কুলে যেত, সে-পথ ধরে হাঁটা এবং গ্যাব্রিয়েল ডিগানের সঙ্গে
কথা বলা ... ক্রোজ এবং সোফি
- * গ্যালারিতে যাওয়া ... পোর্টার এবং ন্যাশ (ম্যানেজার = মিসেস এডউইন্স)
- * পার্মিট অফিসের সূত্র ধরে শিকাগোর লবণাক্ত পানির পুলের তালিকা তৈরি করা
... ক্রোজ
- * স্থানীয় অ্যাকুয়ারিয়াম এবং অ্যাকুয়ারিয়াম সাপ্লাই হাউসগুলোতে খোঁজ নিতে
হবে

১০.
পোর্টার
দ্বিতীয় দিন, সকাল ৯:০৮

‘স্যাম, এই কাজ কিন্তু না করলেও চলবে তোমার।’

‘হ্যাঁ, কাজটা করতে হবে আমাকে।’

বলতে বলতে রেনল্ডসদের ডোরবেল বাজিয়ে দিল পোর্টার।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা এখানে উপস্থিত হয়েছে ওরা দু’জন। গাড়ির নীল-লাল আলো জ্বলছে-নিভছে এখনও। কম করে হলেও তিনটা লাল বাতির সিগনাল অগ্রাহ্য করেছে পোর্টার।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশ, শরীরের ভার বদল করল এক পা থেকে আরেক পায়ে। ‘আমাদের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু ইউনিফর্ম পরিহিত কোনো এক অফিসারকে পাঠিয়ে দেবে।’

দুই হাতের তালু একটা আরেকটার সঙ্গে ঘষল পোর্টার। ওর মনে হচ্ছে, এত ঠাণ্ডার কারণে আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে সে। বাতাস বরফের মতো শীতল। তাপমাত্রা নেমে গেছে তিন ডিগ্রিতে। ‘এখন সকাল ন’টা বেজে কিছু বেশি। রেনল্ডসরা হয়তো আজকের পত্রিকাটা দেখেছেন। খবরটা হয়তো আজ সকালের সব পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছে।’

আরও একবার ডোরবেল বাজাল পোর্টার।

দরজার বাঁ দিকে কাচের একটা জানালা আছে, সেটাতে পর্দা ঝুলছে; একদিকে একটুখানি সরে গেল সেটা। তারপর নেমে এল জায়গামতো। শোনা গেল, কেউ একজন ডেডবোল্ট খুলছে। পাল্লাটা ফাঁক হলো একটুখানি। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী এক মহিলা উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ লাল। অনিদ্রার ছাপ পড়েছে চোখের আশপাশের চামড়ায়। মহিলার চুল বাদামি। দেখে কেমন যেন তেলতেলে মনে হচ্ছে সে-চুল। মনে হচ্ছে, গত কয়েক দিন চুল পরিষ্কার করেননি তিনি। তাঁর পরনে মোটা বাদামি সোয়েটার আর জিন্স। ‘কোনো সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে?’

ব্যাজ কেসটা খুলে দেখাল পোর্টার। ‘আমি ডিটেকটিভ পোর্টার। সঙ্গে আছে ডিটেকটিভ ন্যাশ। শিকাগো মেট্রো থেকে এসেছি আমরা। ভেতরে আসতে পারি?’

পোর্টারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন মহিলা। ভাবখানা এমন, পোর্টারের কথাগুলো বুঝতে একটু যেন সময় লাগছে তাঁর। তারপর মাথা ঝাঁকালেন। পোর্টার আর ন্যাশকে ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন এখন। ওই অবস্থাতেই খুলে দিলেন দরজাটা। ‘আমি ভেবেছিলাম, যে-নিউজ ভ্যান ছিল বাইরে, ঠাণ্ডার ভয়ে পালিয়েছে তারা সবাই। গতকাল রাতেও রাস্তায় দেখেছি আমি তাদেরকে।’

দোরগোড়ার খানিকটা বাইরে কাঠের পোর্চে আলতো লাথি হাঁকিয়ে জুতো থেকে তুষার খসিয়ে ফেলল পোর্টার আর ন্যাশ। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। দরজাটা লাগিয়ে দিল। একটা উষ্ণতা যেন জড়িয়ে ধরল ওদের দু'জনকে। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল পোর্টার। 'আপনার স্বামী কি বাসায় আছেন?'

মাথা নাড়লেন মিসেস রেনল্ডস। 'এখনও ফেরেনি সে।'

'কোথাও গিয়েছেন নাকি তিনি?'

লম্বা করে দম নিলেন মহিলা। তাঁর পেছনে চামড়ার একটা সোফা আছে, বসে পড়লেন সেটার হাতলের ওপর। 'এলা যেদিন থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেদিন থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে, এখানে-সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে মেয়েটাকে। বাসায় ফেরে শুধু কিছু খাওয়ার জন্য, কয়েকটা ঘণ্টা একটু ঘুমানোর জন্য। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে। প্রথম কয়েকবার ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু একটা সময়ে পুরো ব্যাপারটা বৃথা মনে হতে লাগল আমার। রাস্তায় রাস্তায় ওভাবে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো... ব্যাপারটা যেন এ-রকম, আমাদের বাসা থেকে পালিয়ে গেছে কোনো কুকুর, ছোটছুটি করে বেড়াচ্ছে অজানা-অচেনা কিছু বাড়ির মাঝখানে, আর আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি ওটাকে। আমার স্বামীকে যে ওভাবে খুঁজে বেড়াতে মানা করবো, তা-ও পারি না। মন ভেঙে যাবে বেচারার। গত মঙ্গলবার বাসায় থাকার চেষ্টা করেছিল সে। তখন আমাদের কী মনে হয়েছে, জানেন? মনে হয়েছে, আমরা যেন সাংঘাতিক হতাশ হয়ে পড়েছি। অসহায় হয়ে গেছি... কোনো ফাঁদে আটকা পড়েছি যেন। গতকাল রাতে ডিনারের পর আবার বেরিয়ে গেছে সে।'

'ব্যাপারটা কর্মচঞ্চল থাকতে সাহায্য করছে আপনার স্বামীকে,' বললল ন্যাশ।

ওর দিকে একবার তাকালেন মহিলা। শূন্য একটা অভিব্যক্তি কাজ করছে তাঁর চেহারায়। বলে চললেন, 'আমাদের মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে আমি কী করেছি, জানেন? শুধু ফোন করেছি এখানে-সেখানে। ফোন করেছি এলার সব বন্ধুকে। আমাদের সব আত্মীয়কে। প্রতিবেশীদের। মানে... যাকে যাকে ফোন করা সম্ভব ছিল আমার পক্ষে, তাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এমনকী যোগাযোগ করেছি আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে, হাসাপাতালে, মর্গে। এখানে ওভাবে বসে থাকতে কেমন লাগে, জানেন? মনে হয়, ফাঁদে আটকা পড়েছি সত্যিই। অসহায় লাগে। কিন্তু... আর কী-বা করার ছিল আমার? পোস্টার ছাপিয়ে সব জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়েছি আমরা। কিন্তু এই আবহাওয়ায় তেমন কোনো কাজেই আসছে না ওসব। দরকার না পড়লে বাইরেই বের হচ্ছে না কেউ।'

লম্বা করে দম নিল পোর্টার। 'আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা বলার আসলে সহজ কোনো উপায় নেই...'

একটা হাত তুললেন মিসেস রেনল্ডস, চুপ করিয়ে দিলেন পোর্টারকে। 'বলার কোনো দরকার নেই আপনার। আজ সকালে দেখেছি আমি খবরটা। গত তিন

সপ্তাহে একটাবারের জন্যও বন্ধ হয়নি আমাদের টেলিভিশন। গতকাল রাতে কাউচেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঘুমটা যখন ভেঙে গেল, তখন দেখি, পার্কের ফুটেজ দেখানো হচ্ছে টিভিতে। একটাবারের জন্যও বলা হয়নি এলার লাশ পাওয়া গেছে। শুধু বলা হয়েছে, লেগুন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটা মেয়ের লাশ। কিন্তু একটা কথা কী, জানেন? মায়ের মন সব জানে। আমার ধারণা, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই কথাটা জানা ছিল আমার। আমার মনে হয়, আপনাদেরকে টিভিতে দেখেছি আমি। আপনাদের চেহারা কেমন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।’

‘আমি খুবই দুঃখিত।’

মাথা ঝাঁকালেন মহিলা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আলতো করে মুছছেন চোখ দুটো। দেখে মনে হচ্ছে, সপ্তাহ দু’-এক আগে শেষবারের মতো কেঁদেছেন তিনি। ‘আমার এলা যে পালিয়ে যাওয়ার মতো মেয়ে না, সেটা সেই শুরু থেকেই... যেদিন সে নিখোঁজ হয়ে গেল সেদিন থেকেই জানা ছিল আমাদের। আমার মনে হয়, তারপর থেকে একটা একটা করে যত মিনিট অতিবাহিত হয়েছে, আমার আশা একটু একটু করে তত কমেছে। এখনকার পৃথিবীতে একটা মেয়ে শ্রেফ গায়েব হয়ে যেতে পারে না। বিশেষ করে যখন সব জায়গায় ক্যামেরা আছে, ইন্টারনেট আছে। তারপরও যখন একটা মেয়ে পুরোপুরি নিখোঁজ হয়ে যায়, আপনাকে তখন ধরেই নিতে হবে, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।’ লম্বা করে দম নিলেন তিনি। ‘কীভাবে মারা গেছে আমাদের মেয়েটা?’

‘আমাদের ধারণা, পানিতে ডুবে। তবে... এখনও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।’

‘ওই লেগুনে ডুবে মারা গেছে মেয়েটা?’

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘না... অন্য কোথাও। কোনো এক জায়গায় ডুবে মারা গেছে এলা। তারপর ওকে নিয়ে এসে নিমজ্জিত করা হয়েছে লেগুনের পানিতে।’

‘আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, কেউ একজন ডুবিয়ে মেরেছে ওকে। ঠিক না?’

‘বলতে খারাপই লাগছে... সেটাই।’

দৃষ্টি নত হলো মিসেস রেনল্ডসের, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন। ‘আমাদের মেয়েটা কষ্ট পেয়ে মরেছে কি না, জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম আপনাকে। তবে এখন আমার মনে হচ্ছে, সে-প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। প্রশ্নটার জবাব শুনতে চাইছি কি না, সে-ব্যাপারেও এখন আর আমি নিশ্চিত না। মেয়েটাকে কবে বা কখন ডুবিয়ে মারা হয়েছে, কিছু জানেন? যে-লোক করেছে কাজটা, বলা ভালো যে-দানব করেছে কাজটা, সে ঠিক কী করেছে আমার বাচ্চাটার সঙ্গে, জানেন?’

ন্যাশের দৃষ্টিও নত হয়েছে, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সে-ও। ‘এই মুহূর্তে তেমন কোনো তথ্য জানা নেই আমাদের। আসলে আমরা ভাবছিলাম, আপনি কোনোকিছু শোনার আগেই আপনাকে ঘটনাটা জানাতে...’

‘কোনোকিছু শোনা বলতে কী বোঝাচ্ছেন? অন্য কোনো জায়গা থেকে শোনা? আসলে আপনারা যেভাবে বলছেন... মহৎপ্রাণ মানুষ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এভাবে বলা সম্ভব না... কিন্তু কথা হচ্ছে, ওই রিপোর্টাররা...’

‘আপনার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায় কি আছে? তাঁকে কি ফোন করা উচিত না? বাসায় ফিরতে বলা উচিত না?’

আরও একবার ফাঁপা একটা দৃষ্টি নেমে এল মিসেস রেনল্ডসের চোখে। এ-রকম দৃশ্য আগেও দেখেছে পোর্টার। কোনো কোনো মানুষ যখন মনে বড় রকমের চোট পায়, বাস্তবতা থেকে তখন কিছুটা হলেও আলাদা হয়ে যায়। তাদের আশপাশে তখন যা ঘটতে থাকে, তাকিয়ে তাকিয়ে সেসব শুধু দেখতে থাকে তারা, সেসবে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে না। মাথা ঝাঁকালেন মিসেস রেনল্ডস। কাউচের ওপর ভাঁজ করে রাখা আছে একটা কম্বল, সেখান থেকে বের করলেন একটা মোবাইল ফোন। ওটা ধরলেন মুখের কাছে। কয়েক সেকেন্ড পর মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকেই একটা ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন। ‘ফ্রয়েড? প্লিজ বাসায় চলে এসো। পুলিশ এসেছে। তারা আমাদের মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে।’

লাইন কেটে দিলেন তিনি। ফোনটা ফেলে দিলেন কাউচের ওপর।

বাসার পেছনদিকের কোনো একটা দরজা দড়াম করে লাগানো হলো এমন সময়। রীতিমতো কুচকাওয়াজ করতে করতে লিভিং রুমে ঢুকে পড়ল ছোট একটা ছেলে। রান্নাঘরের মেঝেতে তুষারের একটা ট্রেইল রেখে এসেছে যেন। তার পরনে নেভি ব্লু স্লোসুট। সঙ্গে আছে ঢলঢলে হলুদ একটা হ্যাট, স্কার্ফ আর কালো গ্লাভস। বয়স সাত কি আটের বেশি না। ‘মা? কেউ একজন আমাদের উঠানে একটা স্লোম্যান বানিয়ে দিয়ে গেছে।’

ছেলেটার দিকে তাকালেন মিসেস রেনল্ডস। তারপর তাকালেন পোর্টার আর ন্যাশের দিকে। ‘এখন না, ব্র্যাডি।’

‘আমার মনে হয় ওই স্লোম্যান বেশ ব্যথা পেয়েছে।’

‘কী?’

‘রক্ত পড়ছে ওটার গা থেকে।’

একাই ছিল লিলি। এখন আর সে একা না।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এসেছে ওই লোক। শেষ ধাপটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিনিট দু'-এক হবে। দেখছে লিলিকে। তার হাতে কিছু একটা আছে। কিন্তু সেটা কী, ঠাহর করতে পারছে না মেয়েটা।

একসময় কথা বলে উঠল ওই লোক। কণ্ঠ নিচু। শুনলে মনে হয়, যা বলছে চিন্তাভাবনা করে বলছে। চর্চিত। 'তুমি দেখছি দুধটুকু খাওনি।'

সত্যি, ওই দুধ খায়নি লিলি। খাবেও না। ওকে যা খেতে দেবে ওই লোক, যা পান করতে দেবে, তার কোনোকিছু সে ছুঁয়েও দেখবে না। দরকার হলে না খেয়ে থেকে মরে যাবে, তারপরও ওই লোকের দেয়া কোনোকিছু স্পর্শ পর্যন্ত করবে না।

'কেন খাওনি?'

জবাব দিল না মেয়েটা। লেপটা আরও শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল শরীরের সঙ্গে। সরে গেল খাঁচার দূরের এক কোনার দিকে।

'দেখো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে অপ্রীতিকর কোনোকিছু করতে চাইছি না। তবে তুমি যদি চাও, তা হলে অন্য কথা। আমি চাই, আরাম বোধ করো তুমি। শান্ত হও। তোমার গা কি যথেষ্ট গরম হয়েছে?'

লিলির ডানদিকে দেখা যাচ্ছে এই বাড়ির হিটিং, ভেন্টিলেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম। ওয়াটার হিটারও আছে। জ্ঞান ফেরার পর মেয়েটা খেয়াল করেছে, ওসব ব্যবস্থা সময়ে সময়ে চালু করা হয়েছে, আবার বন্ধও করা হয়েছে। আপাতত বন্ধ অবস্থায় আছে। ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাটা সোজা মুখ করে আছে মেয়েটার খাঁচার দিকে। বেশ গরম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই কথা ওই লোককে বলবে না মেয়েটা।

'তোমার যদি বেশি ঠাণ্ডা লাগে, আমাকে জানিয়ো।'

নড়ে উঠল লোকটা, বেরিয়ে আসছে ছায়া থেকে। এগিয়ে আসছে খাঁচার দিকে। এই যে ভেতরে এভাবে বন্দি হয়ে আছে লিলি, ওর মনে হচ্ছে, বাইরের যে-কোনো হুমকির কবল থেকে নিরাপদে আছে আসলে। ওই লোক যত কাছিয়ে আসছে, চেইনলিঙ্ক আর ধাতব বারগুলোর প্রতি তত কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে মেয়েটা। ওর মনে হচ্ছে, ওসব জিনিস যেন ওই লোকের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে ওকে। খালি হাতটা শরীরের পেছনদিকে নিয়ে গেল সে। পেঁচিয়ে ধরল একটা চেইনলিঙ্ক। শীতল ইম্পাত যেন গঁথে যাচ্ছে চামড়ার গভীরে।

খানিকটা হলেও আলো আছে এখন বেসমেন্টে, সে-আলোয় এসে দাঁড়াল লোকটা। তাকে ভালোমতো দেখার একটা সুযোগ পেয়ে গেল লিলি। লোকটার

চামড়ার অবিশ্বাস্য রকমের পাণ্ডুর। দর্শকের মনে হবে, কোনো কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। কিছু শিরা-উপশিরা যেন মাকড়সার জালের মতো বিস্তার লাভ করেছে লোকটার ঘাড়। বলিরেখা পড়ে গেছে চেহারায় আর কপালে... সে-রকমই মনে হয়। কালো একটা ক্যাপ পরে আছে লোকটা। ওটা তার মাথায় চেপে বসেছে যেন। ঢাকা পড়ে গেছে চুল... যদি সে-রকম কোনোকিছু থাকে তার চাঁদিতে আসলেই। জ্র পাতলা; আছে কি নেই, সন্দেহ হয়। লোকটার চোখ দুটোর দিকে যখন তাকাল লিলি। ভাবল, না তাকালেই ভালো হতো। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে-চোখে, মনে হয় লিলিকে বিদ্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছে যেন। স্পষ্ট ঠাহর করা যায়, বুড়ো এক লোকের চোখ ও-দুটো। বোঝা যায়, ছানি পড়ে গেছে সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা বুড়ো না আদৌ... বেশি হলে ত্রিশ হবে তার বয়স। কিন্তু সেই বয়সের সঙ্গে মোটেও মানানসই হয়নি তার চোখ। ওই চোখ হয়তো আসল না। ডানদিকের চোখের রঙ গাঢ় বলে মনে হচ্ছে। লাল হয়ে আছে সেটা। নজর সরিয়ে নিতে চাইছে লিলি। কিন্তু ও-রকম কিছু করার মাধ্যমে লোকটাকে খুশিও করতে চাইছে না। এমন কিছু করতে চাইছে না, যার ফলে ওর দুর্বলতা টের পেয়ে যাবে লোকটা।

‘আমি দেখতে যে-রকম, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার শরীরটা আসলে ভালো না। তবে আজ একটু ভালো লাগছে। কসম খেয়ে একটা কথা বলতে পারি... আমার যে-অসুখ, সেটা ছোঁয়াচে কিছু না। কাজেই দয়া করে ঘাবড়িয়ে না।’

চেইনলিঙ্কটা ধরে মোচড় দিল লিলি। ব্যথা পেল। কিন্তু মনে মনে স্বাগত জানাল সে-ব্যথাকে। আসলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলো একটুখানি। দাঁতে দাঁত পিষল।

খানিকটা হাঁ হয়ে আছে ওই লোকের মুখ। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় কেমন একটা শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে লিলি।

‘তোমাকে ছেড়ে দেবো আমি। তবে তার আগে আমি যা-যা বলবো, করতে হবে তোমাকে।’ হাতেধরা জিনিসটার দিকে তাকাল ওই লোক। একটা শাট গান। ওটার ব্যাপারে কিছু বলল না। লিলি জানে, ওই জিনিস আসলে প্রাণঘাতী কিছু না। তবে ঠিক কতখানি ব্যথা লাগে, অনুমান করার চেষ্টা করল। যদি দরকার পড়ে, সে কি ওই লোককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে পারবে? সে কি ছুট লাগাতে পারবে সিঁড়ির উদ্দেশে?

লোকটা বাঁ হাত দিয়ে একটা চাবি ঢুকিয়ে দিল খাঁচার দরজার ওপরের প্যাডলকে। তারপর খুলল নিচের তালাটা। দুটো তালাই সরিয়ে নিল দরজা থেকে। চেইনলিঙ্কের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল ও-দুটো। ল্যাচ সরিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা।

মড়ার মতো স্থির হয়ে আছে লিলি। খাঁচার পেছনদিকে ওর আঙুলের চাপ আরও বেড়েছে।

‘প্লিজ বেরিয়ে এসো,’ বলল লোকটা। ‘চাইলে আমার হাতেধরা এই গান চালাতে পারি তোমার ওপর, বের করে আনতে পারি তোমাকে। কিন্তু তারপর আমাদেরকে বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। তার চেয়ে ভালো হয়, তুমি যদি আমার কথামতো কাজ করো।’

ঠিক লিলির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ওই লোক। তার হাতে... কঙ্জির কাছে একটা ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে। নোংরা হয়ে গেছে সেটা। রক্তের শুকনো দাগ লেগে আছে।

‘বের হও!’ চিৎকার করে উঠল লোকটা।

লাফিয়ে উঠল লিলি। দম নিল লম্বা করে।

‘কেন আমাকে চিৎকার করতে বাধ্য করো তুমি? প্লিজ ও-রকম কোনো কাজ করতে বাধ্য কোরো না আমাকে। আমি গলা চড়াতে চাই না। আমি নীচ কোনো আচরণ করতে চাই না। যত জলদি শুরু করবো, তত জলদি শেষ হয়ে যাবে সবকিছু।’

কিন্তু লিলি কিছুই শুরু করতে চাইছে না। জানে, উচিত হচ্ছে না, তারপরও নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সিধে হলো দু’পায়ে। এগিয়ে যাচ্ছে লোকটার দিকে, খাঁচার দরজার দিকে। লোকটার কাঁধ ছাড়িয়ে তাকিয়ে আছে দূরের ওই সিঁড়ির দিকে। তাকিয়ে আছে ওপরতলা থেকে আসা সেই আলোর দিকে।

‘তোমার মতো আরও অনেকেই একছুটে হাজির হওয়ার চেষ্টা করেছিল ওই সিঁড়ির কাছে। কিন্তু আজপর্যন্ত কেউ পারেনি। যদি চাও তো চেষ্টা করে দেখতে পারো। তাতে আরও একবার কাজ করে উঠবে আমার হাতের এই শাট গান। খামোকাই দেরি হয়ে যাবে আমাদের। কাজেই আবারও বলছি, আমি যা বলি, তা করাটাই তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো।’ যেন কথা বলছে না, লিলিকে আশ্বস্ত করছে লোকটা। লেপ ভেদ করে ওই লোকের হাত নিজের পিঠের ওপর টের পাচ্ছে মেয়েটা। ওকে গাইড করছে যেন। সিঁড়ির সঙ্গে দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে বড় আর সাদা একটা ফ্রিজ; আলতো করে ঠেলতে ঠেলতে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে।

ফ্রিজের ঢাকনা তুলে ফেলল লোকটা।

লিলি ভেবেছিল, একরাশ বরফ-শীতল বাতাস ধেয়ে আসবে ওর দিকে। ওদের বাসায় এ-রকম একটা ফ্রিজ আছে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। তার বদলে গরম আর আর্দ্র বাতাস উঠে এল ভেতর থেকে। ফ্রিজটা ভর্তি হয়ে আছে পানি দিয়ে। এককদম পিছু হটল মেয়েটা। ধাক্কা মেরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ওই লোকের কাছ থেকে। কিন্তু লোকটা শাট গান ঠেসে ধরে রেখেছে মেয়েটার পিঠের সঙ্গে।

‘পানি ভালো। গরম। এগিয়ে যাও। স্পর্শ করো।’

লিলি দেখতে পেল, ওর একটা হাত এগিয়ে যাচ্ছে ওই পানির দিকে। একটা আঙুল ডুবিয়ে দিল পানিতে। হ্যাঁ, পানিটা গরম... অন্তত বেসমেন্টের বাতাসের তুলনায় অনেক গরম।

‘পরনের সব কাপড় খুলে ফেলো। সেটাই ভালো।’

নির্বিকারভাবে বলল লোকটা। যেন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই উচ্চারণ করেছে শব্দগুলো। এমনভাবে বলেছে, যেভাবে পুরনো বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে।

‘না, আমি...’ লিলি কিছু টের পাওয়ার আগেই ওর মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল শব্দগুলো। থেমে গেল সে, আর কিছু বলতে চায় না। মাথা নাড়ছে। ওই লোক ইতোমধ্যে আঁকড়ে ধরেছে লেপটা। ফ্রিজের কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে লিলি। কিন্তু ওর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তার নিঃশ্বাস নিজের ঘাড়ে টের পাচ্ছে বেচারী।

বাঁ হাতে লিলির কাঁধ আঁকড়ে ধরল লোকটা। পরমুহূর্তেই লেপ ধরে টান মারল।

চোঁচিয়ে উঠল লিলি। এ-জায়গায় ওর জ্ঞান ফেরার পর এই প্রথমবারের মতো সত্যিকারের কোনো আওয়াজ করল। যত জোরে সম্ভব চোঁচাচ্ছে। এত জোরে যে, ওর মনে হচ্ছে, কোনো একটা ছুরি যেন ঢুকে যাচ্ছে ওর গলার ভেতরে। বেসমেন্টের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে-আওয়াজ। ওই প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওর দিকেই... এমন এক কণ্ঠে, যা ওর নিজের না। মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড আতঙ্কিত ছোট কোনো মেয়ে চোঁচাচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, ওই মেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, হাল ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটা কে, জানতে চায় না লিলি।

শাট গানের ধাতব কাঁটাগুলো যেন গাঁথে যাচ্ছে মেয়েটার ঘাড়ে। কেউ যেন ধাতব দুটো দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে সেখানে। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড ব্যথা টের পেল মেয়েটা। মনে হলো, কেউ যেন কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে ওর শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি। মনে হচ্ছে, কেউ যেন একটা ব্রেড দিয়ে ওর পায়ের পাতা থেকে হাতের আঙুলের ডগা পর্যন্ত চিরে ফেলছে। চোখ উল্টে গেল মেয়েটার। ভাঁজ হয়ে গেল দু’পা। মরে গেল ওর সেই চিৎকার। ওকে যেন খামে বন্দি করে নিল কোনো একটা নীরবতা।

যখন জ্ঞান ফিরল, টের পেল, মেঝেতে সেই লেপের ওপর শুয়ে আছে। ওর সব কাপড় খুলে নিয়েছে লোকটা। হাত বাড়িয়ে লেপের একটা কোনা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল সে... গায়ের ওপর টেনে নিয়ে আড়াল করতে চায় নিজেকে। কিন্তু কেন যেন কাজ করছে না হাত দুটো। আঙুলের দিকে তাকাল। এখনও ঝাঁকি খাচ্ছে।

‘তোমাকে একটুও ব্যথা দিতে চাইনি আমি। বিশ্বাস করো, ব্যথা দিতে চাই না। প্লিজ, এমন কোনো কাজ কোরো না, যাতে আবারও ব্যথা দিতে হয় তোমাকে,’ বলল লোকটা। ‘কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে তোমার কাপড়

ফেরত দেবো আমি। দেখে নিয়ো, আমি যা বলছি, তা করাটাই তোমার জন্য ভালো।’

কী ঘটতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণ পর, বোঝা হয়ে গেছে লিলির। নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে ওই ঘটনার জন্য।

লোকটা একহাতে জড়িয়ে ধরল লিলির পিঠ। আরেক হাত নিয়ে গেল ওই মেয়ের হাঁটুর পেছনে। মেঝে থেকে তুলে ফেলল মেয়েটাকে। দেখে লোকটাকে দুর্বল বলে মনে হয়েছিল। অথচ আশ্চর্য, অনেক জোর আছে এই লোকের শরীরে। লিলিকে পঁজাকোলা করে নিয়ে গেল ফ্রিজের গরম পানির কাছে, আলতো করে নামিয়ে দিল পানিতে।

‘গরম, তা-ই না? রীতিমতো চমৎকার।’

গরম এই পানিতে সত্যিই আরাম লাগছে। লিলির মনে হচ্ছে, কোনো একটা সুইমিং পুলের পানিতে ঢুকে যাচ্ছে সে যেন। টের পাচ্ছে, বিশেষ সেই অনুভূতি আস্তে আস্তে ঠাই করে নিচ্ছে ওর আঙুলে আর হাতে। মনে হচ্ছে, উষ্ণতাটা যেন প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনছে ওর হাতে-পায়ে।

‘চোখ বন্ধ করে ফেলো, আলগা করে দাও শরীরটা,’ প্রশান্তিদায়ক এক কণ্ঠে বলছে লোকটা। ‘লম্বা করে দম নাও। এই তো চমৎকার। লম্বা করে দম নাও।’

লোকটার কথামতো কাজ করছে লিলি। এমন না যে, আদেশ পালন করার একটা ইচ্ছা পেয়ে বসেছে ওকে। বরং সে নিজেই এখন লম্বা করে দম নিতে চাইছে। হাঁ করে খুলে দিল মুখটা। বেসমেন্টের বাতাস টেনে নিল ফুসফুসের গভীরে। এভাবে বাতাস নেয়ার পদ্ধতিটা শিখেছিল ইয়োগা ক্লাসে।

‘এবার ধীরে ধীরে দম ছাড়ো। তোমার শরীর থেকে যে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, টের পাওয়ার চেষ্টা করো সেটা,’ ফিসফিস করে কথাটা বলল ওই লোক।

বাতাস ছাড়ল লিলি...

সঙ্গে সঙ্গে ওর দুই কাঁধ ধরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল লোকটা। এত জোরে ধাক্কাটা মেরেছে যে, বেচারীর মাথা ঠুকে গেছে ফ্রিজের তলদেশের সঙ্গে। বেঁচে থাকার স্বাভাবিক এক তাড়নায় পা ছুঁড়ল সে, হাত দিয়ে থাবা মারল যেন। ফ্রিজের ভেতরের দিকের প্লাস্টিক আঁকড়ে ধরতে চাইল আঙুলের সাহায্যে, কিন্তু মাত্র এক সেকেন্ড... তারপর পিছলে গেল আঙুলগুলো।

লিলি লম্বা সময়ের জন্য দম আটকে রাখতে পারে... প্রায় দু’মিনিট। শেষ যে-বার সময়টা মেপেছিল কেউ, তখন ও-রকমই ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তখনই সম্ভব, যখন ফুসফুস দুটো তাজা বাতাসে ভর্তি করে নিয়েছে সে। যখন পানিতে কিছু সময়ের জন্য ডুবে থাকার একটা প্রস্তুতি নিয়েছে সে। এবার নিজের ফুসফুস বাতাসে ভর্তি করেনি মেয়েটা। বরং খালি করেছে... যেমনটা ওকে করতে বলেছিল ওই লোক। ওকে যখন লোকটা ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিয়েছে পানির গভীরে, তখন শ্বাস নিয়ে ফেলেছে সে... বাতাসের তীব্র একটা তাড়না অনুভব করেছিল ওর

শরীর । কিন্তু বাতাসের বদলে পানি গিলে ফেলল বেচারী । সঙ্গে সঙ্গে কেশে উঠল, শরীর থেকে পানি বের করতে গিয়ে আরও পানি গিলে ফেলল । পানি দিয়ে ভর্তি হয়ে গেল ওর গলা আর ফুসফুস । তীব্র একটা ব্যথা টের পেল মেয়েটা । ওর মনে হচ্ছে, ভেতরটা বিস্ফোরিত হচ্ছে যেন । পা ছুঁড়ছিল, থামিয়ে দিল সেটা । থানা চালাচ্ছিল, থামিয়ে দিল সেটাও । বিদায় নিল ব্যথার অনুভূতিটা । একটা মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু । ভাবল, পানির নিচে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়, সে-কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে ওর শরীর । স্থির হয়ে গেল সে । মুখ তুলে দেখতে পেল, পানির ওপর থেকে সেই ধূসর আর রক্তলাল চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা । তার মুখ হাঁ হয়ে আছে । পানির কারণে কেমন বিকৃত দেখাচ্ছে চেহারাটা । তারপরও তাকে দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা । পরমুহূর্তেই চোখের সামনে কালো হয়ে গেল সবকিছু । এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বেচারী ।

সাউথ কিং ড্রাইভে, লিলি ডেভিসদের বাসার বাইরে গাড়ি থামাল ক্রেয়ার। ওর সঙ্গে আছে সোফি রদ্রিগেজ। দুটো খবরের-ভ্যানের পেছনে নিজের সবুজ হোন্ডা সিভিকটা পার্ক করল সে। দুটো ভ্যানের ছাদেই দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা। কিন্তু কোনো সাংবাদিককে নজরে পড়ছে না। দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরা অপারেটরদের কাউকেও।

হালকা তুষারপাত হচ্ছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তুষারের কণা। আকাশটা কেমন অস্পষ্ট আর সাদা হয়ে গেছে।

‘এখানে তো দেখছি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা,’ বলল ক্রেয়ার। একহাতের সঙ্গে অন্য হাত ঘষছে। তাকাল সোফির দিকে। ‘আপনি না এক লোকের সঙ্গে ডেটিং করছিলেন? কী খবর তার? নামটা যেন কী? জেমস, জন, জো...’

‘জেসি। জেসি গ্র্যাবার।’

খিলখিল হাসি শোনা গেল ক্রেয়ারের। ‘তার নাম কি আসলেই সেটা? গ্র্যাবার?’

চোখ উল্টানোর ভঙ্গি করল সোফি। ‘একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি লোকটাকে নিয়ে। নিখাদ ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু না সে। এখন পর্যন্ত চার-চারবার ডেটিং হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু গালে একবার একটুখানি চুমু ছাড়া আর কিছুই পাইনি আমি তার কাছ থেকে। মেয়েমানুষেরও তো চাহিদা বলে কিছু একটা থাকে, নাকি?’

সিটে নড়েচড়ে বসল ক্রেয়ার। রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত তাকাচ্ছে। গ্রেস্টোনের যে-বাড়ির পাশে গাড়ি থামিয়েছে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সেটা। ‘ওটাই তো লিলি ডেভিসদের বাড়ি, না?’

‘হ্যাঁ। ৭৪৮।’

‘ওই মেয়ের স্কুলটা কোথায় যেন?’

জানালা দিয়ে বাইরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিল সোফি ইঙ্গিতে। ‘এখান থেকে চার ব্লক দূরে, পূর্বদিকে। স্কুলটা বলতে গেলে দেখা যায় এখান থেকে।’

তুষারকণার আকার আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছে... ব্রেকফাস্টে যে-সিরিয়াল খেতে পছন্দ করে ক্রেয়ার, এখন সেসবের সমান হয়েছে। কেঁপে উঠল ওর শরীর। জ্যাকেটের জিপার একেবারে গলা পর্যন্ত টেনে দিল। উল দিয়ে মোটা-করে-বোনা বেগুনি একটা মাফলার জড়িয়ে নিল গলায়। মাথায় পরল তুলতুলে গোলাপি ক্যাপ। কাজ শেষে ঘুরে তাকাল সোফির দিকে। একই কাজ করেছে সোফিও।

‘আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, জানেন?’ বলল ক্রেয়ার। ‘গোস্টবাস্টার সিরিজে একটা কাল্পনিক চরিত্র আছে না... স্টে পুফ্ট মার্শম্যালো ম্যান? ঠিক তার মতো।’

দাঁত দেখা গেল সোফির। ‘আর আপনাকে দেখাচ্ছে উইলি ওঙ্কার অনেকদিন-আগে-হারিয়ে-যাওয়া বোনের মতো।’

‘ভালো। চলুন কাজ শুরু করে দিই।’ দরজার হাতল ধরে টান দিল ক্রেয়ার, নামল ফুটপাতে। রাস্তা আর ফুটপাত ইতোমধ্যে ঢেকে গেছে তুষারে, এবং সে-তুষারের উচ্চতা কম করে হলেও দু’ইঞ্চি হবে। এখনও তুষার পড়ছে। কোনাকুনিভাবে যেন ধেয়ে আসছে ক্রেয়ারের দিকে। ওর দিকে গাড়ির-একটা-কোনা ঘুরে এগিয়ে এল সোফি। তার নিঃশ্বাস বাতাসে পাখির পালকের মতো একটা আকৃতি তৈরি করেছে যেন। দু’জনে হাঁটা ধরল পূর্বদিকে, সিন্ধুটি নাইট্‌স্ট্রিট অভিমুখে। তুষারের কারণে কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটছে।

ভার্নন অ্যাভিনিউ পার হলো ওরা। থামল ক্রেয়ার। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ‘আমি যদি কোনো মেয়েকে তুলে নিয়ে যেতে চাইতাম, তা হলে ওই যে... ওই জায়গাটা ভালো একটা স্পট হতে পারত।’

এক ব্লক সামনে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা টানেল দেখা যাচ্ছে। সেখানে স্কাইওয়ে-টা সিন্ধুটি নাইট্‌স্ট্রিটের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। তিনটা ট্রাফিক লেন তিনদিকে চলে গেছে ওই জায়গায়। একেকটা লেনের প্রস্থ কম করে হলেও পনেরো ফুট। প্রতিটা সেকশনে জ্বলছে একটা করে মোট তিনটা লাইট। কিন্তু তাতে অন্ধকার কাটছে না তেমন একটা।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল ক্রেয়ার, সূর্যটা খুঁজছে। ‘সূর্য ওঠার সময় কখন আজ?’

মাথা একদিকে একটুখানি কাত করল সোফি, দুই ভ্রুর মাঝখানে একটা কুণ্ডল দেখা দিয়েছে। ‘সাতটা হবে মনে হয়।’

‘এখন সোয়া ন’টা বাজে। তার মানে, লিলি সেদিন ঘণ্টা দু’-এক আগে এই জায়গা দিয়ে গিয়েছিল। সূর্য ততক্ষণে খানিকটা উঁকি দিয়েছে আর কী। অবশ্য সেদিন সত্যিই দেখা পাওয়া গিয়েছিল কি না সূর্যের, আমি নিশ্চিত না। যা হোক, এই জায়গা এখন বলতে গেলে জনমানবশূন্য। কিন্তু সেদিন যখন স্কুলের সময় হয়ে গিয়েছিল, তখনকার অবস্থাটা হয়তো অন্যরকম ছিল। তারপরও বলবো, বিশেষ কোনো একজনের পক্ষে এখানে গাড়ি পার্ক করাটা কোনো কঠিন কাজ না। তারপর লিলি যখন ফুটপাত ধরে এগোচ্ছিল, তখন তাকে ছোঁ মেরে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছে ওই লোক। আমাকে যদি বলা হয় তা হলে আমি বাজি ধরবো টানেলটার পক্ষে। কারণ এখানকার বাকি সবকিছু একেবারে খোলামেলা।’

আভারপাসের প্রবেশমুখের কাছে হাজির হয়ে গেছে ওরা দু’জন। কঙ্কিটের গায়ে নিজের একটা হাত চেপে ধরল সোফি। ‘এই এলাকায় যারা বাস করে তারা প্রতিবেশী হিসেবে দেখছি ভালো। দেয়ালচিত্র বলতে যা বোঝায়, সে-রকম

কোনোকিছুই নেই এখানকার একটা কোনো দেয়ালে। গৃহহীন মানুষও নজরে পড়ছে না। এখানে কেউ একজন লম্বা একটা সময় ধরে কারও অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, অথচ তাকে দেখতে পায়নি কেউ... আমি কেন যেন সে-রকম কোনোকিছু ভেবে নিতে পারছি না।’

স্কাইওয়ের নিচ দিয়ে একটা ফুটপাথ এগিয়ে গেছে, সেখান দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা দু’জন। দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওদের পায়ের আওয়াজ। অন্য প্রান্ত দিয়ে যখন বেরিয়ে এল ওরা, হাত তুলে দেখিয়ে দিল সোফি। ‘ওই যে, লিলির স্কুল।’

উইলকক্স অ্যাকাডেমি একটা প্রাইভেট স্কুল। এমন একটা দালানে গড়ে তোলা হয়েছে সেটা, যে-দালান এককালে হয় কোনো কারখানা ছিল, নয়তো ছিল কোনো গুদাম। স্কুলের সামনের দিকটা লাল ইটে বানানো। ওই জায়গা দেখলে পরিপাটি বলে মনে হয়। হতে পারে, আজ থেকে মাত্র এক বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছে স্কুলটা। একধারে একটা পার্কিং লট আছে। সেখানে একজায়গায় বড় করে লেখা আছে: ফ্যাকাল্টি ওনলি। গাড়ি দিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে ওই লট। রাস্তার অন্য ধারে দেখা যাচ্ছে একটা পাবলিক লট। সম্ভবত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহার করছে ওটা।

কাচের বড়সড় একটা দরজা আছে স্কুলের সামনের দিকে, সেটা খুলল ক্লেয়ার। তারপর সোফিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। উষ্ণতার একটা তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ল ওদের দু’জনের ওপর।

‘আমি কি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি?’

ঘুরে তাকাল ক্লেয়ার। হাতের বাঁ দিকে একটা টেবিলের ধারে বসে আছে বয়স্ক একজন সিকিউরিটি গার্ড। এক কদম আগে বাড়ল ক্লেয়ার। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ করে উঠল একটা বাজার।

ইঙ্গিতে প্রবেশপথটা দেখিয়ে দিল ওই গার্ড। ‘দরজার পাল্লার সঙ্গে মেটাল ডিটেক্টর লাগানো আছে।’

লোকটাকে নিজের ব্যাজ দেখাল ক্লেয়ার। ‘আমি ডিটেকটিভ নটন। শিকাগো মেট্রোতে আছি। আর ইনি হচ্ছেন সোফি রদ্রিগেজ, মিসিং চিলড্রেন থেকে এসেছেন। নিখোঁজ হয়ে গেছে আপনাদের এক ছাত্রী লিলি ডেভিস, সে-ঘটনার তদন্ত করছি আমরা।’

হাসি দেখা দিয়েছিল সিকিউরিটি গার্ডের চেহারা, উবে গেল সেটা। ‘আজ এখানে আসার সময় শুনলাম ঘটনাটা। ওই মেয়ের পরিবারের জন্য আসলেই খারাপ লাগছে আমার। মেয়েটা ভালো।’

একদিকে একটুখানি কাত হয়ে গেল সোফির মাথা। ‘আপনি চিনতেন ওকে?’

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। ‘এই স্কুল বেশি বড় না। সব মিলিয়ে মাত্র দু’শ’ বাচ্চা হবে। আমি প্রতিদিনই তাদের সবাইকে দেখি। আমি একসময় পিটসবার্গের পুলিশ

ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। ছ'-বছর আগে অবসর নিয়েছি। আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি, বলুন, চেষ্টা করে দেখি।'

'লিলির ব্যাপারে আমাদেরকে কী কী বলতে পারেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

'যেমনটা বলেছি একটু আগে... আমাকে কখনও কোনো ঝামেলায় ফেলেনি ওই মেয়ে। স্কুলে সাধারণত সাড়ে সাতটার মধ্যেই চলে আসত। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কী করে... স্কুলের প্রথম ঘণ্টাটা না পড়ার আগপর্যন্ত ওই পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু লিলি সেটা করত না। সবাইকে ছাড়িয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয়ে যেত নিজের ক্লাসে। ওর বন্ধুবান্ধবও বেশি ছিল না।' একটা হাত নাড়ল গার্ড লোকটা। 'আমার কথা শুনে আবার ভুল বুঝবেন না যেন। অনেকেই পছন্দ করত মেয়েটাকে, যদিও কিছুটা অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিল সে। ওকে দেখলে... অন্তত ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালে যে-কেউ বলে দিতে পারবে, বড় কিছু একটার পরিকল্পনা কাজ করছে মেয়েটার মাথায়। ভাবুক স্বভাবের কিছু মানুষ থাকে না, ওই মেয়ে ছিল ঠিক সে-রকম।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সোফি, নজর রাস্তার গাড়িগুলোর ওপর। 'মেয়েটা কি কারও সঙ্গে গাড়িতে সওয়ার হয়ে আসত স্কুলে?'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'যদি সে-রকম কোনো কাজ করত সে, তা হলে ওকে নজরেই পড়ত না আমার। ওকে যতবার দেখেছি, খেয়াল করেছি, ফুটপাথ ধরে এগিয়ে আসছে... ঠিক যেমনটা আপনারা করেছেন।'

হ্যাট আর স্কার্ফ খুলে ফেলল ক্রেয়ার। 'গ্যাব্রিয়েল ডিগানের কী খবর? ওকে চেনেন আপনি?'

গার্ডের মুখের একটা কোনা একটুখানি বেঁকে গেল। থুঁতনি ডলছে। 'গ্যাব্রি কিছু দোষত্রুটি আছে। কিন্তু এই মেয়েও ভালো। ওর সঙ্গে বেশ খাতির ছিল লিলির।'

'গ্যাবিকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে, বলতে পারেন?'

'ওপরতলায় কল দিচ্ছি আমি। দেখি এমন কাউকে পাওয়া যায় কি না, যে ওই মেয়েকে নিচে নিয়ে আসতে পারবে।' টেবিলের ওপর রাখা ফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গার্ড। 'আপনাদের ওয়ালেট আর গহনগাটি সাবধানে রাখবেন।' চোখ টিপল।

১৩.
পোর্টার
দ্বিতীয় দিন, সকাল ৯:১৪

রেনল্ডসদের বাড়ির পেছনদিকের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার আর ন্যাশ।
তাকিয়ে আছে উঠানের দিকে।

ফুট পঞ্চাশেক দূরে, বাঁ দিকের কোনায়, বড় একটা বার্চ গাছের নিচে, দাঁড়িয়ে
আছে একটা স্লোম্যান। তাকিয়ে আছে পোর্টার আর ন্যাশের দিকে।

পুঁতির মতো কালো দুই চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে একটা স্টোভপাইপ হ্যাণ্ডেলের
নিচে। স্লোম্যানটা লম্বা, কমপক্ষে সাড়ে ছ'ফুট হবে। তার বেশিও হতে পারে
শরীরটা মোটা আর চওড়া। তুষারের কারণে চকচক করছে। ওটার বুকের কাছে
গুঁজে দেয়া হয়েছে লাল একটা গোলাপ।

হাত বানানো হয়েছে গাছের ডালপালা কাজে লাগিয়ে। প্রতিটা হাতে লটকে
দেয়া হয়েছে কালো দস্তানা। কাঠের একটা ঝাড়ু আটকে দেয়া হয়েছে ডানদিকের
হাতটার সঙ্গে। ক্ষণস্থায়ী মুখের এককোণায় গুঁজে দেয়া হয়েছে ভুট্টা দিয়ে বানানো
একটা পাইপ। তুষারে-আবৃত ঘাড় বেয়ে গড়িয়ে নামছে গাঢ় রঙের রক্ত।

তুষার পড়ছে, বাতাস ছেয়ে যাচ্ছে শুভ্র এক অস্পষ্টতায়। দৃশ্যটা খুবই অদ্ভুত
লাগছে। ছবির মতো বলে মনে হচ্ছে। পোর্টারের মনে হচ্ছে, বাচ্চাদের কোনো
গল্পের বইয়ের কোনো পাতার দিকে তাকিয়ে আছে যেন। মনে হচ্ছে, বাস্তবের
কোনো উঠানের দিকে তাকিয়ে নেই সে। ডানদিকে, আরও দূরে, বসানো আছে
একটা দোলনা। উঠানের পেছনে জঙ্গলের বিস্তার।

‘আপনাদের পরিবারের কেউ বানায়নি ওই স্লোম্যান?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

দু’হাত দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস রেনল্ডস। ‘না।’

একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছেন তিনি। কিন্তু একবারের জন্যও চোখ
সরাননি ওই স্লোম্যানের ওপর থেকে... উঠানের সেই আগন্তকের ওপর থেকে।

জ্যাকেটের জিপার খুলল পোর্টার, হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। বের করে আনল
ওর গ্লকটা।

বড় বড় হয়ে গেল ব্র্যাডির চোখ। ‘মা, এই লোক কি গুলি করে ওই
স্লোম্যানকে মেরে ফেলবে?’

‘আমি ওই স্লোম্যানকে গুলি করতে যাচ্ছি না। বরং আশঙ্কা করছি, সে-ই
আমাকে আঘাত করতে পারে,’ চাপা গলায় বলল পোর্টার। ‘তুমি অন্য কাউকে
দেখেছ ওখানে?’

‘না, স্যর।’

‘এক কাজ করো... তোমার মাকে নিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য লিভিং রুমে
চলে যাও। কী মনে হয় তোমার... আমি আর আমার পার্টনার মিলে যতক্ষণে চেক
করবো ওই স্লোম্যান, ততক্ষণ তোমার মায়ের খেয়াল রাখতে পারবে?’

মাথা ঝাঁকাল ব্র্যাডি।

ওই ছেলের ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিল পোর্টার, তাকাল ছেলেটার মায়ের দিকে। ‘যান তা হলে।’

মা-ছেলে চলে যাওয়ার পর ন্যাশের দিকে তাকাল পোর্টার। ‘এখানে থাকো, দূরের ওই গাছগুলোর ওপর নজর রাখো।’

নিজের পিস্তল বের করল ন্যাশ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাচ্ছে জঙ্গলের গাছগুলোর ওপর।

বাসার পেছনের দরজা থেকে নামল পোর্টার। তুষারপাতে হাজির হয়েছে। ওর মনের গভীরে কোনো এক জায়গায় বাচ্চাদের একটা পুরনো গান শুনতে পাচ্ছে যেন।

নতুন-পড়া তুষারের ওপর দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট কিছু পায়ের ছাপ। উঠান পার হয়ে বাসার পেছনদিকের দরজায় হাজির হয়েছে সেগুলো। আরও কিছু ছাপ দেখা যাচ্ছে... স্লোম্যানের দিকে এগিয়ে গেছে। যতখানি সম্ভব ওসব ছাপ অনুসরণ করার চেষ্টা করল পোর্টার। ছোট ছোট পদক্ষেপে এগোচ্ছে, যাতে বাচ্চা ওই ছেলে যেসব ছাপ তৈরি করেছে, সেসবের বাইরে নতুন কোনো ছাপ তৈরি না হয়। রাতের বড় একটা অংশ জুড়ে তুষারপাত হয়েছে। জমিনের ওপর জমাট তুষার ইতোমধ্যে কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ একজন একটা স্লোম্যান বানিয়ে দিয়ে যাবে, অথচ তার কোনো চিহ্ন থাকবে না কোথাও... ব্যাপারটা শ্রেফ অকল্পনীয় মনে হচ্ছে পোর্টারের। স্লোম্যানের হাতে যে-ঝাড়ু ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটার ওপর নজর দিল সে। হতে পারে, যে-ই বানিয়ে থাকুক না কেন ওটা, সে-লোক হয়তো ওই ঝাড়ুর সাহায্যে নিজের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না... লোকটা শেষপর্যন্ত কোনো চিহ্ন না রেখে কী করে ওই ঝাড়ু ধরিয়ে দিল স্লোম্যানের হাতে। আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করল পোর্টার। এই বাসার উঠানটা ফেন্স দিয়ে ঘেরাও করা। চার ফুট উচ্চতার চেইনলিঙ্ক। সামনের উঠানের দিকে একটা দরজা আছে, খোলা।

ওই দরজা থেকে স্লোম্যান বরাবর হালকা একটা ট্রেইল খেয়াল করল পোর্টার। কিন্তু পায়ের চিহ্ন বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কিছু না। বরং দীর্ঘ একটা খাঁজ বললে মানায় বেশি। মনে হচ্ছে, বাসার সামনের দিক থেকে পেছনদিকে ভারী কিছু একটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্লোম্যানের সামনে গিয়ে হাজির হলো পোর্টার, দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

ওটা ওকে ছাড়িয়ে আরও ফুটখানেক ওপরে উঠে গেছে। যে-অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছে পোর্টার, সেখান থেকে ওটার চেহারায় গাছের ভাঙা ডালের সাহায্যে যে-হাসি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেটা দেখে মনে হচ্ছে, দাঁত কেলিয়ে রেখেছে যেন।

পোর্টারের মনে পড়ে যাচ্ছে, যখন ছোট ছিল, তখন এ-রকম শত শত স্লোম্যান বানিয়েছে সে নিজে। ব্যাপারটা তেমন কিছুই না... একটা স্লোবল গড়াতে

থাকলে ওটা একসময় আপনাআপনি তৈরি করে একটা স্নো-বোল্ডার। তখন ওই জিনিস এত ভারী হয়ে যায় যে, আর ধাক্কা দেয়া যায় না। এ-রকম একটা স্নো-বোল্ডারের ওপর তুলনামূলক আরেকটা ছোট বোল্ডার বসিয়ে বানানো হয় স্নোম্যানের মাথা। নিচের বোল্ডারটা ওটার ধড়।

কিন্তু এই স্নোম্যান ও-রকম কোনো কায়দায় বানানো হয়নি।

এটার গায়ে যেসব তুষার দেখা যাচ্ছে, সেসব প্রথমে জমানো হয়েছে কোনো এক জায়গায়। তারপর কেউ একজন, খুব সম্ভব ছেনি আর হাতুড়ির সাহায্যে কুঁদে কুঁদে স্নোম্যানের রূপ দিয়েছে জিনিসটাকে। অর্থাৎ ওই লোক স্নোম্যান বানানোর তুলনামূলক দ্রুত পদ্ধতিটা কাজে লাগায়নি।

এসব চিন্তা একটা মুহূর্তের জন্য খেলে গেল পোর্টারের মাথায়। নজর বোলাচ্ছে স্নোম্যানের মাথা থেকে পাদদেশ পর্যন্ত। ওর দৃষ্টি শেষপর্যন্ত স্থির হলো ওটার ঘাড়ে। লাল একটা বড়সড় দাগ দেখা যাচ্ছে। সাদার পটভূমিতে লাল সেই দাগ দেখে মনে হচ্ছে, ওই জায়গা যেন বিশাল কোনো স্নো-কোন।

হাতের কাছের একটা ওকগাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিল পোর্টার। ভেঙে ফেলা চোখা অংশটা দিয়ে সাবধানে তুষার সরাচ্ছে লাল সেই দাগের কাছে। যে-ই বানিয়ে থাকুক না কেন এই স্নোম্যান, সে কাজ করার সময় তুষারের গায়ে পানি ছিটিয়েছে। ফলে পানি জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে, বরফে পরিণত হয়েছে। ছোট থাকতে এ-রকম একটা কৌশল শিখেছিল পোর্টার। ঠিকমতো যদি বানানো যায়, তা হলে একটা স্নোম্যান পাথরের কোনো মূর্তির মতোই শক্তপোক্ত হয়। মাথা খাড়া করে সারাটা শীতকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আর যদি তুষার ঠিকমতো শক্ত করা না যায়, সূর্যের আলো দেখা দেয়ামাত্র টুকরো টুকরো তুষার খসে পড়তে থাকে ওটার গা থেকে। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, মাঝ-বিকেলের আগেই অর্ধেকটা স্নোম্যান গলে পড়ে আছে জমিনের ওপর।

ওই ডাল কাজে লাগিয়ে বরফ ভাঙতে লাগল পোর্টার। আলাগা তুষারও সরিয়ে দিচ্ছে একইসঙ্গে। খুঁড়তে খুঁড়তে গর্তটা যখন যথেষ্ট গভীর বানিয়ে ফেলল, তখন জিনিসটা নজরে পড়ল ওর।

একজন মানুষের গলা। চিরে ফেলা হয়েছে।



ব্যথা লাগছে।

খুব ব্যথা লাগছে।

খিঁচুনি হলে যেভাবে ঝাঁকি খায় কেউ কেউ, সেভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে লিলির শরীর। পানি বের করে দেয়ার জন্য রীতিমতো যুঝছে ওর ফুসফুস। খাবি খেল সে, দম নিল, যদিও চায় না কাজটা করতে... চায় না আরও পানি ঢুকিয়ে নিতে ফুসফুসে। মরতে চায় না। এবার বাতাসের স্পর্শ পেল ওর ফুসফুস। কেশে উঠল আবারও। ফুসফুস আর গলা থেকে বের করে দিতে চায় আরও পানি। তারপর খাবি খেল আরও একবার।

শীত লাগছে।

প্রচণ্ড শীত লাগছে।

এখন আর পানিতে নেই সে। শুয়ে আছে কঙ্কিটের সেই মেঝেতে।

ঝট করে খুলে ফেলল দুই চোখ।

ওর ওপর ঝুঁকে আছে লোকটা। ওর বুকে দুই হাতের তালু দিয়ে চাপ দিচ্ছে।

চোখাচোখি হলো ওদের দু'জনের। থামল লোকটা। বড় বড় হয়ে গেছে তার চোখ। ঝুঁকে পড়ল খানিকটা। মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছে। এবং সে-গন্ধ যেন ছুটে চলেছে লিলির মুখের ওপর দিয়ে। 'কী দেখতে পেলেন?'

আরও একবার খাবি খাওয়ার কায়দায় কিছু বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিল লিলি। ঢোক গিলল। তারপর আবারও করল একই কাজ।

'ধীরে ধীরে। নইলে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে দম নেয়া শুরু করে দেবে তুমি।' হাত বাড়িয়ে লিলির ডান হাত ধরল ওই লোক। বুড়ো আঙুল চেপে ধরল কজির ওপর। 'তোমার পাল্স এখনও একটু অনিয়মিত বলা যায়। নাক দিয়ে দম নাও। মুখ দিয়ে ছাড়ো। যাকে বলে কিনা স্বাভাবিক ধীরস্থির শ্বাসপ্রশ্বাস।'

নিজের ওপর জোর খাটাল লিলি। ধীর করার চেষ্টা করছে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি... যেমনটা বলেছে ওই লোক। সংবেদনশীলতা টের পাচ্ছে আঙুলের ডগায়, পায়ের পাতায়। কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। কাঁপতে শুরু করল... কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

হাত বাড়িয়ে লেপটা টেনে নিল ওই লোক, ফেলে দিল লিলির গায়ে। 'যে-মুহূর্তে মরে গিয়েছিলে তুমি, তোমার শরীরের তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে সেটা। এবার বলো, কী দেখতে পেলেন?'

একটা অস্পষ্টতা যেন ঝুলে আছে লিলির চোখের ওপর; পিটপিট করে সেটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সে-কাজ করতে গিয়ে ব্যথা লাগছে। এমনকী

ব্যথা লাগছে চোখ খোলা রাখতেও। অস্পষ্ট সেই আলো এখন অত্যাঙ্কল ঠেকছে, অনেক গরম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, চোখ দুটো যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে সে-আলো। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, আলতো একটা চড় বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওর গালে।

মরে গিয়েছিলাম?

‘কী দেখতে পেলেন তুমি?’ আবারও জিজ্ঞেস করল লোকটা। লেপের একটা কোনা দিয়ে ঘষছে লিলির হাত। আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে মোয়েটার হাত দুটো।

‘আমি... আমি মরে গিয়েছিলাম?’ আবারও কেশে উঠল লিলি। বেরিয়ে আসছে পানির শেষ বিন্দুগুলো, আর সে-কারণে যেসব কথা সে বলছে, সেসব যেন ঘষা খাচ্ছে গলার সঙ্গে।

‘ডুবে গিয়েছিলে তুমি। তোমার হৃৎপিণ্ডটা পুরো দুই মিনিটের জন্য কাজ করা থামিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং একঅর্থে বলা চলে, মরে গিয়েছিলে তুমি। আমি ফিরিয়ে এনেছি তোমাকে। এবার বলো, কী দেখতে পেলেন?’

কথাগুলো শুনল লিলি, কিন্তু সেসব আত্মস্থ করতে একটা মুহূর্ত সময় লাগল ওর। মস্তিষ্কটা কেমন যেন মত্ত হয়ে গেছে। সেখানে চিন্তাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে ধীর গতিতে।

ব্যথা করছে বুকটা। গভীর একটা বেদনা অনুভব করছে সে পাঁজরের হাড়গুলোতে। ঠাहर করতে পারল, ওই লোক সম্ভবত কার্ডিয়োপালমোনারি রিসাসিটেশন চালিয়েছে ওর ওপর। এবং সে-কাজ করার মাধ্যমে পানি বের করেছে ওর শরীরের ভেতর থেকে, কিক-স্টার্ট দিয়েছে ওর হৃৎপিণ্ডটাকে। বলল, ‘আমার মনে হয় আপনি আমার পাঁজরের হাড় ভেঙে দিয়েছেন।’

লিলির দু’কাঁধ আঁকড়ে ধরল লোকটা। ওর নিস্তেজ দেহটা ঝাঁকাল। ‘কী দেখতে পেয়েছ তুমি, বলো আমাকে! এখনই বলতে হবে তোমাকে, নইলে ভুলে যাবে পরে! যা দেখেছ, সেটা বেরিয়ে যাবে তোমার মাথা থেকে!’

লিলির বুক এত ব্যথা করছে যে, ওর মনে হচ্ছে, একটা ছুরি যেন ঢুকে যাচ্ছে ওর শরীরের ভেতরে। কঁকড়ে উঠল সে।

ওকে ছেড়ে দিল লোকটা। দূরে সরে গেল। ‘আমি দুঃখিত। দুঃখিত। কথাটা শুধু বলে দাও আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। শুধু বলো আমাকে।’

কী দেখেছিল, ভাবছে লিলি। ওর মন ফিরে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন পানির নিচে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে। যে-মুহূর্তে সে... আসলেই কি ডুবে গিয়েছিল? মনে পড়ে যাচ্ছে, দম নেয়ার চেষ্টা করছিল সে... আসলে পানি ঢুকে পড়ছিল ওর শরীরের ভেতরে তখন। মনে পড়ে যাচ্ছে, চেতনা বলতে যা-কিছু ছিল, সব বিলুপ্ত হচ্ছিল। একটা অন্ধকার ঘিরে ধরেছিল ওকে, মনে পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপর আর কিছু মনে নেই।

‘আমি কিছু দেখতে পাইনি। আমার মনে হয় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।’

‘তুমি মরে গিয়েছিলে।’

‘আমি...’ বলতে গিয়েও থেমে গেল লিলি। কিছুই মনে পড়ছে না আসলে।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা। রক্তলাল দুই চোখ বড় বড় হয়ে আছে। কেমন এক বুনো দৃষ্টি দেখা দিয়েছে সেখানে। মুখের কোনা বেয়ে লাল গড়াচ্ছে।

‘আমার মনে আছে... সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। তারপর আমার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন আপনি। আর কিছু মনে নেই।’

‘কিন্তু কিছু না কিছু তো মনে থাকার কথা তোমার?’

মাথা নাড়ল লিলি। ‘কিছুই মনে নেই।’

মেয়েটার কাঁধ ছেড়ে দিল লোকটা। বড় সেই ফ্রিজে হেলান দিয়ে বসল। খুলে ফেলল পরনের নিট ক্যাপ। হতাশায় মাথা চুলকাচ্ছে।

আরেকবার খাবি খেল লিলি।

সার্জারির নতুন আর বড় একটা কাটাচিহ্ন দেখা যাচ্ছে লোকটার চুলবিহীন চাঁদিতে। চিহ্নটা শুরু হয়েছে বাঁ কানের ওপর থেকে, শেষ হয়েছে মাথার পেছনে এসে। কালো সুতো দিয়ে সেলাই করে দেয়া হয়েছে ক্ষতস্থান। মাংস উঁচু হয়ে আছে ওই জায়গার। কেমন যেন বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে।

ক্যাপ আবার পরে ফেলল লোকটা। ঢেকে ফেলল চাঁদি। উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল নিচের দিকে। টেনে দুই পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল লিলিকে। রক্তের একটা শ্রোত যেন নেমে গেল মেয়েটার মাথা থেকে নিচের দিকে। জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হলো ওর। যেন সাদা একটা চাদর নেমে আসছে চোখের সামনে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে নিজে দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি অর্জন করতে না পারল, ততক্ষণ ওকে ধরে রাখল ওই লোক। তারপর ওকে ধরে নিয়ে এল খাঁচার কাছে, ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। মেয়েটার কাপড়গুলো ছুঁড়ে মারল ভেতরে। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। তারপর জায়গামতো লাগিয়ে দিল তালা দুটো।

‘কাপড় পরে নিতে পারো। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবারও চেষ্টা করবো আমরা। পরেরবার ঠিকই মনে রাখতে পারবে তুমি,’ লিলিকে বলল লোকটা।

সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করল সে। ডান পা-টা শরীরের পেছনে কিছুটা টেনে টেনে হাঁটছে। ‘দুধটুকু খেয়ে নাও। শক্তি দরকার তোমার।’

গ্রাসের দিকে তাকাল লিলি। কোথেকে যেন একটা মাছি উড়ে এসে পড়েছে সেখানে, ডুবে গেছে।

ক্রেয়ার আর সোফিকে পথ দেখিয়ে স্কুলের লবির দূরের এক কোনায় নিয়ে এল সিকিউরিটি গার্ড। তারপর ফোন করল কয়েকটা। এখন যেখানে আছে ক্রেয়ার আর সোফি, সেখানে ছোট একটা বসার-জায়গা আছে। আরও আছে কালো একটা লেদার কাউচ, সঙ্গে ম্যাচ-করা দুটো চেয়ার। একধারে ঝুলছে ছোট একটা সাইন। তাতে লেখা আছে: ফ্রি উইলকম ওয়াই-ফাই... পার্সওয়ার্ড অ্যাভাইলেবল অ্যাট সিকিউরিটি।

একটা পাত্রে বড় একটা গাছ লাগানো আছে, সেটার পাতাগুলো কিছুক্ষণ দেখল ক্রেয়ার। তারপর বলল, ‘এই গাছ এভাবে ঘরের ভেতরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কীভাবে? এখানো তো কোনো আলোই নেই।’

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোফি। ‘ফাইকাস? ওগুলো আসলে আগাছার মতো। যতটুকুই আলো পাক না কেন, তাতেই কাজ চালিয়ে নেয়। মাথার ওপর যে-ফুরোসেন্ট আলো জ্বলছে, হতে পারে ওই গাছ সেটাই গুঁষে নিচ্ছে।’

পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। মুখ তুলে তাকাল ওরা দু’জন। দেখতে পেল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে টিনএজার এক মেয়ে। ওর কাঁধে ঝুলছে বেগুনি রঙের একটা ব্যাকপ্যাক। মেয়েটা তেমন একটা লম্বা না। পাঁচ ফুট কিংবা তার কিছু বেশি হবে। বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। গোলাপি রঙের ছোঁয়া আছে সে-চুলে। ক্রেয়ার আর সোফিকে দেখতে পেয়ে নিজের গতি কমাল মেয়েটা। কেমন সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখন।

‘গ্যাব্রিয়েল ডিগান?’ বলল ক্রেয়ার, তাকিয়ে আছে ওই মেয়ের দিকে।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো বেয়ে নামছে। একটা কোনা ঘুরে এগিয়ে আসতে লাগল বসার-জায়গাটার দিকে। ‘আপনারা লিলির খোঁজ করছেন?’

‘হ্যাঁ,’ বলল সোফি। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল খালি একটা চেয়ার।

সিকিউরিটি গার্ডের দিকে তাকাল ডিগান। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসছে লোকটা। ধপ করে সেই দেখিয়ে-দেয়া চেয়ারটাতে বসে পড়ল ওই মেয়ে। ওর মুখোমুখি কাউচের ওপর বসে আছে সোফি আর ক্রেয়ার।

‘আমি সোফি রদ্রিগেজ, মিসিং চিলড্রেন ডিপার্টমেন্টে আছি। আর ইনি হচ্ছেন ডিটেকটিভ ক্রেয়ার নর্টন, শিকাগো মেট্রো পুলিশে আছেন।’

একটা ব্যাপার খেয়াল করল ক্রেয়ার। সে যে শিকাগো মেট্রো পুলিশের “হোমিসাইড” ডিভিশনে আছে, সেটা বলেনি সোফি।

‘গ্যাবি। আমাকে গ্যাবি বলে ডাকলেই চলবে।’ মাথা ঝাঁকিয়ে দেখিয়ে দিল সিকিউরিটি গার্ডকে। ‘ওই লোক ছাড়া এখানকার আর কেউ আমাকে গ্যাব্রিয়েল বলে ডাকে না। তার নাম আমরা কী দিয়েছি, জানেন? ক্যাপ্টেন ল’ অ্যান্ড অর্ডার, লিলির খোঁজে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু ওই লোক স্কুলের দরজা এত শক্ত করে আটকে রেখেছে যে, আমার মনে হচ্ছে, সে তার মেয়ের সতীত্ব রক্ষা করার বেল্টও অত শক্ত করে আটকায় না।’

সোফির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ক্লেয়ার। হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

‘কোনো কু অথবা ওই জাতীয় কোনো কিছু পেয়েছ?’

গ্যাবির পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম। কিন্তু ক্লেয়ার খেয়াল করল, মেয়েটা ওর সাদা রঙের ব্লাউজ গুঁজে রাখেনি স্কার্টের ভেতরে। স্কার্টটাও দেখে মনে হচ্ছে হেম করে স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে তুলে রেখেছে এক কি দু’ইঞ্চি ওপরে। মেয়েটার কান, জু, ঠোঁট... সবখানেই ছিদ্র আছে অনেক। তবে আপাতত ওর দুই কানে রূপার দুটো ছোট বলয় দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, অন্য কোনো কিছু পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে স্কুলের ড্রেস কোডে।

‘লিলির খোঁজ নেই আজ পুরো এক দিন হয়ে গেল,’ বলতে লাগল গ্যাবি। ‘এমনও হতে পারে, এখন কোনো একটা গর্তে পড়ে আছে সে। আবার এমনও হতে পারে, কোনো একটা বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। হতে পারে, এই কাজ করেছে উন্মত্ত এমন কেউ, যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। আর যদি ফোর মাস্কি কিলারের হাতে পড়ে থাকে বেচারী, তা হলে ওর সঙ্গে কী কী করা হচ্ছে, তা তো ভালোমতোই জানা আছে আপনাদের। ওকে খুঁজে বের করা দরকার আপনাদের।’

‘শেষ কবে অথবা কখন ওর সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

‘বুধবার রাতে। তখন কাজ করছিল সে। ওই গ্যালারি থেকেই আমাকে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছিল সে।’

‘কী বলেছিল?’

‘না, কিছু বলেনি। শুধু নতুন একটা মাসট্যাং গাড়ির ছবি পাঠিয়েছিল। চেরি ফলের মতো লাল গাড়িটা। এককথায় চমৎকার। ওর বাবা বলেছিলেন, আগামী বছর যখন গ্র্যাজুয়েশন করে ফেলবে সে, তখন ওকে একটা গাড়ি কিনে দেবেন। আর তাই আমরা দু’জন একটা কাজ করছিলাম নিজেদের মধ্যে। যেইমাত্র খুঁজে পেতাম, অমনি সুন্দর সুন্দর গাড়ির ছবি পাঠিয়ে দিতাম একজন আরেকজনকে। তবে লিলি কিন্তু নিশ্চিত ছিল না, ঠিক কী চায় সে। ওর বাবা ওকে বলেছিলেন, সব সাবজেঞ্চে যদি “এ” পায় সে, তা হলে যে-গাড়ি কিনতে চাইবে সেটাই কিনে দেয়া হবে ওকে। তিনি আবার একজন ডক্টর। কাজেই আমার মনে হয় যা বলেছেন তিনি, সিরিয়াসলিই বলেছেন। আমি লিলিকে বলেছিলাম, ওর বাবাকে একটা

মাজেরাটির কথা বলতে। কিন্তু বাবার কাছ থেকে অন্যায় কোনো ফায়দা হাসিল করতে চায়নি সে। বরং চেয়েছিল, সুন্দর কোনোকিছু জোগাড় করে নিতে। আরও চেয়েছিল, গাড়িটা যাতে সাশ্রয়ী হয়। আর তাই ওই মাসট্যাঙের ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার কাছে। জবাবে আমি পাঠিয়েছিলাম এটা।

নিজের মোবাইল ফোন সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরেছে গ্যাবি। ঝুঁকল ক্রেয়ার। ‘কী ওটা?’

‘টেলসা রোডস্টার। এখন আর এ-রকম গাড়ি বানায় না প্রতিষ্ঠানটা। কিন্তু গাড়িটা বেশ সুন্দর। পুরো ইলেকট্রিক। দুই দশমিক সাত সেকেন্ডে শূন্য থেকে ষাটে উঠে যেতে পারে গতি। একবার চার্জ দিলে চলতে পারে কয়েক শ’ মাইল।’

রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা নিজের সাত বছরের পুরনো হোন্ডা সিভিকটার কথা স্মরণ হলো ক্রেয়ারের। মনে মনে নোট নিল একটা। বাবাকে ফোন করবে, নতুন একটা গাড়ির কথা বলবে। পয়সা জমিয়ে জমিয়ে নতুন কোনোকিছু কেনার চেয়ে ওই পদ্ধতিই ভালো। ‘দেখতে পারি ওটা?’

ওর হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিল গ্যাবি।

গ্যাবির টেক্সট মেসেজগুলো ঘাঁটছে ক্রেয়ার। সত্যিকারের শব্দ বলতে যা বোঝায়, লিলির সঙ্গে সে-রকম কোনোকিছু আদান-প্রদান করেনি গ্যাবি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিজেদের মধ্যে কিছু গাড়ির ছবি বিনিময় করেছে ওরা দু’জন।

‘লিলি আশা করছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স করিয়ে নেবে তাড়াতাড়ি,’ বলে চলল গ্যাবি। ‘ভেবেছিল, ওই গাড়ি আরেকটু জলদি কেনা যায় কি না সে-ব্যাপারে কথা বলবে ওর বাবার সঙ্গে। গ্রেড স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সব বিষয়ে “এ” পাওয়া ছাত্রী সে। যা হোক, আমরা ভেবেছিলাম, গাড়ি চালিয়ে প্রতিদিন স্কুলে আসা-যাওয়া করতে ভালোই লাগবে... যদিও বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব কয়েক ব্লকের বেশি না।’

ফোনটা গ্যাবিকে ফিরিয়ে দিল ক্রেয়ার। ‘তোমার লাইসেন্স আছে?’

মাথা নাড়ল গ্যাবি। ‘আমার আসলে ও-রকম কোনোকিছু দরকার নেই... অন্তত এখনই না। বাসে বা ট্রেনে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না আমার। এই শহরে রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করাটা বিশাল এক ঝামেলার কাজ। আর তাই আমি ভেবেছিলাম, অন্য কারও গাড়িতে সওয়ার হয়ে চলাফেরা করতে পারলে মন্দ হবে না।’ বাঁকা হাসি দেখা দিয়েছে মেয়েটার চেহারায়। ‘বিশেষ করে সেই গাড়ি যদি টেলসা রোডস্টার হয়।’

‘ও-রকম কোনো কাজ কখনও করেছ তুমি?’ জানতে চাইল সোফি। ‘মানে, অন্যের গাড়িতে চড়ে স্কুলে আসার কথা বলছি।’

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল গ্যাবি। জু চুলকাল। ‘কখনও কখনও। বিশেষ করে যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে, তখন। যেমন যদি জোরে বৃষ্টি হয়। অথবা যদি ভারী তুষারপাত হয়।’

‘গতকাল সকালের ব্যাপারে কিছু বলার আছে তোমার? এ-রকম কি হতে পারে, লিলি সওয়ার হয়েছিল অন্য কারও গাড়িতে?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভাবল গ্যাবি। ‘গতকাল বেশ জোরে তুমার পড়ছিল। কাজেই আমার ধারণা, ব্যাপারটা সম্ভব।’

‘যে বা যারা তাদের গাড়িতে লিফট দিয়ে থাকতে পারে লিলিকে, তাদের নামের একটা তালিকা দরকার আমাদের। কী মনে হয় তোমার... পারবে কাজটা করতে?’ বলল সোফি।

মুখ টিপে হাসল গ্যাবি। ‘আপনারা বোধহয় ভাবছেন এই স্কুলেরই কোনো ছেলে তুলে নিয়ে গেছে লিলিকে? কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানকার কোনো ছেলে যদি ও-রকম কোনো কাজ করার চেষ্টা করে, তার পাছায় জোরে লাথি মারবে লিলি।’

মাথা একদিকে একটুখানি বাঁকা করল সোফি। ‘তা হলে কি কোনো আগন্তুকের গাড়িতে সওয়ার হয়েছিল মেয়েটা?’

‘না।’

‘তা হলে...’ বাকি কথা বলল না সোফি, ঝুলে থাকতে দিল।

সামনের দিকে ঝুঁকল গ্যাবি। ‘স্কুল শুরু হওয়ার আগে সিক্সটি নাইন্থ অ্যাভিনিউটা ভর্তি হয়ে যায় ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে। তাদের কেউ গাড়ি চালাতে থাকে, কেউ আবার হাঁটে। কেউ যদি টেনেহিঁচড়ে কোনো একটা গাড়িতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে থাকে লিলিকে, তা হলে সে-ঘটনা দেখতে পাওয়ার কথা কারও না কারও।’

‘এ-রকম কি হতে পারে, লিলি আগে থেকেই চিনত, এ-রকম কারও গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল?’ বলল ক্লেয়ার। ‘সেক্ষেত্রে কী মনে হয় তোমার... কেউ কি লক্ষ করবে ব্যাপারটা?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্যাবি। ‘জানি না। হতে পারে।’

‘তুমি কি সে-রকম কোনো তালিকা বানিয়ে দিতে পারবে আমাদেরকে? মানে, এ-রকম কারও কথা বলছি আমরা, যে কিনা তার গাড়িতে লিফট দিতে থাকতে পারে তোমার বাস্কবীকে।’

মাথা ঝাঁকাল গ্যাবি। ওর ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল একটা নোটপ্যাড।

১৬.
পোর্টার
দ্বিতীয় দিন, সকাল ১০:২৬

স্লোম্যানের শরীরের ভেতর থেকে পাওয়া গেছে ফ্রয়েড রেনল্ডসকে। লোকটার গলায় গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। কেউ একজন বড়সড় একটা বার্ড ফিডারের ধাতব খুঁটির সঙ্গে প্রথমে বেঁধেছিল লোকটাকে, তারপর তাঁর আশপাশে গড়ে দিয়েছে ওই স্লোম্যান... বরফ আর তুষার দিয়ে ধীরে ধীরে ঢেকে দিয়েছে বেচারাকে।

দৃষ্টিতে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে পোর্টার আর ন্যাশ। ক্রাইম সিন ইনভিস্টেগেশনের একজন অফিসার কাজ করছে। টুকরো টুকরো তুষার সরাচ্ছে লোকটা। কাজটা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যেসব টুকরো কাজে লাগতে পারে বলে মনে হচ্ছে তার, সেসব ঢুকিয়ে ফেলছে ব্যাগের ভেতরে, তারপর ট্যাগ জুড়ে দিচ্ছে। হতাভাগা রেনল্ডসের লাশ একটু একটু করে আরও উন্মোচিত হচ্ছে।

‘অনেক সময় লেগে যাবে,’ চাপা গলায় বলল ন্যাশ।

‘কমপক্ষে কয়েক ঘণ্টা,’ একমত হলো পোর্টার।

‘লোকটা কী করে এই কাজ করতে পারল? মানে... এ-রকম একটা কাজ করে ফেলল সে, অথচ কেউই দেখতে পেল না তাকে?’

ইঙ্গিতে উঠানের চারপাশ দেখিয়ে দিল পোর্টার। ‘এখানে কিন্তু সারি সারি গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। হাতের ডানদিকে লাইন করে লাগানো হয়েছে কিছু গাছ... বেড়া দেয়া হয়েছে আসলে, ফলে এই বাড়ি আড়াল হয়ে গেছে প্রতিবেশীদের নজর থেকে। হাতের বাঁ দিকে আছে কাঠের বেড়া। কেউ যদি আসলেই দেখতে চায় এই জায়গায় কী ঘটছে, তা হলে তাকে গেট দিয়ে ঢুকে পড়তে হবে ভেতরে, হাজির হতে হবে বাড়ির সামনের-দিকের উঠানে। রাস্তা থেকে দেখা যায় না এই জায়গা।’

‘মিসেস রেনল্ডস আগে থেকেই আনমনা ছিলেন। আর ওই লোক যখন স্লোম্যান বানানোর কাজ শুরু করেছিল, ব্র্যাডি সম্ভবত ঘুমাচ্ছিল,’ যা ভাবছে, তা জোরে জোরে আউড়াচ্ছে ন্যাশ।

জমিনের ওপর নজর পড়ল পোর্টারের। সামনের দিকের উঠানের উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে।

ওকে কয়েক কদম সামনে রেখে অনুসরণ করতে লাগল ন্যাশ। পোর্টারের জুতোর ছাপের ওপরই পা ফেলছে, অনেক ছাপ যাতে তৈরি হয়ে না যায় সে-ব্যাপারে সাবধান আছে। এই কাজ যতটা না জরুরি, তার চেয়ে বেশি ওর অভ্যাস। সিএসআই ইতোমধ্যে খোঁজ চালিয়েছে তুষারের ওপর। কিছুই পায়নি।

দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল পোর্টার। থামল একটা মুহূর্তের জন্য। ড্রাইভওয়েতে পার্ক করে রাখা আছে রূপালি রঙের একটা লেক্সাস এলএস, এগিয়ে গেল

সেদিকে। বাড়ির একধারে পার্ক করা হয়েছে গাড়িটা, সামনের দিকের দরজা থেকে দেখা যাচ্ছে না। মিসেস রেনল্ডস ভেবেছিলেন, তাঁর স্বামী বাইরে কোথাও গিয়েছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে তা হলো, এই গাড়ি গিয়ারে দেয়ার মতো সময়টুকুও পাননি ওই লোক।

‘রহস্যময় সেই লোক কী করেছে, জানো?’ বলছে পোর্টার। ‘গাড়ির পেছনের দরজা খুলে চুপিসারে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, ঘাপটি মেরে বসে থেকেছে ড্রাইভারের সিটের পেছনে। সেখানেই লুকিয়ে ছিল সে। তারপর একসময় হাজির হলেন রেনল্ডস। মিসেস রেনল্ডস বলেছেন, তাঁর স্বামী নাকি ডিনারের পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তার মানে হচ্ছে, তখন অন্ধকার ছিল। যা হোক, খুনি লোকটা অপেক্ষা করছিল রেনল্ডসের জন্য... কখন গাড়িতে উঠে বসবেন তিনি। কাজটা করলেন তিনি, সিট বেল্ট বেঁধে নিলেন, লাগিয়ে দিলেন দরজাটা। খুনি লোকটা এগিয়ে এল তখন, কিছু একটা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল রেনল্ডসের গলা। সেটা হতে পারে পিয়ানোর তারের মতো কোনো জিনিস। মিস্টার রেনল্ডসের গলায় যে-স্বত তৈরি হয়েছে, সেটা দেখেই বললাম কথাটা।’ বলতে বলতে গাড়ির পেছনের সিটে উঠে পড়ল সে। যেসব কাজের কথা বলেছে এইমাত্র, সেসব অভিনয় করে দেখাল স্লো মোশনে।

নজর বোলাচ্ছে ড্রাইভারের সিটের পেছনদিকে। ‘এখানে সিট কভারের লেদারের গায়ে একটা জুতোর-ছাপ দেখতে পাচ্ছি। দেখে মনে হচ্ছে, এই ছাপ মুছে দেয়ার চেষ্টা করেছিল খুনি। কিন্তু কিছুটা অংশ মুছতে পারেনি সে। উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সে তার একটা পা চেপে ধরেছিল সিটের গায়ে।’

‘সিএসআই বলেছে, এটা একটা ওয়ার্ক বুটের ছাপ। সাইজ এগারো। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান বানিয়েছে ওটা, জানা যায়নি,’ বলল ন্যাশ।

‘এভাবে কোনো একটা মানুষকে খুন করতে হলে গায়ে অনেক জোর থাকতে হবে। মিস্টার রেনল্ডস নিশ্চয়ই ধস্তাধস্তি করেছেন, বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, ওই তারের ফাঁসের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যা হোক, যে-অ্যাসেল থেকে যত জোরে ফাঁস পরিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁর গলায়, পুরো ব্যাপারটাই তাঁর বিরুদ্ধে গেছে,’ বলল পোর্টার।

গাড়ির ব্যাকসিট থেকে নামল পোর্টার। খুলল সামনের দিকের দরজা। ‘উইন্ডশিল্ড আর ড্যাশবোর্ডের ওপরও লেগে আছে রক্তের ছিটা।’

স্টিয়ারিং হুইল আর দরজাটা ছেয়ে আছে কালো রঙের ফিঙ্গারপ্রিন্ট-পাউডারে। ‘আমাদের সেই রহস্যজনক লোক খুন করল মিস্টার রেনল্ডসকে। তারপর বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। হাজির হলো গাড়ির সামনের দিকে। দু’কাঁধ আঁকড়ে ধরল রেনল্ডসের। টানতে টানতে বের করল তাঁকে, টানতে টানতেই নিয়ে চলল সারাটা পথ।’

আরও একবার পুরো ব্যাপারটা অভিনয় করে দেখাল পোর্টার। পিঠ কুঁজো হয়ে আছে ওর। এমন ভান করছে, যেন অদৃশ্য কোনো শরীর বহন করে নিয়ে

চলেছে তুষারের ওপর দিয়ে। এভাবে এগোতে এগোতে হাজির হয়ে গেল স্লোম্যানের অবশিষ্টাংশের সামনে। রেনল্ডসের শরীরটা এখন সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব তুষার আর বরফ। স্লোম্যানের শরীর গড়ে তোলার জন্য যেসব অবলম্বন ব্যবহার করা হয়েছিল, সেসব পড়ে আছে জমিনের ওপর। পড়ে আছে স্টোভপাইপ হ্যাটটা, কালো গ্লাভস জোড়া, আর সেই ঝাড়ুটা। ‘এই ঝাড়ু ওই লোক কেন ব্যবহার করেছিল, জানো? ট্রাক বলতে যা-কিছু ছিল তার, সব মুছে ফেলার জন্য। বাকি কাজ করে দিয়ে গেছে গতরাতের তুষার।’

‘আমাদের ধারণা, লোকটা হেঁটে গিয়ে ঢুকে পড়েছে ওই জঙ্গলে,’ বলল একজন সিএসআই অফিসার। এই মহিলার সঙ্গে জ্যাকসন পার্ক লেগুনের ক্রাইম সিনে দেখা হয়েছিল পোর্টার আর ন্যাশের।

সম্মতি জানানোর কায়দায় মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। ‘আমি যদি ওই লোকের জায়গায় থাকতাম, তা হলে একই কায়দায় কেটে পড়তাম এখান থেকে। তুমি লিভসি, না?’

‘হ্যাঁ, স্যর,’ জবাবে বলল রোব্বস। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাওয়া জমিনটা। ‘ওই গাছগুলোর নিচে যে-তুষার জমেছে, সেসব অত পুরু না। কিন্তু লোকটা করেছে কী... ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে ফেলেছে সব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, কোনো গাছের ডাল অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা ব্যবহার করেছে সে। তবে যা-ই ব্যবহার করে থাকুক না কেন, সেটা ঝাড়ুর মতো অত কার্যকর না। অস্পষ্ট একটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি আমরা। হায়াসিন স্ট্রিটের এক ব্লক দূর থেকে এসেছে ট্রেইলটা। হতে পারে, লোকটা তার গাড়ি পার্ক করেছিল ওখানে।’

‘টায়ারের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেছে?’

মাথা নাড়ল রোব্বস। ‘অচেনা সেই লোকের গাড়ি চিহ্নিত করার মতো কিছু খুঁজে পাইনি আমরা। ইউনিফর্ম পরিহিত দু’জন পুলিশ অফিসার যাচ্ছে আশপাশের প্রতিটা বাড়ির দরজায় দরজায়... জিজ্ঞেস করবে, গতকাল রাতে এখানে পার্ক করা অবস্থায় কোনো গাড়ি দেখেছে কি না কেউ।’

বেজে উঠল পোর্টারের ফোন। ডিসপ্লের ওপর নজর বুলিয়ে নিল সে। ‘ক্যাপ্টেন।’

‘জবাব দেবে?’

‘না।’

ক্রুঁচকে ফেলল ন্যাশ, মুখ খারাপ করে গালি দিল। ‘জবাব না দেয়ার মানে কী, সেটা কিন্তু ভালোমতোই জানা আছে তোমার।’

নীরব হয়ে গেল পোর্টারের ফোনটা। এক মুহূর্ত পর বেজে উঠল ন্যাশের ফোন।

আরও একবার গালি দিল সে।

‘লোকটাকে বলে দাও, আমরা এখনও ক্রাইম সিনে আছি। এখানকার কাজ শেষ হলেই ফিরে যাবো,’ বলল পোর্টার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ন্যাশ, জবাব দিল সেই ফোনকলের।

এমন সময় ওদের পেছন থেকে চেষ্টা করে উঠল কোনো একজন মহিলা।

ঘুরে তাকাল পোর্টার। দেখতে পেল, বাড়ির পেছনদিকের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস রেনল্ডস। ‘আমি না বলেছিলাম ওই মহিলা আর তাঁর ছেলেকে লিভিং রুমেই রাখতে? এসব দেখা উচিত না তাঁর।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ। সরে গেল ওই বাড়ির কাছ থেকে। ফোনটা এখনও চেপে ধরে রেখেছে কানের সঙ্গে।

চাকা-লাগানো চেয়ারে হেলান দিল ক্লেয়ার, ক্যাচকোঁচ আওয়াজ করে উঠল সেটা। আর্মরেস্টের চিড়-ধরে-যাওয়া সবুজ চামড়ায় চিমটি কাটল। হাত বাড়িয়ে ধরল কফির কাপ, টেনে নিল নিজের দিকে।

খালি হয়ে গেছে ওটা।

ধেং।

‘আরেক কাপ লাগবে নাকি?’ জিজ্ঞেস করল সোফিকে।

সোফির হাতে একটা নোটবুক, নজর বোলাচ্ছে সেটার ওপর। চোখ তুলে তাকাল। ‘আমার লাগবে না। আর মাত্র দুটো বাকি আছে। চলুন কাজ শেষ করে ফেলি যাতে বেরিয়ে পড়তে পারি এখান থেকে।’

গ্যাবি ডিগানের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসের দ্বিতীয় তলায় গিয়েছিল ওরা দু’জন। সেখানে ওদেরকে ফ্রন্ট ডেস্কের নরিন আউটেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় গার্ড লোকটা। ওদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল মেয়েটা, মুখে ছিল জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসি। চোখে পুরু কাচের চশমা; সেটা এত ভারী যে, ওজনের কারণে লাল দাগ ফেলে দিয়েছে ওই মেয়ের নাকের ওপর।

নিজেদের পরিচয় দেয় ওরা। দুটো কাজে পাঠিয়ে দেয় মেয়েটাকে। এক, গ্যাবি যে-তালিকা দিয়েছে, সে-অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জড়ো করা (মোট নামের সংখ্যা ষোলো)। দুই, অ্যাটেনডেন্স রেকর্ড চেক করা। আসলে এমন কাউকে খুঁজছিল ওরা, যে সেদিন ক্লাসে আসতে পারিনি। হতে পারে, সেই ছাত্র অথবা ছাত্রীই তুলে নিয়ে গেছে লিলিকে।

মেয়েটা নিজের হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বেরিয়ে যায়। ততক্ষণে অফিসের বাইরে, হলওয়াতে, লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছে ষোলোজন ছাত্র-ছাত্রী। এখন পর্যন্ত তাদের চোদ্দজনের কথা শোনা শেষ, বাকি আছে কেবল দু’জন। সেদিন সকালে লিলিকে দেখেছিল কি না, মনে করতে পারছে না ওই চোদ্দজনের কেউই। মনে করতে পারছে না, হেঁটে স্কুলে আসতে দেখেছে কি না মেয়েটাকে, অথবা স্কুল বিল্ডিংয়ের ভেতরে কোথাও দেখেছে কি না।

‘এরপর কে?’

গ্যাবির দেয়া সেই নোটের দিকে তাকাল সোফি। ‘ম্যালকম লেফিংওয়েল। আর লিয়ো গুনিয়া।’

লিয়োর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল ক্লেয়ার।

স্কুলের অন্য যেসব ছেলের সঙ্গে ইতোমধ্যে কথা বলেছে ক্লেয়ার আর সোফি, তাদের মতোই লিয়ো গুনিয়ার পরনে সাদা শার্ট, নেভি প্যান্ট আর নীল স্ট্রাইপের

টাই। কালো চুল সুন্দর করে ছাঁটিয়ে রেখেছে সে। ওর খুঁতনির নিচে দাড়ির হালকা উপস্থিতি আছে।

জোর করে হাসি চাপল ক্রেয়ার। ‘বসো, লিয়ো, প্লিজ।’

নিজেদের পরিচয় আরও একবার দিল সোফি। কেন এসেছে এখানে, জানাল ওদের চোখে চোখে তাকিয়ে আছে লিয়ো। মাথা ঝাঁকানো। ‘সারা স্কুল এক এটা নিয়েই কথা বলছে।’

‘তাই নাকি? কী বলছে?’ জানতে চাইল সোফি।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। ‘বলছে, কেউ একজন নাকি তুচ্ছ নিয়ে গেছে লিলিকে। তখন নাকি মেয়েটা স্কুলে আসছিল। যে-লোক অপহরণ করেছে, তার পরিচয় নিয়েও কথা হচ্ছে... ফোর মাস্কি কিলার।’

‘না, কাজটা ফোর মাস্কি কিলারের না,’ বলল ক্রেয়ার।

আবারও অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লিয়ো। ‘কেউ না কেউ তো করেছে কাজটা।’

‘সেদিন সকালে লিলিকে দেখেছিলে তুমি?’

কিছু বলল না লিয়ো। দৃষ্টি নামিয়ে তাকাল মেঝের দিকে।

‘লিয়ো?’

‘আমার থেমে দাঁড়ানো উচিত ছিল। বাইরে এত ঠাণ্ডা, ওই মেয়ে যেখানেই থাকুক না কেন মনে হয় জমে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি ক্লাসে আসাটাই দরকার ছিল আমার। একটা পরীক্ষা ছিল, সেজন্য প্রস্তুতি নিতে চেয়েছিলাম। আগের রাতে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, পড়ার মতো সময় পাইনি।’

চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সামনের দিকে ঝুঁকল ক্রেয়ার। ‘তার মানে হচ্ছে, মেয়েটাকে দেখেছিলে তুমি। কোথায়?’

‘সিক্সটি নাইভ অ্যাভিনিউতে। ওভারপাসের ঠিক আগে।’ মুখ তুলে তাকাল লিয়ো। চোখ ছলছল করছে। ‘ঠাণ্ডায় কুঁজো হয়ে ছিল মেয়েটা। বেশ ভারী তুষারপাত হচ্ছিল তখন। একেবারে শেষ মুহূর্তে ওকে দেখেছিলাম আমি। কী ঘটে গিয়েছিল, জানা ছিল না আমার। থেমে দাঁড়ানোর কথা ভেবেছিলাম একবার। ব্রেড প্যাডেলের দিকে এগিয়েও গিয়েছিল আমার পা। কিন্তু পরীক্ষার কথাটা মনে পড়ে যায় তখন। ঘড়ির ওপর নজর বুলিয়ে নিই আমি। ততক্ষণে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে আমার। তার মানে হচ্ছে, পড়ার জন্য হাতে মাত্র মিনিট বিশেক সময় ছিল। গাড়ি পার্ক করা, স্কুলের ওপরতলায় হাজির হওয়া... এসব কাজে সময় খরচ হয়ে যাবে আরও। যা হোক, শেষমুহূর্তে মেয়েটাকে দেখি আমি। চাইলেও তখন থামা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ফিরে যাওয়ার মতো সময়ও ছিল না। ধরেই নিয়েছিলাম, অন্য কেউ একজন তার গাড়িতে লিফট দেবে মেয়েটাকে।’

সোফির দিকে তাকাল ক্রেয়ার। তারপর তাকাল লিয়োর দিকে। ‘ওই মেয়ের জন্য থেমে দাঁড়াতে দেখেছিলে কাউকে?’

মাথা নিচু করল লিয়ো। ‘না। আমার পেছনে তখন যে-গাড়ি ছিল, সেটার চালক যদি সে-রকম কোনো কাজ করেও থাকে, তবুও আমি দেখতে পেতাম কি না, সন্দেহ আছে। কারণ ও-রকম কোনো কথা ভাবছিলাম না আমি। তা ছাড়া যে-হারে তুষার পড়ছিল...। আমি যদি নিজের গাড়িতে তুলে নিতে পারতাম মেয়েটাকে, তা হলে এখন হয়তো ঠিকই থাকত সে। সব দোষ আমার।’

সোফি জানতে চাইল, ‘তুমি ঠিক ক’টায় দেখেছিলে ওই মেয়েকে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়ো। ‘সাড়ে সাতটা।’

‘তুমি নিশ্চিত?’

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। ‘ওই পরীক্ষায় “এ” পাওয়াটা জরুরি ছিল আমার জন্য। আর তাই সেদিন সকালের প্রতিটা মুহূর্ত গণনা করছিলাম আমি।’

‘শেষপর্যন্ত কী রেজাল্ট করেছ?’

আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা লিয়োর। ‘বি মাইনাস।’

লিয়োর কন্ট্যাক্ট ইনফর্মেশন রেখে দিল ক্লেয়ার। নিজের একটা কার্ড দিল ওই ছেলেকে। তারপর ওকে ক্লাসে ফিরে যেতে বলল।

এরপর ম্যালকম লিফিংওয়েলের পালা। সে বলল, গত একটা সপ্তাহ নাকি লিলির সঙ্গে দেখাই হয়নি ওর।

এমন সময় দরজা দিয়ে নিজের মাথাটা গলিয়ে দিল নরিন আউটেন। ‘সবার সঙ্গে কথা বলা শেষ হয়েছে?’

উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার। টান টান করে দিল পিঠটা। ‘হ্যাঁ, ম্যা’ম। অ্যাটেনডেন্স রেকর্ড ঘেঁটে কিছু পাওয়া গেল?’

ভারী চশমাটা ঠেলে নাকের ওপরের দিকে তুলে দিল নরিন। ছোট একটা নোটবুক খুলে পাতা উল্টাতে লাগল। ‘সেদিন আমাদের দু’জন স্টুডেন্ট অসুস্থ ছিল। তাদের শরীর খারাপের খবর ফোন করে জানিয়েছিল তাদের মায়েরা। একজনের নাম রবিন স্ট্যাটস। অন্যজন রোজালি নিউহাউস। সেদিন প্রথম পিরিয়ডে দেরি করে আসেনি কেউ। আমাদের এখানে যারা পড়ালেখা করে তারা সবাই ভালো। কেউ কোনো খারাপ কাজের সঙ্গে জড়াবে না নিজেকে।’

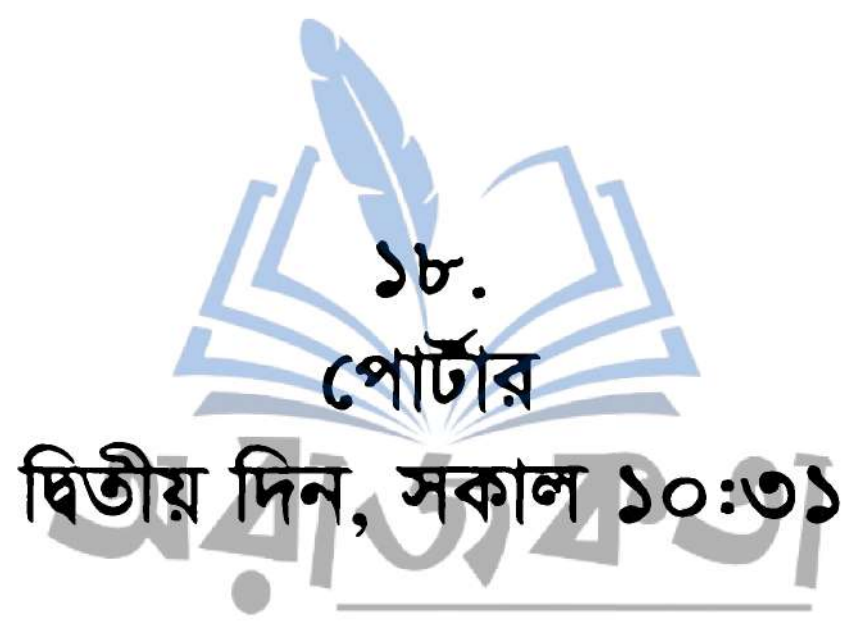
মাথা ঝাঁকিয়ে নোটপ্যাডটা দেখিয়ে দিল সোফি। ‘ওই দু’জন মেয়ের কেউ কি লিলিকে চেনে?’

নরিন বলল, ‘একটু ভেবে দেখি। রবিন নতুন এসেছে স্কুলে। আর রোজালি জুনিয়র। কাজেই, হতে পারে, লিলিকে চেনে ওরা। তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।’

‘এই দু’জনের সঙ্গেও কথা বলতে হবে আমাদেরকে,’ বলল সোফি।

মাথা ঝাঁকাল নরিন।

চেয়ারে হেলান দিল ক্লেয়ার। এই চেয়ার এখন সুতো কাটার চরকির মতো মনে হচ্ছে ওর।



‘ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, কিন্তু সেটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে কেন?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

ওর দুটো হাতই স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে গেছে।

চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, ওর চার্জার গাড়ির ছাদে বসিয়ে-রাখা লাল-নীল আলো জ্বলছে-নিভছে। ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ ছাপিয়ে তারস্বরে চেষ্টাচ্ছে সাইরেনটা। আই-নাইন্টি ফোর রাস্তায় একাশি কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

ওর পাশে বসে আছে ন্যাশ। “আরে সর্বনাশ” জাতীয় একটা ভগ্নি ফুটে আছে ন্যাশের চেহারায়ে। ডান হাতে আঁকড়ে ধরেছে দরজার হাতল, বাঁ হাত দিয়ে খামচে রেখেছে নিজের সিটের একটা কোনা। ‘সে-রকম কোনো কথা কিন্তু বলেননি তিনি। আমিই বরং কথাটা বের করে আনার চেষ্টা করছিলাম তাঁর মুখ থেকে। তিনি যা বলেছেন তা হচ্ছে, “পোর্টারকে এখনই ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওর অ্যাপার্টমেন্টে।”’

স্টিয়ারিং হুইল ধরে বাঁ দিকে একটা মোচড় দিল পোর্টার, বিপজ্জনক কায়দায় পাশ কাটাল একটা গ্যাস ট্রাককে। ‘তাঁর কণ্ঠ শুনে কী মনে হলো? রেগে গেছেন তিনি? নাকি মন খারাপ করেছেন? নাকি ভুগছেন দুশ্চিন্তায়?’

অনিশ্চিত ভগ্নিতে কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘তাঁর গলা শুনলে সবসময় যা মনে হয়, তেমনই মনে হয়েছে আমার। ওই মানুষটার মনে আসলে কী চলছে, সেটা কখনোই ঠাহর করতে পারি না আমি।’

‘ধেৎ!’ হর্নের ওপর চাপড় বসিয়ে দিল পোর্টার। চেপে ধরে রাখল ওটা। নীল রঙের একটা প্রিয়াস হাজির হয়ে গেছে ওর গাড়ির সামনে।

‘তোমার বাসায় কি এমন কিছু আছে যা জানা উচিত আমার? সেখানে কেন দেখা করতে চাইবেন ক্যাপ্টেন?’

ডানদিকের ইন্ডিকেটর লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রিয়াসের ড্রাইভার। অলস এক কায়দায় পাশের লেনে ঢুকে পড়ল গাড়িটা। ওটা সামনে থেকে সরে যাওয়ামাত্র নিজের গাড়ির গতি বাড়াল পোর্টার।

‘স্যাম?’

‘জানি না।’

অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল ন্যাশের গলা দিয়ে। ‘তোমার বাসায় এমন কিছু আছে কি না যা জানা উচিত আমার... সে-রকম কোনো কিছু জানো না তুমি? স্যাম,

ফালতু কথা বাদ দাও তো। আমি তোমার পার্টনার। আমাকে বলতে পারো কথাটা। হিদারের মৃত্যুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না ওই জিনিষের?’

কিছু বলল না পোর্টার।

লেক শোর ড্রাইভে হাজির হওয়ার পথ ধরল।

ক্যাপ্টেনের গাড়িটা সাদা রঙের ক্রাউন ভিক। ওটা ছাড়াও আরও তিনটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। এগুলোর কোনোটা কার, চিনতে পারল না পোর্টার। সব গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে ওর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে। ওই তিনটা গাড়ির দিকে আরও একবার তাকাল সে। কালো রঙের দুটো সেডান। অন্যটা একটা ভ্যান। সব গাড়িতেই এফবিআই-এর নম্বর প্লেট লাগানো আছে। নিজের গাড়ি এমনভাবে পার্ক করল, যেন রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় ভ্যানটার। সাইরেন বন্ধ করল। কিন্তু সেই লাল-নীল আলো নেভাল না। নামল গাড়ি থেকে। দ্রুত পায়ে এগোতে লাগল সিঁড়ির দিকে। ওর ঠিক পেছনেই আছে ন্যাশ।

হলওয়াতে দেখা পাওয়া গেল লোকগুলোর... ক্যাপ্টেন ডাল্টন, স্পেশাল এজেন্ট ডিনার, এজেন্ট পুল, এবং এজেন্ট ইনচার্জ হার্লস। সবাই এফবিআই-এর অফিসার, ফোর মাস্কি কিলার টাস্ক ফোর্সের। এফবিআই-এর দু’জন ক্রাইম সিন টেকনিশিয়ানকেও দেখা গেল। তাদেরকে চিনতে পারল না পোর্টার।

দরজা ঠেলে পোর্টার আর ন্যাশকে ঢুকতে দেখলেন ডাল্টন, রীতিমতো ছুটে এলেন। ‘তুমি কোন ছাতার মাথাটা ভাবছিলে, স্যাম, বলো তো?’

‘মানে?’

‘আমার কথার মানে কী, ভালোমতোই জানা আছে তোমার।’

পোর্টারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশ। কিছু বলছে না।

নিজের মোবাইল ফোন বের করলেন ডাল্টন। কয়েকটা ছবি আনলেন স্ক্রিনে। তারপর ওই স্ক্রিন ধরলেন পোর্টারের চোখের সামনে। ‘এই কেস তা হলে এ-কারণে নিয়েছ তুমি? খোঁজ করছ ওই মহিলার?’

স্ক্রিনের দিকে তাকাল পোর্টার। বিশপের সেই নোটটা দেখা যাচ্ছে। ওটা বিশপ রেখে গিয়েছিল পোর্টারের বিছানায়। পোর্টারের স্ত্রীকে খুন করেছিল যে-লোক, তার একটা কাটা-কান ছিল নোটটার সঙ্গে।

স্যাম,

আপনার জন্য আমার পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা উপহার...

ছেলেটা খুব চেষ্টাচ্ছিল; দুঃখ লাগছে, তার সেই চিংকার

শোনানো গেল না আপনাকে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৯৯

অরাজকতা

অরাজকতা

একটা উপকার করলাম আমি আপনার, বিনিময়ে কিছু কি চাইতে পারি?

ওই যে, কথায় আছে না, টিলিটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়... আমি আর আপনি তো বন্ধু; ধরে নিন বন্ধুত্বের খাতিরে সে-রকম কিছু একটা চাইছি আপনার কাছে।

আমার মাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করুন আমাকে।

তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা বলার সময় হয়েছে মনে হয়।

বি

‘তুমি খোঁজ করছ ওই মহিলার?’ একই কথা আবারও জিজ্ঞেস করলেন ডাল্টন।

লম্বা করে দম নিল পোর্টার। ‘আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি বিশপকে।’

‘সেটা তোমার কাজ না,’ বললেন ডাল্টন, রাগে ফুঁসছেন। ‘একটা কথা বলো তো। ইতোমধ্যে কি ওই ছোকরার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তোমার? কোনো রকম যোগাযোগ কি সে করেছে আদৌ?’

‘না।’

‘যদি করত, আমাকে বলতে সে-কথা?’

‘অবশ্যই বলতাম।’

পুরু বাদামি কোটের পকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে ফেললেন ডাল্টন। ‘তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই আমি। কিন্তু সেটা আর করতে পারবো কি না, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না।’

পুলের দিকে তাকাল ন্যাশ, ক্র কুঁচকে গেছে। ‘আপনাদের কাহিনি কী?’

আত্মরক্ষা করার কায়দায় হাত তুলল পুল, কিন্তু কিছু বলল না।

ডাল্টনের কপালে ভাঁজ পড়ল। ন্যাশের উদ্দেশে বললেন, ‘সে কিছু করেনি। বরং কাজ যা বাড়ানোর তা বাড়িয়েছে তোমার বন্ধুই। সিকিউরিটি ভিডিওতে ধরা পড়েছে সে। তাতে ওকে দেখা গেছে, চুপিসারে ঢুকে পড়েছে এফবিআই-এর অফিসে... আজ সকালে।’

‘এমনও তো হতে পারে, এফবিআই-এর ওপর একটুখানি চাপ তৈরি করার চেষ্টা করেছে পোর্টার আসলে,’ বলল ন্যাশ। বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচা মারার কায়দায় দেখিয়ে দিল ডিনারকে। ‘এই সবেধন নীলমণি কী করেছেন, সেটা জানেন তো? আজ সকালে ঢুকে পড়েছিলেন আমাদের অফিসে, সোজা গিয়ে বসে পড়েছিলেন আমার ডেস্কে। আসল কথা কী... ওই অফিসে আমরা সবাই বড় একটা পরিবারের মতো। প্রয়োজনের সময় সবকিছুই ভাগাভাগি করে নিই নিজেদের মধ্যে।’

স্পেশাল এজেন্ট ইনচার্জ হার্লস এককদম আগে বাড়ল। ‘আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে চলে না যাচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের অফিস একটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।

কাজেই সেখানে বিনা-অনুমতিতে চুপিসারে ঢুকে পড়াটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে-কাজ যদি স্থানীয় কোনো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কোনো অফিসারও করে থাকে, তবুও।’

‘বারবারা ম্যাকিনলের ফাইলটা নিয়েছি আমি,’ বলল পোর্টার।

চোখ উল্টানোর কায়দা করলেন ডাল্টন।

আগে বাড়ল হার্লস। ‘রাষ্ট্রীয় কোনো সম্পত্তি চুরি করার দায়ে আলাদাভাবে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে আপনার বিরুদ্ধে। এবং সেটা একই রকম একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।’

‘আমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ামাত্র ওই ফাইল ফিরিয়ে দেবো।’

‘ওই ফাইল আপনি এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দেবেন। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেবো, আপনার ব্যাজ নিজের কাছে রাখতে পারবেন কি না,’ বলল হার্লস।

লাল হয়ে গেছে ডাল্টনের চেহারা। ঘুরলেন হার্লসের দিকে। ‘ডিটেকটিভ পোর্টারের ব্যাজের কী হবে না-হবে, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র এখতিয়ার কিন্তু আমার। আপনারা এখানে মেহমানের মতো। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তা হলে মনে করিয়ে দিতে চাই, একটামাত্র ফোনকলে আপনাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারি আমি।’

আরও এককদম আগে বাড়ল হার্লস। ‘ক্যাপ্টেন, একটা কথা খোলাখুলি বলে দিতে চাই। আমরা এই শহরে হাজির হয়েছি, কারণ আপনার স্বনামধন্য গোয়েন্দা সাহেব একজন সিরিয়াল কিলারকে ছেড়ে দিয়েছেন, বেফিকির চলে যেতে দিয়েছেন। তাঁর সেই ভুলের কারণে আরও অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটবে। বড় একটা সম্ভাবনা আছে, ইতোমধ্যেই সে-রকম ঘটনা ঘটে গেছে। লাশ পাওয়া গেছে একটা মেয়ের। আরেকটা মেয়ে এখনও নিখোঁজ। এই দুটো অপরাধের সঙ্গে সম্ভবত জড়ানো যেতে পারে একটা মাত্র লোককে। অথচ আপনি কী করেছেন? আনাড়ি একজন গোয়েন্দার হাতে তুলে দিয়েছেন এই কেসের তদন্তভার। তো, এবার সেই গোয়েন্দা কী করেছেন? ফাইল চুরি করে বেড়াচ্ছেন। পুরো ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলার সময় হয়েছে... এ-রকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে, আর কত মানুষের রক্তে নিজের হাত রাঙাতে চান আপনি?’

‘ফোর মাস্কি কিলার তুলে নিয়ে যায়নি ওই মেয়ে দুটোকে,’ নিচু গলায় বলল পোর্টার।

‘যথেষ্ট হয়েছে,’ রীতিমতো গর্জন করে উঠলেন ডাল্টন।

‘এই লোক আর কী কী লুকিয়ে রেখেছেন, জানতে চাই আমি,’ বলল হার্লস। ‘অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলুন।’

নিজেকে আর সামলাতে না পেরে গালি দিয়ে ফেলল ন্যাশ। তারপর বলল, ‘থামুন! যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ওয়ার্যান্ট নিয়ে আসছেন আপনারা, ততক্ষণ এখানে কোনো কাজ নেই আপনাদের।’

আঙুলে গুনতে শুরু করে দিয়েছে হার্লস। ‘রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চুরি করা। রাষ্ট্রীয় কোনো তদন্তকাজে বাধা দেয়া। রাষ্ট্রীয় একজন আসামিকে পালিয়ে যাওয়ার কাজে সহায়তা প্রদান করা এবং প্ররোচনা দেয়া। আপনার বন্ধুর চাকরি থাকে কি না, সেটাই তো এখন তাঁর চিন্তার বিষয় হওয়ার কথা।’

পোর্টারের একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন ডাল্টন, ওকে রীতিমতো ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এলেন হলের আরেক দিকে। ‘তোমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা খুলে দিতে হবে।’

‘কেন?’

‘তুমি যদি ওদেরকে ঢুকতে দাও, একটুখানি ছোক ছোক করার সুযোগ দাও, তা হলে তোমার বিরুদ্ধে যা-যা অভিযোগ করছে ওরা, সেসব নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করবে না। তোমার হাঁড়ির খবর জানতে চায় ওরা; যদি সেটা জানাও, চলে যাবে লোকগুলো। আর যদি তা না করো, তোমাকে রক্ষা করাটা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।’

অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পোর্টার। পুলের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। ‘ঠিক আছে।’

‘স্যাম!’ পোর্টারের মনোভাব আঁচ করে ফেলেছে ন্যাশ।

সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে দুর্বল হাসি হাসল পোর্টার। ‘অসুবিধা নেই। বিশপকে পাকড়াও করতে হয়তো কাজে লাগতে পারে ব্যাপারটা।’

লম্বা করে দম নিলেন ডাল্টন। পোর্টারকে আবারও ঠেলতে ঠেলতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

পকেট থেকে চাবি বের করল পোর্টার। দরজার তালা খুলল। আলতো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল পাল্লা।

ওকে বলতে গেলে ঠেলা মেরে নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে দিল হার্লস আর ডিনার, তারপর ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে। তাদের ঠিক পেছনেই আছে সেই দুই ক্রাইম-সিন টেকনিশিয়ান। এরপর ঢুকল পুল। পোর্টার এবং অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পর দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল তার।

এই লোকগুলোকে অনুসরণ করল পোর্টার। ওর পেছনে আছেন ডাল্টন এবং ন্যাশ।

কে যেন শিস বাজাল, বেডরুম থেকে শোনা গেল সে-আওয়াজ। ‘আরে শালা!’ বলে উঠল হার্লস।

‘ঈশ্বর!’ বেডরুমের দরজায় পা দিয়েছেন ডাল্টন, দম যেন আটকে গেছে তাঁর।

ন্যাশ কিছু বলছে না।

‘আমি এসব কী দেখছি?’ জিজ্ঞেস করল হার্লস।

‘গত চার মাসে সারা দুনিয়ার যেসব জায়গায় গেছে বিশপ, সেটার একটা মানচিত্র,’ বলল পোর্টার। এগিয়ে গেল সেই ম্যাপের দিকে। জ্যাকসন পার্ক লেগুনের জায়গায় যে-হলুদ থাম্‌স্ট্যাক লাগিয়েছিল, সেটা টেনে বের করল। ফেলে দিল নাইটস্‌ট্যান্ডের ওপর।

ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ডিনার। ‘ওটা কী হলো?’

‘জ্যাকসন পার্ক। একটু আগেই তো বললাম, বিশপ তুলে নেয়নি ওই মেয়ে দুটোকে। এই ব্যাপারটা অন্যকিছু। সম্পূর্ণ আলাদা কোনোকিছু।’

ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় হাজির হলো পুল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে। স্ক্রিনে যে-টেক্সট মেসেজ দেখা যাচ্ছে, সেটার সঙ্গে যেন আঠার মতো সঁটে গেছে তার চোখ দুটো। ‘গুগল অ্যালাটস?’

‘বিশপ অথবা ফোর মাস্কি কিলার যেসব জায়গায় গেছে, তার অনলাইন মেনশন।’

আরও ভালোমতো দেখার জন্য স্ক্রিনটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল পুল। কিছু একটা টাইপ করতে চাইছে। কিন্তু কাজটা না করে ঘুরে তাকাল পোর্টারের দিকে। ‘করবো?’

‘অবশ্যই।’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পোর্টার। বেশকিছু মেসেজ এসেছিল, সেগুলো ঘাঁটছে পুল। নজর বুলিয়ে নিচ্ছে প্রতিটা মেসেজের সাবজেক্টে। তারপর রিফ্রেশ করছে স্ক্রিনটা... লোড করছে আগের পঞ্চাশটা মেসেজ। পুনরাবৃত্তি করছে একই কাজ। তার কাজ শেষ হলো একসময়। তখন মুখ তুলে তাকাল ওই ম্যাপের দিকে। ‘কী মনে হয় আপনার? কোথায় আছে বিশপ?’

‘কোনো ধারণা নেই আমার।’

ড্রয়ারগুলো খুলতে শুরু করে দিয়েছে হার্লস। ঘাঁটছে পোর্টারের কাপড়চোপড়। সেদিকে এগিয়ে গেল ন্যাশ। পোর্টারের ড্রেসার আর হার্লসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। ‘যে-ড্রয়ারে পোর্টার ওর আভারওয়্যার রাখে, আপনি কি আসলেই সেটা ঘাঁটবেন এখন?’

‘সরে যান, অফিসার,’ হার্লসের কণ্ঠে হুমকি।

‘অসুবিধা নেই, ন্যাশ। ওই লোক যা-যা দেখতে চান, দেখতে দাও। আমি কোনোকিছু লুকিয়ে রাখিনি কোথাও,’ বলল পোর্টার।

ঘুরে পোর্টারের মুখোমুখি হলো হার্লস। ‘ম্যাকিনলের ফাইলটা কোথায়?’

‘আমার গাড়িতে। ড্রাইভারের সিটের নিচে,’ গাড়ির চাবি হার্লসের দিকে ছুঁড়ে দিল পোর্টার।

চাবিটা লুফে নিল হার্লস, ধরিয়ে দিল একজন টেকনিশিয়ানের হাতে। সামনের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে।

‘আমরা আর কোন কোন ফাইল এখানে খুঁজে পাবো, বলুন তো?’ জানতে চাইল হার্লস।

এগিয়ে গিয়ে বিছানার এককোণায় বসে পড়ল পোর্টার। ‘ম্যাকিনলে ফাইলটাই। ওই একটাই আছে আমার কাছে।’

‘কেন? অন্য ফাইলগুলো চুরি করে নিয়ে আসার পর কাজ শেষে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন নাকি?’

‘না। ওই একটা ফাইলই নিয়েছিলাম আমি।’

ল্যাপটপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পুল। ঘুরল পোর্টারের দিকে। ‘বারবার ম্যাকিনলের ফাইল নিতে গেলেন কেন?’

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভাবল পোর্টার। কিছু বলবে কি না, সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগল না ওর বুঝতে পারছে, নিজের ভাবনাগুলো নিজের মনের ভেতরে রেখে দিয়ে কারও কোনো উপকার করছে না আসলে। ‘সহজাত একটা প্রবৃত্তি বলতে পারেন, তার বেশি কিছু না। এই অনুভূতি এমন কিছু, যার সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগ হয়তো নেই এ-কেসের।’

‘কী রকম?’ জিজ্ঞেস করল পুল।

চাপা হাসি হাসল এজেন্ট ডিনার। ‘আরে এত কথায় কাজ কী? ডিটেকটিভ পোর্টার তো ফিলিপ মার্লো না। আগের দিনের সাদা-কালো সিনেমা আর সস্তা কাগজে ছাপানো উপন্যাসে গোয়েন্দাদের এ-রকম সহজাত প্রবৃত্তির বর্ণনা পাওয়া যেত। সেসব এখন ফালতু হয়ে গেছে।’

‘কী রকম?’ আবারও জানতে চাইল পুল।

চুলে আঙুল চালান পোর্টার। ‘স্বর্ণকেশী বলতে যা বোঝায়, ফোর মাস্কি কিলারের শিকারদের মধ্যে বারবারা ম্যাকিনলে ছিল একমাত্র সে-রকম একটা মেয়ে। এখন পর্যন্ত মোট আটজনকে তুলে নিয়ে গেছে ওই খুনি, তাদের মধ্যে ম্যাকিনলে একমাত্র স্বর্ণকেশী।’

‘আপনি নিশ্চয়ই মশকরা করছেন আমাদের সঙ্গে, না?’ বলল হার্লস।

এককদম আগে বাড়ল পুল। ‘নিজের বিবেচনায় যাদেরকে অপরাধী বলে মনে করেছিল সে, তাদের কাছের-মানুষদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে ওই ম্যাকিনলে পরিবারেই স্বর্ণকেশী ছিল। এবং এই ব্যাপারে বেছে নেয়ার কোনো উপায় ছিল না ফোর মাস্কি কিলারের।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পোর্টার। ‘হতে পারে। কিন্তু অপরাধের যে-ধরণ, সেটা ঠিক মিলছে না এই কেসের বেলায়। একজন পথচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে মেরেছিল বারবারা ম্যাকিনলের বোন। ফলে মারা যায় মানুষটা। এটা শ্রেষ্ঠ একটা দুর্ঘটনা। বাকি অপরাধগুলোর প্রতিটার বেলায়, অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফোর মাস্কি কিলার। প্রতিটা কেসের বেলায় এমন কিছু কাজ সে করেছে, যা দেখলেই বোঝা যায়, ওসব তার পূর্বপরিকল্পিত।’

কথাটা ভেবে দেখল পুল। ‘তারপরও বলতে হবে, এটা তেমন জোরালো কোনো যুক্তি না।’

‘আমি কিন্তু একবারও বলিনি, নিরেট কোনো কিছু আছে আমার কাছে। বরং বলেছি, সহজাত একটা প্রবৃত্তি কাজ করছে আমার ভেতরে। বলতে পারেন, একটা অনুমান আর কী। একটু আগে আপনার সহকর্মী যেমনটা বললেন... যে-ফিলিপ মার্লো আমার ভেতরে আছে, সে যেন কিছু একটা জানিয়ে দিয়েছে আমাকে। তার বেশি কিছু না। যা হোক, আমার সেই অনুমান যদি কাজে লেগে যেত, আপনাদেরকে জানিয়ে দিতাম।’

ওই টেকনিশিয়ান ফিরে এল এমন সময়। হাতে বারবারা ম্যাকিনলের ফাইলটা। ওটা ধরিয়ে দিল হার্লসের হাতে। জিনিসটা পোর্টারের উদ্দেশে নাচাল হার্লস। ‘এই ফাইলে কী খুঁজে পেয়েছেন আপনি, বলুন তো?’

‘ওটাতে নজর বুলানোর মতো সময় পাইনি আমি,’ বলল পোর্টার। ‘আজ সারাটা সকাল ব্যস্ত থাকতে হয়েছে আমাকে।’

ওর দিকে টানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল হার্লস। দু’জনের কেউই কিছু বলছে না। তারপর একসময় দুই টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল লোকটা। তাকাল এফবিআই-এর অফিসার দু’জনের দিকেও। দেয়ালের উদ্দেশে নাচাল একটা হাত। ‘এই সবকিছুর ছবি চাই আমি। তারপর ব্যাগে ভরে ফেলবে সবকিছু, ট্যাগ লাগাবে। সবকিছু নিয়ে ফেরত যাবো আমরা। দরকার হলে এই জায়গার প্রতিটা ইঞ্চি উল্টেপাল্টে দেখবে। আমাদের কেসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ-রকম কোনো কিছু যদি খুঁজে পাও, সেটা জানতে চাই আমি।’

পোর্টারের দিকে ঘুরল সে, এগিয়ে গেল, ওর মুখের এক ইঞ্চি দূরে থামল। ‘কোনো কিছু যদি গোপন করে থাকেন আপনি, যদি বিশেষ কোনো কিছু জানা থাকে আপনার অথচ সেটা এখনও না বলে থাকেন আমাকে, এবং সেটা যদি শেষপর্যন্ত জানা যায়, আপনাকে জেলে ঢোকাতে দ্বিধা বোধ করবো না আমি। আপনি কত সিনিয়র একজন গোয়েন্দা, সে-ব্যাপারে কোনো পরোয়াই করবো না। আপনার ট্র্যাক রেকর্ড কী, পরোয়া করবো না সে-ব্যাপারেও। আমার কাছে আপনি জঘন্য একজন চোর ছাড়া আর কিছুই না। রাষ্ট্রীয় একটা তদন্তকাজ যখন চলছে, তখন সে-কাজে বাধা দিচ্ছেন আপনি। যা হোক, শেষ একটা সুযোগ আছে আপনার হাতে। এ-রকম যদি কিছু থাকে যা এখনও বলেননি আমাকে, বলে দিন। নইলে হয়তো আর কখনোই সে-সুযোগ পাবেন না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে-খবর জানতে পারবো আমি, ততক্ষণে দফারফা হয়ে যাবে আপনার। বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?’

‘আর কিছু নেই আমার কাছে।’

শব্দ করে দম ছাড়ল হার্লস।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পোর্টার।

একসময় ঘুরল হার্লস, এগিয়ে যাচ্ছে পোর্টারের ক্লজিটের উদ্দেশে। পোর্টার খেয়াল করল, ওর ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা হিদারের ছবির দিকে তাকিয়ে আছে সে। সে-ছবিতে উজ্জ্বল একটা হাসি লেপ্টে আছে হিদারের চেহারায়। হাসিটা কেমন যেন আশ্বস্ত করার মতো। পোর্টার টের পেল, নিজেকে ভীষণ একা মনে হচ্ছে ওর। এতখানি একা লাগেনি আগে কখনও।

এক ঘণ্টা পর কাজ শেষ হলো এফবিআই-এর লোকদের। ততক্ষণে চারটা ফাইল বক্স জোগাড় করে ফেলেছে তারা।

আবারও নগ্ন হয়ে গেছে পোর্টারের সেই দেয়ালটা। যাচ্ছেতাই কায়দায় টেপ সরিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলে রঙ উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। ল্যাপটপটা এখন এজেন্ট ডিনারের হাতে। ধীরে ধীরে সারা ঘরে চক্রর দিয়ে বেড়াচ্ছে সে। ভাবখানা এমন, কিছু একটা মিস করে ফেলেছে যেন। হলওয়াতে ডাল্টনকে নিচু গলায় কিছু একটা বলছে হার্লস, শোনা যাচ্ছে সে-আওয়াজ। কিন্তু ঠিক কী বলা হচ্ছে, ঠাहर করতে পারছে না পোর্টার।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিছু একটা বলার সিদ্ধান্ত নিল পুল। কিন্তু মত বদল করল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল পোর্টার, এলিভেটরের ভেতরে যেন পিছলে ঢুকে পড়ল লোকটা। তার পেছনে আছে সেই দুই টেকনিশিয়ান। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে বাক্সগুলো।

‘ডিনার?’ গলা ফাটিয়ে চেষ্টা করে উঠল হার্লস। ‘চলো যাই।’

পোর্টারকে রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিল এজেন্ট ডিনার, এগিয়ে গেল এলিভেটরের দিকে। আফটারশেভ লোশনের গন্ধ রেখে গেল বাতাসে। ১৯৯২ সালের পর ওই গন্ধ ভুলে গেছে লোকে।

ডাল্টনকে শেষ কোনো একটা কথা বলল হার্লস। মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল এলিভেটরের ভেতরে। পোর্টারের সঙ্গে চোখাচোখি হলো লোকটার। তারপর কিঁচকিঁচ শব্দ তুলে লেগে গেল দরজাটা।

ডাল্টন ফিরে এলেন পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্টে। তাঁর পেছনে আছে ন্যাশ। ‘তুমি আসলে ঠিক কী ভাবছ, জানি না আমি, স্যাম। একেবারে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছ।’

‘এমন তো না যে পোর্টার কোনো প্রমাণ লুকিয়ে রেখেছে,’ বন্ধুর সাফাই গাইল ন্যাশ।

চেহারা লাল হয়ে গেল ডাল্টনের। ‘তুমি তোমার মুখটা বন্ধ রাখো, বুঝলে? মনে সন্দেহ আছে আমার... তোমার নাকের ঠিক নিচেই ঘটেছে এসব। অথচ এখন ভান করছ, কিছুই জানো না যেন।’

‘সে আসলেই কিছু জানে না,’ বলল পোর্টার। ‘দোষ যদি হয়ে থাকে, সব আমার।’

ওর দিকে পাই করে ঘুরলেন ডাল্টন। ‘তুমি যে শুধু ফোর মাস্কি কিলার তদন্তের কাজে হস্তক্ষেপ করেছ, তা না, একের পর এক মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া ওই বিকারগ্রস্ত লোককে খুঁজে বের করতে যে-চেপ্টা চালাচ্ছি আমরা, সেটাতেও ব্যাঘাত ঘটিয়েছ। তোমাকে যদি বরখাস্ত করা হয় এখন, তা হলে সে-কাজে আমি কোনো বাধা দিতে পারবো বলে মনে হয় না।’

‘ঠিক আছে, দিয়েন না তা হলে।’

‘হার্লস এখন কী করবে, জানো? পুরো ব্যাপারটা সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করবে তার অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টরের কাছে। তারপর সেই লোক ফোন করবেন আমাদের চিফকে। পুরো ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে চলে গেল।’ দৃষ্টি নত হলো ক্যাপ্টেনের, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন এখন। ‘তোমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি আমি। এক সপ্তাহের জন্য। এই পুরো ব্যাপারটা তোমার মাথা থেকে বের করে দেবে তুমি। এই সময়ের মধ্যে যদি একটাবারের জন্যও টের পাই ফোর মাস্কি কিলারকে ভুলতে পারোনি, তা হলে ব্যাপারটা তোমার জন্য আরও খারাপ হবে। এফবিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তোমার বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবে না। কিন্তু তোমাকে যে সাসপেন্ড করা হবে, কোনো সন্দেহ নেই সে-ব্যাপারে।’

‘ক্যাপ্টেন, আমরা আসলে অসুস্থ একটা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছি, তার বেশি কিছু না। নিশ্চয়ই চান না, আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মকে বাধাগ্রস্ত করুক নোংরা রাজনীতি? এখন অগ্রাধিকারভিত্তিতে পাকড়াও করা উচিত ফোর মাস্কি কিলারকে...’

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাল্টন। ‘তোমার পিস্তল আর ব্যাজ দাও।’

পোর্টার জানে, তর্ক করে কোনো লাভ হবে না এখন। নিজের গ্লকটা তুলে দিল ডাল্টনের বাড়িয়ে-দেয়া হাতে। আইডেন্টিফিকেশন ব্যাজটাও দিল।

দুটো জিনিসই জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন ডাল্টন। ঘুরলেন, বেরিয়ে গেলেন পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। এলিভেটরের সামনে হাজির হয়ে চাপ দিলেন কল বাটনে।

‘ক্যাপ্টেন, নতুন এই লোক কিন্তু জঘন্য। সে যা করছে, দ্রুত করছে,’ বলল পোর্টার।

না ঘুরেই ডাল্টন বললেন, ‘ন্যাশ আর ক্লেয়ার দেখবে ব্যাপারটা। আগামী সাত দিন তোমার পক্ষ থেকে কোনোকিছু শুনতে চাই না আমি। যদি শুনি, তা হলে আরও সাত দিনের জন্য বরখাস্ত করা হবে তোমাকে। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?’



পোর্টার কিছু বলল না।

‘বুঝতে পেরেছ?’ পুনরাবৃত্তি করলেন ক্যাপ্টেন।

‘হ্যাঁ,’ বলল পোর্টার।

এলিভেটর হাজির হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে পড়লেন ডাল্টন। এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন দরজাটা, বন্ধ হতে দিচ্ছেন না ওটাকে। ‘ন্যাশ, চলে এসো আমার সঙ্গে।’

পোর্টারের দিকে তাকাল ন্যাশ, কিন্তু কিছু বলল না। আলতো করে মাথ ঝাঁকাল পোর্টার।

গিয়ে এলিভেটরের ভেতরে ঢুকে পড়ল ন্যাশ। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল পোর্টার সহসা টের পেল, নিজের অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে টের পেল, ওর বুকের খাঁচায় সমানে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা।

তারস্বরে চৈঁচাচ্ছে অসহ্য এক নীরবতা।

১৯.

লিলি

দ্বিতীয় দিন, সকাল ১১:৩৬

খাঁচার এককোণায় যেন গাদাগাদি করে পড়ে আছে লিলি। পুরু কম্বলটা জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। কাপড় পরেছে। তারপরও উষ্ণতা অনুভব করতে পারছে না। কাঁপছে সমানে, কিছুতেই থামাতে পারছে না সেটা। এমনকী হিটারের ভেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও না। বার বার তাকাচ্ছে বেসমেন্টের এককোণায় অবস্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ওই সিঁড়ির দিকে। নিজেকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছে না এই কাজ থেকে। কান পেতে শুনছে পুরনো ফ্লোরবোর্ডের ক্যাচকোঁচ আওয়াজ। ওপরতলায় হাঁটাইটি করছে ওই লোক।

একটা মাকড়সা যেন গুড়ি মেরে উঠে এল চেইনলিফ্টের একদিক দিয়ে। লিলির পা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে আছে ওটা। সরে গেল লিলি। খাঁচার কোনার আরও গভীরে ঢুকে পড়তে চায়।

ওপরতলায় হাঁটছে লোকটা; তার প্রতি কদমে বরগার ফাঁকফোকর দিয়ে নিচে পড়ছে একটুখানি করে ধুলো। আধো আলোয় পাতলা কুয়াশা তৈরি করেছে সে-ধুলো। লিলি এমন এক ভান করছে, যেন ওসব আসলে ধুলো না, তুষার। ভান করছে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। ভাবছে, নিজের বাসায় নিরাপদে ফিরে গেছে সে, এখন ওর ঘরে আছে। কিন্তু যখনই ওই লোক চিৎকার করে উঠছে, ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে মেয়েটার অলীক সেই কল্পনা।

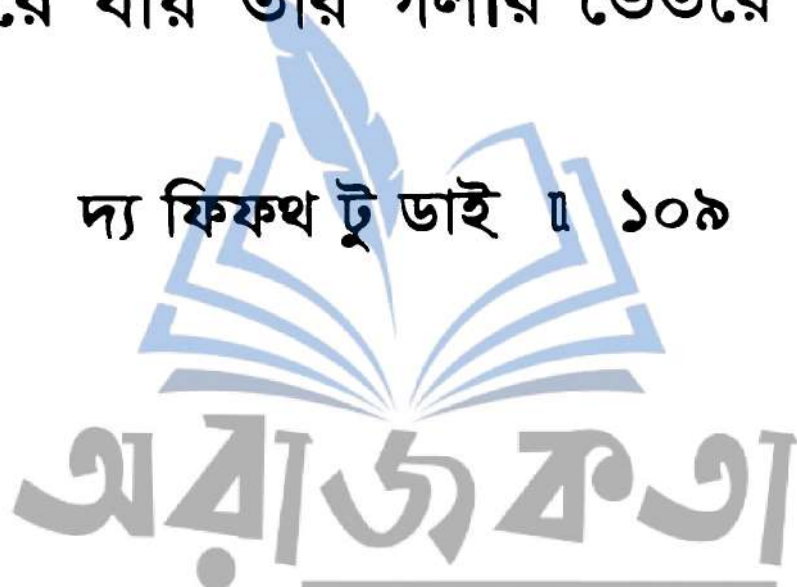
চেষ্টাচ্ছে লোকটা। অনেক বেশি।

কেমন যেন অসংলগ্ন তার সেই চিৎকার। শুনলে মনে হয়, চাপা গলায় উগলে দিচ্ছে অর্থহীন কিছু শব্দ। কখনও কখনও আবার কাঁদছে সে। কখনও আবার এমন এক কায়দায় বিলাপ করছে, শুনলে মনে হয় ব্যথায় আর্তনাদ করছে যেন। কিন্তু যা-ই করুক না কেন, এই বাড়ির নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে তাতে। তার সেই উচ্চ কণ্ঠ যেন ঝুলে থাকছে বাতাসে।

এসব চিৎকার-চেষ্টামেচির আগে কিছু ঘটছে না।

লিলির বাবা একবার একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকতে দিয়ে বাড়ি মেরে বসেছিলেন নিজের তর্জনীতে। তিনি তখন স্কুলের জন্য একটা বার্ডহাউস বানানোর কাজে সাহায্য করছিলেন তাঁর মেয়েকে। তখন একই কায়দায় চেষ্টাচ্ছিলেন তিনি। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাঁর সেই চিৎকার। সহসাই যেন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর মেয়ে দেখছে তাঁকে। আর তাই জোর খাটিয়ে সংযত করেন নিজেকে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেন জিভ। মাঝপথে ভুট করেই থেমে যায় চিৎকারটা। যেন মরে যায় তাঁর গলার ভেতরে কোনো এক জায়গায়। লাল হয়ে উঠে তাঁর চেহারা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ১০৯



অরাজকতা



ওপরতলার ওই লোকের চিৎকার হুট করে থেমে যাচ্ছে না। যখন থেমে যাচ্ছে সে, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকছে। নড়াচড়ার কোনো শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না তখন। কিন্তু তারপর যখন গলা ফাটাচ্ছে, যেন ব্রেডের তীক্ষ্ণতায় সারা বাড়ি ভরে উঠছে আওয়াজে। তারপর একসময় ফোঁপাতে ফোঁপাতে থেমে যাচ্ছে লোকটা।

লিলি জানে না, ওই লোকের এ-রকম চোঁচানোর কারণ কী। জানতে চায়ও না। বরং চায়, লোকটা যেন ওপরতলাতেই থাকে। যা করছে, তা-ই যেন করতে থাকে।

গত এক ঘণ্টায় মাত্র একবার নিচে নেমে এসেছিল লোকটা। লিলি যাতে পেশাব-পায়খানা করতে পারে সেজন্য একটা বালতি দিয়ে গিয়েছিল খাঁচার ভেতরে; সেটা পরিষ্কার করেছে ইউটিলিটি টাবে নিয়ে গিয়ে। তারপর আবার রেখে দিয়েছে খাঁচার ভেতরে। একনজর তাকিয়েছিল গ্লাসভর্তি দুধের দিকে। মরা মাছিটা তখনও ভাসছে সেখানে। গ্লাসটা তুলে নিয়েছিল সে। ওটা হাতে নিয়েই সিঁড়ি বেয়ে চলে গিয়েছিল ওপরতলায়। যাওয়ার সময় একটা কোনো কথা বলেনি। অসুস্থ মানুষের মতো পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল তাকে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়েছিল লিলি। নজর ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল মেয়েটা। ওই লোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। খেয়াল করেছে, সে যতবার তাকিয়েছে লোকটার দিকে, ওই লোক ততবার বেসমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে দেরি করেছে।

লিলি ঠিক করেছে, এবার যখন লোকটা ফিরে আসবে, তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। নজর ফিরিয়ে নেবে না। লোকটার ক্ষতের ব্যাপারে কিছু কথা বলবে। ফলে ওই লোক হয়তো আরও জলদি বিদায় নেবে।

এ-রকম ছেলেছোকরাদের ব্যাপারে ভালোই জানা আছে লিলির।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। হাজির হয়ে গেছে ওই লোক।

কাপড় বদল করেছে সে। এখন তার পরনে কালো জিন্স, গাঢ় লাল সোয়েটার। তবে মাথায় সেই কালো নিট ক্যাপটাই আছে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে থামল, বসে পড়ল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিলির দিকে।

কয়েক মিনিট আগেও লিলি নিজেকে বলছিল, তাকিয়ে থাকবে ওই লোকের চোখের দিকে। তাকিয়ে থাকবে চোখে কোনো একজাতের তীব্রতা নিয়ে। পলক ফেলবে না, নড়বে না একটুও। সে আসলে কাঁপিয়ে দিতে চেয়েছিল ওই লোকের ভেতরটা। পারেনি। বরং ওকেই বাধ্য হয়ে নজর সরিয়ে নিতে হলো। তাকিয়ে আছে কঙ্কিটের মেঝের দিকে। একটু পর পর চোখের কোনা দিয়ে দেখছে লোকটাকে।

যেখানে বসে ছিল, সেখানে লম্বা একটা সময় ধরে বসেই রইল লোকটা... অন্তত মিনিট বিশেক তো হবেই। ছোট করে দম ফেলছে। শেষপর্যন্ত নিচু গলায়

বলে উঠল, ‘তোমাকে যদি চমকে দিয়ে থাকি, সেজন্য দুঃখিত। কখনও কখনও আমার কাজেকর্মে ব্যথা পায় কেউ কেউ।’

কথাটার মানে কী, জানতে ইচ্ছা করছে লিলির। কিন্তু কিছু বলল না সে, চুপ করে রইল।

‘কখনও কখনও,’ বলে চলল লোকটা, ‘আমার মনে হয়, কেউ একজন তার আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে আমার অক্ষিগোলক, সজোরে টানছে বাইরের দিকে। এমন না যে, আমার চোখ উপড়ে ফেলতে চাইছে সে, শুধু চেষ্টাটা করছে আর কী। এই সমস্যার জন্য ওষুধ খাই আমি। কিন্তু তাতে চিন্তা করতে কষ্ট হয় আমার, মনোনিবেশ করতে পারি না কোনো কাজে। অথচ এখন যা করতে চলেছি আমি, সে-কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা দরকার। বিচার-বিবেচনাজ্ঞান বলতে যা-কিছু আছে, নিজের সঙ্গে রাখা দরকার।’

সমস্যাটা কী, জানার ইচ্ছা হলো লিলির। কিন্তু মুখ খুলল না শেষপর্যন্ত। এই লোকের সঙ্গে কোনো কথা বলবে না সে।

হাত বাড়িয়ে ক্যাপের ওপর দিয়েই চাঁদি চুলকাল লোকটা। তারপর উঠে দাঁড়াল। ‘কাজটা আবারও শুরু করার সময় হয়েছে।’

ডান পা-টা কাজে লাগিয়ে চেয়ারে একটা ধাক্কা মারল ক্রোজ, চক্কর খেতে আরম্ভ করল ওটা। ‘পুলিশ হওয়ার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি স্যাম? নতুন কোনো খবর না এটা।’

কনফারেন্স টেবিলের এককোণায় হেলান দিয়ে বসে আছে ন্যাশ। সোফি আর ক্রেয়ার বসেছে ওর মুখোমুখি। ‘আমাদেরকে কথাটা বলতে পারত সে।’

‘বললেও যে খুব একটা লাভ হতো, মনে হয় না,’ বলল ক্রেয়ার। ‘তাকে আড়াল করতে পারতাম না আমরা। ঘটনা শুনে যা মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে কোনো সুযোগই দেননি ক্যাপ্টেন।’

হলটা দেখিয়ে দিল ন্যাশ ইঙ্গিতে। ‘কয়েকটা গাধা আর ভাঁড় হাজির হয়েছে ওখানে, সব দোষ তাদের।’

চেয়ারটাকে আরও একবার চক্কর খাওয়াল ক্রোজ। ‘পুরো ঘটনায় ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি আমি।’

‘মানে?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

‘উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কেউ একজন তার কুকীর্তি বা দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে। এই কেসে এফবিআই-এর সঙ্গে সরাসরি কাজ করা উচিত ছিল আমাদের। তার বদলে তারা ছোঁ মেরে এই কেসের তদন্তভার গ্রহণ করেছে। আমাদেরকে রীতিমতো কেটে বাদ দিয়েছে এই কেস থেকে। কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে এ-রকম কোনো কাজের? একটা কথা বলি... উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কেউ একজন এই কেস থেকে দূরে রাখতে চাইছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টকে।’

‘তিনি কে? ডাল্টন নিজেই?’

‘হতে পারে তাঁর চেয়েও বড় কেউ। আমাদের মেয়র ছিলেন ট্যালবটের বন্ধু। সবকিছু যখন গড়বড় হতে শুরু করেছিল, তখন কিন্তু আমাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তারপর আসি পত্রিকাওয়ালাদের কথায়। তারা বার বার বলেছে, বিশপকে নাকি ছেড়ে দিয়েছে স্যাম নিজেই...’

ক্রোজের দিকে একটা কলম ছুঁড়ে মারল ক্রেয়ার। ‘স্যাম কাউকে ছেড়ে দেয়নি। তিনি বরং ওই মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছেন।’

কলমটা লুফে নিল ক্রোজ, ঢুকিয়ে রাখল নিজের পকেটে। ‘সেটা আমরা জানি। কিন্তু যদি এ-রকম খবর প্রচার করা যায় যে, স্যাম ছেড়ে দিয়েছেন বিশপকে, তা হলে সেটা আরও মশলাদার হয়। আমাদের মেয়রের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল একজন অপরাধী। তদন্তকারী গোয়েন্দাদের মধ্যে যাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, তিনি অবলীলায় চলে যেতে দিয়েছেন একজন সিরিয়াল কিলারকে।’

এসব খবর প্রচারিত হওয়ায় কী হয়েছে? ঘটনাস্থলে হাজির হওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে এফবিআই। তারপর তারা কী করেছে? আমাদের সবাইকে বের করে দিয়েছে এই কেস থেকে।’

ন্যাশের দিকে ঘুরল ক্লেয়ার। ‘কী মনে হয় আপনার? বিশপের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ আছে তাঁর?’

‘কার কথা বলছ? স্যাম?’

‘হ্যাঁ।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘জানি না।’

‘ও-রকম কোনো কাজ কি করবেন তিনি?’ জিজ্ঞেস করল সোফি। ‘ওই লোকের সঙ্গে নিজে যেচে পড়ে কথা বলবেন?’

আরও একবার অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকানোর পালা ন্যাশের। ‘হিদার মারা যাওয়ার পর থেকে নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে নিয়েছে সে। নিজের কাজকর্ম কেমন যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে।’

‘হিদার কে?’ জানতে চাইল সোফি।

মাথা কাত করল ক্লেয়ার। ‘কেন, শোনেনি আপনি?’

সোফি মাথা নাড়ল।

‘স্থানীয় একটা কনভিনিয়েন্স স্টোরে ডাকাতি হয়েছিল। তাতে মারা পড়েন স্যামের স্ত্রী। আমরা যখন বিশপকে তাড়া করতে শুরু করি, ওই ঘটনা তার কয়েক সপ্তাহ আগের। এই কেসে তখন কাজ না করলেই বোধহয় ভালো হতো স্যামের। কিন্তু কথা হচ্ছে, ফোর মাস্কি কিলার কেসের সঙ্গে সেই শুরু থেকে জড়িত ছিলেন তিনি। আর তাই আমরা যখন ভাবলাম ফোর মাস্কি কিলার মারা পড়েছে, তখন খবর দিতে বাধ্য হলাম স্যামকে... ফিরিয়ে আনতে হলো তাঁকে। ফোর মাস্কি কিলারের এই কেস আসলে তাঁরই। হিদারকে যে-ছোকরা খুন করেছিল, পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তাকে। কিন্তু পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যায় ওই ছোকরা। পরে ট্যালবটকে খুন করে বিশপ। ওদিকে স্যাম নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেন এমোরিকে। তারপর কিছু সময় হাসপাতালে কাটান তিনি... সুস্থ হয়ে উঠছিলেন আস্তে আস্তে। যখন বাসায় ফেরেন, নিজের বিছানার ওপর একটা বাক্স পান। সেটার ভেতরে বিশপের একটা নোট ছিল। আর ছিল একটা কাটা-কান... যে-ছোকরা খুন করেছিল হিদারকে, তার। বিশপ যেভাবেই হোক না কেন পাকড়াও করে ফেলেছিল ওই ছোকরাকে,’ বুঝিয়ে বলল ক্লেয়ার।

‘ওই নোটে কী লেখা ছিল?’

‘নিজের মাকে খুঁজে বের করার কাজে স্যামের সাহায্য চেয়েছিল বিশপ,’ সোফিকে বলল ন্যাশ।

‘বিশপের মা? এই পুরো ঘটনার সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্কটা কী?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১১৩



চোখ উল্টানোর কায়দা করল ক্লেয়ার। ‘ওসব নিয়ে আলোচনা করার মতো সময় এখন নেই আমাদের হাতে। আপনার যা-যা জানার আছে, গাড়িতে বলবো আপনাকে। কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। স্যামকে ছাড়া কীভাবে কী করবো, আলোচনা করে বের করতে হবে সেটা।’ ঘুরল ন্যাশের দিকে। ‘রেনল্ডসদের বাসায় কী হলো?’

নিজের মোবাইল ফোনে কিছু ছবি বের করল ন্যাশ। তারপর ফোনটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল ক্লেয়ার আর সোফির দিকে।

ভালোমতো দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ল ক্লেয়ার। ‘এলা রেনল্ডসকে যে-লোক খুন করেছে, সেই একই লোকের কাজ এটা?’

‘কাকতালীয় কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না আমি,’ জবাবে বলল ন্যাশ।

‘কিন্তু কেন?’

‘মিলিয়ন ডলারের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেলেছ।’

একটা একটা করে ছবি দেখছে সোফি। ‘এসবের কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না আমার কাছে। অচেনা সেই লোক যদি টার্গেট করে থাকে রেনল্ডস পরিবারকে, তা হলে লিলি ডেভিসকে তুলে নিয়ে গেল কেন সে? এলা আর লিলি তো একজন আরেকজনকে চিনত না। কোনো যোগসূত্রও নেই ওই দু’জনের মধ্যে।’

‘কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো যোগসূত্র অবশ্যই আছে। আমরা এখন পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারিনি সেটা। এলা রেনল্ডসের বাবার ব্যাপারে কী কী জানতে পেরেছি আমরা?’ বলল ক্লেয়ার।

উঠে দাঁড়াল ন্যাশ, এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে। বড় হাতের অক্ষরে লিখল ফ্লয়েড রেনল্ডস। দাগ দিল ওটার নিচে। ‘এই লোক কাজ করতেন ইউনিমেড আমেরিকা হেল্থকেয়ারে। গত বারো বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। ব্ল্যাক্লেট ইন্স্যুরেন্স বলতে যা বোঝায়, বিক্রি করতেন সেসব। আরও বিক্রি করতেন হেল্থ কেয়ার পলিসি। তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে যা বলেছেন, সে-অনুযায়ী যদি বলি, বোনাস বাদে বছরে দু’লক্ষ ডলার উপার্জন ছিল ওই লোকের। একটা আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের কথা যদি বাদ দিই, তা হলে ঋণ বলতে কিছুই ছিল না ওই পরিবারের। প্রতি মাসে ওই কার্ডের বিল চুকিয়ে যাচ্ছিল পরিবারটা।’

শিস বাজাল ক্লেয়ার। ‘ভালো কাজ করতেন ওই লোক। শালা আমিই একমাত্র আছি ভুল লাইনে।’

‘ইউনিমেডের পলিসি আছে আমাদের,’ বলল সোফি।

‘এই অঙ্গরাজ্যে কাজের দিক দিয়ে তাদের অবস্থান তিন নম্বরে,’ বলল ন্যাশ। তারপর হোয়াইট বোর্ডে লিখল: ১১ সাইজের একটা ওয়ার্ক বুটের ছাপ পাওয়া গেছে।

‘কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল সোফি।

‘মিস্টার রেনল্ডসের গাড়ির ভেতরে, ড্রাইভারের সিটের পেছনদিকে। তাঁর গাড়িটা একটা লেক্সাস এলএস। ছাপটা দেখে আমাদের মনে হয়েছে, অচেনা সেই লোক ওটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল সে, তাই ঠিকমতো করতে পারেনি কাজটা। স্যামের ধারণা, মিস্টার রেনল্ডসের গলায় যখন ফাঁস লাগিয়েছিল লোকটা, তখন জোর পাওয়ার জন্য একটা পা চেপে ধরেছিল ড্রাইভারের সিটের পেছনদিকে।’

ছাদের দিকে তাকাল ক্রোজ। ‘এগারো সাইজ। তার মানে হচ্ছে, একান্তর দশমিক পাঁচ ইঞ্চি। অর্থাৎ লোকটা প্রায় ছ’ফুট লম্বা।’

‘আপনি কী করে জানতে পারলেন?’ জিজ্ঞেস করল সোফি।

‘গড়পরতা একটা হিসেব আছে। একজন লোকের জুতোর সাইজ যা, সে তার চেয়ে সাড়ে ছ’গুণ লম্বা। এর চেয়ে ছোট বা বড় যারা, তাদের পা শারীরিক অনুপাতের বাইরে। তার মানে হাঁটতে কষ্ট হয় তাদের, এমনকী দাঁড়াতে অথবা ভারসাম্য বজায় রাখতেও কষ্ট হয়,’ বলল ক্রোজ।

‘হাহ্।’

‘আমার সঙ্গে থাকুন কিছুদিন। ছোটখাটো সব রকমের বিদ্যা আপনাকে শিখিয়ে দেবো আমি।’

‘না, ধন্যবাদ,’ ক্রোজকে বলল সোফি।

ক্রেয়ার বলল, ‘রেনল্ডস পরিবারের তেমন কোনো দেনা ছিল না... এই তথ্য কেন যেন ঠিক মেনে নিতে পারছি না আমি। চিরাচরিত ঋণ বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো কিছু হয়তো ছিল না তাদের। কিন্তু যদি বলি, যা চিরাচরিত না, সে-রকম কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিল ওই পরিবার, তা হলে? যেমন ধরুন জুয়া। অথবা এমন কিছু, যে-কাজের কথা স্ত্রীকে কখনও বলেননি ওই লোক। ভুল কোনো লোকের টাকা যদি আপনার কাছে চলে আসে, তা হলে সেই লোক, রেনল্ডসের মেয়ের সঙ্গে যা ঘটে গেছে, সে-রকম কিছু করতেই পারে।’

‘কিন্তু সেই লোকের তো রেনল্ডসকে খুন করার কথা না,’ বলল ক্রোজ। ‘কারণ কাজটা যদি করে সে, তা হলে পাওনা টাকা ফেরত দেয়ার জন্য কেউ তো বেঁচে থাকছে না।’

‘কেন, মিসেস রেনল্ডস আছেন না? এমনও হতে পারে, ঋণটা আসলে তাঁরই। হতে পারে, তাঁর মেয়ে আর স্বামীকে খুন করে পাওনাদার বুঝিয়ে দিয়েছে, কী করতে পারে সে,’ বলল সোফি। ‘মেয়েমানুষদের কিন্তু ঘোড়দৌড়ে বাজি খেলারও অভ্যাস থাকে কখনও কখনও।’

‘রান্না করা, ঘরদোর সাফ করা আর বাচ্চাকাচ্চা সামলানোর পরও ওই কাজের জন্য সময় থাকে নাকি তাদের হাতে?’ প্রশ্নটা ক্রোজের। উড়ে আসা কোনো কলমের আঘাত থেকে চেহারা বাঁচানোর জন্য ঢাল হিসেবে তুলে ধরল একটা নোটপ্যাড।

এক মুহূর্ত পর নিচু করল ওটা। দেখতে পেল, ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি তাকিয়ে আছে ক্রেয়ার। ‘আপনি বাজে একটা লোক।’

ক্লোজের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ছে সোফি। ‘আপনাকে ঠিক পছন্দ করতে পারছি না আমি।’

হোয়াইটবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে ন্যাশ। ‘কথাটা ভালো।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল ক্লোজ, বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসছে।

‘তোমাকে বলিনি, মাথামোটা কোথাকার। সোফিকে বলেছি,’ বলল ন্যাশ। ‘ক্রেয়ার, হসম্যানের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখো। কোথাও কোনো ঘাপলা আছে কি না, খুঁজে দেখুক সে।’

‘ঠিক আছে, দেখছি।’

‘এমন কি হতে পারে, কেউ একজন নজর রেখেছে মিসেস রেনল্ডসের ওপর?’ জিজ্ঞেস করল ক্লোজ।

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘ইউনিফর্ম পরিহিত দু’জন পুলিশ অফিসারকে বসিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। তারা নজর রাখছে মিসেস রেনল্ডস আর তাঁর ছোট ছেলেটার ওপর। আমি যখন চলে এলাম, তখন দেখেছি, তিনটা নিউজ-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে ওই বাড়ির বাইরে। খুনি হয়তো নিকট ভবিষ্যতে একা পাবে ন মিসেস রেনল্ডসকে। একদিক দিয়ে হয়তো ভালোই হয়েছে ব্যাপারটা।’

ন্যাশের ফোনটা হাতে নিয়েছে ক্রেয়ার, ছবিগুলো দেখছে। ‘যে বা যারা শুধু খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করে, তারা স্লোম্যান বানায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় খরচ করে বরফের নিচে কোনো লাশ ঢোকায় না মাপমতো। আমাদের এই খুনি যে-ই হোক না কেন, আমার মনে হচ্ছে, কোনো একটা মেসেজ দিতে চাইছে সে।’

‘ধরা পড়ার কোনো ভয়ও নেই তার,’ বলল সোফি। ‘খোলামেলা জায়গায় অনেক সময় কাটিয়ে দিচ্ছে সে।’

মাথা ঝাঁকাল ক্রেয়ার। ‘যার হারানোর কিছু নেই, সে সাধারণত ভয় পায় না। কোনো অনুশোচনা কাজ করে না তার ভেতরে। সে শুধু নিজের কাজটা করে যায়। ফলে লোকটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক একজন মানুষে পরিণত হয়।’

এলা রেনল্ডস আর লিলি ডেভিসের মাঝখানে একটা দাগ টেনে দিল ন্যাশ। ‘এখানে যেসব তথ্য লেখা আছে, সেসবের মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে।’

ভোঁ ভোঁ করে উঠল ক্লোজের ফোন। ডিসপ্লের দিকে তাকাল সে। ‘পার্কের ভিডিয়ো ফুটেজ থেকে সেই ট্রাকের মডেল জানা গেছে। টয়োটা টান্ড্রা, ২০১১।’

‘যেসব গাড়ির সঙ্গে মিলে যায় ওই বিবরণ, সেটার একটা তালিকা তৈরি করা যায় কি না, দেখো। শহরের এক শ’ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে খোঁজটা চালাতে হবে তোমাকে।’

ইতোমধ্যেই নিজের ফোন ট্যাপ করতে শুরু করে দিয়েছে ক্লোজ। ‘হ্যাঁ।’

‘ট্রাক ড্রাইভারের চেহারা বড় করে দেখে কোনো সুফল পাওয়া গেছে?’

‘না,’ বলল ক্লোজ। ‘এখানে আসার আগে চেষ্টা করে দেখেছি আমি। ক্যামেরাটা পুরনো। সে-রকম কোনো রেজুলুশনও নেই ওটার।’

বোর্ডের কাছে ফিরে গেল ন্যাশ। যেসব কাজ হয়ে গেছে, সেগুলো কেটে দিল। অ্যাসাইনমেন্টের বাকি তালিকাটা দেখতে লাগল। ‘আমাদের এই তালিকা লম্বা হচ্ছে। আরও বড় কথা, এখন একজন লোক কম আমাদের।’

নিজের ফোনটা নামিয়ে রাখল ক্লোজ, হাত তুলল।

‘হ্যাঁ, বলো,’ বলল ন্যাশ।

‘মাঠে নামা দরকার আমার। স্টারবাকসে যেতে চাই। ওদের ভিডিও ফুটেজটা একটু দেখতে হবে।’

মুখ তুলে এভিডেন্স বোর্ডের দিকে তাকাল ন্যাশ। ‘তোমার অন্য অ্যাসাইনমেন্টের খবর কী?’

‘ওপরতলায় আমি কোনো ওয়ান-ম্যান শো করছি না। করার মতো কাজ আরও আছে আমার। ল্যাপটপটা নিয়ে আসবো। দরকার হলে সেটা থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করে নেয়া যাবে,’ বলল ক্লোজ।

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘ঠিক আছে। ভদ্রমহিলারা, চলো আমরা ভাগ করে ফেলি এবং বিজয় অর্জন করি। তোমরা আর্ট গ্যালারিতে যাবে। এতক্ষণে চালু হয়ে যাওয়ার কথা তাদের। ক্লোজকে নিয়ে আমি যাবো স্টারবাকসে। এই তালিকার অন্য কিছু আইটেম নিয়েও কাজ করবো। তদন্তের এখন যা অবস্থা, আমাদেরকে ধারণা করে নিতে হবে, লিলি যেখানেই থাকুক না কেন, বেঁচে আছে এখনও। একটা ব্রেক দরকার আমাদের।’

উঠে দাঁড়াল ক্লোজ, টান টান করে দিল শরীরটা। ‘আপনাদের কেউ একজন কি একটু খবর নেবেন স্যামের?’

‘না,’ বলল ন্যাশ।

এভিডেন্স বোর্ড

এলা রেনল্ডস (বয়স ১৫)

নিখোঁজ হয়েছিল: জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে

লাশ পাওয়া গেছে: ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে,

জ্যাকসন পার্ক লেগুনে

সেখানকার পানি জমে বরফে পরিণত হয়েছে: জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে

(মেয়েটা হারিয়ে যাওয়ার ২০ দিন আগে)

এই মেয়েকে শেষবার দেখা গেছে: লোগান স্কোয়ারে বাস থেকে নামছিল।

(ওদের বাসা থেকে ২ ব্লক দূরে/জ্যাকসন পার্ক থেকে ১৫ মাইল দূরে)

শেষ যে-বার দেখা গেছে মেয়েটাকে, তখন তার পরনে ছিল:

কালো কোট

লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গেছে মেয়েটা

(তার লাশ পাওয়া গেছে স্বাদু পানিতে)

পরনে ছিল লিলি ডেভিসের কাপড়

বাস স্টপেজ থেকে এলাদের বাসায় যেতে সময় লাগে: ৪ মিনিট

কেডজির স্টারবাকসে ঘন ঘন যেত মেয়েটা।

ওদের বাসা থেকে সেখানে যেতে সময় লাগে: ৭ মিনিট

লিলি ডেভিস (বয়স ১৭)

বাবা-মা = ডক্টর র্যান্ডল ডেভিস এবং গ্রেস ডেভিস

সবচেয়ে ভালো বন্ধু = গ্যাব্রিয়েল ডিগান

পড়ত উইলকক্স অ্যাকাডেমিতে (প্রাইভেট)

ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে ক্লাসে যায়নি।

শেষ যে-বার দেখা গেছে: স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিল (পায়ে হেঁটে)

ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে, সকাল ৭:১৫ মিনিটে

তখন পরনে ছিল: হীরার নকশা-করা লাল নাইলনের হুডওয়ালা পেরো পার্কা, সাদা

হ্যাট, সাদা গ্লাভস, গাঢ় রঙের জিন্স, গোলাপি টেনিস শূ

(এসব পাওয়া গেছে এলা রেনল্ডসের গায়ে)

লিলিকে খুব সম্ভব তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ সকালে

(স্কুলে যাওয়ার পথে)

স্কুলে যেতে সময় লাগে: সর্বোচ্চ ৩৫ মিনিট (স্কুলের উদ্দেশে বের হয়েছিল ৭:১৫

মিনিটে, ক্লাস শুরু হয় ৭:৫০ মিনিটে)

স্কুলটা ওই মেয়ের বাসা থেকে মাত্র ৪ ব্লক দূরে

মেয়েটা যে নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেটা মাঝরাতের আগে পুলিশকে জানানো হয়নি

(ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে গভীর রাতে জানানো হয়েছে)

বাবা-মা ভেবেছিলেন মেয়েটা কাজে গেছে (আর্ট গ্যালারি), স্কুল শেষ করে (কিন্তু

স্কুলেও যায়নি মেয়েটা)

ফ্রয়েড রেনল্ডস

স্ত্রী: লিয়ান রেনল্ডস

কাজ করতেন ইউনিমেড আমেরিকা হেল্থকেয়ারে, বীমার বিক্রয়প্রতিনিধি ছিলেন

কোনো ঋণ নেই? তাঁর স্ত্রী তা-ই বলেছেন।

হসম্যান চেক করে দেখছে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১১৮

অরাজকতা

অচেনা সেই লোক

* খুব সম্ভব একটা ধূসর পিকআপ চালাচ্ছিল। সেটার পেছনে ছিল একটা ওয়াটার
ট্যাঙ্ক

* হয়তো কোনো সুইমিং পুলে কাজ করে (ক্লিনিং/সার্ভিসিং)

* ১১ সাইজের ওয়াক বুটের ছাপ পাওয়া গেছে,
ড্রাইভারের সিটের পেছনদিকে
রেনল্ডসের গাড়ি (লেক্সাস এলএস)
জোর খাটিয়েছিল লোকটা?

অ্যাসাইনমেন্ট:

- * স্টারবাকস ফুটেজ (১ দিনের) ... ক্লোজ
- * এলার কম্পিউটার, ফোন, ই-মেইল ... ক্লোজ
- * লিলির সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, ফোন রেকর্ড, ই-মেইল
(ফোন এবং কম্পিউটার দুটোই হারানো গেছে) ... ক্লোজ
- * অচেনা সেই লোক হয়তো পার্কে ঢুকছিল; ফুটেজ বড় করে দেখা ... ক্লোজ
- * পার্কের ক্যামেরা কি টিলে করে রাখা হয়েছিল? আগের ফুটেজ দেখা ... ক্লোজ
- * ভিডিয়ো দেখে ট্রাকের মডেল সম্পর্কে জানা ... ক্লোজ
- * লিলি যে-পথে স্কুলে যেত, সে-পথ ধরে হাঁটা এবং গ্যাব্রিয়েল ডিগানের সঙ্গে
কথা বলা ... ক্লোর এবং সোফি
- * গ্যালারিতে যাওয়া ... পোর্টার এবং ন্যাশ
(ম্যানেজার = মিসেস এডউইন্স)
- * পার্মিট অফিসের সূত্র ধরে শিকাগোর লবণাক্ত পানির পুলের তালিকা তৈরি করা
... ক্লোজ
- * স্থানীয় অ্যাকুয়ারিয়াম এবং অ্যাকুয়ারিয়াম সাপ্লাই হাউসগুলোতে খোঁজ নিতে
হবে
- * রেনল্ডস পরিবারের ঋণের ব্যাপারটা চেক করে দেখবে হসম্যান



২১.

পোর্টার

দ্বিতীয় দিন, বেলা ১২:১৮

একটা বিগ ম্যাক (ম্যাকডোনাল্ড'স-এর বড় হ্যামবার্গার) দরকার পোর্টারের।

আর শুধু বিগ ম্যাকই না, সঙ্গে চাই বড় ফ্রাই, চকলেট শেক, এবং ডেজাট হিসেবে অ্যাপেল পাই।

ভীষণ দরকার। রীতিমতো একটা লালসা পেয়ে বসেছে ওকে। সেই লালসা ওকে ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সোজা হাজির করল তিন ব্লক দূরের ওয়াব্যাশ-এ। তারপর সরাসরি সবচেয়ে কাছের ম্যাকডোনাল্ড'স-এ। দিনের এই সময়ে বলতে গেলে গমগম করছে জায়গাটা। খাবারের অর্ডার দিল সে। তারপর সে-খাবার নিয়ে বসে পড়ল দোকানের পেছনদিকে ছোট একটা টেবিলে। প্রতিটা কণা গলাধঃকরণ করল। মিনিট সাতেক পর টের পেল, খালি একটা ট্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে। আকাশে মেঘ ডাকলে যে-রকম আওয়াজ হয়, এখনও যেন সে-রকম শব্দ আসছে ওর পাকস্থলীর ভেতর থেকে।

হিদারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে খুব। ওর হৃৎপিণ্ডের ভেতরে যেন বিশাল একটা গর্ত ছিল, হিদারের কণ্ঠ শুনতে পেলে ভরাট হয়ে যেত সেটা, এখন রীতিমতো জ্বালাপোড়া করছে জায়গাটা।

আজ ছ'মাস হতে চলল মারা গেছে হিদার। অথচ পোর্টারের মনে হয়, জীবনচক্রের ছ'হাজার বছর যেন কাটিয়ে দিয়েছে সে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে ছাড়া। লোকে ওকে বলেছিল, সময় সব ক্ষত সারিয়ে দেবে। বলেছিল, হৃৎপিণ্ডের সেই শূন্যস্থান ভরাট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। কিন্তু সে-রকম কিছু হয়নি। বরং শূন্যস্থানটা মনে হয় আরও বড় হচ্ছে। পোর্টার টের পাচ্ছে, প্রতিদিন আগের চেয়েও বেশি মিস করছে সে হিদারকে।

গত মাসের হিদারের সেল ফোন সার্ভিস বাতিল করে দিয়েছে সে। তার আগপর্যন্ত নিয়মিত ফোন করেছে হিদারের নম্বরে। কখনও কখনও দিনে তিন-চারবারও কল করেছে। উদ্দেশ্য একটাই... লাইনের ও-প্রান্তে হিদারের মিষ্টি কণ্ঠটা শোনা। ও-প্রান্ত মানে যথেষ্ট একটা দূরত্ব; তাতে কণ্ঠটা জীবিত বলে মনে হয়। আসল বলে মনে হয়। পুরো ব্যাপারটা একটা বোকামি ছাড়া আর কিছু না, জানে পোর্টার, কিন্তু হিদারের কণ্ঠ শোনার জন্য ওই একটামাত্র উপায়ই ছিল ওর। সে যত শক্ত করেই ধরে রাখুক না কেন, হিদারের উপস্থিতি ওর জীবন থেকে ফিকে হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ওই মানুষটার শরীর হয়তো মরে গেছে ছুট করেই, কিন্তু আত্মাটা যেন রয়ে গেছে এখনও। নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে সেই আত্মার হাত আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল পোর্টার। তারপর একসময় বুঝতে পেরেছে, কোনো উপায় নেই ওর। আর সে-রাতেই হিদারের সেল ফোনটা বন্ধ করে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১২০

অরাজকতা

দিয়েছিল সে। পরদিন সকালে যখন ফোন করে বিশেষ ওই নম্বরে, হিদারের বদলে একটা রোবট-কণ্ঠ সাড়া দেয়... বলে, নম্বরটা আর চালু অবস্থায় নেই। ঠিক সে-মুহূর্তে পোর্টারের হাত থেকে ছুটে যায় হিদারের হাত, গায়েব হয়ে যায় ভালোবাসার মানুষটা।

এমন যদি হতো, হিদারকে ফিরে পাওয়ার জন্য কাউকে খুন করতে হতো পোর্টারকে, তা হলে তা-ই করত সে।

অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও। অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও ফিরে পেতে চায় সে হিদারকে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে চায়। জিজ্ঞেস করতে চায়, এরপর কী করবে।

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি,’ নিচু গলায় বলল পোর্টার।

বুকফাটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। উঠে দাঁড়াল। এঁটো বলতে যা-কিছু আছে, জোগাড় করে নিল। দরজার কাছে একটা ক্যান আছে, উপচে পড়ছে সেটা, সেখানে ফেলে দিল ওসব। সবশেষে বেরিয়ে এল দোকান থেকে, পা রাখল বরফশীতল একটা দিনে। স্বাগত জানাল সে-দিনের অসাড়তাকে।

ঘুরে বেড়াতে লাগল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে।

মিনিট বিশেক পর খেয়াল করল, ফ্লোর টাওয়ারের লবিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। জুতোর তলার তুষার গলে গিয়ে ছোট একটা জলাশয় তৈরি হচ্ছে পায়ের কাছে। এখানে হাজির হওয়ার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না ওর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সময় একবার ভাবল ফিরে যাবে কি না। কিন্তু তার বদলে টের পেল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লবির দিকে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু দেখছে না। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন।

‘ডিটেকটিভ?’

ওর দিকে মেয়েটাকে এগিয়ে আসতে শোনেনি পোর্টার। আশাও করেনি, এভাবে এগিয়ে আসবে মেয়েটা। কিন্তু ওই তো... ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ওই মেয়ে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

‘হ্যালো, এমোরি।’

শেষবার এমোরির সঙ্গে পোর্টারের দেখা হয়েছিল হাসপাতালে। তখন মাত্র কিছুক্ষণ আগে ফোর মাস্কি কিলারের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ওই মেয়েকে। বেলমন্টের একটা বিল্ডিং, একটা এলিভেটর শ্যাফটের তলদেশে মেয়েটাকে আটকে রেখেছিল বিশপ। আসলে একটা টোপ হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল ওই মেয়েকে... যাতে আকৃষ্ট করতে পারে পোর্টারকে। অপুষ্টিতে ভুগতে শুরু করেছিল বেচারী। অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল। চামড়া হয়ে গিয়েছিল মড়ার মতো পাগুর। বড় রকমের ক্ষতির শিকার হয়েছিল ওর ডান হাতের কজি। কারণ মেয়েটাকে বেঁধে রাখার কাজে হাতকড়া ব্যবহার করেছিল বিশপ। শুধু তা-ই

না, মেয়েটার বাঁ কান কেটে নিয়েছিল সে। তারপরও সেদিন হাসতে সক্ষম হয়েছিল মেয়েটা।

এই ক'মাসে চুল লম্বা হয়েছে ওর। চেহারা ভরাট হয়েছে। গালে রঙ লেগেছে।

‘ডিটেকটিভ, আপনি ঠিক আছেন?’

‘আমি... আমি আসলে দুঃখিত। এখানে কেন হাজির হয়ে গেছি, সে-ব্যাপারে নিজেই আসলে নিশ্চিত না। এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, জানো তুমি, কিন্তু তারপর এত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম... সময়ই করে উঠতে পারলাম না আর।’

‘চলুন কোথাও বসি।’ হাত বাড়িয়ে পোর্টারের একটা হাত ধরল এমোরি। লবির এককোণায় একটা ফায়ারপ্লেস আছে, সেটার সামনে রাখা হয়েছে কয়েকটা কাউচ; পোর্টারকে সেখানে নিয়ে গেল সে। শব্দ তুলে ফাটল একটা গাছের-গুঁড়ি, মোটা শিখা দেখা দিল ফায়ারপ্লেসে, বাইরে বেরিয়ে এল উত্তাপ, আশপাশের বাতাসকে জড়িয়ে ধরল যেন।

গ্লাভস খুলে ফেলল পোর্টার। নার্ভাস ভঙ্গিতে মোচড়ামোচড়ি করছে আঙুলগুলো। ‘মনে হয় এখানে আসাটা উচিত হয়নি আমার।’

হেসে ফেলল এমোরি। ‘বোকার মতো কথা বলছেন আপনি... আপনাকে দেখে ভালো লাগছে আমার। আপনাদের পুলিশ স্টেশনে কম করে হলেও এক ডজনবার থামতে চেয়েছি আমি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভেতরে ঢোকাটা হয়নি আর। বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা। আমার মনে হয় যা ঘটে গেছে, তার পর কী নিয়ে যে কথা বলবো আমরা, সেটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন মনে হয়েছে, জানেন? মনে হয়েছে, অন্য কারও বেলায় ঘটে যাওয়া কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি যেন। মনে হয়েছে, কয়েক মাস আগে আমি যেন কোনো সিনেমা দেখেছি এবং সিনেমা-হল ছেড়ে বের হতে পারিনি। বন্ধুদের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলতে পারিনি। ওরা কিছু বুঝবে না। কথা বলিনি মিস বারোর সঙ্গেও। তিনি কী করেছেন, জানেন? বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওই গল্প ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন আমাকে... তা-ও আবার কয়েকবার। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না। ফলে হয়েছে কী... খুবই অস্বস্তিকর একজন মানুষে পরিণত হয়েছেন তিনি আমার জন্য। যা হোক, দুঃস্বপ্নটা আমার। আর তাই তাঁকে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয় না। ওসব বীভৎস চিন্তাভাবনা তাঁর মাথায় ঢোকানোর কোনো মানে হয় না।’

‘তুমি কি কোনো মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করেছ?’

আরও একবার হেসে ফেলার পালা এমোরির। মাথা নাড়ল। ‘তাঁরাই বরং আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন মনে হয়। ও-রকম কত ডজন লোক যে যোগাযোগ করেছিলেন সেজন্য, নিজেও জানি না আমি। তাঁদের একজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম

না মন থেকে... আমি ওই মহিলাকে যা-যা বলবো সেসব নিয়ে একটা বই লেখার কথা ভাবছিলেন তিনি। ফলে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হই। কিছুই বলতে পারিনি তাঁকে।’

‘সে-রকম কোনো কাজ করার অনুমতি তাঁদের কারও আছে বলে মনে হয় না আমার। লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।’

‘আমারও তা-ই মনে হয়।’

কোলের ওপর হাত রেখেছে এমোরি। পোর্টার এখনও দেখতে পাচ্ছে, মেয়েটার ডান কজিতে হালকা একটা দাগ রয়ে গেছে। তবে ওর ওই হাতের বেশিরভাগ অংশের বেলায় দারুণ কাজ দেখিয়েছেন সার্জনরা... ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছিল তার প্রায় সবটুকুই মেরামত করে দিয়েছেন। মেয়েটার বাঁ হাতের কজিতে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি “এইট”-এর ছোট্ট একটা ট্যাটু... কাজটা বিশপের।

হাত তুলল মেয়েটা, জামার হাতা নামিয়ে দিল। ‘ডাক্তাররা ভালো কাজ দেখিয়েছেন, না?’

‘কী ঘটে গিয়েছিল তা যদি জানা না থাকত আমার, আমি কখনও কল্পনাও করতে পারতাম না ব্যাপারটা। তোমার হাতের সেই আঘাত এখন আর দেখা যায় কি যায় না।’

‘আগামী মে মাসে আবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আমার। তিনি বলেছেন, এই দাগ নাকি পুরোপুরি তুলে ফেলা সম্ভব হবে। তবে তার আগে আহত জায়গাটা যাতে সেরে উঠে সেজন্য সময় দিতে হবে আমাদেরকে,’ পোর্টারকে বলছে এমোরি, কজিটা মোচড়াচ্ছে। ‘এখনও এই জায়গা পুরোপুরি মোচড়াতে পারি না আমি। তবে আপাতত যা মনে হচ্ছে... আগের অবস্থায় ফিরে আসছে জায়গাটা।’

পোর্টারের চোখ ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে গেল মেয়েটার বাঁ কানের দিকে। গাঢ় বাদামি চুলের আড়ালে লুকিয়ে আছে সে-কান। সামলে নিল নিজেকে, আরেকটু হলে নজর ফিরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সহসা টের পেল, সে আসলে বোকা বানাচ্ছে না কাউকে। ‘তোমার কানের কী অবস্থা?’

চওড়া একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল এমোরির চেহারায়। ‘দেখতে চান?’

পাল্টা হাসি উপহার না দিয়ে পারল না পোর্টার। ‘খারাপ কোনো কিছু না তো আবার?’

‘আপনিই বলুন?’ চুল পেছনের দিকে সরিয়ে ফেলল এমোরি। ওর বাঁ কান দেখা যাচ্ছে, সেটা দেখতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। ‘সুন্দর, না?’

সামনের দিকে ঝুঁকল পোর্টার। ডাক্তাররা এমোরির শরীরের যে-জায়গায় আলাগা কান লাগিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ছোট্ট একটা কাটা-চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ওটার কথা যদি বাদ দেয়া হয়, পোর্টার বলতে পারবে না, ওই কান এমোরির আসল নাকি কৃত্রিম। ‘বিস্ময়কর।’

পরনের কাপড়ের ডান হাতাটা গুটিয়ে নিল এমোরি, ওর কনুইয়ের নিচে ছোট একটা কাটা-দাগ দেখাচ্ছে। ‘ডাক্তারটা কী করেছিলেন, জানেন? আমার পঁজর থেকে তরুণাঙ্ঘ্রি নিয়ে সেটা বড় করেছিলেন এই জায়গায়। মাত্র কয়েক মাস সময় লেগেছিল ওই কাজে। আজ থেকে ছ’সপ্তাহ আগে হয়েছে অপারেশনটা। ডাক্তার বলেছিলেন, বিশপ লোকটা নিখুঁতভাবে রীতিমতো একজন সার্জনের দক্ষতায় কেটে নিয়েছিল আমার কান, আর তাই নতুন কানটা জায়গামতো লাগিয়ে দিতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি তাঁর। কাজেই বলতেই হয়, আমার কপাল একদিক দিয়ে ভালো।’

‘তুমি মনে হয় খুব শক্ত মনের একজন মানুষ।’

‘আমার কাছে সবচেয়ে ভালো যেটা লাগছে, সেটা দেখাবো?’

‘কী?’

মাথা ঘোরাল এমোরি, অন্য কানটা দেখাল পোর্টারকে। ‘দুটো কানের মধ্যে পার্থক্য বলতে কিছু নজরে পড়ছে আপনার?’

ব্যাপারটা ঠাহর করতে একটু সময় লাগল পোর্টারের। ‘তোমার ডান কানে ছিদ্র করা আছে। কিন্তু বাঁ কানে সে-রকম কিছু নেই।’

‘হ্যাঁ,’ খুশিতে ঝকঝক করছে এমোরির চেহারা। ‘বাঁ কানে ছিদ্র ছিল একসময়। এখন আর নেই। আমার মনে হয় বাঁ কানটা এভাবেই রেখে দেবো আমি, আর কোনো ছিদ্র করাবো না।’ মেলে ধরল বাঁ দিকের কজিটা। অন্তহীনতার প্রতীক হিসেবে যে-ট্যাটু করেছে সেখানে বিশপ, সেটা দেখাল। ‘এই জিনিস আমার শরীরে রাখবো নাকি রাখবো না, সে-ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। যা ঘটে গেছে, ছোট কোনোকিছু যদি সেটা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাকে, তা হলে আমার মনে হয় মন্দ হয় না। খারাপ কোনোকিছু স্মরণ করাটা কখনও কখনও ভালো। তার ফলে কী হয়, জানেন? অন্য আরও কিছু ঘটনা অত ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় না।’

‘তুমি... কী বলবো... সত্যিই উল্লেখযোগ্য একটা মেয়ে। তোমার সাহস অন্যদেরকে অনুপ্রেরণা জোগানোর মতো।’

চুল ছেড়ে দিল এমোরি, আগের জায়গায় ফিরে এল সেটা। ‘আপনাকে ধন্যবাদ, ডিটেকটিভ।’

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা দু’জন। এই নীরবতা বেমানান কিছু না। বরং স্বস্তিদায়ক কোনোকিছুর চেয়ে একটু বেশি যেন। পোর্টার টের পেল, ফায়ারপ্রেসের শিখার দিকে তাকিয়ে আছে সে। সেসব শিখা গাছের গুঁড়িগুলোকে যেন পেঁচিয়ে ধরেছে সেখানে। মরা কাঠ আস্তে আস্তে লাল আর সাদা হচ্ছে। একটু পর পর কাঠ-ফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে; সেটা বেশ প্রশান্তিদায়ক বলে মনে হচ্ছে। আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছে।

সামনে বসে-থাকা ওই মেয়ে শিশুকালে ওর মাকে হারিয়েছে। কয়েক মাস আগে হারিয়েছে বাবাকে। তারপরও হাসছে। হেসে ওঠার একটা তাড়না নিজের ভেতরে অনুভব করছে পোর্টার। সত্যিই হাসতে চায় সে। এবং সেটা প্রাণখুলে।

ওর মনের কথা যেন পড়তে পারল এমোরি। ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ‘বাবা বলতে যা বোঝায়, আমার জন্য সে-রকম ভূমিকা তেমন একটা পালন করেননি ওই লোক। তাঁকে সত্যি বলতে কী তেমন একটা চিন্তামণ্ড না আমি। টাকার কথা যদি বাদ দিয়ে বলি, আমার মা তাঁর নিজের উইলে যেভাবে যেসব পরিবর্তন করিয়ে নিয়েছিলেন, তাতে মনে হয় না আমার মুখটাও আর দেখতে চাইতেন ওই লোক।’

‘তারপরও তিনি তোমার বাবা। আমি নিশ্চিত, তোমার জন্য কোনো না কোনো পরোয়া ছিল তাঁর মনে। হয়তো সে-আবেগ সঠিকভাবে দেখাতে পারেননি তিনি।’

‘মানুষটা ভয়ঙ্কর ছিলেন,’ নিচু গলায় বলল এমোরি। ‘এবং সেটা শুধু আমার জন্য না। অন্য আরও অনেকের জন্য।’

এই কথার বিপরীতে কিছু বলবে কি না, মেয়ের কাছে ট্যালবটের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে কি না... এসব নিয়ে একটু ভাবল পোর্টার। শেষে সিদ্ধান্ত নিল, সে-রকম কোনো কাজ না-করাটাই ভালো হবে। এই মেয়ে বয়সের তুলনায় পরিণত হয়ে গেছে। আর তাই সত্যি কথাটা জানা দরকার ওর। ‘ওই লোক আর তুমি এক না। কথাটা মনে রাখা জরুরি। ওই লোক কখনও তোমার মতো ছিলেন না।’

দু’চোখ পানিতে ভরে এল এমোরির, নিজেকে সামলানোর জন্য যুঝছে। ‘সংবাদমাধ্যম কিন্তু সে-কথা বলছে না। বরং বলছে, আমার বাবার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি চলে গেছে এক খুকির কাছে। ফলে বাবার ব্যবসা চালানোর জন্য এখন আর কেউ নেই। তাঁর আকাশছোঁয়া দালানগুলোর একটা গত মাসে বন্ধ করে দিয়েছে বিল্ডিং ইন্সপেক্টররা। এবং সেজন্য সংবাদমাধ্যম দোষ দিয়েছে আমাকে। প্রায় চার হাজার মানুষ চাকরি হারিয়েছে, এবং সেটাও নাকি আমার দোষেই।’

ওই বিল্ডিংয়ের খবর জানা আছে পোর্টারের। ওটার নির্মাণকাজে বাজে মানের কঙ্কিট ব্যবহার করেছিলেন ট্যালবট। তাঁর এই শর্টকাট পদ্ধতির খবর যখন জানাজানি হয়, তখন তিনি বিল্ডিংটা ঠিকমতো বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয় ওই প্রোজেক্টের কাজ। ৭০০ মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি খরচ হয়ে গেছে ততদিনে। ওদিকে বিল্ডিংটা ভেঙে ফেলারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।

‘ট্যালবট এন্টারপ্রাইজে রীতিমতো যুদ্ধ চলছে এখন,’ বুঝিয়ে বলার কায়দায় বলতে লাগল এমোরি। ‘বাবার উইল নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছেন তাঁর তিনজন সিনিয়র অফিসার। তাঁদের বক্তব্য একটাই: জোর করে সেই উইল লিখিয়ে নেয়া

হয়েছে বাবাকে দিয়ে। শুধু তা-ই না, তাঁরা বলছেন, মা নাকি জোর খাটিয়েছেন বাবার ওপর, ফলে বাবা সবকিছু লিখে দিয়ে গেছেন আমার নামে। ওই তিনজন এখন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কীভাবে ছোঁ মেরে নিজেদের জন্য কিছু টাকা কামাই করে নেয়া যায়। ফলে কী হচ্ছে... প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া বাকিই রয়ে যাচ্ছে। এভাবে একটু একটু করে রীতিমতো ভেঙে পড়ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানটা। সবকিছু যে নিজের মতো করে সামলে নেবো আমি, সবকিছু যে নিজের দখলে নেবো, সে-বয়স এখনও হয়নি আমার। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে প্যাট্রিশিয়া ট্যালবট। যতদিন পর্যন্ত কেউ একজন সব দায়িত্ব বুঝে না নিচ্ছে, ততদিন কাজ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সে।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ‘সরাসরি আমার নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে সে। বলেছে, সবকিছু এভাবে আমাকে দিয়ে যাওয়ার কোনো অধিকার নাকি নেই আমার বাবার। বলেছে, সবকিছুর আইনসম্মত অধিকার একমাত্র তার। এরপর আছে কার্নেগি...’

কার্নেগি, মানে ট্যালবটের অন্য মেয়ের ব্যাপারে সবকিছুই জানা আছে পোর্টারের। ওই লোক মারা যাওয়ার আগে পত্রিকার নিয়মিত খবরে পরিণত হওয়ার অভ্যাস ছিল মেয়েটার। শহরের এখানে-সেখানে পার্টি করে বেড়াত সে, আইন ভাঙত, আর খেপ্তার হতো পুলিশের হাতে।

‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমার নামে সমানে কুৎসা রটনা করে চলেছে কার্নেগি। যখনই কোথাও কোনো সাক্ষাৎকার দেয়ার সুযোগ ঘটছে তার, ওই একই কাজ করছে। সুযোগ পাওয়ামাত্র বদনাম করছে আমার। সে সবার সামনে বার বার বলছে, আমি নাকি একটা জারজ। আমি নাকি কুত্তী। “বাস্টার্ডবিচ” শব্দটার সঙ্গে হ্যাশট্যাগ জুড়ে দিয়ে নিজের প্রতিটা মেসেজ শেষ করছে সে। অথচ ওর সঙ্গে কখনও দেখাও হয়নি আমার। তারপরও এমন এক মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সে, মনে হচ্ছে, চলতি পথে যদি কখনও দেখা হয় আমাদের, কলম দিয়ে আমার চোখ উপড়ে নেবে যেন।’

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না এমোরি, কেঁদে ফেলল। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল পোর্টার।

মিনিটখানেক পর চোখ মুছল মেয়েটা। ‘স্বার্থপরের মতো আচরণ করছি আমি... বকবক করে চলেছি কেবল নিজের ব্যাপারে। আপনার কী খবর? কেমন চলছে আপনার দিনকাল?’ জানতে চাইল। ‘ওই মেয়ে দুটোর ব্যাপারে শুনেছি আমি। পত্রিকাওয়ালারা বলছে, কাজটা নাকি ফোর মাক্সি কিলারের। আপনি যদি সাংঘাতিক ভুলটা না করতেন... মানে, আপনি যদি ছেড়ে না দিতেন ওই লোককে, তা হলে সে নাকি এ-রকম কোনো কাজ করতে পারত না। ট্রিবিউন তো বলেই দিয়েছে, আপনি অবলীলায় চলে যেতে দিয়েছেন ফোর মাক্সি কিলারকে।’

‘এখনকার মেয়ে দুটোকে যে-লোক অপহরণ করেছে, সে ফোর মাক্সি কিলার না।’

‘তা-ই নাকি?’

‘না,’ বলল পোর্টার।

চোখ মুছে ফেলল এমোরি, জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। ‘হারিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি। আমাকেও তো খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন।’

এই মেয়ের কথা যেন সত্যি হয়, সে-ব্যাপারে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল পোর্টার।

ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হয়েছে। এবার যেতে হবে পোর্টারকে।

এমোরি যেভাবেই হোক বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কাউচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। একই কাজ করল পোর্টারও। ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। ‘কোনো মনোরোগবিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব না আমার পক্ষে। আবার কি কখনও কথা বলা সম্ভব হবে আপনার সঙ্গে? যদি আমার কথা শুনতে রাজি থাকেন আপনি?’

‘সে-রকম কিছু করতে পারলে মনে হয় ভালোই লাগবে আমার।’

‘হ্যাঁ, আমারও ভালো লাগবে।’

ফ্লোর টাওয়ার ছেড়ে যখন বেরিয়ে এল পোর্টার, ওর মনে হতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের সেই গর্তটা কিছুটা হলেও যেন ভরাট হয়েছে।



‘না! আর না!’ চোঁচাচ্ছে লিলি।

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওই লোক। বড়সড় দুই হাতে খামচে ধরেছে যে-লেপ দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে মেয়েটা, সেটা। টানাহেঁচড়া করছে। বলল, ‘কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমাদের।’

সাঁতসেঁতে মেঝের ওপর দিয়ে চট করে সরে যেতে চাইছে লিলি, কিন্তু কাজটা করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। পিছলে যাচ্ছে বার বার। পিছলে যাচ্ছে পা দুটো। ভেজা ভেজা কঙ্কিট খামচে ধরতে চাইছে। টের পেল, হাজির হয়ে গেছে খাঁচার পেছনদিকের এককোণায়। আর পেছনে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ‘প্লিজ থামুন!’

স্টান গান তুলল ওই লোক, তাক করল লিলির দিকে। চাপ দিল বাটনে। ধাতব সেই কাঁটা দুটোতে খেলা করে উঠল বিদ্যুৎ, দেখতে পেল লিলি। ওজোনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে, টের পেল সেটাও। ‘একটা ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। তারপর আবার কাজটা করবো আমরা। কথা দিলাম। কথা দিলাম।’ বলার চেষ্টা করল কথাগুলো। কিন্তু এত জোরে কেঁপে উঠল যে, ভাঙা ভাঙা কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারল কেবল।

ওই কাজ যদি আবারও করে ওরা, তা হলে এই নিয়ে মোট চারবার... না, পাঁচবার করা হবে সেটা। নাকি তৃতীয়বার? নিশ্চিত হতে পারছে না লিলি। কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা, চিন্তাগুলো একত্রিত হতে পারছে না সেখানে। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... কোনো একটা গিঁট লেগে গেছে ওর সচেতনতায়। এবং সে-কারণে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না মস্তিষ্কটা। চোখের সামনে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য তুষারকণা। ফলে আশপাশে কী ঘটছে, ঠাहर করা মুশকিল হয়ে গেছে। এই বেসমেন্টের ভেতরে যেন বয়ে চলেছে একটা তুষারঝড়। আশপাশের সবকিছু যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ধূসর হয়ে গেছে।

ওর দিকে যেন তুষারের সেই পর্দা ভেদ করে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা, বাঁ হাতের আঙুলগুলো মেলে দিয়েছে। ‘এবার, আমরা কিন্তু খুব কাছাকাছি আছি।’

ডান হাতটা লিলির ইঞ্চিখানেকের মধ্যে নিয়ে এসেছে লোকটা। সে-হাতেই ওই স্টান গান ধরে রেখেছে সে। জিনিসটা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে লিলির গলা। আরেকটা শকের ব্যথা সহ্য করার মতো শক্তি আর নেই বেচারীর। এই ব্যথা মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও খারাপ।

মরতে কেমন লাগে, তা-ও এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে মেয়েটার।

ওর চেহায়ায় স্টান গানটা ঠেসে ধরল ওই লোক, চোখের সামনে নিয়ে চাপ দিল বাটনে।

‘ঠিক আছে!’ চিৎকার করে উঠল লিলি। অন্তত চিৎকার করার চেষ্টা করল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে শুরু করেছে, আর তাই কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না ঠিকমতো।

কিছুটা দূরে সরে গেল লোকটা। খালি হাত দিয়ে চুলকাল নিটের সেই ক্যাপ। ওটার নিচে থাকা কালশিটে-পড়া একটা কুৎসিত একটা ক্ষতে আরাম দিচ্ছে আসলে।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল লিলি, পারল না। ভাঁজ হয়ে গেল ওর দু’পা। মনে হচ্ছে, পা দুটো যেন জেলি দিয়ে বানানো।

আগে বাড়ল লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিল লিলির দিকে। দাঁত দিয়ে নখ কেটেছে সে তাড়াহুড়ো করে; লাল হয়ে আছে আঙুলের প্রান্তগুলো, ফুলে আছে।

নিজের আঙুলগুলো দিয়ে ওই লোকের আঙুল জড়িয়ে ধরল লিলি। লোকটার হাতের তালু কেমন যেন ঠাণ্ডা। আঠালো। এই লোককে স্পর্শ করতে চায় না সে। কিন্তু একইসঙ্গে এ-ও জানে, নিজে নিজে দাঁড়াতে পারবে না এই মুহূর্তে। অথচ দাঁড়াতে হবে ওকে। নইলে আরও বেশি ব্যথা পেতে হবে। এই লোক দেবে সেটা।

খাঁচা থেকে মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এল ওই লোক। সিঁধে হয়ে থাকার জন্য নিজের বেশিরভাগ ওজন লোকটার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বেচারী।

পানির ট্যাঙ্কের কাছে যখন পৌঁছে গেল দু’জন, মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকাল লিলি। তাকাল ওই লোকের অস্পষ্ট আর নিষ্প্রাণ চোখ দুটোর দিকে। ‘ত্রিশ মিনিট, প্লিজ। আমাকে একটু বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিন।’

‘আমরা কিন্তু খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।’

টানা অনেকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল লিলি। প্রতিটা মুহূর্ত পার হচ্ছে একেকটা ঘণ্টার মতো। শেষপর্যন্ত মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। ঘাড়ের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল লেপটা, ছেড়ে দিল। ছেঁড়াফাটা জিনিসটা পড়ে গেল মেঝেতে, পড়ে থাকল ওর পায়ের কাছে। আগেরবার যখন পানিতে ডোবানো হয়েছিল ওকে, তারপর আর কাপড় পরেনি। কারণ তখন লোকটা বলেছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে আবারও একই কাজ করতে যাচ্ছে সে। কাপড় পরার বদলে কুঁকড়ে গিয়ে শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে ধরেছিল নরম সবুজ লেপটা। এই লেপ এখন ওর হয়ে গেছে। খাঁচার ভেতরে কুঁকড়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল সে এই লেপের ভেতরে। অপেক্ষা করছিল। পরার জন্য যেসব কাপড় ওকে দিয়েছিল ওই লোক, দেখেছিল সেগুলো। লোকটা বলেছিল, ওসব কাপড় নাকি তার মেয়ের। সব কাপড় সুন্দরভাবে ভাঁজ করে রাখা ছিল খাঁচার ভেতরে, দরজার কাছে।

লিলি ভেবেছিল, এই বাড়িতে ওরা শুধু দু’জনই আছে... সে আর ওই লোক। শেষবার, ঘণ্টাখানেক কিংবা তার কিছু বেশি সময় আগে, লিলি চিৎকার করে

ডেকেছিল ওই লোকের মেয়েকে। কেউ জবাব দেয়নি। লিলি কল্পনায় ভেবে নিয়েছিল, ওর সমান বয়সের কোনো একটা মেয়ে ওপরতলার বেডরুমে একা বসে আছে। দু'হাত দিয়ে চেপে ঢেকে রেখেছে দু'কান। বেসমেন্টে যা করছে তার বাবা, সেটা মেনে নিতে নারাজ সে। মেনে নেবেই বা কীভাবে? সুস্থ-স্বাভাবিক কোনো মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব এ-রকম কোনো কাজ? প্রথমদিকে লিলির বিশ্বাস করতে বাধছিল, এখানে যা ঘটছে তা জানা আছে ওই লোকের মেয়েটার। কিন্তু আস্তে আস্তে ঠাহর করতে পারে, মেয়েটা নিশ্চয়ই জানে এসব। এই বাড়ি অত বড় না। লিলিদের নিজেদের বাড়িটা এই বাড়ির চেয়ে অনেক বড়। এখানে বেসমেন্টে কেউ যদি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, সেটা ওপরতলা থেকে অন্য কারও শুনতে পাওয়ার কথা। সুতরাং এই লোকের মেয়ে সবই বুঝতে পারছে। অথচ কিছুই করছে না লিলির জন্য।

‘তুকে পড়ো ভেতরে,’ বলল লোকটা।

মুখ নামিয়ে পানির দিকে তাকাল লিলি। জানে, পানিটা গরম। অন্তত এই বেসমেন্টের তুলনায়। এবং সেই উষ্ণতা আরামদায়ক। স্বস্তিদায়ক। কিন্তু সারাজীবনে যা-কিছু নিয়ে ভয় পেয়েছে মেয়েটা, সে-সবকিছুর চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে এই পানিকে। বেশি ভয় পাচ্ছে ওর বাবা-মায়ের রাগের চেয়েও। ভয়ঙ্কর কোনো আঘাতের চেয়েও। এমনকী পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই লোকের চেয়েও।

এই পানি ওর জন্য মৃত্যুর সমান।

‘ভেতরে নেমে পড়ো,’ বলল লোকটা।

লম্বা করে দম নিল লিলি। একটা কাঁপুনি যেন রীতিমতো ছোট্টাছুটি করে বড়াচ্ছে ওর শরীরের ভেতরে, বড় করে দম নেয়ায় একটুও কমল না সেটা। কেমন যেন দুর্বল অনুভব করছে সে, সেটা ওর ভেতরে আরও বাড়ছে যেন। দুর্বলতাটা যেন আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে। আবারও দম নিল লম্বা করে। বড়সড় সেই ফ্রিজের একটা প্রান্তে হাত রাখল। উঠে পড়ল সেখান দিয়ে, নেমে পড়ল পানিতে। ওর মাথাটা পানির ওপর ধরে রেখেছে ওই লোক। আস্তে আস্তে পানির গভীরে ঢুকে যেতে লাগল সে। একসময় ওর কান দুটো ডুবে গেল পানির নিচে। আওয়াজ বলতে যা-কিছু ছিল এই বেসমেন্টে, সব হারিয়ে গেল ওর কান থেকে। এখন নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে। এমনকী চোখের পাতা যখন খুলছে আর বন্ধ করছে, সে-শব্দও শুনতে পাচ্ছে।

ওকে পানির ওপর একটুখানি তুলল ওই লোক। বাতাসের স্পর্শ পেল ওর কান দুটো। ‘এবার কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাকে।’ বলল লোকটা। ‘মনে রাখতে হবে সবকিছু।’

‘রাখবো,’ বলল লিলি।

মেয়েটাকে পানির নিচে ঢুকিয়ে দিল ওই লোক। ট্যাঙ্কের তলদেশের সঙ্গে যেন চেপে ধরেছে মেয়েটার দুর্বল শরীরটা। এবার ওই লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার

কোনো চেষ্টা করল না লিলি। এমনকী শেষবারের মতো একটুখানি দমও নেয়নি। তার বদলে শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল পানি। ফুসফুস দুটো আস্তে আস্তে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে পানিতে, ব্যথা লাগছে, কিন্তু সে-ব্যথা সহ্য করছে সে। কাশির দমক উঠতে চাইছে, জোর করে চেপে রেখেছে সেটা। আরও পানি টেনে নিল সে নিজের ভেতরে। এতক্ষণ ওই লোকের একটা ছবি যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছিল ওর মাথার ওপর, এবার ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল সেটা, তারপর একসময় সবকিছু কালো হয়ে গেল চোখের সামনে। আরও কিছুক্ষণ পর ব্যথা-বেদনার কোনো অনুভূতিই বাকি রইল না ওর। শেষবারের মতো নিজেকে মনে করিয়ে দিল, বিশেষ কিছু একটা মনে রাখতে হবে ওকে।

কিন্তু আর কখনোই জেগে উঠতে পারবে না সে।

‘আমার আশপাশে গ্রাউন্ড কফির সুবাস থাকবে না, একহাতে ভেন্টি ক্যারামেল ম্যাকিয়াটো থাকবে না, অথচ আপনি আশা করবেন আমি কোনো একটা জাদু দেখিয়ে দেবো... তা কি হয়, বলুন?’ বলল ক্রোজ। কেডজি’র স্টারবাকস-এ, ম্যানেজারের ডেস্কের পেছনে বসে আছে সে।

ঘরের ভেতরে বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই ঘর আয়তনে এক শ’ বর্গফুটের বেশি হবে না। ডেস্কটা যেন ঠেসে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে পেছনদিকের একটা দেয়ালের সঙ্গে। মেঝের প্রতিটা ইঞ্চি দখল করে রেখেছে বিভিন্ন রকমের সাপ্লাইয়ের বাস্ক। ক্রোজের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশ। ফলে ম্যানেজারকে বাধ্য হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে অফিসরুমের বাইরে, হলওয়াতে।

‘কী খাবেন আপনি?’ ন্যাশকে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার। লোকটার মাথায় বাদামি চুল। পাতলা হয়ে এসেছে সেগুলো। চোখে চশমা আছে। শরীরের কাঠামোটা যে-ওজন বহন করতে পারবে, তার চেয়ে কম করে হলেও ত্রিশ পাউন্ড বেশি ওজন লোকটার। অস্থির কায়দায় হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, সেইসঙ্গে হাত নাড়ছে। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করে ধূমায়িত কফির বাষ্প গ্রহণ করলে একটা মানুষের কী দশা হতে পারে, না ভেবে পারল না ন্যাশ। বলল, ‘একটা রেগুলার লার্জ কফি দেয়া যাবে আমাকে? কালো?’

‘ঠিক আছে। কী করা যায়, দেখছি।’

ন্যাশ দেখতে পেল, হল ধরে এগিয়ে গিয়ে দোকানের সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ক্রোজের দিকে ঘুরল সে। ‘বলো কী খবর।’

ক্রোজের সামনে মনিটরে তিনটা উইন্ডো খোলা আছে। চোখ সরু করে ফেলেছে সে, তৃতীয় উইন্ডোতে কী কী যেন লেখা আছে, সেসব পড়ছে। ‘এই জিনিসটা পুরনো। কম করে হলেও পাঁচ বছর তো হবেই। হার্ডড্রাইভটা মাত্র আধ গিগা’র। ক্যামেরাটা এইচডি। ১০৮০ পিক্সেলের।’

‘দেখো, এমন কোনো কথা বোলো না, যার কারণে আমার পক্ষ থেকে কোনো একটা আঘাত হজম করতে হয় তোমাকে। যা বলার, ইংরেজিতে বলো।’

চোখ উল্টানোর কায়দা করল ক্রোজ। ‘ক্যামেরাটা ডিটেইল ইমেজ ধারণ করছে। ফলে সেটা রেকর্ড করে রাখতে হার্ডডিস্কে চাই প্রচুর জায়গা। অথচ এই কম্পিউটারে সে-রকম কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে যা হচ্ছে... হার্ডডিস্কে যখন পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন পুরনো ইমেজের ওপর নতুন করে রেকর্ডিং শুরু হয়ে যাচ্ছে।’

‘তুমি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারলে?’

একটা উইন্ডো বড় করল ক্রোজ। সেখানকার লেখাটা পড়ছে। ‘সোফি যতখানি খারাপ বলেছিলেন, এই জিনিস কিম্ব আসলে ততটা খারাপ না। আমার মনে হয়, আড়াই দিনের পুরো রেকর্ডিং জোগাড় করে নেয়া সম্ভব। এবং তাতে কোনোকিছু ডিলিট করতে হবে না। এখানে একটা কথা বলে রাখি আপনাকে। কোনো কম্পিউটার যখন কোনো ডেটা ওভাররাইট করে, তখন কিম্ব সেটা লিনিয়ার বা দিনভিত্তিক পদ্ধতিতে করে না... আমরা যদি করতাম কাজটা তা হলে হয়তো ওভাবে করতাম। বরং বাইট অনুযায়ী করে। তার মানে হচ্ছে, পুরনো ভিডিয়ার ওপর যখন নতুন ভিডিয়ো জুড়ে বসে, তারপরও পুরনো ভিডিয়োটার টুকরো টুকরো অংশ রয়ে যায় হার্ডডিস্কে।’

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ন্যাশ। ‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, আড়াই দিনের পুরনো ভিডিয়ার স্ল্যাপশট বের করতে পারবে তুমি, কিম্ব পূর্ণাঙ্গ এবং নিরবচ্ছিন্ন কোনো ভিডিয়ো জোগাড় করতে পারবে না?’

নিঃশব্দ একটা দৈত্য হাসি ছড়িয়ে পড়ল ক্রোজের চেহারায়। ‘এই তো বুঝতে পারছেন এখন।’

‘আমাদের মেয়েটার ব্যাপারে কিছু জানা গেল?’

‘আমার মনে হয় ওই ব্যাপারে আসলে বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। ভিডিয়ো ফুটেজের যে-টুকরো টুকরো অংশের কথা বলেছি, সেগুলোকে একসঙ্গে জোড়া দেয়ার কাজে একটা প্রোগ্রাম ব্যবহার করছি আমি। কিম্ব এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরনো যে-ইমেজ পেয়েছি, সেটা দু’সপ্তাহ আগেরও না।’

‘এবং ওই মেয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছিল তিন সপ্তাহ আগে।’

‘হ্যাঁ।’

ম্যানেজার লোকটা ফিরে এল এমন সময়। দু’হাতে দুটো বড় কাপ। ওগুলো দিল ন্যাশ আর ক্রোজকে। কাপ হাতে নিয়ে গন্ধ ঝুঁকল ন্যাশ। তারপর চুমুক দিল একবার। ‘এটা কফিই তো, নাকি?’

‘ঠিক। আপনি তো সেটাই চেয়েছিলেন।’ কম্পিউটারের দিকে তাকাল ম্যানেজার লোকটা। ‘কিছু পাওয়া গেল?’

‘আরে এই জিনিস যত্নসব ফালতু ভিডিয়োতে ভর্তি হয়ে আছে।’

মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার। ‘শেষবার যে-ডিটেকটিভ এসেছিলেন, তাঁকে ওই একই কথা বলেছি আমি। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভেঙে যাচ্ছে এসব জিনিস, মালিকপক্ষ নতুন কোনোকিছুর কথা ভাবেও না। বিশ্বাস করুন, আমি নিজেই একবার ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলাম এসব। কিম্ব কী করবো... এখানেই তো কাজ করে খেতে হয় আমাদেরকে। যা হোক, দীর্ঘমেয়াদি ভিডিয়ো স্টোরেজের ব্যাপারে একটুও মাথাব্যথা নেই মালিকপক্ষের। যদি ডাকাতি হয় এখানে, তাঁরা চান সে-ভিডিয়ো যাতে রয়ে যায় হার্ডডিস্কে। কিম্ব এক কি বেশি হলে দু’দিনের ভিডিয়ো ফুটেজ ধারণ করে রাখার কোনো যৌক্তিকতা দেখতে পান না তাঁরা।’

আওয়াজ করে উঠল লোকটার ফোন। ওটা পকেট থেকে বের করল সে। ডিসপ্লের মেসেজটা পড়ল। তারপর বিশাল আকারের স্যামসাং ফোনটা ঢুকিয়ে রাখল আগের জায়গায়।

তার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রোজ। ‘আপনাদের এখানে তো ওয়াই-ফাই আছে, না?’

‘অবশ্যই।’

‘কী ধরনের?’

‘এ, বি, জি, এন, ২.৪ গিগাহার্টজের এসি এবং ৫।’

‘মানে সবচেয়ে ভালোটা? আপনাদের কাস্টোমাররা মনে হয় চায় এসব, না?’

মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার। ‘বিশেষ এই ব্যাপারে মালিকপক্ষ আবার বেশ টনটনে। আমাদের সেরা কাস্টোমাররাও এই জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করে।’

‘তুমি আসলে কী বের করছ?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

উঠে দাঁড়াল ক্রোজ। যেখানে যত তার দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছে ভালোমতো। বিশেষ একটা মোটা নীল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। অনুসরণ করতে লাগল ওটা। ঘরের এককোণায় তিন কেস কাপ স্তুপ করে রাখা হয়েছে, ওগুলোর পেছনে চলে গেছে তারটা; গিয়ে সে-জায়গায় হাজির হলো সে। কাপগুলোর আড়ালে কয়েকটা তাক দেখা যাচ্ছে। কন্টেইনারগুলো সরিয়ে রাখল একপাশে। এবার দেখা যাচ্ছে কয়েকটা গিজমো। বিভিন্ন বাতি জ্বলছে-নিভছে ওগুলোতে। এসব কী, চিনতে পারল না ন্যাশ। একটা ডিভাইসের সামনে থেমে দাঁড়াল। কালো একটা বাক্স। সেটার উপরিভাগ থেকে বেরিয়ে আছে দুটো অ্যান্টেনা। জিনিসটা উল্টাল ক্রোজ।

‘এখানকার ওয়াই-ফাই রাউটার। এই জিনিস একইসঙ্গে কাজ করছে অ্যাকসেস পয়েন্ট হিসেবে। এখানে আসার সময় দোকানের ভেতরে বসে থাকতে দেখেছি আমরা বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়েকে, মনে পড়ে? তাদের কেউ কম্পিউটার চালাচ্ছিল, কেউ আবার ব্যস্ত ছিল মোবাইল নিয়ে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তারা সবাই এসব রাউটারের মাধ্যমে যুক্ত ছিল ইন্টারনেটের সঙ্গে। দেখিয়ে দিল নিজের ম্যাকবুকটা। ‘দেখতে পাচ্ছেন? আমি আগেও স্টারবাক্সের রাউটার ব্যবহার করে ইন্টারনেটে ঢুকেছিলাম। তাই এখন আপনাপন সঙ্যুক্ত হয়ে গেছি। মোদা কথা হচ্ছে, এখানকার সবাই এখন যে-নেটওয়ার্কে আছে, আমিও সেই একই নেটওয়ার্কেই আছি।’ ল্যাপটপের স্ক্রিনে যেখানে ঘড়ি আছে, সে-জায়গার বিশেষ একটা আইকন দেখিয়ে দিল ইঙ্গিতে।

‘এসব তথ্য আমাদের ঠিক কোন কাজে লাগছে?’ ক্রোজকে জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

কিবোর্ডে আঙুল চালান ক্লোজ। নতুন একটা উইন্ডো চালু হয়ে গেল। সেখানে কিছু ডেটা এত দ্রুত আসা-যাওয়া করছে যে, ন্যাশ ঠিকমতো পড়তেও পারছে না।

‘ওসব হচ্ছে রাউটারের ট্রাফিক, রিয়েল টাইম অনুযায়ী।’ ম্যানেজারের দিকে তাকান ক্লোজ। ‘রাউটারের সঙ্গে লাগানো স্টিকারে নেটওয়ার্কের আইডি এবং পাসওয়ার্ড লিখে রাখা উচিত না। সম্ভাব্য কোনো হ্যাকার এই নেটওয়ার্কে ঢুকতে চাইলে আগে ও-রকম কোনো জায়গাতেই খোঁজ করবে আইডি-পাসওয়ার্ড।’

আত্মসমর্পণ করার কায়দায় হাত তুলল ম্যানেজার। ‘আমি এসবের কোনো কিছুতে হাত পর্যন্ত লাগাইনি। সবই মালিকপক্ষের কাজ।’

নিজের ম্যাকবুকের ওপর মনোযোগ দিল ক্লোজ। ‘এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যত ই-মেইল করা হচ্ছে, যত ওয়েব পেইজ দেখা হচ্ছে, ছবি নামানো হচ্ছে, কিংবা গান শোনা হচ্ছে, সবই দেখতে পাচ্ছি আমি। কারণ আমি একটা লগ ফাইল ব্যবহার করছি।’

‘তুমি আসলে ঠিক কী বোঝাতে চাইছ, এখনও কিছু নিশ্চিত না আমি,’ বলল ন্যাশ।

হাসল ন্যাশ। ‘আমি যদি উদ্ভিন্ন যৌবনা কোনো মেয়েমানুষ হতাম আর আপনি যদি টম ক্রুজ হতেন, তা হলে এ-রকম কোনো জায়গাতেই আমাকে চুমু খেতে চাইতেন আপনি।’

‘সেটা কোনোদিনও চাইবো না আমি, ক্লোজ।’

‘আপনি চাইলেও সে-কাজ করতে দেবো না আমি।’

‘কাজের কথা বলো। মানে কী এসবের?’

একটু থামতে বলার ইঙ্গিত জানিয়ে একহাতের তর্জনীটা উঁচু করল ক্লোজ। তারপর টাইপ করতে শুরু করল আবারও। ওর কাজ দেখছে ন্যাশ তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখছে, যে-প্রোগ্রামটা চালাচ্ছে সে, কোনো একটা ই-মেইল থেকে কিছু ডেটা কাট-পেস্ট করে বসিয়েছে সেখানে। হাততালি দিয়ে উঠল একসময়। সব দাঁত বেরিয়ে গেছে। ‘ভিডियोতে এলা রেনল্ডসকে দেখা সম্ভব না আমাদের পক্ষে। কারণ সেসব মুছে গেছে অনেকদিন আগে। তবে নিজের ফোন আর কম্পিউটার কাজে লাগিয়ে গত প্রায় এক বছর আগে থেকে শুরু করে এই বছরের জানুয়ারি মাসের একুশ তারিখ পর্যন্ত কী কী করেছে সে, সব দেখা সম্ভব আমাদের পক্ষে।’

কথাটা একটুখানি ভাবল ন্যাশ। ‘জানুয়ারি মাসের একুশ তারিখ? তার মানে হচ্ছে, ওই মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার একদিন আগে। এবং তার মানে হচ্ছে, যেদিন নিখোঁজ হয়ে যায় মেয়েটা, সেদিন এখানে আসেইনি সে। অর্থাৎ আমাদের খোঁজের পরিধিটা সঙ্কুচিত হলো একটুখানি। আর কী কী পেয়েছ তুমি, বলো।’

ন্যাশের কথা শুনছে না ক্লোজ। আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কী সব টাইপ করার কাজে। টানা প্রায় তিন মিনিটের মতো কিছুই বলল না। তারপর বলল, ‘বাচ্চাকাচ্চারা সবসময়ই তাদের বাবা-মায়ের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকে।’

‘মানে?’

ক্লোজের ল্যাপটপে এবার দুটো উইন্ডো দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকেরটা সিলেট করল সে। ‘এখানে কী আছে, জানেন? এলার কম্পিউটার এবং অনলাইন অ্যাকাউন্ট থেকে যেসব ডেটা জোগাড় করতে পেরেছি আমরা, সেসব। ওর মোবাইল ফোনটা ওর সঙ্গেই গায়েব হয়ে গেছে, কিন্তু ল্যাপটপটা পেয়েছি আমরা। ব্রাউজার হিস্টোরি বলতে যা বোঝায়, ওই মেয়ের সে-রকম কোনো ইতিহাস বলতে গেলে নেই। কারণ, হয় সে সিকিউর কোনো ব্রাউজার ব্যবহার করেছে, নয়তো নিজের সে-ইতিহাস এনক্রিপ্ট করেছে। এই কাজ কীভাবে করা যায়, জানে এখনকার বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েই। চায় না, তাদের কাজে নাক গলাক তাদের বাবা-মা। আর তাই আমি করেছি কী... মেয়েটার ম্যাক অ্যাড্রেস জোগাড় করে নিয়েছি। তার মানে হচ্ছে, ওই মেয়ের কম্পিউটারের ইউনিক আইডি পেয়ে গেছি। তারপর সে-আইডি চালিয়ে দিয়েছি স্টারবাক্সের রাউটারের মাধ্যমে। ফলে হাজির হয়ে গেছে নতুন এই উইন্ডো। দেখুন।’ স্ক্রিনের ডান দিকের বাক্সে ক্লিক করল সে। ‘এলা যা-যা করেছে, সব কিন্তু ধারণ করেছে এই রাউটার, সেসব কাজ এনক্রিপ্ট করা থাক বা না-থাক। এখন, দুটো উইন্ডো যদি তুলনা করি আমি একটা আরেকটার সঙ্গে, একটাকে দিয়ে আরেকটা ফিল্টার করি, এনক্রিপ্ট করা অবস্থায় কী কী দেখেছে ওই মেয়ে, বের করে ফেলতে পারবো। সহজভাবে যদি বলি, নিজের বাবা-মাকে কী কী দেখতে দিতে চায়নি সে, জানতে পারবো সেটা।’

‘পর্নোগ্রাফি নাকি?’ জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার। ওই লোক যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে এখানে, ভুলেই গিয়েছিল ন্যাশ।

‘দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ব্যাপারটা সে-রকম কিছু না,’ বলল ক্লোজ। চালু করল আরেকটা উইন্ডো। তারপর ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিল ন্যাশের দিকে।

জিভ দিয়ে বিচিত্র এক আওয়াজ করল ন্যাশ। ‘এ-রকম কোনো কিছু কল্পনাও করিনি আমি।’

ওই যে, ৩৩০৬,' বলল সোফি। অনতিদূরের দোকানটার সামনের দিকে একটা শকচারণ উইন্ডো আছে, সেটার ওপরের নীল-সাদা শামিয়ানাটা ইন্ধিতে দেখিয়ে নিচ্ছে নিজের পাশের গাড়ির-জানালা দিয়ে। সেখানে বড় হাতের অক্ষরে বড় বড় করে লেখা আছে: দ্য লি গ্যালারি (THE LEIGH GALLERY)।

দোকানের সামনে খালি একটা জায়গায় নিজের হোন্ডা পার্ক করল ক্রেয়ার। পাড়ি থেকে নামল ওরা দু'জন। রাস্তা পার হলো। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। বরফে ছাওয়া ফুটপাথে পা যাতে পিছলে না যায়, সে-ব্যাপারে সতর্ক আছে দু'জনই।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকান সময় টুং করে বেজে উঠল ছোট একটা ঘন্টা। দেখা গেল এক মহিলাকে। মাথার বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। চোখে চশমা। দোকানের পেছনদিকে একটা ডেস্কের আড়ালে বসে আছেন, তাকিয়ে আছেন ক্রেয়ার আর সোফির দিকে। 'গুড আফটারনুন, লেডিস।' হাসলেন। 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান আপনারা? নাকি আমি কোনোকিছুতে সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে?'

তাকিয়ে তাকিয়ে দোকানটা দেখছে ক্রেয়ার। কোনো একটা জায়গায় এত রঙের সমাহার আগে কখনও দেখেনি সে। দেয়ালগুলো যেন ছেয়ে আছে বিচিত্র সব পেইন্টিং দিয়ে। মেঝে থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ওসব। এখানকার প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা দখল করে রেখেছে ক্যানভাস। সেগুলোর কোনো কোনোটা আকৃতিতে মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কোনোটা আবার চার থেকে পাঁচ ফুট। বিমূর্ত চিত্রকর্ম যেমন আছে, তেমনই আছে বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপ। প্রায় প্রতিটা ছবিই আলোকিত হয়ে আছে... কৌশল খাটিয়ে ছাদের জায়গায় জায়গায় লাগিয়ে রাখা হয়েছে ট্র্যাক লাইট, জ্বলছে সেগুলো। হাতের দু'পাশের খোলা জায়গা দখল করে রেখেছে কয়েকটা টেবিল। সেগুলোতে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ভাস্কর্য, ফুলদানি, পাথরের ছোট মূর্তি। ঠিক কী কায়দায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওসব, ঠাহর করতে পারল না ক্রেয়ার। ওর মনে হচ্ছে, সব যেন এলোমেলো হয়ে আছে। তারপরও দেখতে সুন্দর লাগছে এখানকার সবকিছুই। এই জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটিয়ে দিতে পারে সে।

হাতের ডানদিকের একটা টেবিল থেকে ছোট একটা ভাস্কর্য তুলে নিল সোফি। 'পেঙ্গুইন খুব ভালো লাগে আমার। ওগুলো দেখতে এত সুন্দর!'

ডেস্কের আড়ালের মহিলাটা উঠে দাঁড়ালেন। ঠেলে চাঁদির ওপর পাঠিয়ে দিলেন চশমাটা। এগিয়ে এলেন। 'এগুলো তৈরি করেছেন স্থানীয় এক আর্টিস্ট। নাম টেস মার্চাম। মেয়েটা যা-ই তৈরি করে না কেন, নিজের হাতে করে। দেখুন,



কেমন প্রহরীদের ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো। এ-রকম ঠাণ্ডা ভালো লাগে আমার। মনে হয়, ওগুলো যেন নজর রেখে চলেছে ক্রিমি জিনিসগুলোর ওপর। এই যে জিরাফ আর জেব্রা দেখতে পাচ্ছেন না? এগুলো ওই মেয়েরই বানানো। সে সত্যিই একজন প্রতিভা।’

মনে মনে একটা নোট নিল ক্রেয়ার... হাতে যখন সময় থাকবে, এই জায়গা আবারও আসবে। ঘুরল ওই মহিলার দিকে। ‘আপনিই কি মিসেস এডউইস?’

‘হ্যাঁ। প্লিজ, আমাকে কলেট বলে ডাকবেন।’

টেবিলের ওপর পেন্সুইনটা নামিয়ে রাখল সোফি। আদর করে দিল ওটা মাথায়। ‘আমি সোফি রদ্রিগেজ। মিসিং চিলড্রেন ডিপার্টমেন্টে আছি। ইন্ডিয়ানা শিকাগো মেট্রোর ডিটেকটিভ ক্রেয়ার নর্টন। আপনাকে লিলি ডেভিসের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই আমরা।’

হাসি হাসি যে-ভাব এতক্ষণ ছিল ওই মহিলার চেহারায়, বিদায় নিল সেট। ‘মেয়েটাকে কি খুঁজে বের করতে পেরেছেন আপনারা? সে ঠিক আছে?’

‘এখনও খুঁজে বের করতে পারিনি। তবে আমাদের অনেকেই নিয়োজিত আছেন সে-কাজে। খুঁজছে মেয়েটাকে,’ বলল ক্রেয়ার। ‘আপনি শেষ কবে বা কখন দেখেছিলেন ওকে?’

‘গত পরশু রাতে। তখন কাজ শেষ করে সবকিছু গুছিয়ে গ্যালারি বন্ধ করেছিল সে। গতকাল রাতেও কাজ করার কথা ছিল ওর। কিন্তু আসেনি সে। যখন বিকেল পাঁচটা বেজে গেল, তবুও এল না মেয়েটা, তখন আমি সত্যিই ভুগতে শুরু করলাম দুশ্চিন্তায়। শেষ করে ওভাবে নিজের শিফট মিস করেছে মেয়েটা, মনে করতে পারি না। আরও বড় কথা হচ্ছে, কখনও কোনো কারণে আসতে যদি দেরি হয় ওর, এবং সেটা যদি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যও হয়, সবসময় ফোন করে আমাকে অথবা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দেয়।’

‘ঠিক ক’টায় আসার কথা ছিল ওর?’

‘বিকেল চারটা থেকে আরম্ভ করে গ্যালারি বন্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত একটা শিফট আছে এখানে। লিলি সাধারণত ওই শিফটেই কাজ করে। তারপর সবকিছু গুছিয়ে তালা লাগিয়ে চলে যায় বাসায়,’ বললেন কলেট।

‘গত পরশু রাতে যখন কাজ করতে এসেছিল সে, তখন ওই মেয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত কোনো কিছু খেয়াল করেছিলেন আপনি?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

মাথা নাড়লেন কলেট। ‘মোটেনা। সেদিন কয়েক মিনিট আগেই চলে এসেছিল মেয়েটা। বরাবরের মতোই প্রাণবন্ত লাগছিল ওকে। সবসময়ই একটা হাসি ফুটে থাকে ওর চেহারায়, তখনও ছিল। এই গ্যালারির কাস্টোমাররা পছন্দ করত ওকে।’ একটা মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। তারপর বললেন। ‘আজ সকালে পত্রিকার পাতায় খবরটা দেখেছি আমি। কী মনে হয় আপনাদের... লিলিকে কি ফোর মাস্কি কিলারই অপহরণ করেছে?’

মাথা নাড়ল ক্রেয়ার। ‘এই কাজ ফোর মার্ফি কিলারের না।’ বলল নটে কপাটা, কিন্তু নিজেই আসলে শতভাগ নিশ্চিত না ওই ব্যাপারে। কয়েক মাস আগে যেমন ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে মনে হচ্ছিল, বিশপের খেল খতম। সবাই ধরে নিয়েছিল, ওই লোকের শেষ টার্গেট ছিল প্রকৃতপক্ষে আর্থার ট্যালবট। যোহেতু ট্যালবটকে নিজের হাতে খুন করেছে সে, কাজেই সবাই ধরে নিয়েছিল, খুনখারাপির সেই অরাজকতা চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো কারণ নেই তার। কোনো সিরিয়াল কিলার স্বেচ্ছায় খুন করা থামিয়ে দিয়েছে, এ-রকম নজির কমই আছে। কাজেই বিশপ যদি কোনো বিরতি নিয়ে থাকে, তা হলে ফিরে আসার জন্য রীতিমতো ছটফট করতে থাকবে। সে যে-পদ্ধতিতে কাজ করে, এলা আর লিলিকে যে-কায়দায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটার সঙ্গে মেলে না সে-পদ্ধতি। ক্রেয়ারের চোখের সামনে এখনও যেন ভাসছে বিশপের সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। মন থেকে ছবিটা ঝেড়ে ফেলে দিল সে।

‘কিন্তু কেউ একজন তো অপহরণ করেছে মেয়েটাকে, তা-ই না?’ জিজ্ঞেস করলেন কলেট।

‘হ্যাঁ, সে-রকমই ধারণা আমাদের,’ বলল ক্রেয়ার।

সোফি বলল, ‘গত কয়েক সপ্তাহে অদ্ভুত বা সন্দেহজনক কাউকে দেখেছেন গ্যালারিতে? এমন কেউ, যাকে আপনি চেনেন না? অথবা এমন কেউ, যে, কোনো চিত্রকর্মের ওপর মনোযোগ দেয়ার বদলে ওই কাজ একটু বেশিই করে ফেলেছিল লিলির বেলায়?’

‘কাস্টোমার বলতে যাঁরা আছেন এই গ্যালারিতে, তাঁদের বেশিরভাগই যাকে বলে কিনা নিয়মিত। এখানে প্রতি মাসে কয়েকবার এটা-সেটা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি আমরা। চাই, নতুন কিছু মুখ যুক্ত হোক আমাদের খদ্দেরদের তালিকায়। তবে আপনি যে-রকম বললেন, সে-রকম কারও কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। যেমনটা বলেছি একটু আগে... লিলি প্রতিদিনই চারটার মধ্যে চলে আসে এখানে। আর আমি পাঁচটার দিকে বেরিয়ে যাই। সময়ের এই হিসেব তেমন একটা হেরফের হয় না আমাদের। কাজেই, হতে পারে, আমি চলে যাওয়ার পর কেউ একজন এসেছিল। আর লিলির চেহারা-নকশাও কিন্তু বেশ ভালো। কাজেই, হতে পারে, পাণিপ্রার্থী বলতে যা বোঝায়, আমি চলে যাওয়ার পর সে-রকম কোনো পুরুষমানুষ এসেছিল এখানে। ওর কিছু বন্ধুকে এখানে হাতেনাতে ধরেছি আমি, কিন্তু তারা কখনও কোনো ঝামেলা করেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্যালারির কোনো কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তারা, আমি কিছু মনে করি না। যা হোক, এই জায়গা কখনও কখনও খুব চুপচাপ আর একেবারে নিরিবিলি হয়ে যায়।’

ছাদের দিকে তাকাল ক্রেয়ার। ‘আপনাদের এখানে কোনো সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে?’

মাথা নাড়লেন কলেট। 'বলতে খারাপই লাগছে, নেই। এই এলাকাটা কিন্তু বেশ ভালো। তা ছাড়া আমরা নগদ টাকায় লেনদেনও করি না। আর তাই এখানে কোনো ক্যামেরা লাগানোর প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভব করিনি কখনও।'

'কিছু অনুষ্ঠানের কথা বললেন একটু আগে,' বলল ক্লেয়ার। 'সেসবে কি অনেক লোকের সমাগম হয়?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায়। স্থানীয় কোনো চিত্রশিল্পীকে যখনই তুলে ধরি আমরা, কয়েক শ' লোকের আসা-যাওয়া চলতেই থাকে। আগেও বলেছি, নিয়মিত কিছু খন্দের আছে আমাদের। তাঁরা যখন আসেন, তখন দাওয়াত করে নিয়ে আসেন তাঁদের কিছু বন্ধু আর ভক্তকে। খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ওসব অনুষ্ঠান যত ঘন ঘন করা সম্ভব হয় আমাদের পক্ষে, করি আমরা।'

সোফির দিকে তাকাল ক্লেয়ার। 'আমি যদি কোনো যুবতী মেয়েকে অনুসরণ করতে চাই, যদি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাই, তা হলে ওই সময়টাই সবচেয়ে ভালো বলে মনে হচ্ছে, না? অনেক মানুষের জমায়েত। অপরিচিত অনেক চেহারা।' ঘুরল মিসেস এডউইন্সের দিকে। 'কোনো কোনো অনুষ্ঠানে সাইন-ইন তালিকা বলতে একটা হিসাব রাখা হয়। সে-রকম কোনোকিছুর ব্যবস্থা কি আছে আপনাদের এখানে? বিশেষ করে যে-অনুষ্ঠানের কথা বললেন, সেসবের জন্য?'

মাথা ঝাঁকালেন কলেট। 'আছে। নাম জোগাড় করি আমরা। ঠিকানা আর ই-মেইলও রেখে দিই যাতে আমরা নিজেদের মেইলিং লিস্টে ভিজিটরের সংখ্যা বাড়াতে পারি। যে-চিত্রশিল্পীকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, তাঁকে সে-রকম একটা তালিকার কপি দেয়া হয় পরবর্তীতে।'

'ও-রকম কয়েকটা তালিকা দিতে পারবেন আমাদেরকে?' জানতে চাইল ক্লেয়ার।

দ্বিধা করতে লাগলেন কলেট। কিছুক্ষণ পর মাথা ঝাঁকালেন অনিচ্ছুক কায়দায়। 'ঠিক আছে, দেবো... যদি তাতে কোনো উপকার হয় লিলির। একটু সময় দিন আমাকে।'

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্লেয়ার, দোকানের পেছনদিকে চলে যাচ্ছেন মিসেস এডউইন্স। তাঁর সেই ডেস্কের পেছনে, একটা হলওয়াতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর। সোফির দিকে তাকাল সে। 'আমরা যে-লোককে খুঁজছি, সে যদি সত্যিই এসে থাকে এখানে, সত্যিই যদি নাম লিখে থাকে কোনো তালিকায়, নিজের আসল নামটা লিখেছে কি না, সন্দেহ আছে আমার। কোনো ঠিকানা যদি দিয়ে থাকে সে, তা হলে সেটাও হয়তো মেকি।'

'তা হলে ওসব তালিকা নিয়ে কাজ করলে কী লাভ হবে আমাদের?'

'সব নাম যাচাই-বাছাই করবো আমরা। নকল নামগুলো আলাদা করে নেবো। ভুয়া নাম বের করতেও খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা না... ঠিকানা অনুযায়ী কাউকে

যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তা হলে সেটাই মেকি। কেউ কেউ বানোয়াট ই-মেইল অ্যাড্রেসও দিয়ে থাকতে পারে। আশা করছি, এ-রকম কারও নাম-ঠিকানা যদি পাওয়া যায়, তা হলে আমাদের খোঁজের পরিধি কমবে। শেষপর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে, শুধু হাতেগোনা কয়েকজন রয়ে গেছে। কাজটা যদি শেষ করে ফেলতে পারি, আমরা...’

কথা শেষ করতে পারল না ক্লেয়ার।

গ্যালারির পেছনদিক থেকে ভেসে এসেছে একটা আর্তচিৎকার।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটানে নিজের গ্লক বের করে ফেলল ক্লেয়ার। ছুট লাগাল শব্দের উৎস লক্ষ করে। ওর পেছনেই আছে সোফি। ঘুরল সেই ডেস্কের একটা কোনা। হাজির হলো হলওয়াতে। ছুটতে ছুটতে পার হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা বাথরুম। সবশেষে পৌঁছে গেল ছোট একটা স্টোরেজ রুমের কাছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন কলেট এডউইন্স। তাঁর একটা হাত এখনও রয়ে গেছে লাইটের সুইচে... সরাতে পারেননি সেখান থেকে। অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরেছেন নিজের মুখ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওই ঘরের কেন্দ্রভাগের দিকে।

মহিলার দৃষ্টি অনুসরণ করল ক্লেয়ার। পিস্তলের হাতলে চাপ বেড়েছে আঙুলগুলোর।

লিলি ডেভিসের নিষ্প্রাণ দেহটা নিখর ঝুলে আছে একটা ধাতব শেঙ্ক থেকে। চকচক করছে মেয়েটার দু’চোখ, ফাঁপা দৃষ্টি ফুটে আছে সেখানে। একটুখানি হাঁ হয়ে আছে মুখটা। কালো একটা বৈদ্যুতিক তার পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে ওর গলায়। বেগুনি রঙ ধারণ করেছে ওই তারের আশপাশের জায়গাটুকু। ভয়ঙ্কর পাণ্ডুর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

পুরো ঘরের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিল ক্লেয়ার। হোলস্টারে ঢোকাল গ্লকটা। এগিয়ে গেল লিলির দিকে। পাল্‌স চেক করার জন্য আঙুল রাখল মেয়েটার গলায়। না, মারা গেছে মেয়েটা। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর চামড়া। ওই তার দিয়ে প্রথমে পেঁচানো হয়েছে মেয়েটার গলা, তারপর সেটা বেঁধে দেয়া হয়েছে ধাতব শেঙ্কটার সঙ্গে। ফলে মেঝেতে পড়ে না গিয়ে ঝুলে আছে বেচারী।

‘মেয়েটা কি নিজেই নিজেকে ওভাবে...’ কথা আটকে গেল কলেটের।

‘না,’ বলল ক্লেয়ার। ‘মেয়েটার লাশ এখানে নিয়ে আসার আগেই মারা গেছে সে।’

‘এই ঘরে আর কে কে ঢুকতে পারে?’ জিজ্ঞেস করল সোফি।

কাঁপছেন কলেট। ‘আমি... আমি ঘণ্টা দু’-এক আগেও এখানে এসেছিলাম। এখান থেকে ছোট কয়েকটা পাথরের-মূর্তি নিয়ে গিয়ে রেখেছি দোকানে। তখন কিন্তু লিলির লাশ ছিল না এখানে। কাউকেই দেখিনি তখন। আজ সারাটা সকাল ধরে আমি একাই আছি এখানে।’

‘ওই দরজার কী অবস্থা?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার। ঘরের দূরের এককোণায় ইম্পাতির একটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

‘ওটা তো সবসময় লক করে রাখি আমরা। যখন কোনো মাল ডেলিভারি নেয়া হয়, শুধু তখনই খোলা হয় ওটা।’

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ক্লেয়ার, বের করে আনল একটা লেটেক্স গ্লাভ। একহাতে পরে নিল ওটা। দরজার হাতলটা পরীক্ষা করে দেখল কিছুক্ষণ। হ্যাঁ, তালা দেয়া আছে ওই দরজায়। এমনকী লক করা আছে ডেডবোল্টটাও।

‘আপনারা সবাই বেরিয়ে যান এই ঘর থেকে,’ বলল সে।

শিকাগো মেট্রোর বেসমেন্টে, কাজ করার জন্য মরচে-পড়া যে-ধাতব ডেস্ক দেয়া হয়েছে স্পেশাল এজেন্ট পুলকে, সেটার ধারে হাজির হলো সে। তার পাশে আরেকটা ডেস্ক আছে। ডিটেকটিভ পোর্টারের বাসা থেকে যেসব জিনিস নিয়ে আসা হয়েছে, সেসব আলাদা আলাদা বাক্সে রাখা আছে ওই ডেস্কের ওপর। স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ হার্লস এবং স্পেশাল এজেন্ট ডিনার ফিরে গেছে রুজভেল্টের এফবিআই-এর ফিল্ড অফিসে। অন্য যেসব কেস আছে তাদের হাতে, সেগুলোর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করতে চায়। তার আগে তারা চটজলদি লাঞ্চ সেরে নিয়েছে ওয়্যাব্যাশের ছোট একটা রেস্টুরেন্টে। এখানে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পুল। ভেবেছিল, হার্লস সোজা মানা করে দেবে। কিন্তু তার বদলে হার্লস লোকটা, সব বাক্স নিয়ে গিয়ে পুলের গাড়িতে তোলার কাজে সাহায্য করেছে। তারপর পুল আর সেই টেকনিশিয়ানদের বলেছে, তারা যাতে সোজা চলে আসে এখানে।

দরজাটা লাগিয়ে দিল পুল। মাথার ওপর জ্বলছিল ফ্লুরোসেন্ট আলো, নিভিয়ে দিল সেটা। অন্ধকারে ডুবে গেল সারা ঘর। শুধু পুলের ডেস্কে জ্বলছে ছোট একটা ল্যাম্প।

বারবারা ম্যাকিনলের ফাইলটা খুলল সে। ভেতরের জিনিসগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। এভাবে অন্ধকারে কাজ করতে ভালো লাগে তার। মনোযোগের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না এই কায়দায়। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, একটা অফিসে সবসময় যে-রকম শশব্যস্ততা থাকে সে-রকম কিছুও নেই। কারও কোনো কণ্ঠও শোনা যাচ্ছে না। আছে শুধু কিছু প্রমাণ।

বারবারা ম্যাকিনলে। বয়স সতেরো। ফোর মাস্কি কিলারের পঞ্চম শিকার। বিশপ কেন তুলে নিয়েছিল এই মেয়েকে? কারণ মেয়েটার বোন, লিবি ম্যাকিনলে, ছুটন্ত গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছিল এক পথচারীকে। ঘটনাটা ১৪ মার্চ, ২০০৭ সালের। ফোল্ডারটার ভেতরের কভারে ফিরে গেল পুল। এখানে স্ট্যাপল করে আটকানো আছে বারবারার একটা ছবি। মেয়েটা সুন্দরী। স্বর্ণকেশী।

ঘরের এককোণায় একটা হোয়াইটবোর্ড আছে। চোখ তুলে সেটার দিকে তাকাল পুল। করতে ইচ্ছা করল না কাজটা, জোর খাটাতে হলো নিজের ওপর। বিশপের নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হওয়া মেয়েগুলোকে দেখছে। তাদের সবারই চুল কালো। শুধু বারবারার বাদামি। ওই ছবিগুলোয় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলল সে। যখন মুখ ফিরিয়ে তাকাল হাতঘড়ির দিকে, টের পেল, প্রায় দশ মিনিট কেটে গেছে। হাত বাড়িয়ে নিল নিজের ফোনটা। এই তদন্ত শুরু করার আগে বিশেষ

একটা নম্বর সেভ করেছিল মোবাইলে। এখনও একবারের জন্যও কল দেয়নি সেটাতে। এবার ডায়াল করল।

তিনবার বাজার পর ওপাশ থেকে সাড়া দিল বিষণ্ণ একটা কণ্ঠ। ‘হ্যালো?’
খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল পুল। ‘ডিটেকটিভ পোর্টার?’
‘হ্যাঁ।’

‘আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল।’

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর পোর্টার বলল, ‘ও আচ্ছা।’

‘আমরা এই কেসের তদন্ত করতে এখানে এসেছি, কারণ কাজটা করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে,’ বলে চলল পুল। ‘আপনি বুঝতে পেরেছেন সেটা, ঠিক না? যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো কেস নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারি না আমরা।’

‘আমন্ত্রণটা কে জানিয়েছে আপনাদেরকে?’

চূলে আঙুল চালাল পুল। ‘যাঁরা করেছেন কাজটা, তাঁরা যদি চাইতেন জবাবটা জানুন আপনি, তা হলে আমাকে ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগত না আপনার।’

‘কী বলার জন্য আমাকে ফোন করেছেন, বলুন।’

‘আমাকে যদি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হতো, আমি এভাবে বাগড়া দিতাম না। যেসব কেস নিয়ে কাজ করি আমি, চাই না, সেগুলোতে নাক গলাক কেউ। একইভাবে আমিও ভাগ বসাতে চাই না অন্য কারও কেসে।’

‘তারপরও ভাগ বসিয়েছেন। কারণ কোনো একজনের মনে হয়েছে, আমি সবকিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছি। আর তাই তিনি তাঁর মান বাঁচানোর জন্য আপনাদেরকে নিয়ে এসেছেন এখানে। কাজেই আপনারা যে এখন আছেন এখানে, সেটা আপনাদের দোষ না। আপনারা শুধু আপনাদের কাজটুকু করছেন। ঠিক বলেছি না?’

‘সবাই বলাবলি করছিল, আপনি নাকি বিশপকে চলে যেতে দিয়েছেন। বলাবলি করছিল, ওই লোকের সঙ্গে নাকি ঘনিষ্ঠতা ছিল আপনার।’

‘আপনারা যা-খুশি তা ভাবতে পারেন অথবা বিশ্বাস করে নিতে পারেন। এই কেস এখন আপনাদের,’ বলল পোর্টার।

উঠে দাঁড়াল পুল। ক্যাচকোঁচ আওয়াজ করে উঠল তার চেয়ারটা। এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে... ওই মেয়েদের ছবিগুলোর দিকে। ‘একটা সত্যি কথা বলি আপনাকে। রাজনৈতিক যেসব ব্যাপার আছে এই কেসে, সেগুলো নিয়ে তেমন একটা পরোয়া নেই আমার। কেন যেন মনে হয় আমার, আপনিও তেমন একটা পরোয়া করেন না। আমি এবং আপনি, আমার মনে হয় আমরা দু’জনই একই জিনিসের পেছনে লেগে আছি। যে-দানবের আবির্ভাব ঘটেছে, আমরা শুধু তার বিনাশ চাই।’

পোর্টার কিছু বলল না।

অরাজকতা

পুল বলে চলল, ‘আমার বস আর ডিনার কী চাইছেন, সেটা আপনাকে বলে দিই। তাঁরা এই কেসের মাধ্যমে নাম কামাই করতে চাইছেন। আমার মনে হয় তাঁদের এজেন্ডা সেটাই।’

‘আপনার কোনো এজেন্ডা নেই?’

‘আছে। আমি চাই না, ওই বিশপ লোকটা আর কারও কোনো ক্ষতি করুক।’
বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। সে-নীরবতা ভাঙল পোর্টার। ‘এজেন্ট পুল, আপনি আমাকে ফোন করেছেন কেন?’

‘ফ্র্যাঙ্ক,’ বলল পুল। ‘আমাকে ফ্র্যাঙ্ক বলে ডাকবেন।’

‘কেন ফোন করেছেন আপনি আমাকে, ফ্র্যাঙ্ক?’

ডেস্কে, ওই ফাইলের কাছে ফিরে এল পুল। ‘বারবারা ম্যাকিনলে। আপনার অ্যাপার্টমেন্টে যখন গিয়েছিলাম আমরা, আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, কিছু একটা গোপন করছিলেন আপনি আমাদের কাছে।’

‘আপনাকেও বলেছি আমি কথাটা, আপনার বসকেও বলেছি। ওই ফোল্ডারটা দেখার মতো সুযোগটুকুও হয়নি আমার।’

‘কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি বলে কিছু একটা তো আছে, তা-ই না? এবং সে-প্রবৃত্তি আপনাকে অন্য কিছু একটা বলছে, ঠিক কি না?’

আবারও চুপ করে থাকার পালা পোর্টারের।

‘আমার সহজাত প্রবৃত্তি কী বলছে, জানেন? বলছে, আমি যেন বিশ্বাস করি আপনার সহজাত প্রবৃত্তিকে।’

নীরবতা। লাইনের ওপ্রান্ত থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছে না পুল। সে-ও কিছু বলল না আর। পোর্টারের কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে।

শেষপর্যন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোর্টার। ‘আপনি জানেন কি না জানি না, আমাকে কিন্তু এই ফোর মাস্কি কিলার কেসে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমি কয়েক সপ্তাহের ছুটিতে ছিলাম। কারণ খুন করা হয়েছিল আমার স্ত্রীকে। যা হোক, লাশ পাওয়া বলতে যা বোঝায়, সে-কাজ করেছিল ন্যাশ। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, ওই লাশ ফোর মাস্কি কিলারের। তারপর দ্রুত ঘটতে শুরু করে বেশকিছু ঘটনা। সিএসআই থেকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম বিশপকে। কারণ ওকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে, ওকে বেশ চালাক-চতুর বলে মনে হয়েছিল। আমরা সে-সময় আসলে কোনো খুনির সন্ধান করছিলাম না। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, মারা গেছে লোকটা। আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এমোরিকে খুঁজে বের করার কাজে। শিকাগো মেট্রোর সেই অফিসে একত্রিত হয়েছিলাম আমরা, ফোর মাস্কি কিলার টাস্ক ফোর্সের প্রধান কুশীলবের সবাই ছিল সেখানে। আর ছিল বিশপ... নতুন একজন লোক। হাতে প্রমাণ বলতে যা-কিছু ছিল আমাদের, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। মাঝেমধ্যে এই ব্যাপারটা খুব কাজে দেয় আমার জন্য... সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব আবার খতিয়ে দেখা।

এতে কখনও কখনও নতুন কিছু একটা যেন স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে চোখের সামনে। নতুন কিছু একটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসে।’

মাথা ঝাঁকাল পুল। ‘নতুন একটা কোণ থেকে সমস্ত তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন আপনারা। হাতে তথ্য-প্রমাণ বলতে যা-কিছু ছিল, সেসবের আড়ালের লোকটার খোঁজ করছিলেন না আর। তবে ওসব তথ্য-প্রমাণ কাজে লাগিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন লোকটা কে। এবং সে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে এমোরিকে।’

‘হ্যাঁ। এভাবে মনোযোগ যখন আরেকদিকে সরিয়ে নেয়া হয়, দেখা যায়, কিছু একটা অন্য কোনোদিক দিয়ে হাজির হয়ে যায় সামনে। যা হোক, আমাদের গতবারের কেস যতটা না ছিল ফোর মাস্কি কিলারকে পাকড়াও করার অভিযান, তার চেয়ে বেশি ছিল নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটা মেয়ের উদ্ধার-অভিযান,’ বলল পোর্টার। ‘আমরা যখন ঘাঁটাঘাঁটি করছি ওসব প্রমাণ নিয়ে, এমন কিছু কাজ করে বিশপ, যার ফলে ওর গুরুত্ব বেড়ে যায়। ঈশ্বরের শপথ করে বলতে পারি, এমন একটা ভান করেছিল সে, দেখে মনে হয়েছিল, এ-সবকিছু যেন সম্পূর্ণ নতুন ওর জন্য। আমাদের বোর্ডগুলোর দিকে যতবার তাকিয়েছে সে, ওর চেহারায়ে দেখা গেছে একজাতের শূন্যতা। ততবার আমি খেয়াল করেছি, গভীর কোনো একটা চিন্তা খেলা করছে ওর মাথায়। আমি খেয়াল করেছি, আমাদের ওসব প্রমাণ নিয়ে ভেবেছে সে, শূন্যস্থান পূরণ করেছে, নিজের মতো করে থিউরি জোগান দিয়েছে। আমি এই একটা কথা বার বার ভেবেছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, একবারের জন্যও স্মরণ হয়নি, এমন কোনো কাজ কখনও করেছিল সে, যার ফলে আমাদের মনে হয়েছিল, সে-ই আসল খুনি। পল ওয়াটসন সিএসআই-এর ভূমিকায় এত দারুণ অভিনয় করেছিল সে যে, আমার মনে হয় সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল নিজের আসল পরিচয়। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, ফোর মাস্কি কিলারকে পাকড়াও করার ব্যাপারে আমরা যতখানি উদগ্রীব ছিলাম, সে-ও ততখানিই ছিল। জানি, আপনি হয়তো ভাবছেন, বাহানা তৈরি করছি আমি আসলে। কিন্তু আমি বলবো, বিশপ যে শুধু একটা মুখোশ পরে ছিল তা-ই না, সে ওই মুখোশেই পরিণত হয়েছিল সে-সময়।’

‘মানসিক সমস্যা আছে লোকটার,’ বলল পুল। ‘আপনি যে-সময়ের কথা বলছেন, সে-সময়ে লোকটা আসলে পল ওয়াটসন সেজেছিল। স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা বলতে কিছু থাকে না এ-ধরনের মানুষদের। তারা আসলে খালি কোনো ক্যানভাসের মতো। খালি কোনো পাত্রের মতো। ওই খালি জায়গাটাতে যে-কোনো একটা ব্যক্তিত্ব ঢেলে দিতে পারে তারা। এবং সে-ব্যক্তিত্ব একসময় দখল করে নেয় খালি জায়গাটা। বিশপের মতো মানুষ আমি আরও দেখেছি। কারও কারও বেলায় এ-ও দেখেছি, বিশেষ সেই ব্যক্তিত্ব দখল করে নিয়েছে আসল

মানুষটাকেই। কারও কারও বেলায় আবার আসল ব্যক্তিত্ব আর নকল ব্যক্তিত্ব দুটোই রয়ে যায়... একটা আরেকটার ব্যাপারে সচেতন থাকে।’

‘যা হোক, যেমনটা বলছিলাম... ওই সময়ে বিশপকে পল ওয়াটসন বলেই মনে হয়েছিল আমাদের। এ-ও মনে হয়েছিল, ফোর মাস্কি কিলারকে পাকড়াও করতে চায় সে। বিশেষ একটা দিনের কথা আজও মনে পড়ে আমার। আমরা সেদিন আমাদের হাতে-থাকা প্রমাণগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করছিলাম। আলোচনা করছিলাম ফোর মাস্কি কিলারের শিকারে পরিণত হওয়া প্রতিটা মেয়েকে নিয়ে। ম্যাকিনলের বর্ণনা আসার পর কেমন যেন থমকে গেল বিশপ। বলল, একমাত্র ওই মেয়েই স্বর্ণকেশী। কথাটা শুনে আমার তখন কী মনে হয়েছিল, জানেন? মনে হয়েছিল, একটা টাস্কফোর্সের সঙ্গে নতুন নতুন যোগ দিয়েছে সে, তাই কিছু একটা বলে ফেলেছে আর কী। মানে, আমাদের সবারই তখন জানা ছিল, যেসব মেয়ে ফোর মাস্কি কিলারের শিকারে পরিণত হয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ম্যাকিনলেই স্বর্ণকেশী। আমরা ওসব ছবির দিকে গত পাঁচটা বছর ধরে তাকিয়ে আছি। কিন্তু সেদিন, ম্যাকিনলের ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটু যেন থমকে গিয়েছিল বিশপ... অন্তত একটা মুহূর্তের জন্য হলেও। আমিও তখন অতটা গুরুত্ব দিইনি ওর সেই কথায়। কিন্তু এখন...’

‘এখন আপনি বিশেষ সেই দৃশ্য আবার দেখছেন মনের পর্দায়। আপনি জানেন, এখন আপনি ওই ঘরেই আছেন, এবং তা-ও আবার আছেন ফোর মাস্কি কিলারের সঙ্গে। এবং সেই খুনি প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে তাকিয়ে আছে বারবারা ম্যাকিনলের দিকে,’ পুরো ঘটনাটার যেন সারমর্ম বলে দিল পুল।

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু এটা তো যথেষ্ট হলো না।’

‘আমার মনে হয় ওই কথাটা ইতোমধ্যে কয়েকবার বলে ফেলেছি আমি। এই কেসে নিরোট প্রমাণ বলতে তেমন কিছুই নেই আমাদের হাতে। যা আছে, তার বেশিরভাগই আমার সেই সহজাত প্রবৃত্তি,’ বলল পোর্টার। ‘বারবারা ম্যাকিনলের সঙ্গে যে-ঘটনা ঘটেছে, সেটাও কিন্তু একটু অন্যরকম। ওই মেয়ের বোন গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল এক পথচারীকে। ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা। এবার ফোর মাস্কি কিলারের অন্য শিকারদের কথা ভাবুন। এদের সবার বেলায় বিশেষ একটা নিয়ম মেনেছে বিশপ... এদেরকে সে খুন করেছে, কারণ এদের খুব কাছের কেউ না কেউ কোনো না কোনো ইচ্ছাকৃত অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। কাজেই ওর এসব হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত। সুচিন্তিত। রীতিমতো আয়োজন করে ঘটিয়েছে সে এসব হত্যাকাণ্ড। এসবের সঙ্গে কাউকে দুর্ঘটনাবশত গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলাটা ঠিক মানায় না।’

ফাইলটার দিকে ফিরে তাকাল পুল। ‘অ্যারেস্ট রিপোর্ট বলছে, আলোর বিপরীতে একজন পথচারী রাস্তা পার হচ্ছিল, এমন সময় তাকে চাপা দেয়

ম্যাকিনলের বোনের গাড়ি। লোকটা রাস্তায়, ওই মেয়ের গাড়ির সামনে নেমে পড়েছিল অনেকটা হুট করেই।’

‘মেয়েটা যদি ওই ঘটনার পর পালিয়ে না যেত, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হতো না। বিশেষ করে ও-রকম কোনো ঘটনার বেলায়,’ বলল পোর্টার। ‘জেকব কিটনার যেভাবে মারা গিয়েছিল, সে-ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার একটা মিল আছে। একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে, কিটনারকে ওভাবে মরার জন্য... চলন্ত বাসের সামনে হাজির হওয়ার জন্য টাকা দিয়েছিল বিশপ। আমি আবার কাকতালীয় কোনো কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করি না।’

‘আমিও করি না,’ বলল পুল। ‘আমাকে একটা সেকেন্ড সময় দিন তো।’ ল্যাপটপে লিবি ম্যাকিনলের রেকর্ড বের করল। নজর বুলিয়ে নিল ফাইলটাতে। ‘রেকর্ড বলছে, ২০০৭ সালের মার্চ মাসে অভিযোগ দায়ের করা হয় ওই মেয়ের বিরুদ্ধে। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বিকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাকে। দশ বছরের জেল হয়ে যায় তার। সাত বছর এবং কয়েক মাস জেল খাটে সে। সপ্তাহ ছয়েক আগে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে মেয়েটা।’

‘যে-লোককে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল সে, তার নামটা কী বললেন?’

‘ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বি। কেন? চেনেন নাকি তাকে?’

আবারও চুপ করে আছে পোর্টার।

‘পোর্টার, ওই নাম যদি বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে আপনার কাছে, তা হলে সেটা কিন্তু আমাকে বলা দরকার আপনার,’ বলল পুল।

‘আমার মনে হয় লিবি ম্যাকিনলের সঙ্গে দেখা করা উচিত আপনার, কথা বলা উচিত। কাজটা যদি করেন, কী জানতে পারলেন, জানাবেন আমাকে।’

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করল পুল।

কিন্তু পোর্টার লাইন কেটে দিয়েছে।

২৬.
পোর্টার
দ্বিতীয় দিন, দুপুর ১:০৪

নিজের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের লবিতে, মেইলবক্সের সামনের দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার। একহাতে ওর মোবাইল ফোন। অন্য হাতে টিভি গাইড। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। হাতেধরা ওই ম্যাগাজিনের ভেতর থেকে একটা ফটো পড়েছে সেখানে। কাগজপত্রে ঠেসে থাকা মেইলবক্স থেকে ম্যাগাজিনটা আলাদা করে নেয়ার সময় ওই ফটো পড়ে গেছে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পোর্টার। আরেকটু ঝুঁকল।

ফটোটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সাত বাই পাঁচ হবে। সাদা-কালো। ম্যাট কাগজের ওপর প্রিন্ট করা হয়েছে। একটা মহিলার ছবি। পরনে জেলখানার জাম্পসুট। একটা আউটডোর চেইনলিঙ্ক দরজা দিয়ে বের করে আনা হচ্ছে তাকে। তার সামনে একজন গার্ড। আরেকজন আছে পেছনে। হাত দুটো পিছমোড়া করে আটকে রাখা হয়েছে হ্যান্ডকাফে। মাথা ঝুঁকে আছে বুকের ওপর। কোথেকে যেন একটা ছায়া পড়েছে মহিলার চেহারায়, ফলে সে-চেহারা দেখা যায় কি যায় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, দূর থেকে তোলা হয়েছে এই ছবি। কেমন যেন দানাদার মনে হচ্ছে ছবিটা। মনে হচ্ছে, কোনো একটা সফটওয়্যার কাজে লাগিয়ে বড় করা হয়েছে যেন। জেলখানার নামটা পড়তে পারল পোর্টার: অরলিন্স প্যারিশ প্রিজন। মহিলার পেছনদিকের দেয়ালে, ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে নামটা।

হাত থেকে টিভি গাইডটা ছেড়ে দিল পোর্টার। ওই ছবির পাশে, মেঝেতে আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ল ওটা। গ্লাভ পরিহিত হাত দিয়ে ছবিটা তুলে নিল সে। উল্টাল। অন্য পিঠে কালো কালিতে লেখা আছে একটামাত্র বাক্য:

আমার মনে হয় আমি খুঁজে পেয়েছি তাঁকে।

বি



২৭.

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা
দ্বিতীয় দিন, দুপুর ১:১৪

‘মেয়েটা দেখেছে?’ বলল লাইনের অপর প্রান্তের লোকটা।

কানের সঙ্গে ফোন চেপে ধরল কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা। ‘না, দেখিনি।’

প্রেসবোর্ড আর কালো প্লাস্টিক দিয়ে বানানো ছোট একটা ডেস্কের ধারে বসে আছে সে। ডেস্কের ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাগজ, মার্কার, এবং বিভিন্ন রকমের ড্রয়িং। ও-রকম আঁকাআঁকির সংখ্যা অনেক। ওই ডেস্ক একটা জানালার পাশে। সেই জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। বাইরে ওই লোকের প্রতিবেশী নিজের কুকুরটা নিয়ে বের হয়েছে। পেছনের একদিকের পা তুলে দিল কুকুরটা, তুষারের ওপর পেশাব করল। প্রতিদিন এই একই কাজ করে ওই প্রতিবেশী। নিজের কুকুর নিয়ে হাজির হয়ে যায় কালো-নিট-ক্যাপ-পরিহিত লোকটার বাড়ির সীমানায়, তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয় ওটা। কাজ শেষে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা করল জন্তুটা।

মাথার একপাশে একটা ক্ষতস্থান আছে, চুলকাচ্ছে সেটা। জায়গাটা চুলকাল ওই লোক। আঙুলের নিচে স্থানচ্যুত হয়ে গেল ওই নিট ক্যাপ। ওটা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল টেকো মাথা।

‘পরেরজন দেখতে পাবে,’ বলল লাইনের অন্য প্রান্তের লোকটা।

‘আমিও তা-ই আশা করি।’

‘আমি যেখানে রেখে আসতে বলেছিলাম ওই মেয়ের লাশ, সেখানেই রেখেছ তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেউ দেখে ফেলেছে তোমাকে?’

‘আমাকে আজকাল কেউ আর দেখতে পায় না।’

‘কেউ তোমাকে দেখে ফেলেছে কি না?’

‘না।’

‘ভালো।’

‘হ্যাঁ।’

সবুজ রঙের একটা মার্কার তুলে নিল কালো নিট ক্যাপের লোকটা। ডেস্কের ওপর রাখা নিজের একটা ড্রয়িং রঙ করতে আরম্ভ করল। কাঁপতে শুরু করেছে তার হাত। দাগ ছাড়িয়ে বার বার চলে যাচ্ছে কালি। বিরক্ত হয়ে মার্কারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওই লোক।

লাইনের ও-প্রান্ত থেকে গুনতে পেল একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ। ও-প্রান্তের লোকটা দেখতে পায় ক্যাপওয়ালাকে। কীভাবে দেখতে পায়, জানে না

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৫০

ক্যাপওয়ালা, কিন্তু এটা জানে, তাকে দেখতে পায় ওই লোক... সবসময়। ‘আজ হোক বা কাল, ওরা সবাই দেখতে পাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।’ আবারও নুপা বলতে শুরু করে দিয়েছে ওই মেয়েদের ব্যাপারে।

ক্যাপওয়ালা এখন মিস করছে ওসব মেয়েকে। ওদেরকে ছাড়া এই বাড়ি বড় বেশি সুনসান মনে হচ্ছে। এবার লাল কালির একটা মার্কার তুলে নিল সে। ড্রয়িংয়ের ওপর রাখল ওটা। দেখতে পেল, আবারও কাঁপছে ওর আঙুলগুলো। নামিয়ে রাখল মার্কারটা। থেমে গেল কাঁপুনি। টান টান করে দিল আঙুলগুলো। তারপর মুঠি পাকাল। টান টান করে দিল আবার। আঙুলের এই নড়াচড়া ভালো লাগছে তার। স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। থামল। এবার আর তার হাত কাঁপছে না। তুলে নিল মার্কারটা। হাত কাঁপছে না। কাগজের গায়ে ঠেকাল ওই মার্কার। না, হাত কাঁপছে না। রঙ করতে শুরু করল। হ্যাঁ, এবার হাত কাঁপতে শুরু করেছে আবারও।

হাত থেকে মার্কারটা ছেড়ে দিল সে। চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। তাকিয়ে আছে ঘরের দিকে।

তার মেয়ের লাল সোয়েটারটা দলা-পাকানো-অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। বিছানার পাশে পড়ে আছে মেয়েটার ছোট লাল জুতো জোড়া।

বলল, ‘পরের মেয়েটাকে নিয়ে আসতে চাই আমি। আজ সন্ধ্যা হওয়ার আগেই।’

‘ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে।’

ক্যাপওয়ালা জানে, ও-প্রান্তের লোকটা যা বলছে, ঠিকই বলছে। সবসময় ঠিক কথাই বলে সে।

আরও একবার চুলকাল মাথার সেই ক্ষতস্থান। আঙুলের নখগুলো যেন ঢুকে যাচ্ছে মাংসের ভেতরে। যখন হাত সরিয়ে নিল, দেখতে পেল, আঙুলের ডগায় লেগে আছে টাটকা রক্ত। ‘সে-ঘটনা কবে ঘটবে, আমাকে বলবেন তো?’

‘বলবো।’

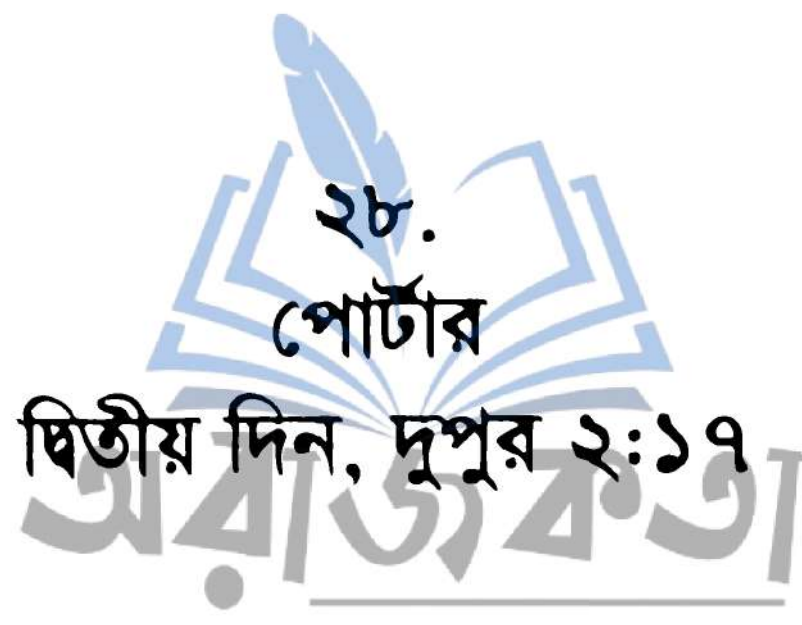
‘আমি কিন্তু প্রস্তুত অবস্থায় আছি।’

‘জানি।’

লাইন কেটে দেয়া হলো অপর প্রান্ত থেকে।

চেয়ার আবারও ঘুরাল কালো নিট ক্যাপের সেই লোক। এবার ডেস্কের দিকে মুখ করেছে। নামিয়ে রাখল ফোনটা। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। হারামজাদা কুকুরটা চলে গেছে। প্রতিবেশী লোকটাকেও দেখা যাচ্ছে না ধারেকাছে কোথাও। তবে কুকুরটা যে-জায়গায় পেশাব করেছিল, সেখানকার উজ্জ্বল সাদা তুষারের ওপর একটা দাগ রয়ে গেছে এখনও।

এবার হলুদ একটা মার্কার তুলে নিল লোকটা। ড্রয়িংয়ে রঙ করতে লাগল।



গত একটা ঘণ্টা নিজের কাউচে বসে থেকে পার করেছে পোর্টার। পাশের কফি টেবিলের ওপর রেখেছে ওই ছবি। বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে এসেছে রিডিং ল্যাম্প। ঢাকনা সরিয়েছে। তারপর জ্বালিয়ে দিয়েছে এক শ' ওয়াটের বাতিটা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সে-আলোয় বিশেষ ওই ছবির ওপর ঝুঁকে পড়েছে সে। খুঁটিয়ে দেখেছে প্রতিটা ইঞ্চি, প্রতিটা পিক্সেল।

দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করেছে ওর মন।

ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বির মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? লিবি ম্যাকিনলে। অথচ ফোর মাক্সি কিলারের হাতে মরতে হলো কাকে? বারবারা ম্যাকিনলেকে।

অবশ্যই। নামটা জানা ছিল পোর্টারের।

আর্থার ট্যালবটকে ধাক্কা মেরে এলিভেটর শ্যাফটে ফেলে দেয়ার আগে ওই নাম পোর্টারকে জানিয়ে দিয়েছিল বিশপ। এই ফোর মাক্সি কিলারের ব্যাপারে আলগা যতকিছু মনে আছে পোর্টারের, বিশেষ ওই নামটাও সেভাবে মনে ছিল... ওটা যেন লটকে ছিল ওর খুলিতে। বিশপের মা এবং মহিলা-প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল যে-লোক, তার নাম ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বি। হতে পারে, ওই দুই মহিলার যে-কোনো একজনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল লোকটার। আবার এমনও হতে পারে, দু'জনের সঙ্গেই লীলাখেলা করছিল লোকটা। নিজের পার্টনারকে খুন করেছিল সে। নিজের ডায়েরিতে সেই পার্টনারের নাম বিশপ বলেছিল মিস্টার স্ট্রেঞ্জার। পরে বলেছিল, ওই লোকের আসল নাম নাকি ফেল্টন ব্রিগস। লোকটা ছিল কোনো একজাতের সিকিউরিটি অফিসার। অথবা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তাকে নিয়োগ দিয়েছিল ট্যালবট। তবে কথা হচ্ছে, অনেক ডেটাবেস চেক করেছে পোর্টার, কিন্তু দুটো নামের কোনোটাই খুঁজে পায়নি।

মানুষ তারা, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব ভূতের মতো। অনেকটা যেন বিশপের মতোই।

অন্তত আজপর্যন্ত তা-ই ছিল।

ওই ফটোর দিকে আবারও তাকাল পোর্টার। দৃষ্টি যেন চুম্বকের মতো আটকে গেছে ছবির মহিলাটার দিকে।

ঠায় বসে রইল আগের জায়গাতেই। একটুও নড়ছে না।

মুখ তুলে যখন তাকাল, নজর বুলিয়ে নিল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ওপর। এফবিআই-এর লোকেরা যেন ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে সবজায়গায়... একেবারে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছে। বইপত্র টেনে নামিয়েছে তারা। কেবিনেট খালি

করেছে। ড্রয়ার বের করে উল্টে ফেলেছে। হিদারের ছবিটা পড়ে আছে মেঝেতে।
নিষ্পলক চাহনিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে বেচারী।

এখানে আর থাকতে চায় না পোর্টার।

এখানে আর থাকাটা সম্ভব না ওর পক্ষে।

বিশেষ করে এখন তো না-ই।

কফি টেবিলের ওপর রাখা ওই ছবির দিকে আবারও তাকাল সে।

দশ মিনিট কেটে গেল।

তারপর অতিবাহিত হলো বিশ মিনিট।

‘ধেং, নিকুচি করি।’

উঠে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গেল বেডরুমের ক্লজিটের দিকে। বের করল নিজের সুটকেস। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভর্তি করে ফেলল ওটা। তারপর নিয়ে গিয়ে রাখল সামনের-দিকের দরজায়।

এবার ফ্রিজের উদ্দেশে পা বাড়াল পোর্টার। গ্রাউন্ড বিফ লেখা একটা প্যাকেটের ফয়েল কাগজ সরাল। ভেতর থেকে বের করে নিল শ’ তিনেক ডলার। ওগুলো চালান করে দিল পকেটে। তারপর ফিরে এল লিভিং রুমে।

আরও একবার নজর বোলাল ওই ঘরে। তারপর এগিয়ে গেল নিজের প্রিয় চেয়ারটার দিকে। জোরে ধাক্কা মেরে কাত করে ফেলে দিল ওটা। শক্ত কাঠের মেঝের সঙ্গে সংঘর্ষের আওয়াজ উঠল, নিঃশব্দ অ্যাপার্টমেন্টে কেমন বিকট শোনালা সেটা।

চেয়ারের তলদেশ দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল পোর্টার। হাতড়াচ্ছে। ভেতরে আটকানো অবস্থায় ছিল জিনিসটা, এবার বেরিয়ে এল।

বিশপের সেই ডায়েরি। ডাক্ট-টেপের সাহায্যে, চেয়ারের কাপড়ের নিচে, কাঠের সঙ্গে আটকানো ছিল ওটা। কোনো তদন্তকাজ পরিচালনা করার সময় প্রমাণ হিসেবে কী কী পাওয়া গেল, সেসবের একটা তালিকা করতে হয় তদন্তকারী অফিসারকে; সে-তালিকায় এই ডায়েরির উল্লেখ করেনি সে। টেপের বাঁধন থেকে আলাগা করে নিল ছোট জিনিসটা। যে-পকেটে টাকা ঢুকিয়েছে, সেখানে চালান করে দিল সাদা-কালো ওই কম্পোজিশন বুক। ফিরে এল টেবিলের ধারে। ওর কাছে যে-ফটো পাঠিয়েছে বিশপ, তুলে নিল সেটা। এখন আর গ্লাভ পরিহিত অবস্থায় নেই সে। ওই ছবিও ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে।

সবশেষে বের করল নিজের মোবাইল ফোন। বন্ধ করে দিল ওটা। নামিয়ে রাখল কফি টেবিলের ওপর।

সদর দরজার কাছে পৌঁছে শেষবারের মতো তাকাল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখল হিদারের পড়ে-থাকা ওই ছবিটা। তারপর তুলে নিল নিজের সুটকেস, বেরিয়ে পড়ল। তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।



ন্যাশের হাতে এককাপ কফি ধরিয়ে দিল ক্রেয়ার। তারপর ন্যাশের পাশে, একটা চেয়ারে বসে পড়ল ধপাস করে। ‘ওই লোক একটা ভূতের মতো। ওই গ্যালারির কথা যদি বলি... সেখানে কেউ যদি একটা আলপিনও ফেলে, আওয়াজ শোনা যাবে। অথচ ওই লোক যেভাবেই হোক না কেন খুলে ফেলেছে পেছনদিকের দরজার তালা। দু’-দুটো তালা ছিল ওই দরজায়, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার। তারপর কী করেছে লোকটা? ঢুকে পড়েছে স্টোররুমে। জায়গামতো নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে লিলির মরদেহ। এতকিছু করেছে সে, অথচ একটা কোনো আওয়াজ হয়নি। মনোযোগ আকর্ষিত হয়নি ওই ম্যানেজার মহিলার। অথচ মহিলা তখন হলের আরেকধারে, বেশি হলে দশ কি পনেরো ফুট দূরে ছিলেন।’

কফির কাপে চুমুক দিল ন্যাশ। নাক কুঁচকে উঠল ওর। ‘এই জিনিস তো দেখছি ভয়ঙ্কর।’

‘কফিটা হয়তো বেশ কিছুক্ষণ চড়ানো ছিল স্টোভে।’

কাপের দিকে তাকাল ন্যাশ। কাঁধ ঝাঁকাল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। তারপর আরও টা কফি খেল।

লিলি ডেভিসের লাশে জরুরি একটা ময়নাতদন্ত করার ব্যাপারে রাজি হয়েছে আইজলি। আর তাই মেডিকেল একজামিনারের অফিসে হাজির হয়েছে ন্যাশ আর ক্রেয়ার, গত এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেছে সেখানে। লিলির মরদেহ ছাড়া ওই গ্যালারি থেকে প্রমাণ বলতে আর কোনোকিছু পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা জুতোর দাগ। অচেনা সেই লোক গ্যালারি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সবকিছু মুছে দিয়ে গেছে সম্ভবত। শুধু রেখে গিয়েছিল হতভাগী ওই মেয়েকে।

আইজলি আদেশ জারি করেছিল, মেয়েটাকে যাতে সোজা নিয়ে আসা হয় এখানে... সে যাতে কাজ শুরু করে দিতে পারে।

সে-কাজের ফল কী আসে, জানার জন্য এখানে অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছে ক্রেয়ার আর ন্যাশ। ক্রোজ নিজের আইটি টিম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে ব্যস্ত। সোফি রদ্রিগেজ সোজা চলে গেছে ডেভিসদের বাসায়। ন্যাশরা কেউই চাইছে না, লিলির মারা যাওয়ার খবর টিভির মাধ্যমে জানতে পারুক মেয়েটার বাবা-মা... যেমনটা ঘটেছে রেনল্ডসদের বেলায়।

‘আমরা তা হলে কী জানতে পেরেছি? বিভিন্ন রকম গাড়ির ব্যাপারে খোঁজখবর করছিল এলা রেনল্ডস?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

স্টারবাক্সে, ওই মেয়ের ব্রাউজিং ইতিহাস ঘেঁটে কী জানা গেছে, ক্রেয়ারকে বলেছে ন্যাশ।

কফির কাপে আরেকবার চুমুক দিল ন্যাশ। ‘পুলান্সি রোডে গাড়ির একটা দোকান আছে, নাম কারস আর ইউএস। প্রায় দু’সপ্তাহ ধরে প্রতিদিনই তাদের ইনভেন্টরি ঘেঁটেছে মেয়েটা। তারপর, দেখে যা মনে হয়েছে আমাদের, নিজের মনমতো কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। গাড়িটা একটা মাজদা টু স্পোর্টস কার। ২০১২ সালের মডেল। দাম ৭৪৯৫ ডলার। উজ্জ্বল সবুজ রঙ ওটার। ভেতরটা সুদৃশ্য কাপড়ে মোড়া। ইঞ্জিন ১.৫ লিটারের। ট্রান্সমিশন অটোমেটিক। পঁচাত্তর হাজার মাইল চলেছে।’

‘মাইলেজ তো প্রচুর।’

‘হ্যাঁ।’ জোর করে চেহারায়ে হাসি ফুটিয়ে তুলল ন্যাশ। ‘আমিও প্রথমে তা-ই ভেবেছিলাম।’

‘আপনি বলেছেন, এই যে খোঁজ চালিয়েছিল এলা, এটা এনক্রিপ্ট করা ছিল, ঠিক না? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ-রকম কোনো কিছু কেন নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে লুকাতে চাইবে সে?’ জানতে চাইল ক্রেয়ার।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘হতে পারে, তাঁরা চাইছিলেন না, এই বয়সেই কোনো গাড়ি কিনে ফেলুক মেয়েটা। ওর বয়স হয়েছিল মাত্র পনেরো বছর। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, বয়স এখনও অনেক কম মেয়েটার।’

‘ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে আমার। ড্রাইভিং করার মতো বয়সও হয়নি ওই মেয়ের, অথচ গাড়ি খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিল সে।’

‘আরে কী বলো না-বলো! আমার বয়স যখন আট, আমি তো তখন থেকেই গাড়ি খুঁজতে শুরু করেছিলাম।’

‘পনেরো বছর বয়সী মেয়েরা সাধারণত কী করে, জানেন? যেসব ছেলের গাড়ি আছে, তাদের প্রতি আগ্রহ দেখায়। নিজেরা সাধারণত কোনো গাড়ি কেনে না।’

‘সব মেয়েই তো আর একরকম না। যা হোক, আমি আর ক্রোজ পরিকল্পনা করেছিলাম, ওই দোকানে যাবো। তখনই ফোন করলে তুমি, লিলির খবরটা জানালে। দেখি, এখানকার কাজটা শেষ হলে যাবো ওই দোকানে।’

গ্যাব্রিয়েল ডিগান একটা কথা বলেছিল, সেটা মনে পড়ে গেল ক্রেয়ারের। বলল, ‘গ্যাবির কথা মনে আছে আপনার? লিলির সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ওই মেয়ে বলেছে, লিলিও নাকি একটা গাড়ির খোঁজ করছিল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যত টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছিল সে, সবই নাকি গাড়ির ছবি। আসলে ঠিক কোন জিনিসটা দরকার ছিল ওর, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিল। ওর বাবা নাকি বলেছিলেন, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর গাড়ি কিনে দেবেন ওকে।’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ক্রেয়ার, কফির কাপে আরেকবার চুমুক দিল ন্যাশ।

‘এ-রকম কি হতে পারে, ওই দোকানের কোনো ডিলারের সঙ্গে দেখা করেছিল মেয়েটা? যদি সত্যিই হয়ে থাকে সে-রকম কিছু, তা হলে ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা যোগসূত্র হতে পারে।’

‘মানে, আপনি বলতে চাইছেন, আমাদের সেই অচেনা লোক একজন ব্যবহৃত-গাড়ির সেল্‌সম্যান?’

উঠে দাঁড়াল ন্যাশ, ধীর পায়ে পায়চারি করতে লাগল অফিসের ভেতরে। ‘যদি সত্যিই তা-ই হয়, তা হলে লোকটা কিন্তু সহজ একটা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কীভাবে কাজ করে, ভেবে দেখো একবার। যে-গাড়ি পছন্দ হচ্ছে, সেটা পেয়ে যাচ্ছে এলা অথবা লিলির মতো মেয়েরা। এমনও হতে পারে, পছন্দের গাড়িটা দেখতে যাচ্ছে ওরা। আর তখনই আমাদের সেই অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে ওদের। এই পুরো কাজে কিন্তু হুমকি বা আশঙ্কা বলতে কিছুই নেই। যা হোক, গাড়ি দেখতে যাচ্ছে ওরা, ওদেরকে তখন সেসব গাড়ি দেখাচ্ছে রহস্যময় সেই লোক। আবার এমনও হতে পারে, দোকানে-থাকা অন্য গাড়িও দেখাচ্ছে। একসঙ্গে বেশ ভালো একটা সময় অতিবাহিত করছে ওরা। একটাবার একটু ভেবে দেখো তো... এ-রকম কোনো গাড়ির দোকান থেকে শেষ করে একঘণ্টার আগে বের হতে পেরেছ তুমি? ও-রকম কোনো দোকানের কর্মচারীরা তো পারলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে তাদের কাস্টোমারদের... সহজে ছাড়তে চায় না। এমনও হতে পারে, রহস্যময় সেই লোককে নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরেছে ওরা। পরিচিত হয়েছে একজন আরেকজনের সঙ্গে। একসঙ্গে হয়তো টেস্ট ড্রাইভেও গেছে দু’-একবার। ফলে কী হয়েছে... ওই লোকের ব্যাপারে সন্দেহ বলতে যদি কিছু ছিলও এলা অথবা লিলির মনে, বিদায় নিয়েছে সে-অনুভূতি। ওরা যে-রকম মেয়ে, রাস্তাঘাটে অচেনা কেউ যদি এগিয়ে আসে ওদের দিকে, সতর্ক হয়ে ওঠার কথা ওদের। কিন্তু যে-পরিস্থিতির কথা বলছি আমি, সেক্ষেত্রে কী ঘটে থাকতে পারে? হয়তো রহস্যময় সেই লোকের মন জোগানোর চেষ্টা করেছিল ওরা, যাতে সে-লোক গাড়ির দাম কমিয়ে রাখার ব্যাপারে দু’-চারটা কথা বলে দোকানের মালিকের সঙ্গে।’

বড় বড় হয়ে গেছে ক্রেয়ারের চোখ। ‘কেউ যখন টেস্ট ড্রাইভের জন্য যায় কোথাও, ড্রাইভার’স লাইসেন্সের একটা কপি জমা দিতে হয় তাকে। সেইসঙ্গে দিতে হয় নিজের সব ব্যক্তিগত তথ্য। এলা আর লিলি চলে আসার পর, ওই লোক হয়তো সেসব তথ্য হাতিয়ে নিয়েছিল।’

মাথা নাড়ছে ন্যাশ। ‘তুমি সম্ভবত ভুলে যাচ্ছ, দুটো মেয়ের কারও ড্রাইভার’স লাইসেন্স ছিল না।’

‘এমনও হতে পারে, কোনো ফর্ম অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা পূরণ করতে হয়েছিল তাদেরকে।’

‘হতে পারে।’

‘চেক করে দেখার মতো একটা তথ্য বটে, কোনো সন্দেহ নেই।’

‘হ্যাঁ।’

ডাবল ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল আইজলি। একটা পেপার টাওয়েল দিয়ে হাত মুছছে। মাথা কাত করে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল একজামিনেশন রুমটা। ‘আসুন।’

উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার। আইজলিকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়ল ওই ঘরে। ওর পেছনে আছে ন্যাশ। মুখের ভেতরে একটা চুইংগাম ঢুকিয়ে দিল ক্লেয়ার। ন্যাশকে সাধল আরেকটা।

মাথা নাড়ল ন্যাশ। ‘আমি মনে হয় আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে উঠছি এখানকার গন্ধের সঙ্গে।’

‘এ-রকম কোনো কাজের-পরিবেশে এখানকার গন্ধের সঙ্গে কেউ করে ধাতস্থ হতে পারে, জানেন? যেদিন সে অবসর নেয়, সেদিন,’ বলল আইজলি।

লিলি ডেভিসের নগ্ন দেহটা শুইয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর। এখনও চিরে খুলে রাখা হয়েছে ওর বুক। ইংরেজি “ওয়াই” আকৃতির মতো বড় একটা কাটা-জায়গা দেখা যাচ্ছে বেচারীর বুকে। সেটা শুরু হয়েছে ওর কাঁধ থেকে, শেষ হয়েছে পিউবিক বোনের কাছে এসে। মেয়েটাকে দেখতে পাওয়ামাত্র রক্ত সরে গেল ন্যাশের চেহারা থেকে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল ক্লেয়ারের দিকে। ‘চুইংগামটা এখন দাও তো আমাকে।’

চাপা হাসি হাসল ক্লেয়ার। চুইংগাম দিল ন্যাশকে। তারপর ঝুঁকে পড়ল লিলির মরদেহের ওপর। একেবারে শান্ত দেখাচ্ছে মেয়েটার চেহারা।

বড় একটা লাইট কাত করে আলোটা টেবিলের ওপর ফেলল আইজলি। নিশ্চিত করতে চাইছে, ওই আলো যাতে লিলির বুকের গর্তের ভেতরে পড়ে। ‘অন্য কোনো সময় হলে এই চেরা জায়গাটা এতক্ষণে বন্ধ করে দিতাম আমি। কিন্তু এখন চাইছি, আপনারা দেখুন।’ চেরা জায়গাটার ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছে লিলির পাঁজরের হাড়গুলো। ‘ফুসফুসে এই দাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন?’

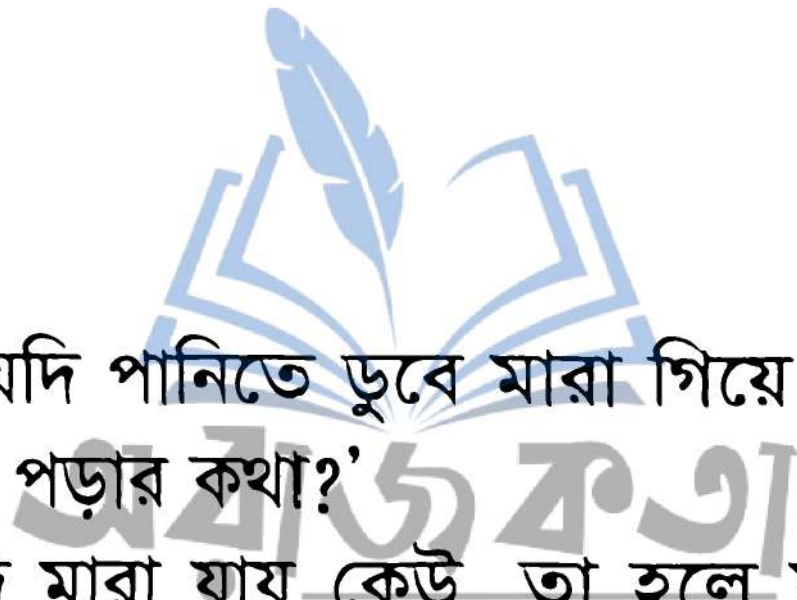
ক্লেয়ার দেখতে পাচ্ছে, গোলাপি ফুসফুসের ওপর গাঢ় কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে। দুটো ফুসফুসে ও-রকম দাগ দেখা যাচ্ছে কয়েক ডজন। ‘কী ওগুলো?’

‘কারও ফুসফুস যখন কোনো তরল পদার্থে পূর্ণ হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড একটা চাপে টনটন করতে থাকে, তখন এ-রকম কালশিটে পড়ে যায় কখনও কখনও,’ ক্লেয়ারকে বলল আইজলি।

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে লিলির? এলার মতো?’ বলল ন্যাশ।

মাথা ঝাঁকাল আইজলি। ‘লবণাক্ত পানিতে ডুবে... এলার মতো।’

আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ল ক্লেয়ার। ‘আমার মনে হয় না, আমাদের হৃৎপিণ্ড যদি রক্ত পাম্প করা থামিয়ে দেয়, তা হলে তখন শরীরের কোথাও কোনো



কালশিটে পড়বে। সত্যিই যদি পানিতে ডুবে মারা গিয়ে থাকে এই মেয়ে, তা হলে কি তার ফুসফুসে কালশিটে পড়ার কথা?’

‘ও-রকম কায়দায় যদি মারা যায় কেউ, তা হলে মৃত্যুর আগে বা পরে তার ফুসফুসে কালশিটে পাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না।’

‘অস্বাভাবিক না হলে এই ব্যাপারটা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন কেন আপনি?’

আরও একবার লিলির লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ল আইজলি। আঙুলের সাহায্যে দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েটার ফুসফুস দুটো। ‘কোনো কোনো দাগ যে অন্য কোনো দাগের চেয়ে বেশি গাঢ়, খেয়াল করেছেন?’

মাথা ঝাঁকাল ক্লেয়ার।

‘এসব আসলে কী নির্দেশ করছে, জানেন? একাধিকবার ট্রমার শিকার হয়েছিল এই বেচারী। কোনো কোনো দাগ আবার অন্য কোনো দাগের চেয়ে পুরনো।’

‘তার মানে, তুমি বোঝাতে চাইছ, মেয়েটা একাধিকবার ডুবে গিয়েছিল?’ বলল ন্যাশ।

‘আমি চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে বলতেই হয়, এই মেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে ছয় কি সাত বার ডুবেছিল পানিতে।’

ক্রুঁচকে গেছে ক্লেয়ারের। ‘সেটা কীভাবে সম্ভব?’

‘আমার ধারণা, আপনাদের সেই অচেনা লোক এই মেয়েকে পানিতে ডুবিয়েছে, তারপর একেবারে শেষমুহূর্তে তুলে এনেছে,’ বলল আইজলি। ‘আপনারা যদি মেয়েটার পাঁজরের হাড়ের দিকে ভালোমতো তাকান, সূক্ষ্ম কিছু চিড় দেখতে পাবেন। আমার মনে হয়, ওই লোক কার্ডিয়োপালমোনারি রিসাসিটেশনও চালিয়েছে এই মেয়ের ওপর। আরেকটা কথা। মেয়েটার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিকাল পোড়ার দাগ দেখতে পেয়েছি আমি... সেসব সম্ভবত স্টান গানের। তার মানে হচ্ছে, মেয়েটাকে নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য ও-রকম কিছু একটা ব্যবহার করেছিল ওই লোক। আবার মেয়েটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার কাজেও ব্যবহার করে থাকতে পারে জিনিসটা।’

‘স্টান গানের সাহায্যে কারও জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সম্ভব নাকি?’

মাথা নাড়ল আইজলি। ‘না, সম্ভব না। স্টান গানের সাহায্যে কারও শরীরে বিদ্যুৎ চালনা করা হলে, সে-বিদ্যুৎ ওই মানুষটার চামড়ার নিচ দিয়ে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু যদি কারও জ্ঞান ফিরিয়ে আনার দরকার হয়, তা হলে তার হৃৎপিণ্ডের দিকে চালনা করতে হয় বিদ্যুৎ। এখন ওই লোক যদি এ-রকম মনোভাব নিয়ে কাজটা করে থাকে, তা হলে সম্ভবত মেয়েটাকে গুইয়ে দিয়ে ওর পিঠের নিচে রেখেছিল ধাতব একটা প্লেট। তারপর স্টান গান ব্যবহার করেছিল এই মেয়ের ওপর। কিন্তু তাতেও কাজ হবে কি না, সন্দেহ আছে আমার। আর কার্ডিয়োপালমোনারি রিসাসিটেশন যদি সত্যিই করে থাকে লোকটা, তাতে মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে।’

‘একাধিকবার,’ আনমনে বলল ক্লেয়ার।

‘কমপক্ষে ছয় কি সাতবার।’

‘মাই গড।’

মাথা নিচু করল ন্যাশ। জ্বলন্ত চুলকাল। ‘তার মানে হচ্ছে, ওই লোক বার বার পানিতে চুবিয়েছে এই মেয়েকে। এবং শেষপর্যন্ত মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।’

‘হ্যাঁ, আমার সিদ্ধান্ত সে-রকমই,’ বলল আইজলি।

টেবিল থেকে একটু সরে দাঁড়াল ক্লেয়ার। ‘কেন... কেউ কেন...’ শেষ করল না অথবা করতে পারল না কথাটা। ওই কথা যতটা না অন্য কারও উদ্দেশ্যে বলেছে, তার চেয়ে বেশি বলেছে নিজেকে।

এবার জ্বলন্ত কোঁচকানোর পালা আইজলির। ‘আরও কিছু দেখানোর আছে আপনাদেরকে।’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্লেয়ার, রুমের আরেকদিকে এগিয়ে গেল আইজলি। একটা গার্নিতে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেয়া অবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়েছে আরেকটা মরদেহ; একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল সেটা, সে-চাদর সরিয়ে নিল আইজলি।

এলা রেনল্ডস।

‘আমি এই মেয়ের লাশ আরও একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। একটু আগে ফুসফুসের যে-দাগগুলোর কথা বললাম, এই মেয়ের বেলাতেও তেমনটা দেখতে পেয়েছি। বরফশীতল পানিতে থাকার পরও গলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল এলার লাশ। ফলে তার শরীরের টিস্যুগুলো বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই ফুসফুসের দাগগুলো ভালোমতো দেখা যায়নি তখন। যা-ই হোক না কেন, স্বীকার করে নিচ্ছি, দাগগুলো আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল আমার। কোনো অজুহাত দিচ্ছি না... ওসব দাগ আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।’

‘তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, এলাকেও বার বার পানিতে চুবিয়েছে ওই লোক?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

মাথা ঝাঁকাল আইজলি, চেহারা গম্ভীর হয়ে গেছে। ‘এলার বেলায় যা ঘটেছে তা হলো, সময়ের বড় একটা ব্যবধান নিয়ে ওই মেয়েকে বার বার পানিতে চুবিয়েছে রহস্যময় সেই লোক। এমনও হয়েছে, কয়েকদিন পর পর ওকে চুবানো হয়েছে পানিতে। আর লিলির বেলায় সেই বিরতিটা নেমে এসেছে এক ঘণ্টা কিংবা তারও কম সময়ে। আপনাদের সেই অচেনা লোকের আচার-আচরণে অদ্ভুত এক তাড়াহুড়ো দেখতে পাচ্ছি। লিলিকে যদি সামলে নেয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় দেয়া হতো, তা হলে হয়তো বেঁচে থাকত পারত মেয়েটা। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষের শরীর এত বেশি নিতে পারে না। কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি মেয়েটাকে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৫৯



অরাজকতা

‘এলার বাবার কী খবর?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার। ‘নতুন আর কী কী জা পারলেন তাঁর ব্যাপারে?’

যে-চাদর দিয়ে এলার শরীর ঢেকে রাখা হয়েছিল, সেটা আবার জায়গা সমত্রে টেনে দিল আইজলি। হাজির হলো ঘরের আরেকদিকে। এখানে দেয়া গায়ে বানানো আছে বেশ কয়েকটা ধাতব ড্রয়ার। টান মেরে একটা ড্রয়ার ফেলল সে। কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করল ন্যাশ আর ক্লেয়ারকে। ‘পোর্টারের যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি অনেকবার। কিন্তু প্রতিবারই ভয়েস মেইল পাচ্ছি

‘আগামী কয়েকটা দিনের জন্য একটু পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে স্যাম,’ ব ন্যাশ।

‘সব ঠিকঠাক তো?’

‘এই একটু ব্যক্তিগত সমস্যা আর কী।’

দেখে মনে হলো, বিশেষ এই ব্যাপারটা আসলে কী, তা জানার জ জোরাজুরি করবে আইজলি। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করল সে। একটু আগে যে-ড্রয় খুলেছে টান মেরে, সেটার ভেতরে আছে ফ্রয়েড রেনল্ডসের লাশ। পুরু আর কা একটা বডি ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে। ওই ব্যাগের জিপারটা টা মেরে লাশের মাথা থেকে শরীরের মাঝামাঝি পর্যন্ত খুলে দিল সে। তারপর দু’দিকে সরিয়ে দিল প্লাস্টিক, যাতে ভেতরটা ভালোমতো দেখতে পায় ন্যাশ আর ক্লেয়ার লাশের চামড়া ফেকাসে সাদা হয়ে গেছে। শুধু গলার সেই কাটা জায়গাটা কালচে বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। লাশের কণ্ঠার হাড়ের কাছে বিশ্রী একটা অবস্থা ধারণ করেছে ওই ক্ষত। গলা বেয়ে কানের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে ওটা; যত এগিয়েছে, ক্ষতও তত চিকন হয়েছে, বিশেষ ওই রঙও তত ফিকে হয়েছে।

লাশের গলা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে একটা আঙুল নিয়েছে আইজলি, ওটা দিয়ে যেন অনুসরণ করে দেখাচ্ছে ওই দাগ। ‘এই কাজ করা হয়েছে খুবই চিকন কোনো তার দিয়ে... সেটা পিয়ানোরও হতে পারে, আবার ইলেকট্রিক গিটারেরও হতে পারে। বেশিরভাগ হার্ডওয়্যার দোকানে এ-রকম চিকন তার কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ও-রকম কোনো দোকানে যে-রকম তার পাওয়া যায়, এই লোককে খুন করতে তার চেয়েও চিকন তার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটা বললাম একটু আগে... সেই তারের সঙ্গে যেন সাদৃশ্য আছে বিশেষ কোনো বাদ্যযন্ত্রের। পোর্টার বলেছিলেন, গাড়ির সিটের পেছনদিকে নাকি জুতোর দাগ পাওয়া গেছে। আমি এখন যা দেখতে পাচ্ছি, সেটার সঙ্গে মিলে গেছে পোর্টারের সেই বর্ণনা। অচেনা সেই লোক নিজের তার দিয়ে প্রথমে পেঁচিয়ে ধরেছিল মিস্টার রেনল্ডসের গলা। তারপর প্রচণ্ড জোরে টান মেরেছিল তারটা আঁকড়ে ধরে। মিস্টার রেনল্ডসের মাথার পেছনদিকটা তখন স্বাভাবিকভাবেই এলিয়ে পড়েছিল সিটের হেডরেস্টের গায়ে। আপনারা যদি এই জায়গাটা একটু ভালোমতো দেখেন... খেয়াল করুন, তার ধরে এত জোরে টান মারা হয়েছিল যে,

গলার চামড়া-মাংস কেটে সেটা বলতে গেলে আঁচড় বসিয়ে দিয়েছে শ্বাসনালীতে। গলার দু'দিকে কিন্তু আঘাতের চিহ্ন তুলনামূলকভাবে কম। তার মানে হচ্ছে, পেছনদিক থেকে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল মিস্টার রেনল্ডসের।

‘তার মানে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

মাথা ঝাঁকাল আইজলি। ‘আমি নিশ্চিত। অন্য আর কিছু খুঁজে পাইনি আমি।’

ভাইব্রেট করে উঠল ক্লেয়ারের মোবাইল ফোন। ওটা হাতে নিল সে। একটা টেক্সট মেসেজ এসেছে, পড়ল। ‘এইমাত্র বড় রকমের একটা স্ট্রোক হয়েছে র্যান্ডল ডেভিসের।’

মিনিট ত্রিশেক পর, রাশ আওয়ারের জ্যাম ঠেলতে ঠেলতে জন এইচ. স্ট্রজার জুনিয়র হাসপাতালে পৌঁছে গেল ক্রেয়ার আর ন্যাশ। হাজির হলো ইমার্জেন্সি রুমে। এখানে এককোণায় একটা ওয়েটিং রুম আছে, সেখানে বসে থাকতে দেখা গেল সোফি রদ্রিগেজকে। তাঁর সঙ্গে আছেন লিলি ডেভিসের মা গ্রেস ডেভিস।

অটোমেটিক গ্লাস ডোর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্রেয়ার আর ন্যাশ, ওদেরকে দেখতে পেল সোফি। চট করে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ‘তাঁদের কিচেনে ছিলাম আমরা। লিলির খবরটা জানিয়েছিলাম আমি। ওই দম্পতিও আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন লিলির ব্যাপারে, আর তাই খবরটা যেন প্রত্যাশিতই ছিল তাঁদের কাছে। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন মিস্টার ডেভিস। তারপর একসময় হুট করেই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি। স্বামীকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন মহিলা। কিন্তু ওই লোক রীতিমতো দশাসই। মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি। খিঁচুনি উঠতে লাগল তার শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করলাম আমি। মিনিট চারেকের মধ্যে হাজির হয়ে গেল প্যারামেডিক্সের লোকজন। ততক্ষণে খিঁচুনি অনেকটা কমে গেছে মিস্টার ডেভিসের। তবে দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। হৃৎস্পন্দনও কমে গিয়েছিল অনেক। তাঁর পাল্‌স খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু যখন পেলাম, তখন দেখি, প্রতি মিনিটে বড়জোর চল্লিশবার স্পন্দন হচ্ছে।’

‘আগে এ-রকম কোনো ইতিহাস ছিল তাঁর?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

মাথা নাড়ল সোফি। ‘কিছু না... অন্তত তাঁর স্ত্রীর কথা অনুযায়ী। প্রতিদিন ব্যায়াম করতেন ওই লোক। এতকিছু ঘটছে তাঁর পরিবারে, তারপরও আজ তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখি, দৌড়াতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। বললেন, এই কাজ করলে নাকি তাঁর মাথা পরিষ্কার থাকে।’

‘তাঁর মেয়ে নিখোঁজ, অথচ তিনি জগিঙে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন?’ বলল ন্যাশ।

‘সমস্যা সমাধান করার জন্য কত লোক যে কতকিছু করে, কী আর বলবো।’ গ্রেস ডেভিসের দিকে তাকাল সোফি। ‘ওই মহিলাকে দেখলে এখন মায়াই হচ্ছে আমার। মেয়েকে হারিয়েছেন তিনি। আর এখন তাঁর স্বামী আইসিইউ-তে। কীসের মধ্য দিয়ে যে দিন পার করছেন তিনি, কল্পনাও করতে পারছি না।’

ইমার্জেন্সি রুমের দুই পাল্লার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন একজন ডাক্তার। নজর বুলিয়ে নিলেন ভিড়ের ওপর। তারপর হাঁটা ধরলেন গ্রেস ডেভিসের উদ্দেশে।

‘আমি খুবই দুঃখিত, থ্রেস,’ বললেন তিনি। ‘আপনার জীবনে এখন যা-যা ঘটছে, একটা মানুষ কিছুতেই চাইতে পারে না সে-রকম কোনাকিছু।’

‘আপনারা পূর্বপরিচিত?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

চোখ সরু হলো ডাক্তারের। ‘আপনি কে?’

‘আমি ডিটেকটিভ ক্লেয়ার নটন। ইনি ডিটেকটিভ ন্যাশ। আর উনি সোফি রদ্রিগেজ, মিসিং চিলড্রেনে আছেন।’

কোমলতার ছাপ পড়ল ডাক্তারের চেহারায়। ‘লিলিকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছেন আপনারা।’ মাথা ঝাঁকালেন। ‘মেয়েটা এত মিষ্টি... কী আর বলবো। ওকে আমি বলতে গেলে ওর সারাটা জীবন ধরে চিনি। কেউ কেন এ-রকম একটা কাজ করতে গেল ওই মেয়ের সঙ্গে?’

সাদা হয়ে গেল থ্রেসের চেহারা। ফুলে ওঠা লাল দুই চোখ ভরে গেল পানিতে। তাঁকে একহাতে জড়িয়ে ধরল সোফি।

লিলিকে যে খুঁজে পাওয়া গেছে, সেটা ডাক্তারকে জানাল ক্লেয়ার। যতক্ষণ কথা বলল সে, সারাটা সময় থ্রেসের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার। ক্লেয়ার শেষ করার পর লম্বা করে দম নিলেন তিনি। ‘ভয়ঙ্কর।’ এগিয়ে গেলেন থ্রেসের দিকে। আলতো করে আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। থ্রেসের কানে ফিসফিস করে বললেন কিছু একটা।

‘ডেভিস পরিবারের সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে?’ জানতে চাইল ক্লেয়ার।

‘আমাদের এখানে অনকোলজি-তে কাজ করেন র্যাভাল। আমি এই হাসপাতালে আজ ছ’বছর ধরে ইমার্জেন্সি বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছি। এখানে আমাদের যে-দল, সেটা বেশ শক্তপোক্ত বলা যায়। আমি আর র্যাভাল... আমরা দু’জনই আমাদের রেসিডেন্সি শেষ করেছি ম্যাগৌ হাসপাতালে।’

এক কদম আগে বাড়ল ন্যাশ। ‘ডক্টর ডেভিসের কী অবস্থা এখন? সামলে উঠতে পারবেন তো তিনি?’

‘তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। কিন্তু ওই স্ট্রোক স্থায়ী একটা ক্ষতির কারণ হতে পারে। একটা সিটি স্ক্যান করানোর কথা আছে তাঁর। ওটার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি আমি।’ মিসেস ডেভিসকে ছেড়ে দিলেন ডাক্তার। এক কদম পেছনে সরে দাঁড়ালেন। ‘থ্রেস, র্যাভাল কতদিন ধরে লিসিনোপ্রিল খাচ্ছিলেন, বলতে পারেন?’

কপাল কুঁচকে গেল থ্রেসের। ‘লিসিনোপ্রিল কী?’

‘একজাতের ওষুধ। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেবন করা হয় ওটা।’

‘র্যাভালের তো উচ্চ রক্তচাপ ছিল না?’

থ্রেসের কাঁধে হাত রাখলেন ডাক্তার। ‘এমনও তো হতে পারে, উচ্চ রক্তচাপ ছিল র্যাভালের, কিন্তু সেটা আপনাকে বলতে চাননি তিনি? আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিতে চাননি হয়তো।’

মাথা নাড়লেন মিসেস ডেভিস। পার্স থেকে বের করলেন মোবাইল ফোন। স্ক্রিনে ট্যাপ করছেন। ‘উচ্চ রক্তচাপ ছিল না ওর। প্রতি সপ্তাহে কয়েকবার করে চেক করতাম আমরা... এই ব্লুটুথ কাফের মাধ্যমে। গত বছর একটা কনফারেন্সে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে নিয়ে এসেছিল এটা।’ ফোনটা ধরিয়ে দিলেন ডাক্তারের হাতে। ‘আপনি নিজেই দেখুন। আমাদের সব ফলাফল রেকর্ড করা আছে এটাতে।’

স্ক্রিনে স্ক্রল করতে লাগলেন ডাক্তার। ‘সবই তো দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিক।’

‘নিয়মিত ব্যায়াম করে সে,’ বলছেন গ্রেস। ‘শেষ যে-বার ডাক্তার দেখিয়েছিলাম আমরা, তিনি তখন বলেছিলেন, ত্রিশ বছর বয়সী কোনো যুবকের মতো সুস্থ আছে সে।’

‘যদি সত্যিই তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে গুরুতর একটা সমস্যা হাজির হয়ে গেছে আমাদের সামনে,’ বললেন ডাক্তার, খুঁতনি চুলকাচ্ছেন।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল ক্লেয়ার। এবার ঠাহর করতে পারল, কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে কোথাও না কোথাও। বলল, ‘কী সমস্যা?’

কয়েকটা মুহূর্ত কিছু বললেন না ডাক্তার, হারিয়ে গেছেন আত্মচিন্তায়। তারপর বললেন, ‘র্যাভলের রক্তে ঘনীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে লিসিনোপ্রিল। অনুমান করে নিচ্ছি, বড় রকমের একটা ডোজ নিয়েছিলেন তিনি... তিন কি চার শ’ মিলিগ্রাম।’

‘স্বাভাবিক মাত্রাটা কী?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

‘দুই দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম থেকে চল্লিশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত। কিন্তু তার বেশি না কিছুতেই।’

সোফির দিকে তাকাল ক্লেয়ার। কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগেই মাথা ঝাঁকাতে আরম্ভ করল সোফি। ‘ভাবছি আমি... ভাবছি... আমরা ছিলাম কিচেনে, এক গ্লাস পানি ছিল আমার হাতে, মিসেস ডেভিস কী যেন পান করছিলেন...’

‘কমলার জুস,’ বললেন মিসেস ডেভিস। ‘র্যাভাল কফি বানিয়েছিল। আমি আবার কফি খাই না। যেদিনই খাই, সেদিনই রাতে জেগে থাকতে হয় আমাকে।’

‘কী মনে হয় তোমার? কফির সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল কেউ?’ ক্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিল ক্লেয়ার, কিন্তু বলল না সেটা। হাত ধরে টেনে দূরে নিয়ে গেল ন্যাশকে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু’জন, সেখান থেকে ওদের কথা শুনতে পাবে না বাকিরা। নিচু কণ্ঠে বলল, ‘আমাদের সেই অচেনা লোক কিন্তু এলা রেনল্ডসের বাবাকে খুন করেছে।’

‘হুঁ, পিয়ানোর একটা তার কাজে লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরেছে তাঁকে। ভদ্রলোকের গলাটা আরেকটু হলে আলাদাই হয়ে গিয়েছিল,’ বলল ন্যাশ। ‘আর

এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওষুধের ওভারডোজ দেয়া হয়েছে লিলির বাবাকে। হতে পারে, সত্যিই উচ্চ রক্তচাপ ছিল ডক্টর ডেভিসের। নিজে নিজেই ওষুধ খাচ্ছিলেন তিনি। বিশেষ কোনো একটা কারণে এই কথা লুকিয়েছেন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। তা না হলে তুমিই বলো আমাকে, যার উচ্চ রক্তচাপ নেই, সে কেন বাসায় নিয়মিত রক্তচাপ মাপবে?’

একহাতের কজি উঁচু করে দেখাল ক্লেয়ার। অ্যাপলের একটা হাতঘড়ি পরে আছে সে, দেখিয়ে দিল সেটা। ‘আমি প্রতিদিন কত কদম হাঁটি, সেটা ট্র্যাক করে এই জিনিস। আমার হার্ট রেট মনিটর করে। এমনকী আমি যদি অনেকক্ষণ ধরে বসেও থাকি, সেটাও আমাকে জানিয়ে দেয়। আজকাল সবাই নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেরাই পরীক্ষা করে।’ ন্যাশের বেটপ ভুঁড়িতে আলতো খোঁচা মারল। ‘সবারই করা উচিত সেটা।’

‘আমি হৃষ্টপুষ্ট হতে পারি, কিন্তু তাতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না আমার।’

‘ওই ওষুধের স্বাভাবিক মাত্রা যদি দুই দশমিক পাঁচ থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ মিলিগ্রাম হয়ে থাকে, তা হলে মিস্টার ডেভিস খেয়েছেন সে-মাত্রার দশগুণ বেশি। এই ব্যাপারটা কোনো দুর্ঘটনা না। কেউ একজন তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে,’ বলল ক্লেয়ার।

‘কেন? ব্যাপারটা তো আত্মহত্যার চেষ্টাও হতে পারে?’

‘সেটা জানার একটা মাত্র উপায় আছে,’ বলল ক্লেয়ার। বের করল ওর মোবাইল ফোন। শিকাগো মেট্রোর বিশেষ একটা নম্বরে ডায়াল করছে। ‘ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেটর পাঠাচ্ছি আমি জায়গামতো।’

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকান ন্যাশ। ‘বাসার বাড়তি চাবি কোথায় লুকিয়ে রাখেন, মিসেস ডেভিসকে জিজ্ঞেস করে দেখবো আমি।’



ডাউনার্স গ্রোভ। এই এলাকার ম্যাককিন রোড থেকে ৩০০ ব্লক দূরে, ৩১৭ নম্বর বাড়ি ছাড়িয়ে কয়েকটা বাড়ির পরে, রাস্তার ডানদিকে, নিজের লাল জিপটা পার্ক করল স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল। প্যাসেঞ্জার সিটে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে বারবারা ম্যাককিনলের ফাইলটা।

পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী লিবি ম্যাককিনলের একমাত্র জ্ঞাত-ঠিকানা এটাই। আজ থেকে সপ্তাহ ছয়েক আগে প্যারোলে জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছে মেয়েটা। তার ফাইলে প্যারোল অফিসার এই ঠিকানাই লিখেছে।

এখানে আসাটা উচিত হয়নি পুলের।

কথাটা জানে সে।

ড্রাইভওয়ায়ে দাঁড়িয়ে আছে আশির দশকের শেষদিকের একটা ফোর্ড টরাস। দেখে মনে হচ্ছে, ওই গাড়ি বেশ কিছুদিন ধরে আছে সেখানে। রঙ মলিন হয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছে মেরুন অথবা বাদামিতে... শেষবিকেলের আলোয় সে-রঙ ঠাहर করা মুশকিল। ড্রাইভওয়ায়ে গাড়ির টায়ারের কোনো দাগ নেই। কারণ ওই জায়গায় পুরু হয়ে জমেছে তুষার। কোনো কোনো জায়গায় তুষারের সেই সাদা আবরণ ভেদ করে মাথা তুলেছে লম্বা বাদামি ঘাস আর নলখাগড়া। আলুথালু একটা লনকে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করেছে শীতকাল, পুরোপুরি পারেনি। বাড়িটা একতলা। কেমন যেন বাক্সের মতো দেখতে। নির্দিষ্ট কোনো গঠনশৈলী আছে ওটার, এমনটা প্রতীয়মান হয় না। কেবল ঠাहर করা যায় চারটা দেয়াল আর একটা ছাদ। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া একটা গ্যারেজ আছে। তাতে ঠাই হতে পারে একটামাত্র গাড়ির। সাদা রঙ করা হয়েছিল বাড়ির দেয়ালগুলোতে, সে-রঙ বহু আগেই খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে গাঢ় রঙের কাঠ। ছাদটা জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা দরকার। সে-ছাদ যেন ঝুলে পড়েছে খুবই ছোট একটা লিভিং রুমের ওপর... দেখে ওই ঘরকে সে-রকমই মনে হচ্ছে।

আশপাশের বাড়িগুলোয় আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কিন্তু ৩১৭ নম্বর বাড়িটা ডুবে আছে অন্ধকারে। নিষ্প্রাণ হয়ে আছে।

তুমি একটা নজর দেখতে চাও এই বাড়ি, কে যেন ফিসফিস করে পুলের মনের গভীরে জানিয়ে দিল কথাটা। চট করে শুধু উঁকি দিলেই চলবে। তারপর আবার চলে যেতে পারবে নিজের রাস্তায়। কারও কোনো ক্ষতি হবে না তোমার এই কাজে। কোনো সমস্যা হবে না। কেউ কিছু টেরও পাবে না।

পুল সত্যিই উঁকি দিতে চায় এই বাড়িতে। কথা বলতে চায় ওই মেয়ের সঙ্গে। পোর্টার যা বলেছিল, ঠিকই বলেছিল। যে-কারণে লিবির বোনকে খুন করেছে ফোর

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৬৬

মাস্কি কিলার... কিছু একটা গড়বড় আছে ওই ঘটনায়। বিশেষ এই ব্যাপারটা যেন বার বার খোঁচাচ্ছে পুলকে। জানে, সে যদি এই কাজ না করে, তা হলে আগামী দুটো সপ্তাহ কেটে যাবে এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই। কাজেই মাথা থেকে পুরো ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, সোজা গিয়ে হাজির হওয়া ওই বাড়ির সদর দরজায়, তারপর বেল বাজানো, এবং সবশেষে মিস ম্যাকিনলের সঙ্গে দু’-চারটা কথা বলা।

পোর্টারের সঙ্গে তখন কথা বলা শেষ করে ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বির ব্যাপারে বিস্তারিত একটা খোঁজ চালিয়েছে পুল। লিবি ম্যাকিনলে গাড়িচাপা দিয়েছিল যে-লোককে, তার নাম ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বি। কীভাবে শনাক্ত করা গেছে তাকে? তার ওয়ালেটের ভেতর থেকে পাওয়া ড্রাইভার’স লাইসেন্সের মাধ্যমে। বারবারা ম্যাকিনলের ফাইলের ভেতরে সে-লাইসেন্সের একটা ছবি আছে। কিন্তু ওই লোকের ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ড্রাইভার’স লাইসেন্স ডেটাবেসেও বিস্তারিত কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। আশ্চর্য ব্যাপার, ওই লাইসেন্সের যে-নম্বর, সেটা দেয়া হয়েছিল এক মহিলাকে... নাম লেসলি কারমাইকেল, বয়স ছেচল্লিশ, বাসিন্দা উডলন-এর। মোদা কথা, ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বির লাইসেন্স না ওটা। তার মানে হচ্ছে, লিবি ম্যাকিনলে এমন এক লোককে গাড়িচাপা দিয়ে মেরেছে, যে কিনা নকল একটা পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপরও কার্বির নামটা শোনামাত্র বিশেষ কিছু একটা ঠাহর করে ফেলেছে পোর্টার।

জিপ থেকে নামল পুল। সাক্ষ্য বাতাসটা ভীষণ ঠাণ্ডা। গাড়ির দরজা লাগাল। রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেল ৩১৭ নম্বর বাড়ির দিকে। একটা ফুটপাথ এগিয়ে গেছে ওই বাড়ির দিকে। আবার পাথরে বাঁধাই করা একটা রাস্তাও এগিয়ে গেছে। দু’জায়গাতেই পুরু হয়ে জমে আছে তুষার। বেলচা ব্যবহার করে সরিয়ে ফেলা হয়নি সে-তুষার। বাড়ির সামনের দিকে যে-পোর্চ আছে, সেটা কম করে হলেও চার ইঞ্চি পুরু তুষারে ঢেকে গেছে। গ্লাভ পরিহিত আঙুলের সাহায্যে বেল চাপ দিল পুল। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এল সুরেলা একটা আওয়াজ। অপেক্ষা করছে সে।

সাড়া দিচ্ছে না কেউ।

আরও একবার বেল বাজাল পুল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল ড্রাইভওয়েটা।

তারপর নজর ফিরিয়ে নিয়ে আবার দেখল সদর দরজাটা।

ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না।

একটা কোনো আলো নেই এই বাসার কোথাও।

এমনও হতে পারে, পুলকে দেখে ফেলেছে লিবি ম্যাকিনলে। তারপর তড়িঘড়ি করে নিভিয়ে দিয়েছে বাসার সব আলো। যেসব জেলখাটা আসামি প্যারোলে মুক্তি পায়, তাদের অনেকেই এ-কাজ করে... পুলিশকে বাসার দরজায় হাজির হতে দেখে লুকিয়ে পড়ে। লিবি এখন কোথায় কাজ করে, সে-ব্যাপারে কোনো তথ্য

নেই তার সেই ফাইলে। কাজেই, এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই মেয়েটার সম্ভবত।

ধেং, ব্যাপারটা জরুরি না হলে জঘন্য এই আবহাওয়ায় কেউ বাইরে বের হয় নাকি?

দরজায় টোকা দিল পুল... পর পর তিনবার, জোরে। ‘মিস ম্যাকিনলে? আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল। আমি জানি, ভেতরেই আছেন আপনি। দরজা খুলুন।’

ওই মেয়ে বাসার ভেতরে আছে কি না, সে-ব্যাপারে আসলে কোনো ধারণা নেই পুলের। একটা কৌশল খাটিয়েছ সে। তবে এ-রকম কৌশল কাজে লেগে যায় মাঝেমধ্যে।

গ্লাভ পরিহিত হাত দুটোতে ফুঁ দিল পুল। ওর মনে হচ্ছে, একটা টাবভর্তি বরফশীতল পানিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন। বাতাসে যেন মেঘ সৃষ্টি করছে ওর নিঃশ্বাস। তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে।

পোর্চ থেকে নেমে পড়ল সে। বাড়ির একধারে জন্মে আছে ছোট কয়েকটা গাছ, এগিয়ে গেল সেদিকে। বড় একটা পিকচার উইন্ডোর সঙ্গে ঠেসে ধরল নিজের চেহারা। জানালার ঠাণ্ডা কাচ ঢাকা পড়ে আছে তুষারে। ভেতরের কিছুই দেখতে পেল না সে।

যদি হিটার চালু করা অবস্থায় থাকত, তা হলে কাচের সঙ্গে যখন চেহারা ঠেসে ধরেছিলাম আমি, উত্তাপ টের পেতাম তখন। এ-রকম কোনো আবহাওয়ায় হিটার চালু করে না পৃথিবীর কোন মানুষটা?

কয়েক কদম পিছু হটল পুল। চক্কর কাটতে লাগল বাড়িটা ঘিরে। যখনই কোনো জানালা পার হচ্ছে, সেখানে উঁকি দিয়ে দেখে নেয়ার চেষ্টা করছে বাড়ির ভেতরটা। ওকে যদি এই অবস্থায় দেখে থাকে লিবির কোনো প্রতিবেশী, তা হলে, কোনো সন্দেহ নেই, এখন ডায়াল করছে নাইন ওয়ান ওয়ানে। বাড়ির এক কোনায় পৌঁছে গেল সে। হোঁচট খেল মরচে-ধরা একটা বাইসাইকেলে, আরেকটু হলে উল্টে পড়ে গিয়েছিল, পুরু তুষারের নিচে চাপা পড়ে আছে পুরনো সেই লাল সাইকেলটা। নজরে পড়ছে পাত্রে-লাগানো কিছু গাছের অবশিষ্টাংশ। কোনো এককালে জীবিত ছিল ওগুলো, মরে গেছে অনেক আগেই। বাগানে পানি দেয়ার হোস-পাইপও দেখা যাচ্ছে। প্যাঁচানো অবস্থায় আছে ওগুলো। এই শীতকালে ওগুলোর কথা ভুলে গেছে এই বাসার বাসিন্দা।

বাড়ির পেছনদিকে হাজির হলো পুল। এখানে কাঠের একটা পাটাতন দেখা যাচ্ছে। একটা কালো ওয়েবার বার-বি-কিউ দেখা যাচ্ছে ওই পাটাতনের একধারে। কয়েকটা লন চেয়ার স্তুপ করে রাখা আছে ওটার আশপাশে। পাটাতনের ওপর উঠে পড়ল সে। পায়ের নিচে ওজনের কারণে ক্যাচকোঁচ করে উঠল ওটা।

এই জিনিস পচে গিয়ে থাকতে পারে। ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

দরজার উদ্দেশে সাবধানে এগিয়ে চলল সে।

স্ক্রিন ডোর একদিকে একটুখানি ভাঙা।

ইঞ্চি পাঁচেক হবে ভাঙা জায়গাটা। কিন্তু ওই জায়গা দিয়ে নিজের হাত সহজেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবে একজন লোক।

স্ক্রিন ডোরের লক খুলে ফেলার জন্য যথেষ্ট। শুধু সঙ্গে তালা খুলবার যত্নপাতি থাকলেই হবে।

দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল পুল। তালা দেয়া।

কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। হোলস্টার থেকে বের করে আনল ওর গুলি ২২ পিস্তলটা। কোমরের কাছে নিচু করে ধরল ওটা, তাক করে রেখেছে জমিনের দিকে। ওটার নলের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় আছে একটা এলইডি ফ্যাশলাইট। তর্জনীর সাহায্যে লাইটটা জ্বালিয়ে দিল সে।

আলতো ধাক্কা দিল দরজায়। যেন প্রতিবাদ করে উঠল ওটা... চৌকাঠের সঙ্গে আটকে গেছে শক্ত হয়ে। এবার আরেকটু জোরে ধাক্কা দিল সে। খুলে গেল দরজাটা, জোরে আওয়াজ হলো।

প্রথমেই একটা গন্ধ এসে বাড়ি মারল পুলের নাকে। বাজে একটা গন্ধ... খারাপ কোনোকিছুর। ওই গন্ধ যেন ওকে সতর্ক করে দিয়ে ওর গাড়িতে ফিরে যেতে বলছে, চলে যেতে বলছে এখান থেকে।

‘মিস ম্যাকিনলে? আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল। ভেতরে আসছি আমি।’

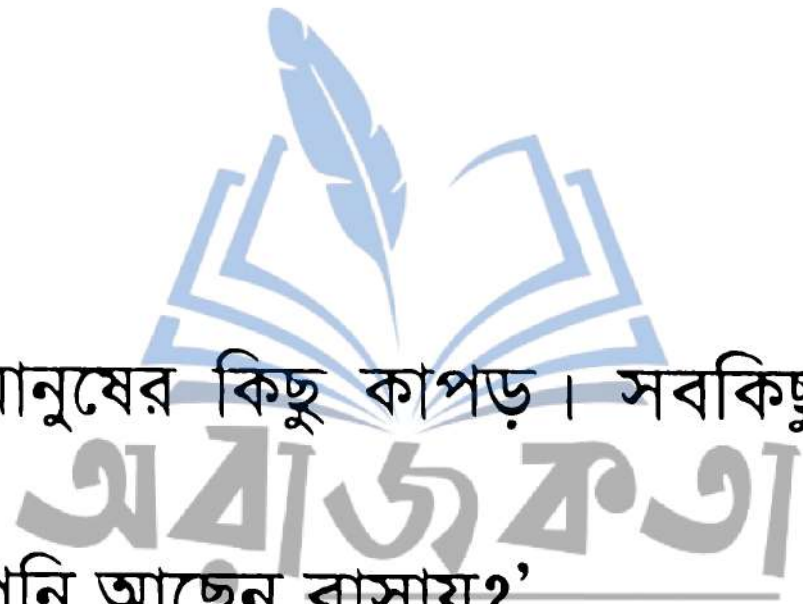
অনতিদূরে কাঠের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, রান্নাঘরের দিকে খোলে ওটা। জুতোর ডগা দিয়ে দরজার পাল্লায় ঠেলা মারল পুল, অস্থির দৃষ্টিতে নজর বোলাল এখানে-সেখানে, যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকে তাক করছে পিস্তলের নল, ফ্যাশলাইটের আলোও গিয়ে পড়ছে ওই জায়গায়। সিন্কে উঁচু একটা স্তূপ হয়ে আছে বেশ কয়েকটা ডিশের। কাউন্টারটা বলতে গেলে চাপা পড়ে গেছে ওগুলোর নিচে। বেশ কয়েকটা পিৎজা বক্স আর কার্টন দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আছে খালি সোডার-ক্যান আর পানির বোতল।

হিটারটা বন্ধ।

সিন্কে দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। ঠাহর করতে পারল, ওই ডিশগুলোর গায়ে বরফের স্তর জমে গেছে। এখানকার সবকিছুই ঢাকা পড়ে আছে পুরু বরফের আস্তরণে।

তারপরও ওই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

কিচেন কাউন্টার পার হলো পুল। হাজির হলো ছোট্ট একটা ডাইনিং রুমে। টেবিলের ওপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে বিভিন্ন বাক্স আর কাগজ। সেসব কাগজের কোনোটা চাকরির দরখাস্ত। কোনোটা আবার জীবনবৃত্তান্ত। ওসব বৃত্তান্তের একেবারে মাথায় বড় হাতের অক্ষরে প্রিন্ট করা আছে “এলিজাবেথ ম্যাকিনলে” নামটা। খবরের কাগজ আছে। খোলা হয়নি এমন কিছু বিলপত্র



আছে। আর আছে মেয়েমানুষের কিছু কাপড়। সবকিছু বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।

‘মিস ম্যাকিনলে? আপনি আছেন বাসায়?’

ঠাণ্ডা বাতাসে মেঘ তৈরি করে ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে পুলের নিঃশ্বাস। একদিকের দেয়ালের গায়ে দেখতে পেল থার্মোস্ট্যাটটা। ভালোমতো তাকাল ওটার দিকে। হিটার বন্ধ করা আছে। ডায়াল দিয়ে রাখা হয়েছে সবচেয়ে-ঠাণ্ডা পজিশনে।

পুলের হাতের বাঁ দিকে একটা দরজা, খোলা। ওটার উদ্দেশে পা বাড়াল সে; টের পাচ্ছে, লিভিং রুমের দিকে যাচ্ছে। পিস্তল আর জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট এখন তাক করা আছে সামনের দিকে, ওর আগে আগে যাচ্ছে। হাতের ডান দিকে বাড়ির সদর দরজাটা। সেই পিকচার উইন্ডো ভেদ করে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। ওই জানালার কাচ বাইরে থেকে যেমন অস্বচ্ছ, ভেতর থেকেও তা-ই। বাঁ দিকে দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে একটা কাউচ। সেটার মুখোমুখি অবস্থায় আছে ছোট একটা টেলিভিশন। দুধের কতগুলো খালি ক্রেটের ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে টিভিটা। সস্তা প্রেসবোর্ড দিয়ে বানানো একটা টেবিল আছে কাউচের সামনে। ওই টেবিলের ওপর কিছু জিনিস ছিল, কেউ একজন সেসব আছড়ে ফেলেছে মেঝেতে... কয়েকটা ম্যাগাজিন, একটা রিমোট, বিলপত্র, এবং অ্যাডভার্টাইজিং সার্কুলার।

টেবিলের ওপর তিনটা বাক্স দেখা যাচ্ছে। নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা হয়েছে সেগুলো। তিনটা বাক্সই সাদা। কালো সুতো দিয়ে বাঁধা। তিনটা বাক্সের সাদা রঙে কেমন লালচে বাদামি দাগ লেগে আছে। দাগ না বলে ওগুলোকে কোনো একজাতের ছিটা বললে মানায় বেশি।

পুল এখন যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক উল্টোদিকে একটা বাথরুম। টেলিভিশনের বাঁ দিকে আরেকটা ঘর দেখা যাচ্ছে... খুব সম্ভব বেডরুম।

আগে বাড়ল সে, নজর বুলিয়ে নিল বাথরুমের ওপর। সাদা বাথটাবের জায়গায় জায়গায় লেগে আছে লাল দাগ... বৃত্ত রচিত হয়েছে যেন। সিন্কে পড়ে থাকা টুথপেস্ট শুকিয়ে গেছে। মেঝেতে পড়ে আছে জরাজীর্ণ একটা টাওয়েল। বোঝা গেল, ওটা কাজে লাগিয়ে আয়নার মাঝখানের কোনো একটা জায়গা মুছেছে কেউ একজন। আয়নাটার দিকে তাকাল সে। নিজের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে।

পিছিয়ে এল, বাথরুম থেকে বের হয়ে হাজির হলো লিভিং রুমে। এখন বেডরুমের দিকে তাক করে রেখেছে পিস্তলটা। টেবিলের ওপর রাখা ওই তিনটা বাক্স দেখে নিল চোখের কোনা দিয়ে। ওগুলোর ওপর থেকে নজর সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যেন চওড়া কোনো বৃত্তচাপ রচনা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে বেডরুমের খোলা দরজাটার দিকে। ইচ্ছা আছে, বেডরুমের বাইরের দেয়াল ঘেঁষে সেখানে যাওয়ার বদলে সোজা গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বে। আরও কাছে গেল

বেডরুমের। ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে, ওর সেই ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাচছে হতশ্রী একটা ড্রেসারের গায়ে, এবং বিছানায়।

ওই বিছানার চার দিকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন মেয়েমানুষকে, বলা ভালো, একজন মেয়েমানুষের শরীরটা। তার শরীর থেকে কেটে আলাগা করে ফেলা হয়েছে পরনের কাপড়, সেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হয়েছে মানুষটাকে... ছোট ছোট হাজারটা ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে তার দেহে, শরীরের প্রতিটি দৃশ্যমান ইঞ্চিতে। চোখ দুটো গায়েব। বেরিয়ে আছে কালো অক্ষিকোটর। মুখ ভরে আছে শুকনো, খসখসে রক্তে। দেখা যাচ্ছে না, তবুও পুল জানে, ওই মেয়েমানুষের বিবর্ণ চুলের আড়ালে... যেখানে কান থাকার কথা... সেখানে নেই ও-দুটো। খুঁজলে ওই বাক্স তিনটার যে-কোনো একটাতে পাওয়া যাবে ওগুলো।

ফ্ল্যাশলাইটটা পিস্তলের নল থেকে আলাগা করে নিল পুল। হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল অস্ত্রটা।

নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে লিবি ম্যাকিনলের দেহাবশেষের দিকে।



ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পুল, একটুও নড়ছে না। সামনে থাকা বাতাস যেন পাকড়াও করে নিচ্ছে ওর নিঃশ্বাসকে। ছোট ঝাঁটার মতো সাদা সেই নিঃশ্বাস যেন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

বড় বেশি নিস্তরক অনুভূত হচ্ছে সারা ঘর।

কেউ যখন এমন কোনো ঘরে ঢোকে যেখানে আগে থেকেই অন্য আরেকজন আছে, তখন সেই অন্য কারও উপস্থিতি ঠাহর করা যায়। সহজাত কোনো প্রবৃত্তির বশে একটা মানবদেহ অনুভব করতে পারে অন্য একটা মানবদেহকে। মানুষের স্বাভাবিক সতর্কতা, আত্মরক্ষার অনুভূতি ইত্যাদি তীব্র হয়ে ওঠে সে-সময়। একজন মানুষের শরীরে, অন্য একজন মানুষকে দেখলে অথবা তার কোনো আওয়াজ শুনলে অ্যাড্রেনালিনের ঢেউ বয়ে যেতে থাকে। বলতে গেলে তৎক্ষণাৎ একটা কথা বিচার করতে আরম্ভ করে মানবমস্তিষ্ক... আমি কি এই মানুষটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি? নাকি আমি এই মানুষটার প্রতি বিকর্ষণ অনুভব করছি? আমি কি এই মানুষটার প্রতি উদাসীন? নাকি হতচকিত হয়ে গেছি? চোখের পলক ফেলতে যে-সময় লাগে, তারও আগে একজন মানুষের শরীর আর মন ওসব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

তবে কথা হচ্ছে, ওসব সিদ্ধান্ত তখনই নেয় একজন মানুষ, যখন ঘরে উপস্থিত অন্য মানুষটা জীবিত কেউ হয়।

কেউ যখন এ-রকম কোনো ঘরে ঢোকে যেখানে আগে থেকেই মরে পড়ে আছে একজন মানুষ, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওসব চিন্তাভাবনা খেলা করে না তার মাথায়। আত্মা ছাড়া একজন মানুষের শরীর কোনো খোসার মতো। খোলসের মতো। এবং যেভাবেই হোক না কেন, বিশেষ এই ব্যাপারটা জানে একজন মানুষের মন। সেক্ষেত্রে জীবিত মানুষটার মস্তিষ্ক আলাদা কিছু সিগনাল পাঠাতে থাকে: মরা মানুষটার মৃত্যুর কারণ কী? কখন মারা গেছে সে? যে-ই খুন করে থাকুক না কেন তাকে, সেই খুনি কি এখনও আছে ধারেকাছে কোথাও? এবং হত্যাকারী মানুষটা কি আমার ক্ষতির কারণ হতে পারে?

এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল পুল, দৃষ্টি নামিয়ে আরও একবার দেখল লিবি ম্যাকিনলেকে। টের পাচ্ছে, কিছু একটা হারিয়ে ফেলার অনুভূতি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে। টের পাচ্ছে, বুকের গভীরে কোথাও ব্যথা করছে একটুখানি।

বিছানার আরেকটু কাছে এগিয়ে গেল সে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা গিয়ে পড়েছে নিখর শরীরের ওপর।

কেটে আলগা করে নেয়া হয়েছে লিবি'র হাতের আঙুলগুলো। একই অবস্থা পায়ের আঙুলগুলোরও। নাইটস্ট্যান্ডের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে ওগুলো। গলদা চিংড়ির একজোড়া দাগ-পড়া দাঁড়াও সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওই আঙুলগুলোর পাশে।

এ-রকম কোনো কাজ আগে কখনোই করেনি বিশপ। বোঝা যাচ্ছে, নিজের কর্মপরিধি বিস্তৃত করছে সে।

বিছানার পাশে থাকা একটা ল্যাম্প জ্বালানোর চেষ্টা করল পুল। পারল না। বাত্ব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

ফোর মাস্কি কিলারের আগের প্রতিটা শিকারের বেলায়, যে-ঘরে আবিষ্কৃত হয়েছে লাশগুলো, সে-ঘরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কোনো যোগসূত্র ছিল না ওসব লাশের। ওই খুনি যখন চেয়েছে আবিষ্কৃত হোক লাশগুলো, প্রতিটা ঘর মঞ্চের মতো করে সাজিয়েছে। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তারা কখনোই জানতে পারেনি, হতভাগী ওই মেয়েগুলোকে ঠিক কোথায় খুন করেছে লোকটা। স্পেশাল এজেন্ট ইন-চার্জ হার্লসের সন্দেহ, শহরের নিচ দিয়ে যেসব টানেল বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন দিকে, সেসব জায়গায় ওই খুনগুলো করেছে বিশপ। কিন্তু পুলের ধারণা আবার অন্যরকম। ওর বিশ্বাস, কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো একটা কিল-রুম আছে বিশপের... মানে, বিশেষ সেই ঘরে শিকারদের নিয়ে গিয়ে খুন করে লোকটা। সে-ঘর ওই লোকের জন্য স্বতন্ত্র, নিরিবিলি। ওই ঘরের কোনো একটা মানে আছে তার কাছে। ঘরটা এমন কোনো জায়গায়, যেখানে কাজ করার সময় কোনো রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না সে। ওই ঘর এমন কোথাও, যে-জায়গা, শিকারের মুখ থেকে আতঁচিৎকার বেরিয়ে আসার আগেই সেটা গিলে খেয়ে ফেলে।

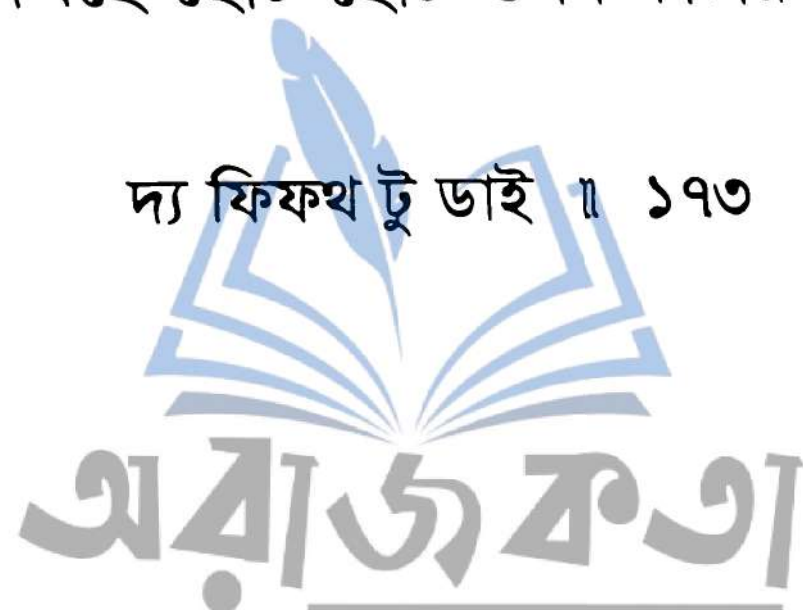
বোঝাই যায়, প্রচণ্ড একটা কষ্ট সহ্য করতে করতে মারা গেছে লিবি ম্যাকিনলে। ধীরে ধীরে মরণ হয়েছে তার। এবং সে মারা গেছে এখানে, একাকী।

ঘরের সবজায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রক্তের দাগ। পুলের ফ্ল্যাশলাইটের আলো যেন অনুসরণ করছে ওসব দাগকে। বিছানার পেছনের দেয়ালে, চাদরে, পায়ের নিচে থাকা জীর্ণ সবুজ কার্পেটে... সব জায়গায়। আসলে এখানে আসাটাই উচিত হয়নি ওর। অন্তত এভাবে তো না-ই। হতে পারে, সম্ভাব্য কোনো প্রমাণ নষ্ট করে দিচ্ছে সে। কিন্তু কিছু একটা ওকে বলে দিচ্ছে বার বার, এখানে প্রমাণ বলতে কোনোকিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্তত এমন কিছু পাওয়া যাবে না, যা কোনো কাজে লাগতে পারে। পুল এবং ওর সঙ্গের লোকেরা শুধু তা-ই খুঁজে পাবে, যা, বিশপ চায় খুঁজে পাক পুলিশের লোকজন।

লাশের ওপর একটুখানি ঝুঁকে পড়ল পুল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখছে ক্ষতবিক্ষত শরীরটা। দেখছে ছোট ছোট ওসব কাটার-দাগ।

রেজর ব্লেড।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৭৩



অরাজকতা

প্রতিটা ক্ষত দৈর্ঘ্যে আধ ইঞ্চির বেশি হবে না। সংখ্যায় এত বেশি যে, শুকনো রক্ত দিয়ে ভরে গেছে মেয়েটার ত্বক।

গ্লাভ খুলে ফেলল পুল। হাত বাড়িয়ে দিল লাশটার উদ্দেশে। আঙুলগুলো লিবির একটা হাত ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি।

ঠাণ্ডা হয়ে আছে মরদেহ। কিন্তু জমে যায়নি। মেয়েটা মারা যাওয়ার অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল হিটার... হতে পারে কয়েক দিন আগে, আবার হতে পারে কয়েক সপ্তাহ আগে। অথচ লিবি মারা গেছে সাম্প্রতিক সময়ে... গত দুই বা তিনদিনের মধ্যে।

এমন সময় অদ্ভুত কিছু একটা নজরে পড়ল পুলের।

আগে খেয়াল করেনি ব্যাপারটা, কারণ অন্য একদিকে তাকিয়ে ছিল। বিছানার মাথা থেকে নজর সরিয়ে লিবির হাতের দিকে তাকানোমাত্র দেখতে পেল।

কিছু শব্দ।

বিশপ যে শুধু একটা রেজর ব্লেডের সাহায্যে লিবিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে তা-ই না, বিশেষ কিছু শব্দ লিখে দিয়ে গেছে মেয়েটার শরীরে। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... বিশপের তুলির নিচে লিবির শরীর একটা ক্যানভাস। ছোট ছোট শব্দ ওগুলো, শুকিয়ে আসা রক্তের কারণে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না।

তুই একটা শয়তান... তুই একটা শয়তান... তুই একটা শয়তান... তুই

একই শব্দগুচ্ছ, বার বার... লিবির শরীরের প্রতিটি উন্মুক্ত ইঞ্চিতে।

জঘন্য এই কাজ যখন করেছে বিশপ, তখনও বেঁচে ছিল মেয়েটা। প্রতিটা কাটাদাগের কোনায় জমে আছে রক্তের ক্ষুদ্র কিছু ফোঁটা... সেগুলোই ওই কথা জানিয়ে দিচ্ছে পুলকে। এবার মেয়েটার পায়ের দিকে তাকাল সে, আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলছে নজর। প্রতিটা ক্ষতস্থানে জমে থাকা রক্ত ওই একই কথা বলে দিচ্ছে ওকে। মেয়েটার শরীর ক্ষতবিক্ষত করতে করতে ওর পাঁজরের হাড়ের কাছে যখন পৌঁছে গিয়েছিল বিশপ, তখন কোনো একসময়ে মারা যায় বেচারী। তারপরও নিজের কাজ চালিয়ে গেছে লোকটা। তবে মেয়েটা মারা যাওয়ার পর ওকে ব্লেড দিয়ে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে ফালা ফালা করেছে সে।

তার মানে, এই মেয়েকে যে-নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েছে বিশপ, মেয়েটা মারা যাওয়ার পর ব্যাপারটা আর উপভোগ করতে পারেনি। শুধু কাজ শেষ করার একটা তাগিদ নিয়ে সেরেছে বাকিটুকু।

পুরো ব্যাপারটা সত্যিই নৃশংস... বদলা নেয়া ছাড়া অন্য কিছু না।

‘ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বি তোমাদের জন্য কে ছিল আসলে?’ কথাটা জোরেই বলল পুল... জানতে চেয়েছে লিবি ম্যাকিনলে এবং অ্যানসন বিশপের কাছে। কিন্তু দু’জনেরই কেউই জবাব দিল না... দেয়ার কথাও না।

মিনিট দশেক পর নিজেরই পদক্ষেপ অনুসরণ করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল সে। হাজির হলো জিপের কাছে। ঢুকে পড়ল ভেতরে, চালু করল ইঞ্জিন। ফোন করল স্পেশাল এজেন্ট ইন-চার্জ হার্লসকে। ডিটেকটিভ পোর্টারকেও ফোন করবে কি না, ভাবল। কিন্তু মত বদল করল। জানে, যা দেখে এসেছে একটু আগে, সেটা নিয়ে কখনও না কখনও কথা হবে পোর্টারের সঙ্গে; তখন পোর্টারের চেহারা কেমন হয় সেটা দেখতে চায় নিজের চোখে।

পোর্টার আসলে কী জানে, সেটা জানা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে ওর জন্য।



রাত দশটার কিছু পরে নিউ অরলিন্সে হাজির হলো ডিটেকটিভ পোর্টার। মাঝে দু'ঘণ্টার একটা যাত্রাবিরতি করেছে ডালাসে। আজকের দিনে এটা ছাড়া আর কোনো ফ্লাইট ছিল না। ডালাসে যখন ছিল, বিমানবন্দরের টার্মিনালে ম্যাকডোনাল্ড'স-এর একটা দোকানে ঢুকেছিল। খাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিছু একটা। কিন্তু পাকস্থলী সাড়া দেয়নি। ফলে শেষপর্যন্ত গলা দিয়ে নামাতে পারেনি কিছুই।

নিউ অরলিন্স এয়ারপোর্ট থেকে একটা ক্যাব নিল পোর্টার। সোজা রওয়ানা করল থ্রেভিয়ার স্ট্রিটে অবস্থিত অরলিন্স প্যারিশ প্রিজনের উদ্দেশে। জায়গামতো পৌঁছে ড্রাইভারকে বলল, জেলখানাটা ঘিরে একটা চক্কর লাগাতে। একসময় চেইনলিঙ্কে ঘেরা একটা ফুটপাথ নজরে পড়ল ওর। বিশপের দেয়া ফটোগ্রাফের বিশেষ সেই নামও দেখতে পেল। থামতে বলল ড্রাইভারকে। ওর জন্য অপেক্ষা করতে বলে নামল।

রাস্তা পার হলো সে। পরনের ভারী কোটের কারণে এত রাতেও ঘামছে। শীতকালে কখনোই শিকাগোর বাইরে আসেনি। এত দক্ষিণে এসে এখন টের পাচ্ছে, দু'জায়গার তাপমাত্রায় বলতে গেলে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বাতাসে অর্দ্রতা বেশি। সে-বাতাসে যেন মিশে আছে দূর-থেকে-ভেসে-আসা একটা বাজে গন্ধ... বিশেষ এ-গন্ধ বলে দিচ্ছে, শহরটা বহুল ব্যবহৃত, রীতিমতো যেন নির্যাতিত, অথচ রাতের এই প্রহরে সবকিছু যেন ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

অনতিদূরে একটা গেট আছে, সেটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন গার্ড। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল পোর্টার। ওই লোক পোর্টারকে জানিয়ে দিল, ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয় সকাল নটায়, শেষ হয় সন্ধ্যা ছ'টায়। এবং এই সময়সূচীর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ওয়ার্ডেন আসবে সকাল সাতটায়, পোর্টারের যদি কিছু বলার থাকে তা হলে সেটা তখন বলতে পারে ওই লোককে।

গার্ড লোকটাকে বিশপের-পাঠানো ফটোটা দেখাল পোর্টার। ছবির মহিলাকে চিনতে পারল না লোকটা। তবে ওই মহিলার সামনে যে-গার্ডকে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে ছবিতে, তাকে চিনতে পারল। 'আরে, এ তো আমাদের ভিন্স উইডনার। তবে সে কিন্তু শুধু সকালে ডিউটি করে। ঠিক আটটায় হাজির হয়ে যায়।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানাল পোর্টার। ফিরে এল ক্যাবের কাছে।

'আপনার কেউ আছে নাকি ওই জেলখানায়?' জিজ্ঞেস করল ক্যাবের ড্রাইভার। ততক্ষণে পেছনের সিটে উঠে বসেছে পোর্টার, দরজা লাগিয়ে দিয়েছে।

‘হ্যাঁ, কেউ একজন আছে আর কী।’

‘আমিও কিন্তু কিছুদিন কাটিয়েছি ওখানে। আমার এক কাজিন যদি কৌশল খাটিয়ে আমাকে বের করে না আনত, তা হলে এখনও থাকতাম হয়তো। আসলে হয়েছে কী... এই শহরে সৎভাবে পেট চালানো দায়। বাড়তি দুটো পয়সার জন্য একটু এদিক-ওদিক করতেই হয়।’

‘আর সেটা করতে গিয়েই শেষপর্যন্ত জেলে যেতে হয়েছিল, না? বাড়তি আয়ের আশা?’

দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। ‘লোকের পকেট কীভাবে মারতে হয়, আমাকে সে-বিদ্যা শিখিয়েছিল আমার আরেক কাজিন। যে-কোনো লোকের পকেট কাটতে সে ওস্তাদ।’

‘সে যদি ধরা পড়ে না থাকে, আপনি ধরা পড়লেন কেন?’

‘একবারও কিন্তু বলিনি, ওই একই কাজে আমিও ওস্তাদ ছিলাম। আমার মনে হয়, আমার সেই কাজিন আমাকে ট্রেনিং দেয়ার সময় একটা বা দুটো কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। প্রথম যেদিন চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম, সেদিনই ধরা খাই আমি। এক লোকের পেছনের পকেটে হাত ঢুকিয়েছি, টের পেয়ে গেল সে, খপ করে চেপে ধরল আমার হাত, মুচড়ে দিল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম আমি গলা ফাটিয়ে। এত জোরে যে, ঘটনা কী দেখতে এগিয়ে এল পুলিশের তিনজন অফিসার। অত বড় একটা কুত্তার-বাচ্চার পকেট মারা উচিত হয়নি আমার প্রথমেই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, বিশাল সেই শরীরের কারণে সে কিছু টের পাবে না আসলে। অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছিলাম।’

‘কতদিনের জেল হয়েছিল আপনার?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ড্রাইভার। ‘তিন সপ্তাহ এবং একদিন। আমার জন্য ওই সময়ই যথেষ্ট। জেলখানাটা আরেকবার দেখার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। নিজের পাছটা এখানে... এই ট্যাক্সির ড্রাইভার’স সিটে লাগাতে পারলেই আমি খুশি। যা হোক, আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন?’

জেলখানাটার দিকে তাকিয়ে আছে পোর্টার। ফেকাসে বালি রঙে নির্মিত ওই বিল্ডিং, জানালাগুলো সরু। সেখানে কোনো একজায়গায় আছে ওই মহিলা। ‘ওয়ার্ডেনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন আমাকে?’

‘না, কিছু বলতে পারবো না। জেলখানায় যাওয়ার পর সারাটা সময় মাথা নিচু করে রেখেছিলাম আমি। কারও সঙ্গে একটা কোনো কথা বলিনি। যে-ক’দিন ছিলাম সেখানে, একরকম নিঃসঙ্গই কাটিয়ে দিয়েছি। বেরিয়ে আসার পর জেলখানার গন্ধটা ধুয়ে ফেলেছি নিজের শরীর থেকে। জেলখানার বাস থেকে নামার পর টানা দু’মিনিট ধরে দেখেছিলাম লোকটাকে। একটা কোনো কথা বলেননি তিনি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন তাঁর গার্ডদের... গরু যেভাবে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় খোঁয়াড়ের দিকে, আমাদেরকে সেভাবে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল



তারা।' বলছে ড্রাইভার। 'মানুষটা দেখতে-শুনতে কঠোর প্রকৃতির। তাঁর চাকরিই তাঁকে ও-রকম বানিয়ে দিয়েছে মনে হয়।' রিয়ারভিউ মিররে একবার দেখে নিল পোর্টারকে। 'আমার কোনো মাথাব্যথা থাকার কথা না, তারপরও জানতে চাইছি... আপনার বন্ধু কেন জেল খাটছেন?'

'জানি না।'

'কেন জানতে চাইলাম কথাটা, বলি। মূল জেলখানার পূর্বদিকে আরেকটা বিল্ডিং আছে; মিনিমাম-সিকিউরিটি প্রিজনার বলতে যা বোঝায়... সোজা কথায় যারা একটু কম বিপজ্জনক, তাদেরকে রাখা হয় সেখানে। আর যারা দাগী আসামি, তাদেরকে রাখা হয় জেলখানার মূল বিল্ডিংয়ে।'

'আমি যে-মহিলার সন্ধান করছি, সে এই বিল্ডিংয়েই আছে।'

'তা হলে তো খুব খারাপ কথা।'

'এখানে কাছাকাছি কোথাও কোনো হোটেল আছে?' জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

'আপনি থাকতে চাইবেন, এ-রকম কোনো জায়গা নেই। এক কাজ করলেই তো পারেন। বারবানে ফিরে যেতে পারেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন জুংসই কোনোকিছু পাওয়া যায় কি না।'

'এই জেলখানার কাছাকাছি কোনো থাকার জায়গা দরকার আমার।'

লম্বা করে দম নিল ড্রাইভার লোকটা। 'এই ব্লকের মাথায় থাকার একটা জায়গা আছে, নাম ট্রাভেলার'স বেস্ট। কিন্তু আমি আমার সেই কাজিনকেও থাকতে দিইনি সেখানে।'

'কাজ চলবে আমার,' বলল পোর্টার।

চোখ উল্টানোর ভঙ্গি করল ড্রাইভার। গাড়ি গিয়ারে ফেলল। 'দেখুন, এই ছুটিটা কিন্তু আপনার। কাজেই আপনার যেভাবে মন চায়, সেভাবে কাটান সেটা। তবে আপনার ভালোর জন্য একটা কথা আগেভাগেই জানিয়ে রাখি... ওখানকার কোনো ব্যালকনি থেকে নিচে যদি পুঁতিও ফেলেন, আপনার ওপর একটা পয়েন্ট টু-টু খালি করে দিতে দ্বিধা বোধ করবে না কেউ।'

আশপাশে যে-ক'টা হোটেল আছে, সেগুলোর মধ্যে ট্রাভেলার'স বেস্টকে সেরা বলা চলে না কিছুতেই। জেলখানা থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে ওটা। বিল্ডিংটা কেমন যেন হাঁতকা। একটা পার্কিং গ্যারেজের মাথায় সওয়ার হয়েছে যেন। দেখলে মনে হয়, দুটো তলায় যেন কোনোরকমে সাজানো হয়েছে কয়েকটা ঘর। বড় একটা ফুরোসেন্ট সাইনবোর্ড আছে। সেটাতে বলা হচ্ছে: ট্রাভেলার'স বেস্ট ভ্যালু ইন হোটেল... ঘর খালি আছে। ওই সাইনবোর্ডের অর্ধেকের বেশি বাতি অকেজো হয়ে গেছে। আর দুটো বাল্ব মিটমিট করছে নোংরা সাদা প্লাস্টিকের আড়াল থেকে।

পার্কিং ক্যাবটা ঢুকিয়ে দিল ড্রাইভার। ‘আপনি নিশ্চিত তো... থাকতে পারবেন এই হোটেলে?’

দরজা দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে গিয়েছিল পোর্টার, বলল, ‘এখানে তো সব নগদের কারবার, না?’

‘আরে আপনি চাইলে কয়েক প্যাকেট লাকি সিগারেট আর এক বোতল মদের বিনিময়েও ঘর ভাড়া নিতে পারেন এখানে। তবে আমি নিশ্চিত কেউ নগদ দিতে চাইলে খুশিই হবে এই হোটেলের লোকজন।’

মিটারে দেখা গেল, ৫১ ডলার ২৩ সেন্ট বিল উঠেছে। ওয়ালেট থেকে বিশ ডলারের তিনটা নোট বের করল পোর্টার। সেগুলো দিল ড্রাইভারের হাতে। ‘ভাংতি টাকা রেখে দিন আপনি।’

ওই নোট তিনটা অতি দ্রুত গায়েব হয়ে গেল লোকটার শার্টের পকেটে। ‘ভালো কথা, আমার নাম হার্শেল ক্রিসম্যান। যদি কোথাও যাওয়ার দরকার হয় আপনার, আমার নম্বরে ফোন করবেন। চট করে হাজির হয়ে যাবো আমি। এমনকী এখানেও।’ মাথা ঝাঁকিয়ে ইস্তিফা দেখিয়ে দিল হোটেলটা। নিজের ফোন নম্বর লেখা একটা বিজনেস কার্ড দিল পোর্টারকে। ‘কঙ্কিটের ওই দেয়াল বরাবর পার্কিং লট ধরে এগিয়ে যান। একটা এলিভেটর দেখতে পাবেন, সেটার আরেক ধারেই আছে অফিসটা... বিল্ডিংয়ের ঠিক বিপরীতে। যদি মত বদল করেন, যদি সিদ্ধান্ত নেন বারবানের হিলটনে গিয়ে উঠবেন, আমাকে শুধু একটা ফোন করলেই চলবে। আর যদি এই শহরটা ঘুরেফিরে দেখতে চান, তা হলেও ফোন করতে পারেন আমাকে। এই শহরের নাড়িনক্ষত্র সব জানা আছে আমার।’ কণ্ঠ নিচু করল। ‘যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন আপনার মেয়েবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে, সেটা যদি পূরণ না হয়, তা হলে চকচকে নতুন মেয়েবন্ধু কোথায় পাওয়া যেতে পারে, তা-ও জানা আছে আমার। শুধু আমাকে একটা ফোন দিলেই হবে।’

বুঝতে পারার কায়দায় মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। প্যান্টের পকেটে চালান করে দিল ড্রাইভারের দেয়া কার্ডটা। ‘রাইডের জন্য ধন্যবাদ, হার্শেল। নিজের খেয়াল রাখবেন।’

চলে গেল ক্যাবটা। পোর্টার সহসাই টের পেল, একা দাঁড়িয়ে আছে সে। দূর থেকে ভেসে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। কারা যেন অনতিদূরে কথা বলছে জোরালো কণ্ঠে, অন্ধকার ভেদ করে শোনা যাচ্ছে সেসবও।

সিভার ব্লকের সেই দেয়াল হাতের একপাশে রেখে পার্কিং গ্যারেজের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল পোর্টার। এখানে জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে আবর্জনা, পচতে শুরু করেছে সেসব, বাতাসে তাই বাজে একটা গন্ধ। এলিভেটরের পেছনে অফিসটা পেয়ে গেল সে। দরজা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আমন্ত্রণ জানানোর মতো কোনো লবিও নেই কোথাও। শুধু দেখা যাচ্ছে পুরু কাচের একটা জানালা। কীসের যেন দাগ লেগে আছে ওটাতে। বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে, এমন এক



লোকের দেখা পাওয়া গেল। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে জায়গায় জায়গায়। সারা মাথা জুড়ে টাক। চোখে কালো রিমের চশমা আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, এগিয়ে যাচ্ছে পোর্টার। প্রথমে নজর রেখেছিল ছোট একটা কম্পিউটার মনিটরে, এবার তাকিয়ে আছে জানালা ভেদ করে।

ওই জানালার কাছে গিয়ে হাজির হলো পোর্টার। ‘আমার একটা ঘর লাগবে, প্লিজ।’

লোকটার ঠোট ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়, সেটার ওপর জিভটা বুলিয়ে নিল সে। তার মুখের কোনায় কী যেন আছে। ডরিটোস চিপসের ছোট কোনো টুকরো হবে সম্ভবত। ‘আগে আইডেন্টিফিকেশন কার্ড আর ক্রেডিট কার্ড দেখান আমাকে।’

নিজের ওয়ালেট বের করল পোর্টার। ‘আইডি কার্ড নেই আমার। নগদ টাকা দেবো আমি।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ বাঁকাল লোকটা। ‘এখানে এক রাত থাকার খরচ উনত্রিশ ডলার পঁচানব্বই সেন্ট। জামানত হিসেবে দিতে হবে আরও এক শ’ ডলার। মূল্যবান জিনিসপত্র বলতে যা-কিছু আছে এখানে, সেগুলো তো রক্ষা করতে হবে আমাদেরকে, নাকি?’

ওয়ালেট থেকে এবার বিশ ডলারের পাঁচটা নোট বের করল পোর্টার। জানালার নিচে ছোট একটা স্লটের মতো আছে, সেখান দিয়ে ঠেলে দিল টাকাটা। ‘এক শ’ ডলার দিলাম। যদি তিন রাতের বেশি থাকতে চাই, ফিরে আসবো আমি।’

টাকাটা তুলে নিল ম্যানেজার। হাত মুঠি পাকিয়ে আঘাত করল সেকেলে একটা ক্যাশ রেজিস্টারের এককোনায়ে, খুলল ড্রয়ারটা। টাকা রেখে দিল সেখানে। ‘জামানত হিসেবে যে-টাকার কথা বললাম, সেটা দেবেন না? আমরা কিন্তু আপনাকে আমাদের চাদর কিংবা টাওয়েল নিয়ে যেতে দেবো না।’

‘এই কিছুদিন হলো নিজেকে নতুনভাবে গুছিয়ে নিয়েছি আমি। কাজেই আমাকে নিয়ে আপনার চিন্তা করার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমি এমনকী আপনাদের মিনিবারে পা পর্যন্ত দেবো না, মদ খেয়ে মাতাল হওয়া তো পরের কথা।’

চোখ সরু করে ফেলল ম্যানেজার লোকটা। নজরের সাহায্যে জরিপ করছে পোর্টারকে। একসময় ঠাহর করতে পারল, এই কাজের কোনো দরকার নেই আসলে। জানালার সেই স্লট দিয়ে একটা ক্লিপবোর্ড ঠেলে দিল বাইরের দিকে। ‘নিম্ন, সই করুন, প্লিজ।’

যে-লাইন খালি আছে, সেখানে বব সিগার নামটা লিখল পোর্টার। তারপর ক্লিপবোর্ডটা চালান করে দিল ওই লোকের দিকে।

নামটা পড়ল ম্যানেজার। পেগবোর্ড থেকে আলাগা করে নিল একটা চাবি। স্লটের নিচে একটা ধাতব ট্রে-তে ফেলল চাবিটা। ‘আমাদের একটা পেন্টহাউস

সুইট আছে, সেখানে একটা ঘর দিলাম আপনাকে। বিল্ডিংয়ের পূর্বদিকে অবস্থান ওটার। শহরটা চমৎকার দেখা যায় ওখান থেকে। নাস্তার ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে... প্রতিটা হলের শেষমাথায় ভেন্ডিং মেশিনে পেয়ে যাবেন। যে-ক'দিন আছেন এখানে, সময়টা উপভোগ করুন।'

হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল পোর্টার। প্লাস্টিকের একটা রিঙে ঝুলছে ওটা। গায়ে কালো কালিতে খোদাই করা আছে ২০৩ নম্বরটা। কালো রঙটা ফিকে হয়ে গেছে। ওই চাবি পকেটে চালান করে দিল সে। তুলে নিল নিজের ব্যাগ। 'ধন্যবাদ।'

জবাব দিল না ম্যানেজার লোকটা। সিকিউরিটি মনিটরের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে সে। দায়সারা ভঙ্গিতে হাত নাড়ল পোর্টারের উদ্দেশে। চিপসের গুঁড়ো লেগে থাকার কারণে কেমন কমলা রঙ ধারণ করেছে তার আঙুলের ডগাগুলো।

এলিভেটর ছাড়িয়ে সিঁড়ির উদ্দেশে এগোল পোর্টার। হাজির হয়ে গেল দ্বিতীয় তলায়। খুঁজে বের করল ২০৩ নম্বর ঘরটা। প্রতিবেশী বলতে কেউ আছে কি না ওর, নিশ্চিত হতে পারল না সে-ব্যাপারে। আশপাশের সবগুলো জানালাই কালো দেখাচ্ছে।

চাবিটা কাজে লাগিয়ে ঘরের তালা খুলতে একটু বেগ পেতে হলো ওকে। তালা খুলে যাওয়ার পর ধাক্কা দিল পাল্লায়, পা রাখল ভেতরে। লাইট জ্বালিয়ে দিল।

ঘরের মাঝখানে আছে কুইন সাইজের একটা বিছানা। ওক কাঠের রঙ যে-রকম হয়, সে-রকম হালকা রঙের একটা ড্রেসার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিছানার উল্টোদিকের দেয়ালের সঙ্গে। ড্রেসারটার গায়ে কেমন যেন আঁচড়ের দাগ। এককালে যে-জায়গায় টেলিভিশন ছিল, সেটার পাশে লিখে রাখা হয়েছে: ফ্রি এইচবিও! টিভি যে ছিল, সেটা বোঝা যায় কাঠের গায়ে আঁচড় দেখে। মেঝের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে মলিন একটা বাদামি দাগ। নির্দিষ্ট কোনো ধরন ঠাহর করা যায় না ওই দাগের। মেঝেতে বিছানো আছে সবুজ একটা বারবার; কোনো একজাতের ক্লিনজার দিয়ে ওটা সাফ করার চেষ্টা করেছিল কেউ একজন, কাজ আরও বাড়িয়েছে সে। দূরের এক কোনায় দেখা যাচ্ছে দাগে-ভরা একটা টেবিল এবং সেটার সঙ্গে একটা চেয়ার।

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম আছে। তবে সেখানে উঁকি দিয়ে দেখার রুচি হলো না পোর্টারের। নিজের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল বিছানার ওপর। ঘরের এ-মাথা থেকে হাজির হলো ও-মাথায়, দাঁড়াল জানালার পাশে। পুরু পর্দা ঝোলানো আছে, সরিয়ে দিল সেটা। দূরে দেখা যাচ্ছে জেলখানার আলো। ওই কয়েদখানার সরু, খাঁজের মতো দেখতে জানালাগুলো আলোকিত হয়ে আছে এলোমেলোভাবে।



৩৪.

ক্রেয়ার

তৃতীয় দিন, ভোর ৪:৫৬

ফোন বাজছে।

ঝট করে খুলে গেল ক্রেয়ারের চোখ। শীতল ধাতব ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। মুখ থেকে সমানে গড়াচ্ছে লাল।

‘ধেং!’ বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। মুখ তুলে তাকাল ঘড়ির দিকে। সকালের আলো ফুটতে আর বেশি বাকি নেই। হাসপাতাল থেকে ডেভিসদের বাসায় গিয়েছিল ন্যাশ। আর ক্রেয়ার ফিরে এসেছিল ওদের অফিসকক্ষে।

হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিল সে, কল রিসিভ করল। ‘হ্যাঁ?’

‘ডিটেকটিভ নর্টন?’

‘বলছি।’

‘আমি লিভসি রোব্বস, ক্রাইম ল্যাব থেকে। আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কয়েকবার। কিন্তু কেবলই ভয়েস মেইল পাচ্ছিলাম আপনার।’

‘কাজ করতে করতে যখন ঘুমিয়ে যাই আমি, তখন ঘটে ও-রকম। বলুন কী খবর।’

‘ডেভিসদের বাসায় কী কী পেয়েছি আমরা প্রাথমিকভাবে, সেসব ই-মেইল করে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি আমি মিনিট বিশেক আগে। ডিটেকটিভ পোর্টারের কাছেও মেইল পাঠিয়েছি। যেটুকু কফি বাকি ছিল, সেটাতে লিসিনোপ্রিলের বেশ ভালো একটা ডোজ পেয়েছি আমরা। ওই বাড়ির যে-ঘরে নোংরা কাপড় আর জুতো রাখা হয়, সেখানকার দরজার ডেডবোল্টে আঁচড়ের দাগও পাওয়া গেছে। দাগগুলো যাকে বলে কিনা বেমানান... বিশেষ কোনো একটা চাবির কারণে পড়ে থাকতে পারে।’

‘তার মানে কেউ একজন জোর খাটিয়ে ঢুকেছিল ওই বাসায়?’

‘আমাদের সিদ্ধান্ত তা-ই। লোকটা প্রথমে ওই দরজার তালা খুলেছে, তারপর সেখান দিয়ে ঢুকেছে বাসার ভেতরে। সবশেষে কফিমেকারের ওয়াটার ট্যাঙ্কে বিশেষ সেই ওষুধের তরল একটা মিশ্রণ ঢেলে দিয়েছে। ওই ট্যাঙ্ক যদি কানায় কানায় ভর্তিও করে ফেলতেন মিস্টার ডেভিস, তবুও লাভ হতো না তেমন একটা... এত বেশি পরিমাণে ওষুধ মেশানো হয়েছিল যে, সেটা স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসত না কিছুতেই।’ একটু দ্বিধা করছে মেয়েটা। ‘র‍্যাভাল ডেভিসের টক্সিকোলোজি রেজাল্টের ফল কী, জানার জন্য হাসপাতালে ফোন করেছিলাম আমি। আমাকে বলা হয়েছে, রাত দশটা চৌত্রিশ মিনিট মারা গেছেন বেচার। বড়

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৮২

রকমের একটা স্ট্রোক হয়েছিল তাঁর, এবং তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি ডাক্তারদের পক্ষে।’

লম্বা করে দম নিল ক্লেয়ার। প্রথমে দুটো মেয়ে। তারপর তাদের বাবারা।

‘আরও কথা আছে,’ লাইনের ও-প্রান্ত থেকে শোনা যাচ্ছে রোঙ্কসের কণ্ঠ। ‘আমরা নিশ্চিত হয়েছি, লিলি ডেভিসের লাশের গায়ে যে-কাপড় ছিল, সেটা আসলে এলা রেনল্ডসের। ওই কাপড় থেকে দুটো মেয়েরই ত্বকের টিস্যু এবং চুল পাওয়া গেছে। জামার হাতায় অল্প পরিমাণ বমিও পেয়েছি আমরা। লিলি ডেভিসের সঙ্গে মিলে গেছে সেটা। আমার সেই ই-মেইলে এসবের কথা উল্লেখ করেছি আমি।’

‘অচেনা সেই লোক কখন ঢুকে পড়েছিল বাড়ির ভেতরে, সে-ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?’

‘না। ওই লোক যে কিচেন পার হয়ে অন্য কোথাও গিয়েছিল, এ-রকম কোনো তথ্যপ্রমাণ এখনও জোগাড় করতে পারিনি আমরা। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, কী করতে যাচ্ছিল সে ওই বাড়িতে, সেটা সেখানে ঢোকান আগেই ভালোমতো জানা ছিল তার। তাই ঢুকেই চট করে কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে পেরেছে।’

‘আমাকে খুঁজে বের করার জন্য ধন্যবাদ। আরও কিছু যদি জানতে পারেন, জানাবেন প্লিজ,’ বলল ক্লেয়ার।

‘আপনি বিশ্রাম নিন, ডিটেকটিভ।’

লাইন কেটে দেয়া হলো।

ডেস্কের ওপর ফোনটা নামিয়ে রাখল ক্লেয়ার।

বিশ্রাম নেয়ার কোনো উপায় নেই ওর। অন্তত এখন তো না-ই।

উঠে দাঁড়াল সে। টান টান করে দিল হাত-পা। এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে। লিলি ডেভিস নামটার নিচে লিখল...

এলা রেনল্ডসের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পাওয়া গেছে

পানিতে চুবানো হয়েছে এই মেয়েকে

বেশ কয়েকবার কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা হয়েছে... লবণাক্ত পানিতে

একটা কলাম যোগ করে দিল র‍্যাভাল ডেভিসের জন্য। সেখানে লিখল:

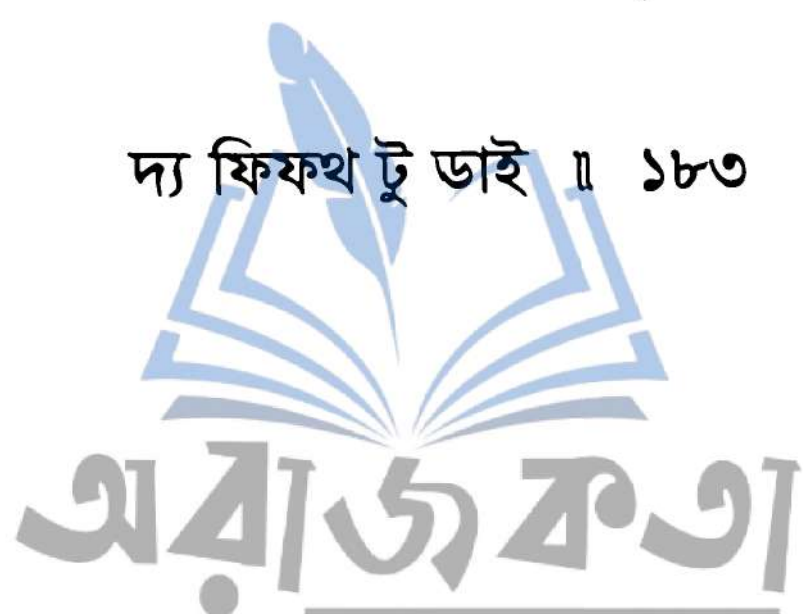
ডাক্তার, জন এইচ. স্ট্রজার, জুনিয়র হাসপাতাল

লিলি ডেভিসের বাবা

স্ত্রী= হেন্স ডেভিস

ওভারডোজ... লিসিনোপ্রিল (রক্তচাপের ওষুধ)

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ১৮৩



অরাজকতা



কার কোন অ্যাসাইনমেন্ট আছে, সে-তালিকার ওপর নজর বুলিয়ে নিল সে।
যেসব কাজ করা হয়ে গেছে, সেসব কেটে দিল। আর বেশি কাজ বাকি নেই।
এখন নতুন কোনো সূত্র দরকার ওদের।

এখন পর্যন্ত লাশ পাওয়া গেছে চারজনের।

শিকাগো শহরে লবণাক্ত পানির সুইমিং পুল আছে, এ-রকম একটা তালিকা
তৈরি করতে বলা হয়েছিল ক্লোজকে; কাজটা কতদূর করতে পেরেছে সে, ভাবল
ক্রেয়ার।

আনমনা হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঠাহর করতে পারল, ঘরের এককোণায় রাখা
কফি মেশিনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দ্রুত মত বদল করল। ওই ভেন্ডিং
মেশিন থেকে কিছু একটা বের করবে সে, এবং সেই জিনিস থাকবে সিল-করা
লিসিনোপ্রিল-প্রুফ প্যাকেটে।

৩৫.
ন্যাশ
তৃতীয় দিন, সকাল ৬:৪৩

‘পুরনো এই গাড়ির হিটারটা পুরো ফালতু,’ বলল ক্রোজ, দু’হাত ঘষছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

কারস আর ইউএস-এর বাইরে, রাস্তার আরেকধারে গাড়ি পার্ক করেছে ওরা। দোকানের সাইনবোর্ড বলছে, আরও এক ঘণ্টার আগে খুলবে না দোকানটা। ওই সময়টা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দু’ঘণ্টা আগে... ভ্যালেন্টাইন ডে’র বিক্রি উপলক্ষে। লাল রঙের ঝুলন্ত ফিতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সারা পার্কিং লট।

রাতের বেশিরভাগ সময় ডেভিসদের বাসায় কাটিয়ে দিয়েছে ন্যাশ। ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেটরদের কাজ তত্ত্বাবধান করেছে। তারপর বাসায় গেছে, চটজলদি সেরে নিয়েছে গোসল, কাপড় বদল করেছে। সবশেষে হাজির হয়েছে ক্রোজের অ্যাপার্টমেন্টে, গাড়িতে তুলে নিয়েছে ওকে।

ড্যাশবোর্ডের গায়ে আলতো চাপড় বসিয়ে দিল ন্যাশ। ‘ভালো দিন বলতে যা-কিছু ছিল, সব পেছনে ফেলে এসেছে আমার কনি। কিন্তু আমি এই গাড়িকে চমৎকার একটা অবস্থায় নিয়ে যাবো আবার। এই একটু মেরামতির কাজ সারতে হবে আর কী, তার বেশি কিছু না।’

হাতে হাত ঘষা থামার ক্রোজ, তাকিয়ে আছে ন্যাশের দিকে। ‘এই গাড়ি বদল করে সুন্দর দেখে একটা টয়োটা কিংবা হোন্ডা গাড়ি নিচ্ছেন না কেন? এমন কোনো গাড়ি, যেটার ভেতরে এয়ারব্যাগ আছে, সিডি প্লেয়ার আছে। ও-রকম প্লেয়ারকে কী বলে, জানেন? এইট-ট্র্যাক প্লেয়ার।’

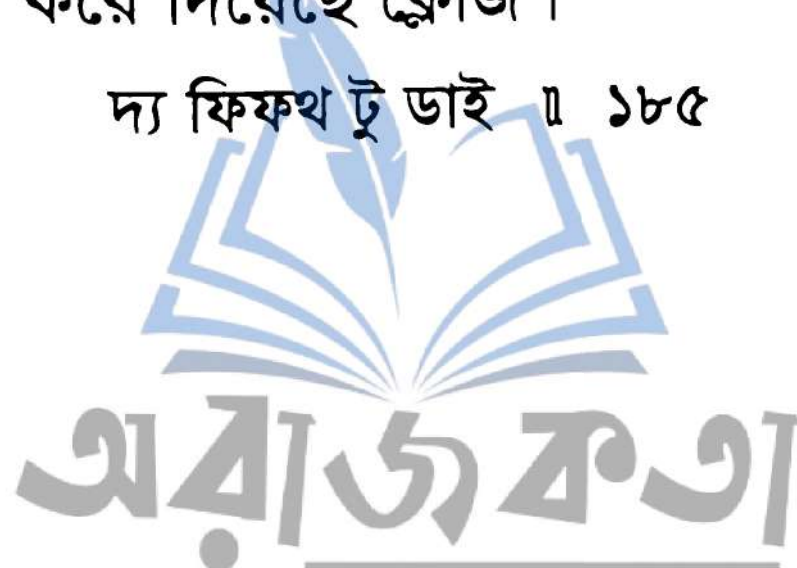
হাত বাড়িয়ে গ্লাভ বক্সের গায়ে একটা কিল বসিয়ে দিল ন্যাশ। মুহূর্তের মধ্যে খুলে গিয়ে ক্রোজের হাঁটুর সঙ্গে বাড়ি খেল ওটা। আট ট্র্যাকের কতগুলো টেপ হড়মুড় করে পড়ে গেল গাড়ির মেঝেতে। ‘তোমার যেটা খুশি লাগে, তুলে নাও।’

পায়ের কাছে পড়ে থাকা ওই টেপগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ক্রোজ। ‘আপনার এই গাড়ি তো দেখছি কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছে। ঝুঁকে পড়ল সে, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটা টেপ। গাড়ির এইট-ট্র্যাক প্লেয়ারে ঢুকিয়ে দিল কার্টিজটা। এক মুহূর্ত পরই শোনা গেল নিল ডায়মন্ডের “সুইট ক্যারোলিন”। গাড়ির ভাঙাচোরা স্পিকার থেকে কেমন এক তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে আসছে গানটা।

স্টিয়ারিং হুইলে আঙুলের সাহায্যে ড্রাম বাজাচ্ছে ন্যাশ। ওদিকে ক্রোজ ছন্দের তালে তালে সামনে-পেছনে দুলছে। ‘এই লোকের সামনে জন লেননও কিছু না। এই লোক সত্যিকারের একটা প্রতিভা।’

গুনগুন করতে শুরু করে দিয়েছে ক্রোজ।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৮৫



অরাজকতা



হাত বাড়িয়ে প্রেয়ারের ইজেক্ট বাটনে চাপ দিল ন্যাশ, বের করল টেপটা।

‘কী হলো?’ ভ্রু কুঁচকে গেছে ক্রোজের।

‘এই গান যদি বাজাতে দিই তোমাকে, তা হলে তুমি গাইতে শুরু করবে। গাইতে শুরু করবো আমিও। ফলে বিশেষ কোনো একটা মুহূর্ত চলে আসবে আমার আর তোমার মাঝখানে। সেটা যতক্ষণে শেষ হবে, ততক্ষণে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটে যাবে আমাদের মধ্যে। মোদা কথা, তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিল ডায়মন্ডের কোনো গান গাইতে রাজি না আমি। ভুলে যেয়ো না, মাঠে নেমে কাজ করতে শুরু করেছে তুমি বেশিদিন হয়নি।’

‘আজ যদি আপনার সঙ্গে ক্রেয়ার অথবা পোর্টার থাকতেন, তা হলে নিশ্চয়ই গাইতেন?’

‘সেটা আলাদা কথা।’

‘আলাদা কোন দিক দিয়ে?’

‘আলাদা মানে আলাদা। অত কথা ব্যাখ্যা করার সময় নেই।’

‘আমার মনে হয় আমাকে নিয়ে ঈর্ষায় ভুগতে শুরু করেছেন আপনি।’

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ন্যাশ। ‘নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি।’

পুরু, নীল উইন্টার কোট পরিহিত এক লোক বেরিয়ে এসেছে লাল রঙের একটা এসইউভি থেকে। বরফের ওপর দিয়ে ছুট লাগিয়েছে পার্কিং লটের কেন্দ্রস্থলে থাকা হোঁতকা ধূসর সেই বিল্ডিংয়ের দিকে। গ্লাভ-পরা হাতে চাবি ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। দরজা খুলতে পারল, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

‘লোকটা হয় ওই দোকানের ম্যানেজার নয়তো মালিক,’ বলল ক্রোজ। ‘ঠিকই বলেছিলেন আপনি। বেচাবিক্রির জন্য প্রস্তুতি নিতে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে লোকটা।’

‘চলো যাই,’ বলল ন্যাশ। নিজের সিট বেল্ট খুলে ফেলল। ধাক্কা মেরে খুলল গাড়ির দরজা। বরফশীতল বাতাস আরেকটু হলে উল্টে ফেলে দিয়েছিল ওকে। বরফের ওপর পা রাখতে রীতিমতো যুঝতে হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে তুলে দিল কোটের কলার, সেটা শক্ত করে ধরে রাখল ঘাড়ের কাছে। এখন একটা হ্যাট থাকলে ভালো হতো, ভাবল মনে মনে।

ট্রাফিক সিগনাল ক্রিয়ার হওয়ামাত্র রাস্তা পার হলো সে। পিছলে পড়ে যাওয়ার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে যতখানি দ্রুত সম্ভব করেছে কাজটা। ওর ঠিক পেছনেই আছে ক্রোজ।

কারস আর ইউএস-এর ভেতরের জায়গাটা অত বেশি বড় না। খুব বেশি হলে আধ একর হবে। উঁচু কালো ফেন্স দিয়ে ঘেরাও করে দেয়া হয়েছে পুরো জায়গা। হাল মডেলের ব্যবহৃত গাড়ির যে-সিলেকশন আছে তাদের, সে-অংশটুকু বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে হলুদ ফ্লাডলাইট। প্রতিটা গাড়িতে জুড়ে দেয়া হয়েছে কোনো না কোনো ট্যাগ: খুবই কম দাম! কোথাও কোনো মরিচা নেই! দারুণ দাম! সম্পূর্ণ পরিষ্কার!

এগুলো ছাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ন্যাশ। হাজির হলো অফিসরুমের দরজায়।

ফুটপাথের একধারে বরফ জমে আছে, সেগুলোতে পিছলে গিয়ে আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল ক্রোজ। ব্যাপারটা কেউ দেখতে পেয়েছে কি না, জানার জন্য দ্রুত নজর বোলাল আশপাশে। ওকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ন্যাশ।

‘এই কেস পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফ্লোরিডা অথবা লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যাবো আমি। আমার মতো একজন আইটি বিশেষজ্ঞের জন্য কাজের প্রচুর সুযোগ আছে সেখানে। সেই সঙ্গে আছে গরম আবহাওয়া,’ বলল ক্রোজ। শেষপর্যন্ত হাজির হতে পেরেছে অফিসরুমের সামনে।

ছোট এই অফিস বিল্ডিংয়ের দরজাটা লক করা আছে। তবে ন্যাশ দেখতে পাচ্ছে, ভেতরে ওই লোক হাঁটাচলা করছে। কাচের গায়ে টোকা দিল সে। তুলে ধরল নিজের ব্যাজ এবং আইডি কার্ড। বিল্ডিংয়ের ভেতরে, দূরের এক কোণায় ছিল লোকটা, একটা ফাইল কেবিনেটের সামনে কী যেন করছিল। তার হাতে একটা কফি স্কুপার দেখা যাচ্ছে। কাজে ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্ত হলো সে, এবং সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠল তার চেহারায়। কফির একটা ক্যানে ফেলে দিল ওই স্কুপার, তারপর এগিয়ে এল দরজার দিকে। নীল রঙের সেই কোট এখনও আছে তার গায়ে। তবে অর্ধেক বোতাম খোলা। বেরিয়ে আছে বেটপ ভুঁড়ি। কোটের নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ একটা সোয়েটার।

নোংরা কাচ-দরজার আড়াল থেকে ন্যাশের ব্যাজটা কিছুক্ষণ দেখল ওই লোক। ‘কী চান আপনি?’

‘জনগণের যারা সেবক, তাদের সঙ্গে কথা বলার ওটা কিন্তু কোনো পছন্দ না,’ বলল ক্রোজ।

‘আমরা মেট্রো পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই,’ চিৎকার করে জানিয়ে দিল ন্যাশ। শীতের বাতাস রীতিমতো গর্জন তুলেছে এই জায়গায়।

কেমন ব্যাকুল একটা দৃষ্টিতে কফিমেকারটা একবার দেখে নিল ওই লোক। তারপর মোচড় মেরে খুলে দিল দরজার লক, ফাঁক করল পাল্লা। হাতের ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলছে ন্যাশ আর ক্রোজকে। ‘জলদি করুন। ভেতরের গরমটা বেরিয়ে যেতে দেবেন না।’

পিছলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ন্যাশ আর ক্রোজ। দরজাটা আবার লক করে দিল ওই লোক। আবারও তাকাল সেই কফিমেকারের দিকে।

‘আপনি তো দেখা যাচ্ছে ওই জিনিসের জন্য রীতিমতো ব্যাকুল হয়ে আছেন,’ বলল ন্যাশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। ‘দুঃখিত। গত বছর সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমি। তার আগের বছর ছেড়েছি মদ খাওয়া। আমার জন্য এখন কেবল ক্যাফেইনই বাকি আছে।’



‘ঠিক আছে তা হলে। কফি বানান,’ বলল ন্যাশ।

ফাইল কেবিনেটের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল লোকটা। যত্ন সহকারে দশ স্কুপ কফি মেপে আলাদা করে নিল, ঢালল কফিমেকারের রিজার্ভয়ারে। তারপর চাপ দিল একটা বাটনে। যেন প্রাণ পেল মেশিনটা। হিসহিস আওয়াজ হচ্ছে। পানি যত গরম হচ্ছে, বুদবুদের শব্দ তত জোরালো হচ্ছে। ন্যাশ আর ক্রোজের দিকে ফিরে তাকাল লোকটা। তাকে এতক্ষণে নিরুদ্ভিগ্ন মনে হচ্ছে। ‘আমার নাম মেল কাম্বারল্যান্ড। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি?’

‘আমি ডিটেকটিভ ন্যাশ। আর এ হচ্ছে এডউইন ক্রোজোয়োস্কি।’ পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোন। ট্যাপ করল স্ক্রিনে, সেটা মেলে ধরল কাম্বারল্যান্ডের সামনে। ‘এই মেয়েকে চেনেন?’

একটা ডেস্কের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কাম্বারল্যান্ড, ছোঁ মারার কায়দায় সেটার একটা কোনার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল সে, ন্যাশও ওই একই কায়দায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল নিজের পিস্তলের উদ্দেশে, কিন্তু সহসা ঠাহর করতে পারল, আসলে নিজের চশমাটা নিচ্ছে ওই লোক। শুনতে পেল, ওর পেছনে দাঁড়ানো ক্রোজ চাপাহাসি হাসল।

জায়গামতো চশমাটা পরে নিল কাম্বারল্যান্ড। কাছে এল আরেকটু। ‘ভালোমতো দেখতে পারি?’

তার হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দিল ন্যাশ।

ওই মোবাইল চেহারার খুব কাছে নিয়ে গেল কাম্বারল্যান্ড, তার চেহারা থেকে জিনিসটার দূরত্ব এখন এক ইঞ্চির বেশি হবে না। একদিকে একটুখানি কাত করে রেখেছে মাথাটা, যাতে চশমার কাচ ভেদ করে ভালোমতো দেখতে পায়। ‘আমার কি এই মেয়েকে চিনতে পারা উচিত?’

‘ওই যে, গাড়িটা কিন্তু ওখানেই আছে,’ বলল ন্যাশের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রোজ।

ঘুরে তাকাল ন্যাশ। দেখতে পেল, উজ্জ্বল সবুজ রঙের একটা মাজদা টু দেখিয়ে দিচ্ছে ক্রোজ আঙুলের ইশারায়। অফিস বিল্ডিংয়ের পাশের লটে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা।

‘ও, ওই মেয়ে,’ বলে উঠল কাম্বারল্যান্ড, মোবাইলটা ফিরিয়ে দিল ন্যাশকে। ‘শুনুন, এসব ব্যাপার নিয়ে ছেলে-মেয়েদের বাবা-মায়ের সঙ্গে সবসময়ই কথা বলতে হয় আমাকে। একটা বাচ্চা কোনো গাড়ি কিনতে পারবে না, এ-রকম কোনো আইন কিন্তু নেই কোথাও। আসল কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না লাইসেন্স পাচ্ছে তারা, ততক্ষণ পর্যন্ত চালাতে পারবে না সে-গাড়ি। যা হোক, ক্রেডিট কার্ড ছিল না ওই মেয়ের। আমি তাই ওকে বললাম, ভেঙে ভেঙে দশটা পেমেন্ট না দেয়ার আগপর্যন্ত গাড়িটা নিয়ে যেতে পারবে না সে। ততদিনে ওর বয়স ষোলো হয়ে যাওয়ার কথা। তার মানে কারও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কোথাও কোনো

আইনও ভঙ্গ হচ্ছে না। মেয়েটার বাবা-মা যদি আমার বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে থাকেন, আমি তাদের উদ্দেশে বলবো, আইনকানুন একটু ভালোমতো দেখে নিতে। কারণ তা না হলে যাঁরা কর দিচ্ছেন, তাঁদের টাকাটা খামোকা অপচয় হচ্ছে। আমি নিশ্চিত, করার মতো আরও ভালো কোনো কাজ আছে আপনাদের... যেমনটা আছে আমার নিজের।’

কাম্বারল্যান্ডের পেছনে উপচে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে কফিমেকারটার। দাগে ভরা একটা মগ কাজে লাগাল লোকটা।

‘এক কাপ কফি পেলে মন্দ হয় না,’ বলল ক্রোজ। ‘তবে ও-রকম কোনো কাপে।’ কেবিনেটের একপাশে স্টাইরোফোমের কয়েকটা কাপ আছে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সেগুলো।

দুটো কাপ নিল কাম্বারল্যান্ড, কফিতে পূর্ণ করল। একটা করে কাপ ধরিয়ে দিল ক্রোজ আর ন্যাশের হাতে। ‘প্রথম দুটো পেমেন্ট সময়মতোই দিয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু তৃতীয়টা দিতে দেরি করছে। আজ দু’সপ্তাহ হয়ে গেল কোনো খবর নেই ওর। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের দায়িত্বজ্ঞান বলতে কিছু নেই আসলে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, কোনো একটা চোখ-ধাঁধানো কাপড় কেনার পেছনে খরচ করে ফেলেছে টাকাটা। অথবা অন্য কোনো ফালতু কাজেও খরচ করে থাকতে পারে। অথচ এখানে আসার কথা ভাবেনি একবারও। ওর যে দেরি হবে টাকাটা দিতে, আমাকে সে-কথা বলে যাওয়ার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করেনি।’

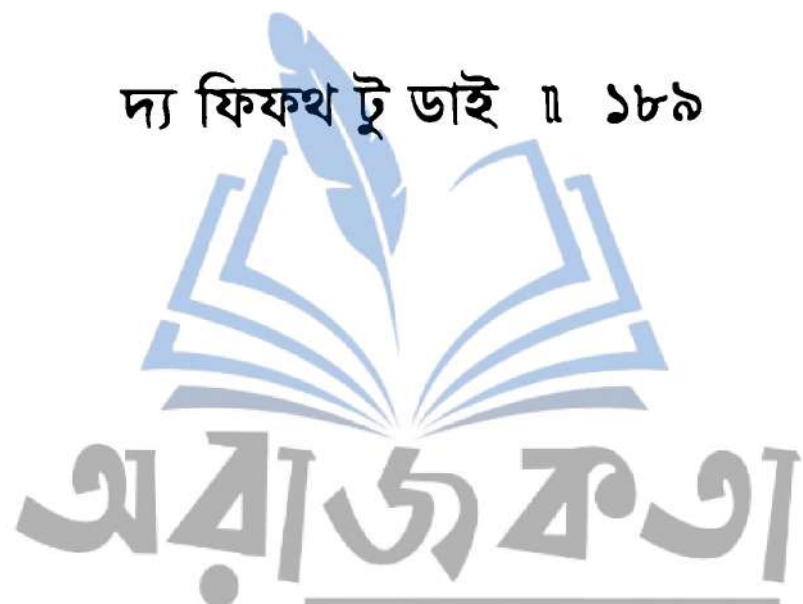
‘মেয়েটা মরে গেছে,’ বলল ন্যাশ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাম্বারল্যান্ডের চেহারার দিকে, দেখছে কী প্রতিক্রিয়া হয় লোকটার।

কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ‘ও আচ্ছা। কথাটা জানা ছিল না আমার।’

‘জানতেন না?’

ফাইলিং কেবিনেটের ওপর নিজের কফি মগটা নামিয়ে রাখল কাম্বারল্যান্ড। আত্মসমর্পণ করার কায়দায় দু’হাত তুলল। ‘আপনি কী ভাবছেন, সে-ব্যাপারে আমি আসলে নিশ্চিত না। আমি যা করেছি তা হলো, একটা গাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করেছি ওই মেয়ের কাছে... তার বেশি কিছু না। ওই মেয়ের সঙ্গে বড়জোর চার কি পাঁচবার দেখা হয়েছে আমার। এখানে এসেছিল সে। যেসব গাড়ি প্রদর্শনীতে রাখা আছে, সেগুলো দেখেছে। শেষপর্যন্ত পছন্দ করেছে মাজদা-টা। তারপর কীভাবে পেমেন্ট করবে, সে-ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা করেছে। ব্যস, এটুকুই। যেমনটা আমি বলেছি একটু আগে... পেমেন্টের তৃতীয় কিস্তিটা দিতে দু’সপ্তাহ দেরি করে ফেলেছে সে। শেষ যে-বার দেখেছি আমি ওকে, তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে এই বছরটা। আর টেকনিকালি যদি বলি, ওই গাড়ি কিন্তু এখনও কেনেনি সে। কিস্তিতে শোধ করছিল গাড়ির মোট মূল্যের দশ শতাংশ দাম। কাজটা করতে পারলে ওর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক একটা চুক্তি করে ফেলতাম আমরা।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৮৯



অরাজকতা



‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন জানুয়ারির পর ওই মেয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি আপনার?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

ডেস্কের আরেক ধারে গিয়ে দাঁড়াল কাম্বারল্যান্ড। কম্পিউটারের কিবোর্ডে কয়েকটা কি চাপল। ‘এলা রেনল্ডস, তা-ই না? এখানে জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে শেষবার এসেছিল মেয়েটা। তিন শ’ বারো ডলার দিয়ে গেছে। আমি ওকে বলেছিলাম, মাত্র দু’শ’ ডলার দিলেই হবে। কিন্তু মেয়েটা চায়নি, অন্য কেউ কিনে ফেলুক ওই গাড়ি। আর তাই বাড়তি কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তার আগের মাসে দিয়েছিল দু’শ’ তিহাত্তর ডলার। এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখের।’

‘কোথেকে এসব টাকা জোগাড় করছিল মেয়েটা, ভাবছি,’ বলল ক্লোজ। ‘সে কোথায় কাজ করত, অথবা আদৌ কোথাও কোনো কাজ করত কি না, সে-ব্যাপারে কিন্তু আমাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই।’

নিজের ফাইলটা ঘাঁটছে কাম্বারল্যান্ড। ‘আমাদের কাছে যে-আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল মেয়েটা, তাতে বলা হয়েছে, অন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ায় সে। টাকার উৎসের ঘরে সেটাই লিখেছে সে।’

‘বাবা-মাকে এই কথা হয়তো জানায়নি সে,’ বলল ক্লোজ। ‘আমিও একসময় ছাত্র পড়িয়েছি। কিন্তু কথাটা কোনোদিন জানাইনি আমার বাবাকে। তাতে হতো কী... আমাকে যে-টাকা দিতেন তিনি, সেটা কিছু কাটছাঁট করে ফেলতেন।’

‘ছাত্র পড়ানো...’ বলছে ন্যাশ, ‘তার মানে স্টারবাকস-এ যে এতবার গিয়েছিল ওই মেয়ে, টাকা পেয়েছিল কোথায়, সেটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, একটা গাড়ি কেনার জন্য ইন্টারনেট ব্রাউজ করার পাশাপাশি সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখাও করেছে সে।’

‘স্টারবাকস আর লাইব্রেরি... এই দুটো জায়গাতেই ছাত্র পড়াতাম আমি,’ বলল ক্লোজ।

এবার নিজের ফোনে লিলি ডেভিসের ছবি বের করল ন্যাশ। ওটা দেখাল কাম্বারল্যান্ডকে। ‘এই মেয়েকে চেনেন নাকি? এখানে কখনও দেখেছেন?’

ছোট সেই ডিসপ্লের দিকে উঁকি দিয়ে তাকাল কাম্বারল্যান্ড। চশমার আড়ালে চোখ পিটপিট করছে। ‘না। চিনি না।’

‘এ-রকম কি হতে পারে... এখানে এসেছিল মেয়েটা, কিন্তু অন্য কোনো সেলসম্যানের সঙ্গে কথা বলেছে?’

মাথা নাড়ল কাম্বারল্যান্ড। ‘ও-রকম কোনো কাজ যদি করেও থাকে মেয়েটা, আমি তো এখানে সবসময়ই থাকি। ওই দরজা দিয়ে যে বা যারাই ঢোকে অফিসে, তাদের চেহারা মনে রাখাটা আমার ব্যবসার একটা অংশ বলে মনে করি। এখানে কিছু বিক্রয়কর্মী আছে, বয়স কম, কাজে ভালো। তবে আমি তাদের চেয়েও ভালো। এমনও হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে গাড়ি না কিনেই চলে গেছে কেউ কেউ, কিন্তু আমার বেলায় তেমনটা ঘটেনি। আমি যখনই কারও সঙ্গে কথা বলি, সে-মানুষটা কোনো না কোনো গাড়ি কিনতে বাধ্য হয়।’

‘আপনার এখানে যারা কাজ করে, তাদের নামের একটা তালিকা দরকার আমাদের,’ বলল ন্যাশ।

‘সহজ কাজ। আমি নিজে কাজ করি। আরও আছে ব্র্যান্ডন স্ট্রিটার। আছে ডগ ফ্রেডেনবার্গ। সে আমার মেকানিক। ফু হয়েছে ওর, দু’দিন ধরে অসুস্থ, তাই কাজে আসতে পারছে না। আর ব্র্যান্ডনের আসার কথা আছে আটটায়।’

‘এ-রকম কি হতে পারে, এলা রেনল্ডসের সঙ্গে কথা বলেছিল ওই দু’জনের কোনো একজন?’

‘যদি ওদের কেউ করেও থাকে কাজটা, আমার জানা নেই,’ ন্যাশকে বলল কাম্বারল্যান্ড। ‘তবে এটা মনে আছে, মেয়েটা যখন প্রথমবার পা দিয়েছিল এখানে, ব্র্যান্ডন তখন কথা বলছে অন্য একজন কাস্টোমারের সঙ্গে। একটা গাড়ি কেনার ব্যাপারে আগে থেকেই মন স্থির করে রেখেছিল মেয়েটা। মাজদা-টা দেখল, তারপর সোজা হাজির হয়ে গেল অফিসে। আমাকে বলল, ওই গাড়ি কিনতে চায়। এমনকী টেস্ট ড্রাইভ অথবা অন্যকিছুও চায় না। আমার কথার মানে কিন্তু এ-ই না, লাইসেন্স ছাড়া কাউকে টেস্ট ড্রাইভ করতে দিই। তবে মেয়েটা যদি বলত, তা হলে ওকে ওই গাড়িতে বসিয়ে টেস্ট ড্রাইভে যেতাম আমি।’

‘অন্য লোকটা কোথায় ছিল তখন? ফ্রেডেনবার্গের কথা বলছি।’

কম্পিউটারের কিবোর্ডে আবারও আঙুল চালান কাম্বারল্যান্ড। ‘মনে হচ্ছে সে তখন গ্যারেজে একটা পন্টিয়াকের নিচে ছিল... মাস্টার ব্রেক সিলিভার বদল করছিল। কাস্টোমারদের সঙ্গে কিন্তু খুব কমই যোগাযোগ হয় ওর। আপনারা ইচ্ছা করলে অপেক্ষা করতে পারেন ওর জন্য। এক কাজ করুন না... ততক্ষণে একটু ঘুরেফিরে দেখুন না আমার গাড়ির-কালেকশন?’

শেভিতে ফিরে এসেছে ন্যাশ আর ক্লোজ। উইন্ডশিল্ডের ওপর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে তুষার।

গাড়ি চালু করল ন্যাশ। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রাস্তার দিকে। ‘আমার মনে হয় না কফিখোর লোকটাকেই খুঁজছি আমরা।’

‘দেখুন, প্রকৃত শনাক্তকরণের দায়িত্বটা আমি আপনাদের... মানে, ডিটেকটিভদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে একটা কথা মনে নিতেই হবে আমাকে, পুরো ঘটনাটার সঙ্গে ঠিক মেলানো যায় না কফিখোরকে। নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে কোনো মেয়েকে যদি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে থাকে সে, তা হলে সেটার মতো বোকামি আর কিছু হতে পারে না। আরেকটা কথা... সরাসরিই বলছি। ও-রকম কোনো কাজ করার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ওই লোকের আছে বলে মনে হয়নি আমার।’

‘লোকটার বয়স বেশি,’ বলল ন্যাশ। ‘মেয়েদেরকে যারা ওভাবে তুলে নেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা যৌনতাড়না কাজ করতে থাকে তাদের ভেতরে। এবং



তাদের বয়স হয় পঁয়ত্রিশ কিংবা তার নিচে। ধর্ম বা যৌনসম্পর্ক যদি না-ও ঘটে থাকে, বিশেষ সেই তাড়নাটাই মুখ্য একটা ভূমিকা পালন করে। কাম্বারল্যান্ডে বয়স পঞ্চাশের ঘরে। শরীরের ওজন অনেক বেশি। সে যদি কিশোরী কোন্ মেয়ের কাছে গিয়ে তাকে ক্যান্ডি বা ফুল অফার করে, ওই মেয়ে চাইলে পিটিয়ে সোজা করে দিতে পারবে লোকটাকে। আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, আমরা আরও কম বয়সী, আরও শক্তিশালী কাউকে খুঁজছি। এমন কেউ, যে লোকের ভেতরে বিশেষ কোনো একটা তাড়না আছে।’

‘কাম্বারল্যান্ডের ওখানে কাজ করে যারা, তাদের কেউ করে থাকতে পারে কাজটা,’ বলল ক্রোজ। ‘কাম্বারল্যান্ড বলেছে, এখানে নাকি কখনও আসেনি নিকি ডেভিস। কিন্তু কথাটা সত্যি না-ও হতে পারে।’

‘আমরা যা জানি তা হলো, ওই দুটো মেয়েই বাজারে গাড়ি খোজাখুঁট করছিল। আপাতত সূত্র বলতে এই একটা তথ্যই আছে আমাদের হাতে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।’

স্টেরিয়োর পাওয়ার বাটনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ক্রোজ।

‘থামো!’ বলে উঠল ন্যাশ। ‘ওই কাজ করো না!’

৩৬.
পুল
তৃতীয় দিন, সকাল ৬:৪৪

সারা রাত ওই বাড়িতেই থাকল ওরা।

লিবি ম্যাকিনলের ভগ্নপ্রায় বাড়ির ভেতরে ঢুকছে আর বের হচ্ছে পাতলা প্লাস্টিকের স্যুট পরিহিত সিএসআই-এর সদস্যরা। কম করে হলেও এক ডজন অফিসার হাজির হয়েছে তাদের। নিজের জিপের ড্রাইভার'স সিটে বসে আছে পুল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওই লোকগুলোকে। জানে, নিজেদের কাজের ব্যাপারে সাবধান আছে ওরা। যে-ক্রাইম সিন ওর নিজের, সেখানে কী করছে এত লোক, ভাবতে চাইছে না সে-ব্যাপারে।

বাড়ির সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে স্পেশাল এজেন্ট ইন-চার্জ হার্লস। কানে চেপে ধরেছে নিজের মোবাইল ফোন। স্পেশাল এজেন্ট ডিনার বাসার ভেতরে কোথাও আছে।

পুল দেখল, লাইন কেটে দিল হার্লস, রাস্তা পার হচ্ছে এখন। পুল যদিকে গাড়ি পার্ক করেছে, এগিয়ে আসছে সেদিকে।

গাড়ির কাচ নামিয়ে দিল পুল।

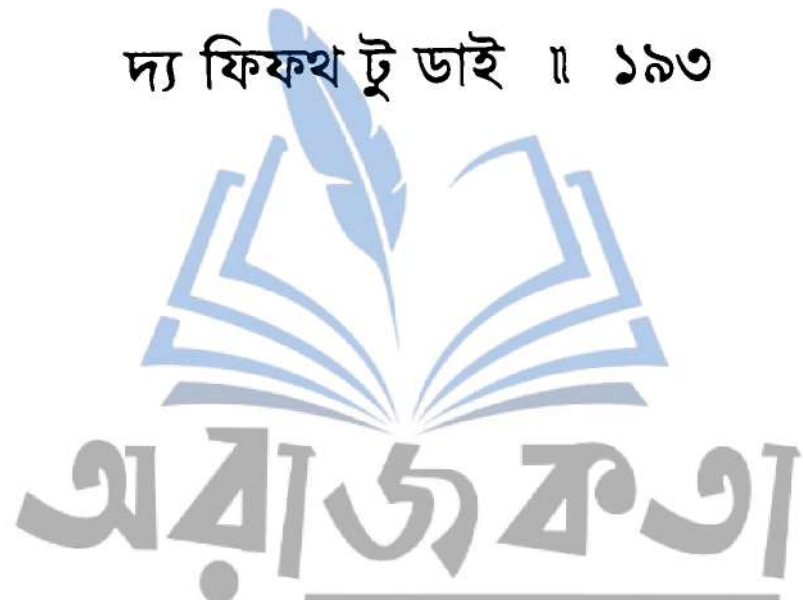
‘মেডিকেল একজামিনারের ভাষ্যমতে, ওই মেয়ে মারা গেছে কয়েক দিন আগে। আমাদের ধারণা, গত বুধবার নাগাদ বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয় বেচারীকে। যে-ই খুন করে থাকুক না কেন ওই মেয়েকে, সময় নিয়ে কাজটা করেছে সে। প্রথম যে-ক্ষত তৈরি করেছে সে ওই মেয়ের শরীরে, সেটা থেকে আরম্ভ করে শেষ ক্ষত পর্যন্ত পৌঁছাতে আনুমানিক দশ থেকে বারো ঘণ্টা সময় লেগেছে তার। লোকটা কাজ শুরু করেছে মেয়েটার পায়ের পাতা থেকে। শেষ করেছে হাতের আঙুলের ডগায় গিয়ে। চোখ, কান, এমনকী জিহ্বাও বাদ দেয়নি।’

‘ওই কাটাচিহ্নগুলোর ব্যাপারে কী জানা গেল?’

‘মেডিকেল একজামিনারের মতে, সময় যত এগিয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে ওসব ক্ষত তত-বেশি তৈরি করেছে খুনি। মেয়েটাকে বিছানা থেকে উঠতেই দেয়নি লোকটা। ওই মেয়ে বিছানায় পেশাব করে দিয়েছে, এমনকী মলত্যাগও করেছে। এত জোরে হাত-পা ছুঁড়েছে অথবা ছুঁড়বার চেষ্টা করেছে মেয়েটা যে, ওর ডান পায়ের বাঁধন চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে পৌঁছে গেছে পেশীর কাছে।’

পুল চোখ বন্ধ করছে না। জানে, ওই কাজ যদি করে, লিবি ম্যাকিনলের লাশটা ভেসে উঠবে চোখের সামনে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, লিবিকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে বিশপ। অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে মেয়েটার ওপর। এবং সেটা আধ দিনেরও বেশি সময় ধরে। সমানে চেষ্টাচ্ছে বেচারী। কিন্তু তার সেই

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৯৩





চিৎকারে সাড়া দিচ্ছে না কেউই। ‘পুরো ব্যাপারটা বিশপের জন্য কেমন যেন একটা আনাড়িপনা বলে মনে হচ্ছে আমার।’

‘আনাড়িপনা না। লোকটা নিজের বিকাশ ঘটচ্ছে। সে কে, সেটা ভালোমতোই জানা আছে আমাদের। আগের মতো আর সতর্ক থাকার দরকার নেই তার,’ বলল হার্লস।

‘হয়তো।’

‘কী ধারণা তোমার... এই কাজ অন্য কারও?’

‘মনে হয়।’

‘তা হলে তো পুরো ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে।’

পুল বলল, ‘বিশপ কিন্তু কখনও তার কোনো শিকারের শরীরে এভাবে কাটাকুটি করেনি। হাত-পায়ের আঙুলগুলো ওভাবে... এই ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন।’

‘যেমনটা বলেছি আমি... নিজের বিকাশ ঘটচ্ছে লোকটা।’

‘হবে হয়তো।’

শরীরের ভার এক পায়ের ওপর থেকে আরেক পায়ে বদল করল হার্লস। তার নিঃশ্বাস বুলে আছে আশপাশের বাতাসে। দেখে মনে হচ্ছে, কোনো সিগারেটখোর তামাকপোড়া ধোঁয়া ছাড়ছে যেন। তুষার আবার পড়তে শুরু করেছে। এবার আগের চেয়ে জোরে। তুষারকণাগুলোও ভারী। ‘পোর্টারের কথামতো এখানে হাজির হয়েছিলে তুমি, না?’

এই কথা যতটা না একটা প্রশ্ন, তার চেয়ে অনেক বেশি একটা বিবৃতি। মাথা ঝাঁকাল পুল। ‘সহজাত প্রবৃত্তির যে-তাড়না অনুভব করি আমরা, পোর্টারের বেলায় সেটা ভালো কাজ করে।’

‘ভালো কাজ করে? ওই বিশপ লোকটার সঙ্গে বলতে গেলে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিল পোর্টার, অথচ তার কাছে বিশপের ব্যাপারে একটা কোনো ক্ল ছিল না। তারপর বিশপকে যখন গ্রেপ্তার করার সুযোগ ছিল পোর্টারের হাতে, তখন সে কী করেছে? শ্রেফ চলে যেতে দিয়েছে বিশপকে। তা-ও আবার কী... শিকাগো মেট্রোর অর্ধেক পুলিশ অফিসারের নাকের ডগা দিয়ে। আমি তো বলবো, বিশপকে পাঁচ বছর আগেই পাকড়াও করা উচিত ছিল পোর্টারের। কাজটা যদি করত সে, আজ এখানে থাকতে হতো না আমাদেরকে। আর ওই মেয়েমানুষটা...’ মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখিয়ে দিল হার্লস, ‘এখনও বেঁচে থাকত। যা বললাম আমি এখন, কথাটা মাথায় রেখো।’

বিশেষ এই কথার জবাবে কিছু বলল না পুল। নজর ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়েছে বাড়িটার দিকে। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙাচোরা একটা গাড়ি। একপাশে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে একটা বাইক। ‘ওই মানুষটা একেবারে জনবিচ্ছিন্ন

অবস্থায় থাকত এখানে। যাকে বলে কিনা গৃহবন্দি, অনেকটা সে-রকম। মানুষটার প্যারোল অফিসারের সঙ্গে কথা বললে কী জানা যাবে, জানেন? জানা যাবে, ওই লোক বাসা থেকে একটাবারের জন্যও বের করতে পারেনি লিবি ম্যাকিনলেকে।’

এবার চুপ হয়ে যাওয়ার পালা হার্লসের। এইমাত্র যা বলল পুল, আজ থেকে এক বছর আগেও যদি বলত কথাটা, তা হলে ওকে নিয়ে হাসিতামাশা করত হার্লস। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছে পুল এবং প্রমাণ করে চলেছে। এই টাস্ক ফোর্সে যাতে নেয়া হয় ওকে, সে-ব্যাপারে রীতিমতো কাকুতি-মিনতি করেছে।

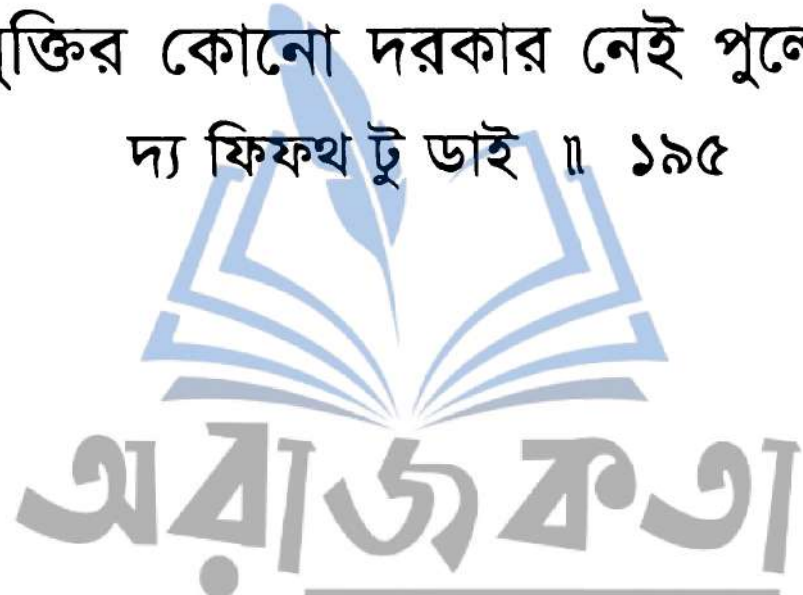
বাসার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল স্পেশাল এজেন্ট ডিনার। দেখতে পেল হার্লস এবং পুলকে। হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওই দু’জনের। ‘ভেতরে আসুন, একটা জিনিস দেখে যান।’

জিপ থেকে নেমে পড়ল পুল। হার্লসকে অনুসরণ করে রাস্তা পার হলো। তুষারকণা থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে রেখেছে। ওগুলো এখন বরফের মতো অনুভূত হচ্ছে।

বাসার ভেতরে বিদ্যুতের মূল সংযোগ দেয়া হয়নি এখনও। পেছনের উঠানে একটা জেনারেটর বসিয়েছে সিএসআই-এর লোকেরা। কমলা রঙের একটা এক্সটেনশন কর্ড সাপের মতো ঐক্বেঁকে ঢুকে পড়েছে হলওয়ায়ে এবং অন্যান্য ঘরে। হলুদ রঙের ধাতব স্ট্যান্ডের ওপর জ্বলছে ডাবল হ্যালোজেন ফ্লাডলাইট। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠেছে বাসার ভেতরের প্রায় প্রতিটি ইঞ্চি। একইসঙ্গে তৈরি হয়েছে কিছু ছায়া। ডিনারকে অনুসরণ করে সদর দরজা থেকে ভেতরে ঢুকে পড়ল হার্লস আর পুল, হাজির হলো বেডরুমে। এখানে এখনও আগের মতোই পড়ে আছে লিবি ম্যাকিনলের লাশ। একজন ফটোগ্রাফার ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিছানার সামনে। যে-আতঙ্ক নিয়ে মারা গেছে বেচারী, সেটার প্রতিটি ইঞ্চি ধারণ করে রাখছে লোকটা। পুল যেন গুনতে পাচ্ছে, ওই রক্তে ভরা জমাট বাঁধা মুখের ভেতর থেকে এখনও ভেসে আসছে বেচারীর আতঁচিক্কার।

ঘরের ঠিক মাঝখানে, ট্রাইপডের ওপর রাখা একটা থ্রিডি ইমেজিং ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ আলাগা করে নিচ্ছে আরেকজন টেকনিশিয়ান। কাজ করার সময় ওই স্ট্যান্ডের ওপর চক্ৰ খেতে সক্ষম ক্যামেরাটা। সব অ্যাঙ্গেল থেকে ঘরের ছবি ধারণ করতে সক্ষম... স্থিরচিত্র এবং ভিডিও। এরপর অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে ওটা, একই কাজের উদ্দেশ্যে। এভাবে সারা বাড়ির ছবি তোলা হবে। ছবি তোলা হবে সম্ভবত বাড়ির বাইরেরও। সবশেষে কাজে লাগানো হবে একটা কম্পিউটার। সেটা ওসব ছবিকে জোড়া দেবে। ফলে যা হবে... এজেন্টরা যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গা থেকে ভার্চুয়ালি হেঁটে বেড়াতে পারবে এই ক্রাইম সিনে। অবশ্য এই প্রযুক্তির কোনো দরকার নেই পুলের। ভালো হোক বা মন্দ...

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৯৫



অরাজকতা

ওর স্মৃতিশক্তি প্রায় নিখুঁত। এই বাড়িতে পা দেয়ার পর যা-যা দেখেছে সে, সেসব চাইলেও মুছে ফেলতে পারবে না নিজের স্মৃতি থেকে। সেসব দৃশ্য, গন্ধ, শব্দ যেন ক্রমাগত পুড়িয়ে চলেছে ওর মস্তিষ্কে।

চারটা হ্যালোজেন লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে বিছানাটা। ওগুলোর সম্মিলিত আলো বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু ওই ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আরও উজ্জ্বল। দৃষ্টি আরেকদিকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো পুল।

ড্রেসারের ঠিক পাশে, একটা খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডিনার। ওর হাতে একটা জ্বলন্ত ম্যাগলাইট। আলোটা গিয়ে পড়েছে ড্রয়ারের ভেতরে।

সেই আলো অনুসরণ করে ড্রয়ারের ভেতরে উঁকি দিয়ে তাকাল পুল।

‘ওখানে যেসব জিনিস দেখা যাচ্ছে, সেসবের যে-কোনো একটা আবার জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত ওই মেয়েকে। তা হলে এত বড় ঝুঁকি নিতে গেল কেন সে?’ জিজ্ঞেস করল ডিনার।

পকেট থেকে বেগুনি রঙের এক জোড়া লেটেক্স গ্লাভস বের করল পুল, পরে নিল। তারপর হাত ঢুকিয়ে দিল ড্রয়ারের ভেতরে। বের করে আনল একটা ড্রাইভার’স লাইসেন্স এবং পাসপোর্ট। দুটোতেই লিবি ম্যাকিনলের ছবি আছে। এবং দু’জায়গাতেই ওই মেয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ক্যালিন সেলকে। ড্রেসারের ওপর নকল এই পরিচয়পত্র দুটো নামিয়ে রাখল পুল। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে দিল ড্রয়ারের ভেতরে। বের করে আনল একটা পিস্তল... ঔজ্জ্বল্যবিহীন কালো রঙের একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ। ‘এটা গুলিভর্তি অবস্থায় আছে।’

‘দেখে তো মনে হয় না, এই জিনিস কখনও কোনো কাজে লাগিয়েছে মেয়েটা,’ বলল হার্লস।

‘কাজে লাগানোর মতো কোনো সুযোগই তো পাওয়ার কথা না তার,’ বলল পুল। ‘যদি বিশপের কথা বলি... মেয়েকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিল ওই লোক। যাকে বলে কিনা কজা করে ফেলেছিল। টেক্সিকোলোজি রিপোর্ট হাতে পেলেই মেডিকেল একজামিনার দেখতে পাবেন, কোনো একজাতের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে মেয়েটাকে... প্রোপোফল অথবা নুবায়েন হতে পারে। আগেও ওসব ওষুধ ব্যবহার করেছে লোকটা।’

পুলের দিকে ঘুরল হার্লস। ‘তুমি তখন বললে, ওই মেয়ে নাকি একরকম গৃহবন্দির মতো জীবন যাপন করত। অথচ এসব জিনিস দেখে এখন মনে হচ্ছে, পালিয়ে যাওয়ার মতলব ছিল তার।’

‘রাফসদের কবল থেকে বেঁচে থাকাটাও তো জরুরি, নাকি? তাদের থাবা থেকে এক ইঞ্চি বাইরেও যদি থাকা যায়, তা হলেও তো কাজে দিতে পারে সেটা,’ নিচু গলায় বলল পুল।

‘তোমার কথার মানে কী?’ খেঁকিয়ে উঠল ডিনার।

‘তেমন বিশেষ কিছু না। খাড ম্যাকঅ্যালিস্টারের একটা উপন্যাসে একবার পড়েছিলাম ওই কথা, সেটাই বললাম আর কী।’ বলল পুল। ‘কোনো একটা বিশেষ জায়গায় ফাঁদে আটকা পড়ে যাওয়ার ভয় কাজ করে কারও কারও মনে... আমার মনে হয় না লিবি ম্যাকিনলে সে-রকম কোনো মেয়ে ছিল। বরং আমার মনে হয়, বিশেষ কোনো একজনের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল সে। বিশেষ কোনো একজনকে ভয় পেত সে।’

‘কার কথা বলছ? বিশপ?’

‘ওই লোক লিবির বোনকে খুন করেছে। হতে পারে, জেলখানায় যখন ছিল লিবি, তখন তাকে কোনো না কোনোভাবে কোনো একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল লোকটা। আমার মনে হয়, লিবি যে-লোককে গাড়িচাপা দিয়ে মেরেছে... মানে, ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বির কথা বলছি, সে-লোক কোনো না কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশপের কাছে। আর তাই আজ অন্যরকম একটা হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আমরা চোখের সামনে। ট্যালবটের কারণে লিবি ম্যাকিনলেকে খুন করেনি বিশপ। অথবা ট্যালবট যেসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে-রকম কোনোকিছুর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেও করেনি। আমার মনে হয়, বদলা নেয়ার জন্য খুন করা হয়েছে লিবিকে। বিশপ চেয়েছিল, মরার আগে যেন প্রচণ্ড কোনো যন্ত্রণা ভোগ করে লিবি,’ বলল পুল।

ভাঁজ করে রাখা বাদামি একটা সোয়েটারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে কী যেন, সেটা নজরে পড়ল ওর। আবারও হাত ঢুকিয়ে দিল ড্রয়ারের ভেতরে, বের আনল জিনিসটা। একটা পোলারয়েড ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে নগ্ন দু’জন মেয়েমানুষকে। বিছানায় শুয়ে আছে তারা। ক্ষয়ে গেছে ছবিটার কোনাগুলো। মলিন হয়ে গেছে রঙ।

‘আমি তো এই মেয়েকে পছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছি,’ বলল ডিনার।

‘এই ছবি অনেক পুরনো। কম করে হলেও পনেরো বছর তো হবেই। বিশপও হতে পারে, আমার ধারণা। আজকাল আর কেউ পোলারয়েড ক্যামেরা ব্যবহার করে না।’

ড্রয়ারের আরেকদিকের কোনায় আরেকটা সোয়েটার দেখা যাচ্ছে, ইঙ্গিতে সেটা দেখিয়ে দিল হার্লস। ‘আরও কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি আমি।’

ওই জিনিস নজরে পড়ল পুলেরও। আরও একবার ড্রয়ারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতে হলো ওকে। এক গোছা বাদামি চুল। ইঞ্চি ছয়েক লম্বা। নাইলনে-ঢাকা কালো রাবারের হেয়ার-টাইয়ের দু’প্রান্তে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওসব চুল।



ওয়েস্ট শিকাগো অ্যাভিনিউ এবং নর্থ ডেমেনের এককোণায় দাঁড়িয়ে আছে ল্যারিসা বিয়েল। পিয়ের'স বেকারিটা ওর পেছনে। যখনই কেউ ওই দোকানের দরজা খুলে ঢুকছে অথবা বের হচ্ছে, একদৌড়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুঝতে হচ্ছে মেয়েটাকে। যুঝতে হচ্ছে একগাদা বিস্কুট, কেক এবং অন্যান্য মুখরোচক খাবার খাওয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। তবে এই যে এখন দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে, বুক ভরে টেনে নিচ্ছে বেকারির সুবাস, এটা নিশ্চয়ই অবৈধ কিছু না? আজ রাতে স্কুলে ভ্যালেন্টাইন'স ডে নাচের আয়োজন করা হয়েছে। এবং সেজন্য যে-পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে ল্যারিসার জন্য, সেটা ওর গায়ে ঠিকমতো লাগতে হবে। ওই কাপড় আবার এত টাইট যে, একটা বা দুটো ডোনাট যদি পেটে যায় মেয়েটার, তা হলে যাকে বলে কিনা খাদের কিনারে চলে যাওয়া, সে-অবস্থা হবে ওর। কেভিন ডিউ থাকবে ওই অনুষ্ঠানে। ল্যারিসা জানে, স্ট্র্যাপবিহীন কালো সেই কাপড়ে ওকে যে-মুহূর্তে দেখবে ছেলেটা, সঙ্গে সঙ্গে কায়িশা জেরো'র পিছু ধাওয়া করতে ভুলে যাবে সে। বরং জেরো'র বদলে সঙ্গ চাইবে ল্যারিসার।

আরও একবার খুলে গেল বেকারির দরজাটা। বেরিয়ে এল বুড়োমতো একজন লোক। একটা ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। পরনে ঢলঢলে একটা নীল কোট। সঙ্গে সবুজ স্কার্ফ। সেটাতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা পরী গিয়ে উঠছে ক্রিসমাস গাছে। ডিম আর বেকন দেয়া সেই স্যান্ডউইচের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। পানিতে ভরে গেল ল্যারিসার মুখ।

না!

আর না। ফুটপাত ধরে আরও ফুট দু'-এক এগিয়ে গেল মেয়েটা, আরও কাছাকাছি হলো সেই কোনার। হিমশীতল বাতাস বয়ে চলেছে এই বিল্ডিংয়ের চারপাশ ঘেঁষে। কেঁপে উঠল মেয়েটা।

ওই লোক গেল কোথায়?

ফুটপাতে পা ঠুকল মেয়েটা। দৌড়াতে আরম্ভ করল একজায়গাতেই। ফুটপাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে যেসব মানুষ, তারা কী ভাবছে না-ভাবছে, সেটা নিয়ে মিনিট দশেক আগেও মাথা ঘামাত সে। কিন্তু এখন আর ঘামাচ্ছে না। ঠাণ্ডায় রীতিমতো জমে যাওয়ার দশা ওর। শরীর গরম করার জন্য যদি কিছু না করে, তা হলে একটা মানব-আইসক্রিমে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না।

লোকটাকে আবারও দেখতে পেল এমন সময়।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ১৯৮

রাস্তার সেই কোনায়, মেয়েটার ঠিক সামনে হাজির হয়েছে ওই লোক। নিজের গাড়িটা নিয়ে যেন পিছলে ঢুকে পড়েছে ফেডএক্সের একটা ট্রাক আর জরাজীর্ণ একটা এসইউভি'র মাঝখানে। চালু করে দিয়েছে গাড়ির ফ্ল্যাশার।

দরজার হাতল ধরে টান মারল ল্যারিসা। খুলে ফেলল দরজাটা। উঠে পড়ল গাড়ির ভেতরে, ধপাস করে বসে পড়ল সিটে। লাগিয়ে দিল দরজা। হিটারের ভেন্টের কাছে নিয়ে গেল হাত দুটো। ‘আপনি বিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছেন। আমি আরেকটু হলে চলেই যেতাম।’

কালো নিট ক্যাপের একটা কোনা চুলকাল ওই লোক। দেখলে মনে হয়, লোকটা টেকো। কিন্তু সে যখন হ্যাট পরে আছে, তখন ওই কথা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। ‘কাগজপত্র নিয়ে এসেছ?’

মাথা ঝাঁকাল ল্যারিসা। পকেট থেকে বের করল কিছু প্রিন্টআউট। ‘কীভাবে কাজ করবেন আপনি, একটু বলুন তো?’

পাতলা একটা হাসি দেখা দিল ওই লোকের মুখে। একটা ক্লিপবোর্ডের সঙ্গে আটকে দিচ্ছে ওসব কাগজ। কাজ শেষ হলে বোর্ডটা ছুঁড়ে মারল গাড়ির পেছনের-সিট লক্ষ করে। ‘যে-প্রতিযোগিতায় জিতেছ তুমি, তার ফলে একটা লেসন বিনা-পয়সায় পাবে। যদি চালিয়ে যেতে চাও কাজটা, চার শ’ ডলার লাগবে। ওই টাকা দিয়ে কিনতে পারবে ত্রিশ ঘণ্টার ক্লাস ইন্সট্রাকশন, সেই সঙ্গে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে কাটাতে পারবে আট ঘণ্টা। এই ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে, ওই নিয়মই মানতে হবে তোমাকে। সাত শ’ ডলার থেকে শুরু করে আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে আমাদের। তবে সেটা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য... যেমন প্যারালাল পার্কিং অথবা লিখিত পরীক্ষায় কী কী প্রশ্ন আসবে, সেসব।’

‘প্রতিবার তা হলে এখান থেকেই আমাকে তুলে নেবেন আপনি?’

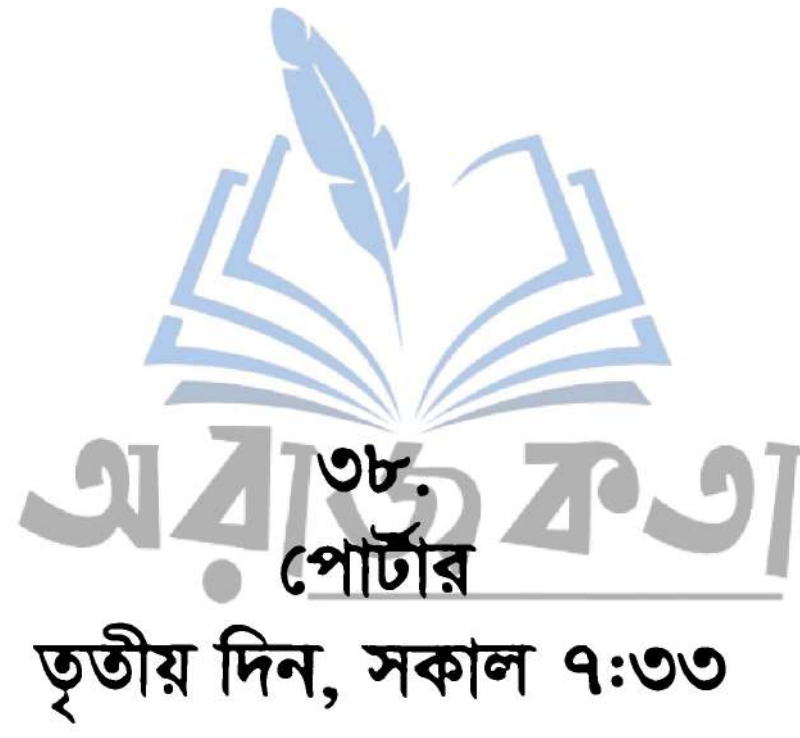
মাথা ঝাঁকাল লোকটা। ‘আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সারা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নিই। শহরের মধ্যে যে-কোনো জায়গায় তোমাদেরকে নামিয়েও দিতে পারবো আমরা। শেষপর্যন্ত ড্রাইভিংয়ের কাজটা কিন্তু করতে হবে তোমাদেরকেই।’

বিনয়ের হাসি হাসল ল্যারিসা। ছাত্র-ছাত্রী অর্থাৎ স্টুডেন্ট উচ্চারণ করার সময় “এস” এবং শহর অর্থাৎ সিটি উচ্চারণ করার সময় “সি”-তে একটু সমস্যা হয়েছে ওর ইন্সট্রাক্টরের।

‘কম্প্লিমেন্টারি যেসব লেসন আছে, সেগুলো দিয়েই তা হলে শুরু করি আমরা?’

বুকের ওপর সিট বেল্ট বেঁধে নিল ল্যারিসা। ‘আমি প্রস্তুত।’

দেখল, স্টুডেন্ট ড্রাইভার লেখা একটা প্ল্যাকার্ড ড্যাশবোর্ডের ওপর বসিয়ে দিল লোকটা, তারপর নেমে পড়ল গাড়ির শ্রোতে। ওই প্ল্যাকার্ড বসানোর কাজটা হাস্যকর বলে মনে হলো মেয়েটার। কারণ গাড়ির বডিতে প্রায় সবজায়গায় রঙের সাহায্যে লেখা আছে কথাটা।



অরলিস প্যারিশ প্রিজনের কক্ষিটের নাড়িভুঁড়ির অনেক ভেতরে, ওয়ার্ডেনের অফিসের বাইরে, একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে পোর্টার। হোটেল থেকে হেঁটে হাজির হয়েছে এই জায়গায়। সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, শহরের এই এলাকায় রাতের বেলায় আসাটাই ভালো।

প্রধান দরজার কাছে যখন হাজির হয়েছিল সে, কেমন একটা ক্লান্তি আর উদাসীনতা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল একজন গার্ড। পোর্টার কিছু বলার আগেই মুখ খুলেছিল লোকটা। রীতিমতো চৈঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত দেখা করা যাবে কয়েদিদের সঙ্গে। ভিজিটর গেটগুলোর অবস্থান কোথায় কোথায়, জানিয়ে দিয়েছিল সেটাও। লোকটার হাতে শিকাগো মেট্রোর একটা বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দেয় পোর্টার। এখানে আসার উদ্দেশ্য কী ওর, জানিয়ে দেয় সেটা। গার্ড আর তখন কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, এমনকী পোর্টারের ব্যাজও দেখতে চায়নি। জেলখানার সিকিউরিটি যখন পার হচ্ছিল পোর্টার, গার্ডকে বলেছিল, নিজের পিস্তলটা রেখে এসেছে হোটেল রুমে। সে সত্যি নাকি মিথ্যা বলছে, পরখ করার জন্য জেলকর্তৃপক্ষের কেউ যদি তখন ফোন করত শিকাগো মেট্রোতে, তা হলেই সব খেল খতম হয়ে যেত ওর। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে কোনো উপায় ছিল না... সে একরকম নিরুপায়। সাধারণ কোনো নাগরিক হিসেবে যদি আসত এখানে, ওকে ঢুকতে দেয়া হতো না ভেতরে।

অরলিস প্যারিশ প্রিজনের দেয়ালগুলো সিঁড়ার ব্লকে নির্মিত। অনুজ্জ্বল সাদা রঙ করা আছে সেসব জায়গায়। পর পর কয়েকটা হলওয়ে পার হতে হয়েছিল পোর্টারকে। পার হতে হয়েছে চড়াই-উৎড়াইয়ের মতো উঁচু-নিচু কিছু জায়গা। কোন দিকে যাচ্ছে আসলে, ঠাহর করে নিতে সময় লেগেছিল ওর। জেলখানার ভেতরের বাতাস বন্ধ। অস্বাস্থ্যকর। এখানে জুতো পরে হাঁটলে স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। পোর্টার বুঝে নিয়েছিল, জমিনের অনেক নিচে হাজির হয়েছে সে। যে-গার্ড পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল পোর্টারকে, সে জানিয়েছে, ওয়ার্ডেনের অফিসে যাওয়ার শর্টকাট একটা রাস্তা আছে। এবং সেটা হচ্ছে, জেলখানার এই “নাড়িভুঁড়ির” মধ্য দিয়ে যাওয়া। আবদ্ধতার অনুভূতি কখনও পেয়ে বসেনি পোর্টারকে। কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারছিল, লম্বা একটা সময় যদি কাটায় এই জেলখানার ভেতরে, বিশেষ সেই অনুভূতি পেয়ে বসবে ওকে। এখানে কাজ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না সে। কল্পনা করতে পারে না, প্রতিটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে এ-রকম কোনো জায়গায়। ইস্পাতনির্মিত প্রতিটা দরজার কাছে যখনই হাজির হয়েছে ওরা, অপেক্ষা করতে হয়েছে; তারপর একসময় ভেঁ আওয়াজ তুলে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২০০

খুলে গেছে ওই দরজা, ভেতরে ঢুকতে পেরেছে ওরা। সিকিউরিটি ক্যামেরার ফাঁপা দৃষ্টি অনুভব করতে পেরেছে পোর্টার। প্রতি বিশ ফুট কিংবা তার কিছু বেশি দূরত্ব পর পর ও-রকম ক্যামেরা বসানো আছে একটা করে।

বিশেষত্ব আছে জেলখানার করিডরগুলোতেও... প্রতি প্রায় দশ ফুট পর পর বসানো হয়েছে একটা করে দরজা। পুরনো কোনো সাই-ফাই সিনেমায় দেখা এয়ারলক অথবা ডিকন্টামিনেশন চেম্বারের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল পোর্টারের। একটা করিডরের শেষমাথায় দেখা পাওয়া গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের। এখানকার দেয়ালও সিঁড়ার ব্লকে নির্মিত। দরজা ইস্পাতের। তবে বিরল কিছু দৃশ্যও আছে... বহুল ব্যবহৃত রাগের দেখা পাওয়া গেল মেঝেতে। প্লাস্টিকের ফার্নগাছ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে কয়েকটা কোনা। অনুর্বর কোনো জমিনে সভ্যতার ছোঁয়া পাওয়া মরুদ্যান যেন।

ইশারায় পোর্টারকে ওই বেঞ্চ দেখিয়ে দিয়েছিল গার্ড। ‘ওয়ার্ডেন আছেন কাছেপিঠেই, তবে রাউন্ডে গিয়েছেন। চলে আসবেন শীঘ্রই। ততক্ষণ বসে থাকুন।’

এই ঘটনা মিনিট ত্রিশেক আগের।

বিভিন্ন কোনা থেকে ছ’টা সিকিউরিটি ক্যামেরা তাকিয়ে আছে এই ঘরের দিকে। সেগুলোর কোনো কোনোটা ঘুরছে। কোনোটা আবার স্থির হয়ে আছে। কিন্তু পোর্টারকে দেখছে সবগুলোই।

‘ডিটেকটিভ পোর্টার?’

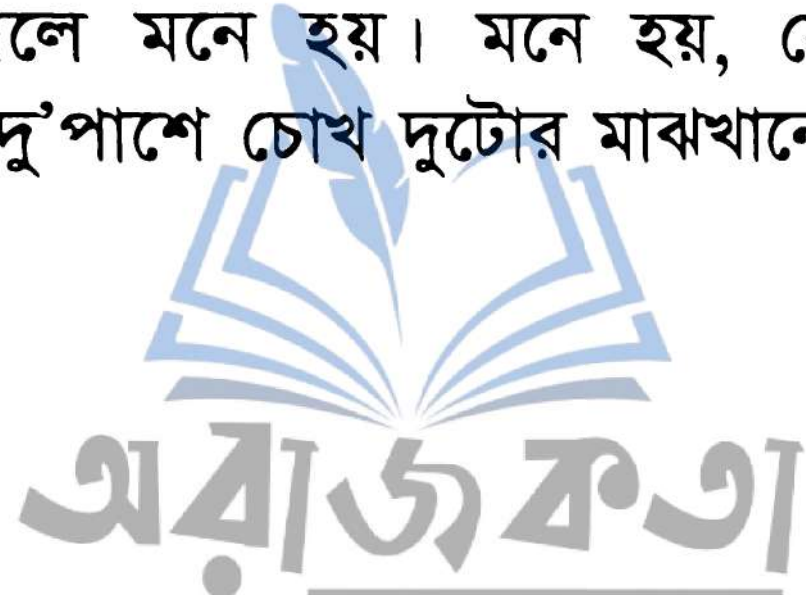
কাউকে আসতে শোনেনি পোর্টার। তারপরও ওই লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর থেকে চার ফুটেরও কম দূরত্বে। ‘হ্যাঁ।’

‘আমি ওয়ার্ডেন ভিনা। ঠিক কী কারণে আপনাকে হাজির হতে হলো আমাদের এই একটুকরো স্বর্গে, বলুন তো?’

‘আপনাদের একজন কয়েদির সঙ্গে দেখা করা দরকার আমার।’

‘দেখাসাক্ষাতের এই যে ব্যাপারটা, এটা নিয়ে গত দশ বছরেও কখনও কাজ করতে হয়নি আমাকে। এবার বুঝুন এই জেলখানা কেমন একটা জায়গা। যা হোক, আমাদের এখানে ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয় সকাল ন’টা থেকে। কোথায় কীভাবে যেতে হবে, সেটা আমার অফিস থেকে বের হলেই দেখতে পাবেন। আপনার কাজে দখল দেয়ার কোনো দরকারই নেই আমার।’

ওয়ার্ডেন লোকটা পোর্টারের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো হবে। চাঁদির দিকে তাকালে মনে হয়, লোকটার চুল ধূসর হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। তারপর থেকে নিয়মিত নিখুঁতভাবে চাঁদি কামিয়ে রাখে সে। নাকটা দেখলে ভাঙা বলে মনে হয়। মনে হয়, সেটা মেরামত করা হয়েছে কয়েকবার। সে-নাকের দু’পাশে চোখ দুটোর মাঝখানে দূরত্ব বেশি না। লোকটার



ঘাড়ে একটা কাটাদাগ আছে... বেশি গভীর না, বরং চিকনই বলা চলে। গোলাপি হয়ে গেছে। পরনে নীল রঙের শার্ট। সেটার কলারের আড়ালে গায়েব হয়ে গেছে ওই দাগ। মানুষটা গাঁটাগোঁটা। আত্মবিশ্বাস আছে। তার দু'চোখ যেন আঠার মতো সঁটে গেছে পোর্টারের চোখের সঙ্গে। সেই চোখে একজন জেলরক্ষকের দৃষ্টি।

‘আমাদের বিশ্বাস করার মতো উপযুক্ত কারণ আছে, আপনাদের এই বিশেষ কয়েদির সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে ফোর মাস্কি কিলারের।’

‘ও, আপনিই তা হলে ডিটেকটিভ পোর্টার?’

‘হ্যাঁ, আমিই ডিটেকটিভ পোর্টার।’

‘টিভিতে আপনাদের সেই কেসের বিবরণ নিয়মিত দেখছিলাম আমি। ওই লোক একটা পাগল। যোগসূত্রের কথা বললেন... কীসের যোগসূত্র?’

‘কিছু মনে করবেন না... সেটা বলার মতো স্বাধীনতা এই মুহূর্তে নেই আমার।’

‘ঠিক আছে, তা হলে আমারও মনে হয় না, আমাদের বিশেষ কোনো একজন কয়েদির সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে দেয়ার মতো স্বাধীনতা আছে আমার।’

‘সেক্ষেত্রে একটা ওয়ার্যান্ট নিয়ে ফিরে আসতে হবে আমাকে,’ বলল পোর্টার।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ার্ডেন। ‘প্লিজ, সেটাই করুন তা হলে। এবং সেই ওয়ার্যান্ট নিয়ে যখন আসবেন আবার, ভিজিটর গেটের গার্ডকে সেটা দেখাতে ভুলবেন না।’ ঘুরল লোকটা, রওয়ানা হলো নিজের অফিসের দরজার উদ্দেশে। ‘নিউ অরলিন্সে আপনার সময় উপভোগ করুন, ডিটেকটিভ।’

‘এমনও হতে পারে, আমি যে-মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি, ফোর মাস্কি কিলারের মা সে,’ বলল পোর্টার। ‘আমার এই সাক্ষাৎ, আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে রাখতে হবে এটা। সংবাদমাধ্যম যদি ছিটেফোঁটা আভাস-ইঙ্গিতও পায়, একমাত্র যে-সূত্র আছে আমাদের হাতে, সেটাও জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। আপনার সাহায্য দরকার আমার, ওয়ার্ডেন।’

দরজা আর কিছুটা দূরে ছিল, এমন অবস্থায় থেমে দাঁড়াল ওয়ার্ডেন। মাথা নাড়ছে। ‘আমি আশা করেছিলাম, এই উইকএন্ডটা চমৎকার কাটবে আমার। আশা করেছিলাম, শান্তিতে কাটাতে পারবো সময়টা। আপনাকে সাহায্য করাটা কিন্তু চমৎকার কোনো কাজ না। শান্তির কোনো কাজও না।’

‘তবে ওই কাজ যদি করেন আপনি, কয়েকজন মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারবেন, ওয়ার্ডেন। আমার শুধু ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলা দরকার।’

পোর্টারের দিকে তাকাল ওয়ার্ডেন। ‘মহিলার নাম কী?’

একটা মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল পোর্টার। বড়শিতে গঁথে ফেলেছে সে ওই লোককে, চায় না ছুটে যাক লোকটা। ‘আমি নিশ্চিত না। তার বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ, তা-ও জানা নেই আমার।’

দাঁত দেখা গেল ওয়ার্ডেনের। ‘ডিটেকটিভ, আমাদের এখানে হাজার দু’-এক কয়েদি আছে। ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা আসার আগে ছিল ছ’হাজার পাঁচ শ’র মতো। কয়েদিদের কেউ কেউ গুরুতর কোনো অপরাধের বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। কারও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আবার অত গুরুতর কিছু না... ট্রাফিক আইন ভাঙা, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করা ইত্যাদি। বাকি কয়েদিরা এখানে আছে লুইজিয়ানা ডিপার্টমেন্ট অভ কারেকশন্সের পক্ষ থেকে। কাউকে কাউকে আবার দীর্ঘদিন আটকে রাখার হুকুম জারি করে এখানে পাঠিয়েছে সরকার। বলুন তো, যে-কয়েদির নামই জানা নেই আপনার, তাকে খুঁজে বের করবেন কী করে?’

পকেট থেকে সেই ফটোটা বের করল পোর্টার। ওয়ার্ডেনের হাতে দিল। ‘আমার কাছে এই একটা জিনিসই আছে।’

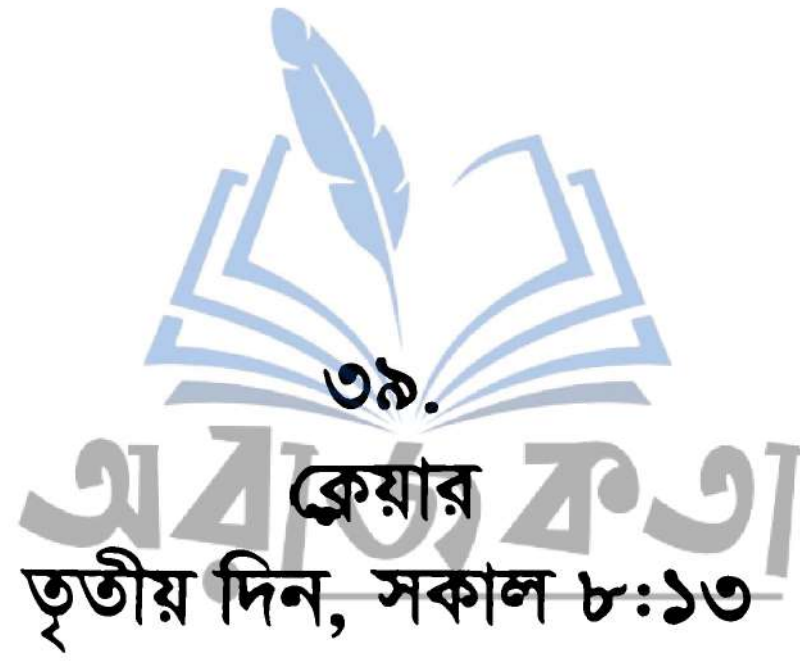
ছবিটা হাতে নিল ওয়ার্ডেন। পকেট থেকে বের করল চশমা। উল্টাল জিনিসটা। ছবির পেছনদিকে লেখা মেসেজটা পড়ল। তারপর আবার তাকাল ধূসর-হয়ে-আসা সেই ছবির দিকে। ‘এই গেট তো পশ্চিম দিকেরটা,’ বলল, ভালোমতো দেখছে ছবিটা।

বিশপের মায়ের আগে আগে হাঁটছে যে-গার্ড, ইঙ্গিতে তাকে দেখিয়ে দিল পোর্টার। ‘সে...’

‘ভিনসেন্ট উইডনার,’ বলল ওয়ার্ডেন। ‘চিনতে পেরেছি আমি।’

‘হতে পারে, উইডনার চিনতে পারবে ওই মহিলাকে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়ার্ডেন। ‘আসুন আমার সঙ্গে।’ মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন অফিসের দরজাটা। ‘দেখি কী করতে পারি আমি।’



ডেস্কের কোনায় রাখা ক্রেয়ারের মোবাইল ফোন বাজছে। ওটা ছোঁ মেরে তুলে নিল সে। অ্যাক্সেন্ট বাটনে চাপ দিল। ‘ডিটেকটিভ নটন।’

‘ডিটেকটিভ? আমি সার্জেন্ট ডন স্পিগেল। নাইন ওয়ান ওয়ান ডেস্কের দায়িত্বে আছি।’

‘আপনার জন্য কী করতে পারি আমি, সার্জেন্ট?’

‘কয়েক মিনিট আগে আমার একজন অপারেটর খুব অদ্ভুত একটা কল রিসিভ করেছে। আমার ধারণা, আপনার কেসের সঙ্গে এই ব্যাপারটার যোগসূত্র থাকতে পারে। কলটা রেকর্ড করেছি আমরা। আপনাকে শোনাবো?’

আরেকটা হারিয়ে-যাওয়া মেয়ের খবর যেন না হয়। মনে মনে প্রার্থনা করল ক্রেয়ার। মুখে বলল, ‘হ্যাঁ, শোনান।’

‘একটু লাইনে থাকুন। আপনাকে স্পিকারে দিচ্ছি আমি,’ বলল সার্জেন্ট।

মৃদু একটা খটাখট শব্দ শুনতে পেল ক্রেয়ার। কল্লনার চোখে দেখতে পেল, ওই প্রান্তের মহিলাটা ফোন নামিয়ে রাখছে। ‘এই যে, চালু করলাম।’

‘নাইন ওয়ান ওয়ান। আপনার ইমার্জেন্সিটা কী, বলুন।’ অপারেটরকে বলতে শুনল ক্রেয়ার।

কিছুক্ষণ দ্বিধা করল কেউ একজন। তারপর বয়স্কা এক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠটা ধীর গতির। কেমন যেন খসখসে। ‘লোকটা দু’বার মারা গেছেন।’

‘আমি দুঃখিত, ম্যা’ম। আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।’

‘দু’বার মারা গেছেন লোকটা,’ বলল বয়স্কা ওই মহিলা। এবার আগের চেয়ে জোরালো হয়েছে গলার আওয়াজ। জরুরি একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অপারেটর, শোনা গেল সেটা। ‘কে, ম্যা’ম? কে মারা গেছেন দু’বার?’

‘ফ্রয়েড রেনল্ডস।’

উঠে দাঁড়াল ক্রেয়ার। এগিয়ে গেল এভিডেন্স বোর্ডের দিকে।

ফ্রয়েড রেনল্ডস

স্ত্রী: লিয়ান রেনল্ডস

কাজ করতেন ইউনিমেড আমেরিকা হেল্থকেয়ারে, বীমার বিক্রয়প্রতিনিধি ছিলেন
কোনো ঋণ নেই? তাঁর স্ত্রী তা-ই বলেছেন।

হসম্যান চেক করে দেখছে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২০৪

শেষ লাইনটার নিচে ক্লেয়ার লিখল:

পাতলা একটা তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে
(পিয়ানো?)

তাঁর নিজের বাসার বাইরে (গাড়িতে)
মরদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটা স্লোম্যানের ভেতরে
এলা রেনল্ডসের বাবা

‘কে, ম্যা’ম?’ আবার জিজ্ঞেস করতে শোনা গেল অপারেটরকে।

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা ওই বয়স্কা মহিলার। ‘ফ্রয়েড রেনল্ডস। গত সপ্তাহে মারা গেছেন তিনি। আরও একবার মারা গেলেন গতকাল। আজকের শোকবার্তায় তাঁর মৃত্যুর খবর পড়লাম।’

‘ম্যা’ম, আপনি কি বুঝতে পারছেন, ইমার্জেন্সি সার্ভিসে ভুয়া কল করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে চতুর্থ শ্রেণির গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনা হতে পারে?’

‘কোনো মানুষই কিন্তু দু’বার মারা যায় না।’

‘চতুর্থ শ্রেণির গুরুতর অপরাধের শাস্তি কী, জানেন? এক থেকে তিন বছরের কারাদণ্ড। সঙ্গে পঁচিশ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা। কেউ যদি নাইন ওয়ান ওয়ানে ভুয়া কল করে, তা হলে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে। একই অবস্থা হতে পারে ইমার্জেন্সি রেসপন্ডারদেরও। নষ্ট হতে পারে জনগণের সম্পদও,’ অপারেটর জ্ঞান দিচ্ছে ওই মহিলাকে।

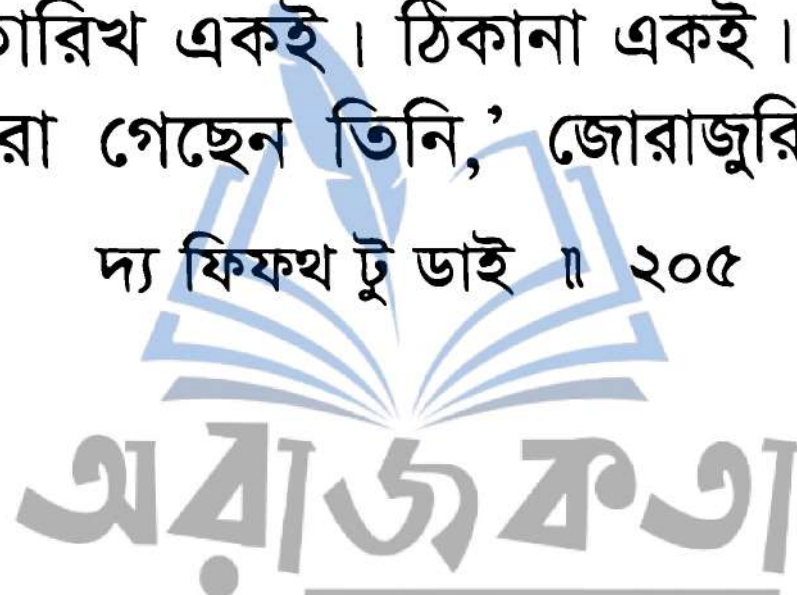
‘দেখুন, আমি আসলে সতর্ক করে দেয়ার জন্য ফোন করেছি। যদি ভুল জায়গায় ফোন করে থাকি, তা হলে উপযুক্ত ডিপার্টমেন্টে আমার কলটা ট্রান্সফার করে দিন।’

একটা ক্লিক শব্দ শোনা গেল। ক্লেয়ার প্রথমে ভাবল, অপারেটর লাইন কেটে দিয়েছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই তার কণ্ঠ শোনা গেল। তার মানে সে নিশ্চয়ই মিউট করে দিয়েছিল ওই কল।

‘ফ্রয়েড রেনল্ডস নামটা কিন্তু সাধারণ, ম্যা’ম। কাজেই আমি নিশ্চিত, আপনি যে-ঘটনার কথা বলছেন, সেটা নিছকই কাকতালীয়। আমি চাই না, আপনি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ুন। আর তাই এখন লাইনটা কেটে দেবো। আপনার প্রতি উপদেশ, এই একই ব্যাপার নিয়ে আবার ফোন করবেন না। যদি করেন, খুব সম্ভব আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে।’

‘নাম একই। জন্মতারিখ একই। ঠিকানা একই। সুতরাং আমি একই লোকের কথা বলছি। দু’বার মারা গেছেন তিনি,’ জোরাজুরি করছে বয়স্কা ওই মহিলা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২০৫



অরাজকতা

‘যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো আজকের শিকাগো একজামিনার দেখে নিতে পারেন।’

ঠিক এই মুহূর্তে কেটে দেয়া হলো লাইন।

ক্রেয়ার গুনতে পেল, সার্জেন্ট স্পিগেল তুলে নিল ফোনটা। স্পিকার বন্ধ করে দিল। ‘আমাদের সেই অপারেটর লাইন কেটে দিয়েছিল। তারপর সে সতর্ক করে দিয়েছিল অন্য কয়েকজন অপারেটরকে। বলেছিল, ওর বিশ্বাস, বিশেষ ওই ফোনকল আসলে পাগলাটে কোনো মহিলার কাজ। আমাদের স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি হচ্ছে, মেকি কোনো কল যদি আসে তা হলে সেটা ট্রেস করা, তারপর যদি বার বার একই ফোন করা হয়, তা হলে মেট্রো পুলিশের সাহায্য নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা। যে-পত্রিকার কথা বলা হয়েছে, সেটার অনলাইন সংস্করণে ঢুকলাম। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, শোকবার্তায় দু’বার এসেছে ফ্রয়েড রেনল্ডসের নাম। আজকের সংস্করণে একবার। আর গত বুধবারের সংস্করণে আরেকবার। শনাক্ত করার জন্য যত রকমের তথ্য ছিল, সব মিলে গেছে। একই লোক।’

ড্রা কুঁচকে গেছে ক্রেয়ারের। ‘কীভাবে সম্ভব সেটা? লোকটা গতকাল মারা গেছেন।’

‘আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস কী? লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।’

৪০.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, সকাল ৮:১৬

‘ওটা কি...?’

‘হ্যাঁ, নিকোলাজ কেজ,’ বলল ওয়ার্ডেন। নিজের অফিসে নিয়ে এসেছে পোর্টারকে। তার ডেস্কের বাঁ দিকে, দেয়ালে ঝুলছে ওই হলিউড তারকার ছবি। ‘২০১১ সালের এপ্রিল মাসে আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন তিনি। স্থানীয় একটা খাবারের-দোকানে মারামারি করেছিলেন। সেখানকার একটা জানালাও ভেঙেছিলেন। ক্যামেরা যে চলছে না, সেটা মাঝেমধ্যে ভুলে যান তাঁর মতো হলিউডের অভিনেতারা। যা হোক, তিনি যে এখানে ছিলেন, সেটা কিন্তু উপভোগ করেছেন। আর তাই এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার এক মাস পর আবার এসেছিলেন। সেবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অতিরিক্ত মদ্যপান। এবং তারপর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। আমরা ছেড়ে দিতাম ব্যাপারটা। কিন্তু তিনিই তখন জোরাজুরি করতে থাকেন অফিসারদেরকে। কাজেই তাঁকে খেপ্তার না করে আর কোনো উপায় ছিল না তাদের। তিনি অনেক বড় একজন অভিনেতা। কন এয়ার ছবিতে যে-অভিনয় করেছেন তিনি, সেটা খুব ভালো লেগেছে আমার।’

‘কন এয়ার মানে শন কনারির সঙ্গে যে-ছবি তিনি করেছিলেন, সেটা?’

জবাব না দিয়ে একটা আঙুল উঁচু করল ওয়ার্ডেন, ফোন কানে ঠেকাল। ‘ওয়ার্ডেনের অফিসে উইডনারকে পাঠিয়ে দাও,’ বলল রিসিভারে। এক মুহূর্ত পর পোর্টার শুনতে পেল, ওয়ার্ডেনের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জেলখানার ইন্টারকম সিস্টেমে।

‘শন কনারির সঙ্গে যে-ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি, সেটার নাম দ্য রক,’ পোর্টারকে বলল ওয়ার্ডেন, ফোন নামিয়ে রেখেছে। ডেস্কের সামনে কয়েকটা খালি চেয়ার আছে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সেগুলো। ‘আমাদের এই জেলখানায় সেলিব্রেটিরা প্রায়ই আসেন। এই শহরটা একটা পার্টি টাউন তো, তাই। আমরা তাঁদেরকে দু’-একদিন এখানে রেখে ছেড়ে দিই। কারও সহায়-সম্পত্তির যদি কোনো ক্ষতি না হয়, অথবা কেউ যদি আহত না হয়, তা হলে অত গুরুতর অভিযোগ দায়ের করারও কোনো দরকার হয় না। মদ খেয়ে যারা মাতাল হয়ে যায়, তাদের সবাইকে যদি ধরে নিয়ে এসে জেলে ঢুকাই, এই জেলখানা ভর্তি হয়ে যেতে এক সপ্তাহ সময়ও লাগবে না।’

দরজায় টোকা দেয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

মুখ তুলে তাকাল পোর্টার। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ভিনসেন্ট উইডনারকে... সেই ছবিতে দেখেছিল। জেলখানার বেশিরভাগ গার্ডের চুল যতখানি লম্বা থাকে,

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২০৭



অরাজকতা

ওই লোকের গাড়ি রঙের চুল তার চেয়ে কিছুটা লম্বা... ঝুলে আছে শার্টের কলারের কিছুটা ওপরে। খুঁতনিতে একটুখানি দাড়ি আছে, ছোট করে ছেঁটে রেখেছে। গলায় একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। সেটা ইঞ্চি দু'-একের মতো লম্বা। খুঁতনির নিচে এসে শেষ হয়েছে। পোর্টার অনুমান করে নিল, ওই দাগ কয়েক বছরের পুরনো হবে। কেটে যাওয়ার দাগ... পেশাদার কোনো শল্যবিদের কাটাছেঁড়া না। কোনো ছুরি অথবা ভাঙা কাচের কারণে তৈরি হয়েছিল ক্ষতটা। নিজের পায়ের সেই দাগের কথা মনে পড়ে গেল পোর্টারের। সেখানে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছিল বিশপ। এখন চুলকাচ্ছে জায়গাটা। জোর করে নিজেকে সংবরণ করল পোর্টার।

ওর ওপর একটা মুহূর্তের জন্য স্থির হলো উইডনারের দৃষ্টি। তারপর সে নজর ফেরাল উইডনারের দিকে। 'গুড মর্নিং, স্যার। কী করতে পারি আপনার জন্য?'

অন্য একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিল ওয়ার্ডেন ইঙ্গিতে। বসে পড়ল উইডনার। তার নড়াচড়া কেমন যেন ধীরস্থির। জেলখানায় যারা গার্ডের দায়িত্ব পালন করে, তারা সবসময়ই কেমন যেন সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করে। প্রতিটা পদক্ষেপের আগে যেন যাচাই-বাছাই করে দেখে সব রকমের পরিস্থিতি। অন্তত ভালো গার্ডেরা তা-ই করে। বাকিরা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে... এই বুঝি মার খেতে হলো কোনো কয়েদির হাতে। উইডনারের সেই দাগের কথা মনে পড়ে গেল পোর্টারের। লোকটাকে কোন শ্রেণিতে ফেলা যায়... ভালো গার্ড নাকি খারাপ গার্ড... নিশ্চিত হতে পারল না সে।

'উনি শিকাগো মেট্রোর একজন ডিটেকটিভ। নাম স্যাম পোর্টার। একটা বর সন্ধান পেয়েছেন তিনি। সেটা অনুসরণ করে হাজির হয়েছেন এখানে। এদের সাহায্য চাইছেন,' বুঝিয়ে বলল ওয়ার্ডেন। মাথা ঝাঁকাল পোর্টারের দিকে। 'ফটোটা আছে না আপনার কাছে?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ওই ফটো বের করল পোর্টার। দিল উইডনারের হাতে। ছবিতে দু'জন গার্ডের মাঝখানে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে একজন মহিলাকে। 'একে চেনেন?'

মাথাটা ডানদিকে একটুখানি কাত করল উইডনার। 'সে তো ডো।'

'সে কী?'

'ডো। অপরিচিত কোনো পুরুষমানুষকে আমরা বলি জন ডো। আর অপরিচিত মেয়েমানুষকে বলা হয় জেন ডো। এই মহিলার পুরো নম্বর হচ্ছে জেন ডো ২১৩৮,' বলল উইডনার। পোর্টারের হাতে ফিরিয়ে দিল ছবিটা। 'আপনার ব্যাপারটা আসলে কী, বলবেন?'

কম্পিউটারের কিবোর্ডটা নিজের আরেকটু কাছে টেনে নিল ওয়ার্ডেন। দু'হাতের দুই তর্জনী কাজে লাগিয়ে টাইপ করছে। 'জেন ডো নম্বর ২১৩৮। এ-বছরের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে আমাদের এখানে এসেছে মহিলা। তার মানে আজ তিন সপ্তাহের কিছু বেশি হলো। সাজাপ্রাপ্ত আসামি। এবং নিজের অপরাধ

স্বীকার করে নিয়েছে সে। রায় কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় আছে। প্রতারণার মাধ্যমে আরেকজনকে ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আছে ওই মহিলার বিরুদ্ধে। ঘটনাটা ঘটেছে বারবনে।’

‘এ-রকম কোনো ঘটনার বেলায় আপনাদের সেই ধরে-আনলাম-আর-ছেড়ে-দিলাম নীতিটা নিশ্চয়ই কাজ করবে না, না?’ বলল পোর্টার।

কম্পিউটারের স্ক্রিনে জ্বল করছে ওয়ার্ডেন। ‘এক লোকের ওয়ালেট চুরি করেছিল ওই মহিলা। সেটার ভেতরে ছিল... ধেং!’

‘কী?’

‘ওই লোকের ওয়ালেটে ছিল মাত্র পাঁচ শ’ বারো ডলার,’ বলল ওয়ার্ডেন। পাঁচ শ’ ডলারের বেশি কোনো টাকা চুরি করলে অরলিন্স প্যারিশে সেটা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। আপাতত যা মনে হচ্ছে, কম করে হলেও দু’বছর জেলখানায় কাটাতে হবে ওই মহিলাকে। সময়টা আরও বেশিও হতে পারে... যদি এই অপরাধ তার প্রথম অপরাধ না হয়ে থাকে। আরেকটা কথা। ওই মহিলা কিন্তু এখনও তার নামটা বলেনি।’

‘ফিঙ্গারপ্রিন্ট? সেটা নিশ্চয়ই মিলে গেছে কোনো না কোনো ডেটাবেসের সঙ্গে?’

মাথা নাড়ল ওয়ার্ডেন ভিনা। ‘কোনো ডেটাবেস সিস্টেমেই নেই ওই মহিলার ফিঙ্গারপ্রিন্ট। না আমাদের সিস্টেমে, না ন্যাশনাল সিস্টেমে। তবে একটা শনাক্তকরণ চিহ্ন আছে তার শরীরে। একটা ছোট ট্যাটু বলা যেতে পারে, কজিতে।’ মনিটরটা ঘুরিয়ে দিল যাতে ভালোমতো দেখতে পায় পোর্টার।

বড় বড় হয়ে গেছে পোর্টারের চোখ। ঝুঁকে পড়েছে ডেস্কের ওপর। ইংরেজি “এইট”-এর মতো ছোট একটা ট্যাটু দেখা যাচ্ছে। জ্যাকব কিটনারের কজিতেও এ-রকম একটা ট্যাটু পাওয়া গিয়েছিল... মানে, সেই লোক, যে কিনা মারা পড়েছিল একটা সিটি বাসের চাপায়। তখন ধরেই নেয়া হয়েছিল, আসল ফোর মাস্কি কিলারই মারা গেছে। এমোরি কনার্সের গায়েও সে-রকম একটা ট্যাটু ঐঁকে দিয়েছিল বিশপ।

‘ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করা দরকার আমার,’ বলল পোর্টার।

মনিটরটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল ওয়ার্ডেন। ‘অনুমতি নেয়ার দরকার হবে আমাদের। মহিলার একজন উকিল আছে।’

ড্র কুঁচকে গেল পোর্টারের। ‘যে-মহিলা নিজের নামটা পর্যন্ত জানায়নি, সে আবার উকিল পেল কী করে?’

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল উইডনার। ‘মহিলাকে যখন প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, তখন ঘটেছে ঘটনাটা। তাকে যখন বাস থেকে নামালাম আমরা, তারপর থেকে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হওয়ার আগপর্যন্ত টানা এক ঘণ্টারও বেশি সময় কিছুই বলেনি সে। যে-ডিটেকটিভ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল, তার

দিকে তাকিয়ে ছিল। লোকটার নাম ডানলেভি। মুখের কোনায় সারাটা সময় একটা হাসি ধরে রেখেছিল ওই মহিলা। এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে, এবং মাত্র তিনটা শব্দ উচ্চারণ করে: “উকিল সারা ওয়ার্নার”। তারপর আবার হেলান দেয় নিজের চেয়ারে। ভাঁজ করে ফেলে দু’হাত। হাসতে থাকে আবারও। ডানলেভি নিজের মেজাজ ঠিক রেখেছিলেন কীভাবে, জানি না আমি। তাঁর জায়গায় আমি থাকলে কিছুতেই করতে পারতাম না সেটা।’ বাজে কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে, সামলে নিল নিজেকে, তাকাল ওয়ার্ডেনের দিকে। তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়েছে ভিনা।

‘সারা ওয়ার্নার কে? স্থানীয় কেউ?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

‘সেটা ডানলেভিকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার,’ জবাবে বলল উইডনার।

নিজের ফোন স্পিকার মুড়ে দিল ওয়ার্ডেন। একটা নম্বর ডায়াল করল।

কর্কশ একটা কণ্ঠ জবাব দিল। ‘হ্যাঁ?’

‘ডানলেভি? আমি ওয়ার্ডেন ভিনা... অরলিন্স প্যারিশ প্রিজেন থেকে। আমার সঙ্গে আছেন শিকাগো থেকে আসা একজন ডিটেকটিভ। আরও আছে আমাদের এক গার্ড। কয়েক সপ্তাহ আগের একজন জেন ডো’র কথা মনে আছে আপনার? তার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন আমাদেরকে? ওই মহিলার উকিলের দায়িত্ব পালন করেছে সারা ওয়ার্নার।’

‘আরে ধেং! ওই খাচ্চোরটা আবারও?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডানলেভি। ‘মহিলার অপরাধের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলার নেই আসলে। ভুল মানুষের পকেট কাটতে গিয়েছিল সে। লোকটা পরে বলেছে, আগেও নাকি তার পকেট কাটা হয়েছিল। আর তাই রাস্তাঘাটে যখনই হাঁটত সে, মাথায় খেয়াল চাপলেই নিজের ওয়ালেটটা চেক করে দেখত। যা হোক, ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল মহিলাটা। এমন সময় ওই লোককে আলতো ধাক্কা মারে সে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার আঙুল চলে যায় পকেটে। টের পায়, ওয়ালেটটা নেই জায়গামতো। খপ করে মহিলার হাত চেপে ধরে সে। মহিলাও পাল্টা এক খামচি মেরে বসে ওই লোকের চেহারার একপাশে। চিৎকার করে আবোলতাবোল কী সব বলতে থাকে লোকটাকে। এই যেমন... “আমি আর যাবো না তোমার সঙ্গে, আমাকে যেতে দিতে হবে তোমার! তুমি আমাকে আঘাত করো বার বার, এ-রকম ঘটনা আর ঘটতে দেবো না! যথেষ্ট হয়েছে!” দৃষ্টি আকর্ষিত হয় স্থানীয় দুটো ছেলের। মনের সুখে মদ গিলছিল তারা। টলতে টলতে বেরিয়ে আসে পাব থেকে, টেনেহিঁচড়ে আলাদা করে ওই লোক আর মহিলাকে, তারপর ইচ্ছামতো পেটাতে শুরু করে লোকটাকে।’

‘ধেং!’ ওয়ার্ডেনের কণ্ঠে বিরক্তি।

‘লোকটার পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে যায়। তিনটা দাঁত খসে পড়ে। কালশিটে পড়ে যায় দু’চোখের নিচেই। তার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত। হয়নি, কারণ

তখন ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায় তার বউ। গলা ফাটিয়ে চৈঁচাতে থাকে।’ লম্বা করে দম নিল ডানলেভি। বলে চলল, ‘গুহামানবের অবস্থায় চলে গিয়েছিল ওই দুই ছেলে, দ্বিতীয় চিৎকারটা শুনে হুঁশ ফেরে। তাদের একজন, পকেটমার সেই মহিলা ভিড়ের মধ্যে গায়েব হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলে। এক ট্যুরিস্ট আবার দেখে ফেলে এই ঘটনা। ভাবে, ছেলেটা বোধহয় মারবে ওই মহিলাকে। সে তখন মহিলাকে বাঁচাতে এগিয়ে যায়, ফলে আরেকটু হলে ছেলেটার সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়ে গিয়েছিল তার। যা হোক, শেষপর্যন্ত হাজির হয় স্থানীয় পুলিশ, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেয়।’ হাত দিয়ে ফোন ঢাকল ডানলেভি, চিৎকার করে কিছু একটা বলল কোনো একজনকে। কী বলল, ঠাहर করতে পারল না পোর্টার। একটা মুহূর্ত পর আবারও শোনা গেল ডানলেভির কণ্ঠ। ‘যতক্ষণ পর্যন্ত না হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে আসা হয় ওই পকেটমার মহিলাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে নিয়ে গিয়ে ঢোকানো হয় একটা ইন্টারভিউ রুমে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ ছিল না আমার। যা হোক, আমাদের সেই কথোপকথনটা ছিল শুধু আমার পক্ষ থেকে। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু একটা কথাও বের করতে পারিনি ওই মহিলার পেট থেকে। শেষপর্যন্ত ওই উকিলের চালটা চালল সে।’

‘সারা ওয়ার্নার।’

‘হ্যাঁ, সারা ওয়ার্নার।’

চুপ হয়ে গেল ভিনা আর ডানলেভি দু’জনই। ওয়ার্ডেন লোকটা তাকাল পোর্টারের দিকে। মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। তারপর তাকাল ফোনের দিকে।

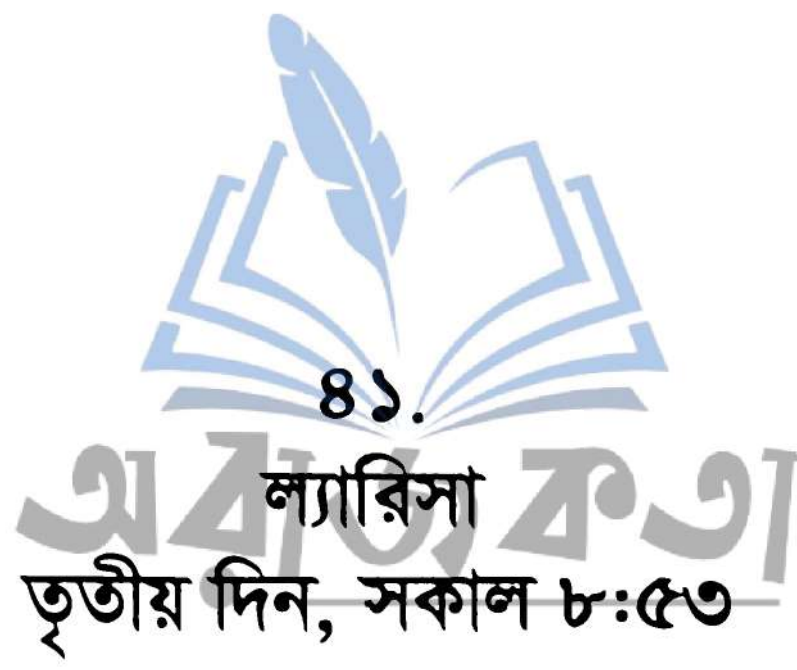
‘ধন্যবাদ, রিক। আবার যদি কোনোকিছুর দরকার হয় আমাদের, যোগাযোগ করবো আপনার সঙ্গে।’

‘ঠিক আছে।’

ওপ্রান্তে নিখর হয়ে গেল লাইনটা।

অফ বাটনে চাপ দিল ওয়ার্ডেন ভিনা। হেলান দিল চেয়ারে। ‘আপনাকে যে দেখা করিয়ে দেবো ওই মহিলার সঙ্গে, ব্যাপারটা মুশকিল হয়ে গেল। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে যদি দেখা করতে চান ওই মহিলার সঙ্গে, তা হলে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, আপনার সঙ্গে যাতে দেখা করতে রাজি হয় মহিলা, সে-ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার নামটা যাতে নিজের ভিজিটর লিস্টে তুলে দেয় সে। আর যদি একজন ডিটেকটিভ হিসেবে দেখা করতে চান, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই মহিলার উকিল ছাড়পত্র দিচ্ছে আপনাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না আপনি। যে-পদ্ধতিতেই এগোন না কেন, নিকট ভবিষ্যতে আপনার সামনে কোনো না কোনো বাধা হাজির হবেই।’

পোর্টার বলল, ‘সারা ওয়ার্নারের দেখা পাওয়া যেতে পারে কোথায়?’



অন্ধকার। রঙের ক্ষুদ্র কিছু কণা আর ধুলো যেন পাক খেয়ে খেয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। গড়ান খেল ল্যারিসা বিয়েল, হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল লেপটা, ওটা টেনে দিতে চায় মাথার ওপরে।

শনিবার।

আজ কোনো ক্লাস নেই।

কোনো ক্লাস নেই মানে, আজ শুধু ঘুমাবে মেয়েটা। কোনো স্কুল নেই মানে, পুরু লেপটার নিচে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে। সকাল গড়িয়ে গিয়ে আরও কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও শুয়ে থাকতে পারবে। যদি চায় তো তার চেয়েও বেশি সময় গড়াগড়ি করতে পারে বিছানায়। আজ কাজে গিয়েছেন ওর মা। বাসাটা তাই খালি। নিঃশব্দ। মেয়েটার মনে পড়ে গেল, আজ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওর... ওই ড্রাইভিং স্কুলে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যাতে মিস না হয়, সেজন্য অ্যালার্ম সেট করে রেখেছিল সে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেজে উঠবে ওটা। তবে ওই সময়ের আগ পর্যন্ত আরও একটু ঘুমানো যেতে পারে। আবারও হাত বাড়িয়ে দিল লেপটা নেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কিছুই ঠেকল না হাতে।

কেমন আজব কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে নিজের ঘরটাতে। একটা ইলেকট্রিক ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হচ্ছে... এটার সঙ্গে ঠিক পরিচিত না সে। কোথাও কোনো একটা যন্ত্র চলছে মনে হয়।

কিন্তু... ল্যারিসা তো আরও আগেই উঠে গিয়েছিল ঘুম থেকে।

বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

মনে পড়ে গেল, কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে হাজির হয়েছিল রাস্তার এককোণায়, দেখা করেছিল ওর ইন্সট্রাক্টরের সঙ্গে। উঠে পড়েছিল ওই লোকের গাড়িতে।

ম্যাট্রেসটা কেমন যেন ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। শব্দ লাগছে। বিছানা থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ আসছে।

‘দুধ খাবে নাকি? তোমার জন্য দুধ নিয়ে এসেছি আমি।’

কণ্ঠটা কোমল। কেমন একটা দ্বিধা আছে সে-কণ্ঠে। কোনো একজন অপরিচিত লোকের গলার আওয়াজ ওটা। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো, নিজের সে-অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগল ল্যারিসা। জোর করে খুলতে চেষ্টা করছে দুই চোখ। খুলতে পারল একসময়, পিটপিট করতে লাগল। খুব ভারী অনুভূত হচ্ছে চোখের পাতা। কেমন এক অদ্ভুত ক্লান্তি অনুভব করছে ওই জায়গায়। মনে হচ্ছে, একটা ব্যথা যেন লেপ্টে রয়ে গেছে সেখানে। মনে হচ্ছে,

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২১২

কেউ যেন গন্ধের ক্লাব দিয়ে সজোরে বাড়ি মেরেছে ওর মাথায়... দুমড়েমুচড়ে দিয়েছে মাথাটা।

‘দুধটুকু এখনও মনে হয় গরম আছে। তবে গরমই ভালো। গরম দুধ ভালো লাগে আমার।’

ওই যে... অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে ল্যারিসার সেই ইস্ট্রাক্টর। ছুরি ঢোকানোর কায়দায় ওই মেয়ের শরীরে কিছু একটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল লোকটা। মেয়েটা যেইমাত্র সিট বেল্ট বেঁধেছিল, ঠিক তার পর পরই। এবং সেটা ঢোকানো হয়েছিল ওই মেয়ের উরুতে। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করেছিল মেয়েটা। এবার মনে পড়ে গেল, নিচের দিকে তাকিয়েছিল বেচারী। সুঁইওয়ালা একটা সিরিঞ্জ নজরে পড়েছিল ওর। অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, ওই সিরিঞ্জের প্লাঞ্জারে চাপ দিচ্ছিল প্রশিক্ষক লোকটা।

এই ঘটনার পর আর কিছু মনে নেই।

ঠাহর করতে পারল, কোনো একটা বাড়ির বেসমেন্টে আছে সে। এই জায়গা অন্ধকারাচ্ছন্ন। আস্তে আস্তে নজরে পড়ছে আশপাশের অনেককিছু। উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সেটার ধাপে ধাপে যেন বসে আছে কিছু ছায়া। ল্যারিসা এবং সেই দেয়ালের মাঝখানে চেইনলিঙ্ক আছে।

উঠে বসল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে উঠল মাথা, আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিল। চোখের সামনে সবকিছু যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সাদা একটা আলোয়। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে এল দৃষ্টি। ঘরটা অন্ধকার। সিঁড়ির ওপরের কোনো এক জায়গা থেকে একটুখানি আলো আসছে।

‘তোমার শরীরের ভেতরে বিশেষ একজাতের ড্রাগ ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি। যদি দুধটুকু খেয়ে নাও, ওই ওষুধের কার্যকারিতা কমে আসবে আস্তে আস্তে। দুঃখিত... যা করেছি তোমার সঙ্গে, সেটা করতে বাধ্য হয়েছি আসলে। কিন্তু যদি ওই কাজ না করতাম, তা হলে আমার সঙ্গে এখানে আসতে না তুমি।’

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা। সেই প্রশিক্ষক।

ল্যারিসা টের পেল, একটা খাঁচার ভেতরে আছে সে। চেইনলিঙ্কের একটা খাঁচা। ওর শরীরের নিচে কঙ্কিটের মেঝে। নোংরা একটা সবুজ লেপ আবৃত করে রেখেছে শরীরটাকে। তাকাল এদিকে-সেদিকে... আশপাশে আর কী কী আছে, ঠাহর করে নেয়ার চেষ্টা করছে। একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। হিটার আছে একটা। এক ধারে আছে একটা ওয়ার্ক বেঞ্চ। সিঁড়ির কাছ ঘেঁষে দেয়ালের সঙ্গে রাখা হয়েছে সাদা রঙের একটা ফ্রিজার। তবে ওটা নিশ্চয়ই ভাঙা। কারণ কোনো আওয়াজ আসছে না ওই যন্ত্র থেকে। ঢাকনাটাও খোলা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

ফ্রিজারটার গোড়ার কাছে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে পড়ে আছে ওই জিনিস, পেইন্টাররা যে-রকম তারপুলিন ব্যবহার করে সে-রকম তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।



‘ওটা কী?’ বলল ল্যারিসা। নিজের কণ্ঠ নিজের কাছেই কেমন অচেনা ঠেকল। কর্কশ হয়ে গেছে ওর গলার আওয়াজ।

সিঁড়ির একটা ধাপে বসে ছিল লোকটা, চট করে উঠে দাঁড়াল। দেখে মনে হচ্ছে রেগে গেছে। ‘ওটা কিছু না। তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।’

ল্যারিসা শুনতে পেল, আরও কাছে এগিয়ে আসছে লোকটা। একটা পা কেমন যেন টেনে টেনে হাঁটছে। ফুট তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিট ক্যাপের ওপর দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। এখন ওই লোকের চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা। চোখের চারপাশে কালো দাগ বসে গেছে। কেমন যেন ঢুকে গেছে চেহারার খানিকটা ভেতরে। দেখলে ধূসর মনে হয় ওই চোখ দুটো। মনে হয়, আজব কোনো অবসন্নতা আর উদাসীনতা ভর করেছে সেখানে। ওই চোখ দেখলে সে-দুটোর মালিকের বয়স আরও অনেক বেশি বলে মনে হয়। রক্তলাল হয়ে আছে ওগুলো। কোনায় জমে আছে শুকিয়ে আসা অশ্রু।

‘আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না,’ এক কদম পেছনে সরে গেল লোকটা, ‘ওভাবে না।’ সিঁড়ির সেই আবছা আলো ছায়ামূর্তি গড়ে দিয়েছে লোকটার, কেমন অস্পষ্ট একটা আকার ধারণ করেছে তার শরীর।

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে দু’পায়ে খাড়া হলো ল্যারিসা। মনে হচ্ছে, ওর শরীরের প্রতিটি পেশী যেন কাজটা করতে বাধা দিচ্ছে ওকে। দুর্বল হয়ে গেছে পেশীগুলো, কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর কারণে নোংরা সেই সবুজ লেপ লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। খেয়াল করল, পরনের জ্যাকেটটা গায়েব হয়ে গেছে। বুকের কাছে দু’হাত তুলল সে। সোয়েটারের হাতা দুটো টেনে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। দুই হাত ঢুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে সোয়েটারের হাতার ভেতরে। ‘আপনি যদি আমাকে চলে যেতে দিন, আপনি যে এভাবে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলেন আমাকে, সে-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবো না আমি। এই ঘটনা ছোট একটা গোপন ব্যাপার হয়ে রয়ে যাবে আমার আর আপনার জন্য।’ আজ রাতে নাচের যে-অনুষ্ঠান আছে, সেটার কথা মনে পড়ে গেল ওই মেয়ের। মনে পড়ে গেল কেভিন ডিউ’র কথা। মনে হলো, এখানে এই সময়ে থাকতে পারে না সে। যা ঘটে চলেছে, সেসব শ্রেফ অবাস্তব বলে মনে হলো ওর। ‘আমি কোথায় আছি, সে-খবর কিন্তু জানা আছে আমার বাবা-মায়ের। তাঁরা জানেন, গাড়ি চালানো শেখার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করেছি আমি। এ-রকম যদি হয়, আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না লম্বা একটা সময় ধরে, তা হলে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা; আমি যে নিখোঁজ, জানিয়ে দেবেন সেটা। আপনি কি তা-ই চান? আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন, সে-রকম কিছু ঘটবে না। কথা দিচ্ছি, আমি সব ভুলে যাবো।’

মিথ্যা বলছে ল্যারিসা। একটা কন্সট্রাকশন সাইটে যাওয়ার জন্য আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলেন ওর বাবা। আর ওর মা অফিসে যাওয়ার পরিকল্পনা

করেছিলেন। শনিবার বিকেলে কাজ করতে পছন্দ করেন ওই মহিলা, কারণ তখন আর কেউ সাধারণত থাকে না ওই অফিসে। আজ একসঙ্গে বাইরে কোথাও ডিনার করার পরিকল্পনা করেছেন ওর বাবা-মা। মেয়েটার যে আজ ভ্যালেন্টাইন'স ডে ড্যান্স-এ যাওয়ার কথা আছে, সেটা জানা আছে তাঁদের দু'জনেরই। সুতরাং তাঁরা যখন কাজ এবং ডিনার শেষে বাসায় ফিরবেন, যখন দেখবেন ল্যারিসা এখনও আসেনি, ধরেই নেবেন, মেয়েটা ওর কোনো বন্ধুর বাসায় গেছে, বন্ধুকে নাচের অনুষ্ঠানের জন্য রেডি হতে সাহায্য করছে। দু'জনের কেউই আশা করবেন না, মাঝরাতে আগে ফিরবে মেয়েটা। এমনও ভেবে নিতে পারেন, আজ আরও পরে বাসায় ফিরতে পারে ওই মেয়ে। সুতরাং আজ প্রকৃতপক্ষে কেউই খোঁজ করবে না মেয়েটাকে। ওর পথ চেয়ে বসে থাকবে না কেউ।

‘তোমার মন আর আত্মা পবিত্র তো, নাকি?’

ল্যারিসা খেয়াল করল, “আত্মা”, অর্থাৎ soul বলার সময় ইংরেজি “এস” অক্ষরটা উচ্চারণ করতে কেমন জড়তা কাজ করছে ওই লোকের মুখে। কথা শেষ করেই আজব কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা, যেন রেগে উঠছে নিজের ওপরই।

‘বুঝলাম না।’

একটা মুহূর্তের জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল ওই লোক। নিজেকে সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গে, আবারও আশ্রয় নিল ছায়ার। ‘বিশেষ কোনো কিছু যদি দেখতে হয় তোমাকে, তা হলে তোমার পবিত্র থাকা চাই। আর নিজেকে পবিত্র করার উপায় একটাই... মন ও আত্মা পবিত্র করা।’ একহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ডলছে লোকটা, ভঙ্গিটা দেখলে মনে হয় নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ‘তোমার আগে যে-মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম, সে পবিত্র ছিল না। আর তাই আমার ধারণা, সেই বিশেষ কিছু একটা দেখতে পায়নি সে। তোমার বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম কিছু হবে। আমি নিশ্চিত।’

মেঝেতে পড়ে থাকা সেই তারপুলিনের ওপর ফিরে গেল ল্যারিসার নজর।

‘যত তাড়াতাড়ি শুরু করবো আমরা, তত তাড়াতাড়ি তোমাকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হবে আমার পক্ষে। তুমি তো চলেই যেতে চাও এখান থেকে, ঠিক না?’

‘হ্যাঁ, আমি চাই, আমাকে ছেড়ে দেবেন আপনি।’

‘তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি আমি। কিন্তু বলতে খারাপই লাগছে, তোমাকে চলে যেতে দেয়াটা হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।’

ছোট্ট খাঁচাটার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হাজির হলো মেয়েটা। দাঁড়াল দরজার সামনে। ওটার মাথার কাছে একটা প্যাডলক ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। তালা আছে আরও একটা... দরজার নিচের দিকে। দুই হাত দিয়ে দরজাটা আঁকড়ে ধরল সে। ‘আমাকে যেতে দিন, পাগল কোথাকার! আমাকে এখান থেকে বের হতে দিন।’



দু'আঙুল দিয়ে চাঁদির একটা পাশ চুলকানোর কথা বাদ দিয়ে বললে, নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না প্রশিক্ষক লোকটার মধ্যে। তাকে দেখে এখন একটা ছায়ার মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আরও গাঢ় কোনো ছায়ার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে যেন। ফেঁটে যাওয়া শুকনো ঠোট চাটল লোকটা।

চিৎকার করে উঠল ল্যারিসা।

ওর পক্ষে যত জোরে চেষ্টানো সম্ভব, করল কাজটা। এত জোরে যে, জ্বালাপোড়া করে উঠল গলার ভেতরে। সোজা তাকিয়ে আছে ওই লোকের চোখের দিকে। একটানা চেষ্টাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটুখানি বাতাসও বাকি থাকল ওর ফুসফুসে, করতে লাগল কাজটা। তারপর আবার বুক ভরে দম নিল, চেষ্টায়ে উঠল আরও একবার। শেষ পর্যন্ত যখন থামল, ঘরটা তখন ভরে উঠল গভীর এক নীরবতায়। শুধু শোনা যাচ্ছে সেই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আওয়াজ। টিক টিক করে একটা আওয়াজ আসছে ইলেকট্রিক হিটারটা থেকে, শোনা যাচ্ছে সেটাও।

‘আমিও কখনও কখনও চেষ্টাই,’ ল্যারিসাকে বলল লোকটা। ‘চেষ্টালে ভালো লাগে। ‘কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার সেই চিৎকার কখনোই শুনতে পায় না কেউই। এই যে এতক্ষণ ধরে এত জোরে চেষ্টালে, তোমার চিৎকারও কেউ শুনতে পেয়েছে কি না, সন্দেহ।’

সিঁড়ি যদিও আছে, সেদিকে হাঁটা ধরল লোকটা। সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে থামল। ‘দুধটুকু খেয়ে নাও। শক্তি দরকার তোমার। এই যে যাচ্ছি, তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো আমি। কাজ শুরু করা যাবে তখন।’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ল্যারিসা, সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে ওপরে উঠে যাচ্ছে লোকটা। ডান পায়ে কোনো সমস্যা আছে ওই লোকের। সিঁড়ির একেবারে ওপরে যখন পৌঁছে গেল লোকটা, একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল ল্যারিসা। তবে চলে যাওয়ার আগে লাইটটা জ্বালিয়ে রেখে গেছে ওই লোক।

খাঁচার এককোণায়, মেঝেতে রেখে দেয়া হয়েছে দুধের গ্লাসটা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওটা হাতে তুলে নিল ল্যারিসা। গ্লাসটা কাত করে দুধটুকু ফেলে দিল কঙ্কিটের ওপর। তারপর এগিয়ে গেল লেপের কাছে। সবুজ সেই লেপ দিয়ে ভালোমতো পেঁচিয়ে নিল ওই গ্লাস। জুতো পরা পা দিয়ে বার কয়েক লাথি হাঁকাল গ্লাসের গায়ে। সরাল লেপটা। সাবধানে বেছে বেছে আলাদা করে নিল সবচেয়ে ধারালো টুকরোটা। ওটা দৈর্ঘ্যে তিন ইঞ্চির মতো হবে। কাঁপা কাঁপা হাতে ধরে রেখেছে টুকরোটা। ‘আয়, শুরু করি আবার, শুষোর কোথাকার!’

হলওয়াতে ন্যাশ আর ক্রোজের কণ্ঠ শুনতে পেল ক্রেয়ার। এর কিছুক্ষণ পর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওই দু'জন। কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে ওরা।

মাথা নাড়ল ক্রেয়ার।

ন্যাশ ঘরের ভেতরে ঢোকামাত্র ওর দিকে একটা কলম ছুঁড়ে মারল ক্রেয়ার। ওটা লুফে নিল ন্যাশ।

‘ঘটনা কী, ক্রেয়ার?’

মাথা নিচু করে ন্যাশকে পাশ কাটাল ক্রোজ, গিয়ে বসে পড়ল নিজের ডেস্কের ধারে। ‘পোর্টার না একটা নিয়ম চালু করেছিলেন... অন্য কোনো ডিটেকটিভের দিকে কোনোকিছু ছুঁড়ে মারা যাবে না?’

‘পোর্টার আপাতত বরখাস্ত। কাজেই ওই নিয়ম এখন আর কার্যকর না,’ ন্যাশ আর ক্রোজকে বলল ক্রেয়ার। ‘কিছু একটা পেয়েছি আমি। সেটা বড় কিছু হতে পারে।’

কনফারেন্স টেবিলের এক কোণায় বসে পড়ল ন্যাশ। ‘ভালো। কারণ ওই গাড়ি-বিক্রেতার ওখানে গিয়ে তেমন কিছু জানতে পারিনি আমরা। শুধু জানা গেছে, বাবা-মাকে না জানিয়ে একটা মাজদার জন্য টাকা পরিশোধ করছিল এলা রেনল্ডস। সেখানকার তিনজন লোকের সঙ্গেই কথা হয়েছে আমাদের। একজনের নাম ব্র্যান্ডন স্ট্রিঙ্গার। সেলস-এ কাজ করে। ফটো দেখে চিনতে পারল এলাকে। মেয়েটা যখন প্রথমবার গিয়েছিল ওখানে, তখন আরেকজন কাস্টোমারের সঙ্গে কথা বলছিল লোকটা। আসি কাম্বারল্যান্ডের কথায়। সে মালিক। তোয়াজ করা বলতে যা বোঝায়, শুরু থেকে সে-কাজই করেছে লোকটা এলার সঙ্গে। এদের দু'জনের কেউই লিলি ডেভিসকে চেনে না। একজন মেকানিক আছে ওই দোকানে। নাম ডগলাস ফ্রেডেনবার্গ। তবে সে আমাদের সেই লোক না। তার বাসায় বউ আছে, পাঁচটা বাচ্চা আছে। কোথাও কারও সঙ্গে বসে যে পোকার-টোকার একটু খেলবে সে, সে-উপায়ই নেই তার, একাধিক কিডন্যাপিং আর খুনের কথা তো বাদই দিলাম। তা ছাড়া তার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ একটা অ্যালিবাই দিয়েছে কাম্বারল্যান্ড নিজে। মোদা কথা, ওই তিনজনের কাউকেই এলা বা লিলির সঙ্গে জড়ানো যায়নি। অর্থাৎ, আরও কয়েকটা কানা গলি।’

ক্রেয়ারের ডেস্কের ওপর বেশ কয়েকটা প্রিন্ট আউট দেখা যাচ্ছে। একটা কাগজ তুলে নিল সে, দিল ন্যাশের হাতে।

‘কী এটা?’



‘পড়ে দেখুন।’

চোখের সামনে ওই কাগজ মেলে ধরল ন্যাশ। শব্দ করে পড়তে লাগল, ‘ফ্রয়েড বার্নার্ড রেনল্ডসের ভালোবাসায় পূর্ণ স্মৃতির উদ্দেশে— মে ১১, ১৯৬২ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫। প্লিজ যোগ দিন আমাদের সঙ্গে, সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, বিকেল ৫টায়, ভার্জিন ক্যাথোলিক চার্চের সেইন্ট গ্যাব্রিয়েলে। সেখানে ফ্রয়েডের জন্য একটা স্মৃতিচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন প্রেমময় স্বামী, একইসঙ্গে স্নেহময় একজন পিতা। চার্চ হলে অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।’ কাগজটা নামাল সে। ‘ফ্রয়েড রেনল্ডসের শেষকৃত্যের খবর। তো কী হয়েছে?’

এবার আরেকটা প্রিন্টআউট হাতে নিল ক্লেয়ার, দিল ক্রোজকে।

ক্লেয়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ক্রোজ, তারপর খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করল গলা। পড়তে লাগল, ‘ফ্রয়েড বার্নার্ড রেনল্ডসের ভালোবাসায় পূর্ণ স্মৃতির উদ্দেশে— মে ১১, ১৯৬২ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫। তিনি ছিলেন মিথ্যার পিতা, মৃত্যুর স্বামী। শেষপর্যন্ত শান্তি খুঁজে পেয়েছেন তিনি একগুচ্ছ গোলাপের মাঝখানে। আপনারা কেউ আর কোনো ফুল আনবেন না, প্লিজ। শুধু আপনাদের আশীর্বাদ চাই।’ পড়া শেষ করে কাগজটা ফিরিয়ে দিল ক্লেয়ারের হাতে।

ন্যাশের দিকে ফিরল ক্লেয়ার। ‘আপনি যে-শোকসংবাদ পড়লেন, সেটা আজ সকালের শিকাগো একজামিনার-এ এসেছে। আর এটা...’ ক্রোজকে যে-কাগজ দিয়েছিল সেটা নাড়ল, ‘প্রকাশিত হয়েছিল ওই একই পত্রিকায়, গত বুধবার।’

হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ। ‘দেখি তো...’

ওকে উপেক্ষা করল ক্লেয়ার, এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে। ফ্রয়েড রেনল্ডসের তথ্য লেখা আছে যেখানে, তার ঠিক নিচে টেপ দিয়ে আটকে দিল কাগজ দুটো। কাজ শেষে ফিরে এল নিজের ডেস্কে। ‘আরও আছে।’

হ্যাঁ মেরে তুলে নিল আরেকটা কাগজ। শব্দ করে পড়তে লাগল, ‘ডক্টর র্যান্ডল ফ্রেডেরিক ডেভিস, গ্রেস অ্যান ডেভিসের স্বামী এবং লিলি গ্রেস ডেভিসের বাবা, আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন।’

‘ডেভিস মারা গেছেন?’

মাথা ঝাঁকাল ক্লেয়ার। ‘গতকাল রাতে। বড় রকমের একটা স্ট্রোক হয়েছিল তাঁর।’

‘এত জলদি তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিতও হয়ে গেল?’

আবারও সেই বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল ক্লেয়ার। র্যান্ডল ডেভিসের নামের নিচে টেপ দিয়ে আটকে দিল কাগজটা। ‘যে-ই ছাপিয়ে থাকুক না কেন এই খবর, র্যান্ডল ডেভিস কবে-কখন মারা যাবেন, সেজন্য অপেক্ষা করেনি সে। তাঁর এই মৃত্যুসংবাদও ছাপানো হয়েছে একজামিনার পত্রিকায়, আজ থেকে চারদিন আগে।’

‘তার মানে, ওই লোক যাদেরকে খুন করার পরিকল্পনা করছে, তাদের মৃত্যুসংবাদ অগ্রীম ছাপিয়ে দিচ্ছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওই মেয়ে দুটোর কী অবস্থা?’ জিজ্ঞেস করল ক্রোজ। ব্যাগের ভেতর থেকে বের করছে নিজের ল্যাপটপ।

‘খুঁজে দেখেছি আমি। কিন্তু ওই মেয়ে দুটোর ব্যাপারে কোথাও কিছু পাইনি। যা পেয়েছি, তা শুধু ওদের বাবাদের ব্যাপারেই।’

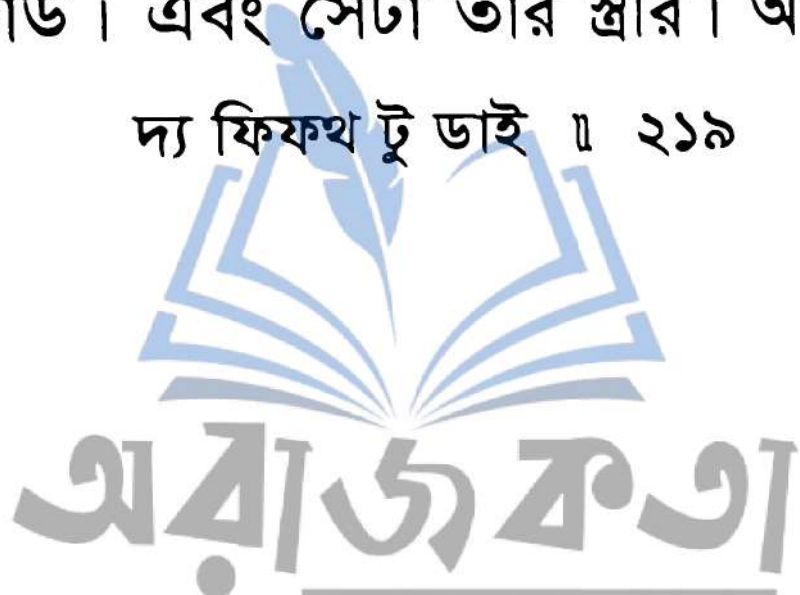
হোয়াইটবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল ন্যাশ। প্রিন্টআউট দুটো দেখছে। ‘কে ছাপিয়েছে এসব খবর, জানা গেছে?’

‘সেটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার।’

‘অদ্ভুত?’

‘শিকাগো একজামিনারের মৃত্যুসংবাদ বিভাগের দায়িত্বে আছেন যে-মহিলা, তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি আপনারা-এখানে-আসার একটু আগেও। আজ তেতাল্লিশ বছর হতে চলল ওই বিভাগে কাজ করছেন তিনি। বললেন, প্রতিটা মৃত্যুসংবাদ তিনি নিজে পড়েন আগে, তারপর ছাপতে পাঠান। কারণ, তাঁর নিজের ভাষায় যদি বলি, “সাধারণ মানুষের কোনো শ্রদ্ধাই নেই ব্যাকরণের প্রতি।” এবং তিনি কসম খেয়ে বলেছেন, গত সপ্তাহে যে-দুটো মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো নাকি দেখেননি তিনি। তবে আজ যেটা প্রকাশিত হয়েছে, সেটার কথা মনে করতে পারলেন... এমনকী এ-ও মনে করতে পারলেন, ছাপতে পাঠানোর আগে ওই মৃত্যুসংবাদে কিছু কাটাকুটিও করেছিলেন তিনি। আমি যখন অন্য সংবাদগুলো পড়ে শোনালাম তাঁকে, রীতিমতো খঁকিয়ে উঠলেন ওসব শুনে। বললেন, তাঁর নজরে যদি পড়ত, তা হলে কোনো না কোনো সংশোধনী অবশ্যই আনতেন ওসব সংবাদে। যা হোক, আপাতত যা জানা গেছে, শিকাগো একজামিনারের একটা ওয়েবসাইট আছে, আর সেখানে পাওয়া যায় মৃত্যুসংবাদের নির্দিষ্ট ফর্ম। সে-ফর্ম পূরণের মাধ্যমেই ও-রকম কোনো সংবাদ জমা দিতে হয় ওই পত্রিকায়। বানোয়াট বা মিথ্যা সংবাদ যে একেবারেই আসে না, তা না। ওসব কাজ করে ছেলেছোকরারা, মজা করার উদ্দেশ্যে। পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, এ-রকম কোনো সংবাদ যাচাই-বাছাই না করে ছাপানো যাবে না। আর তাই যে-মহিলার কথা বলছি, তিনি ডেথ সার্টিফিকেট নেন। অথবা ফিউনারেল হোমে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নেন। আরও কথা আছে। এ-রকম প্রতিটা সংবাদ ছাপাতে কিন্তু ভালো একটা খরচ আছে।’ নিজের ডেস্কের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল ক্রোয়ার, বসে পড়ল জায়গামতো। ‘এসব মৃত্যুসংবাদ পত্রিকাওয়ালাদের জন্য পয়সা কামাই করার বড় একটা উপায়। যে-তিনটা ঘটনার কথা বললাম, তিনটার বেলাতেই ক্রেডিট কার্ডের ডেটা দেয়া হয়েছিল। রেনল্ডসের মৃত্যুসংবাদ দুটোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল একই কার্ড। এবং সেটা তাঁর স্ত্রীর। আবার, র্যান্ডল ডেভিসের ভুয়া

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ২১৯



অরাজকতা



মৃত্যুসংবাদ ছাপানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল তাঁর স্ত্রী গ্রেস ডেভিসের আমেরিকান এক্সপ্রেস। ভুয়া মৃত্যুসংবাদ দুটোর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেউ একজন অনলাইনে সেসব তথ্য সাবমিট করেছিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাফ করেছিল ওই পত্রিকার সিস্টেম। এবং এমনভাবে কোড করে দিয়েছিল, যার ফলে ভুয়া সংবাদ দুটো “অনুমোদিত” হয়ে গেছে। এবং সে-কারণেই, যে-মহিলার কথা বললাম একটু আগে, তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে ওই সংবাদগুলো। ওই পত্রিকার যে-সেফগার্ড আছে, তা-ও ঠেকাতে পারেনি সংবাদ দুটোকে। সরাসরি ছাপাখানায় চলে গেছে ও-দুটো। কেউ যাচাই-বাছাই করার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি।’

ল্যাপটপের স্ক্রিনে দৃষ্টি আটকে গেছে ক্লোজের। একের পর এক টেক্সট যেন গড়াগড়ি খাচ্ছে সেখানে। বলল, ‘একজামিনার পত্রিকার ওয়েব ফর্মের সেই কোডটা ঘেঁটে দেখছি আমি। তাদের সিস্টেম এমনকিছু তথ্য সংগ্রহ করে নেয়, যা ব্যবহারকারীরা দেখতে পায় না। যেমন একজন ব্যবহারকারীর অপারেটিং সিস্টেম, আইপি অ্যাড্রেস... এবং আরও কিছু ডেটা।’

‘গত ত্রিশ দিনে যেসব মৃত্যুসংবাদের আবেদন জমা পড়েছিল একজামিনার পত্রিকায়, আমি যে-মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি সেসবের একটা ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের কাছে। আপনার ইনবক্সে এতক্ষণে চলে যাওয়ার কথা ওটার,’ ক্লোজকে বলল ক্লেয়ার।

‘পেয়েছি। ওটাও দেখছি।’

র্যান্ডল ডেভিসের বেলায় যে-ভুয়া মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা দেখছে ন্যাশ। ‘এটা যদি আজ থেকে চারদিন আগে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, লিলি ডেভিস গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে ছাপানো হয়েছে খবরটা।’

মাথা ঝাঁকাল ক্লেয়ার।

‘সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আসল শিকার কে? বাবা নাকি মেয়ে?’

গত একটা ঘণ্টা এই একই ধাঁধা নিয়ে ভেবে ভেবে পার করেছে ক্লেয়ার। কোনো জবাব পায়নি। ‘আমার মনে হয় আমাদের সেই রহস্যময় লোক বাবা এবং মেয়ে দু’জনের পেছনেই লেগেছে... আলাদা আলাদা কারণে। মেয়েগুলোকে বার বার পানিতে চুবাচ্ছে সে। বিশেষ এই কাজে সময় নিচ্ছে লোকটা। সামলে ওঠার সুযোগ দিচ্ছে মেয়েগুলোকে। কিন্তু একই কাজ করে যাচ্ছে বার বার... যতক্ষণ পর্যন্ত না মারা যাচ্ছে মেয়েগুলো। এলা রেনল্ডসের মরতে সময় লেগেছে কয়েক সপ্তাহ। আর লিলি ডেভিসের লেগেছে কয়েক দিন। এবার আসি তাদের বাবাদের কথায়। সম্পূর্ণ আলাদা এক পদ্ধতিতে এই লোকগুলোকে খুন করা হচ্ছে। এবং দ্রুততার সঙ্গে করা হচ্ছে কাজটা। অনুচিন্তা বলতে যা বোঝায়, এই ব্যাপারটা যেন ঠিক সে-রকম... মানে, খুনির মাথায় যেন ছুট করেই একটা চিন্তা খেলা করে যাচ্ছে— মেয়েটাকে শেষ করে দিলাম, কিন্তু মেয়েটার বাবা তো বাকি রয়ে গেল, এবার তাকেও মেরে ফেলা যাক।’

‘না, অনুচিন্তা বলতে তুমি যা বোঝাচ্ছে, সেটা মেনে নিতে পারছি না আমি,’ বলল ন্যাশ। ‘যদি এই মৃত্যুসংবাদগুলো খুনিরই কাজ হয়ে থাকে, তা হলে।’

‘ঠিক আছে, মানলাম,’ বলল ক্লেয়ার। ‘আরেকটা কথা আমার মাথায় এসেছে। এই মেয়েগুলোকে নিয়ে যা করছে খুনি... পানিতে ডুবিয়ে মারার কথা বলছি আর কী... আমার ধারণা, কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করছে সে কাজটা।’

‘কী হতে পারে সেই উদ্দেশ্য? বিশেষ কিছু একটা শিখতে চাইছে সে?’

‘হ্যাঁ, বিশেষ কিছু একটা শিখতে চাইছে সে,’ একমত হলো ক্লেয়ার।

‘তার মানে নিজের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে লোকটা মেয়েগুলোর ওপর। আর বাবাদেরকে ব্যবহার করছে স্মোকস্ক্রিন হিসেবে?’

চাঁদিতে হাতের আঙুলগুলো চেপে ধরল ক্লেয়ার। ‘না, আমার মনে হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি কিছু একটা ঘটছে। কেন, সে-ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত না আমি।’

‘বাবা, মেয়ে... আমার কিন্তু ব্যাপারটা ফোর মাস্কি কিলারের মতোই মনে হচ্ছে অনেকটা,’ বলল ন্যাশ।

‘পানিতে ডুবিয়ে মারাটা ফোর মাস্কি কিলারের সঙ্গে মেলে না। আরেকটা কথা। বিশপ আগেরবার যেসব মেয়েকে খুন করেছিল, তাদের কারও বাবা-মায়ের কোনো ক্ষতি কিন্তু করেনি। তার চিন্তাভাবনা ছিল এ-রকম... মেয়েগুলোকে যদি মেরে ফেলি, তা হলে তাদের বাবা-মায়েরা জীবিত অবস্থায় কষ্ট পাবে অনেক বেশি— সন্তান হারানোর কষ্ট।’

‘হতে পারে চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এসেছে লোকটার।’

‘মানলাম। কিন্তু তাই বলে কার্যপদ্ধতিও বদলে ফেলতে হবে?’

‘কিছু রেকর্ড খুঁজে পেয়েছি আমি,’ ন্যাশ আর ক্লেয়ারের কথোপকথনে বাধা দিয়ে বলে উঠল ক্রোজ। ‘তিনটা মৃত্যুসংবাদের বেলাতেই দেখা যাচ্ছে, যে-আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো, যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে, তাদের বাসারই। তার মানে হচ্ছে, প্রতিটা মৃত্যুসংবাদ, যে বা যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে, তাদের বাসা থেকেই পাঠানো হয়েছে। অথবা, এমন কোনো কায়দা অবলম্বন করা হয়েছে, যার ফলে সে-রকমই মনে হয়।’

‘সে-রকম কোনোকিছু কি করা সম্ভব?’

ল্যাপটপ স্ক্রিনের ওপরের দিকের এক জায়গায় একটা আঙুল রাখল ক্রোজ, কী যেন ভাবছে। ‘কৌশল খাটালে সম্ভব। কোনো একটা ফর্ম পূরণের বেলায় যে-আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়, সেটা নকল করা মোটামুটি অসম্ভব। প্রযুক্তির ভাষায় যদি বলি, হোস্ট মেশিন থেকে ডেটা বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই স্ট্রিং ধারণ করে ফেলা সম্ভব।’

‘ইংরেজিতে বলুন,’ বলল ক্লেয়ার।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২২১





ক্লোজ বলতে লাগল, ‘ধরা যাক, আমি খুনি। আমি এখন চাইছি, যাকে খুন করেছি, তার বাসার আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে কোথাও কোনো একটা মেসেজ পাঠাবো। সেক্ষেত্রে আমাকে যা করতে হবে তা হলো, ওই বাসাতেই তৈরি করতে হবে মেসেজটা, এবং সেটা পাঠানোর সময় ব্যবহার করতে হবে তাদের রাউটার। এই কাজ করার জন্য কয়েকটা উপায় আছে।’ কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে একটা দুটো করে আঙুল উঁচু করতে লাগল। ‘এক, রিমোট কোনো লোকেশন থেকে ওই বাসার কম্পিউটার হ্যাক করা। এই কাজ কিন্তু যথেষ্ট কঠিন। এক্ষেত্রে আমাকে যা করতে হবে তা হলো, যদি অ্যাকসেস পেতে চাই বিশেষ সেই কম্পিউটারে, তা হলে আগেই একটা ম্যালওয়্যার পাঠাতে হবে। তার ফলে কী হবে? বাসার পেছনদিকের দরজাটা খুলে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, সে-রকম একটা ঘটনা ঘটবে। অথবা, বলা যেতে পারে, একটা ফুটো তৈরি হবে বিশেষ সেই কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে। আমি যার কম্পিউটার হ্যাক করতে চাইছি, সে-লোক যদি নিয়মিত নিজের অপারেটিং সিস্টেম আপডেট না করে, তা হলে ওই কাজ সহজ হয়ে যাবে আমার জন্য। তারপরও আমি বলবো, ব্যাপারটা একইসঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিশ্চিত। দুই, আমি যদি ওই পরিবারের ওয়াই-ফাই হ্যাক করি। এই কাজ কিন্তু তুলনামূলকভাবে সহজ। এবং এই কাজ ওই বাসার বাইরের রাস্তা থেকেই করা সম্ভব। শুধু লাগবে কয়েকটা টুল, যা কিনা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেয়া যায়।’

‘বাসার এত কাছাকাছি হাজির হওয়া কিন্তু বিপজ্জনকও,’ বলল ন্যাশ।

‘একটা ব্যাপার আপনারা খেয়াল করেছেন কি না, জানি না। ওই লোক এসব মেসেজ কখন পাঠিয়েছে অথবা পাঠাচ্ছে? যখন কাউকে তুলে নিয়ে যায়নি সে, যখন কারও কোনো ক্ষতি করেনি। ফলে তার ওপর নজর রাখার কথা ভাবেনি কেউই। জায়গামতো গিয়ে, কাজ সেরে, কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসা সম্ভব তার পক্ষে। বিশেষ করে ওই পরিবার যদি তাদের রাউটারের ফার্মওয়্যার আপডেট করে না থাকে।’

‘কেউই তাদের ফার্মওয়্যার আপডেট করে না। আমরা এই ব্যাপারটা জেনেছি স্টারবাক্স থেকে।’

‘একদম ঠিক বলেছেন,’ মাথা ঝাঁকাল ক্লোজ। ‘পত্রিকার কথাটাও মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে। এবং সেটা যদি করি আমরা, তা হলে তিন নম্বর অপশনটা চলে আসছে আমাদের সামনে। আমাদের রহস্যময় সেই লোক কী করেছে? ওয়েব ফর্ম পূরণ করার মাধ্যমে মৃত্যুসংবাদে বিজ্ঞাপন জমা দিয়েছে। তারপর, ওসব ডেটা পত্রিকার যে-সার্ভারে জমা থাকে, সেটা হ্যাক করেছে। সার্ভারের ভেতরে ঢুকে পড়ামাত্র আইপি অ্যাড্রেস বদল করে দিয়েছে। এটা খুব কঠিন কাজ। তার জায়গায় যদি আমি থাকতাম, ওয়াই-ফাইয়ের পেছনে লাগতাম।’

‘সেক্ষেত্রে কোনো একজাতের “কুর্টপ্রিন্ট” কি পাওয়া যেতে পারে? যেমনটা আমরা পেয়েছি স্টারবাকসে?’ বলল ন্যাশ।

আবারও মাথা নাড়ার পালা ক্লোজের। ‘প্রতিটা সার্ভারের ক্ষেত্রে ম্যাক অ্যান্ড্রোস বলতে যা বোঝায়, ওই পত্রিকা নিজেদের ডেটায় সে-রকম কোনোকিছু ক্যাপচার করে না। কিন্তু প্রতিটা লোকেশনের রাউটার আবার এই কাজ করে। আমার শুধু অ্যাকসেস দরকার।’

‘তার মানে ওই মানুষগুলোর বাসার ভেতরে যেতে হবে আপনাকে?’ জানতে চাইল ক্লেয়ার। ‘এখন যে-পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা...’

‘দরকার হবে না। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে করে নিতে পারবো ওই কাজ... যেমনটা করেছে আমাদের সেই রহস্যময় লোক। ওই পরিবারগুলোকে বিরক্ত করার কোনো দরকার নেই।’

ন্যাশ বলল, ‘পত্রিকা থেকে একটা তালিকা পাঠানো হয়েছে আমাদের কাছে। সেটাতে তাদের কাছে যতগুলো মৃত্যুসংবাদ জমা পড়েছিল, সব উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা কি নামগুলো চেক করে দেখতে পারি? এ-রকম কোনো মৃত্যুসংবাদ কি খুঁজে বের করা সম্ভব, যেটার ক্ষেত্রে কোনো ডেথ সার্টিফিকেট জমা দেয়া হয়নি? এমনও তো হতে পারে, কপাল খুলে গেল আমাদের। হতে পারে, রহস্যময় সেই লোক তার পরবর্তী টার্গেটের ওপর আঘাত হানার আগেই আমরা খুঁজে বের করে ফেলতে পারবো বেচারী মানুষটাকে?’

‘সোশাল সিকিউরিটি নম্বর অথবা ও-রকম অন্য কোনোকিছু ছাড়া কাউকে সেই তালিকা থেকে বাদ দেয়াটা কঠিন একটা কাজ হবে। তারপরও চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি,’ বলল ক্লোজ।

হোয়াইটবোর্ডের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। কার কী অ্যাসাইনমেন্ট আছে, দেখছে। ‘আশপাশের এলাকায় লবণাক্ত পানির সুইমিং পুলের যে-তালিকা তৈরি করার কথা ছিল, ভাগ্য কি সেটার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেছে আমাদেরকে?’

‘প্রশ্নটার জবাবে আমি যদি “হ্যাঁ” বলি, আমার দিকে এটা-সেটা ছুঁড়ে মারা কি বন্ধ করবেন আপনি?’ বলল ক্লোজ।

‘না।’

‘আপনি আসলে শয়তান একটা মেয়েমানুষ,’ বলল ক্লোজ। ‘যা হোক। ফাইল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আপনার কাছে। আপনার ইনবক্স দেখে নিয়ন। লবণাক্ত পানির সুইমিং পুলের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি আমরা। আইজলি ওই দুটো মেয়ের ফুসফুস থেকে যে-পানি পেয়েছে, সেটাতে অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ ছিল। অথচ সুইমিং পুলের পানিতে প্রতি মিলিয়নে তিন হাজার কণিকা পাওয়া যায়। আর আমরা যে-পানির খোঁজ করছি, সেটাতে পাওয়া গেছে পঁয়ত্রিশ হাজার কণিকা। মানে, সমুদ্রজলের সমান। আঠারোটা অ্যাকুয়াটিক স্টোর খুঁজে বের করেছি আমি, যারা কিনা সাগরজলের মাছ বিক্রি করে এবং ও-রকম অন্যান্য জিনিস জোগান দেয়। ওই লিস্টও পাঠিয়ে দিয়েছি আপনার কাছে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২২৩



অরাজকতা



নিজের ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার। এগিয়ে গেল বোর্ডের কাছে। আপডেট করল সেটা। ‘ঠিক আছে, আমি চেক করে দেখবো। আপনারা দু’জন তা হলে এখন কী করবেন? গাড়ি চালিয়ে গিয়ে হাজির হবেন ওই দুটো মেয়ের বাসায়? ওখানকার রাউটার থেকে যেসব তথ্য জোগাড় করে নেয়া দরকার, সেসব জোগাড় করবেন?’

‘এখন স্যাম থাকলে কী করতেন, জানেন? রাউটারের ডেটা জোগাড় করে আনার জন্য একটা ওয়ার্যান্ট ইস্যু করাতে বাধ্য করতেন আমাকে,’ বলল ক্লেয়ার।

আরেকটা কলম তুলল ক্লেয়ার, ছুঁড়ে মারার জন্য প্রস্তুত। ‘আপনি যদি না বলতেন কথাটা, তা হলে এই জিনিস ছুঁড়ে মারতাম না আমি, ছুঁড়ে মারার ভান করতাম।’

এভিডেন্স বোর্ড

এলা রেনল্ডস (বয়স ১৫)

নিখোঁজ হয়েছিল: জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে
লাশ পাওয়া গেছে: ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে,
জ্যাকসন পার্ক লেগুনে

সেখানকার পানি জমে বরফে পরিণত হয়েছে: জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে
(মেয়েটা হারিয়ে যাওয়ার ২০ দিন আগে)

এই মেয়েকে শেষবার দেখা গেছে: লোগান স্কোয়ারে বাস থেকে নামছিল।
(ওদের বাসা থেকে ২ ব্লক দূরে/জ্যাকসন পার্ক থেকে ১৫ মাইল দূরে)

শেষ যে-বার দেখা গেছে মেয়েটাকে, তখন তার পরনে ছিল:

কালো কোট

লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গেছে মেয়েটা

(তার লাশ পাওয়া গেছে স্বাদু পানিতে)

পরনে ছিল লিলি ডেভিসের কাপড়

বাস স্টপেজ থেকে এলাদের বাসায় যেতে সময় লাগে: ৪ মিনিট

কেডজির স্টারবাকসে ঘন ঘন যেত মেয়েটা।

ওদের বাসা থেকে সেখানে যেতে সময় লাগে: ৭ মিনিট

লিলি ডেভিস (বয়স ১৭)

বাবা-মা = ডক্টর র্যান্ডল ডেভিস এবং গ্রেস ডেভিস

সবচেয়ে ভালো বন্ধু = গ্যাব্রিয়েল ডিগান

পড়ত উইলকিন্স অ্যাকাডেমিতে (প্রাইভেট)

ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে ক্লাসে যায়নি।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২২৪

শেষ যে-বার দেখা গেছে: স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিল (পায়ে হেঁটে)
ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে, সকাল ৭:১৫ মিনিটে
তখন পরনে ছিল: হীরার নকশা-করা লাল নাইলনের হুডওয়ালা পেরো পার্কা, সাদা
হ্যাট, সাদা গ্লাভস, গাঢ় রঙের জিন্স, গোলাপি টেনিস শু
(এসব পাওয়া গেছে এলা রেনল্ডসের গায়ে)
লিলিকে খুব সম্ভব তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ সকালে
(স্কুলে যাওয়ার পথে)
স্কুলে যেতে সময় লাগে: সর্বোচ্চ ৩৫ মিনিট (স্কুলের উদ্দেশে বের হয়েছিল ৭:১৫
মিনিটে, ক্লাস শুরু হয় ৭:৫০ মিনিটে)
স্কুলটা ওই মেয়ের বাসা থেকে মাত্র ৪ ব্লক দূরে
মেয়েটা যে নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেটা মাঝরাতের আগে পুলিশকে জানানো হয়নি
(ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে গভীর রাতে জানানো হয়েছে)
বাবা-মা ভেবেছিলেন মেয়েটা কাজে গেছে (আর্ট গ্যালারি), স্কুল শেষ করে (কিন্তু
স্কুলেও যায়নি মেয়েটা)
এই মেয়ের লাশের পরনে পাওয়া গেছে এলা রেনল্ডসের কাপড়
ডুবিয়ে মারা হয়েছে এবং তার আগে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা
হয়েছে কয়েকবার ... লবণাক্ত পানিতে

ফ্রয়েড রেনল্ডস

স্ত্রী: লিয়ান রেনল্ডস

কাজ করতেন ইউনিমেড আমেরিকা হেল্থকেয়ারে, বীমার বিক্রয়-প্রতিনিধি ছিলেন
কোনো ঋণ নেই? তাঁর স্ত্রী তা-ই বলেছেন।

হসম্যান চেক করে দেখছে

পাতলা একটা তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে
(পিয়ানো?)

তাঁর নিজের বাসার বাইরে (গাড়িতে)

মরদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটা স্লোম্যানের ভেতরে
এলা রেনল্ডসের বাবা

র্যান্ডল ডেভিস

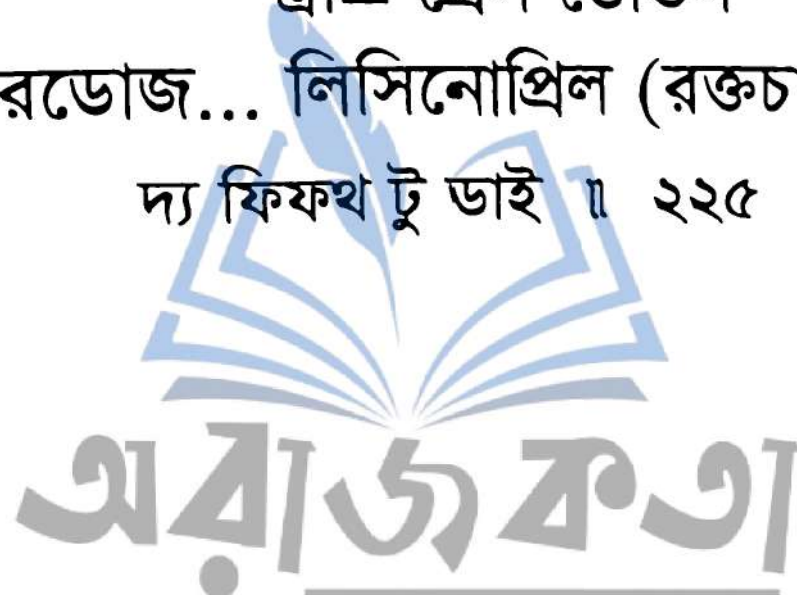
ডাক্তার, জন এইচ. স্ট্রিজার, জুনিয়র হাসপাতাল

লিলি ডেভিসের বাবা

স্ত্রী= গ্রেস ডেভিস

ওভারডোজ... লিসিনোপ্রিল (রক্তচাপের ওষুধ)

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২২৫





অচেনা সেই লোক

- * খুব সম্ভব একটা ধূসর পিকআপ চালাচ্ছিল। সেটার পেছনে ছিল একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক
- * হয়তো কোনো সুইমিং পুলে কাজ করে (ক্লিনিং/সার্ভিসিং)
- * ১১ সাইজের ওয়াক বুটের ছাপ পাওয়া গেছে,
ড্রাইভারের সিটের পেছনদিকে
রেনল্ডসের গাড়ি (লেক্সাস এলএস)
জোর খাটিয়েছিল লোকটা?

অ্যাসাইনমেন্ট:

- * স্টারবাকস ফুটেজ (১ দিনের) ... ক্লোজ
- * এলার কম্পিউটার, ফোন, ই-মেইল ... ক্লোজ
- * লিলির সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, ফোন রেকর্ড, ই-মেইল (ফোন এবং কম্পিউটার দুটোই হারানো গেছে) ... ক্লোজ
- * অচেনা সেই লোক হয়তো পার্কে ঢুকছিল; ফুটেজ বড় করে দেখা ... ক্লোজ
- * পার্কের ক্যামেরা কি টিলে করে রাখা হয়েছিল? আগের ফুটেজ দেখা ... ক্লোজ
- * ভিডিয়ো দেখে ট্রাকের মডেল সম্পর্কে জানা ... ক্লোজ
- * লিলি যে-পথে স্কুলে যেত, সে-পথ ধরে হাঁটা এবং গ্যাব্রিয়েল ডিগানের সঙ্গে কথা বলা ... ক্লোর এবং সোফি
- * গ্যালারিতে যাওয়া ... পোর্টার এবং ন্যাশ
(ম্যানেজার = মিসেস এডউইন্স)
- * পার্মিট অফিসের সূত্র ধরে শিকাগোর লবণাক্ত পানির পুলের তালিকা তৈরি করা ... ক্লোজ
- * স্থানীয় অ্যাকুয়ারিয়াম এবং অ্যাকুয়ারিয়াম সাপ্লাই হাউসগুলোতে খোঁজ নিতে হবে ... ক্লোর
- * রেনল্ডস পরিবারের ঋণের ব্যাপারটা চেক করে দেখবে হসম্যান

৪৩.
পুল
তৃতীয় দিন, সকাল ৯:২৩

শিকাগো মেট্রোর হেডকোয়ার্টার্সে ধার হিসেবে যে-রুম দেয়া হয়েছে এফবিআই-কে, সেটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পুল। তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে।

শিকাগো ফিল্ড অফিস থেকে কয়েকজন এজেন্ট এসেছিল, গতকালের সারাটা রাত খরচ করে ওই দেয়াল নতুনভাবে তৈরি করে দিয়ে গেছে তারা। এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যেসব ডেটা পাওয়া গেছে, সেসব। শোভা পাচ্ছে ক্রাইম সিনে যেসব ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে, সেসবও।

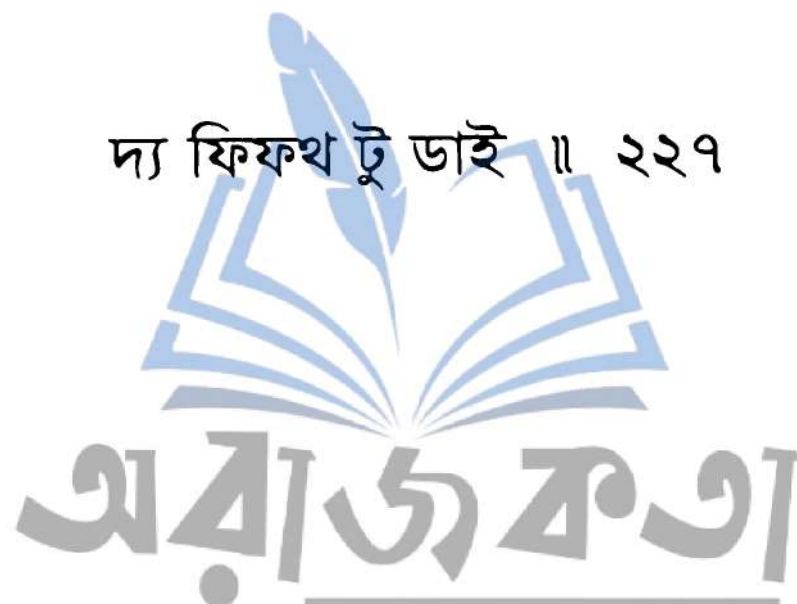
আসলেই, খুব বিস্তারিত এক উপায়ে কাজ করেছে ডিটেকটিভ পোর্টার। আলাদা আলাদা রঙযুক্ত প্রতিটা থাম্বট্যাগের মানে ঠাহর করে নিতে বেশি সময় লাগল না পুলের। লাল রঙ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কোথায় কোথায় দেখা গেছে বিশপকে। যে-সংবাদকর্মী অথবা সংবাদমাধ্যম খবরটা দিয়েছে, তাদের অবস্থান বোঝানো হয়েছে নীল রঙের মাধ্যমে। ফোর মাস্কি কিলারের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে, সে-রকম পদ্ধতি অনুসরণ করে যাদেরকে অপহরণ অথবা হত্যা করা হয়েছে, তাদের বাসস্থান চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে হলুদ রঙের থাম্বট্যাক।

জ্যাকসন পার্কে একটা হলুদ ট্যাক দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছিল এলা রেনল্ডসের লাশ। পোর্টার একটা কথা জোর দিয়ে বার বার বলেছে, ওই মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া অথবা মেয়েটার লাশ পাওয়ার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই বিশপের। তারপরও নিজের সেই ম্যাপে জ্যাকসন পার্ককে চিহ্নিত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে সে। তারপর একসময় মার্কারটা সরিয়ে ফেলারও চেষ্টা করেছে। বিশেষ এই ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলল পুলকে। গত দু'মাসে শিকাগো শহর-এলাকায় তিনটা খুন হয়েছে, এবং সে-ব্যাপারে অবগত আছে সে। তিনটার কোনোটাই চিহ্নিত করা হয়নি পোর্টারের সেই ম্যাপে। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, এলা রেনল্ডসের কেসটা কেন চিহ্নিত করতে গেল সে?

লিলি ডেভিসের বেলায় ব্যবহৃত হয়নি কোনো থাম্বট্যাক। জোরালো সম্ভাবনা আছে, পোর্টার একটা ট্যাক লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে-রকম কোনো সুযোগ পায়নি বেচারী।

এই বিল্ডিংয়ের অন্য কোনো এক জায়গা থেকে নতুন একটা হোয়াইটবোর্ড নিয়ে আসা হয়েছে, সেদিকে এগিয়ে গেল পুল। কোথেকে আনা হয়েছে ওটা, জানতে চায়নি সে। বোর্ডের ওপরে বাঁ দিকে লিবি ম্যাকিনলে'র নামটা লিখল। মেয়েটার ফটো আটকে দিল সে-নামের নিচে। ক্রাইম সিন থেকে যেসব ছবি তোলা হয়েছে, সংযোজন করল সেগুলোও। সবশেষে জুড়ে দিল ওর নিজের লেখা নোট।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২২৭



অরাজকতা



বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছিল।

হাত এবং পায়ের আঙুলগুলো আলাদা করে ফেলা হয়েছে শরীর থেকে।

কান, চোখ এবং জিহ্বাও কেটে ফেলা হয়েছে।

অসংখ্য কাটাকুটির চিহ্ন পাওয়া গেছে... নির্যাতন করা হয়েছে।

বদলা নেয়া হয়েছে।

নকল পরিচয় পাওয়া গেছে

(লাইসেন্স/পাসপোর্ট, নাম লেখা ছিল ক্যালিন সেলকে)

একটা .৪৫ পিস্তল পাওয়া গেছে

ক্যালিন সেলকে নামটা সার্চ করে দেখেছে ওরা। জানতে পেরেছে, সাত বছর বয়সী এক শিশুর নাম ওটা। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে খুন করা হয়েছে ওকে। ঘটনাটা ঘটেছিল ইলিনয়ের উডস্টকে। যদি বেঁচে থাকত মেয়েটা, তা হলে আজ সে বয়সে লিবি ম্যাকিনলের চেয়ে মাত্র এক মাসের ছোট হতো। আরও কথা আছে। পরিচয়পত্র বলতে যা-যা পাওয়া গেছে লিবি ম্যাকিনলের বাসায়, তার সবই ভুয়া না। কোনো কোনোটা আসল সরকারি কাগজ। তার মানে হচ্ছে, সেলকের জন্মসনদের একটা কপি অবশ্যই ছিল লিবির কাছে। এবং আরও ছিল ওই মেয়ের সোশাল সিকিউরিটি কার্ড। এই জিনিসগুলো কাজে লাগিয়ে একটা পাসপোর্ট হাতিয়ে নিয়েছে সে। তারপর এই তিনটা ডকুমেন্ট কাজে লাগিয়ে আবেদন করেছে এবং নকল নামে পেয়ে গেছে একটা ড্রাইভার'স লাইসেন্স। এসব কাজ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু জেলখানায় যে-সময়টা কাটিয়েছে ওই মেয়ে, ততদিনে হয়তো শিখে নিয়েছিল ওসব পদ্ধতি। পুলের ধারণা, চোদ্দ শিকের পেছনে থাকা অবস্থাতেই এই কাজগুলো করেছে মেয়েটা। কিন্তু সেক্ষেত্রে কারও না কারও সাহায্যের দরকার হয়েছে তার। জেলখানায় কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে সে, ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। আর তাই “গবেষণা” বলতে যা বোঝায় এসব ক্ষেত্রে, সে-কাজ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু চিঠি লেখা এবং সেগুলো জায়গামতো ডাকযোগে পাঠানোর যে-কাজ, সেসব করে দিয়েছে জেলখানার বাইরের কেউ।

লিবি ম্যাকিনলের নামের নিচে যেসব তথ্য সংযোজিত হয়েছে, সেসবের মধ্যে শেষ জিনিসটা হচ্ছে, একগোছা সোনালি চুলের একটা ছবি। যা-যা লেখা হয়েছে সেসব থেকে বিশেষ ওই ছবি পর্যন্ত একটা তীরচিহ্ন আঁকল পুল। নামের পাশের কলামে টেপের সাহায্যে আটকে দেয়া হয়েছে ছবিটা। সে আশা করেছিল, চুলের ওসব নমুনা থেকে ডিএনএ প্রোফাইল তৈরি করতে পারবে ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন টিম। কিন্তু সে-রকম কিছু করা যায়নি। যে-ই ওসব চুলের মালিক বা মালকিন হয়ে থাকুক না কেন, তার মাথা থেকে উপড়ে ফেলা হয়নি সেগুলো, বরং কেটে আলাদা করা হয়েছে। শনাক্ত করার মতো কোনো তথ্যই পাওয়া

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২২৮

যায়নি। তারপরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে ওগুলো নিয়ে। জানা গেছে, ওসব চুল যার, ধূমপান করার অভ্যাস ছিল সে-মানুষটার। এবং তামাক যেমন সেবন করত সে, একইভাবে সেবন করত মারিজুয়ানা। শুধু তা-ই না, জ্যানাব্র নেয়ারও অভ্যাস ছিল তার। উদ্বেগ কমানোর জন্য খুব সাধারণ একটা ওষুধ ওটা।

চুলগুলো কোনো পুরুষলোকের, নাকি কোনো মেয়েমানুষের, নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ল্যাবরেটরির পরীক্ষানিরীক্ষায় মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে, ওসব চুলের বয়স কম করে হলেও বিশ বছর। ফলে, যে-মানুষটার মাথা থেকে আলাগা করা হয়েছে ওসব চুল, তার বয়স সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাওয়া যায়নি, পাওয়া সম্ভবও না। কোনো একজনের মাথা থেকে পনেরো কি বিশ বছর আগে কেটে আলাদা করা হয়েছিল ওসব চুল, জানিয়েছে ল্যাবরেটরির টেকনিশিয়ানরা। চুলগুলো দু'প্রান্তে আটকে রাখার কাজে যে-দুটো কালো ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো সাধারণ মানের ইলাস্টিক... প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম গুডি। প্রায় প্রতিটা ওষুধ এবং মুদি সামগ্রীর দোকানে পাওয়া যায় ওসব জিনিস।

‘কোথায় রাখবো এটা?’

ঘুরল পুল। দেখতে পেল, অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে ডিনার, হাতে বড় একটা সাদা বাক্স। ডিটেকটিভ ন্যাশ আর নর্টন খুঁজে পেয়েছিল এই বাক্স, আজ থেকে মাস চারেক আগে, লা স্যাল-এর একটা অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে ওদের জন্য এই বাক্স প্রস্তুত করে রেখেছিল বিশপ, ভেতরে গুঁজে দিয়েছিল একগাদা কাগজপত্র। বলল, ‘ওই টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখো।’

ভারী একটা শব্দ তুলে বাক্সটা জায়গামতো নামিয়ে রাখল ডিনার। ‘এটার ভেতরে যা-যা আছে, সবকিছুর সূচীপত্র তৈরি করা হয়েছে। স্ক্যান করে ইমেজও বানানো হয়েছে। তুমি চাইলে তোমার ট্যাবলেটেও দেখতে পারো ওসব। তারপরও আসল জিনিস তোমার দরকার হলো কেন, বলো তো?’

‘ইমেজ ঘাঁটাঘাঁটি করা আসলে খুব একটা কাজে দেয় না আমার বেলায়। সত্যিকার অর্থেই স্পর্শ করা যায়, এমন কিছু একটা চাই আমি।’

‘ও আচ্ছা। যা হোক, যা করার, তাড়াতাড়ি করো। হার্লস কিন্তু বলে দিয়েছেন, এসব খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে তুমি আসলে তোমার সময় নষ্ট করছ। তিনি চান, আমরা যাতে গিয়ে কথা বলি ম্যাকিনলে মেয়েটার প্রতিবেশীদের সঙ্গে। চান, আমরা যাতে গিয়ে কথা বলি ওই মেয়ের প্যারোল অফিসারের সঙ্গে।’

‘তুমি গিয়ে করছ না কেন ওসব কাজ?’

‘তা-ই নাকি? আমি যাবো?’

মাথা বাঁকাল পুল। ‘ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসারদের দিয়ে গুরু করতে পারো। তারা ইতোমধ্যেই ওই মেয়ের বেশিরভাগ প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলে ফেলেছে। তুমি চাইলে মেয়েটা যে-বাড়িতে থাকত, সেটার আশপাশের জায়গাগুলো আবারও ঘুরেফিরে দেখে আসতে পারো। আমি ফোন করেছিলাম ওই



প্যারোল অফিসারকে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইনি। পাওয়ামাত্র আমরা দু'জনে দেখা করতে যাবো।’

অফিসের ভেতরে এভাবে আটকা পড়ে আছে, এই ব্যাপারটা রীতিমতো ঘেন্না হয় ডিনারের। পুল জানে, “মাঠে যাওয়া” বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো সুযোগ পাওয়ামাত্র লুফে নেবে ডিনার, এমনকী এই আবহাওয়াতেও। আরও জানে, লিবির প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ কোনো ফায়দা হবে না আসলে। কিন্তু তাতে কোনো পরোয়া করে না সে। শুধু চায়, ওকে আর কোনোভাবেই যাতে বিরক্ত না করে ডিনার।

চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দরজার দিকে পা বাড়াল ডিনার। একটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রেখেছিল ওর কোট, হাত বাড়িয়ে নিল সেটা। ‘সম্ভবত আর এক ঘণ্টার মধ্যে ফিল্ড অফিস থেকে ফিরে আসবেন হার্লস সম্ভবত। তিনি হাজির হওয়ার আগেই যদি এখন থেকে বেরিয়ে যাও তুমি, ভালো হয়।’

ওর উদ্দেশ্যে চট করে আরেকবার মাথা ঝাঁকাল পুল। তারপর ফিরে গেল ওই বাক্সের কাছে। হার্লসকে নিয়ে একটুও কোনো দূর্শিত্তা কাজ করছে না ওর মনে।

বাক্সের ভেতর থেকে আলগা করতে লাগল কাগজের স্তুপগুলো। সুন্দর সারি করে সেগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল টেবিলের ওপর।

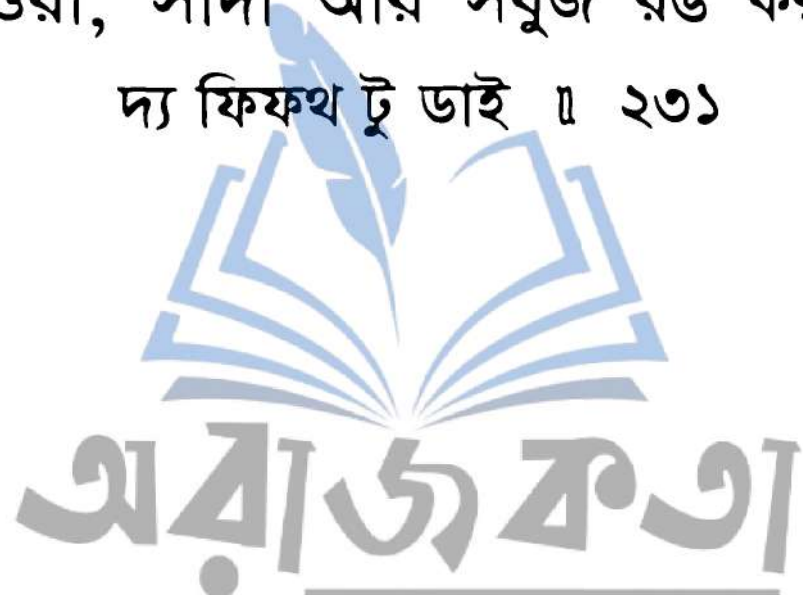
88.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, সকাল ৯:৩৩

‘আপনাকে একটা কথা সোজাসুজি বলে রাখতে চাই, ছুটি কাটাতে এসে যা করছেন আপনি, বড় ভুল করছেন,’ বলল ট্যাক্সিক্যাবের সামনের সিটে বসা হার্শেল ক্রিসম্যান। ‘শহরের এই জায়গায় পা-ই রাখে না বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট। যখন রাখে, দৌড়ে পালায়। অপরাধের সঙ্গে জড়িত যেসব দল আছে এখানে তাদের সঙ্গে মোলাকাত করার চেয়ে, যেসব ওঝানি ঝাড়ফুক করে অথবা যারা ড্রাগস বেচে, তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা অনেক ভালো। এসব এলাকার মানুষজন এত গরিব যে, তারা দুধ বাঁচানোর জন্য সিরিয়াল খায় কাঁটাচামচ দিয়ে। কোথাও যেতে হলে এক বাস ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাদের।’

হাসল পোর্টার... গত দু’দিনের মধ্যে এই প্রথমবার। প্রথম দেখায় এই এলাকা খুব একটা খারাপ লাগেনি ওর। শটগান হোম বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কয়েকটা বাড়ির কাছে পার্ক করা আছে ওদের ট্যাক্সি এই মুহূর্তে। এসব বাড়ি আকারে ছোট, একতলা। ভেতরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে একটা মাত্র ঘর, সেটা বারো ফুট বাই বারো ফুটের বেশি হয় না। এবং হলরুম বলতে কিছু থাকে না কখনোই। সাউথ ব্রড অ্যাভিনিউ’র ধারে গড়ে উঠেছে এই বাড়িগুলো। একেকটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে প্রতিটা বাড়িরই। শিকাগোর কুক কাউন্টি প্রিজনের পাশে ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাভিনিউতে এ-রকম ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দেখা পেয়েছে পোর্টার। কোনোটা কাজ করছে জামিন নেয়ার অফিস হিসেবে। কোনোটাতে কাজ করছেন উকিলেরা। আবার কোনোটা ব্যবহৃত হচ্ছে বিনামূল্যে চেক ভাঙানোর স্টোর হিসেবে। শিকাগোতে দেখা যায়, এসব জায়গার দেয়ালগুলোতে ঐকে রাখা হয়েছে হরেক গ্রাফিতি বা দেয়ালচিত্র। জানালাগুলোয় শোভা পাচ্ছে মোটা গরাদে। কিন্তু এখানে, নিউ অরলিন্সের চাকচিক্যের আড়ালে ও-রকম প্রতিটা অফিস আসলে গোপন করার চেষ্টা করেছে কোনো না কোনো কদর্যতা। এবং সেসব চাকচিক্য আর কিছুই না... উজ্জ্বল রঙের পেইন্ট এবং অলঙ্করণযুক্ত স্থাপত্য নকশা।

পোর্টারদের ট্যাক্সি যে-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার ঠিক পরের বাড়িটাই একটা বেইল-বন্ড অফিস, মানে জামিন নেয়ার কাজ করা হয় সেখানে। সেখানে আবার একটা পোর্চও আছে। ওই জায়গায় দেখা যাচ্ছে বেতের দুটো চেয়ার। হাঁটু সমান উঁচু একটা টেবিলকে ঘিরে রেখেছে ওই চেয়ার দুটো। দেখলে মনে হয়, সকালের লেমোনেডটা খাওয়ার জন্য জুৎসই একটা জায়গা। যে-বাড়ির সামনে পার্ক করেছে ওরা, সাদা আর সবুজ রঙ করা আছে সেটাতে। দরজায়

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৩১





আটকে দেয়া হয়েছে ছোট একটা নামফলক, সেটাতে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে... সারা ওয়ার্নার, আইনজীবী।

‘একটু সময় লাগতে পারে,’ বলল হার্শেল।

‘অপেক্ষা করতে অসুবিধা নেই আমার।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হার্শেল। ‘মিটারে যে-ভাড়া উঠছে, খরচ কিন্তু আপনার।’

রাস্তার ও-প্রান্তে গলি থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। দাঁড়াল ফুটপাতে। পরনের প্যান্ট নামিয়ে ফেলল কিছুটা। পেশাব করছে লোকটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই পোর্টারের। কাজ সারতে সারতে অচেনা কোনো সুরে শিস বাজাচ্ছে ওই লোক। সুরটা চিনতে পারল না পোর্টার। কাজ শেষে প্যান্ট তুলে জিপার আটকাল লোকটা। তারপর গিয়ে ঢুকে পড়ল ওই গলিতে। হাই তুলছে, মুখে একটা হাত তুলে দিয়েছে। গলিটা ডুবে আছে গাঢ় ছায়ায়। সেখানে আরও তিনজন লোককে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি করতে দেখল পোর্টার। আরেকজনকে দেখা গেল গুয়ে আছে একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো স্লিপিং ব্যাগে। একধারে আছে একটা ডাস্টবিন, সেটার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কার্ডবোর্ডের বড়সড় একটা বাক্স। একটা লোককে, বলা ভালো একটা ছায়াকে দেখা গেল গিয়ে ঢুকে পড়ছে ওই বাক্সের ভেতরে।

‘ওই লোক এখানকার কেউ না,’ বলল হার্শেল।

‘না?’

‘নিউ অরলিন্সের লোকজন হয়তো ধনী না, কিন্তু নিজেদের শহরের প্রতি সম্মান আছে আমাদের। এমনকী এই শহরের নোংরা জায়গাগুলোও নোংরা করি না আমরা।’

এগিয়ে এসে পোর্টারদের পাশে থামল কালো একটা বিএমডব্লু। সেটার জানালার কাচগুলো টিন্টেড।

‘নিন, এসে গেছেন আপনার সেই উকিল,’ বলল হার্শেল।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পোর্টার। ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুলে গেল। নামল একজন মহিলা। তার মাথার বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। চেহারা য ইয়া বড় সানগ্লাস। অফিসের উদ্দেশ্যে পা বাড়ানোর আগে দেখে নিল পুরো ব্লকটা। লাগিয়ে দিল গাড়ির দরজা। তারপর হাঁটা ধরল অফিসের উদ্দেশ্যে।

ট্যাক্সিক্যাবের সামনের সিটের কাছে ঝুঁকে পড়ল পোর্টার। ‘কত টাকা হয়েছে আমার?’

জবাব দেয়ার আগে আয়নায় একবার নজর বুলিয়ে নিল হার্শেল। ‘১৬ ডলার ৭৫ সেন্ট।’

বিশ ডলারের একটা নোট হার্শেলের হাতে ধরিয়ে দিল পোর্টার। হাতের ইশারায় খুচরো টাকাটা রেখে দিতে বলল ওই লোককে।

‘কী করবো? অপেক্ষা করবো আপনার জন্য?’

এখনও ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে পোর্টার। দেখছে, সেই ল’ অফিসের সামনের দরজার তালা খুলছে সে। কাজ শেষে ঢুকে পড়ল ভেতরে, লাগিয়ে দিল দরজাটা। দশ ডলারের আরেকটা নোট হার্শেলের হাতে ধরিয়ে দিল পোর্টার। ‘পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন আমার জন্য। যদি ততক্ষণে না আসি আমি, চলে যাবেন। আর যদি কোনো দরকার হয়, আপনাকে ফোন করবো।’

টাকাটা নিল হার্শেল, চালান করে দিল শার্টের পকেটে। ‘এত কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন আপনি... তিনি নিশ্চয়ই আপনার জন্য বিশেষ কেউ।’

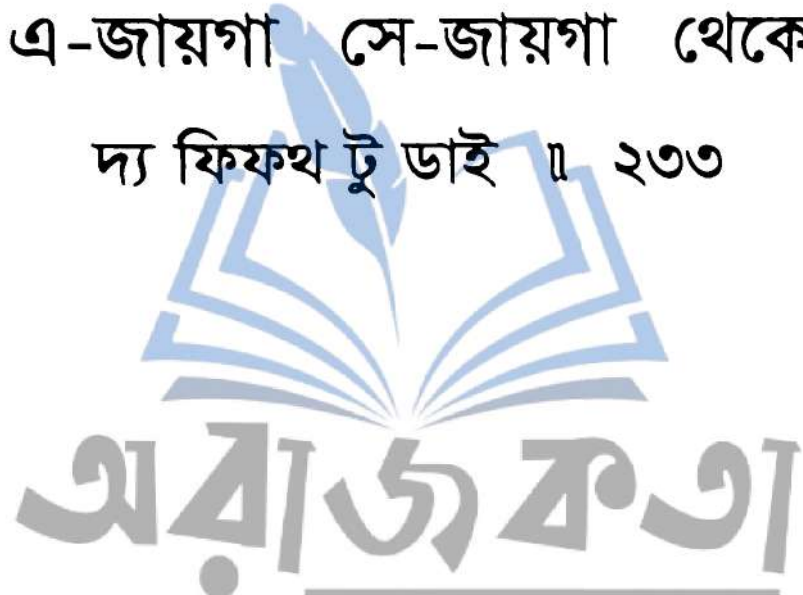
ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল পোর্টার। ওই অফিসের উদ্দেশে পা বাড়ানোর আগে ট্যাক্সির ছাদে একটা টোকা দিল। তারপর ঘুরল।

অফিসের দরজাটা যখন খুলল সে, ভেতরে কোথাও একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। নিজের জন্য পথ করে নিতে হলো ওকে। এয়ার কন্ডিশনার চলছে ভেতরে, ওর গায়ে যেন একটা তরঙ্গের মতো এসে আঘাত করল বায়ুপ্রবাহ। বাইরের আবহাওয়া কতখানি গরম আর আর্দ্র, এতক্ষণ টের পায়নি সে। অথচ এখন বলতে গেলে কেবল সকাল হয়েছে।

‘বসে পড়ুন। একটু আরাম করুন। আসছি আমি।’ অফিসের ভেতর থেকে শোনা গেল একজন মহিলার কণ্ঠ। ‘মাত্র এসেছি। চা বানাচ্ছি। ক্যাফেইন ছাড়া আমি আবার কোনো কাজের না।’

অফিসটা বেশি বড় না। চওড়ায় মাত্র দশ ফুট হবে। লম্বায় চোদ্দ। দেখলেই বোঝা যায়, পুরো জায়গাটা বদল করে ফেলার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপরও পোর্টারের মনে হচ্ছে, কোনো একটা ল’ অফিসে যেন দাঁড়িয়ে নেই সে, বরং দাঁড়িয়ে আছে পুরনো কোনো বাসার পার্লামেন্টে। এখানকার ছাদ উঁচু। ক্রাউন মোন্ডিঙের ডেকোরেশন আছে চারধারে। দেয়ালের নিচের অংশগুলোতে দেখা যাচ্ছে কাঠের প্যানেলিং। পোর্টারের হাতের ডান দিকে বড় একটা জানালা আছে, আর সেটার পাশে আছে একটা ফায়ারপ্লেস। সেখানে আরও আছে ছোট একটা কাউচ, আর দুটো চেয়ার। ওর হাতের বাঁ দিকের দেয়াল জুড়ে তৈরি করা হয়েছে কয়েকটা বুকশেলফ। সেগুলো দেখতে এই বাড়ির মতোই পুরনো লাগছে। ঘরের পেছনদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যান্টিক কাঠের ডেস্ক। সেটার সঙ্গে আছে আরও দুটো চেয়ার। ওই ডেস্ক আর চেয়ার দুটো... সব জায়গাতেই স্তূপ হয়ে আছে বই আর কাগজ। এগুলো ছাড়িয়ে পেছনে দেখা যাচ্ছে একটা দরজা, সেটা খুলেছে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা হলওয়েতে। মনের পর্দায় পোর্টার যেন দেখতে পেল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, এককালে সে-জায়গা একটা সিটিং রুম ছিল, আর পেছনদিকে ছিল একটা কিচেন এবং অনাড়ম্বর একটা ফ্যামিলি রুম। যেন শুনতে পেল, বাসার এ-জায়গা সে-জায়গা থেকে চিৎকার-চঁচামেচি করছে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৩৩



অরাজকতা



বাচ্চাকাচ্চারা। কিন্তু ভূতুড়ে সেসব আওয়াজ প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে গেছে বহু আগেই।

‘যদি কিছু মনে না করেন, আমার ডেস্কের সামনের চেয়ার দুটো থেকে বইপত্র সরিয়ে ফেলুন। মেঝেতে নামিয়ে রাখলেই হবে,’ পেছনের ঘর থেকে আবার শোনা গেল ওই মহিলার কণ্ঠ। ‘দুঃখিত, আজ কেউ দেখা করতে আসবে আমার সঙ্গে, এমনটা আশা করিনি।’

দ্বিতীয় আরেকটা তলা আছে এই বাড়িতে। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েই ব্যাপারটো মোটামুটি ঠাহর করে নিয়েছিল পোর্টার।

বাড়তি সেই জায়গা কোনো এককালে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল কি না, ভাবল সে। ভাবল, এখানে হয়তো কোনো একসময় থাকত সারা ওয়ার্নার।

ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল সে। একটা চেয়ারের ওপর থেকে সরিয়ে নিল বই এবং কাগজপত্রের স্তুপ। ওগুলো নামিয়ে রাখল অন্য চেয়ারটার স্তুপের ওপর। তারপর বসে পড়ল।

ডেস্কের পাশের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধাই করা অবস্থায় ঝুলছে কয়েকটা ডিগ্রি সেসবের ওপর নজর বুলিয়ে জানা গেল, মিস ওয়ার্নার তার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেছে পেন সেট থেকে। আইনের ওপর ডিগ্রিটা সে নিয়েছে ইউনিভার্সিটি অভ পেনসিলভানিয়ার ল’ স্কুল থেকে, ১৯৯৮ সালে। পোর্টার কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে উঠতে পারেনি। হাই স্কুলের পড়া শেষ করে যোগ দিয়েছিল পুলিশ ফোর্সে। ক্রিমিনাল জাস্টিসের ওপর কোনো ডিগ্রি নেয়া যায় কি না, ভেবেছিল। কিন্তু পরে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছিল, ওই ডিগ্রি বিশেষ কোনো কাজে আসবে না ওর, বরং উল্টো আরও ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে ওকে। ডিটেকটিভের চেয়ে বড় কিছু যদি হতে চাইত সে, তা হলে প্রাতিষ্ঠানিক সনদও বেশি লাগত ওর। কিন্তু সে-রকম কোনো খায়েশ কখনোই ছিল না ওর মনে। সে দেখেছে, যারা ওর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তাঁদেরকে পিঠে অনেক ভারী বোঝা বহন করতে হয়। দিনের পর দিন পার করে দিতে হয় ডেস্কের পেছনে বসে, দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয় খরচাপাতি নিয়ে, কাকে কোন কাজে নিয়োগ দেয়া হবে না-হবে সেসব নিয়ে। মাঠের কাজটাই একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে সবসময় কাজ করেছে পোর্টারের মাথায়।

‘খুবই দুঃখিত... এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম আপনাকে।’

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পোর্টার। দেখতে পেল, ডেস্কের পেছনে হুলুয়েতে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা। তার দু’হাতে দুটো চায়ের-কাপ, ধোঁয়া উঠছে ও-দুটো থেকেই।

‘আপনার জন্য এক কাপ চা নিয়ে এসেছি,’ বলল মহিলা। ‘ভাবলাম, যদি না আনি, তা হলে হয়তো অভদ্রতা হবে। তা ছাড়া... কেউ যখন আসে আমার

অফিসে, আমি আবার তখন একা খেতে পারি না চা।’ অদ্ভুত একজাতের ফুলিঙ্গ খেলা করছে মহিলার বাদামি দুই চোখে। ওসব কথা যখন বলল সে, একজাতের দুষ্টমি ফুটে উঠল তার চেহারায়ে। ‘আরে আমি তো জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছি দুধ বা চিনি কিছু লাগবে কি না আপনার।’

নিজের কাপটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল পোর্টার। ‘আপনি যা এনেছেন তাতেই কাজ চলবে। ধন্যবাদ।’

মহিলার কথায় একজাতের টান আছে। বোঝা যায়, ওই ব্যাপারে চর্চা করেছে সে, নিজেকে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারপরও খানিকটা হলেও রয়ে গেছে ওই টান। সেটা শুনে তাকে স্থানীয় বলে মনে হয় না। ক্যাজুন... মানে, দক্ষিণ লুইজিয়ানার অধিবাসী ফরাসি-কানাডিয়ানদের বংশধর বলে মনে হয়।

হাসল সারা ওয়ার্নার। একটা কাপ ধরিয়ে দিল পোর্টারের হাতে। কমণীয় এক ভঙ্গিতে বসে পড়ল ডেস্কের পেছনে নিজের চেয়ারে। নিজের কাপটা দু’হাতে ধরে তুলল ঠোঁটের কাছে। পরনে গাঢ় ধূসর স্কাট সুট। লোম চেঁছে-ফেলা পা আবৃত করে রেখেছে কালো মোজা। ডেস্কের আড়ালে ওই পা দুটো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাপারটা খেয়াল করল পোর্টার এবং একধরনের অপরাধবোধে জর্জরিত হলো। নজর ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল দেয়ালে ঝোলানো সেই ডিগ্রিগুলোর দিকে। মনে মনে অঙ্ক কষল একটা। মুখোমুখি বসা এই মহিলা যদি কোনো ক্লাসে ফেল না করে সোজা গিয়ে ভর্তি হয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, মহিলার বয়স পঁয়তাল্লিশের আশপাশে হবে। অর্থাৎ পোর্টারের চেয়ে দশ বছর কম। এই অফিসে এভাবে বসে না থাকলে ও-রকম কোনো অনুমান কখনও করত না সে। যদি রাস্তায় দেখা হতো মহিলার সঙ্গে, তা হলে ধারণা করে নিত, মহিলার বয়স বড়জোর পঁয়ত্রিশ। চোখের পাশে সূক্ষ্ম কিছু রেখা আছে বটে, কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়ে বললে মহিলার ত্বকে কোথাও কোনো খুঁত নেই। মৃদু ঢেউ তুলে তার কাঁধে এসে লুটিয়ে পড়েছে বাদামি চুলগুলো। বাতাসে লাইলাকের মৃদু একটা সুবাস টের পাচ্ছে পোর্টার।

‘আপনি কে, সেটা মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত আমার,’ বলল মহিলা, হাসিটা এখনও ধরে রেখেছে ঠোঁটের কোনায়।

নিজেকে সামলে নিল পোর্টার। ‘দুঃখিত। গত কয়েকটা দিন কেমন একটা পাগলের মতো সময় কাটছে আমার।’ নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড দিল মহিলাকে। ‘আমি ডিটেকটিভ স্যাম পোর্টার। শিকাগো মেট্রোতে আছি।’

একটা মুহূর্ত ওই কার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল মহিলা। তারপর কার্ডটা নামিয়ে রাখল ডেস্কের এক কোনায়। ‘সেই ফোর মাস্কি কিলার?’

‘কেসটার কথা মনে আছে আপনার?’

মহিলার ফোনের কাছে স্থূপ হয়ে আছে বেশকিছু কাগজ, পোর্টারের কার্ডটা তুলে নিয়ে সেগুলোর কাছে রেখে দিল সে। ‘ডিটেকটিভ, আমি একজন ক্রিমিনাল



ডিফেন্স অ্যাটর্নি। যদি স্বীকার করতে হয় তো সবার আগে আমি বলবো, একজন অপরাধীর মন নিয়ে যেসব জল্পনা-কল্পনা আছে আমার, সেসব আবেশের কাছাকাছি পর্যায়ে পড়ে। মানে, তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে একজাতের আবেশ অনুভব করি। হাই প্রোফাইল কেস বলতে যা বোঝায়, সেসব যত ঘনিষ্ঠভাবে সম্ভব, অনুসরণ করি আমি। এবার বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে? আপনি কি ভাবছেন, শিকাগো থেকে পালিয়ে নিউ অরলিন্সে চলে এসেছে ওই খুনি?’

একটুখানি চা খেল পোর্টার, তারপর কাপটা নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর। ‘আমি আপনাকে কিছু একটা দেখাবো। যা দেখবো, সেটা আমার এবং আপনার মাঝখানে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আপনি কারও সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারবেন না। বুঝতে পেরেছেন? আমরা এখনও আমজনতাকে কিছুই জানতে দিইনি এটার ব্যাপারে। বিশেষ এই তথ্য ফাঁস হয়ে যাক, এ-রকম কোনো ঝুঁকি নেয়াও সম্ভব না আমাদের পক্ষে।’

‘অবশ্যই।’

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল পোর্টার। বের করে আনল বিশেষ ওই ফটো। ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল ওটা। ঘুরিয়ে দিল, যাতে ভালোমতো দেখতে পায় মহিলা।

কিন্তু ছবি না, ওয়ানারের দুই চোখ নির্নিমেষ দেখছে পোর্টারকে। একটা মুহূর্ত, তারপর নজর নামিয়ে তাকাল ওই ছবির দিকে। ‘ওটা কি...’

‘হ্যাঁ, আপনার মক্কেল। অন্তত আমার তা-ই বিশ্বাস।’

‘কিন্তু ফোর মাস্কি কিলারের সঙ্গে ওই মহিলার কী সম্পর্ক?’

এবার ছবিটা ওল্টাল পোর্টার। যে-নোট লেখা আছে ওটার পেছনে, সেটা দেখাল মহিলাকে।

‘আমার মনে হয় আমি খুঁজে পেয়েছি তাঁকে। বি,’ শব্দ করে পড়ল ওয়ানার। ড্র কুঁচকে গেছে। তাকাল পোর্টারের দিকে। ‘বুঝলাম না। কে কাকে খুঁজে পেয়েছে?’

‘হাতের লেখাটা অ্যানসন বিশপের। ওর বিশ্বাস, আপনার মক্কেল ওর মা।’

ভাবলেশহীন অভিব্যক্তিটা এখনও লেপ্টে আছে ওয়ানারের চেহারায়। ‘আপনার কী বিশ্বাস, বলুন তো?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পোর্টার। ‘কী বিশ্বাস করবো আমি আর কী করবো না, বুঝতে পারছি না। আমার এখন যা অবস্থা, যে-সূত্র পাচ্ছি, সেটাই অনুসরণ করছি। যা হোক, ছবির এই মহিলার ব্যাপারে আমাকে কী কী বলতে পারেন আপনি?’

ছবিটা পোর্টারের দিকে ঠেলে দিল ওয়ানার। তার হাতের ডান দিকে কাগজপত্রের আরেকটা স্তুপ আছে, সেখান থেকে টেনে বের করল একটা ম্যানিলা

ফাইল। খুলল ফাইলটা। ভেতর থেকে বের হলো একটা ছবি। সেটার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে কিছু ডকুমেন্ট।

‘জেন ডো নম্বর ২১৩৮। এই উপাধি ছাড়া এবং ওই মহিলার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা ছাড়া, তার বিরুদ্ধে বলতে গেলে কিছুই জানি না আমি। এ-পর্যন্ত তার সঙ্গে দু’বার দেখা হয়েছে আমার। এবং এখন পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি সে।’

‘আপনার সঙ্গেও না?’

‘না, আমার সঙ্গেও না।’

‘আমি জেলখানায় গিয়েছিলাম। ওয়ার্ডেনের অফিস থেকে আমাকে বলা হয়েছে, মহিলা নাকি নির্দিষ্ট করে আপনার নাম উল্লেখ করেছে, আপনার জন্য অনুরোধ করেছে। এ-পর্যন্ত যা বলেছে সে, তা শুধু আপনার নাম।’

এবার অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকানোর পালা ওয়ার্ডেনের। ‘কেন ও-রকম করল সে, সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। এমনকী আমার নাম কোথেকে জোগাড় করেছে, তা-ও জানি না। তবে একটা কথা ঠিক, নিজের বিজ্ঞাপনটা স্থানীয়ভাবে বেশ প্রচার করি আমি। কাজেই হতে পারে, আমার কার্ড দেখেছে ওই মহিলা। অথবা আমার কোনো ফ্লায়ার দেখেছে। আবার এমনও হতে পারে, কারও কাছ থেকে শুনেছে, জনকল্যাণমূলক কিছু কাজ করি আমি। আবার কে জানে, কোনো একটা ফোনবুক থেকে হয়তো হুট করেই বাছাই করে নিয়েছে আমার নাম। যা হোক, প্রথমবার যখন দেখা হলো মহিলার সঙ্গে, তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে সে। আমার সঙ্গে যা-ই বলুক না কেন সে, সেসব কথা পাচার হবে না কারও কাছে। আমি সেসব কথা ভাগাভাগি করবো না কারও সঙ্গে। উকিল আর মক্কেলের মধ্যে যে-গোপনীয়তা থাকে, সে-ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিলাম আমি তাকে। সেদিন ত্রিশটা মিনিট ধরে কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে। জবাবে একটা কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি সে। শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।’ আরেক চুমুক চা খেল ওয়ার্ডেন। বলে চলল, ‘দ্বিতীয়বার যখন গেলাম জেলখানায়, মহিলার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেসব দেখলাম। ওগুলো ঠিক কতখানি গুরুতর, বুঝিয়ে বললাম তাকে। কিন্তু সেবারও কিছু বলল না সে। আমি যে তার আইনসঙ্গত প্রতিনিধি, এ-ব্যাপারে কাগজপত্র যা-যা ছিল, সবগুলোতে স্বাক্ষর করে দিল। আর তাই ধরে নিলাম, আমি যা-যা বলেছি তাকে, সবই বুঝতে পেরেছে। জানতাম পড়তে পারে সে। শুধু কথা বলতে চাইছেন না যে-কোনো কারণেই হোক।’

‘এখন পর্যন্ত কি আদালতে নেয়া হয়েছে ওই মহিলাকে?’

চোখ উল্টানোর কায়দা করল ওয়ার্ডেন। ‘কী একখানা দৃশ্য ছিল সেটা! আদালতকক্ষে যত রকমের দৃশ্য দেখা সম্ভব, সবই দেখা হয়ে গিয়েছিল জাজ কবরিকের। এবং কাজ বাদ দিয়ে কোনো খেলায় অংশ নেয়ার মতো মানুষ না

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৩৭



অরাজকতা



তিনি। হুমকি দিয়ে বললেন, তিনি ধরে নেবেন, ওই মহিলা নিজের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছে। কারণ সাজার শুনানির সময়ও একটা কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি মহিলা। আমি তখন তাঁকে বুঝিয়ে-গুনিয়ে দু'সপ্তাহ সময় নিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের উনিশ তারিখে আবারও আদালতে হাজিরা দেয়ার কথা আছে আমাদের। তার মানে হচ্ছে, এই কেস সাজিয়ে-গুছিয়ে আনতে এক সপ্তাহেরও কম সময় আছে আমার হাতে। আমি আজ আবারও যাচ্ছি ওই জেলখানায়। আজও যদি মুখ না খোলে ওই মহিলা, তা হলে একজন মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা চাইতে হবে আমাকে।'

‘আমি ওই মহিলার মুখে কথা ফোটাতে পারবো।’

তা শেষ করল ওয়ার্নার। তারপর কাপটা ধীরেসুস্থে নাড়াচাড়া করতে লাগল নিজের ম্যানিকিউর-করা কোমল আঙুলগুলোর সাহায্যে। ‘তারপর কী হবে? শিকাগোর কোনো একটা কেসে অভিযুক্ত করা হবে ওই মহিলাকে? ফলে আমার মক্কেলের কোন ভালোটা হবে, বুঝতে পারছি না।’

‘আমি ওই মহিলার পেছনে লাগিনি। তার ছেলের পেছনে লেগেছি।’

‘আপনি কেন ভাবছেন, ওই লোককে কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেটা জানা আছে মহিলার? আর যদি ধরেও নিই কথাটা জানে সে, আপনাকে কেন বলতে যাবে? জানেন কি না জানি না, আত্মরক্ষার চেয়েও অনেক শক্তিশালী একটা সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে মানুষের ভেতরে... সন্তানকে রক্ষা করার জন্য একজন মায়ের মধ্যে যে-প্রবৃত্তি থাকে, সেটা।’

‘আমি কথা বলাতে পারবো ওই মহিলাকে। আমি সাহায্য করতে পারবো আপনাকে।’ ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল পোর্টার। ‘প্লিজ, আমাকে দেখা করতে দিন ওই মহিলার সঙ্গে।’

হাসল ওয়ার্নার। বন্ধ করল ফোল্ডারটা। মাথা ঝাঁকাল শেষপর্যন্ত। ‘ঠিক আছে।’

ল্যারিসা খেয়াল করল, ঘরের অন্য দিকটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ফ্রিজারের সামনে, পেইন্টারদের তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা জিনিসটা দেখছে। কিছু একটা অবশ্যই ঢেকে রাখা হয়েছে সেখানে। ওই লোক... ওই প্রশিক্ষক লোকটা... চলে যাওয়ার আগে বলে গেছে, “এ-ই শেষ, আর না।” ল্যারিসা জানে, লোকটা আসলে অন্য কোনো মেয়ের কথা বুঝিয়েছে। তার মানে, ল্যারিসাকে নিয়ে যে-কাজ করতে চাইছে লোকটা, সেটা সে আগেও করেছে। এবং সে-কাজের জন্য ওই লোক ভালোমতোই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আরও বোঝা যায়, কোনো না কোনো বিশেষ পদ্ধতি মেনে কাজটা করে সে। সেটা এত সুশৃঙ্খল কোনো কিছু যে, বোঝাই যায়, মেয়েদেরকে এভাবে অপহরণ করে নিয়ে আসা, এভাবে খাঁচায় আটকে রাখা... এসব ওই লোকের জন্য প্রথমবার হতে পারে না।

ভাঙা কাচের ওই টুকরোটা তালুতে বেশ জোরে চেপে ধরে রেখেছিল ল্যারিসা। তাতে যা হয়েছে... ওর হাত কেটে গেছে, তা-ও আবার একবার না, দু'বার। তবে ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছু না। কিন্তু রক্ত বের হয়েছে। পরনের জিন্সে ঘষে সে-রক্ত মুছে ফেলেছে সে। জিন্সের সঙ্গেই চেপে ধরে রেখেছিল হাতটা। চাপের কারণে জোড়া লেগে গেছে ক্ষতের মুখ। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর টুকরোটা আবার তুলে নিয়েছিল সে। হাতের তালুতে কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করার ইচ্ছা ছিল না ওর। কিন্তু একটা একটা করে যত মুহূর্ত পার হয়েছে, ওর মুঠি তত শক্ত হয়ে গেছে আপনাআপনি। শক্ত হয়ে গেছে ওই কাচ আঁকড়ে রাখা আঙুলগুলোও। একসময় কাচটার রেজরের-মতো-ধারালো প্রান্তভাগে এত জোরে চাপ দিয়ে ফেলেছে যে, তালুতে উষ্ণ রক্তের স্পর্শ টের পেয়েছে। কিন্তু এবার রক্তপ্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেনি সে। বরং সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে অনুভব করার চেষ্টা করেছে ব্যথাটা। ফলে যা হয়েছে... বেদনার সেই অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছে ওর ইন্দ্রিয়গুলোকে। সতর্ক হয়ে উঠেছে সে। আশপাশে কী আছে না-আছে, সেসব খেয়াল করার একটা তাড়না জেগে উঠেছে ওর ভেতরে।

খাঁচার প্রতিটা ইঞ্চি চেক করে ফেলেছে সে।

ধাতব এই কাঠামো বল্টুর সাহায্যে বেশ মজবুত করে আটকে দেয়া হয়েছে মেঝের কঙ্কিটের সঙ্গে। মাথার ওপর এত বেশি জায়গা নেই যে, কোথাও চড়া যাবে... তারপর শরীরটা বাঁকিয়ে-মুচড়িয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে এই খাঁচা থেকে। খাঁচার ছাদ এবং যে-কোনো একদিকের দেয়ালের মধ্যে ব্যবধান আছে বড়জোর দু'ইঞ্চির। দরজায় যে-দুটো প্যাডলক বুলছে, সেগুলোও বেশ শক্তপোক্ত। গোলাকার। এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, বোল্ট-কাটার ব্যবহার করারও





কোনো কায়দা নেই। কিন্তু তার মানে এ-ই না, মেয়েটার হাতের কাছে কোপ ও-রকম কোনো যন্ত্র আছে। একটা পিন অথবা পেপার ক্লিক যদি থাকত, তখন খুলবার চেষ্টা করত সে। কিন্তু ও-রকম কিছুও নেই ওর কাছে।

কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে ওর মোবাইল ফোনটা। কোনো সন্দেহ নেই ওটা হাতিয়ে নিয়েছে ওই লোক। তারপর চুরমার করে দিয়েছে। মেয়েটা ছদ্ম মোবাইলের সিগনাল থেকে ওর অবস্থান জেনে যাওয়া সম্ভব পুলিশের পক্ষে।

জোরালো একটা চিৎকার ভেসে এল ওপরতলা থেকে।

কণ্ঠটা একজন পুরুষলোকের।

আরেকটু হলে কাচের টুকরোটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিল ল্যারিসা। ওটা এতক্ষণে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে ওর মুঠোর ভেতরে।

কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে, অসহনীয় কোনো ব্যথায় যেন ছটফট করছে প্রশিক্ষিত লোকটা।

মিনিটখানেকের মতো স্থায়ী হলো ওই চিৎকার। তারপর তীব্রতা কমে এল একসময় চাপা একটা ফোঁপানি শুনতে পেল মেয়েটা। তার কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি থেমে গেল চিৎকারটা।

কেউ কি ল্যারিসাকে উদ্ধার করার জন্য হাজির হয়ে গেছে এখানে?

কেউ কি প্রচণ্ড কোনো আঘাত হেনেছে ওই লোকের ওপর?

চোখ বুজে ফেলল মেয়েটা। সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে এখন শুধু শুনবার চেষ্টা করছে। ওপরতলায় ঠিক কী ঘটছে, শুনবার চেষ্টা করছে সেটা।

আরও একবার থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে সারা বাড়িতে। আরও একবার শুধু শোনা যাচ্ছে ওই হিটারের টিক টিক আওয়াজ।

‘সাহায্য করুন আমাকে!’ গলা ফাটিয়ে চৈঁচিয়ে উঠল ল্যারিসা। ‘আমি এখানে আছি!’

নীরবতার ওই দেয়ালের বিপরীতে কেমন যেন ক্ষুদ্র শোনাও ওর কণ্ঠ। একটু বেশিই দুর্বল শোনাও।

শুনতে পেল, সিঁড়ির ওপরে মোচড় দেয়া হলো কোনো একটা দরজার হাতল ধরে। প্রথমে খটাখট আওয়াজ করে উঠল ওই হাতল, তারপর খুলে গেল দরজাটা। কেউ একজন বেশ অনেকখানি মেলে ধরে রাখল পাল্লাটা, ক্যাচকোঁচ আওয়াজ শোনা গেল।

ওপরতলার আলোটা পৌঁছে গেছে সিঁড়িতে। মনে হচ্ছে, কেউ একজন তার উজ্জ্বল কয়েকটা আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে সিঁড়ির তলদেশের উদ্দেশে। কিন্তু বেসমেন্টের অন্ধকার ঠেলে পেছনদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওগুলোকে।

কাচের টুকরোটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ল্যারিসা। টের পেল, রক্ত গড়িয়ে নামছে ওর হাতের একটা পাশ থেকে। পড়ছে ওর পায়ের কাছে, মেঝেতে।

সিঁড়ির গোড়ায় শোনা যাচ্ছে পায়ের আওয়াজ।

উত্তেজনা বাড়ল মেয়েটার।

প্রশিক্ষক লোকটাকে যখন দেখতে পেল, লোকটা যখন একটা কোনা ঘুরে হাজির হলো খাঁচার সামনে, তার চোখ দুটো যখন খুঁজে নিল মেয়েটাকে, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে ল্যারিসা তখন সিদ্ধান্ত নিল, অন্য কোনোদিকে তাকাবে না, ওই লোকের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। এবং তা-ই করল... জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। আঙুলের সাহায্যে কাচের টুকরোটা ঠেলে দিল তালুর আরেকটু ভেতরে, লুকিয়ে ফেলতে চাইছে ওই জিনিস। হাত চেপে ধরে রাখল জিপ্সের সঙ্গে, যাতে রক্ত নজরে না পড়ে লোকটার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, খাঁচার দরজা যেইমাত্র খুলবে ওই লোক, সঙ্গে সঙ্গে শয়তানটার ওপর হামলা চালাবে সে। লাফিয়ে গিয়ে পড়বে লোকটার ওপর, কাচের টুকরোটা ঢুকিয়ে দেবে ওই লোকের গলার গভীরে। লোকটার মরণ নিশ্চিত করার জন্য টুকরোটা ধরে জোরে মোচড় দেবে।

ওই লোকের হাতে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। ওটা বয়ে নিয়ে এসেছে সে। আরেকটু কাছে যখন এল লোকটা, ল্যারিসা ঠাহর করতে পারল, সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা কিছু কাপড় নিয়ে এসেছে ওই লোক। খাঁচার দরজার কাছে, মেঝেতে ওসব কাপড় নামিয়ে রাখল লোকটা।

‘তোমার সমান বয়সের একটা মেয়ে আছে আমার। এই কাপড়গুলো ওরই।’

দৃষ্টি নামিয়ে ওসব কাপড়ের দিকে তাকাল ল্যারিসা। কালো লেগিংস, মোজা, অন্তর্বাস এবং লাল রঙের একটা সোয়েটার। দেখতে কেমন যেন পুরনো লাগছে সোয়েটারটা। বহুল ব্যবহারে জীর্ণ বলে মনে হচ্ছে। মলিন হয়ে গেছে রঙটা।

‘তোমার পছন্দ হয়েছে ওসব?’

কিছু বলল না মেয়েটা।

‘আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওগুলো পরে নিয়ো তুমি।’

‘আপনার মেয়ে আছে?’

প্রশ্নটা শোনামাত্র কেমন যেন ফাঁপা হয়ে গেল প্রশিক্ষক লোকটার চেহারা। ‘তোমার যে ওই কাপড়গুলো পছন্দ হয়েছে, আমার মেয়েটাকে বলবো। শুনলে খুশি হবে সে।’

‘কোথায় আপনার মেয়ে? আমি যে এখানে আছি, জানে সে?’ এককদম পিছিয়ে গেল ল্যারিসা। ‘বাঁচাও! তোমার বাবা একটা বন্ধ পাগল! বাঁচাও আমাকে!’

দুধের গ্লাসটা যেখানে ছিল, সেদিকে তাকাল ওই লোক। ‘এখানে আসে না আমার মেয়ে। এই বেসমেন্ট ভালো লাগে না ওর।’

চোখের কোনা দিয়ে পেইন্টারের সেই তারপুলিনটা আরও একবার দেখে নিল ল্যারিসা। ঘুরল। আর তাকাতে পারছে না সে। বুঝতে পারছে, এখন মানসিকভাবে শক্ত থাকা দরকার ওর।



দুধের গ্লাসটা যেখানে ছিল, সেদিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওই লোক। তারপর তাকাল খাঁচার পেছনদিকে... যেখানে দুধটুকু ফেলে দিয়েছে ল্যারিসা। দেখল, লেপের সাহায্যে খানিকটা দুধ মুছেও ফেলেছে ওই মেয়ে। ‘আমি যেসব মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে, তাদের অর্ধেকই ওই কাজ করেছে... দুধের গ্লাস ভেঙেছে, আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। বাকি অর্ধেক ও-রকম কিছু করেনি। জানো, কেউ একজন তোমার ব্যাপারে আমাকে বলেছে, তুমি নাকি একটা যোদ্ধা। যারা ও-রকম, তাদেরকে কিন্তু ভালো লাগে আমার। এ-রকম তেজ থাকা ভালো।’

জুতোর ডগা দিয়ে কাপড়ের সেই স্তূপ স্পর্শ করল সে। ‘আমাদের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে, এগুলো পরে নিয়ো তুমি। তোমাকে দেখতে তখন চমৎকার লাগবে। দেখে নিয়ো, তোমার নিজের কাছেও ভালো লাগবে। এই সোয়েটারটা আমার মেয়ের প্রিয় সোয়েটার। একটা পনি ঘোড়ার ছবি আছে ওটার সামনের দিকে, দেখেছ নাকি?’

সোয়েটারের ভাঁজ খুলল লোকটা, মেলে ধরল।

‘আপনি বার বার বলছেন... আমাদের কাজ শেষ হলে। কোন কাজের কথা বোঝাচ্ছেন আপনি আসলে, বলুন তো?’ ল্যারিসা যে কথা বলে ফেলেছে, সেটা সে ঠাহর করার আগেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা শব্দ ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছে হলো ওর। ওই প্রশ্নের জবাব জানতে চায় না সে।

এখনও সোয়েটারটা মেলে ধরে রেখেছে প্রশিক্ষক লোকটা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, ল্যারিসার কোনো কথাই শুনতে পায়নি যেন। সোয়েটারের সামনের দিকে ঘোড়ার যে-ছবি আছে, তাকিয়ে আছে সেটার দিকে। মিটিমিটি হাসছে। সাবধানে ভাঁজ করল সোয়েটারটা, রেখে দিল কাপড়ের সেই স্তূপের ওপর। ‘একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। পরনের সব কাপড় খুলে ফেলতে হবে।’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ল্যারিসা। কাচের টুকরোটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, খাঁচার আরও ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছে সে। ‘না, না...’

একটুখানি হাঁ হয়ে আছে ওই লোকের মুখ। দেখে মনে হচ্ছে, নাকের বদলে মুখ দিয়ে দম নিচ্ছে যেন। থেকে থেকে বের করে দিচ্ছে জিভটা, চাটছে ফেটে যাওয়া ঠোঁট। কাজ শেষে তার জিভ আবার ঢুকে যাচ্ছে মুখের ভেতরে। পেছনের পকেট থেকে বের করল একটা স্টান গান। ছোট ওই কালো যন্ত্রটা তুলে ধরল মাথার ওপর, টিপে দিল ট্রিগার। যন্ত্রটার দুটো পোলের মাঝখানে যেন লাফিয়ে হাজির হলো বিদ্যুচ্চমক। ‘তোমার হাতে কাচের একটা টুকরো আছে। ওটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দাও। তারপর সব কাপড় খুলে ফেলো, যাতে শুরু করতে পারি আমরা। তোমাকে কাজে লাগিয়ে কী করতে চাইছি, সেটা তখনই দেখতে পাবে। এবং যেইমাত্র দেখতে পাবে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’

পিছাতে পিছাতে খাঁচার এককোণায় হাজির হয়ে গেছে ল্যারিসা; আর যেটুকু দুধ পড়ে আছে মেঝেতে, সেখানে পা পড়ে গিয়ে আরেকটু হলে পিছলে গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই আরও জোরে চেপে ধরল কাচের টুকরোটা। তাতে কাজ বাড়ল... তালুর কাটাটা আরও গভীর হলো। রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে মেঝেতে।

বড় বড় হয়ে গেল ওই প্রশিক্ষক লোকটার চোখ। ‘নিজেকে ওভাবে আঘাত কোরো না! কাচের টুকরোটা ফেলে দাও!’ পকেট থেকে চাবির একটা গোছা বের করল। হাতড়ে হাতড়ে খুলতে আরম্ভ করেছে খাঁচার তালা।

গলার একপাশে কাচের টুকরোটা চেপে ধরেছে ল্যারিসা। ‘থামুন। নইলে নিজের গলা নিজেই কেটে ফেলবো আমি। ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, ওই কাজ করবো আমি।’

কণ্ঠ যতখানি সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করছে সে। নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করছে নিজের ওপর। এমন এক ভঙ্গিতে কথা বলছে, যেন এই মুহূর্তে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ওর হাতেই। কিন্তু যা-ই বলছে, উঁচু কণ্ঠে বলছে। থেকে থেকে বুজে আসছে গলা। বোঝাই যায়, কান্না চেপে রেখেছে সে।

খাঁচার আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল বেচারী। এবার লেপের ওপর পিছলে গেল ওর পা। হুড়মুড় করে পড়ে গেল পেছনের দেয়ালের ওপর। খালি হাতটা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করল। তাতে কাজ বাড়ল আরও। কাচের অন্য যেসব টুকরো পড়ে আছে, হাতটা গিয়ে পড়ল ওগুলোর ওপর। ছোট ছোট ওই টুকরোগুলোর কারণে হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল কমপক্ষে বারো জায়গায়।

প্রথম তালা খুলে ফেলেছে প্রশিক্ষক লোকটা। এবার সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দ্বিতীয় তালাটা নিয়ে।

ল্যারিসার মনে হচ্ছে, ওর দম যেন আটকে গেছে গলার কাছে। যতখানি শ্বাস নেয়া দরকার, ততখানি নিতে পারছে না। দুই চোখ যেন চুম্বকের মতো আটকে গেছে ওই লোকের ওপর। লোকটা একটা দানব। দ্বিতীয় তালাটাও খুলে ফেলল সে। মোচড় দিয়ে দরজা থেকে আলাগা করে ফেলল ওটা, ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঢুকে পড়ল খাঁচার ভেতরে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটার দিকে। মেঝেতে পড়ে আছে ওই মেয়ে, নড়তেও ভুলে গেছে যেন। কাচের ভাঙা টুকরোটা মেয়েটার যে-হাতে আছে, সে-হাত একটা পা দিয়ে চেপে ধরল লোকটা। স্টান গান কাজে লাগিয়ে মেঝের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে মেয়েটাকে।

মুক্ত হাতটা বাড়িয়ে দিল ল্যারিসা, কঙ্কিটের মেঝেতে পড়ে থাকা কাচের ছোট ছোট অনেক টুকরো আঁকড়ে ধরল। দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করেই ওসব টুকরো চালান করে দিল মুখের ভেতরে। এবং দেরি না করে গিলে ফেলল ওগুলো। কত টুকরো গিলেছে জানে না নিজেও... পাঁচ, দশ কিংবা বিশ। ভেবেছিল, টুকরোগুলো গলা বেয়ে নেমে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড ব্যথা পাবে, কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না।

বরং ওর মনে হলো, একসঙ্গে অনেক বড়ি গিলে ফেলেছে যেন। অথবা গিলে খেয়েছে একটা আইস কিউবের ভাঙা কিছু অংশ।

প্রশিক্ষক লোকটা ততক্ষণে রীতিমতো কুস্তি শুরু করে দিয়েছে... ল্যারিসার হাত থেকে আলাগা করে নিয়েছে কাচের ভাঙা টুকরোটা। ছুঁড়ে খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল ওই জিনিস। মেঝেতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল ওটা... পরিণত হলো ছোট আরও কিছু টুকরোয়। ততক্ষণে ল্যারিসার অন্য হাত ওর মুখের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে লোকটা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। কাচের সব টুকরো গিলে ফেলেছে মেয়েটা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লোকটা, খানিকটা শূন্যে তুলে ফেলল ল্যারিসাকে, তারপর ওকে আছড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। এমনভাবে কাজটা করেছে, যেন ল্যারিসা কোনো মানুষ না, বরং কাপড় দিয়ে বানানো একটা পুতুল। ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার বেরিয়ে এসেছে তার গলা চিরে। এত জোরে চিৎকার করা সম্ভব না ওই মেয়ের পক্ষেও। মিনিটখানেক টানা চেষ্টা লোকটা, তারপর ল্যারিসাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। খাঁচা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল, জায়গামতো আটকে দিল তালা।

‘কী করলে তুমি এটা?’ বুনো আহত পশুর মতো গর্জন করে উঠল যেন।

এবার সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছে ল্যারিসা... পেটে। ওর মনে হচ্ছে, কেউ যেন একটা আলপিন দিয়ে সমানে খোঁচা মারছে সেখানে।

‘কী কারণে এখনও ওখানে রয়ে গেছে ওরা?’

গাড়ির গতি অনেকখানি কমিয়ে আনল ন্যাশ। ডেভিসদের বাসা থেকে প্রায় দু’ব্লক দূরে পার্ক করল নিজের শেভিটা। ওই বাড়ির উল্টোদিকে, রাস্তার ধারে পার্ক করা অবস্থায় আছে দুটো নিউজ ভ্যান। একটা ভ্যানের ছাদ থেকে বড় একটা অ্যান্টেনা উদ্ভিত হয়েছে আকাশের দিকে। তবে আশপাশে কোথাও কোনো সাংবাদিক অথবা ক্যামেরাম্যানের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভাবনা আছে, তারা তাদের ভ্যানের ভেতরেই আছে। ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

‘আরও কাছাকাছি যাওয়া দরকার আমাদের,’ বলল ক্লোজ। বসে আছে ন্যাশের পাশে। মুখটা বলতে গেলে ডুবে গেছে ল্যাপটপের ভেতরে। ‘ওদের ওয়াই-ফাইটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না আমি।’

এসবে কিছু যায়-আসে কি না, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না ন্যাশ। ক্লোজ আগেরবার কীভাবে যেন লগইন করেছিল রেনল্ডসদের ওয়াই-ফাইয়ে। আবিষ্কার করেছে, যাকে বলে কিনা ধুয়েমুছে সাফসুতরো করে ফেলা, রাউটারের লগের বেলায় ঠিক তা-ই ঘটেছে। তার মানে হচ্ছে, মৃত্যুসংবাদ পাঠানোর পর সমস্ত রেকর্ড মুছে দিয়ে গেছে রহস্যময় সেই লোক।

‘ধেং!’ বিরক্তি প্রকাশ পেল ন্যাশের কণ্ঠে। ভ্যান দুটো অতিক্রম করল সে, প্রথম ভ্যানটার সামনে পার্ক করল নিজের গাড়ি।

দাঁত দেখা গেল ক্লোজের।

‘এত মজার কী এমন ঘটল, শুনি একটু?’

‘ওরা ওদের ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের নাম কী দিয়েছে, শুনবেন? “এফবিআই সার্ভাইলেন্স ভ্যান”। কাছেপিঠের কেউ যদি ওয়াই-ফাই সিগনাল অনুসরণ করার চেষ্টা করে, তা হলে ভাববে, আশপাশেই কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে এফবিআই-এর লোকেরা।’

‘তাতে সংবাদমাধ্যমের লোকেরা একটুও ঘাবড়ে গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।’

‘বেশিরভাগ লোক ওয়াই-ফাই ব্যবহার করার সময় কী করে? নিজেদের নামের শেষ অংশটা ব্যবহার করে। অথবা রাস্তার ঠিকানা ব্যবহার করে। এই ব্যাপারটা বোকামি বলে মনে হয় আমার কাছে। একটা ওয়াই-ফাই কোন বাসায় আছে, সেটা খারাপ লোকদেরকে জানানোর দরকারটা কী? ব্যাপারটা যেন এ-রকম... আপনি আপনার সদর দরজার তালার জন্য যে-চাবি ব্যবহার করেন, সেটার গায়ে সঁটে দিয়েছেন বাসার ঠিকানাটা,’ বলল ক্লোজ।



ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের নিউজ ভ্যানটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল ন্যাশ। যে-মুহূর্তে গাড়ি পার্ক করেছে সে, ওই ভ্যানের পেছনদিকের দরজা খুলে গেছে। 'হাঙরগুলো আসার আগে আর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড সময় আছে আমাদের হাতে।'

'তা হলে ঝামেলা একটা হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন?'

'রাউটারের মডেলটা পেয়ে গেছি আমি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, ওয়াই-ফাইয়ের নাম যখন বদল করা হয়েছিল, তখন ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটাও পাল্টে ফেলা হয়েছে। ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক বলতে যা বোঝায়, সেভাবে পাসওয়ার্ডটা জানার চেষ্টা করছি আমি এখন,' বুঝিয়ে বলল ক্রোজ।

'কত সময় লাগতে পারে?'

'এক মিনিট। বড়জোর দুই।'

ভ্যান থেকে নেমে পড়েছে ক্যামেরাম্যান। তুষারপাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে মাথার ওপর তুলে দিয়েছে কোটের হুড। ক্যামেরা বের করে আনার জন্য হাত ঢুকিয়ে দিল ভ্যানের ভেতরে। তারপর ওই জিনিস স্থাপন করল কাঁধের ওপর।

বাড়িটার দিকে তাকাল ন্যাশ।

সবগুলো খড়খড়ি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি থেকেও থাকে বাড়ির ভেতরে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না ন্যাশ। ভ্যানের ভেতর থেকে এবার বেরিয়ে এল একজন মেয়েমানুষ। তার পরনে পাতলা একটা ট্রেন্স কোট। তার শরীরটা যেন ফুটিয়ে তুলেছে ওই কাপড়। ওটার সাহায্যে ঠাণ্ডা থেকে যে বাঁচতে পারবে না সে, বোঝাই যায়।

মেয়েটাকে চেনে ন্যাশ। লিজেথ লাউডন। চ্যানেল সেভেন।

ক্যামেরাম্যানকে কিছু একটা বলল মেয়েটা। তাকাল ন্যাশের গাড়ির দিকে। তার একহাতে একটা মাইক্রোফোন। অন্য হাতটা চুল ঠিক করায় ব্যস্ত।

এবার দ্বিতীয় ভ্যান থেকে নামল কেউ একজন। স্যুট পরিহিত এক লোক। তাকে চিনতে পারল না ন্যাশ। ওর গাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে ওই লোকও। লাফিয়ে ওই ভ্যান থেকে নামল একজন ক্যামেরাম্যান। দ্রুত পায়ে অনুসরণ করছে স্যুটওয়ালাকে।

'ধেং!'

ল্যাপটপের স্ক্রিনের ওপর আটকে আছে ক্রোজের দৃষ্টি।

জানালায় কাচে টোকা দিল কেউ একজন।

লিজেথ লাউডন।

গাড়ির জানালার কাচ নামাতে বলার জন্য সারা দুনিয়ায় যে-সক্কেত প্রচলিত আছে, সেটা দেখাল সে। তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ন্যাশ। ক্রোজকে বলল, 'কাজ শেষ করার সময় হয়ে গেছে কিন্তু।'

'প্রায় শেষ।'

লিজেথ লাউডনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল স্যুটওয়ালা। খঁকিয়ে কিছু একটা বলল ক্যামেরাম্যানের উদ্দেশে। ন্যাশের গাড়ির সামনের দিকে যে-জায়গা আছে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে সেটা। ক্যামেরাম্যান লোকটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একটা ট্রাইপড খোলার কাজে। তাকে যে-জায়গা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, সে-জায়গার উদ্দেশে হাঁটছে একইসঙ্গে।

‘ওহ, না, কোন গজবের মধ্যে পড়লাম আমি,’ বলল ন্যাশ। গিয়ারে ফেলল শেভিটাকে। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে একটুখানি আগে বাড়ল গাড়িটা। লাফিয়ে পেছনে সরে গেল ওই ক্যামেরাম্যান। বাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরেকটু হলেই বারোটা বেজে গিয়েছিল তার ট্রাইপডের।

‘আমি ঢুকে পড়েছি,’ জানান দিল ক্রোজ। ‘একটু সাবধান থাকতে হবে আপনাকে। রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে কিন্তু বিপদ।’

এবার গাড়ি রিভার্স গিয়ারে দিল ন্যাশ। পেছনের ভ্যানের এক ইঞ্চি সামনে গিয়ে থামল। একটু আগের ক্যামেরাম্যান লোকটা হাঁটা ধরেছে আবার, গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে চায়। তার মতলব ঠাহর করতে পেরে শেভিটাকে প্রথম গিয়ারে ফেলল ন্যাশ, আগে বাড়ল। এবার ধাক্কা লাগিয়ে দিল ওই ট্রাইপডের সঙ্গে। বরফের ওপর পিছলে গেল ক্যামেরাম্যান, জমাট তুষারের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। পাশে পড়ল তার ক্যামেরা।

আরও একবার টোকা পড়ল জানালার কাছে।

লাউডন এবার গলা ফাটিয়ে চঁচাচ্ছে ন্যাশ আর ক্রোজের উদ্দেশে।

দাঁত বের করে হাসল ন্যাশ, আরও একবার হাতের নাচন দেখিয়ে দিল ওই মেয়েকে। তার পেছনে যে-ক্যামেরা আছে, সেটার লাল বাতি জ্বলে উঠেছে। ‘হাতে কিন্তু আর একটুও সময় নেই। এবার শেষ করতেই হবে।’ বলল ন্যাশ। দাঁতে দাঁত পিষছে, কিন্তু হাসিটা ধরে রেখেছে।

‘পেয়ে গেছি!’ বলল ক্রোজ। ‘যান!’

অ্যাম্বুলেটরটা গাড়ির মেঝের সঙ্গে বলতে গেলে চেপে ধরল ন্যাশ। রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের আওয়াজ তুলল শেভিটা; মাছ যেভাবে লেজ এপাশে-ওপাশে নাড়ায়, সেভাবে অনিয়ন্ত্রিত এক কায়দায় ছুট লাগাল সামনের দিকে। বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে গাড়ির পেছনের চাকা, ট্যাকশন পাওয়ার চেষ্টা করছে। চারদিকে ছিটকে যাচ্ছে তুষার। সে-তুষার ঢেকে দিচ্ছে দুই রিপোর্টারকে, তাদের যন্ত্রপাতিতে। তীর বেগে আগে বাড়ল গাড়িটা। পেছনে রেখে গেল সাদা ধোঁয়ার একটা মেঘ।

নিজের বিএমডব্লু-টা একটা সাইড লটে পার্ক করল সারা ওয়ার্নার। গাড়ি থেবে নামল পোর্টার, মহিলাকে অনুসরণ করতে লাগল ওই পার্কিং লট ধরে। মেইন ভিজিটরস সেন্টারে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে বেশকিছু লোক। সেখান থেকে দু'শ' ফুট দূরে ছোট একটা সাইড এন্ট্রেন্স আছে। দু'জন গার্ড ওয়ার্নারের পাতলা চামড়ার ব্রিফকেসটা সার্চ করে দেখল। হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সার্চ করা হলো ওদের দু'জনকে, এমনকী ওদের শরীরের এখানে-সেখানে আলতো চাপড়ও দেয়া হলো। ড্রাইভার'স লাইসেন্স দেখাতে বলা হলো পোর্টারকে। জুতোর ফিতা আর বেল্ট খুলে ফেলতে বলা হলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে ওর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলো লাইসেন্সটা। ওই গার্ড দু'জনের পেছনে একটা লকার আছে, সেখানে রেখে দেয়া হলো ওর বাকি জিনিসগুলো। নম্বর ট্যাগযুক্ত একটা চাবি ধরিয়ে দেয়া হলো ওর হাতে। ওয়ার্নার কোনো বেল্ট পরেনি। অফিস থেকে বেরিয়ে আসার আগে হিল বদল করে ফ্ল্যাট জুতো পরে এসেছে। ছবি তোলা হলো ওদের দু'জনের। লাল রঙের বড় আইডেন্টিফিকেশন স্টিকারে প্রিন্ট করা হলো সে-ছবি। সেই স্টিকারের ওপরের দিকে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে: ভিজিটর।

সিকিউরিটি পার হয়ে আরেক প্রান্তে হাজির হলো ওরা, দেখতে পেল এখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে একজন মহিলা অফিসার। ওয়ার্নার যখন বলেছে জেন ডো # ২১৩৮-এর সঙ্গে দেখা করতে চায় ওরা, তখন ডেকে আনা হয়েছে ওই মহিলাকে। ওদের দু'জনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'এদিকে আসুন, প্লিজ।'

কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখা মিলল ভারী একটা ধাতব দরজার, সেখানে আওয়াজ তুলল একটা বাজার। আরও একবার সেই বন্ধ বাতাসে পা রাখল ওরা। আগেরবারের স্মৃতি মনে পড়ে গেল পোর্টারের।

ওয়ার্ডেনের অফিসের সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, তা হলে জেলখানার এই জায়গার দেয়ালগুলোকে প্রফুল্ল বলতে হবে। সাগরজলের রঙ যে-রকম হয়, সে-রকম হালকা একটা রঙ করা হয়েছে এখানকার দেয়ালগুলোতে। কিনারাগুলোয় ব্যবহার করা হয়েছে হালকা হলদে-বাদামি রঙ। ছাদ অফ-হোয়াইট। প্রতিটা কোনায় লাগানো আছে ক্যামেরা। অগ্রসর হচ্ছে ওরা, আর ওদেরকে অনুসরণ করছে সেসব ক্যামেরা। ফাঁপা মনে হয় ওগুলোকে। মনে হয়, যান্ত্রিক কিছু চোখ যেন সেগুলোর ভিত্তির ওপর ঘুরছে ধীরগতিতে। ওই অফিসার ওদেরকে পথ দেখিয়ে ও-রকম আরও তিনটা দরজা পার করল। তারপর ওরা হাজির হলো বড় একটা ঘরে। এখানে বেশকিছু টেবিল আছে। বেশিরভাগ টেবিলের একধারে বসে

আছে কয়েদিরা। অন্য প্রান্তে বসেছে তাদের সঙ্গে যারা দেখা করতে এসেছে, তারা। চারপাশে এত কোলাহল, মনে হচ্ছে কালা হয়ে যেতে হবে। সিঁতার ব্লকের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে-আওয়াজ। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে আলাদা কয়েকটা ঘর আছে। ওই অফিসার একটা খাম ধরিয়ে দিল ওয়ার্নারের হাতে। তারপর খুলে ধরল দ্বিতীয় ঘরটার দরজা। হাতের ইশারায় ভেতরে যেতে বলল ওদেরকে। ঢুকল ওরা। শব্দ তুলে ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

অ্যালুমিনিয়ামে নির্মিত একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে। হাতের ব্রিফকেসটা সেটার ওপর নামিয়ে রাখল ওয়ার্নার। মেঝেতে আটকে দেয়া অবস্থায় চারটা চেয়ার আছে ওই টেবিল ঘিরে, একটাতে বসে পড়ল সে। খুলল খামটা। ভেতর থেকে বের করল এক তা কাগজ। যা লেখা আছে সেটাতে, সেটা পড়া শেষ করামাত্র বলল, ‘আরে ধেং!’

‘কী?’ জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

‘আমাদের সেই মিস ডো গতকাল রাতে যাকে বলে কিনা ঝগড়াঝাটি আর হাতাহাতি, সে-রকম একটা কাজ করে ফেলেছে। টুথব্রাশের হাতল দিয়ে তাকে জোরে আঘাত করার চেষ্টা করেছে তারই এক সহ-কয়েদি। গার্ডরা ঘটনাস্থলে হাজির হতে বেশি দেরি করেনি। কিন্তু ততক্ষণে জেন ডো করেছে কী... রীতিমতো কুস্তি খেলার কায়দায় ওই টুথব্রাশ ছিনিয়ে নিয়েছে সেই কয়েদির হাত থেকে, এবং সেটার হাতল দিয়ে তিনবার ঘা বসিয়ে দিয়েছে ওই মহিলার শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। একটা আঘাত করেছে ঘাড়ের, উরুতে দু’বার। তারপর পিছু হটে গিয়ে আত্মসমর্পণ করার কায়দায় উঁচু করেছে দু’হাত। প্রধান ধমনী বলতে যা-কিছু আছে মানুষের শরীরে, জেন ডো’র কোনো আঘাতই সেগুলোর ধারেকাছে যেতে পারেনি, তারপরও যাকে মেরেছে সে, সে-মহিলা এখন ভর্তি আছে জেলখানার হাসপাতালে। তার দাবি, জেন ডো-ই ঝগড়ার সূত্রপাত করেছে। কিন্তু অন্য দু’জন সাক্ষী বলেছে, ওই মহিলাই প্রথমে গায়ে হাত তুলেছে এবং জেন ডো কেবল আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছিল। তদন্ত হয়েছে এই ঘটনার। এখন সেটার ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে, জেন ডো’র বিরুদ্ধে বাড়তি কোনো অভিযোগ দায়ের করা হবে কি না।’ কাগজটা নিজের ব্রিফকেসের ওপর নামিয়ে রাখল ওয়ার্নার। গালমন্দ করল। ‘যে-দিনটাই শুরু হয় হত্যাচেষ্টার ঘটনা দিয়ে, সেদিনের মতো আর কিছু আছে নাকি?’

‘আমার ধারণা জেন ডো এখনও কোনো কথা বলছে না, ঠিক না?’

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল ওয়ার্নার। ‘আমার মনে হয় আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জবাবটা জানা হয়ে যাবে আমাদের।’

বাজারের জোরালো আওয়াজ শোনা গেল আরও একবার। খুলে গেল দরজাটা। প্রথমে ভেতরে ঢুকল একজন গার্ড। তার পেছনে দেখা যাচ্ছে জেন ডো # ২১৩৮-কে। ওই মহিলার পেছনে আছে আরও একজন গার্ড।



একটা শেকলের দুই প্রান্তে বাঁধা আছে মহিলার দু'পা। ওই শেকল সংযুক্ত হয়েছে আরেকটা শেকল, দ্বিতীয়টার সঙ্গে আবার যুক্ত হাতকড়া, আর সে-কড়াতে বাঁধা আছে মহিলার দুই কজি। হাঁটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়, সেজন্য সামনের দিকে অদ্ভুত এক কায়দায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে ওই মহিলা। লম্বা বাদামি চুল নেমে এসেছে চেহেরা থেকে দিয়েছে সেটা। সে-চুলের কিছু অংশ কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে এসে জাম্পসুটের ওপর। গার্ড দু'জন মহিলাকে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল একটা টেবিলের একটা আই-ভ্রুকের সঙ্গে আটকে দিল শেকলের একটা প্রান্ত মুখের কাছে তুলল মহিলা। চোখের ওপর থেকে চুল সরাল। একঝলপে পেল পোর্টার, মহিলার একদিকের কজিতে, ভেতরের দিকে, ইংরেজ সংখ্যাটার ট্যাটু আঁকা আছে। হাত নামাল মহিলা, জাম্পসুটের হাতা অদৃশ্য হয়ে গেল ওই ট্যাটু।

‘হ্যালো জেন,’ বলল সারা ওয়ার্নার। ‘আমি আজ আমার এক বন্ধু নিয়ে এসেছি। তাঁর নাম স্যাম পোর্টার, শিকাগো মেট্রো পুলিশ ডি-আছেন, ডিটেকটিভ।’

পোর্টার দেখতে পেল, ধীরে ধীরে চোখ তুলল ওই মহিলা। টের ওপর স্থির হয়েছে মহিলার নজর। মহিলার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকাটা সম্ভব হচ্ছে না পোর্টারের পক্ষে, নজর সরিয়ে নিতে চাইছে সে, এ-তাড়নার রীতিমতো যুঝতে হচ্ছে ওকে। মাথাটা একদিকে একটুখানি কাত করল হেলান দিল চেয়ারে। দু'হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরেছে পরস্পরকে ছিটেফোঁটাও নেই তার চেহারায়। কপালের কোনো জায়গা কেঁ একটুখানিও। অভিব্যক্তি বলতে কিছুই নেই ওই চেহারাতে। শুধু দুই চোখে গভীর আর অন্তর্ভেদী একটা দৃষ্টি।

ওয়ার্নারের পাশের চেয়ারে, জেন ডো'র মুখোমুখি বসে পড়ল পোর্টার চুকিয়ে দিল পকেটে। বের করে আনল সেই ফটোগ্রাফ। ওই মহিলা আর নি মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখল ওটা।

ছবিটা একনজর দেখে নিল মহিলা। তারপর আবার আগেরবারের তাকিয়ে থাকল পোর্টারের দিকে।

ফটোটা উল্টিয়ে দেখাল পোর্টার। ‘আপনার ছেলে তার গুণ জানিয়েছে।’

মহিলা যদি বিশেষ ওই লেখার দিকে তাকিয়েও থাকে, খেয়াল ব পোর্টার। দেখতে পেল, এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। খাড়া দু'হাতের দুই তর্জনী। মাথার ভার ছেড়ে দিল ও-দুটোর ওপর।

মহিলার জামার হাতা নেমে গেছে। ফলে পোর্টার আবারও দেখতে পাচ্ছে ট্যাটু। ‘ফ্রাঙ্কলিন কার্বির ব্যাপারে কিছু বলুন আমাদেরকে। ওই লোকের হাতে ও-রকম ট্যাটু ছিল?’

কার্বির নাম শোনামাত্র মহিলার মুখের একটা কোনা খানিকটা বেঁকে গিয়ে উঠে গেল ওপরের দিকে... বোঝা গেল হাসছে সে। মাথা কাত করল আবারও, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে মুছে ফেলল ওই হাসি।

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়ার্নার। ‘গতকাল রাতে ঠিক কী ঘটেছে, বলবেন? অন্য কয়েদিদের সঙ্গে যদি ওভাবে মারামারি করতে থাকেন, এখান থেকে আপনার ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের ঘরে নেমে যাবে। সাক্ষীদের কেউ যদি এখন ভুল বিবৃতি দেয়, হত্যাচেষ্টার মামলায় ফেঁসে যাবেন আপনি।’

জেন ডো আগের মতোই তাকিয়ে আছে পোর্টারের দিকে।

‘দেখুন, যতক্ষণ খুশি লাগে নিজের মুখটা বন্ধ রাখতে পারেন আপনি,’ বলে চলল ওয়ার্নার। ‘আমার সঙ্গে আপনি কথা বললেন কি না সে-ব্যাপারে আমার কোনো পরোয়াও নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, এই কাজ করে আপনি নিজের কোনো উপকার করছেন না। বরং আমি বলবো, নিজের জন্য আরও গভীর একটা গর্ত খুঁড়ছেন। আপনাকে কীভাবে বাঁচানো যায়, সেটা ভেবে বের করার জন্য এক সপ্তাহেরও কম সময় আছে আমাদের হাতে। আর যদি পুরোপুরি বাঁচাতে না-ও পারি, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কীভাবে কমিয়ে আনা যায়, অন্তত সে-চেষ্টা করতে হবে। এই অবস্থায় আপনার সাহায্য ছাড়া কোনোকিছু করার উপায় নেই আমার।’

জেন ডো তবুও নিশ্চুপ।

মহিলার চোখে খেলা করছে অদ্ভুত একজাতের বুদ্ধিমত্তা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পোর্টার। মনে হচ্ছে, ওই দু’চোখের কোনায় যেন ঝিকমিক করছে কিছু একটা। ধীরে, নিয়মিত গতিতে শ্বাস নিচ্ছে মহিলা। কোনো সন্দেহ নেই, নিয়মিত ছন্দে চলছে মহিলার পাল্স। কোনো উদ্বেগ নেই তার, কোনো দুর্ভাবনা নেই। মনে হচ্ছে, ও-রকম কোনোকিছুকে কোনো পাত্তাই দেয় না সে। মনে হচ্ছে, ওই যে শেকল, দরজার ওই তালা, এই জায়গা... এ-সবকিছু যেন তার জন্য একটা দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। এসবই যেন তার কাছে উদ্দেশ্যহীন, বড়জোর কোনো একটা অন্তরায়।

এমোরি কনার্স এবং অন্য যেসব মানুষ মারা পড়েছে বিশপের হাতে, তাদের কথা মনে পড়ে গেল পোর্টারের। মনে পড়ে যাচ্ছে ছোট সেই বালকের কথা, যাকে বড় করেছে মুখোমুখি-বসে-থাকা মহিলাটা। ছোট ওই ছেলের আকার-আকৃতি গড়ে দিয়েছে ওই মহিলাই।

টের পেল, একজাতের রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ওর ভেতরে। ঝুঁকল সামনের দিকে। ‘ক্যালি ট্রেমেল, বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। এল বর্টন, বয়স তেইশ। মিসি লুম্যাক্স, আঠারো। সুজ্যান ডেভোরো, ছাব্বিশ।’ প্রতিটা নাম ধীরে ধীরে, একটা একটা করে আঙুলে গুনল সে... ইচ্ছাকৃতভাবে। ‘অ্যালিসন ক্র্যামারের বয়স ছিল উনিশ বছর। জোডি ব্রুমিংটন, বাইশ। গুহার হার্বার্ট, আঠার



ট্যালবট, হার্নেল ক্যাম্পবেল। এরা সবাই আজ মৃত। এবং এমোরি কনার্গবে করার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রতিটা ঘটনার জন্য দায়ী আপনার ছেলে... আনিজের সন্তান। ও-রকম আর কে কে আছে, বলুন? ও-রকম আর কতজনকে করে দিয়েছে আপনার ছেলেটা?’

পোর্টার ইচ্ছাকৃতভাবে বারবারা ম্যাকিনলের নামটা চেপে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখছে কী অভিব্যক্তি হয় ওই মহিলার। কিন্তু কোনো অভিব্যক্তিই হলো পোর্টারের মনে হলো, হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া কয়েকজন মানুষের নাম — উচ্চারণ করেনি সে, বরং মুদিসামগ্রীর একটা তালিকা থেকে কিছু জিনিসের আউড়েছে।

জেন ডো # ২১৩৮, বিশপের মা, ওই শয়তান মহিলা, আবারও হেলান চেয়ারে।

উঠে গিয়ে মহিলার গলা দু’হাতে শক্ত করে চেপে ধরতে ইচ্ছে করত পোর্টারের। দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে মন চাইছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে বের করল বিশপের ডায়েরিটা। জিনিস ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের ওপর, মহিলার হাতের কাছে। ‘আপনি যে আসলে সে সেটা ভালোমতোই জানা আছে আমার,’ বলল মহিলাকে। ‘ভালোমতোই জানি।’

ছোট ওই ঘর পার হয়ে দরজার কাছে হাজির হলো সে, দড়াম করে দু’বা কিল মারল দরজায়। টের পেল, ওর পিঠটা যেন জ্বলছে... ওকে এখনও নির্নিমেষে দেখছে মহিলা।

ফোনের এন্ড কল বাটনে চাপ দিল ন্যাশ। জিনিসটা ফেলে দিল পকেটের ভেতরে। 'স্যামের ভয়েস মেইল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ফোনে এমনকী রিংও বাজছে না।'

মুখ তুলে তাকাল না ক্রোজ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ২৭ ইঞ্চির একটা সেন্টার মনিটরের দিকে। ওটাকে ঘিরে রেখেছে ২২ ইঞ্চির আরও চারটা মনিটর।

ন্যাশের মনে হচ্ছে, এই জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর গায়ের চামড়া রোদেপোড়া বাদামি হয়ে যাবে। ক্রোজের ল্যাপটপটা গাড়িতেই ছিল। কিন্তু জোরাজুরি করছিল সে... মেট্রো অফিসে নিজের ডেস্কে বসে বিচার-বিশ্লেষণের কাজগুলো নাকি তাড়াতাড়ি করতে পারে।

'আপনি তখন বললেন, পোর্টারকে ফোন করা নাকি উচিত না আপনার,' শুনে মনে হলো, দূরের কোনো জায়গা থেকে ভেসে আসছে ক্রোজের কণ্ঠ। একগাদা টেক্সটের মাঝে কিছু একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। 'বললেন, নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে গিয়ে ধরা খেয়েছেন তিনি, এবার ফল ভোগ করতে হবে তাঁকে... ইত্যাদি।'

পকেট থেকে ফোনটা আবার বের করল ন্যাশ, পোর্টারের বাসার নম্বরে ডায়াল করল। 'এ-রকম চুপ মেরে যাওয়াটা ওর নীতির মধ্যে পড়ে না।' চারবার রিং হলো। তারপর জবাব পাওয়া গেল একটা অ্যান্সারিং মেশিনের। লাইন কেটে দিল সে। 'আমাদের মনে হয় একবার যাওয়া দরকার ওর ওখানে।'

'আমার মনে হয় আমি কিছু একটা পেয়ে গেছি,' বলল ক্রোজ, তাকিয়ে আছে মনিটরের স্ক্রিনের দিকে।

ঝুঁকে পড়ল ন্যাশ। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার সংখ্যা আর অক্ষর, কোলন চিহ্নের সাহায্যে আলাদা হয়ে আছে ওগুলো। 'এসব কী দেখছি আমি?'

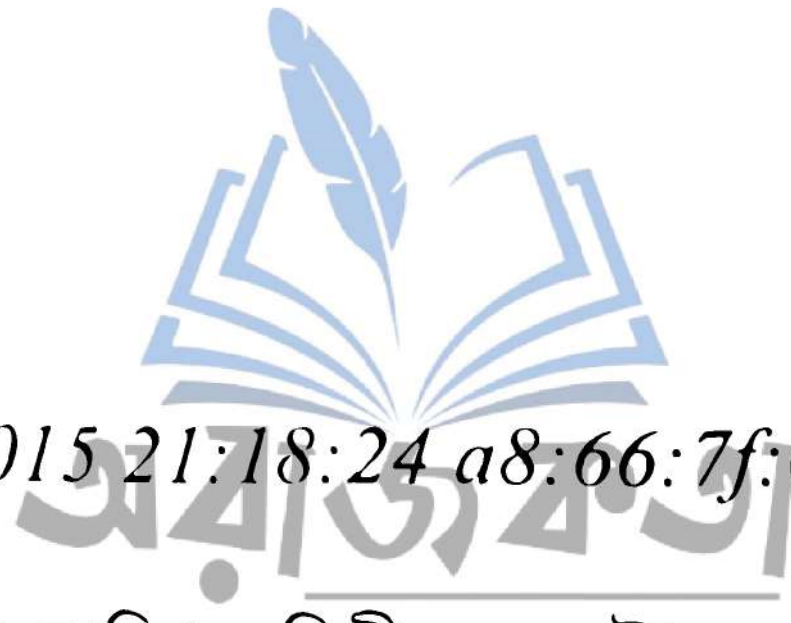
'এখানে দেখতে পাচ্ছেন?' এক সিরিজে দেখা যাচ্ছে কিছু তারিখ, ইঙ্গিতে সেগুলো দেখিয়ে দিল ক্রোজ। 'এসব ডেটা ফেব্রুয়ারি মাসের নয় তারিখে কীভাবে শুরু হয়েছে, খেয়াল করেছেন?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, আমাদের সেই রহস্যময় লোক এই ফাইলও মুছে দিয়ে গেছে? যেমনটা সে করেছিল রেনল্ডসের বাড়িতে? অর্থাৎ আমাদের হাতে কিছুই নেই আসলে?'

একটা কলমের সাহায্যে স্ক্রিনটা দেখিয়ে দিল ক্রোজ। 'কিছু একটা আছে আমাদের কাছে। প্রথম লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন?'

বিশেষ ওই লাইন দেখিয়ে দিল সে। ওটাতে দেখা যাচ্ছে:

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৫৩



‘প্রথম অংশটা হচ্ছে তারিখ। দ্বিতীয় অংশটা সময়। আর শেষের অংশটা একটা ম্যাক অ্যাড্রেস। পুরো ফাইলে, যাকে বলে কিনা চিরুনি অভিযান, সেভাবে খোঁজ চালিয়েছি আমি। বিশেষ এই ম্যাক অ্যাড্রেস পাওয়া গেছে মাত্র একবার। ওই যে ওটা... দেখতে পাচ্ছেন আপনি,’ বুঝিয়ে বলল ক্রোজ।

‘এসবের মানে কী?’

‘আমার মনে হয় আমাদের সেই রহস্যময় লোক রাউটারের সমস্ত ডেটা মুছে দিয়ে গেছে। তারপর ডিসকানেক্ট করেছে ওটা। কিন্তু তার আগে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য রেকর্ড হয়ে গেছে তার উপস্থিতি। বিশেষ যে-সময়টা দেখালাম একটু আগে, সেটার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত অন্য সব ম্যাক অ্যাড্রেসের তালিকা মিলিয়ে দেখেছি আমি। ওই বাসার একটা ডিভাইসের সঙ্গে মিলে গেছে সবগুলো, শুধু এটা মেলেনি।’

‘এত উচ্চমার্গের কথা বুঝতে পারছি না আমি। যা হোক, এই নম্বর কি ট্রেস করা সম্ভব তোমার পক্ষে?’

মাথা ঝাঁকাল ক্রোজ। ‘কিছুটা। ওই আইডি-টা অনন্য। প্রতিটা হার্ডওয়্যারে এমনভাবে তৈরি করা হয় ম্যাক অ্যাড্রেস, যাতে কেউ ওটা বদল করতে না পারে অথবা রূপান্তর ঘটাতে না পারে। কিন্তু বিশেষ সেই অ্যাড্রেস বর্তমানে কোথায় আছে, জানতে হলে অনেক নেটওয়ার্ক ঘাঁটতে হবে আপনাকে। এই ব্যাপারটা আইপি অ্যাড্রেসের মতো না।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ন্যাশ। ‘তা হলে তোমার এই আবিষ্কার আমাদের কী কাজে লাগছে?’

‘এই ব্যাপারটা অনেকটা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো,’ বলতে লাগল ক্রোজ। ‘স্টারবাক্স থেকে যে-ডেটা পেয়েছিলাম আমরা, সেসবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি আমি বিশেষ ওই ম্যাক অ্যাড্রেস। লগ-এ পাওয়া গেছে রেকর্ডটা। তার মানে হচ্ছে, ওই নেটওয়ার্কের সঙ্গে কখনও না কখনও সংযুক্ত অবস্থায় ছিল আমাদের সেই রহস্যময় লোক। কতক্ষণ ধরে ছিল তা-ও জানি... তেত্রিশ মিনিট। এবং ওই সময়ে একই কম্পিউটার ব্যবহার করেছে সে।’ হেলান দিল চেয়ারে। ‘শিকাগো শহরে যে-ওয়াইফাই সিস্টেম আছে, সেটা বেশ হুপ্তপুপ্ত বলা চলে। আমাদের পার্কগুলোতে টাওয়ার আছে। লাইব্রেরিগুলোতে আছে। এমনকী কোনো কোনো ট্রেনেও আছে। সবজায়গায় আছে। যা হোক, ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখে বিশেষ ওই ম্যাক অ্যাড্রেসের আরেকটা লগইন পাওয়া গেছে... জ্যাকসন পার্কে, সকালে, প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো।’

‘মানে এলা রেনল্ডসের লাশটা যখন পানিতে নামাচ্ছিল সে।’

মাথা ঝাঁকাল ক্লোজ। ‘প্যাসিভ অ্যাক্টিভিটি বলে একটা কথা আছে, যার সরল মানে হচ্ছে চালু কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকা। ওই ম্যাক অ্যাড্রেস তখন সে-রকম একটা অবস্থায় ছিল। বিরতি দিয়ে দিয়ে নেটওয়ার্কে হাজির হয়েছে ওটা, হুটহাট ঢুকে পড়েনি। অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি, আমাদের সেই রহস্যময় লোকের ল্যাপটপটা তখন তার গাড়িতে রাখা ছিল... ভিডিয়োতে যে-গাড়ি দেখেছি আমরা, সেটার কথা বলছি আর কী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার ব্যবহার করা বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো কাজ করছিল না সে তখন। যেসব ট্রাফিক আমি পেয়েছি, সেসব খুব সম্ভব অটোমেটেড কিছু কাজ, যেমন ই-মেইল... ফলে লোকটার ল্যাপটপ যদি ব্যাকগ্রাউন্ডেও কাজ করে থাকে, তবুও কোনো সমস্যা হয়নি। প্রতি মিনিটে একবার হিট করেছে ওটা নেটওয়ার্কে। ওই লোক যদি তখন ইন্টারনেট ব্রাউজ করার কাজে ব্যবহার করত ল্যাপটপটা, তা হলে সে-সময় নেটওয়ার্কে আরও বেশি হিট পেতাম আমরা।’

‘কোনো কাজই যদি না থাকবে তার, তা হলে ওয়াই-ফাইয়ে সংযুক্ত হতে গেল কেন সে?’

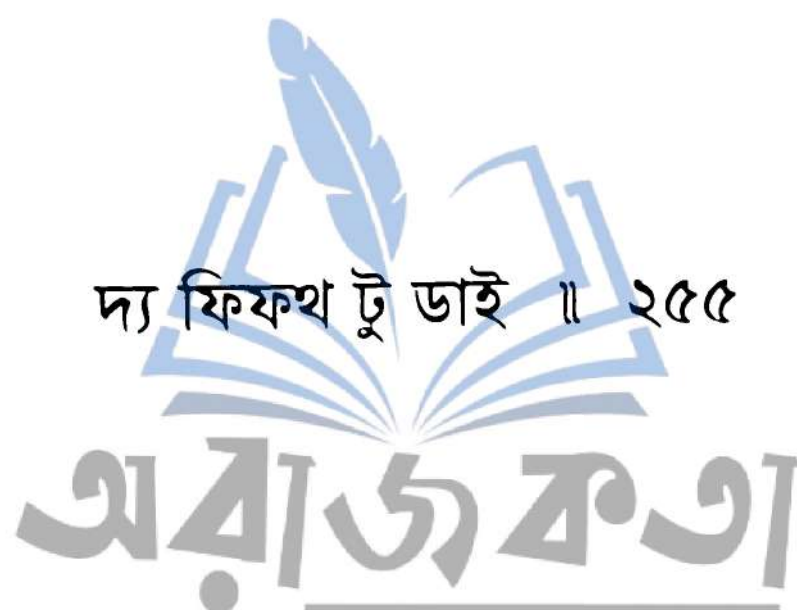
‘আমার মনে হয় না সে-বার ইচ্ছাকৃতভাবে সংযুক্ত হয়েছিল লোকটা ওই নেটওয়ার্কে। খুব সম্ভব যা ঘটেছিল... আগে কোনো এক সময়ে পাবলিক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয়েছিল নিজের ল্যাপটপের সাহায্যে। এবং তারপর কানেকশনটা ডিলিট করেনি অথবা করতে ভুলে গেছে। ফলে বিশেষ সেই এন্ট্রি রয়ে গিয়েছিল ওর কম্পিউটারের সিস্টেমে। আর তাই যখনই সে ওই পার্কের নেটওয়ার্কের রেঞ্জের ভেতরে এসেছে, আপনাআপনি চালু হয়ে গেছে কানেকশনটা। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল আমার বেলায়... স্টারবাক্স-এ। সময় বাঁচানোর জন্য অনেকেই করে এ-রকম কাজ।’

‘যা হোক, আমার সেই আসল প্রশ্নে ফিরে যাই। ওই লোককে ট্রেস করা কি সম্ভব তোমার পক্ষে?’

‘একটা আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে বাসার ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের মতো। নম্বরটা সবসময় একই থাকে, সবসময় চালু থাকে। কাজেই নেটওয়ার্কের ভাষায় স্ট্যাটিক ফিজিকাল লোকেশন বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ কোনো একটা ডিভাইস যদি নির্দিষ্ট কোনো অবস্থানে স্থির থাকে, তা হলে সেটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব। আগেও বলেছি আবারও বলছি, প্রতিটা ম্যাক অ্যাড্রেস অনন্য এবং নির্দিষ্ট... আমাদের সেই রহস্যময় লোকের ল্যাপটপের বেলাতেও কথাটা প্রযোজ্য। ওই ল্যাপটপ চালু করা সম্ভব, বন্ধ করা সম্ভব, লক্ষ লক্ষ আলাদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। মোদা কথা হচ্ছে, সত্যিকার অর্থে ট্রেস করা বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো কিছু করতে পারবো না আমরা ওই ডিভাইসের বেলায়। তবে... ওটার ওপর নজর রাখতে পারবো।’

‘কীভাবে?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৫৫



অরাজকতা



‘নগর-পরিকল্পনাবিদেৱা যখন ফি ওয়াই-ফাই চালু কৰেছিলেৰ এই শহৰে, তখন আইনপ্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ লোকজনেৰ জন্ম একটা পেছনেৰ-দৰজা খোলা ৰেখেছিলেৰ। যা বলতে চাইছি তা হলো, আমি একটা স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰোগ্ৰাম লিখে সেটা ছেড়ে দিতে পাৰি ইন্টাৰনেটে অথবা কোনো একটা নেটওয়ার্কে। ফলে কী হবে... আমাদেৰ সেই রহস্যময় লোকেৰ ল্যাপটপ যদি কোনো পাবলিক সিস্টেমেৰ সঙ্গে সংযুক্ত হয় কখনও, সঙ্গে সঙ্গে সেটা জেনে যাবো আমৰা। এবং ওই মুহূৰ্তে সে ঠিক কোথায় আছে, সে-খোঁজ সঙ্কুচিত কৰে আনতে পাৰবো। তখন নিৰ্দিষ্ট যে-হাবেৰ সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সে, সেটা খুঁজে বেৰ কৰতে পাৰলেই হবে। তবে একটা কথা মাথায় ৰাখতে হবে আমাদেৰ... প্ৰতিটা টাওয়ার সিকি মাইল ব্যাসাৰ্ধ নিয়ে কাজ কৰে।’

‘সিটি ব্লকে ও-ৰকম সিকি মাইলেৰ ব্যবধান আৰ আলাদা কোনো দেশ একই কথা।’

‘আমৰা এটুকু জানতে পাৰবো, এই শহৰে আছে কি না লোকটা। তাৰ ফলে কিছু একটা গুৰু তো কৰা যাবে অন্তত। এমনও হতে পাৰে, কপাল ভালো হবে আমাদেৰ। এবং শেষপৰ্যন্ত কোনো একজনেৰ সঙ্গে মিলে যাবে আমাদেৰ এই খোঁজ।’

৪৯.

পোর্টার

তৃতীয় দিন, সকাল ১০:৪২

পোর্টারকে অনুসরণ করে হলওয়েতে বেরিয়ে এল সারা ওয়ার্নার। ওদের পেছনে দরজা লাগিয়ে দিল গার্ড। ইন্টারভিউ রুমে তালাবদ্ধ অবস্থায় আটকা পড়ে থাকল জেন ডো।

পোর্টারের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওয়ার্নার। ‘ওই মহিলাকে ওটা কী দিলেন আপনি?’

‘কয়েক মাস আগে একটা ক্রাইম সিনে আমাদের জন্য একটা ডায়েরি রেখে গিয়েছিল বিশপ, সেটা। ওর শৈশবে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেছে, সেসবের উল্লেখ ছিল ওটাতে। ওই মহিলা যদি আসলেই বিশপের মা হয়ে থাকে, তা হলে ঘটনাগুলো মনে পড়ার কথা তার।’

দ্রুত কুঁচকে গেল ওয়ার্নারের। ‘আপনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন, আপনাকে যদি দেখা করতে দিই ওই মহিলার সঙ্গে, তা হলে এমন কিছু করবেন না, যাতে তার ওপর বাড়তি কোনো অভিযোগ আরোপ করা যেতে পারে।’

‘ডায়েরিতে যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব নিছকই পরিস্থিতিগত তথ্য, তার বেশি কিছু না।’

‘গার্ডদেরকে ফাঁকি দিয়ে ওই জিনিস আপনি নিয়ে এলেন কী করে?’

‘আমার অন্তর্বাসের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম।’

চোখ সরু হলো ওয়ার্নারের। ‘ওই মহিলার উকিল হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য আগেই জানিয়ে রাখি আপনাকে, ডায়েরিটা আমি দিতে পারতাম তাকে। ওটা ওভাবে চোরাচালান করার কোনো দরকার ছিল না।’

‘জেনে ভালো লাগল। আমার আবার ওসব কাজ করার একটু ঝোঁক আছে।’

‘আরেকটা কথা। ওই মহিলার উকিল হিসেবে জানিয়ে রাখি, তার সঙ্গে যদি কোনো তথ্য অথবা ওই জাতীয় কিছু ভাগাভাগি করে নেয়ার দরকার হয়, তা হলে সেটা আগেভাগেই জানিয়ে রাখবেন আমাকে।’

‘ঠিক আছে, নোট করে নিলাম। মহিলাকে ওখানে কতক্ষণ রাখা হবে?’

‘বাতি বন্ধ করে দেয়ার আগপর্যন্ত... যদি আমি তাদেরকে ও-রকম কিছু করতে বলি। কেন?’

‘মহিলাকে কি একটু পর্যবেক্ষণ করতে পারি আমরা?’

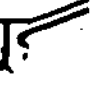
পোর্টারের চোখের সঙ্গে যেন সঁটে গেল ওয়ার্নারের চোখ জোড়া। পোর্টার জানে, মনমরা হয়ে আছে বেচারী। এবং সে-রকম হয়ে থাকার সব রকমের অধিকার আছে তার। নিজের সত্যিকারের অনুভূতিগুলো গোপন করে ভাবলেশহীন এক চেহারায় সে-ও তাকিয়ে থাকল ওই মহিলার দিকে।

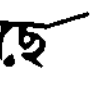
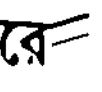
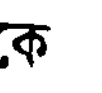
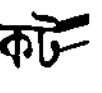
দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৫৭

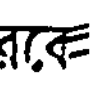
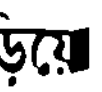


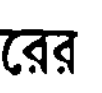
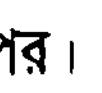
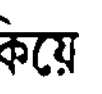
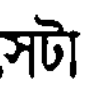
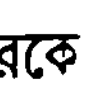
অরাজকতা

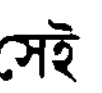
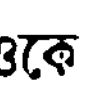
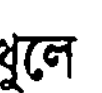
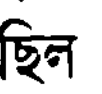
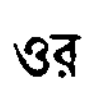


প্রস্তাবটা খানিকক্ষণ ভেবে দেখল ওয়ার্নার, তারপর জিভ দিয়ে বিচ্চি  আওয়াজ করল। মাথা নাড়ল। হাতের বাঁ দিকে একটা দরজা আছে, ঘুঁ  সেদিকে। 'আসুন।'

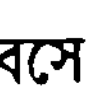
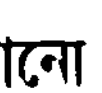
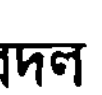
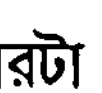
অবজার্ভেশন রুমটা ছোট... সরু কোনো হলওয়ার চেয়ে একটু বড় হবে।  ঘরের দরজা দেখে অনুমান করে নেয়া যায়, এ-রকম ঘর আরও আছে  জেলখানায়... প্রতিটা ইন্টারভিউ রুমের সঙ্গে একটা করে। হাতের বাঁ দিকে  ইন্টারভিউ রুমের সঙ্গে লাগোয়া বড় একটা ওয়ান-ওয়ে মিরর উইন্ডো আছে  আরও আছে ছোট একটা ডেস্ক, সেটার ওপর দেখা যাচ্ছে একটা কম্পিউটারে  মনিটর। সেই মনিটরে ক্লোজ-আপ করা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে জেন ডো-কে  ইন্টারভিউ রুমের টেবিলটার ধারে বসে আছে সে। সেখানকার এক কোনার একট  ক্যামেরার সাহায্যে ওর এই ছবি দেখা যাচ্ছে।

অবজার্ভেশন রুমের ডেস্কের পাশে আছে একটামাত্র চেয়ার। ওয়ার্নারকে  সেখানে বসতে বলল পোর্টার। কিন্তু মানা করে দিল মহিলা। জানিয়ে দিল, দাঁড়িয়ে  থাকতে অসুবিধা নেই তার।

জেন ডো একটুও নড়েনি আগের জায়গা থেকে। পোর্টার আর ওয়ার্নারের  মুখোমুখি বসে আছে সে। ডায়েরিটা আছে ওই মহিলার সামনে, টেবিলের ওপর।  ওটার কভারের গায়ে আঙুলের সাহায্যে ড্রাম বাজাচ্ছে সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে  আছে মিরর উইন্ডোর দিকে... যে-জিনিস পোর্টারদের জন্য জানালার কাচ, সেটা  ওই মহিলার জন্য একটা আয়না। তবুও কেন যেন মনে হলো পোর্টারের, ওদেরকে  দেখতে পাচ্ছে ওই মহিলা।

পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হলো। তারপর দশ। আরেকটু হলে আবারও সেই  ইন্টারভিউ রুমে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল পোর্টার। কিন্তু কাজটা করতে হলো না ওকে  শেষপর্যন্ত... দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন ডো, একটামাত্র আঙুল কাজে লাগিয়ে খুলে  ফেলল ডায়েরিটা, পড়তে আরম্ভ করল। পোর্টার টের পেল, টান টান হয়ে গিয়েছিল  ওর শরীর, এবার শিথিল হচ্ছে আস্তে আস্তে। ডেস্কের গায়ে হেলান দিল সে। ওর  পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওয়ার্নার। উরুতে নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা করে বাড়ি  মারছে হাতে-ধরা সেই খাম দিয়ে।

‘ওই মহিলা আরও কোনো মারামারি করেছে নাকি?’

খাম দিয়ে উরুতে আঘাত করা থামাল ওয়ার্নার। ডেস্কটা ঘুরে এসে বসে  পড়ল এককোণায়। ‘এই জেলখানা ভয়ঙ্কর একটা জায়গা। এ-রকম খারাপ কোনো  জায়গা কখনও দেখিনি আমি। এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুব ঘন ঘন বদল  হয়... গত কেবল এক বছরে সে-হার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি। এখানে একই  গার্ডকে দু’বার দেখা বাকি আছে আমার এখনও। রিভলভিং ডোর বলতে যা  বোঝায়, সে-রকম কিছু-একটা আছে এখানে। এবং সে-সুবিধার ব্যাপারটা  গার্ডদের চেয়ে কয়েদিরা জানে ভালো। কয়েদিদের বেশিরভাগই যাবজ্জীবন

কারাদণ্ড ভোগ করছে। তাদের হারানোর মতো কিছুই নেই। হাতেধরা কুড়াল দিয়ে সুযোগ পাওয়ামাত্র যে-কোনোকিছুর ওপর ঘা মারতে প্রস্তুত হয়ে আছে তারা। আশা করি আমার কথার মানে বুঝতে পেরেছেন।’

মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। ‘সে-সুযোগ কী রকম... এমন কোনো নতুন কয়েদি, যে কিনা মুখ খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে?’

‘এমন কোনো নতুন কয়েদি, যে এখানকার নিয়ম মেনে, আমি যাদের কথা বলছি তাদের সঙ্গে উঠ-বস করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে। যতদূর শুনেছি, আমাদের জেন ডো নিজের মতো থাকে এখানে। কেউ যদি তার সঙ্গে কথা বলতে যায়, তা হলে তার সামনে থেকে সরে যায় সে। শুনতে বেখাপ্পা ঠেকলেও সত্যি, জেলখানার কয়েদিদের মধ্যেও আমি বড়-তুমি ছোট এ-রকম একটা ব্যাপার প্রচলিত আছে। কাজেই ও-রকম নাকউঁচু কাউকে যদি অবজ্ঞা করে থাকে আমাদের জেন ডো, তা হলে... বুঝতেই পারছেন...’ হাতেধরা খামটা উঁচু করে দেখাল ওয়ার্নার। ‘এটার কথা যদি বলি... জেন ডো রীতিমতো তার শিকারের মৌসুমের কথা জানিয়ে দিয়েছে। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে... রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে অন্য কয়েদিরাও। এবার তারা যা করতে পারে তা হলো, দল গঠন করে যোগ দিতে পারে জেন ডো’র সঙ্গে। আসলে এই যে মারামারি-কাটাকাটি, এসব এখানকার কয়েদিদের একঘেয়েমি কাটানোর একটা উপায় মাত্র।’

‘ওই মহিলাকে একা কোথাও রাখা যায় কি না, সে-রকম কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব?’

সম্মতি জানানোর কায়দায় মাথা ঝাঁকাল ওয়ার্নার। ‘অবশ্যই... যদি সে-রকম কোনো জায়গা থাকে তা হলে। সরকার এখন চাইছে, এই কারা-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিউ অরলিন্স শহর এবং শেরিফ ডিপার্টমেন্টের ওপর থেকে সরিয়ে নিতে। তাতে কারও কোনো উপকার হবে কি না, কে জানে। গত মাসে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে... গত বারো মাসে, এখানকার কয়েদিদের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এ-রকম ঘটনা দু’শ’রও বেশি। এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, এ-রকম ঘটনা আছে চুয়াল্লিশটা। কয়েদিরা যৌন-হামলার শিকার হয়েছে, এ-রকম ঘটনা ঘটেছে তিনবার। কে জানে, এসব ঘটনা হয়তো আরও অনেক ঘটেছে, কিন্তু কেউ কাউকে রিপোর্ট করেনি। কয়েদিরা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে ষোলোবার। শরীরের কোনো না কোনো জায়গায় গুরুতর জখম নিয়ে স্থানীয় কোনো হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এখানকার উনত্রিশজন কয়েদিকে, কারণ জেলখানার হাসপাতালে তাদেরকে চিকিৎসা দেয়ার উপায় ছিল না। সরকারের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এসব সংখ্যাকে গুরুতর বলছে।’

ওয়ার্নার ঠাহর করতে পেরেছে, ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পোর্টার। নজর নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল সে। ‘দুঃখিত। আমি বোধহয় এই



ব্যাপারটা নিয়ে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। তুলনামূলক ভালো কিছু মানুষকে এই জেলখানার ভেতরে ঢুকতে দেখেছি আমি গত কয়েক বছরে, কিন্তু তারা যখন সাজা শেষ করে বেরিয়েছে, তখন আর আগের মতো ভালো ছিল না।’

হাসল পোর্টার। ‘কোনো একটা ব্যাপারে কোনো একজনের আবেগ কাজ করছে... দেখে ভালো লাগল। এই ব্যাপারটা বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা না। শিকাগোতেও একই ঝামেলার মধ্যে আছি আমরা। কখনও কখনও একজন গার্ড আর একজন কয়েদির মধ্যে পার্থক্যটা শুধু কোথায় থাকে, জানেন? কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে একজন গার্ড থাকে চোদ্দ শিকের এপাশে, আর একজন কয়েদি থাকে চোদ্দ শিকের ওপাশে।’

উঠে দাঁড়াল ওয়ার্নার। ঘুরল সেই ওয়ান-ওয়ে জানালার দিকে। ‘আমাদের ওই মহিলার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত যে নেবো, এখনও ভেবে পাচ্ছি না।’

যে-পাতা পড়ছিল, সেটা উল্টাল জেন ডো। মৃদু একটা ঝনঝন শব্দ উঠল তার হাত-পায়ের শেকলে, স্পিকারের সাহায্যে অবজার্ভেশন রুমে ভেসে এল সেটা।

‘মহিলাকে এতখানি বেঁধে রাখতে নিষেধ করুন গার্ডদেরকে,’ বলল পোর্টার। ‘একটুখানি হলেও আরাম পেতে দিন তাকে।’

‘আরে ধেং! এই ঘটনার জন্য এখন অনেক কথা শুনতে হবে আমাদের।’ বলল ভার্নন বেডার্ড। ধপাস করে বসে পড়ল তার ডেস্কের পেছনে রাখা কাঠের চেয়ারে। দম ছাড়ল আস্তে করে। ‘গত বুধবার ওই মেয়ের বাসায় গিয়ে তাকে দেখে আমার কথা ছিল আমার। এবং সেটা হওয়ার কথা ছিল একটা সারপ্রাইজ ভিজিট। অথচ সুযোগ করে উঠতে পারিনি আমি।’

লিবি ম্যাকিনলের প্যারোল অফিসার ঘণ্টাখানেক আগে ফিরতি ফোন করেছিল পুলকে। এই মুহূর্তে সে বসে আছে পুল আর ডিনারের সঙ্গে, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কুক কাউন্টি অ্যাডাল্ট প্রোবেশন ডিপার্টমেন্টের লবিতে। জায়গাটা মেট্রো হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেশি দূরে না।

এলিভেটর থেকে যে-মুহূর্তে বাইরে পা দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে পুল আর ডিনারকে চিনে নিয়েছিল সে। চর্বিবহুল শরীর মানুষটার। হাত মোটা মোটা। তার চশমার কাচ দেখলে সে-কাচ আরও মোটা বলে মনে হয়। পরনে হলুদ শার্ট, সেটার বুকের কাছে কয়েকটা বোতাম খোলা। নিম্নাঙ্গে আছে বাদামি স্ল্যাক্স। সেটা তার শরীরের তুলনায় দুই সাইজ ছোট বলে মনে হচ্ছে। পুল আর ডিনারকে নিয়ে বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায়, নিজের অফিসে হাজির হয়েছে সে। কক্ষটা দেখতে ছোট একটা বাস্কের মতো। একটা মাত্র জানালা আছে এখানে। নিচের পার্কিং লটটা দেখা যায় সেখান থেকে। লোকটার ডেস্কের ওপর স্তূপ হয়ে আছে বিভিন্ন ফাইল। দূরের দেয়ালে যেন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা কেবিনেট। ফাইলের স্তূপ দেখা যাচ্ছে সেখানেও।

তার ডেস্কের ওপর দেখা যাচ্ছে তিনটা স্ট্যাপলার। পুল খেয়াল করল, বেডার্ডের কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে ওগুলোর ওপর নজর চলে যাচ্ছে ওর।

‘শেষ কবে ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?’ জিজ্ঞেস করল ডিনার।

নিজের সুইভেল চেয়ারে একটুখানি মোচড় খেল বেডার্ড। কাঠের একটা কেবিনেট আছে তার পেছনে, কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল সেটার ভেতরে। তারপর বলল, ‘এই যে, পেয়ে গেছি।’ ঘুরল আবার, খুলল ম্যাকিনলের ফাইলটা। ভেতরের ফ্ল্যাপে আটকানো আছে একটা লগ, দেখে নিল সেটা। ‘জানুয়ারি মাসের নয় তারিখে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। তবে মানিয়ে নিচ্ছিল ভালোই।’

‘আপনার কথায় কেমন একটা দ্বিধা টের পাচ্ছি। তার মানে আপনি যা বলছেন, পুরোপুরি ঠিক না?’ জানতে চাইল পুল।

চেয়ারে হেলান দিল বেডার্ড। ফাইলটা টেনে নিয়েছে নিজের দিকে। ফাইলের এক কোণায় একটা হলুদ রঙের পোস্ট-ইট নোট দেখা যাচ্ছে, ওটার গায়ে খোঁচা



মারছে একটা আঙুলের সাহায্যে। ‘কয়েদিরা যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসে, দেখা যায়, তাদের অনেকেই বিভিন্ন ঝামেলার মুখোমুখি হয়। পাঁচ বছর অথবা তার বেশি জেল খাটে যারা, তাদের বেলায় এই সমস্যাটা বেশি হয়... আমার হিসেব অনুযায়ী। আপনি যখন একটা মানুষকে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে জেলখানায় বন্দি করে রাখবেন, ওই জীবনটা কিন্তু বাইরের জীবনের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হবে তাদের কাছে। জীবনটা তখন কাঠামোবদ্ধ একটা রুটিনে পরিণত হয় ওসব মানুষের জন্য। প্রতিদিন একই সময়ে খাবার খায় তারা। প্রতিদিন একই সময়ে গিয়ে জড়ো হয় কয়েদপ্রকোষ্ঠের বাইরে। প্রতিদিন একই সময়ে আলো নিভে যায় তাদের জন্য, আবার একই সময়ে জ্বলে ওঠে। তাদের প্রতিটা দিন জেলখানার ভেতরে এমনভাবে কেটে যায়, যেন তারা বসে আছে কোনো চলন্ত গাড়িতে, আর সেটা চালাচ্ছে অন্য কেউ। ওই যে কাঠামোর কথা বললাম একটু আগে... ওটার ওপর একটু বেশিই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তারা। নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলতে যা-কিছু আছে, সেটা মরে যায় আস্তে আস্তে। এখন কথা হচ্ছে, যতদিন জেলখানায় আছে তারা, এই ব্যাপারটা কিন্তু ভালো। সময় যত যায়, তাদেরকে সামলানোটা তত সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে কী বোঝায়, সেটা একসময় ভুলে যায় তারা। আর তাই তারা যখন জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসে, দেখা যায়, নিজেদের বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে, এটা-সেটা বাছবিচার করতে গিয়ে রীতিমতো খতমত খেয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে মনে করুন লাঞ্চার কথা— কোথায় সারবে সেটা, কখন সারবে, কী খাবে... দ্বিধায় ভুগতে থাকে সেসব নিয়ে। কখনও কখনও এই ব্যাপারটা অনেক বড় কোনোকিছু হতে পারে।’

সামনের দিকে ঝুঁকল পুল। লিবি ম্যাকিনলের ফাইলে যে-লগ আছে, সেটা দেখছে। ‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওই মেয়ে ঠিকমতো মানিয়ে চলতে পারছিল না?’

একটা মুহূর্ত পুল আর ডিনারকে দেখে নিল বেডার্ড। ‘রীতিমতো জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছিল মেয়েটা।’

‘তা হলে এখানে এসব কথা লিখলেন কেন?’

‘জেল থেকে বের হওয়ার পর একটা মানুষ যে-জীবনের সম্মুখীন হয়, সেটা ঠিকঠাক করে দেয়ার চেষ্টা করি আমি। তাদের হাতটা ধরি। তাদেরকে শেখাই, কীভাবে যত্ন নিতে হবে নিজেদের। কীভাবে দূরে থাকতে হবে সমস্ত প্রলোভন থেকে, ঝামেলা থেকে। ব্যাপারটা কিন্তু সহজ না... আমার জন্যও না, তাদের জন্যও না।’ ফাইলের গায়ে একটা হাত রাখল বেডার্ড। ‘একটা কথা বলি। আমাদের এই যে প্যারোল সিস্টেম... এটার প্রায় সবাই কিন্তু চাইলেই আমার যে-কোনো ফাইল ঘাঁটতে পারে। শুধু যে আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই করতে পারবে কাজটা, এমন না। সুতরাং আমি যদি কোনো ফাইলে একটা কোনো ভুল কথা লিখি, তা হলে তার মানে হচ্ছে, ওই মানুষটার জন্য একটা ঝামেলা তৈরি করে

দিলাম। এমন একটা অসুবিধা তৈরি করে দিলাম মানুষটার জন্য, যা, অনেক লম্বা একটা সময় ধরে অনুসরণ করতে থাকবে তাকে। আমি লিখেছি, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর বাইরের দুনিয়াটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে ঝামেলা হচ্ছিল লিবি ম্যাকিনলের। বিশেষ এই ব্যাপারে কিন্তু পড়ালেখা করার সুযোগ ছিল তার। কিন্তু সে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, সুযোগটা নেবে না। তার জায়গায় বরং আরেকজন প্যারোলিকে ওই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। স্বাভাবিক কাজকর্ম বলতে যা বোঝায়, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সেসব প্রায় কিছুই করতে পারছিল না মেয়েটা।

‘আপনার ওই হলুদ পোস্ট-ইট নোটের মানে কি সেটাই?’ জিজ্ঞেস করল পুল। ‘ওটা কি কোনো এক জাতের ইন্টারনাল কোড? যেটা দেখলেই আপনি বুঝে যান, জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মানুষটার অবস্থা কী? তখন ফাইল আর তেমন একটা ঘাঁটতে হয় না আপনাকে?’

মাথা ঝাঁকাল বেডার্ড। ‘সবুজ মানে সব ঠিকঠাক। লাল মানে বড় রকমের ঝামেলা। নীল মানে মানিয়ে চলছে, তবে তাতে সময় লাগছে।’

‘লিবি ম্যাকিনলের ট্যাগটা হলুদ।’

‘হলুদ মানে হচ্ছে, আবার জেলখানায় ফিরে যেতে চাইছিল মেয়েটা। প্যারোলে যারা মুক্তি পায়, তাদের কাউকে কাউকে বড় রকমের কোনো না কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দেখেছি আমি। তারপর তারা কী করে জানেন? সশরীরে গিয়ে হাজির হয় নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে। উদ্দেশ্য একটাই... আবার যাতে গিয়ে ঢুকে পড়তে পারে জেলের ভেতরে।’ ফাইলে লিবি ম্যাকিনলের একটা ছবি আছে, সেটার দিকে তাকাল বেডার্ড। ‘হাফওয়ে হাউস মানে কী, সেটা হয়তো জানা আছে আপনাদের। জেল থেকে যারা ছাড়া পেয়েছে, অথবা যাদের মানসিক সমস্যা আছে, তাদের দেখভালের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান। আমি ভেবেছিলাম, ও-রকম কোনো জায়গায় নিয়ে যাবো মেয়েটাকে। যদি তাতেও কোনো কাজ না হয়, একজন বা দু’জন রুমমেটের ব্যবস্থা করে দেবো তার জন্য। কখনও কখনও কাজে লেগে যায় এই ব্যাপারটা।’

পুল খেয়াল করল, আবারও সেই তিনটা স্ট্যাপলারের দিকে তাকিয়ে আছে সে। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তাকাল বেডার্ডের দিকে। ‘একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো আপনাকে। চাইবো, জবাব দেয়ার আগে যাতে ভালোমতো চিন্তাভাবনা করেন আপনি।’ ঝুঁকল সামনের দিকে। একটা কনুই ঠেকিয়ে রেখেছে ডেস্কে। ‘আপনার কী মনে হয়, বলুন তো? লিবি ম্যাকিনলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, নিজের দেখভাল ঠিকমতো করতে পারছিল না... সেজন্য ফিরে যেতে চাইছিল জেলখানায়? নাকি জেলের বাইরের পৃথিবীতে থাকতে ভয় পাচ্ছিল মেয়েটা? জেলখানাটাই নিরাপদ বলে মনে হচ্ছিল তার কাছে?’

ঈর্ষ কুঁচকে গেছে বেডার্ডের। ‘আপনি বোঝাতে চাইছেন, বিপদে ছিল ওই মেয়ে? তার পেছনে লেগে গিয়েছিল কেউ একজন?’



‘হ্যাঁ।’

বড় করে দম নিল বেডার্ড। ধীরে ধীরে ছাড়ল সেটা। ‘বলা মুশকিল। কারণ আমাকে কখনোই সে-রকম কিছু বলেনি ওই মেয়ে। শেষ যে-বার দেখা হলো তার সঙ্গে, কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছিল তাকে। সিন্ধে গিয়ে আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে এসেছিল। তখন খেয়াল করেছিলাম, হাত কাঁপছে বেচারীর। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। কেমন যেন ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল চোখ দুটো। তার মানে ঘুম ঠিকমতো হচ্ছিল না তার। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, শুকিয়ে গেছে। হয়তো ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করার কারণে ওজন কমে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি, বিপদে আছে সে। যদি সে-রকম কিছু হতো, আমার মনে হয় আমি ঠিকই টের পেতাম। যারা কোনো গ্যাঙের সদস্য, তারা যখন ছাড়া পায়, তাদের মধ্যে ও-রকম একটা ভাব কাজ করে।’

‘প্যারোলে যারা মুক্তি পায়, তারা যে-জায়গায় থাকে, সে-রকম কোনো জায়গা কি কখনও সার্চ করে দেখেছেন আপনি?’ জানতে চাইল এজেন্ট ডিনার।

‘অবশ্যই... তবে যদি যথোপযুক্ত কারণ থাকে, তা হলে।’

‘লিবি ম্যাকিনলের বাসাটা সার্চ করেছিলেন কখনও?’

মাথা নাড়ল বেডার্ড। ‘গাড়িচাপা দিয়ে একটা মানুষ মেরে ফেলার দায়ে জেল খাটতে হয়েছিল মেয়েটাকে। ড্রাগসের মামলা হয়নি তার নামে। অবৈধ অস্ত্র রাখার মামলাও হয়নি। এমনকী যে-ক’বছর জেলে ছিল মেয়েটা, ওসব থেকে দূরে ছিল। প্যারোলে মুক্তি পাওয়া কোনো কয়েদি মাদক সেবন করে কি না, সে-পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক। ওই পরীক্ষা যতবারই করা হয়েছে লিবি ম্যাকিনলের, ততবারই উতরে গেছে সে। আর তাই তার বাসাটা সার্চ করে দেখার মতো কোনো কারণই ছিল না আমার। আচ্ছা, আপনারা আসলে ঠিক কী বলতে চাইছেন, বলুন তো? ওই মেয়ে কি কোনোকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল?’

চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই শরীরের ভার বদল করল বেডার্ড।

ওই লোক আসলে কী জানতে চাইছে, জানে পুল। ওই মেয়ে কি এমন কোনোকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, যেটা ধরা উচিত ছিল আমার? আমি এখন ঠিক কতখানি ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি?

‘ক্যালিন সেলকে। বিশেষ এই নামের কোনো মানে কি আছে আপনার কাছে?’

‘না।’

এবার সামনে ঝুঁকল ডিনার। ‘আপনি নিশ্চিত?’

জবাব না দিয়ে বাঁ দিকে ফিরল বেডার্ড। কিছু নোটপেপারের আড়াল থেকে যেন উদ্ধার করল তার কম্পিউটারের কি-বোর্ডটা। ওই নাম টাইপ করল। ‘না, মনে করতে পারছি না নামটা। প্যারোল অফিসার হিসেবে যেসব কয়েদির দায়িত্ব

পালন করেছি আমি, ওই মানুষটা তাদের মধ্যে ছিল না। আমাদের সিস্টেমের কোথাও তাকে খুঁজেও পাচ্ছি না।’

পুল বলল, ‘লিবির বাসায় একটা ড্রাইভার’স লাইসেন্স পেয়েছি আমরা। পেয়েছি একটা পাসপোর্টও। দুটোতেই লেখা ছিল ক্যালিন সেলকের নাম। কিন্তু ছবিটা ছিল লিবি ম্যাকিনলের।’

‘আসল নাকি নকল?’

‘আসল।’

‘ও-রকম কোনোকিছু বানানো কিন্তু সহজ কাজ না।’

‘আসল ক্যালিন সেলকে মারা যায় সাত বছর বয়সে,’ বলে চলল পুল। ‘সাইকেল চালাচ্ছিল মেয়েটা, এমন সময় একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মারে ওকে। ঘটনাটা আজ থেকে চব্বিশ বছর আগের।’

‘লিবি ম্যাকিনলে খুব সম্ভব একটা জন্মসনদ জোগাড় করে নিয়েছিল। তারপর সে-জিনিস কাজে লাগিয়ে বানিয়ে নিয়েছে পাসপোর্ট। তারপর ওই সনদ আর পাসপোর্ট দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স,’ বলল বেডার্ড, যা ভাবছে তা মুখে উচ্চারণ করছে। ‘এখন কথা হচ্ছে, এসব কাজ যদি জেলে থাকতে করে থাকে সে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, কেউ না কেউ ওসব কাজ করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে মেয়েটাকে। আবার, যদি জেল থেকে বের হওয়ার পর করে থাকে, তা হলেও একই কথা... কেউ না কেউ সাহায্য করেছে তাকে।’

‘ঠিক কী কারণে বলছেন এই কথা?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বেডার্ড। ‘আপনারা যা ভাবছেন, এসব ঘটনা কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটে। যেমনটা বলেছি আমি একটু আগে... জেল থেকে বের হওয়ার পর জীবন নতুন করে শুরু করাটা কঠিন একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায় বেশিরভাগ কয়েদির জন্য। আর তাই কেউ কেউ ভাবে, নতুন একটা পরিচয় যদি জোগাড় করে নিতে পারে নিজেদের জন্য, তা হলে কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। বছর দশেক আগের একটা ঘটনা বলি। ওহায়ো স্টেট পেন জেলখানায় বন্দি ছিল এক লোক। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল তার। জেলে কয়েদ থাকা অবস্থাতেই নকল পরিচয়পত্র বানাত সে এবং সরবরাহ করত। জেলখানার যেসব কয়েদির মুক্তির দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসত, তাদের খোঁজ বের করত লোকটা। জীবনটা নতুন করে শুরু করার জন্য নকল পরিচয়পত্র বিক্রি করত তাদের কাছে। কয়েদিরা করত কী... জেলখানার বাইরে থাকা কারও না কারও সাহায্য নিয়ে ওই লোকের এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে টাকা পৌঁছে দিত। এই চাচাতো ভাই লোকটা ছিল জেলের বাইরে। এই লোক নকল পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করে ফেলত। তারপর অপেক্ষা করত কয়েদিদের জন্য... কবে বেরিয়ে এসে ওসব পরিচয়পত্র নেবে। জেলখানার ভেতরে বসে এই কাজ করা সম্ভব না কারও পক্ষে। কারণ হাজারটা ফোনকল করতে হয় এখানে-



সেখানে বিভিন্ন জায়গায়, প্রচুর চিঠিপত্র লিখতে হয়। কাগজপত্র হাতে পাওয়ার জন্য একটা ঠিকানার দরকার হয়। জেলখানার কোনো কয়েদির জন্য ওসব কাগজ কখনোই ডাকযোগে পাঠানো হয় না।’

‘আমারও তা-ই মনে হয়।’

ঘাড়ের কাছটা চুলকাল বেডার্ড। যে-আঙুলের সাহায্যে করেছে কাজটা, সেটা দেখল কিছুক্ষণ। ‘ধারণা করা হয়, ওহায়োর সেই চক্রটা জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে এবং সরবরাহ করে প্রতি বছরে প্রায় দু’লক্ষ ডলার হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই একই কাজ যদি স্টেটভিল কারেনকশনাল জেলখানাতেও ঘটিয়ে থাকে কেউ, একটুও আশ্চর্য হবো না আমি... মানে, যেখানে আটকা ছিল লিবি ম্যাকিনলে, সে-জায়গার কথা বলছি। এমনও হতে পারে, ওই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল অনেকে। একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের। প্রযুক্তি কিন্তু অনেক উন্নত হয়েছে আজকাল। সুতরাং জাল পরিচয়পত্রের ব্যবসাটাও বিশেষ একটা কাজে পরিণত হয়েছে। আর এ-কাজে লাভও প্রচুর।’

‘লিবি ম্যাকিনলের বাসার যে-ড্রয়ারে নকল পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে, আমরা কিন্তু সেই একই জায়গা থেকে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভও পেয়েছি।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেডার্ড। ‘যে-লোক লিবিকে নকল পরিচয়পত্র দিয়েছিল, সেই একই লোক ওই পিস্তল দিয়ে থাকতে পারে মেয়েটাকে। হরেক রকম জিনিসের কারবার করে ওসব লোক... নকল পরিচয়পত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, কবে কখন কোন দেশে পাড়ি জমাতে হবে না-হবে সেসব প্ল্যান। এসব কোনোকিছু পেতে হলে আপনাকে শুধু যা করতে হবে তা হলো, ঠিক লোকের হাতে তুলে দিতে হবে উপযুক্ত পরিমাণের টাকাপয়সা। যদি করতে পারেন ওই কাজ, যে-জীবনই চান না কেন, কিনে নিতে পারবেন। অন্তত আমার তা-ই ধারণা।’

পুল বলল, ‘লিবি ম্যাকিনলের টাকাপয়সা কেমন ছিল?’

ওই মেয়ের ফাইলে আরেকবার নজর বুলিয়ে নিল বেডার্ড। ‘ওর বাবা-মা দু’জনই মারা গেছেন। একটামাত্র বোন ছিল বেচারীর, সেই মেয়েকে আবার “খাতিরযত্ন” করে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে ফোর মাস্কি কিলার। গত বছর আমি এমন কাউকে পাইনি, যে-মানুষটা কিনা দেখা করতে গিয়েছিল লিবির সঙ্গে। আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান, জেলখানায় গিয়ে খোঁজখবর করে দেখতে পারেন। ওই মেয়ের তেমন কোনো কলরেকর্ডও পাওয়া যায়নি। সুতরাং আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, একা একাই সময় কাটিয়ে দিত মেয়েটা। সব রকমের ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাইত। জেলে যাওয়ার আগে ওই মেয়ের ধারকর্জ কেমন ছিল?’

জবাব দেয়ার আগে মোবাইল ফোনের নোট দেখে নিল ডিনার। ‘গাড়ির পেছনে মেয়েটার ঋণ ছিল বারো হাজার ডলার। স্টুডেন্ট লোন ছিল আটচল্লিশ হাজার ডলার। যে-চেকিং অ্যাকাউন্ট ছিল মেয়েটার, সেখানে ছিল মাত্র বত্রিশ

ডলার। বছরের পর বছর ধরে ব্যাংক ফি দিতে দিতে সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল ওই অ্যাকাউন্টের। এবং শেষপর্যন্ত অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।’

দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে দিল বেডার্ড। ‘জেলখানায় কোনো কাজের বিনিময়মূল্য চুকানোর উপায় মাত্র দুটো... হয় নগদ টাকা দিতে হবে আপনাকে, নয়তো কারও দানদক্ষিণা গ্রহণ করতে হবে। নকল পরিচয়পত্র কেনার মতো টাকা যদি না থাকে লিবির কাছে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর কোনো একজনের জন্য বিশেষ কোনো একটা কাজ করে দিতে রাজি হয়েছিল সে। বিনিময়ে হাতে পেয়েছিল ওই পরিচয়পত্র। একই ব্যাখ্যা ওই পিস্তলের বেলাতেও খাটতে পারে।’

‘আপনার সঙ্গে তো যোগাযোগ ছিল মেয়েটার। তাকে দেখে কী মনে হয়েছে, বলুন তো? পিস্তল-বন্দুক চালানোর মতো পারদর্শিতা ছিল ওর?’ জানতে চাইল পুল।

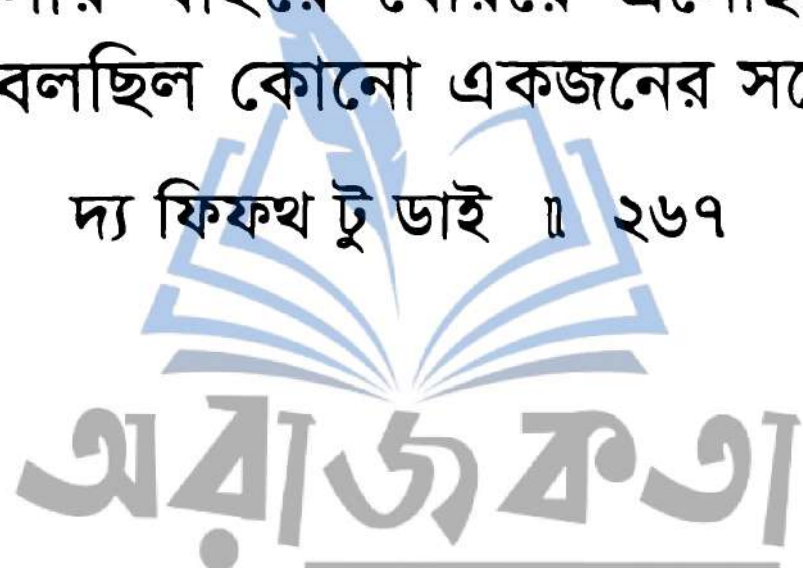
‘আমার মনে হয় জেলখানায় কয়েক বছর কাটানোর পর যে-কেউ ও-রকম কোনো জিনিস হাতের নাগালে পেতে চাইবে। এমনকী সে-মানুষটা যদি শহরতলীর নিরপরাধ কেউও হয়, তবুও।’

দশ মিনিট পর।

বেডার্ডের অফিসের বাইরে, পুলের জিপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু’জন। তুষারপাতের পরিমাণ কমেছে। আশপাশের সবকিছু সাদা হয়ে আছে। কোটের হাতা দিয়ে ডলে ডলে উইন্ডশিল্ড সাফ করল পুল। ‘লিবি ম্যাকিনলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে কিছু জানা গেল?’

মাথা নাড়ল ডিনার। ‘ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন পুলিশ অফিসার পাঠানো হয়েছিল ওই মেয়ের বাসায়। কিন্তু তারা কিছুই জানতে পারেনি। আমি নিজেও গিয়েছিলাম সেখানে। এক বুড়ি মহিলার দেখা পেয়েছি... লিবিকে দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন একমাত্র তিনিই। বাসার একটা জানালার ধারে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দেন তিনি। নিজের নাকটা অন্যদের বেলায় গলানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তাঁর।’ নজর বুলিয়ে নিল মোবাইল ফোনের ওপর। ‘মহিলার নাম রক্সি হ্যাকলার। বলেছেন, লিবি ম্যাকিনলে ওই বাসায় গিয়ে ওঠার পর মোট তিনবার দেখেছেন মেয়েটাকে। যেদিন মেয়েটা গিয়েছিল সেই বাসায়, সেদিন প্রথমবার। বাসার সামনে মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল একটা গাড়ি। ওর সঙ্গে তখন ছিল একটা মাত্র ডুফেল ব্যাগ। পরদিন মেয়েটা যখন গ্রোসারি স্টোর থেকে হাত ভর্তি করে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ফিরে আসছিল, তখন মেয়েটার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন তিনি। তৃতীয়বার মেয়েটাকে তিনি দেখেছেন গত সপ্তাহে। বলেছেন, লিবি নাকি সে-সময় বাসার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, ফুটপাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। ফোনে কথা বলছিল কোনো একজনের সঙ্গে। আবহাওয়ার কারণে ওই

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৬৭



অরাজকতা



ব্যাপারটা তখন অদ্ভুত ঠেকেছিল রব্বির কাছে। আপনিই বলুন, এ-রকম তুষারপাতের মধ্যে শুধু একটা ফোন করার জন্য বাইরে কে যায়?’

‘মেয়েটা তখন কার সঙ্গে কথা বলছিল, কিছু জানা গেছে?’

‘ওই মেয়ের নামে কোনো মোবাইল ফোন আছে, এ-রকম কোনো রেকর্ডই পাওয়া যায়নি। আর আমরাও কিন্তু ওই বাসায় কোনো মোবাইল ফোন খুঁজে পাইনি।’

‘আচ্ছা, এ-রকম কি হতে পারে, আড়িপাতার কোনো যন্ত্র বসানো হয়েছিল ওই বাসায়?’

পায়ের কাছে জমে থাকা, কালচে হয়ে আসা তুষারের ছোট একটা স্তূপে লাগি হাঁকাল ডিনার। ‘সন্দেহ আছে। আমাদের টেকনিশিয়ানরা তল্লাশি চালিয়েছে ওই বাসায়। ও-রকম কোনো যন্ত্র পায়নি। সেখানে কয়েকবার তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তারা। যা হোক, আমার কথার মানে এ-ই না, আড়িপাতার কোনো যন্ত্র যে বসানো নেই কোথাও, এ-রকম কোনো ধারণা ছিল না লিবির। জেলখানায় অনেক বছর বন্দি থাকার পর বেরিয়ে এসে অনেকেই ভাবতে শুরু করে, কেউ একজন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে তাকে। কেউ একজন লুকিয়ে থেকে শুনছে তার সব কথা।’

‘এই কেসে সত্যিই সে-রকম কেউ একজন থাকতে পারে।’

গাল ফুলিয়ে বাতাস ছাড়ল ডিনার। ওর নিঃশ্বাস সাদা ধোঁয়া হয়ে কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল বাতাসে। ‘বিশপ এর আগে কখনোই একই পরিবারের দ্বিতীয় কোনো সদস্যকে খুন করেনি। লিবিই প্রথম। বিশপ যে আসবে কোনো না কোনোদিন, জানত মেয়েটা। আর তাই পালানোর চেষ্টা করেছিল বেচারী। কিন্তু বিশপের গতি ছিল বেশি।’

মাথা ঝাঁকাল পুল। ‘আমরাও সে-রকম ধারণা। বিশপ কেন এই কাজ করেছে, সেটা যদি বের করতে পারি আমরা, তা হলে শয়তানটার আরও কাছাকাছি যেতে পারবো।’

‘এবার তা হলে কী করবো আমরা? এখানে এত ঠাণ্ডার মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার বিচিও তো জমে যাচ্ছে।’

‘মেট্রো অফিসে যাচ্ছি আমি। বিশপ একটা বাক্স রেখে গিয়েছে, সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করার কাজটা শেষ করা দরকার আমার। তুমি এক কাজ করো না। নকল পরিচয়পত্র ঘেঁটে জানার চেষ্টা করো, ওসব বানানোর প্রয়োজন কেন হয়েছিল লিবির। কে সাহায্য করেছিল মেয়েটাকে, জানা দরকার আমাদের।’

‘বিশপের অন্য শিকারদের পরিবারের সদস্যদের ওপর কি নজর রাখা উচিত আমাদের?’

এই প্রশ্নের কোনো জবাব জানা নেই পুলের।

ঠাণ্ডা কক্কিটের ওপর গড়ান খেল ল্যারিসা বিয়েল। বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখেছে দু'পা। চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, মাথার পাশে বমি করে রেখেছে নিজেরই। লাল লাল কীসব যেন আছে বমিতে। গত কয়েক ঘণ্টা এই নিয়ে ক'বার বমি করেছে, সে-হিসেব ভুলে গেছে সে। গলাটা ভীষণ ব্যথা করছে। ঢোক গিলতে পারছে না সে। কথা বলতে পারছে না।

বমি করার সময় কিছু কাচের টুকরোও বেরিয়ে এসেছে। ওসব দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা। লাল আর হলুদের মাঝখানে যেন ঝিকমিক করছে কাচের সাদা টুকরোগুলো। পাকস্থলীটাও ব্যথা করছে সাংঘাতিক। তার মানে, মেয়েটা জানে, এখনও কাচের সব টুকরো বেরিয়ে আসেনি।

সে যখন কাচ গিলে ফেলেছিল, তারপর সেই প্রশিক্ষক লোকটা ওর চুল ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল ফ্রিজারের কাছে। জোর খাটিয়ে বেচারীর মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল ভেতরে। পানির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না মেয়েটা। ওর নাক আর গলায় ঢুকে গিয়েছিল পানি। কেশে উঠতে বাধ্য হয়েছিল সে। এবং তার ফলে গিলে ফেলেছিল আরও পানি।

‘খাও!’ চৈঁচিয়ে উঠেছিল ওই লোক।

দম নিতে পারছিল না ল্যারিসা।

এবং ওকে দম নিতে দিতে চাইছিলও না প্রশিক্ষক লোকটা।

পানির কারণে জ্বালা করছিল চোখ। মনে হচ্ছিল, সাগরের পানি লাগছে বুঝি চোখে। থুতু ফেলার কায়দায় সেই লবণ-পানি মুখ থেকে বের করে দিতে চাইছিল মেয়েটা। কিন্তু ওই লোক চেপে ধরে রেখেছিল মেয়েটার মুখ, চেপে ধরে রেখেছিল মেয়েটার নাক... যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি গিলে ফেলে সে, ততক্ষণ। এই একই পদ্ধতি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে লোকটা। আর তারপরই শুরু হয়ে যায় ল্যারিসার বমি। তখন মেয়েটাকে টানতে টানতে আবারও খাঁচায় ঢোকায় ওই লোক, মেঝের খাঁচায় বলতে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এবং সবশেষে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়।

কাচ যখন গিলে ফেলেছিল, সেগুলো কখন গলা দিয়ে নিচে নেমেছে, টের পায়নি ল্যারিসা। কিন্তু বমি করার সময় ওর মনে হয়েছে, রেজর ব্লেডের কিছু টুকরো যেন উঠে আসছে গলা চিরে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল সে, কিন্তু তাতে ফল হয়েছে উল্টো... ব্লেডের খোঁচা খাওয়ার মতো যন্ত্রণাটা বেড়েছে বেশি।

এই মুহূর্তে প্রশিক্ষক লোকটা উপস্থিত আছে কাছেই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ল্যারিসাকে।

খাঁচার বাইরে, কয়েক ফুট দূরে, কক্কিটের মেঝেতে বসে আছে ওই লোক। দুই চোখের নজর যেন স্থির হয়ে আছে ল্যারিসার ওপর। লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ



শুনতে পাচ্ছে মেয়েটা। বড় করে দম নিচ্ছে লোকটা, ছাড়ছেও বড় করে। হৃদয় কেমন যেন ছেঁড়া-ছেঁড়া মনে হচ্ছে ওই আওয়াজ। ডান হাতটা বাঁ হাতের ওপর রেখেছে সে। আঙুল মোচড়াচ্ছে।

একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ল্যারিসার মুখ থেকে। আরও একবার গড়ান পেয়ে সে। ওই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকটা সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে।

‘তাহাকে ভয় করিয়ো না যে তোমার আত্মাকে হত্যা করিতে পারে না, দেহকে পারে তোমার দেহকে হত্যা করিতে। বরং ভয় করো তাঁহাকে, যিনি তোমার দেহ ও আত্মা উভয়কেই ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন নরকে,’ মেয়েটার পেছনদিক থেকে নিচু গলায় ফিসফিস করে বলল ওই লোক... পবিত্র কোনো ধর্মগ্রন্থের কোথাও একটা শ্লোক আউড়াল। কথাটা সে এত নিচু গলায় বলেছে যে, মেয়েটা প্রথমে নিশ্চিত হতে পারল না, ওই কথা আসলেই শুনেছে কি না। কয়েক সেকেন্ডের নীরবতার পর একই কথা আবারও উচ্চারণ করল লোকটা। ইংরেজিতে “সোল” অর্থাৎ আত্মা বলতে গিয়ে “এস”-এ সমস্যা হচ্ছে তার... মনে হচ্ছে, বিষয়টি কোনো সাপ যেন হিসহিস করছে।

ব্যথায় আরও একবার মোচড় দিয়ে উঠল ল্যারিসার পাকস্থলী। চেষ্টা করে ওঠার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সেই চিৎকারের পথ রোধ করে দিল গলার ব্যথাটা। কেবল সাঁ সাঁ শব্দ বের হলো অল্প কিছুক্ষণ।

গিলে ফেলা কাচের কথা ভাবছে মেয়েটা।

চায় না, টুকরোগুলো বেরিয়ে আসুক বমির সঙ্গে। বরং চায়, ওসব টুকরো ফেল চিরে ফালা ফালা করে ফেলে ওর পাকস্থলীটা। চায়, ওর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ফেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওগুলোর কারণে। মনেপ্রাণে চাইছে, কাচের টুকরোগুলো যেন ওর সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দেয় চিরতরে। যদি সম্ভব হতো, আরও কাচ গিলে ফেলত সে।

এখনও ব্যথা করছে, তার মানে হচ্ছে, এখনও বেঁচে আছে মেয়েটা। যখন এই ব্যথা থেমে যাবে, শান্তি পাবে সে। কিন্তু সেটা থামছে না কিছুতেই। পেটের কাছে একটা জ্বালাপোড়া টের পাচ্ছে বেচারী। মনে হচ্ছে, যেভাবেই হোক না কেন একটা তপ্ত ছুরি যেন ঢুকে পড়েছে ওর পেটের ভেতরে। হাঁটু দুটো হাত দিয়ে খামচে ধরল বেচারী। নিঃশব্দ একটা চিৎকারকে বেরিয়ে যেতে দিল গলা চিরে।

ওর পাশে কোনো একজায়গায় বেজে উঠল একটা মোবাইল ফোন।

রিসিভ করা হলো কলটা। দূর থেকে একটা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। স্পিকার মুঠ চালু করা নেই। তারপরও ওই কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে মেয়েটা। ‘কাচ গিলে ফেলেছে, কিন্তু তার মানে তো এটা না যে, মরার মতো দশা হয়েছে ওই মেয়ের। এখনও হয়তো দেখতে পারে সে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রশিক্ষক লোকটা। ‘মেয়েটার বড় রকমের কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে। সে আর দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আর কখনও হয়তো দেখতেও পাবে না।’

‘তোমার কিন্তু চেষ্টা করা দরকার।’

‘অন্য কাউকে দরকার আমার।’

লাইন কেটে দেয়া হলো ও-প্রান্ত থেকে। নীরবতা নেমে এল বেসমেন্টে।

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল প্রশিক্ষক লোকটা।

এখনও নীরবতা।

কেমন যেন স্তব্ধ ঠেকছে সবকিছু।

আশপাশে জমাট অন্ধকার।

‘জানিয়া রাখো, তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করা হইয়াছে একবার, কিন্তু তাহার পরই হইবে বিচারকার্য,’ আবারও শ্লোক আউড়াতে শোনা গেল প্রশিক্ষক লোকটাকে।

ল্যারিসার মনে হলো, ওর কানের কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে বলা হয়েছে কথাটা।

লাফিয়ে উঠল সে। অসহ্য একটা ব্যথায় যেন পুড়ে যাচ্ছে ওর পেট।

এখন ওর ঠিক পেছনে হাজির হয়েছে ওই লোক। কখন এত কাছে চলে এল লোকটা? শুনতে পায়নি বেচারী।

সে কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল?

তা হলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল কতক্ষণ?

ঘাড়ের ওপর লোকটার গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে সে। টের পাচ্ছে, দুর্গন্ধ আছে সে-নিঃশ্বাসে।

নিশ্চয়ই আরও একবার বমি করেছে ল্যারিসা। কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছুই মনে করতে পারছে না সে। কেমন যেন চটচটে হয়ে আছে ওর চুল।

মুখ ঘুরিয়ে ওই লোকের দিকে তাকাল মেয়েটা। ব্যথা আর সহ্য করতে পারছে না।

খাঁচার ভেতরে অন্য কেউ নেই। বেসমেন্টেরও একই অবস্থা।

ল্যারিসা এখন একা।

কেউ একজন সবুজ সেই লেপ মুড়িয়ে গুঁজে দিয়ে গেছে ওর মাথার নিচে।

বাড়ির ভেতরে একটু পর পর কেমন একটা ক্যাচকোঁচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এটা বাদ দিয়ে বললে সারা বাড়িতে এখন কবরের নীরবতা।



ফিফটিভ অ্যাভিনিউ'র দোকানটার নাম “ট্যাক্সস আ লট অ্যাকুয়ারিয়াম অ্যান্ড ফিশ সাপ্লাইস”। ওটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্রেয়ার। টের পেল, গরম আর আর্দ্র বাতাসের একটা তরঙ্গ যেন ঘিরে ধরেছে ওকে। পা ঠুকল মেঝেতে, পরনের বুট থেকে ঝেড়ে ফেলল তুষার। খুলে ফেলল জ্যাকেটের জিপার।

দোকানটা সরু। প্রতিটা দেয়ালের সঙ্গে সারি করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে নীল কতগুলো ওয়াটার ট্যাক্স। সেসবের মাঝখান দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরি হয়েছে তিনটা। ওসব জায়গা আবার ভর্তি হয়ে আছে দোকানের বিভিন্ন জিনিস দিয়ে।

একধারে একটা কাউন্টার আছে, সেখানে একটা রেজিস্টারের পেছন থেকে মুখ তুলে তাকাল লম্বা আর ধূসর চুলওয়ালা এক লোক। একটা পেপারব্যাগ বই পড়ছিল, সেটা এখনও ধরে রেখেছে হাতে। জ্যাক রিচারের সাম্প্রতিক বই সেটা। ‘সাহায্য করতে পারি আপনাকে?’

আজ সকাল থেকে এ-রকম আরও তিনটা দোকানে গিয়েছে ক্রেয়ার। এবং তিন জায়গাতেই ব্যর্থ হতে হয়েছে ওকে। এগিয়ে গেল ওই কাউন্টারের দিকে। লোকটাকে দেখাল নিজের ব্যাজ।

কাউন্টারের ওপর বই নামিয়ে রাখল লোকটা। ড্র কুঁচকে গেছে। ‘খুঁজে পেয়েছেন নাকি?’

‘কী খুঁজে পাবো?’

‘তার মানে এখনও খুঁজে পাননি ওটা।’

চোখ সরু করল ক্রেয়ার। ‘আমি আসলে ঠিক বুঝতে পারছি না...’

‘যদি খুঁজে না পেয়ে থাকেন এখনও, তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকটা উচিত হচ্ছে না আপনার। কাজে নেমে পড়া উচিত আবারও, খোঁজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। সময় নষ্ট করছেন আপনি।’ হতাশায় বিচিত্র এক আওয়াজ করল লোকটা নাক দিয়ে। ‘আমার বীমার যে-দাবি, সেটার পরিমাণ পাঁচ হাজার ডলার। আর যে-জিনিসটা হারানো গেছে, সেটা ওই টাকার সামান্য একটা অংশ। ফলে আমি এখন দাবিও জানাতে পারছি না বীমা-প্রতিষ্ঠানে। আবার নতুন করে কিনতেও পারছি না জিনিসটা। কাজেই আপনার কাছে আমি এখন যা চাই তা হলো, গিয়ে খুঁজে বের করবেন জারজটাকে, তারপর ওই জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন এখানে।’

হাত তুলল ক্রেয়ার। ‘দেখুন, আমার মনে হয়, প্রথম থেকে শুরু করা দরকার পুরো ব্যাপারটা। আমি একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ হিসেবে কাজ করছি শিকাগো মেট্রোতে। এবং...’

‘হোমিসাইড? একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক চুরি গেছে আমার দোকান থেকে, সেটা খুঁজবার জন্য হোমিসাইড ডিটেকটিভ কী করছে এখানে?’

‘কেউ একজন আপনার একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক চুরি করে নিয়ে গেছে?’

‘কেন? আপনি কি সেজন্যই আসেননি এখানে?’

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল ক্লেয়ার। পার্কের সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে যে-ছবি আলাদা করে দিয়েছে ক্রোজ, সেটা বের করল। ‘আপনি কি এই ট্যাঙ্কের কথাই বলছেন?’

ফোনটা হাতে নিল ওই লোক। ছবিটা দেখল কিছুক্ষণ। দেখার সুবিধার্থে স্ক্রিনে চিমটি কেটে জুম করে নিল ওই ছবি। ‘বলা মুশকিল। এই ছবির অবস্থা বেশি ভালো না। তবে... হতে পারে। আমার তা-ই মনে হয়। কোথেকে পেয়েছেন এটা?’

‘ট্রাকটা চিনতে পেরেছেন?’

‘না।’

ফোনটা ফিরিয়ে নিল ক্লেয়ার, পকেটে রেখে দিল। ‘আপনার সেই ওয়াটার ট্যাঙ্ক চুরি হয়েছে কবে?’

‘আমি যখন পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছি, তখন। আপনার কি ইতোমধ্যে জানা উচিত না ব্যাপারটা?’

‘ধরে নিন আমি জানি না।’

‘ধরে নেয়ার কিছু নেই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি জানেন না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার সেই ওয়াটার ট্যাঙ্ক কবে চুরি হয়েছে, বলুন।’

কাউন্টারের ওপর লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছে লোকটা। ‘ক্রিসমাসের সপ্তাহখানেক পর। দোকানের পেছনদিকে একটা গুদাম আছে; কেউ একজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল সেখানে, ওই ট্যাঙ্ক তুলে নিয়ে পালিয়েছে।’

‘সঙ্গে আর কিছু চুরি গেছে?’

‘বিশ ব্যাগ লবণ।’

‘দেখাতে পারবেন আমাকে?’

পেপারব্যাগ বইটার যে-পাতা পড়ছিল লোকটা, সেটা ভাঁজ করে রাখল। তাকে অনুসরণ করার ইশারা করল ক্লেয়ারকে। দু’জনে যখন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার ট্যাঙ্কের মাছগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদেরকে। এ-রকম মাছ সবসময়ই ভয় লাগে ক্লেয়ারের। আর এখানকার ওয়াটার ট্যাঙ্কের কোনো কোনো মাছ বেশ বড়সড়। কল্পনার চোখে ওসব মাছের ছোট ছোট দাঁত যেন দেখতে পেল সে।

দোকানের পেছনদিকে দরজা আছে। সেটা খুলে ওরা দু’জন হাজির হলো একটা গুদামে। জিনিসপত্র কেমন যেন অগোছালো হয়ে আছে এখানে। দেয়ালে দেয়ালে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা ধাতব তাক আর র্যাক। ক্লেয়ারের হাতের বাঁ

দিকে অগোছালো অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে কাচের পুরনো কয়েকটা ট্যাঙ্ক একটার ওপর আরেকটা স্তূপ করে রাখা হয়েছে ওগুলো। ধাতুনির্মিত তিনটা পিপা দেখা যাচ্ছে। সেগুলোর ভেতরে কোনো রকমে ঠেসে ঢোকানো হয়েছে প্লাস্টিকে পাইপ, উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওসব। বিভিন্ন দৈর্ঘ্য আর সাইজের টিউবও আছে।

বড় একটা মেশিনও আছে একই জায়গায়। চলছে সেটা, ভাঙা ক্লথ-ওয়াশারের মতো আওয়াজ তুলেছে। অদ্ভুতদর্শন ওই যন্ত্র বিস্তার লাভ করেছে প্রায় দশ ফুট জায়গায়। সেখান থেকে কিছু পাইপ বেরিয়ে এসে সিলিভারে ঢুকেছে, তারপর আবার সিলিভার থেকে বেরিয়ে ঢুকেছে ট্যাঙ্কে। ছোট আরও কিছু পাইপ গায়েব হয়ে গেছে দেয়াল ভেদ করে, কোনো সন্দেহ নেই মূল দোকানের দিকে গেছে সেগুলো।

‘আমার ওয়াটার ফিল্ট্রেশন সিস্টেম। ওই যে... ওসব ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন না... ওগুলো ভর্তি হয়ে আছে লবণাক্ত পানিতে। স্বাদু পানির তুলনায় ওই লবণাক্ত পানির মান বজায় রাখাটা বেশ কৌশলের একটা কাজ। পিএইচ যদি একটু এদিক-সেদিক হয়, লবণের পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায়, লবণ যদি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে... এ-রকম যে-কোনোকিছু পুরো ইকোসিস্টেমটাকে এলোমেলো করে দিতে পারে, ফলে মারা পড়বে এখানকার সব মাছ। এবং তাতে খুব বেশি সময়ও লাগবে না... বড়জোর দু’ঘণ্টা।’ এগিয়ে গেল লোকটা, একটা পরিমাপযন্ত্র দেখল ভালোমতো। ‘কয়েক বছর আগে বেশ বড় একটা প্যাফারফিশ ছিল আমার... প্রায় এক ফুট লম্বা। কীসের যে খোঁচা লাগল ওটার গায়ে বুঝলাম না, ওটা আকারে একটা বাস্কেটবলের সমান হয়ে গেল। সব বিষ বেরিয়ে গেল ওটার শরীর থেকে। আমার অর্ধেক মাছ মরে গেল। পুরনো ফিল্টার ব্যবস্থা বদলে রিভার্স অসমোসিস চালু করলাম আমি ওই ঘটনার পর। তারপর থেকে আর কোনো সমস্যা হয়নি। যদিও লেভেল ঠিক আছে কি না, সেটার ওপর নজর রাখতে হয় নিয়মিত।’

প্যাফারফিশের ব্যাপারে কিছু শোনার মতো সময় নেই ক্রেয়ারের। ‘চোরটা কোন জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল, দেখাবেন?’

গুদামের পেছনদিকের একটা জায়গা দেখিয়ে দিল ওই লোক ইঙ্গিতে। ‘আমার ধারণা ওই দরজাটা ব্যবহার করেছিল সে।’

গ্যারেজে যাওয়ার জন্য একটা দরজা আছে সেদিকে, আর তার ঠিক সঙ্গেই আছে তুলনামূলক ছোট একটা ধাতব দরজা। দ্বিতীয় দরজাটায় ডেডবোল্ট আছে দুটো। আর স্লাইড বোল্ট আছে একটা। গ্যারেজের দরজাটা ইলেকট্রিক। ‘কোনটা?’

‘জানি না।’

‘বাইরে থেকে জোরপূর্বক খুলে ফেলা হয়েছিল কোনো দরজা... এ-রকম কোনো চিহ্ন নজরে পড়েছিল আপনার?’

লাল হয়ে গেল লোকটার চেহারা। ‘আপনার আগে যে-অফিসার এসেছিল, তাকে কিন্তু আমি বলেছি... সবসময় ভালো দেয়া থাকে ওই দরজায়। আর গ্যারেজের দরজাটাও সবসময় লাগানো থাকে। আমি যখন দোকানে আসি, চেক করে দেখি ওগুলো। আবার যখন দোকান থেকে বেরিয়ে যাই, তখনও একবার চেক করি। এবং আমার যতদূর ধারণা, ওখান দিয়েই ঢুকেছে এবং বেরিয়ে গেছে চোরটা। সে কীভাবে করেছে কাজটা, সেটা বের করার মতো বুদ্ধি যদি না রাখে এই শহরের পুলিশ, তা হলে দায় আমার না, পুলিশের।’

দুটো দরজার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার দিকে এগিয়ে গেল ক্লেয়ার। ডেডবোল্ট খুলল, স্লাইডটা সরাল। খুলে ফেলল দরজাটা। ঠাণ্ডা একঝলক বাতাস যেন ছুটে এসে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খালি হাত দিয়ে জ্যাকেট আঁকড়ে ধরে রাখল সে। ধাতব ওই দরজার কোনাগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কোথাও কোনো ঘষাঘষির দাগ নেই। কোনো জায়গা একটুখানি চ্যাপ্টাও হয়ে যায়নি। তার মানে জোর খাটিয়ে খোলা হয়নি এই দরজা। দুটো ডেডবোল্টই বেশ শক্তপোক্ত... বাইরে থেকে খুলে ফেলাটা অসম্ভব কিছু না, কিন্তু কাজটা বেশ শ্রমসাধ্য। ‘আপনি নিশ্চিত এই স্লাইড বোল্ট লাগানো অবস্থায় ছিল?’

‘নিশ্চিত, কারণ কখনোই খোলা অবস্থায় থাকে না ওটা। তা ছাড়া আমি সবসময় ব্যবহার করি বড় দরজাটা। দু’ভাবে খোলা যায় ওটা... আমার গাড়ির ভেতরে একটা রিমোট আছে, সেটা দিয়ে। আর এই যে... এখানে যে-বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে।’ ইঙ্গিতে একদিকের দেয়ালের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় জুড়ে দেয়া জ্বলজ্বলে একটা বাটন দেখিয়ে দিল ওই লোক।

তারপর ফিরে গিয়ে দাঁড়াল গুদামঘরের ঠিক মাঝখানে। দু’দিকে ছড়িয়ে দিল দু’হাত। ‘চুরি-যাওয়া যে-ট্যাক্সের কথা বলছি, সেটা ছিল ঠিক এখানে। যেদিন চুরি হয়েছে, তার আগের রাতে আমার ট্রাক থেকে নামিয়ে এনেছিলাম ওটা, ফিল্ট্রেশন সিস্টেমের পাইপের সাহায্যে পূর্ণ করেছিলাম পানি দিয়ে। পরদিনের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলাম আর কী।’

‘পরদিন কী ঘটনার কথা ছিল?’

‘এই শহরের বিভিন্ন জায়গায় ষোলোটা বড় অ্যাকুয়ারিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ করি আমি। আর তার ফলে এই ব্যবসা থেকে মোট যা আয় হয় আমার, সেটার বিশ শতাংশ চলে আসে। নিয়মিত যদি পানি বদল না করি, কী মনে হয় আপনার... ব্যবসা চালাতে পারবো আর? পানি কিন্তু উবে যায় জলীয় বাষ্প হয়ে। নোংরা হয়ে যায়। আর তাই সময়ে সময়ে বদল করতে হয়। যেখানে যেখানে অ্যাকুয়ারিয়াম আছে আমার, প্রায়ই যাই সেসব জায়গায়। যদি কোনোটা বদল করে দেয়ার দরকার হয়, করি। আবার যদি শুধু পানি বদল করে দেয়ার দরকার হয়, তা-ও করি।’

গ্যারেজের দরজা খোলার ওই বাটনের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। ক্র্যাফ্টসম্যান ৫৪৯৮৫ মডেলের জিনিস ওটা। ওর হাতের ডান দিকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে



দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা মই। ‘যদি কিছু মনে না করেন, মইটা একটু এগিয়ে দেবেন?’

মই নিয়ে এল লোকটা, ক্রেয়ারের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছে। বিশেষ সেই ডোর ওপেনারের নিচে স্থাপন করল মইটা। পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করল ক্রেয়ার। উঠে পড়ল মইয়ের ধাপ বেয়ে। ওই ডিভাইসের পেছনদিকটা দেখল ভালোমতো। হলুদ একটা বাটন দেখতে পেয়ে চাপ দিল সেটাতে। তারপর চাপ দিল ওর নিজের গ্যারেজ-দরজার রিমোটের বাটনে। ওপেনারের লাইট বাস্ক জ্বলে উঠল। ওটার ভেতরের মেমোরি ইউনিট বিশেষ এক কায়দায় লিপিবদ্ধ করে রাখল ক্রেয়ারের রিমোটের সিগনালটা।

আরও একবার নিজের রিমোটে চাপ দিল ক্রেয়ার। গুঞ্জন তুলে প্রাণ পেল গ্যারেজ-দরজার মোটর, এবং আস্তে আস্তে খুলে যেতে আরম্ভ করল দরজাটা। রিমোটে আবারও চাপ দিল সে। এবার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে মোটর, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজাটা।

মইয়ের ধাপ বেয়ে নেমে এল ক্রেয়ার। ‘এখানে প্রবেশাধিকার আছে আর কার কার?’

‘শুধু আমার।’

‘কোনো বিক্রেতাও আসে না? আপনার এখানে চাকরি করে, এ-রকম কেউও কি নেই? আর বাড়িওয়ালা... তিনিও আসেন না?’

‘দোকানের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য একটা মেয়েকে ঠিক করেছিলাম কয়েক সপ্তাহ আগে। কিন্তু সে মাত্র একদিন কাজ করেই পালিয়েছে। মেয়েটা নার্ভাস প্রকৃতির ছিল। আমার মনে হয় না এত লোকজনের মাঝখানে থাকতে পছন্দ করে সে।’ কণ্ঠ নিচু করল লোকটা। ‘মানুষ হত্যার দায়ে স্টেটভিল কারেকশনাল সেন্টারে ছিল মেয়েটা। আমার এখানে চাকরি নেয়ার মাত্র কিছুদিন আগে বেরিয়ে এসেছিল। কী ঘটে গিয়েছিল ওর সঙ্গে, বলেছিল আমাকে। শুনে ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা বলে মনে হয়েছিল আমার। আরও মনে হয়েছিল, কাজ খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। আর তাই ভাবলাম, আমার এখানে একটা ব্যবস্থা করে দিই ওকে। এখানে নগদ লেনদেন নেই তেমন একটা। আর ওই মেয়েকে একগাদা মাছ নিয়ে চলেও যেতে দেখিনি। মানুষের চরিত্র বেশ ভালোই বুঝতে পারি আমি। আর যখন ওই মেয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তখন আমার মনের ভেতরে কোনো সতর্ক-ঘণ্টাও বেজে ওঠেনি। তাই তখন ভেবেছিলাম, যদি কাজে নিয়োগ দিই মেয়েটাকে, তা হলে এমন কী ক্ষতি? পার্ট-টাইম কোনো সহযোগীর খোঁজে আমি এমনিতেও বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছিলাম পত্রিকার পাতায়।’

জ্র কুঁচকে গেল ক্রেয়ারের। ‘তার মানে আপনি যে-চাকরির বিজ্ঞাপন দেননি, সেটার জন্য আবেদন করেছিল ওই মেয়ে? এমনকী... দোকানের জানালায় কোনো “কর্ম খালি আছে” বিজ্ঞপ্তিও ঝোলাননি আপনি?’

দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল লোকটা। 'এমন একটা দিনে এখানে হাজির হয়েছিল ওই মেয়ে, যেদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম আমি। দেখল, সাহায্য দরকার আমার। নিজে থেকেই সাহায্য করতে চাইল। যেমনটা বলেছি একটু আগে... বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছিলাম আমি।'

'ওই মেয়ের নাম কী?'

'লিবি। লিবি ম্যাকিনলে।'

রীতিমতো ছোঁ মেরে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল ক্লেয়ার। স্পিড ডায়াল থেকে বিশেষ একটা নম্বর ডায়াল করল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভয়েস মেইল: 'আমি স্যাম পোর্টার, শিকাগো মেট্রোতে আছি। আমি...'

লাইন কেটে দিল ক্লেয়ার।

ধেং। ন্যাশকে ডায়াল করতে চেয়েছিল সে।



৫৩.
পুল
তৃতীয় দিন, দুপুর ১:১৮

আহ, বন্ধুরা আমার!

জেনে ভালো লাগছে, আপনারা শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছেন এই ঠিকানা, শেষপর্যন্ত হাজির হতে পেরেছেন এখানে। এই মুহূর্ত যখন আসার কথা, তখন আপনাদের সঙ্গে এখানে থাকতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আফসোস, শেষপর্যন্ত ঘটল না সে-রকম কিছু। তবে নিজেকে আমি কী বলে প্রবোধ দিচ্ছি, জানেন? আপনাদের যথোপযুক্ত হাতে শেষপর্যন্ত তুলে দিতে পারলাম এসব জিনিস। আমি নিশ্চিত, ফিনানশিয়াল ক্রাইমে আপনাদের যেসব সহকর্মী আছে, তাঁদের কাছে এসব নিয়ে যাবেন আপনারা। ফলে তাঁরা নিরেট কিছু প্রমাণ হাতে পেয়ে যাবেন মিস্টার ট্যালবট এবং ওই লোকের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। আমার বিশ্বাস, এই বাস্তবে যত কাগজ আছে, সেই লোককে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সেসব যথেষ্ট। কিন্তু খারাপটা কোথায় লাগছে, জানেন? খারাপ লাগছে, বিচারকাজের জন্য অপেক্ষা করাটা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। খারাপ লাগছে, আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে কোনো একটা দণ্ড দিতে পারলাম না জঘন্য ওই লোককে। আশা করছি, নিজের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক অংশীদার গুস্তার হার্বার্টের মতোই ন্যায়বিচারের দেখা পাবে মিস্টার ট্যালবট। অতীতে যা যা করেছে সেই লোক, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে তাকে। কী যেন বলেন না আপনারা... বিদায়ের আগে শেষ-চুম্বন... মেয়েকে সেভাবে আদর করার একটা সুযোগ হয়তো দিতে পারি আমি তাঁকে। আবার হয়তো না-ও দিতে পারি। তারা যদি একজন আরেকজনকে মরতে দেখে, তা হলেই সবচেয়ে ভালো হয় সম্ভবত।

একান্ত আপনাদেরই,
অ্যানসন বিশপ

যে-কাগজে লেখা হয়েছে এই নোট, কুঁচকে গেছে সেটার কোনাগুলো। আঙুল দিয়ে ডলে ডলে ওসব কোনা সমান করল পুল। তাকিয়ে আছে হাতের লেখার দিকে। মোটামুটি পরিষ্কারই বলা চলে। পড়া যায়। তারপরও কেমন যেন বিরক্তিকর।

খালি একটা অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল একটা বাস্ক, আর সেটার ভেতরে ছিল এই নোট। ওই বাস্ক উদ্ধার করেছিল ডিটেকটিভ ক্রেয়ার নর্টন

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৭৮

আর ব্রায়ান ন্যাশ। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে বিশপ অপহরণ করেছিল এমোরি কনার্সকে। এবং সে-ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর সে অপহরণ করেছিল ওই মেয়ের জন্মদাতা পিতা আর্থার ট্যালবটকে। নিজের নকল পরিচয়ের জন্য কিছু এম্প্লয়মেন্ট ডকুমেন্ট তৈরি করে নিয়েছিল ধূর্ত ওই লোক, এবং সে-পরিচয় কাজে লাগিয়ে পল ওয়াটসন ছদ্মনামে ঢুকে পড়েছিল শিকাগো মেট্রোর ক্রাইম ল্যাবে। তার সেসব এম্প্লয়মেন্ট ডকুমেন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেই অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা। আসলে বিশপ চেয়েছিল, তার ব্যাপারে কী কী তথ্য জোগাড় করতে পারে পুলিশ, সেটা জানতে। এবং সেসব তথ্য কাজে লাগিয়ে সে একটা পরিকল্পনা সাজিয়েছে (পরিকল্পনার সংখ্যা এক অথবা একাধিক হতে পারে)। নিশ্চিত হতে চেয়েছে, সে যে-সময়ে চাইবে, তার আগেও যেন আবিষ্কৃত না হয় ওই বাব্ব, আবার পরেও যেন না হয়। জানত, যেদিন মুখোশ খুলে যাবে তার, সেদিন খুঁজতে খুঁজতে ওই অ্যাপার্টমেন্ট ঠিকই বের করে ফেলবে পুলিশ।

ওই বাব্ব থেকে যা-যা পাওয়া গেছে, সব সুন্দরভাবে সারি করে একটা ফোল্ডিং টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছে পুল। লিবি ম্যাকিনলের প্যারোল অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগেই করেছে কাজটা।

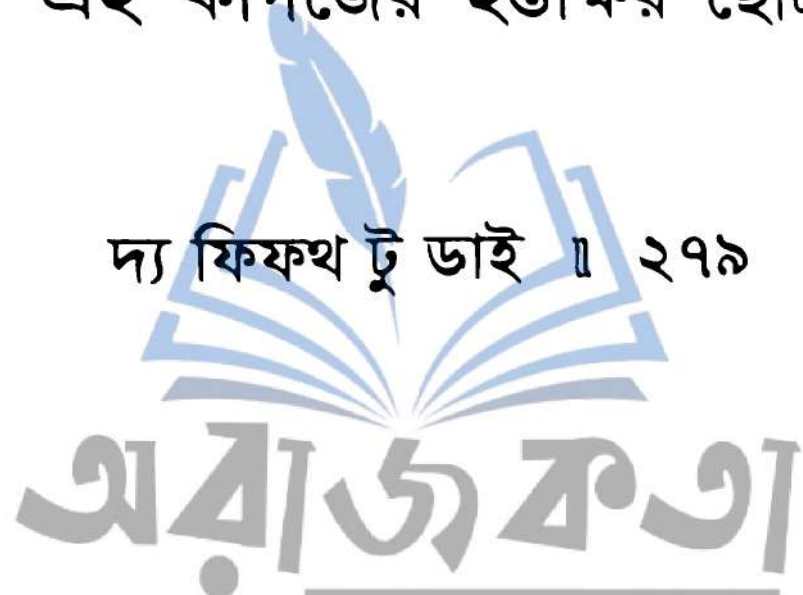
রিমের পর রিম কাগজ একসঙ্গে বেঁধে তৈরি করা হয়েছে মোট বারোটা বান্ডিল।

প্রথম সাতটা বান্ডিল থেকে পাওয়া গেছে এমন কিছু তথ্য, যেসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আর্থার ট্যালবট... বিশেষ করে ওই লোকের রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত লেনদেন এবং ফিন্যানশিয়াল হোল্ডিংস। ওসব তথ্যের খুঁটিনাটি অনেককিছু নিয়ে এখনও ব্যস্ত আছে শিকাগো মেট্রোর ফিন্যানশিয়াল ক্রাইমস ডিভিশন এবং এফবিআই। এমন পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের সহায়-সম্পত্তি আজপর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করেছে তারা, যেসব, তাদের বিশ্বাস, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাহায্যে অর্জন করা হয়েছিল। ট্যালবট এন্টারপ্রাইজ বিশাল একটা প্রতিষ্ঠান। তাদের বেশিরভাগ সহায়-সম্পত্তির ব্যবহার স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অপারেটিং অ্যাকাউন্ট বলতে যা বোঝায়, সেসবে আবার টাকা রাখার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আসলে আদালত চেয়েছেন, ট্যালবট এন্টারপ্রাইজে হাজার হাজার যেসব লোক বৈধভাবে চাকরি করে, তাদেরকে কোনো রকম বিপদের মধ্যে না ফেলে বিশৃঙ্খল ওই অবস্থার একটা সমাধান করতে। হাত দেয়া হয়নি এমোরি কনার্স ট্রাস্টেও। কারণ ট্যালবট এন্টারপ্রাইজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সেটা।

এগারোটা বান্ডিল একপাশে সরিয়ে রাখল পুল। বারো নম্বর বান্ডিলটা ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে বেশি।

এটাতে প্রায় তিন শ' তা কাগজ আছে। সবার ওপরের কাগজটাতে সবুজ আর সাদা দাগ টানা আছে। এই কাগজের হস্তাক্ষর ছোট ছোট। প্রথম লাইনে লেখা আছে:

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৭৯



অরাজকতা



এই বাভিলের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে একটা ম্যানিলা এনভেলপ। ভেতরে আছে মোট ছাব্বিশটা পোলারয়েড ছবি। সেসব ছবি বিভিন্ন বয়সের টিনএজার ছেলে এবং মেয়ের। প্রতিটা ছবিতে নম্বর দেয়া আছে। এই হাতের লেখা বিশপের হাতের লেখার সঙ্গে মানানসই না। ডিটেকটিভ ন্যাশ যে-রিপোর্ট দাখিল করেছিল, তাতে বলা হয়েছে, বিশেষ এই এনভেলপ প্রাথমিক অবস্থায় এই বাভিলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। বরং মূল বাক্সের তলদেশে ছিল। বাক্স আর এই এনভেলপ দেখলে মনে হয়, কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে ও-দুটোর মধ্যে পুলের আবার একটা স্বভাব আছে... যে-প্রমাণ যেভাবে পাওয়া গেছে, সেটা সেভাবেই রেখে দেয়। যেভাবে পাওয়া গেছে জিনিসটা, সেটা নষ্ট হতে দিতে চায় না আসলে। ওর ধারণা, নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বারো নম্বর বাভিলের সঙ্গে ওই এনভেলপ জুড়ে দেয়াটা একটা অসতর্কতা ছাড়া আর কিছু না। কারণ এর ফলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে-কেউ।

বিশেষ সেই টেক্সটের প্রথম লাইনের ওপর আঙুল বোলাল পুল।

163. WF14 2.5k. JM.

১৬৩ সংখ্যাটা, পুলিশের বিশ্বাস, বিশেষ একটা টিনএজারের সঙ্গে জড়িত... শ্বেতাঙ্গ এক মেয়ে, বয়স চোদ্দ। তাকে হয়তো ২.৫ হাজার ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। আবার এমনও হতে পারে, ওই টাকার বিনিময়ে কেনা হয়েছিল তাকে। মুদ্রাটা ডলার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে এমনও হতে পারে, ওটা ভিনদেশী কোনো মুদ্রা। মানব-পাচারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বেশিরভাগই বিটকয়েন পছন্দ করে বেশি।

বিটকয়েনের ব্যাপারটা ভালোই জানা আছে পুলের। সেই ২০০৮ সাল থেকে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য একটা কাঁটা হয়ে আছে ওই মুদ্রা। বিশেষ করে অপরাধীরা যখন অনলাইনে নগদ টাকার মতো ব্যবহার করতে শুরু করেছিল ওই মুদ্রা, তারপর থেকে। কারণ একটাই... ওই মুদ্রার উৎস খুঁজে বের করাটা রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল; শুধু জানা যেত কে কী-উদ্দেশ্যে লেনদেন করছে।

বিশেষ সেই লাইনে 2.5k দিয়ে যদি ২৫০০ বিটকয়েন বোঝানো হয়ে থাকে, তা হলে আমেরিকান ডলারে সেটার মান দাঁড়ায় ২.৬ মিলিয়ন। ব্যাপারটা কেন যেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কারণ চোদ্দ বছর বয়সী কোনো মেয়ের শরীর-স্বাস্থ্য যদি খুব ভালোও হয়, তবুও আমেরিকার বাজারে তাকে বেচাকেনা করতে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৮০

২৫,০০০ ডলারের কম লাগার কথা। ইংরেজিতে “কে” অক্ষরটা দিয়ে কখনও কখনও বিটকয়েনকে বোঝানো হয়ে থাকে সংক্ষেপে। যদি তা-ই হয়, তা হলে 2.5k সমান হয় ২,৬০০ আমেরিকান ডলারের। এবার গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান পাওয়া যাচ্ছে।

একজন মানুষের জীবনকে কিনে নেয়া এবং পরে বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারটা রীতিমতো বিষিয়ে তুলল পুলের মন। চিন্তাটা জোর করে মাথা থেকে বের করে দিল সে। প্রমাণের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে ওকে।

163. WF14 2.5K. JM.

কিশোরীর নম্বর ১৬৩। সে যে-ই হোক না কেন, একজন শ্বেতাঙ্গ। বয়স চোদ্দ। তাকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল ২,৬০০ ডলারের বিনিময়ে। আবার এমনও হতে পারে, বিক্রি করে দেয়ার জন্য তার দাম ধার্য করা হয়েছিল ২,৬০০ ডলার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জে.এম. আদ্যাক্ষরের মানে কী? হতে পারে, ওটা সেই হতভাগী মেয়েটার নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার এমনও হতে পারে, যে-লোক কিনতে চেয়েছিল মেয়েটাকে, তার নামের সংক্ষিপ্ত রূপ সেটা। নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই আপাতত।

সব পোলারয়েড ছবি হাতে নিল পুল, একটা একটা করে দেখছে। কিন্তু কোনোটার গায়েই ১৬৩ নম্বরটা লেখা নেই।

ছবি অনুযায়ী মোট মেয়ের সংখ্যা উনিশ। আর ছেলের সংখ্যা সাত।

প্রথম পাতায় যে-ক’টা লাইন লেখা আছে, সব গুনল পুল। ছাব্বিশ। মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা তিন শ’। তার মানে, এখানে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, এমন টিনএজার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। গায়ের রঙ এবং লিঙ্গের পর যে-কোড ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা যদি বয়সের হয়, তা হলে কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে আর টিনএজারের কাতারে নেই, বরং তাদের তুলনায় বেশ বড় হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বয়সের যে-এন্ট্রি খুঁজে পেল পুল, তা হচ্ছে তেইশ।

মানব-পাচারের দিক দিয়ে সারা আমেরিকায় শিকাগোর স্থান প্রথম থেকে তিন নম্বরে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই শহরে এবং শহরের আশপাশে পাচারের শিকার হয়েছে এমন ভুক্তভোগীর সংখ্যা কম করে হলেও ২৫,০০০। যদি এই তালিকা বিশ্বাসও করে কেউ, তবুও তাকে বলতে হবে, ওই ভুক্তভোগীদের প্রকৃত সংখ্যা কমপক্ষে তিনগুণ হবে।

দ্য কুক কাউন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং টাস্ক ফোর্স, দ্য শিকাগো রিজিয়োনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং টাস্ক ফোর্স (সিটিটিএফ), এবং দ্য ইলিনয় টাস্ক ফোর্স অন হিউম্যান ট্রাফিকিং... সবার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল বিশপের সেই বিশেষ

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৮১

ডেটা। কিন্তু সেটার প্রকৃত অর্থ কী, নির্ণয় করতে পারেনি কেউই। যদি পারত, আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানব-পাচারের রেকর্ড সামনে চলে আসত হয়তো।

উঠে দাঁড়াল পুল। পালাক্রমে টান টান করে দিল পা দুটো। তুলে নিল একটা পোলারয়েড ছবি। এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে। লিবি ম্যাকিনালের দল থেকে যেসব ছবি পাওয়া গেছে, সে-রকম একটা ছবির সঙ্গে ধরল হাতের ছবিটা প্রাথমিক পর্যায়ে সে ধরে নিয়েছিল, একই পোলারয়েড ক্যামেরা ব্যবহার করে তোলা হয়েছে এসব ছবি। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া আর কী। কিন্তু পরে নিশ্চিত হওয়া গেছে, একই ক্যামেরা ব্যবহার করে তোলা হয়নি সব ছবি।

বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা গেছে, টিনএজারদের ছবি তুলবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ৭৮০ টার্বো পোলারয়েড ফিল্ম। আর ম্যাকিনালের বাসা থেকে যেসব ছবি পাওয়া গেছে, সেগুলো তুলবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে পিএক্স ৬৮০ কালার শেড এফএফ। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আরও একটা তথ্য জানতে পেরেছে পুল। পোলারয়েড ক্যামেরা নাকি অনেকটা বন্দুকের নলের মতো। ছবি যখন প্রিন্ট করা হয়, তখন ওগুলোতে নাকি প্রতিটা ক্যামেরার অনন্য একটা ছাঁচ রয়ে যায়। সূক্ষ্ম কতগুলো দাগ পড়ে যায় আসলে প্রতিটা ছবিতে, উপযুক্ত যত্নপাতি ছাড়া সাধারণ কোনো মানবচক্ষু ওসব পার্থক্য ধরতে পারে না। তবে মাইক্রোস্কোপের নিচে ধরলে আবার টের পাওয়া যায় ব্যাপারটা। বাক্সের ভেতরে যেসব ছবি ঢুকিয়ে দিয়েছিল বিশপ, সেগুলো একই ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয়েছে। ছবিগুলোতে যে-ক্রমিক নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে, সে-সূত্র ধরে জানা গেছে, ওসব ছবি তোলা হয়েছে দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে, এবং বিশেষ এই ঘটনা ঘটেছে নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে।

বেজে উঠল পুলের ফোন। ডেস্কে ফিরে এল সে।

ডিনার।

অ্যাক্সেন্ট বাটনে চাপ দিল পুল।

‘ফ্র্যাঙ্ক? কিছু একটা পেয়ে গেছি আমি। তুমি ঠিকই বলেছিলে।’

‘সেই আইডি, নাকি?’

‘হ্যাঁ। বছরখানেক আগে ইলিনয় ভাইটাল রেকর্ডস-এর কাছে তাদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে একটা আবেদন জমা দেয়া হয়... প্রতিস্থাপন করতে হবে একটা জন্মসনদ। তারিখটাও বলে দিই... ২০১৪ সালের ১০ এপ্রিল।’

‘লিবি ম্যাকিনলে তখনও জেলে ছিল।’

‘হ্যাঁ। অনুরোধটা জমা দিয়েছিল ক্যালিন সেলকে। অর্থাৎ কেউ একজন ক্যালিন সেলকে’র ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জোগান দিয়েছিল সে। যেমন, যে-হাসপাতালে জন্ম নিয়েছিল ওই মেয়ে। যে-শহর এবং অঙ্গরাজ্যে জন্ম নিয়েছিল। বিয়ে হওয়ার আগে তার মায়ের পারিবারিক নাম।

বাবার পুরো নাম। কেন প্রতিস্থাপন করতে চাইছে সে ওই সনদ, জানতে চাওয়া হয়েছিল তার কাছে। জবাবে সে বলেছিল, “আগুন পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে আগেরটা।” এমনকী, লিবি ম্যাকিনলের ছবি আছে, এ-রকম একটা ফটো আইডি-ও জমা দিয়েছিল সে। সম্পূর্ণ বাটপারি আর কী। কিন্তু কেউ সেই ফটো আইডি চেক করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। যা হোক, নতুন জন্মসনদটা বেরিয়ে আসে ২০১৪ সালের ২ মে। এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পর, ২০১৪ সালের ৮ মে, একটা পাসপোর্টের আবেদন জমা দেয়া হয় ওই সনদ কাজে লাগিয়ে। সঙ্গে জমা দেয়া হয় তিনটা ইউটিলিটি বিল... ইলেকট্রিসিটি, ফোন এবং কেবল... সবই একই ঠিকানার। বলে রাখি, বিশেষ এই ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ওসব কাগজ।’

‘কোথায় সেই ঠিকানা?’

‘ব্রাইটন পার্ক।’

বুকের ভেতরে কেমন একটা চাপ-চাপ অনুভূতি হচ্ছে পুলের। ‘ঠিকানাটা টেক্সট করে দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হবে আমার।’

‘কতক্ষণ সময় লাগতে পারে?’

একটা হাত তুলল ক্রোজ, লোকে যেভাবে মাছি তাড়ায় সে-কায়দায় দূরে সরে যেতে বলল ক্রেয়ারকে। কম্পিউটারের মনিটরের সঙ্গে যেন আঠার মতো সঁটে আছে দু’চোখ। ‘ভালো একটা ক্যামেরা অ্যাপ্কেল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি আমি। সে-রকম কিছু নজরে পড়লে জানাবেন।’

‘ওই যে, ওটা!’ চিৎকার করে উঠল ক্রেয়ার।

‘আরে, আস্তে, ক্রেয়ার,’ বলল ক্রেয়ারের কাঁধের ওপর ঝুঁকে থাকা ন্যাশ।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ক্রেয়ার, স্পর্শ করল কম্পিউটারের মনিটর। ‘এই যে... এটা হচ্ছে ওই মাছের দোকানের পেছনের দরজা। ওটা কোন রাস্তা?’

একটা সিসিটিভি ক্যামেরার গ্রাফিকের পাশে একটা ইনফর্মেশন ট্যাব আছে, ওটাতে ক্লিক করল ক্রোজ। ‘সিক্সটিভু এবং মর্টিমারের একটা কোনা।’

‘আরেকটু কাছে যাওয়া সম্ভব?’

‘এর চেয়ে বেশি জুম করা যাবে না আর। ঠিক কোন দিনটা দরকার আমাদের?’

‘লোকটা বলেছে, তার সেই ট্যাক্স নাকি ত্রিসমাসের এক সপ্তাহ পর চুরি হয়েছে,’ বলল ক্রেয়ার। ‘এই ব্যাপারে জানুয়ারি মাসের চার তারিখের আগে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেনি লোকটা। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা কি ডিসেম্বর মাসের সাতাশ তারিখ থেকে শুরু করতে পারি?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রোজ। ‘সময়ের বিস্তারটা অনেক বড় হয়ে গেল।’

‘জাল যখন ফেলবোই, বড় একটা জাল ফেলাই ভালো। যা হোক, গাড়িটা কোন জাতের ছিল, সেটা দিয়ে কি সার্চ করা যেতে পারে?’

মাথা নাড়ল ক্রোজ। ‘একটা গাড়ির গড়ন কী রকম, এবং সেটা কোন মডেলের, এই ক্যামেরার ভিডিও দেখে বোঝা যাবে না সেসব। তবে এই ক্যামেরাটা গাড়ির লাইসেন্স প্লেট পড়তে পারে এবং রেকর্ড করে রাখতে পারে। ডিপার্টমেন্ট অভ মোটর ভেহিকেলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি আমি ওই তথ্য...’

ওকে বাধা দিয়ে ক্রেয়ার বলে উঠল, ‘তার মানে হচ্ছে, আমাদের সেই রহস্যময় লোক যদি তার গাড়ির নম্বরপ্লেট বদল করে না থাকে, তা হলে ওই ক্যামেরা যেসব নম্বরপ্লেটের ছবি ধারণ করেছে, সেগুলো সার্চ করে দেখতে পারবেন আপনি এবং ২০১১ মডেলের যে-ক’টা টয়োটা টান্ড্রা পাওয়া যায় সব আলাদা করে নিতে পারবেন। বিশেষ করে ওই ইন্টারসেকশন ধরে ও-রকম যে-ক’টা গাড়ি গেছে, সেসব। জলদি করুন তা হলে।’

টাইপিঙ শুরু করে দিয়েছে ক্লোজ। ‘কাজের সময় যদি কফি পাই আমি, তা হলে আমার কাজের গতি বাড়ে।’

‘কিছু একটা খুঁজে বের করুন, কথা দিচ্ছি, টানা এক মাস ধরে স্টারবাক্স থেকে কফি কিনে খাওয়াবো আপনাকে।’

‘আপনার দয়া-মায়ার কোনো শেষ নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে, যে-কথা আপনি দিলেন আমাকে, তাতে আমার বর্তমান সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না।’

ন্যাশের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। ‘গলা ভেজানোর জন্য কিছু একটা নিয়ে আসবেন?’

তর্ক করার জন্য মুখ খুলল ন্যাশ, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু না-বলাটাই ভালো মনে করল। রওয়ানা দিল আইটি ডিপার্টমেন্টের কোনায় অবস্থিত ছোট ব্রেক-রুমের উদ্দেশে।

কণ্ঠ নিচু করল ক্লেয়ার, ঝুঁকে পড়ল আরও কিছুটা। ‘স্যামের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?’

মনিটরের ওপর থেকে একটাবারের জন্যও সরেনি ক্লোজের নজর। ‘তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। সরাসরি আদেশ দেয়া হয়েছে, অথচ সেটা অমান্য করছি আমি... এ-রকম কোনোকিছু কল্পনাও করতে পারি না।’

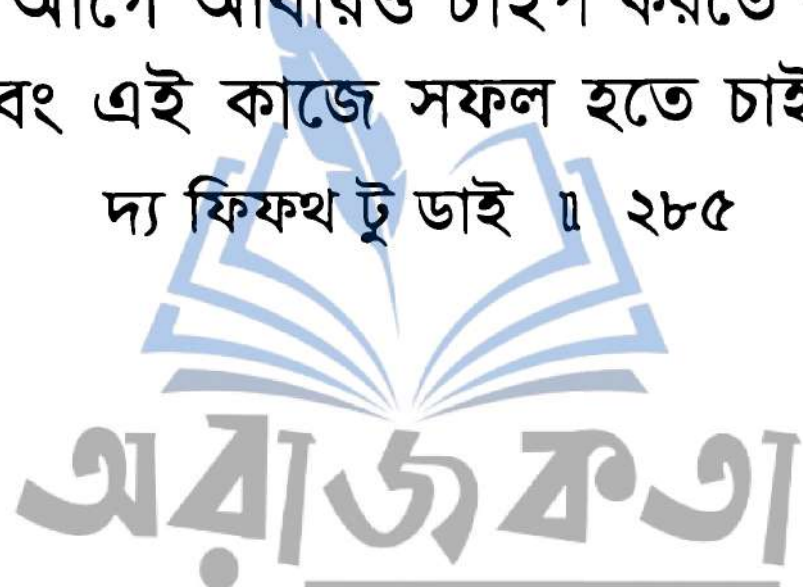
‘আমি এ-পর্যন্ত তিনবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি তাঁর সঙ্গে। তিনবারই ভয়েস মেইল পেয়েছি।’

‘ন্যাশও ফোন করেছিলেন... এই কয়েক ঘণ্টা আগে। ফলাফল একই,’ নিচু গলায় বলল ক্লোজ।

ওর স্ক্রিনে হাজির হলো একটা লিস্ট। কয়েকটা আইটেম সিলেক্ট করে নিল সে, চাপ দিল এন্টার বাটনে। ‘এই ঘরে উপস্থিত একমাত্র বয়স্ক ব্যক্তির মতো আচরণ করতে চাই না আমি। পোর্টার আমারও বন্ধু। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে... আমাদের সবাইকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছেন তিনি। এখানে হাজির হয়েছে এফবিআই, ফোর মাস্কি কিলার কেসের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই আমার। বাস্তবজীবনে এ-রকম ঘটনা ঘটতেই থাকে। আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি ওই ব্যাপারে, নিজের কাজ করছি। আপনিও তা-ই করেছেন। ন্যাশও করেছেন। এবং পোর্টারেরও একই কাজ করা উচিত ছিল।’ টাইপ করা থামাল সে। নুয়ে পড়েছে কাঁধ। ‘আপনিও তো পিছু হটে গেছেন ওই কেস থেকে, না? অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোথাও গোপন কোনো গবেষণাগার নেই তো আপনার?’

ক্লেয়ার কিছু বলার আগে আবারও টাইপ করতে লাগল ক্লোজ। ‘আমি আমার কাজটা পছন্দ করি। এবং এই কাজে সফল হতে চাই। আর তাই আমাকে যা-যা

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৮৫



বলা হয়, করি। হয়তো একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে আমার কাজকর্ম, কিন্তু আমি ঘুমাই বাচ্চাদের মতো, মাথায় একটা কোনো দূর্শিত্তা থাকে না। আরে!

‘কী?’

‘টয়োটা টাভ্রা গাড়ি তো দেখা যাচ্ছে ভালোই জনপ্রিয়।’

‘ও-রকম কত গাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে?’

‘ছ’শ’ বারো... ডিসেম্বর তেইশ থেকে আরম্ভ করে আটাশ তারিখের মধ্যে।’

ফিরে এল ন্যাশ। সাবধানে ভারসাম্য রক্ষা করছে তিনটা স্টাইরোফোম কাপের। ক্লোজের পাশে নামিয়ে রাখল একটা কাপ। আরেকটা দিল ক্লেয়ারকে।

স্ক্রিনের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। ‘প্রতিটা গাড়িকে যে-ক’বার দেখা গেছে, সে-অনুযায়ী লিস্টটা সাজাতে পারবেন? ওই মাছের দোকানে গিয়ে হাজির হলো লিবি ম্যাকিনলে, কাজ করল মাত্র একটা দিনের জন্য... এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। সে যদি যে-কোনোভাবেই হোক না কেন আমাদের সেই অচেনা লোকের সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করে থাকে, যদি ওই দোকানের কোথায় কী আছে না-আছে তা সেখানে গিয়ে জেনে এসে থাকে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, ওই কাজটা করতে হয়নি আমাদের সেই লোককে। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, যে-টয়োটা টাভ্রা যত বেশি বার আসা-যাওয়া করেছে ওই এলাকা দিয়ে, সে-গাড়ির যাতায়াত সেখানে তত বেশি স্বাভাবিক... হয়তো একই লোক প্রতিদিন কাজে গেছে এবং ফিরে এসেছে সেখান দিয়ে।’

স্ক্রিনের ওপরদিকে যে-ক’টা এন্ট্রি দেখা যাচ্ছে, সেগুলো একটু ঠিকঠাক করে নিল ক্লোজ, তারপর আবার চাপ দিল এন্টার বাটনে। ‘ঠিক আছে। সর্বোচ্চ আসা-যাওয়ার সংখ্যাটা দেখতে পাচ্ছি চোদ্দ। একবার মাত্র এসেছে এ-রকম গাড়ির সংখ্যা এক শ’ ছয়। দু’বার আসা-যাওয়া করেছে, এ-রকম গাড়ির সংখ্যা তিরানব্বই। সবচেয়ে ছোট সংখ্যার এন্ট্রি থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যার এন্ট্রি সাজিয়ে দিচ্ছি আমি।’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্লেয়ার, স্ক্রিন থেকে গায়েব হয়ে গেল ওই লিস্ট। একডজন গাড়ির ছবি দেখা যাচ্ছে এখন। একই অ্যাজেল থেকে ধারণ করা হয়েছে সব ছবি। ‘আমরা এমন কারও খোঁজ করছি, যার টয়োটা টাভ্রার পেছনদিকে থাকবে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক।’

একের পর এক ছবির ওপর নেচে বেড়াচ্ছে ওদের নজর। কয়েক সেকেন্ড পর স্ক্রিনের নিচের দিকে “নেক্সট” লেখা বাটনে ক্লিক করল ক্লোজ। নতুন এক সেট ছবি জায়গা দখল করে নিল আগের ছবিগুলোর। সব ছবি দেখল ওরা, তারপর আবার নেক্সট চাপল ক্লোজ। কিছুক্ষণ পর আবারও একই কাজ করল। এভাবে বারোবার স্ক্রিনে অনেক ছবি এল আর গেল। তারপর পাওয়া গেল বিশেষ সেই ছবি, যেটার খোঁজ করছিল ওরা।

‘ওই যে,’ বলে উঠল ক্লোজ।

‘জ্যাকসন পার্কের ক্যামেরায় যে-ট্রাকের ছবি দেখেছিলাম আমরা, ওটাই।
কোনো সন্দেহ নেই,’ বলল ন্যাশ।

‘নম্বরপ্লেটের সূত্র ধরে নাম-ঠিকানা বের করে ফেলা দরকার আমাদের,’ বলল
ক্লেয়ার। ‘ড্রাইভারের ওপর কি জুম করা সম্ভব?’

‘হ্যাঁ।’ মাউসের সাহায্যে একটা স্লাইডার ধরে টান মারল ক্লোজ, ড্রাইভারের
ছবি হাজির হয়ে গেল পুরো স্ক্রিন জুড়ে। গাড়ির উইন্ডশিল্ডের গায়ে কয়েকবার ক্লিক
করে ড্রাইভারের চেহারাটা হাজির করাল সে।

‘আরে ধেৎ!’ বিরক্তি প্রকাশ পেল ন্যাশের কণ্ঠে।

‘ওটাই কি...?’ কথা শেষ করল না ক্লোজ, হেলান দিল চেয়ারে। হাঁ হয়ে গেছে
মুখ। ঘাড় ডলছে।

‘বিশপ,’ মৃদু গলায় বলল ক্লেয়ার।



‘যেসব কাজ করে বেড়াচ্ছি আমি, শুনলে মোটেও খুশি হবেন না আমার কাইরোপ্রাক্টর (স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাদার ব্যক্তি),’ গুঁড়িয়ে উঠল সারা ওয়ার্নার। অবজার্ভেশন রুমের ডেস্কে শুয়ে আছে সে। কম্পিউটার মনিটর এবং কিবোর্ডটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে একপাশে।

প্রতি ত্রিশ মিনিট পর পর এসে ওদের দু’জনকে দেখে যাচ্ছে গার্ডরা। এবং প্রতিবারই তাদেরকে হাত নেড়ে চলে যেতে বলেছে ওয়ার্নার।

চেয়ারের পিঠের সঙ্গে ঘষটে শরীরটা সিঁধে করল পোর্টার। ওর সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে গেছে।

একদিকের দেয়ালে ঝুলছে একটা ঘড়ি, সেদিকে তাকাল সে। ‘তিন ঘণ্টা হতে চলল। ওই মহিলা কী করছে?’

ঘাড় ঘুরাল ওয়ার্নার। ওয়ান-ওয়ে জানালা দিয়ে তাকাল অবজার্ভেশন রুমের দিকে। ‘এখনও পড়ছে। দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেয়া উচিত ছিল আমাদের।’

এই কথায় যেন সম্মতি জানাতেই গুড়গুড় আওয়াজ উঠল পোর্টারের পাকস্থলীতে। ‘ওই মহিলার পড়া যখন শেষ হবে, তখন এখানে থাকতে চাই আমি। তাকে সেই ডায়েরি হজম করার সময় দিতে চাই না।’

‘খাবার নিয়ে কোনো কথা বলবেন না, প্লিজ।’

‘দুঃখিত।’

মাথার ওপর দু’হাত তুলল পোর্টার, টান টান করে দিল শরীরটা। হাই উঠতে চাইছে, জোর করে সংবরণ করল। ‘আপনার যদি করার মতো অন্য কোনো কাজ থাকে, আমার জন্য অপেক্ষা না করাটাই ভালো হবে। আপনাকে আটকে রাখতে চাই না আমি।’

হাই তুলল ওয়ার্নার, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। ‘আজ করার মতো কিছুই নেই আমার।’

‘উল্লেখ করার মতো কেউ নেই আপনার জীবনে?’

হেসে ফেলল ওয়ার্নার। ‘আমি একজন ক্রিমিনাল ডিফেন্স অ্যাটর্নি। তা-ও আবার কোথায়... এই দেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক শহরগুলোর একটাতে। নিজের জন্য এমন একটা অফিস বেছে নিয়েছি আমি, যেটার ওপরতলায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে... ভুল করেছি আসলে। কারণ আমার কাজ আক্ষরিক অর্থেই আমার সঙ্গে বাসায় চলে আসে— যেহেতু বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ মাত্র। এক্ষেত্রে অফিসটা কোথায়, তাতে কিছু যায়-আসে না। কারণ নিজের কেস ফাইলগুলোতে মাথা গুঁজে সপ্তাহে আশি ঘণ্টা অথবা তারও বেশি

সময় পার করে দিতে হয় আমাকে। গাছ যে-রকম মাটিতে শেকড় গেড়ে রাখে, যদি সে-রকম কায়দায় নিজের কাজ না করি... অর্থাৎ যদি একটু অবসর পাই, তা হলে সে-সময়টাও আমাকে কাটাতে হয় এখানে। অথবা চলে যাই কোর্টহাউসে, কখনও আবার পুলিশ স্টেশনে। যেসব সিদ্ধান্ত আমি নিই, সুযোগ বলতে যা-কিছু আছে আমার জীবনে, সেগুলোকে শেষ করে দেয় আমার ওসব সিদ্ধান্ত।' ঘাড় ঘুরিয়ে পোর্টারের দিকে তাকাল সে, হাসল আবারও। 'ডেটিঙ বলতে যা বোঝায়, গত চার মাসে সে-রকম কোনো সুযোগ যদি পেয়ে থাকি আমি, তা হলে আজকের আমাদের এই সহাবস্থান সে-সুযোগের কাছাকাছি যেতে পেরেছে।'

পোর্টার টের পেল, চেহারা লাল হয়ে গেছে ওর। 'আসলেই? কেমন করছি আমি, বলুন তো?'

নজর ফিরিয়ে নিয়ে ছাদের দিকে তাকাল ওয়ার্নার। তারপর আনমনে দেখতে লাগল নিজের হাতের নখগুলো। পোর্টার খেয়াল করল, ওগুলো বেশি লম্বা না। মহিলা নেইলপলিশ লাগিয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু যদি করেও থাকে কাজটা, ন্যাচারাল কোনো একটা রঙ ব্যবহার করেছে।

'নতুন কিছু একটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আপনি, সেজন্য বাহবা দিতেই হয় আপনাকে,' পোর্টারের প্রশ্নের জবাবে বলছে ওয়ার্নার। 'তবে যে-জায়গা বেছে নিয়েছেন, সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা নিচে নেমে গেছে। তবে, স্বীকার করতে অসুবিধা নেই আমার, কারও কারও চেয়ে ভালো হয়েছে সেটা।'

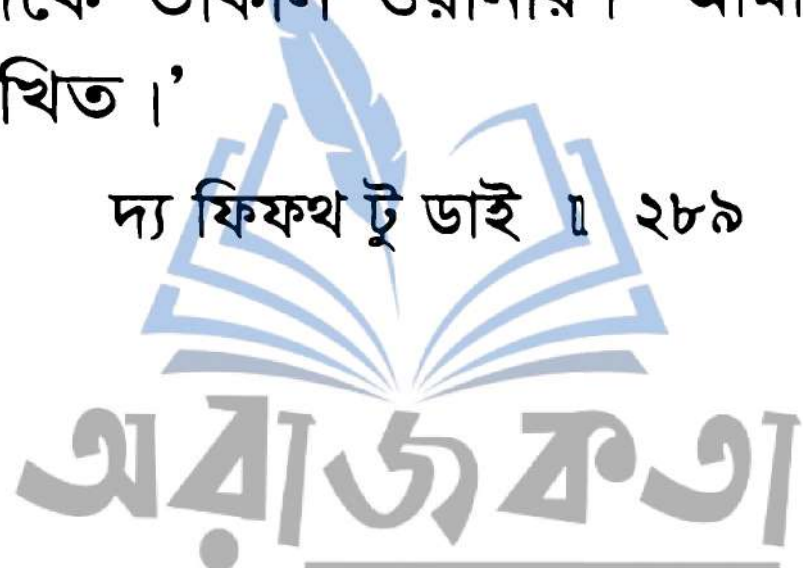
'যদি কোনো অসুবিধা না থাকে, আপনাকে ডিনারে নিয়ে যেতে পারি কোথাও? আমার কারণে মন খারাপ হয়ে গেছে আপনার, ধরে নিন সেটার বিনিময়ে কিছু একটা করতে চাইছি আপনার জন্য।' এসব কথা যে বলে ফেলেছে, ঠাহর করার আগেই পোর্টারের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল ওগুলো। সঙ্গে সঙ্গে আফসোস হলো ওর... সুযোগ থাকলে ফিরিয়ে নিত ওসব কথা।

এবার চেহারা লাল হয়ে যাওয়ার পালা ওয়ার্নারের। মাথা ঝাঁকাল। 'ওই কাজের জন্য আগে বাসা থেকে অনুমতি নিয়ে আসা দরকার আপনার, রোমিয়ো। টাকা-পয়সা কম থাকতে পারে আমার, তারপরও কারও সঙ্গে ডিনারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত না আমি।'

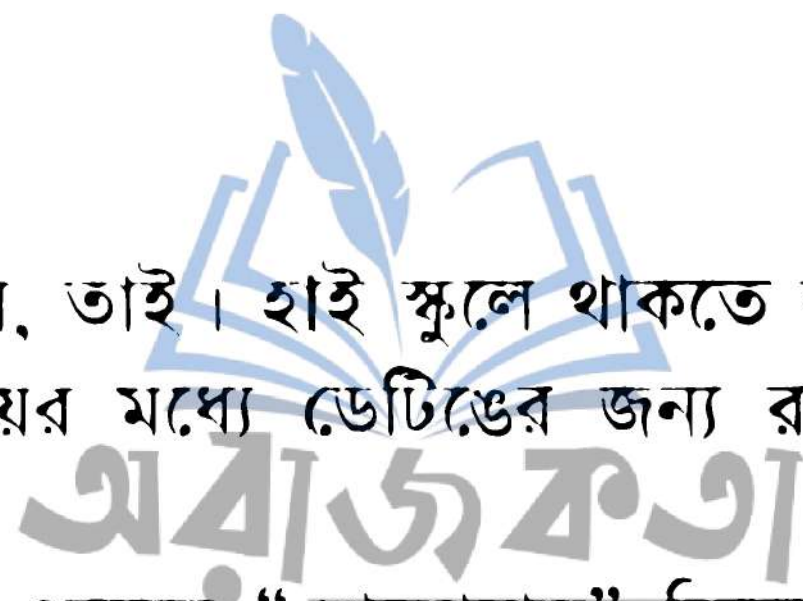
বুড়ো আঙুল দিয়ে ওয়েডিং রিংয়ের অস্তিত্ব ঠাহর করে নিল পোর্টার। তাকাল ওটার দিকে। 'গত বছর মারা গেছে আমার স্ত্রী। এখন হয়তো আর এই আংটি পরে থাকা উচিত না আমার। কিন্তু ওটা যখন খুলে রাখি, তখন কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে থাকে।'

আবারও ছাদের দিকে তাকাল ওয়ার্নার। 'আমাদের ডেটিঙ আনুষ্ঠানিকভাবে বেখাপ্পা হয়ে গেছে। দুঃখিত।'

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ২৮৯



অরাজকতা



‘চর্চা নেই তো আমার, তাই। হাই স্কুলে থাকতে কী করতাম আমি, জানেন? চার মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ডেটিঙের জন্য রাজি করিয়ে ফেলতাম সে-কোনো মেয়েকে।’

‘ক্যাম্পাসের তুখোড় একজন “খেলোয়াড়” ছিলেন আপনি তা হলে, নাকি? হাই স্কুলে থাকতে আপনি দেখতে কেমন ছিলেন, ভেবে বের করতে পারছি না।’

কিছু বলার আগে একটু ভাবতে হলো পোর্টারকে। সুদূর সেই অতীত দিন লুকোচুরি খেলছে ওর সঙ্গে। সে যেন দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ কোনো টানে... একপ্রান্তে, অপর প্রান্তটা দেখতে পাচ্ছে না ঠিকমতো। ‘কখনও কখনও এসব ঘটনা অনেক আগের বলে মনে হয়। কখনও আবার মনে হয়, এই যেন গতকাল ঘটে গেছে সবকিছু।’

‘ব্যাপারটা নির্ভর করে আপনার বিশেষ সেই স্মৃতি ঠিক কী রকম, সেটাই ওপর।’

‘মানে কী কথাটার?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়ার্নার। ‘যখন আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছিলাম, কখনও কখনও মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু লেখা পড়তাম আমি। সুখস্মৃতি বলতে যা বোঝায়, সেগুলো যখন মনে করি আমরা, তখন আমাদের মস্তিষ্ক ধারণা করে নেয়, ওসব ঘটনা নিকট অতীতে ঘটেছে। আবার আমাদের মস্তিষ্কই ভয়ঙ্কর কোনো স্মৃতিকে দূরে ঠেলে দিতে চায়, কখনও আবার ভুলে যায়। কখনও কখনও আটকে দেয় পুরোপুরি। একজাতের আত্মরক্ষামূলক কায়দা আর কী... যা মনে হয় আমার। ভালো কোনো কিছুর সঙ্গে থাকা, খারাপ কোনো কিছুর সঙ্গে যতখানি সম্ভব দূরত্ব তৈরি করা... ব্যাপারটা অনেকটা এ-রকম।’ মাথার ভার একটা হাত আর কনুইয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে পোর্টারের দিকে তাকাল সে। ‘কী মনে পড়ে আপনার, বলুন তো?’

‘হাই স্কুলের কথা বলছেন?’

মাথা ঝাঁকাল ওয়ার্নার। ‘লকারের ভেতরে আপনাকে ঠেসে ধরত কেউ, আর সে-কাজেই কি ব্যয় হয়ে যেত অনেকটা সময়? নাকি উল্টোটা... আপনিই সেখানে ঠেসে ধরতেন কাউকে?’

দাঁত বের করে হাসল পোর্টার। ‘আমি নিশ্চিত, লকারের ভেতরে যদি এঁটে যেতাম আমি, তা হলে সেখানে আমাকে কেউ না কেউ লক করে রাখত। যাকে বলে কিনা নাদুসনুদুস, আমি ছিলাম সে-রকম।’

‘আপনি?’

‘হ্যাঁ। সে-সময় আমার ওজন ছিল এক শ’ পঞ্চাশ পাউন্ড। উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি।’

‘খুব একটা খারাপ না। পরে গায়েগতরে অনেক বড় হয়েছেন আপনি।’ ডেস্ক থেকে পা নামাল ওয়ার্নার। ডেস্কের এককোণায় বসে আছে এখন। কুঁচকে গেছে

তার ধূসর স্কাট, ডলে ডলে সমান করার চেষ্টা করল। ‘হাই স্কুলে আপনার সেরা স্মৃতিটা কী?’

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল পোর্টার। কিন্তু একটা অঙ্ককার ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না ওর। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই পিঠ খাড়া করল। ‘বাদ দিন। আমি তো অনেকক্ষণ বকবক করলাম। এবার আপনার কথা বলুন। আপনি তো দেখতে-শুনতে ভালোই। বাজি ধরে বলতে পারি, স্কুলজীবনে দারুণ কিছু স্মৃতি আছে আপনার।’

‘হাহ্, দেখতে-শুনতে ভালোই, না? আর কী কী যে শুনতে হবে আমাকে, সেটাই ভাবছি।’

‘আপনার সেই মনোবিজ্ঞান ক্লাস... ও-রকম কোনো ক্লাস নিশ্চয়ই একটাও মিস করেননি?’

‘না, একটাও না।’

প্রসঙ্গ বদল করল পোর্টার। ‘আমি নিশ্চিত, জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আমরা সবাই পুরুষ অথবা মহিলা হয়ে যাই। কিন্তু সে-ঘটনা ঠিক কোন বয়সে ঘটে, আমি নিশ্চিত না। নিজেকে আমার এখনও একটা খোকা বলে মনে হয়। এখনও কিছু কিছু ছেলেমানুষি কাজ করে আমার ভেতরে।’

‘জীবনের কোন পর্যায়ে এসে আমরা সবাই পুরুষ অথবা মহিলায় পরিণত হই, জানেন? যখন জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো একটা কাজ শুরু করি। সে-সময় আমাদের দায়িত্ব আর থাকে না অন্য কারও কাঁধে। সে-সময় আমরা নিজেরা অন্যদের দায়িত্ব গ্রহণ করি।’

‘হয়তো সে-সময়ই সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হই আমরা,’ নিচু গলায় বলল পোর্টার।

‘কী?’

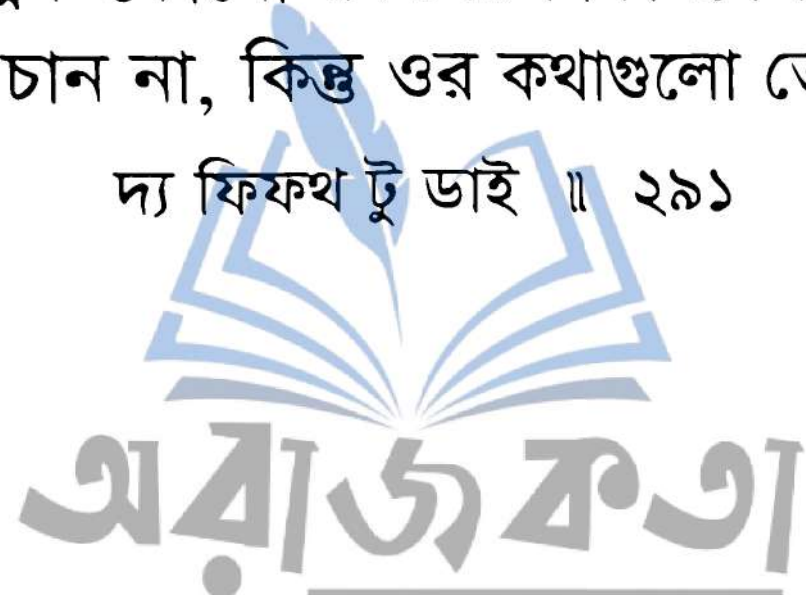
‘বিশপের ডায়েরিতে উল্লেখ করা আছে এমন একটা কথা বললাম। ওর ধারণা, ছোট ছোট বাচ্চারা পৃথিবীর অন্য সব মানুষের চোখে অদৃশ্য হয়ে থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে তাদের, ওই স্বচ্ছতা তত কমতে থাকে... লোকের দৃষ্টিতে তারা ধরা পড়তে থাকে তত বেশি। তারপর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হই আমরা, তখন সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হই যেন। শেষপর্যন্ত একসময় আবার ফিকে হয়ে যাই... যখন বার্ধক্য গ্রাস করে আমাদেরকে। সে-সময় আমাদেরকে আর দেখতে পায় না এই সমাজ,’ বুঝিয়ে বলল পোর্টার।

‘হাহ্। আপনার কথার অন্তর্নিহিত কোনো অর্থ আছে বলে মনে হচ্ছে আমার। মনে রাখার চেষ্টা করবো কথাটা,’ বলল ওয়ার্নার।

‘বিশপ একটা মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক। তার মতো কারও কাছ থেকে মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক কোনো রকমের দিকনির্দেশনা পেতে চাই না আমি।’

‘তা হয়তো পেতে চান না, কিন্তু ওর কথাগুলো তো হুবহু উচ্চারণ করলেন।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৯১



অরাজকতা



দড়াম করে একটা আওয়াজ উঠল ওয়ান-ওয়ে জানালার কাছে । লাফিয়ে ডেস্ক ছেড়ে নেমে পড়ল ওয়ার্নার । চিৎকার করে উঠেছে ।

উঠে দাঁড়িয়েছে পোর্টার । স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওই জানালার দিকে ।

কাচের ওপাশে, মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে জেন ডো । টান টান করে মেলে দিয়েছে একটা হাতের তালু । সেটার সাহায্যে জানালার কাচের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে বিশপের ডায়েরিটা ।

৫৬.
পুল
তৃতীয় দিন, দুপুর ১:৩৫

পুলের জিপে বসে আছে স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল এবং স্টুয়ার্ট ডিনার। যে-জায়গায় আছে ওরা, সেটা ৫১৯ ফর্টি-ফাস্ট প্রেস থেকে আধ ব্লক দূরে। জায়গাটা নিরিবিলি একটা রেসিডেনশিয়াল স্ট্রিট।

নিজের জাইস ৫২৬০০০ বিনোক্যুলারের সাহায্যে বিশেষ ওই বাড়ির ওপর নজর রাখছে পুল। জিনিসটা বেজায় ভারী। কিন্তু একইসঙ্গে দারুণ কার্যকর।

বাড়িটা ছোট। ভেতরে হয়তো দুটো বেডরুম আছে। বাথরুম আছে হয়তো একটা। একতলা। হালকা সবুজ রঙ করা হয়েছিল বাড়ির বাইরের দিকে। মলিন হয়ে গেছে সেটা। জায়গায় জায়গায় আবার উঠেও গেছে সে-রঙ। সারা সম্পত্তি ঘেরাও করে রেখেছে চেইনলিঙ্কের একটা ফেন্স। গেটের একধারে ঝুলছে “ভাড়া হবে” বিজ্ঞপ্তি। কালো একটা টাইয়ের সাহায্যে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ওটা। ফুটপাথ, উঠান আর ড্রাইভওয়ে... সবই ঢাকা পড়ে আছে কমপক্ষে এক ফুট তুষারের নিচে। বোঝা গেল, বেলচার সাহায্যে ওগুলো পরিষ্কার করছে না কেউ বেশ কিছুদিন ধরে। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে নেই কোনো গাড়ি। জানালায় ঝুলছে ভারী পর্দা। ফলে বাইরে থেকে বাসার ভেতরটা দেখা অসম্ভব হয়ে গেছে।

‘জন্মসনদ আর পাসপোর্ট দুটোই দিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই ঠিকানায়। ডিপার্টমেন্ট অভ মোটর ভেহিকেল থেকে সিকিউরিটি ফুটেজ জোগাড় করা হয়েছে। জানা গেছে, লিবি ম্যাকিনলে ব্যবহার করে আসছিল ওই ড্রাইভার’স লাইসেন্স। এবং সেটা করতে গিয়ে নকল কাগজপত্র ব্যবহার করেছে সে। কবে করেছে ওই কুকাজ, তা-ও জানা গেছে... স্টেটভিল কারেকশনাল থেকে বের হওয়ার তিন দিন পর,’ পুলকে বলল ডিনার।

‘বাড়িটা দেখে আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। ওই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে... এমন কোনো জুতোর ছাপ নেই তুষারের ওপর। বাসার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি না, জানালায় পর্দা টানানো আছে।’ বিনোক্যুলার নিচু করল পুল। ‘ওই বাড়ি কোনো একজাতের গোপন আস্তানা বলে মনে হচ্ছে আমার। ওসব কাগজ পাওয়ার কাজে যে-ই সাহায্য করে থাকুক না কেন মেয়েটাকে, এই বাড়ি শ্রেফ একটা ঠিকানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সে-কাজে, তার বেশি কিছু না।’

জ্যাকেটের জিপার টেনে দিল পুল। গলায় পেঁচিয়ে নিল একটা স্কার্ফ। ‘আরও ভালোমতো দেখার জন্য যাচ্ছি আমি।’

তুষার পড়ছে, সেদিকে একবার তাকিয়ে নিল ডিনার। ‘ফালতু এই তুষারপাত থামবে কখন?’



তুষারপাত তেমন কোনো মাথাব্যথার কারণ না পুলের কাছে। সাদা স্ফটিক কন্মলের তলায় যখন ঢাকা পড়ে যায় প্রকৃতি, পৃথিবীর কুৎসিত রূপটাও তখন স্পষ্ট পড়ে যায় কখনও কখনও।

জিপের দরজা খুলল সে। ক্যাচকোঁচ আওয়াজ করে উঠল সেটা। নামস পুঁদ দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। কখনও কখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে ড্রাইভারের সঙ্গে দরজাটা ঠিকমতো লাগে না। শুনতে পেল, নেমে পড়েছে ডিনারও। গাড়ির কোনো ঘুরে এদিকেই আসছে। তুষারের ওপর মচমচ আওয়াজ তুলেছে তার জুত জোড়া।

ফুটপাত ধরে এগোতে লাগল ওরা দু'জন। একসময় হাজির হয়ে গেল ওই বাড়ির ঠিক মুখোমুখি একটা জায়গায়। রাস্তা পার হলো। এখনও কোনো গাড়ির দেখা পায়নি পুল। যারা এখানকার অধিবাসী, তারা ছাড়া বোধহয় আর কেউ তেমন একটা আসে না এ-জায়গায়। অদ্ভুত লাগছে পুলের। এ-রকম একটা জায়গায় ডাকযোগে পাঠানো হলো কাগজপত্র? যেখানে গাড়িঘোড়ার চলাচল বেশি, ডাকযোগে কাগজপত্র পাঠানোর জন্য সাধারণত সেসব জায়গা পছন্দ করে বেশিরভাগ লোক। নিরিবিলি কোনো এলাকায় একজন আগন্তুকের আগমন কিন্তু সহজেই ধরা পড়ে প্রতিবেশীদের নজরে। এবং যারা ডাকযোগে জিনিসপত্র নেয়ার সুযোগটা গ্রহণ করে, লোকের নজরে পড়তে চায় না তারা।

পুলের মনের পর্দায় ভেসে উঠল লিবি ম্যাকিনলের সেই বাড়ির ছবি। বিশেষ করে ওই বাড়ির ভেতরে যা-যা দেখতে পেয়েছিল সে, সেসব। তেতো একটা স্বাদ টের পেল সে মুখের ভেতরে। টের পেল, ওসব ভুলে যেতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু ওর মনটা কেমন যেন বেয়াড়া প্রকৃতির... স্মৃতির ঠিক সামনের দিকে ওসব দৃশ্য রেখে দেয়ার জন্য জোরাজুরি করছে যেন।

মেইলবক্সের দেখা পাওয়া গেল দুটো। ওই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে যে-ফুটপাত, সেটার একধারে, একটা খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও-দুটো। বাঁ দিকেরটা খবরের কাগজ ইত্যাদি রাখার জন্য। এটাতে কোনো দরজা নেই। এবং আপাতত খালি পড়ে আছে। ওটার পাশে আছে একটা ধাতব বাস্ক। পুল খুলল সেটা। চিঠিপত্র দেখা যাচ্ছে কিছু। বের করল সেগুলো। 'পাবলিশার্স ক্লিনিং হাউস। লিবি ম্যাকিনলের কাছে পাঠানো হয়েছে এটা। আরও আছে একটা ভেটেরান'স ডোনেশন কার্ড। দুটোরই পোস্টমার্ক দেখা যাচ্ছে এ-সপ্তাহের। কেউ একজন নজর রাখছে এই বাক্সের ওপর,' চিঠি দুটো বাক্সের ভেতরে রেখে দেয়ার আগে ডিনারকে বলল পুল।

রাস্তার এদিকে-সেদিকে তাকাল ডিনার। 'ড্রাইভওয়ার প্রায় অর্ধেকটায় কেউ একজন বেলচা চালিয়েছে কিছুদিন আগে, তুষার সাফ করেছে। বাসার ভেতরটা আগে চেক করে আসি আমরা। তারপর কথা বলা যাবে এখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে। কেন যেন মনে হচ্ছে, এত নিরিবিলি কোনো জায়গায় এ-রকম কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবো, যে-লোক কিনা নজর রেখেছিল এই বাসার ওপর।'

ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে শক্ত হয়ে আটকে আছে চেইনলিঙ্কের ওই দরজা। ওটার গায়ে কষে কয়েকবার লাথি মারতে হলো পুলকে। একসময় ছিটকে খুলে গেল পাল্লাটা। পুরু তুষারের ওপর দিয়ে যেন নিতান্ত অনিচ্ছুক কায়দায় দোল খেয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল ওটা। ফুটপাতে উঠে পড়ল ওরা দু'জন। এগিয়ে চলেছে বাড়ির সামনের দিক লক্ষ্য করে।

‘ফ্র্যাঙ্ক,’ নিচু গলায় ডাকল ডিনার, গ্লাভ পরিহিত একটা হাত তুলে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে ওই বাড়ির সদর দরজাটা। এককালে একটা ডেডবোল্ট ছিল দরজায়, এখন গায়েব হয়ে গেছে। যে-জায়গায় ছিল ওটা, সেখানে যেন হাঁ করে আছে একটা গর্ত। দরজার হাতলটা দূর থেকে দেখেই কেমন যেন আলগা বলে মনে হচ্ছে। ওটার উপরিভাগে বিশ্রী কিছু ঘষামাজার দাগ দেখা যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় ভেতরের দিকে দেবেও গেছে জিনিসটা। বোঝা গেল, কেউ একজন কিছু একটা দিয়ে জোরে বাড়ি মেরেছিল ওটার গায়ে। আঘাতের দাগ লেগে আছে দরজার পাল্লাতেও।

জ্যাকেটের জিপার খুলে ফেলল পুল। পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করার জন্য হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। অন্য হাতের একটা আঙুল তুলল ডিনারের দিকে, তারপর ওই একই আঙুল দিয়ে ইশারায় দেখিয়ে দিল বাড়ির একটা পাশ... সেখানে যেতে বলছে ডিনারকে। নিজের পিস্তল বের করে নিল ডিনার। একটা কোনা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির পেছনদিকে। সেখানে কোনো ব্যাক-ডোর আছে কি না, খুঁজবে।

দরজার হাতলের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল পুল। ঘোরাল ওটা। তারপরও ওটা ধরে রাখতে হলো ওকে। ওই হাতল দরজার পাল্লার সঙ্গে আটকে রাখার জন্য যেসব বন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো হয় খুলে ফেলা হয়েছে নয়তো ফ্রু আলগা করে ফেলা হয়েছে। ফলে পুলের মনে হচ্ছে ওর হাতের মধ্যেই এখন খুলে আলগা হয়ে আসবে পুরো জিনিসটা। মৃদু একটা ক্লিক শব্দ তুলে খুলে গেল ভেতরের ল্যাচ। দরজায় আলতো একটা ধাক্কা মারল পুল।

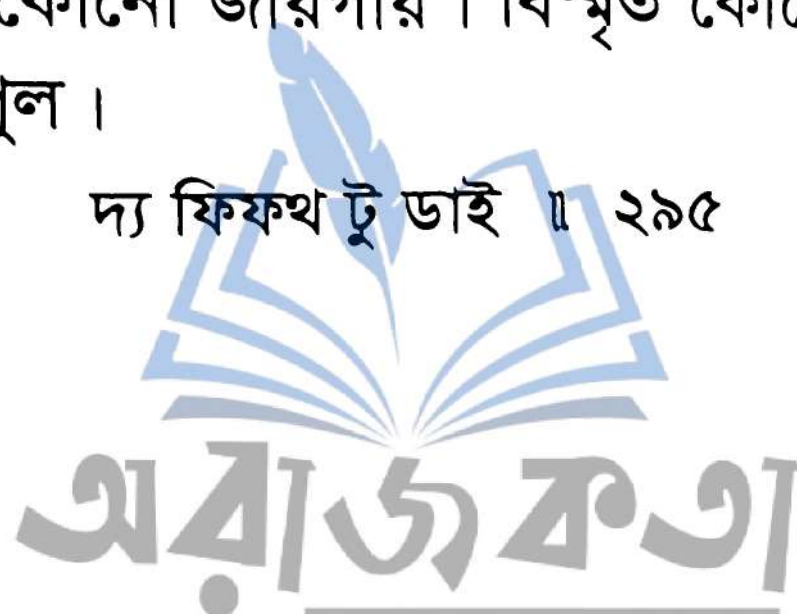
প্রথমেই নজরে পড়ে ছোট একটা লিভিং রুম। কেউ একজন একটা ছুরি হাতে নিয়ে হামলা চালিয়েছে এই ঘরে। চামড়ার জরাজীর্ণ একটা বাদামি কাউচ আছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে সেটার সব কুশন। বেশকিছু তুলোর দলা, সাদা টাম্বলউইডের আকৃতি ধারণ করে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝের এখানে-সেখানে। বাসার হিটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

‘এফবিআই!’ নিজের উপস্থিতি জানান দিল পুল। ‘আপনি যেখানেই লুকিয়ে থাকুন না কেন, আমি চাই, বেরিয়ে আসবেন খোলা কোনো জায়গায়!’

বাসার ভেতরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠ। এ-রকম কোনো শব্দ তৈরি হতে পারে কেবল খালি কোনো জায়গায়। বিস্মৃত কোনো জায়গায়।

ভেতরে পা রাখল পুল।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৯৫



অরাজকতা



দেয়ালে দেয়ালে দেখা যাচ্ছে কিছু গ্রাফিতি। সেসবের মধ্যে আছে বড় বড় গ্যাং ট্যাগ। আছে কারও কারও নাম। এবং আছে বিক্ষিপ্ত কিছু লেখা... ভালাবাসে তোমাকে, লিটল মিক্স, এক্স-ট্রেন চার্পস। এসব লেখার আদর্শ মানে কী, সে-ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই পুলের।

বাড়ির আরেকদিকে একটা ব্যাক ডোর জোরালো একটা আওয়াজ ভুলে গেল হাঁ হয়ে। কিচেনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে ডিনার, হাতেধরা পিস্তল তাক করে রেখেছে ছাদের দিকে। মাথা ঝাঁকাল পুলের উদ্দেশ্যে। ওর হাতের ডান দিকে একটা হলুয়ে আছে, ঘুরল সেদিকে। পকেট থেকে বের করল ছোট একটা ফ্যাশলাইট সুইচ সামনের দিকে ঠেলে জ্বালল ওটা। পিস্তলের নিচে ধরল জিনিসটা। এবার আলো ফেলছে হলের এখানে-সেখানে।

যে-ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল পুল, সেটা পার হলো। ড্রাইওয়াল বলতে যা বোঝায়, হলুয়ের দেয়ালগুলো সে-রকম... অর্থাৎ ইটের বদলে প্লাস্টারবোর্ড ব্যবহার করে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে এখানে; কেউ একজন লাথি হাঁকিয়েছে ওসব বোর্ডের গায়ে অথবা ঘুসি মেরেছে। ওই দেয়ালগুলোর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ডজন ডজন গর্ত দেখা যাচ্ছে। তার মানে, যে-লোক করেছে এই কাজ, সে আসলে কিছু একটা খুঁজেছে এখানে। হয়তো ভেবেছিল, দেয়ালের প্লাস্টারবোর্ডের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিশেষ সেই জিনিস। আবার এমনও হতে পারে, দুট্টু ছেলেপেলের কাজ ওটা। নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই আসলে। মেঝেতে বিছানো কার্পেট এককালে ছিল সোনালি রঙের, এখন হয়ে গেছে মাটির মতো বাদামি; পেশাবের মতো গন্ধ আসছে ওটা থেকে।

প্রথম বেডরুমটাতে হাজির হলো ওরা। মেঝেতে দেখতে পেল একটা ম্যাট্রেস। সেটার আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে খাবার আর বেভারেজের খালি কিছু কন্টেইনার। এককোনায় এলোমেলোভাবে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে একটা কম্বল। জানালায় পর্দা তো টানানো আছেই, জানালার কাছে আবার সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে খবরের কাগজও। বাথরুমটা ব্যবহার করা হয়েছে কিছুদিন আগেও। পানি যেহেতু পড়ছে না, সেহেতু কমোডে যেসব জিনিস ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে উপচে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে, সেসব আসলে কী, ভাবতেও চায় না পুল। বাথটাবও যে খুব একটা ভালো কোনো কায়দায় ব্যবহার করা হয়েছে, এমনটা বলা যাবে না। সিন্কেস সঙ্গে যে-ভ্যানিটি ডোর থাকে, সেগুলো গায়েব হয়ে গেছে। ফলে ভাঙাচোরা কিছু প্লাস্টিকের পাইপ মুখব্যাধান করে বেরিয়ে আছে যেন।

দ্বিতীয় বেডরুমে হাজির হলো ওরা।

এখানে কোনো ম্যাট্রেস নেই। শুধু আছে ছেঁড়াফাটা একটা স্লিপিং ব্যাগ। গ্যাসের সাহায্যে চলে, এ-রকম একটা ক্যাম্পিং ঘিলের দেখা পাওয়া গেল; সেটাও ভাঙাচোরা। যে-লোক ব্যবহার করত ওই জিনিস, হয়তো ওটাতে রান্না করত সে। আবার এমনও হতে পারে, ঘর গরম রাখার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাত জিনিসটা।

আবার দুটোই হতে পারে। রান্নার জিনিসপত্র না-ধোওয়া অবস্থায় ফেলে রাখলে যে-রকম গন্ধ ছড়ায় বাতাসে, এই ঘরে সে-রকম একটা বাসি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

লিভিং রুমে ফিরে এল ওরা। এই বাড়িতে বেসমেন্ট বলে কিছু নেই। এবং পুরো বাড়ি এই মুহূর্তে পরিত্যক্ত।

‘আমার মনে হয় গৃহহীন কিছু লোক ঘাঁটি গেড়েছিল এখানে। আবার এমনও হতে পারে, স্থানীয় ছেলে-ছোকরারা তাদের অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলেছিল এই জায়গায়। ডাকযোগে ওসব কাগজ পাওয়ার জন্য কেন ব্যবহার করা হয়েছে এই বাড়ির ঠিকানা, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি।’ হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে রাখল পুল। ‘এই বাড়ি কতদিন ধরে খালি পড়ে আছে?’

কিচেনে ফিরে গেছে ডিনার, ড্রয়ার আর কেবিনেট ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ‘একবছরেরও বেশি সময় ধরে।’ সিন্ধের সঙ্গে পানি চলাচলের জন্য যে-নালা আছে, তাকাল সেদিকে। ‘কেউ একজন কঙ্কিট ঢেলে দিয়েছে এখানে।’

‘বাচ্চাকাচ্চারা কখনও কখনও করে ও-রকম কাজ।’ বলল পুল। লিভিং রুমের গ্রাফিতিগুলো দেখছে।

ডিনার বলে চলল, ‘এই বাড়ির ব্যাপারে বিস্তারিত তেমন কোনো কিছু জানতে পারিনি আমি। এটার আসল মালিক মারা গেছেন। তাঁর বাচ্চাকাচ্চা তিনটা। তিনজনেরই বয়স কম। এই অঙ্গরাজ্যের বাইরে থাকে। বাড়িটা বিক্রি করে দেয়া হবে, এমন ঘোষণাও দেয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় ভাড়া দেয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু ভাড়াটে বলতে কাউকে পাওয়া যায়নি।’ সিন্ধের নিচ থেকে মরা একটা ইঁদুর বের করল সে, ওটার লেজ ধরে উঁচু করে রেখেছে। রান্নাঘরের আরেক প্রান্তের উদ্দেশে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা। ‘কেন কোনো ক্রেতা পাওয়া গেল না, অথবা কেন কোনো ভাড়াটে পাওয়া গেল না, বুঝতে পারিনি আমি। এই এলাকা তো দেখতে-শুনতে ভালোই।’

পুলের পায়ের কাছে, মেঝেতে শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল ইঁদুরটা। ওটা উপেক্ষা করল সে। ‘এখানে একটু দেখে যাও তো। কিছু একটা আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।’ হাতে ধরা জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় একটা দেয়ালচিত্র অনুসরণ করছে সে।

এগিয়ে এল ডিনার। ‘এটাও বাচ্চাদের কাজ বলে মনে হচ্ছে আমার। দুর্বৃত্তদের দল অথবা গ্যাং বলে না? অনেকটা সে-রকম।’

কালো মার্কার দিয়ে লেখা বিশেষ কিছু বাক্য দেখিয়ে দিল পুল।

আমি থামতে পারিনি, অথচ এসেছিল মরণ,
তাই সে নিজ দয়ায় করল আমায় স্মরণ;
ওই বাহনে শুধু আমাদের হয় ঠাই
এবং অমরত্বকেও সেখানে খুঁজে পাই।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৯৭



‘ওটা বাচ্চাদের কাজ না। ওটা একটা উক্তি। ডিকিনসনের “দ্য চ্যারিট”
এর। আর এই যে... এটাও।’ একই হস্তাক্ষরে লেখা আরও কিছু বাক্যের দিকে
ইঙ্গিত করল পুল।

জীবন ও মৃত্যুর একটি উপমা আমি জানি,
সদৃশ তারা; যেমন বরফ আর পানি।
বরফে জমাট বাঁধে পানির সব বিন্দু,
সে-বরফই গলে আবার হয় কোনো জলসিক্ত।
যা মারা যায়, পুনর্জন্ম নিশ্চিত তার,
যা জন্মে, তা মরে যায় কখনও আবার।
বরফ আর পানি কেউ করে না একে-অপরের ক্ষতি,
জীবন আর মৃত্যু, বলছি আমি, দু’জনই সুন্দর অতি।

‘এই লেখা হানশান-এর। একজন চীনা কবি। সেই টাং সাম্রাজ্যের সময়ে
লেখালেখি করতেন তিনি,’ বলল পুল।

‘আপনি এসব কথা জানতে পারলেন কীভাবে?’

‘কলেজে যখন পড়তাম, আমার এক বান্ধবী ছিল। মেয়েটা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের
অনুসারী। কিছু কবিতার বই থেকে প্রায়ই কিছু উক্তি আউড়াত সে। সেসবের মধ্যে
এই লাইনগুলোও ছিল।’

‘বুঝলাম। কিন্তু যা বুঝলাম না, তা হলো, কোনো কোনো শব্দের নিচে দাগ
দেয়া হয়েছে কেন?’

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল পুল। তারপর মাথা নাড়ল
‘জানি না।’

দেয়াল বরাবর কয়েক ফুট সরে গেল ডিনার। ‘এখানে আরও একটা লেখা
দেখতে পাচ্ছি আমি। ওই একই হস্তাক্ষর।’

চলো বাসায় প্রত্যাবর্তন করি, চলো ফিরে যাই,
চাওয়া-পাওয়ার এই হিসেবকে বলি ধেং ছাই,
আনন্দ আজ যেন সঙ্গী হয়েছে ত্বরণের।
ওদিকে নীল মহাসাগর থেকে মরণের
জীবন বয়ে চলেছে অমৃতসুধার মতো।
জীবনে মৃত্যু আছে; মৃত্যুতে আছে জীবন অবিরত।
সুতরাং ভয় কীসের; কোথায় ভয়?
আকাশের পাখিরা গাইছে “মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়!”
অমরত্বের জোয়ার যেন দিন-রাতের সরণিতে,
নেমে আসছে এখানে... অসহ্য সুন্দর ধরণীতে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ২৯৮

দ্রু কোঁচকাল পুল। ‘ওটা মনে হয় তিব্বতীয় কোনো কিছুর। তবে আমার ভুল হতে পারে। বাসা, ভয় আর মৃত্যু শব্দ তিনটার নিচে দাগ দেয়া হয়েছে কেন, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না আমি।’

ঘাড় চুলকাল ডিনার। ‘যেসব ছেলেছোকরা করেছে এই কাজ, তাদের বুদ্ধি আছে। কিন্তু তারপরও... এসব কাজ ছেলেপেলেদেরই। আমার মনে হয় না লিবি ম্যাকনিলের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র আছে এসবের।’

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল পুল। দেয়ালচিত্রের ছবি নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ‘তুমি এক কাজ করো না... গিয়ে কথা বলো এখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে। আমি একটু ছবি-টবি তুলে রাখি... যদি দরকার হয় আর কী।’

নাক দিয়ে বিচিত্র এক আওয়াজ করল ডিনার। ‘আমি পারবো না। লিবি ম্যাকনিলে যেখানে খুন হয়েছে, সে-জায়গার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তুমি তখন গরম একটা জায়গায় বসে ছিলে আরাম করে। কাজেই এবার যদি কাউকে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বের হয়ে দরজায় দরজায় গিয়ে কথা বলতে হয়, তা হলে সেটা তুমি।’

নিতান্ত অনিচ্ছুক এক ভঙ্গিতে দেয়ালের দিকে তাকাল পুল।

ওকে আশ্বস্ত করল ডিনার। ‘চিন্তা করো না। এসব দেয়ালের প্রতিটা ইঞ্চির ছবি তুলে নিচ্ছি আমি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটা ধরল পুল। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরের বরফশীতল বাতাসে।

৫৭.
কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা
তৃতীয় দিন, দুপুর ১:৩৫

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা তার আঙুলগুলো চেপে ধরল কপালে। টিপে ধরল জায়গাটা। কিছু চিন্তাভাবনা ভেতর-থেকে ওই জায়গায় আঘাত করছে যেন, বেরিয়ে আসতে চাইছে। ফলে ব্যথা করছে জায়গাটা। বেশ ব্যথা করছে। সে যে আবারও গলা ফাটিয়ে চেষ্টা করে উঠেছে, টের পায়নি প্রথমে। আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়েছে সে-আওয়াজ, মিলিয়ে গেছে একসময়, তখন বুঝতে পেরেছে। একটুখানি থুতু গড়িয়ে পড়ল তার সোয়েটশার্টের কলারে। চোখ খুলল সে। জানালা গলে ঢুকে পড়া আলো যেন জোর করে প্রবেশ করল সেই খোলা জায়গা দিয়ে। চিরে দিল পিউপিল আর রেটিনা। পুরনো ব্যথার সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন আরেকটা।

হাতের বাঁ দিকে রাখা ওষুধের বোতলটা নিল সে, হাতড়ে হাতড়ে খুলল ওটার ঢাকনা। রক্তাক্ত আঙুলগুলোতে তিনবার পিছলে গেল চাইল্ডপ্রুফ ঢাকনাটা। তারপর বোতলটা খুলতে পারল সে। ঝাঁকিয়ে বের করল দুটো ট্যাবলেট। মুখে পুরে দিল। গিলে ফেলল পানির সাহায্য ছাড়াই। গলা বেয়ে নিচে নামার সময় কেমন বালির মতো একটা অনভূতির জন্ম দিয়ে গেল ট্যাবলেট দুটো।

ওই লোকের হাত থেকে তার ডেস্কের ওপর শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল ওষুধের বোতলটা। ওটার ভেতরে আর যে-ক'টা ট্যাবলেট ছিল, সেগুলো পড়ে গেল তার ড্রয়িংয়ের ওপর। কোনো কোনোটা পড়ল মেঝেতে। পরোয়া করল না লোকটা।

বাঁ হাতের দিকে তাকাল সে। তাকাল রক্তাক্ত আঙুলগুলোর দিকে। মাথার সেই কাটা জায়গাটা চুলকাতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্ত বেরিয়ে এল। তারপরও লোকটার মনে হচ্ছে, যথেষ্ট হয়নি। যেইমাত্র চুলকানি থামায় সে, এক কি দুই মুহূর্তের জন্য একটু আরাম লাগে। তারপর চুলকানিটা শুরু হয় আবারও। শুরু হয় বাঁ কান থেকে, শেষ হয় মাথার পেছনদিকে গিয়ে। মনে হয়, হাজারটা পতঙ্গ যেন তার চামড়ার নিচে শুরু করেছে মৃত্যুর কোনো মিছিল। মনে হয়, ওগুলো যেন ঢুকে পড়ছে তার মাথার অনেক গভীরে।

ওসব পতঙ্গ যেন খেয়ে ফেলছে তার সমস্ত চিন্তাভাবনাকে। এখন সে জানে কথাটা। জানে, ওসব পতঙ্গ খেয়ে ফেলছে তার স্মৃতিশক্তিকে। আর তাই কোনো কোনো ঘটনা মনে করতে এত অসুবিধা হচ্ছে তার। খেয়ে খেয়ে সংখ্যায় কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে ওগুলো; তাদের সংখ্যা যত বাড়ছে, লোকটার চুলকানিও তত বাড়ছে। আগে একবার-দু'বার চুলকাত, এখন বার বার চুলকাচ্ছে।

ফোনের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল সে। প্রথমবারের চেষ্টায় তুলতে পারল না রিসিভার। একসময় আঁকড়ে ধরল হাতলটা। প্রোথাম করে রাখা প্রথম স্পিড ডায়ালে চাপ দিল। এই একটা নম্বরই সেট করে রাখা হয়েছে। ওপ্রান্তে রিং বাজছে। একবার, দু'বার, তিনবার...

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩০০

আপনি যে-মেইলবক্সে যোগাযোগ করেছেন, ব্যবহারকারী এখনও চালু করেননি সেটি। আর তাই ইনকামিং কোনো মেসেজ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে। অনুগ্রহপূর্বক পরে আবার যোগাযোগ করুন।

লাইন কেটে দিল লোকটা। তারপর আবার চাপ দিল স্পিড ডায়ালে।

আপনি যে-মেইলবক্সে যোগাযোগ করেছেন, ব্যবহারকারী এখনও চালু করেননি...

রিসিভারটা জায়গামতো রেখে দিল ওই লোক। ঘরের আরেক প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে ফোনটা। সস্তা প্লাস্টিক টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গিয়ে লাগবে দেয়ালের সঙ্গে... বিশেষ এই দৃশ্য দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু দেখতে পেল না। দেখতে পারল না।

আরেকটা মেয়ে লাগবে তার।

এবং আরেকটা মেয়েকে তুলে আনার জন্য ওই লোকের সহায়তা লাগবে।

এমন একটা মেয়ে চাই, যে দেখতে পাবে। যে দেখতে পাবে শীঘ্রই।

ওষুধটা কাজ করতে শুরু করেছে। দৃষ্টি পরিষ্কার হলো লোকটার। তার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আঁকিঝুঁকির দিকে তাকাল নজর নামিয়ে। মনে পড়ে গেল বিশেষ এই স্কেচ আঁকার কথা। তাদের বাড়ির বাইরের দৃশ্য... তার মেয়ে সাইকেল চালাচ্ছে ফুটপাথের পাশ দিয়ে। ঘটনাটা বেশিদিন আগের না। গত বছর শরৎকালের। সে-সময় গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়তে শুরু করেছে কেবল। আঁকাটা ভুল হয়ে গেছে। সাইকেলের রঙ লাল হওয়া উচিত ছিল। আনমনে আঙুল বোলাতে শুরু করল লোকটা তার মেয়ের নরম সোয়েটারের ওপর। কখন তুলে নিয়েছে ওটা হাতে, মনে নেই। কিন্তু জিনিসটা দলা পাকানো অবস্থায় আছে তার হাতে। ছোট কলারটাতে আনমনে গুঁতো মেরে চলেছে সে তর্জনীর সাহায্যে।

নাকের কাছে তুলল সোয়েটারটা। গন্ধ গুঁকল।

কিছুই নেই।

স্রাণশক্তি কবে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না লোকটা। তবে এটা জানে, সাম্প্রতিক কোনো একটা সময়ে ঘটেছে ঘটনাটা। খুব সম্ভব গত কয়েকদিনের যে-কোনো এক সময়ে।

ইন্দ্রিয়শক্তি বলতে যা বোঝায়, একে একে লোপ পাচ্ছে সেসব; সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ওই মেয়েটাও। গায়েব হয়ে যাচ্ছে লোকটার সব চিন্তাভাবনা, স্মৃতিশক্তি। তার ভেতরটা কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছে কতগুলো পোকা।

ডেস্কের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে কিছু জিনিস। সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল লোকটা। লাল মার্কারটা খুঁজে পেল। ক্যাপ খুলল ওটার। নিবটা সাবধানে নামাল কাগজের ওপর, তাক করেছে সাইকেলের ফ্রেম বরাবর। জানে, হাত কাঁপতে শুরু করবে আবার। আশাও করেছে ও-রকম কিছু একটার। রক্ত চলাচলের কারণে গরম হয়ে উঠেছে তার চেহারা। মাংসের নিচে যেন

মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। কাগজের স্পর্শ পেল নিবটা। এখনও নিষ্কম্প আছে লোকটার হাত। ছবিটা রঙ করতে লাগল। অশ্রু গড়াচ্ছে তার চোখে। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে ওই ছবির ওপর। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে ওই লোকের মেয়ের ওপর, মেয়েটার চকচকে সাইকেলের ওপর।

চাপা একটা চিৎকার ভেসে এল বেসমেন্ট থেকে। কিন্তু সেটা উপেক্ষা করল ওই লোক।

মেয়েটা যা করেছে, সেজন্য তাকে ঘৃণা করে লোকটা।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে ওই মেয়ে।

আর দেখতে পায় না।

একটা অপদার্থে পরিণত হয়েছে।

নিজের পাপের জন্য তিলে তিলে কষ্ট পাবে ওই মেয়ে। জ্বলে-পুড়ে মরবে।

বাইক রঙ করা হয়ে গেছে। এবার মেয়েটার সোয়েটার রঙ করতে লাগল ওই লোক। এখন হাতে যে-সোয়েটার ধরে আছে সে, সেটার মতোই দেখতে ওই সোয়েটার। লাল। সাবধানে রঙ করছে লোকটা।

চুলকানিটা চলে গেছে। পুরোপুরি যায়নি, তবে কমেছে। নিজেকে জানিয়ে দিল সে, ওই কাটা জায়গা আর চুলকাবে না। ক্ষতস্থানের মুখ আবারও খুলে দেয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না।

আরও একবার গোঙানি শোনা গেল বেসমেন্ট থেকে। গতবারের চেয়ে জোরে।

চুলকানিটা মাথাচাড়া দিল আবার, তবে মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য। মানে... চুলকানোর মতো কিছু না। চুলকাবে না লোকটা, সিদ্ধান্ত নিল আবারও।

সোয়েটার রঙ করা শেষ করল সে। এবার হাতে তুলে নিল নীল একটা মার্কার। ছবির আকাশটা রঙ করবে। শিকাগোর শরৎকালের আকাশ সাধারণত ধূসর রঙে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু ওই মেয়ে যখন সাইকেল চালাচ্ছিল, তখন মনে আনন্দ নিয়ে করছিল কাজটা। এবং আনন্দের সময়ে আকাশের রঙ হতে হবে নীল।

কাজে এতখানি ডুবে গেছে লোকটা যে, আরেকটা মানুষ যে রাস্তা পার হচ্ছে, দেখতেই পেল না জানালা দিয়ে। দেখতে পেল না, তার বাসার সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে মানুষটা। দরজায় টোকা পড়ার আগপর্যন্ত তার উপস্থিতি কিছুই টের পেল না কালো নিট ক্যাপের সেই লোক। নিচতলা থেকে বেশ জোরেই ভেসে এল টোকা-দেয়ার আওয়াজটা।

কাটা জায়গাটায় চুলকানি শুরু হয়েছে আবার। মনে হচ্ছে, বিক্ষিপ্ত কোনো ভঙ্গিতে যেন ছোট্টাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে পতঙ্গগুলো... যেন কোনো আড়ালের খোঁজে ছুট লাগিয়েছে ছোট ছোট পায়ে।

৫৮.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, দুপুর ১:৩৬

‘আমার মনে হয় পড়া শেষ ওই মহিলার,’ বলল ওয়ার্নার। একটুখানি আলাগা হয়ে আছে তার দুই ঠোঁট, একহাতের আঙুল দিয়ে ও-দুটো চেপে ধরেছে সে।

‘তা-ই মনে হয় আপনার?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোর্টার।

জেন ডো দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গাতেই। দেখে মনে হচ্ছে, তার শরীরটা যেন জমে গিয়ে পরিণত হয়েছে বরফে। ডায়েরিটা হাত দিয়ে চেপে ধরেছে জানালার কাচের সঙ্গে। সংঘর্ষের ফলে এখনও একটা কম্পন যেন টের পাওয়া যাচ্ছে ঘরের ভেতরে।

দরজার উদ্দেশে রওয়ানা হলো ওয়ার্নার। ‘একটু সময় দিন আমাকে। আপনি গিয়ে ইন্টারভিউ রুমে ঢোকান আগে আমি কিছু কথা বলে নিই মহিলার সঙ্গে।’

মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। এখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার দিকে। জানে, ওকে দেখতে পাচ্ছে না মহিলা। কিন্তু তাতে ওর বিশেষ একটা অনুভূতিতে কোনো পরিবর্তন আসছে না... সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ওই মহিলা। মানুষটার দুই চোখে নির্ভেজাল ক্রোধ। কেমন একটা অন্ধকার যেন ভর করেছে চোখ দুটোতে। ভূতুড়ে মনে হচ্ছে দৃশ্যটা। তবে দেখে মনে হচ্ছে, মহিলার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক। ওই মানুষটার মনের ভেতরে কী চলছে, পড়তে পারল না পোর্টার। হতে পারে, দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করেছে মহিলার হৃৎপিণ্ড। আবার এমনও হতে পারে, হৃদস্পন্দন স্বাভাবিকই আছে তার। দ্বিতীয়টাই কল্পনা করে নিল পোর্টার। দীর্ঘ এই কর্মজীবনে এমন অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর, যারা নিজেদের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। বিশেষ একজাতের প্রশিক্ষণ আছে এদের... ক্ষতিকর আবেগের সময়ও শান্ত রাখতে পারে নিজেদেরকে। তবে সেই সময়ে কথা বলে তাদের চোখ... ফিল্টার বলতে আর কোনো কিছু থাকে না তখন সেখানে।

কাচের ও-প্রান্তে আবির্ভূত হতে দেখা গেল ওয়ার্নারকে। জেনকে দেখে মনে হলো, ওয়ার্নারের উপস্থিতি টের পায়নি। এখনও দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। তার উকিল যখন বসে পড়ল টেবিলের ধারে, তখন শেষপর্যন্ত ঘুরল মহিলা। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল ওয়ার্নারের পাশে। ডায়েরিটা রাখল টেবিলের ওপর।

ঝুঁকে পড়ল মহিলা। ফিসফিস করে কী যেন বলল ওয়ার্নারের কানে।

মুখ তুলে তাকাতে দেখা গেল ওয়ার্নারকে। চমকে গেছে। হতে পারে, এই প্রথমবার তার মক্কেল কথা বলেছে তার সঙ্গে, সেজন্য। জেন ডো’র কথার জবাবে নিচু গলায় কী যেন বলল। এত নিচু গলায় বলেছে যে, পোর্টার শুনতে পেল না। উঠে দাঁড়াল ওয়ার্নার। ইন্টারভিউ রুমের দূরের এককোণায় রাখা আছে ক্যামেরার

নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, এগিয়ে গেল সেদিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পোর্টার। ওয়ার্নার এখন যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখানকার দেয়ালে দেখা যাচ্ছে দুটো নুইস আঙুলের চাপে দুটোই বন্ধ করে দিল সে। প্রথমটার কারণে বিকল হয়ে পেল ক্যামেরার ভিডিও ফিড। দ্বিতীয়টা বন্ধ করে দিল অডিও সিস্টেম। কবরের নীরবতা নেমে এল অবজার্ভেশন রুমের ভেতরে। কাচের ও-পাশ থেকে পোর্টারের দিকে তাকাল ওয়ার্নার। তবে সরাসরি পোর্টারের দিকে তাকায়নি, পোর্টারের হাতের বাঁ দিকের কোনো একটা জায়গার দিকে তাকিয়েছে। আসলে ঠিক ঠান্ডা করতে পারছে না, কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফিরে গিয়ে বসে পড়ল জেন ডো'র পাশে।

পোর্টারের দিকে ঘুরে তাকিয়েছে ওই মহিলাও। অস্পষ্ট একটা হাসি দেখা দিয়েছে তার চেহারায়। কিন্তু সে যে হাসছে, সেটা ঠান্ডা করা যায়। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর তার উকিলের দিকে মুখ ঘুরাল সে। ঝুঁকে পড়ল।

পোর্টার দেখতে পাচ্ছে, ওই দু'জনের ঠোট নড়ছে। নির্বাক কোনো চলচ্চিত্র চলছে যেন ওর সামনে। কথা বলতে বলতে শারীরিক কিছু অঙ্গভঙ্গি করছে তারা... এমন কোনো একটা কাহিনি বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে যা বুঝতে পারছে না পোর্টার। আঙুলের ইঙ্গিতে একাধিকবার ওই ডায়েরি দেখিয়ে দিল জেন। কখনও আবার হাতে নিয়ে বিশেষ কয়েকটা পাতা খুলে দেখাল। ওসব পাতায় যা-যা লেখা আছে, সেসবের ওপর আঙুল বোলাল। মুখে উচ্চারণ করল শব্দগুলো। একটা কথাও বলল না সারা ওয়ার্নার, পুরোটা সময় চুপ করে শুনল শুধু। কখনও কখনও মাথা ঝাঁকাল, কখনও আবার মাথা নাড়ল। কখনও ভ্রু কঁচকাল। আবার, কখনও কখনও, ডায়েরির কোনো কোনো জায়গা তাকে দেখিয়ে দিল জেন ডো; সেগুলো শব্দ করে পড়ল। পোর্টারের ইচ্ছা করছে, অবজার্ভেশন রুমের চেয়ারটা মাথার ওপর তুলে ধরে সজোরে আছড়ে মারে জানালার কাচে, যাতে চুরমার হয়ে যায় সেটা, যাতে ওই জানালা টপকে ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে পড়তে পারে সে। যেসব বাক্যালাপ চলছে এখন জেন ডো এবং সারা ওয়ার্নারের মধ্যে, অন্য যে-কোনোকিছুর চেয়ে সেসব শুনতে চায় সে।

শেষপর্যন্ত, প্রায় ত্রিশ মিনিট পর, উঠে দাঁড়াল সারা। বেরিয়ে এল ওই ঘর থেকে। ততক্ষণে তার মক্কেল নিজের চেহারা ঢেকে ফেলেছে দু'হাতে।

অবজার্ভেশন রুমের দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়েছে ওয়ার্নার। 'আসুন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ওই মহিলা।'

পোর্টার ঠান্ডা করতে পারছে, ওর হাত কাঁপছে। অবজার্ভেশন রুমের তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি হওয়ার কথা না, তারপরও ওর ভ্রু কাছে জমে গেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'আপনি ঠিক আছেন?'

মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। রওয়ানা হলো দরজার উদ্দেশে।

পোর্টারের আগে হেঁটে ইন্টারভিউ রুমে হাজির হলো ওয়ার্নার। হলওয়াতে যে-গার্ড ছিল, এই সময়ের মধ্যে ডিউটি বদল হয়েছে তার। নতুন গার্ডটা তুলনামূলক কম বয়স্ক। দেখলেই বোঝা যায় তার আদি-নিবাস স্পেনে। উদাসীন এক দৃষ্টি মেলে তাকাল পোর্টার আর ওয়ার্নারের দিকে। তারপর নজর ফিরিয়ে নিল মেঝের কোনো একটা কৌতূহল-উদ্রেককারী জায়গার দিকে।

ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে পড়ল পোর্টার। বসে পড়ল জেন ডো'র মুখোমুখি একটা চেয়ারে। ওর পাশে বসল ওয়ার্নার। ঘরের দরজাটা লাগিয়ে দিল সেই গার্ড।

টেবিলের ওপর দিয়ে ডায়েরিটা পোর্টারের দিকে ঠেলে দিল জেন। কিন্তু আঙুলের ডগাগুলো সরিয়ে নিল না ওই জিনিসের ওপর থেকে। এখনও স্পর্শ করে রেখেছে ওটার সাদা-কালো কভার। ‘এখানে যেভাবে যা-যা বলা হয়েছে, আসল ঘটনা সেভাবে ঘটেনি।’

মহিলার কণ্ঠ ঠিক কেমন হবে, সে-ব্যাপারে কী আশা করেছিল পোর্টার, নিজেও নিশ্চিত না। কণ্ঠটা কর্কশ। কেমন যেন কর্তৃত্বপরায়ণ। অন্তত তা-ই মনে হলো পোর্টারের। বেহালার গায়ে সেটার ছড়ের মসৃণ আঘাত শুনতে যেমন লাগে, ওই মহিলার জিহ্বা বেয়ে যেন একই মসৃণতায় বেরিয়ে এসেছে শব্দগুলো। পোর্টার আশা করেছিল, কথা বলার সময় রেগে যাবে মহিলা। কিন্তু সে-রকম কিছু হলো না। শান্ত আছে জেন ডো। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। তার বাচনভঙ্গিতে দক্ষিণাঞ্চলের হালকা একটা টান খেয়াল করল পোর্টার।

‘সেভাবে ঘটেনি?’

ডায়েরির ওপর থেকে আঙুল সরিয়ে নিল মহিলা। টেবিলের কোনায় নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করল আঙুলগুলো। মাথাটা একটুখানি কাত হয়ে আছে বাঁ দিকে। ‘কল্পনাপ্রবণ বলতে যা বোঝায়, অ্যানসন সবসময়ই ছিল সে-রকম। কিছু মানুষ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন দেয়, তেমনই একটা ঝাঁক ছিল ওর মধ্যে।’

পোর্টারের পাশে চুপ করে বসে আছে সারা। ডায়েরির দিকে তাকাল একবার। তারপর তাকাল পোর্টারের দিকে।

সামনের দিকে ঝুঁকল পোর্টার। ‘কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে আপনার ছেলেকে, সে-ব্যাপারে কিছু জানেন?’

আঙুলগুলো মুঠ করল আর খুলল বিশপের মা। টেবিলের অ্যালুমিনিয়ামে কেমন একটা আওয়াজ উঠল নখের কারণে।

‘সে কোথায়, জানেন আপনি?’

সেই হাসিটা ফিরে এসেছে আবারও। তবে সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে মহিলা। তবে ঠোঁটের কোনা দেখলে হাসির আভাস পাওয়া যায়। ‘একটা কলম দিন আমাকে।’

‘আমার কাছে কোনো কলম নেই।’



জু কুঁচকে গেলে বিশপের মায়ের। 'থাকবে, তেমনটা আশাও করিনি আমি। এখনকার গার্ডরা ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে। তাদের ধারণা, আমাকে যদি ও-রকম কিছু দেয়া হয়, তা হলে সেটা গৈঁথে দিতে পারি আমি অন্য কারও ঘাড়ে। বিশ্বাস বলতে কিছু নেই এই জায়গায়।'

'ওনাকে একটা কলম দিন,' ওয়ার্নারকে বলল পোর্টার। দু'চোখের দৃষ্টি চুম্বকের মতো সঁটে আছে ওয়ার্নারের মক্কেলের ওপর।

চোখ সরু হলো ওয়ার্নারের। 'স্যাম, আমার মনে হয় না...'

'প্লিজ।'

শরীরটা কেমন শক্ত হয়ে গেল ওয়ার্নারের। যে-সুরে কথাটা বলেছে পোর্টার, তাতে বিস্মিত হয়েছে সে। শব্দ করে দম ছাড়ল। হাত বাড়িয়ে দিল ব্রিফকেসটা নেয়ার জন্য। বের করল নীল একটা বলপয়েন্ট কলম। বিশপের মায়ের সামনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সেটা।

জিনিসটা তুলে নিল ওই মহিলা। ক্যাপ খুলল। থাবা দেয়ার কায়দায় সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল খোলা হাতটা। দূরে সরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চেয়ারের গায়ে সজোরে ঠেলা মারল পোর্টার বসে থাকা অবস্থাতেই। আরেকটু হলে উল্টে গিয়েছিল সেটা, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে-রকম কিছু ঘটল না। ভারসাম্য ফিরে পেল সে। ডায়েরিটা ধরল ওই মহিলা, টেনে নিল নিজের দিকে। মুখ টিপে হাসছে। 'এত লাফালাফি করার কিছু নেই, স্যাম। আমি সাধারণত কামড়াই না।'

নিজের নামটা ওই মহিলার মুখ থেকে শুনে পোর্টারের মনে হলো, কোনো একটা লাশ যেন সেটার নির্জীব আঙুলগুলো দিয়ে চেপে ধরেছে ওর শিরদাঁড়া।

ডায়েরির কভার ওল্টাল মহিলা। প্রথম পাতায় কী যেন লিখল। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ক্যাপ আটকাল কলমের। ওটা ফিরিয়ে দিল ওয়ার্নারের হাতে। ওয়ার্নার ওই কলম চট করে ঢুকিয়ে রাখল ব্রিফকেসে।

টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল পোর্টার, ডায়েরিটা নিল। খুলল। 'এটা কী?'

হাসল মহিলা, উঠে দাঁড়াল। 'আমি এখন আমার সেলে ফিরে যেতে চাই।'

এগিয়ে গেল দরজার কাছে। সেখানকার কাছে টোকা দিল দু'বার।

দরজার পাশে ছোট একটা জানালা আছে, সেখানে দেখা গেল সেই গার্ডের চেহারাটা। কোমর সমান উঁচুতে খুলে গেল ছোট একটা দরজা। মহিলা ঘুরল, পোর্টারদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দুই হাত পিছমোড়া করে বাড়িয়ে ধরেছে ছোট সেই দরজার দিকে। তার কজিতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল গার্ড, শক্ত করে আটকে দিল। একটুখানি আগে বাড়ল মহিলা। মূল দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল গার্ড, একটা কাঁধ ধরল মহিলার।

'আবার কথা হবে আমাদের, স্যাম। অপেক্ষায় থাকলাম সেটার জন্য।' দোরগোড়ায় গিয়ে একটুখানি থামল জেন ডো। 'যে-জায়গার ঠিকানা লিখে দিলাম,

সেখানে গিয়ে ভালোমতো খুঁজে দেখবেন, ডিটেকটিভ। ওখানেই লুকিয়ে থাকে ওই দানবটা। ওখানে গেলে আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।’

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না সে। তাকে নিয়ে চলে গেল গার্ড। নরম একটা জুতো পরেছে মহিলা, চলার ছন্দে সে-জুতোর আওয়াজ ভেসে আসছে হলওয়ে থেকে।

পোর্টারের দিকে তাকাল ওয়ার্নার। ‘কী লিখেছে ওই মহিলা?’

ডায়েরিটা ঘুরিয়ে দিল পোর্টার যাতে বিশেষ সেই পাতা দেখতে পায় ওয়ার্নার:

১২ জেনকিন্স ক্রল রোড
সিম্পসনভিল, এসসি



আবারও টোকা দিল পুল, এবার আগের চেয়েও জোরে।

বরফশীতল বাতাসের কারণে অসাড় হয়ে গেছে গাল আর ঘাড়, স্কার্ফ না পরার কারণে মনে মনে নিজেকে শাপশাপান্ত করছে সে।

পরিত্যক্ত সেই জায়গার বাঁ দিকে অবস্থিত বাড়ির দরজায় যখন টোকা দিয়েছিল পুল, কেউ জবাব দেয়নি। একের বেশি জানালায় গিয়ে উঁকি দেয় সে। কেউ বাসায় আছে বলে মনে হয়নি ওর। একটা কুকুর দেখে ফেলে ওকে। মেঝেতে একটা কম্বলের নিচে শুয়ে ছিল ওটা। কিন্তু একবারও ঘেউ ঘেউ না করে ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

পরিত্যক্ত জায়গাটার ডান দিকে একটা বাসায় একজন প্রতিবেশীর দেখা মেলে। কিন্তু কাজে লাগতে পারে, এ-রকম কোনো তথ্য দিতে পারেনি ওই মহিলা। দরজায় কে এসেছে, দেখার জন্য রীতিমতো তর্জন-গর্জন করতে করতে হাজির হয়েছিল সে। তার গোলগাল শরীরে এঁটে বসেছিল গোলাপি একটা আলখাল্লা, আঙুলের সাহায্যে আঁকড়ে ধরেছিল সেটা। মহিলার পেছনে সত্তর ইঞ্চির একটা টেলিভিশন। তাতে চলছিল গফ্ খেলা, তা-ও আবার বিকট আওয়াজে। একেবারেই বেমানান ওই টিভি, ছোট লিভিং রুমের তুলনায় বেশি বড়। অ্যামাজনের খালি কতগুলো বাক্স এলোমেলোভাবে স্তুপ করে রাখা ছিল দরজার ঠিক ভেতরেই, একটা কোট র‍্যাকের পাশে। সে-র‍্যাকে ছিল কম করে হলেও এক ডজন কোট, হ্যাট আর স্কার্ফ। কাউচে বসে ছিল ছোট দুটো কুকুর। ঠিক যে-মুহূর্তে দরজায় টোকা দেয় পুল, সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চৈঁচাতে শুরু করে ওগুলো। দরজাটা যখন খুলে যায়, পুলকে যখন দেখা যায় পাল্লা আর চৌকাঠের মাঝখানের ব্যবধান দিয়ে, ওগুলোর উত্তেজনা তখন আরও বাড়ে। বাসার ভেতরে কেমন যেন পনিরের মতো গন্ধ।

জ্র কুঁচকে পুলের দিকে তাকিয়ে ছিল ওই মহিলা। ঠোঁট ফেটে গেছে তার। সে-ঠোঁটের আড়ালে দেখা যাচ্ছিল হলুদ দাঁত। ‘কী?’

নিজের ব্যাজটা তুলে ধরে পুল। ‘এফবিআই-এ আছি আমি। পাশের বাড়ির ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।’

ব্যাজটা উপেক্ষা করে মহিলা। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে পুলের দিকে। ‘পাশের বাড়ির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।’ ঘুরল দুই কুকুরের দিকে। ‘চুপ কর তোরা! দু’জনই!’

দম নেয়ার জন্য একটু বিরতি দেয় কুকুর দুটো, তারপর চৈঁচানো শুরু করে আবার।

‘গত কয়েক সপ্তাহে কাউকে ওই বাসায় ঢুকতে অথবা ওই বাসা থেকে বের হতে দেখেছেন?’

‘ওই বাড়ির যে-মালিক, বাড়িটার সামান্যতম যত্নও নেয় না সে, একটুখানি দেখভালও করে না। ওই বাড়ির মূল মালিকের নাম হেষ্টিংস। লোকটা মারা যাওয়ার পর তার বাচ্চাদের কারণে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে বাড়িটা। সন্তান অকৃতজ্ঞ হলে যা হয় আর কী। ওই বাড়ি আমার কাছে বিক্রি করে দেয়া উচিত ছিল লোকটার। ক্যান্সার যখন খেয়ে ফেলা শুরু করল তাকে, তখন আমিই কিন্তু দেখভাল করেছিলাম তার। সে-সময় দোকানে গিয়ে এটা-সেটা নিয়ে আসা আর সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। আমিই সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করেছি তাকে তখন।’

‘হেষ্টিংস মারা যাওয়ার পর কে কে ছিল ওই বাড়িতে?’

হাত তুলে গাল চুলকায় মহিলা। শুষ্ক গালে গোলাপি দাগ পড়ে যায়। ‘সে-রকম কেউ তো ছিল না। তবে ছেলেছোকরার দল থাকতে পারে। হতে পারে, রাস্তায় থাকার চেয়ে ওই বাড়ির ভেতরে থাকাটা বেশি ভালো বলে মনে করেছিল তারা। হেষ্টিংসের বাচ্চাকাচ্চারা যদি না চায় ওই ছেলেছোকরার দল আর থাকুক সেখানে, ভালো দেখে একটা তালা লাগিয়ে দিলেই তো পারে। বাড়িটাও যদি একটু রঙ করায়, ভালো হয়। হেষ্টিংস যদি আজ বেঁচে থাকত, তার বাড়ির এই অবস্থা হতে দিত না।’

‘ওই মেইলবক্সের কী খবর? হেষ্টিংসের বাচ্চাকাচ্চাদের নামে কখন কোন চিঠিপত্র আসে, সে-ব্যাপারে কেউ কি নজর রাখছে? ওটার ভেতরে তো চিঠির স্তুপ দেখতে পেলাম না। তার মানে, কেউ একজন নিয়মিত সংগ্রহ করছে ওসব।’

‘রাস্তার ওই পাড়ে একটা বাড়ি আছে। সেখানে একটা লোক থাকে। সে-ই মনে হয় ওসব চিঠি সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখে। মানুষটা ভালো।’

‘কোন বাড়ি?’

হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছিল মহিলা। ‘ওই যে, সবুজ বাড়িটা।’

পুল এখন দাঁড়িয়ে আছে সেই সবুজ বাড়ির দরজায়।

আবারও টোকা দিল সে।



৬০.

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা
তৃতীয় দিন, দুপুর ২:০৪

কে যেন টোকা দিচ্ছে দরজায়।

বেশ জোরে।

মাথার পাশে যে-কাটা জায়গা আছে, টোকার আওয়াজের কারণে ব্যথা করছে সেটা। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে লোকটার। যে-লোক টোকা দিচ্ছে, তাকে থামতে বলতে ইচ্ছে করছে। এসব থামাতে বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বিশেষ ওই শব্দ হচ্ছে তো হচ্ছেই... বার বার। আগেরবারের আওয়াজের চেয়ে পরেরবারেরটা আরও জোরে হচ্ছে। ওই লোক একসময় খেয়াল করল, নিজের ডেস্কে বসে আছে সে, দু'হাতে চেপে ধরেছে কান দুটো। মার্কারটা কখন যেন হাত ফস্কে পড়ে গেছে মেঝেতে, পায়ের কাছে।

উঠে দাঁড়াল সে।

যেন হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল ছোট ওই ঘরের দরজার উদ্দেশে। তারপর এগোল সিঁড়ির দিকে। পায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল তার মেয়ের কাপড়, আরেকটু হলে উল্টে পড়ে গিয়েছিল সে।

সাবধানে নামল সিঁড়ি বেয়ে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে-ক'বার আঁকড়ে ধরল রেলিং, শুধু সে-ক'বার হাত সরাল কান থেকে।

টোকা দেয়ার প্রতিটা আওয়াজ যেন প্রতিধ্বনি তুলেছে তার মাথার ভেতরে।

মাথাব্যথার চেয়েও বেশি অসহ্য লাগছে এই ব্যথা। চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দিলে যে-রকম লাগে, তার চেয়েও খারাপ লাগছে।

সে চাইছে, এসব যেন থেমে যায়।

এসব থেমে যাওয়াটা জরুরি তার জন্য।

সিঁড়ির তলদেশে হাজির হলো একসময়। আবারও সেই হোঁচট খেয়ে এগোনোর কায়দায় হাঁটছে, যাচ্ছে সদর দরজার দিকে। সেখানে যখন পৌঁছাল, পেতলের ডোর-নবটা যখন ধরল, দম নিল লম্বা করে। ওই দম জোর খাটিয়ে চালান করে দিল ফুসফুসে, শরীরের পেশীগুলোতে, মাংসে। টের পাচ্ছে, স্বস্তিদায়ক সেই বাতাসে যেন ভরে উঠছে তার শরীর। টের পাচ্ছে, ব্যথা কমে আসছে আস্তে আস্তে। গাল দুটো জ্বালা করছিল, সে-অনুভূতি যেন ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যথাটা কমতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে চিন্তাশক্তি।

জোর করে একটা হাসি ফোটাল চেহারায়। খুলল দরজাটা।

৬১.
পুল
তৃতীয় দিন, দুপুর ২:০৪

দরজাটা যখন খুলে গেল, পুল তখন তাকিয়ে ছিল নিচের দিকে... নিজের বাঁ হাতে ধরা ব্যাজটা দেখছিল। ডান হাতে টোকা দিতে যাচ্ছিল আবারও।

অ্যানসন বিশপ যে খুলেছে দরজাটা, প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি পুল। প্রথমে ওর ব্যাজ দেখল বিশপ। একটা মুহূর্ত পর মুখ তুলে বিশপের দিকে তাকাল পুল।

বিদ্যুৎগতিতে থাবা চালান বিশপ, খপ করে আঁকড়ে ধরল পুলের জ্যাকেটের কলার, প্রচণ্ড শক্তিতে পুলকে টেনে নিল ওই ঘিন হাউসের ভেতরে। আর ঠিক তখনই নিজের ভুলটা বুঝতে পারল পুল। শক্তি আছে বটে বিশপের গায়ে! পুল কিছু করার আগেই ওকে বাসার ভেতরে টেনে ঢোকাল সে, আছড়ে ফেলল হলওয়ার ছোট একটা টেবিলের ওপর। ওটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল পুল।

তবে তার আগে বিশপের মুখ থেকে চারটা শব্দ শোনা হয়ে গেছে পুলের:
'আপনি স্যাম পোর্টার না।'



কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা
তৃতীয় দিন, দুপুর ২:০৪

দরজাটা খুলল ওই লোক।

পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মানুষ। টিনএজার। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। বয়স ষোলোর মতো হবে।

প্রথমে কথা বলল ছেলেটা। তার পরনে সাদা শার্ট আর কালো টাই। ওপরে বেশ ভারী একটা কোট। 'গুড আফটারনুন, স্যর। আমরা আজ আপনার এবং আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সত্যিটা আজ আপনাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই আমরা। যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনি কোন ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করেন? আপনি কি প্রোটেষ্ট্যান্ট? নাকি ক্যাথোলিক?'

মেয়েটা তাকিয়ে আছে ওই লোকের মাথার কাটাচিহ্নের দিকে। অস্বস্তির একটা হাসি দেখা দিয়েছে তার চেহারায়ে।

কালো নিট ক্যাপটা শক্ত করে মাথায় এঁটে দিল ওই লোক। যত ভালোভাবে সম্ভব, ঢেকে দিল কাটাচিহ্নটা। হাসিটা ফিরিয়ে দিল ওই মেয়েকে। 'আমার... আমার এই কিছুদিন আগে একটা অপারেশন হয়েছে। দুঃখিত। সাধারণত ঢেকেই রাখি ওই কাটা জায়গা। ওটা কখনও কখনও কারও কারও জন্য আপত্তিকর হতে পারে।'

সঙ্গিনীর দিকে একবার তাকাল ছেলেটা। তারপর ফিরল ওই লোকের দিকে। 'আপনি যদি এখনও আমাদের সঙ্গে থাকেন, তা হলে প্রভু আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তা ছাড়া কাটা কোনো দাগ আপত্তিকর কিছু না। ওসব হচ্ছে সেরে ওঠার চিহ্ন। বিশ্বাসের প্রমাণ।'

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা খেয়াল করল, মাথা ঝাঁকচ্ছে সে। চুলকানি আর ব্যথা দুটোই চলে গেছে। 'ভেতরে আসবে তোমরা? ঠাণ্ডা থেকে একটু রেহাই পেতে তা হলে।'

শরীরের ভার এক পায়ে ওপর থেকে অন্য পায়ে বদল করল মেয়েটা। পাশে দাঁড়ানো ছেলেটার হাতের আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দিল নিজের আঙুলগুলো।

হাসল ছেলেটা। 'ভেতরে যেতে পারলে খুশি হবো আমরা।'

৬৩.

পুল

তৃতীয় দিন, দুপুর ২:০৫

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ছোট ওই টেবিল। ছালা করে উঠল পুলের একদিকের কাঁধ। মেঝেতে আছড়ে পড়েছে সে, ওর চারপাশে বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে ভাঙা কাঠের টুকরো।

ওর একটা হাঁটু একহাতে আঁকড়ে ধরল বিশপ, আরেক হাতে ধরল একদিকের কাঁধের নিচটা। তুলে ফেলল শূন্যে। চরকির মতো পাক খেল একবার, তারপর ছুঁড়ে মারল হলওয়ার উল্টোদিকের দেয়ালে। পুল টের পেল, ওর মাথাটা আগে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালের সঙ্গে। তারপর বাড়ি খেল হার্ডউডের মেঝের সঙ্গে। ভোঁতা একটা আওয়াজ শোনা গেল। দৃষ্টির পুরোটা জুড়ে যেন জ্বলে উঠল সাদা একটা আলো। তার ঠিক পরই প্রচণ্ড আর তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা টের পেল সে। ওর মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এখনই। ঘাড়ের ঠিক নিচে, কাঁধের কাছে শুরু হয়েছে ব্যথাটা। হাত বেয়ে যেন নেমে আসছে নিচের দিকে।

মেঝেতে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে পুল। হাতের মাংসের নিচে পিস্তলের বাঁটের স্পর্শ টের পাচ্ছে।

ওর পাঁজরে জোরে লাথি হাঁকাল বিশপ।

নতুন একটা ব্যথা টের পেল পুল। আগের ব্যথার চেয়েও জোরালো এটা।

কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি ভেদ করে পুল দেখতে পেল, এক কদম পিছিয়ে গেল বিশপ। মেঝে থেকে তুলে নিল টেবিলের ভাঙা একটা পায়া। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পুলের পাশে। ‘আমাকে ক্ষমা করে দিতে হবে আপনার। আমি আসলে চাইছিলাম না, আমার এখানে কোনো অতিথি আসুক। যদি জানতাম আপনি আসছেন, রাস্তার আরেক প্রান্তে যে-বেকারি আছে, সেখান থেকে কিছু একটা নিয়ে আসতাম আপনার জন্য। ওরা আবার ভালো স্কোন বানায়, খেতে মজাই লাগে। মিষ্টিও বেশি দেয় না। আমার কী ধারণা, জানেন? আমার ধারণা, সেখানকার যে-বাবুর্চি, সে-মহিলা মধু মেশায় ওই জিনিসে। আমি মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ব্যাপারে। কিন্তু কিছু বলেনি সে, মুখে শ্রেফ তালা মেরে রেখেছিল।’

টেবিলের পায়াটা মাথার ওপর তুলল বিশপ। তারপর সজোরে নামিয়ে আনল পুলের ঘাড়ে। সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল পুলের নজরের সামনে।



৬৪.
কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা
তৃতীয় দিন, দুপুর ২:০৫

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা পথ দেখিয়ে বাসার ভেতরে নিয়ে গেল ওই ছেলে-মেয়েকে। তারা তাদের কোট খুলে তার হাতে দেবে কি না, জানতে চাইল। ছেলেটা কোট খুলে ফেলল, দিল ওই লোকের হাতে। কিন্তু মেয়েটা সে-কাজ করল না। এমনকী কোটের জিপারও নামাল না তেমন একটা।

তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল ওই লোক। 'তোমরা আসার আগে গরম চকলেট বানাতে যাচ্ছিলাম আমি। খাবে নাকি আমার সঙ্গে? এ-রকম ঠাণ্ডা কোনো দিনে এক কাপ গরম চকলেটের চেয়ে ভালো আর কোনোকিছু হয় না। চলো গিয়ে কিচেনে বসি। আরাম লাগবে। তোমরা কেন এসেছ এখানে, সে-ব্যাপারে শুনবো বিস্তারিত।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না লোকটা, ঘুরল। কিচেনে যাওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত একটা হলওয়ে আছে, রওয়ানা হয়ে গেল সেদিকে। তাকে অনুসরণ করছে ছেলেটা। মেয়েটা আছে সবার পেছনে। ওই লোক কান পেতে শুনছে মেয়েটার পায়ের আওয়াজ। কেমন একটা দ্বিধা টের পাচ্ছে যেন মেয়েটার পদক্ষেপে। ওই মেয়ের পরনের বুটে শব্দ সোল আছে।

কিচেনে ঢুকে পড়ল লোকটা, টেবিলের কাছ থেকে টেনে সরাল দুটো চেয়ার। 'প্লিজ, আরাম করে বসো তোমরা। এই মাত্র এক মিনিট লাগবে আমার।'

'আপনি অনেক দয়ালু একজন মানুষ,' বলল ছেলেটা।

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, মেয়েটার জন্য একটা চেয়ার আরও একটুখানি টেনে সরিয়ে দিল ওই ছেলে। ছেলেটার দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর বসে পড়ল। কোমল একটা ধন্যবাদ উচ্চারণ করল কি করল না।

'প্লিজ আমাকে বলো, তোমাদের নাম কী?'

স্টোভের ওপরে একটা কেবিনেট আছে, সেখান থেকে তামার একটা পাত্র নামিয়ে নিল ওই লোক। খানিকটা দুধ ঢালল সেটাতে। গ্যাস বার্নারের ওপর রাখল পাত্রটা। নীল শিখা যেন চাটতে শুরু করেছে পাত্রের তলাটা।

'আমার নাম ওয়েজলি হার্টজলার,' বলছে ছেলেটা। 'আর এ আমার বন্ধু, কেটি কুইগলি।' কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়াল নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর ভাঁজ করল দু'হাত।

দ্য ওয়াচটাওয়ার এবং অ্যাওয়েক!

'তোমরা তা হলে জিহোভা'র (পরমেশ্বর) সাক্ষী?'

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩১৪

‘আপনি জানেন?’ বলে উঠল মেয়েটা। টেবিলের ওপর হাত রেখেছে সে-ও। তবে এখনও পুরু গ্লাভস পরে আছে। যে-কায়দায় আঙুল নাড়াচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

মেয়েটার কণ্ঠ মিষ্টি। স্ফটিকের কোনো ঘণ্টা বাজলে যে-রকম আওয়াজ হয়, অনেকটা যেন সে-রকম।

লোকটার হাতের বাঁ দিকে একটা ড্রয়ার আছে, সেটা খুলল সে, ভেতর থেকে বের করে আনল কাঠের বড় একটা চামচ। ওটা দিয়ে নাড়তে শুরু করল পাত্রে দুধটুকু। ‘ঈশ্বরের বাণীগুলোর সঙ্গে বিভিন্নভাবে পরিচিত আমি। তবে একটা কথা বলতেই হয়। ঈশ্বরের সাক্ষীরা যখন আমাকে ডাকতে আসেন, তোমাদের দু’জনের চেয়ে তাঁদের বয়স সাধারণত অনেক বেশি হয়।’

‘আমাদের বয়স ষোলো, স্যর। ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট,’ বলল ছেলেটা।

‘ওয়েজলি, তা-ই না?’

‘হ্যাঁ, স্যর।’

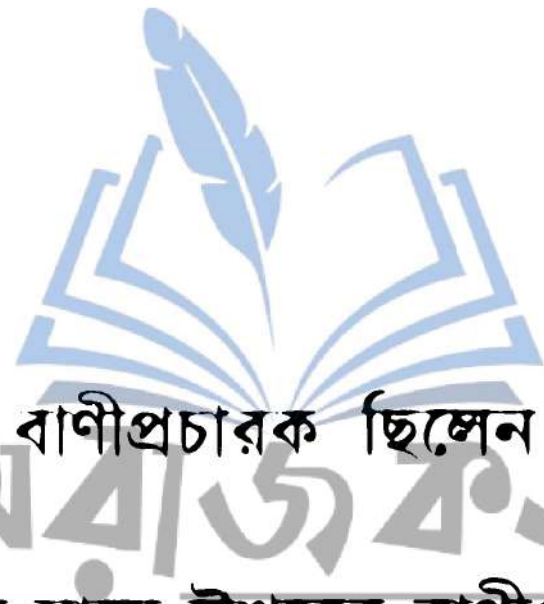
‘একমত না হয়ে কোনো উপায় নেই আমার। এখনকার ছেলেপেলের কাছ থেকে অনেককিছু শেখার আছে। অথচ বেশিরভাগে ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয় তোমাদেরকে।’

তিনটা মগ জোগাড় করে নিল লোকটা। স্টোভের ওপরে গোডিভা হট কোকো মিস্কের একটা কৌটা রাখে, খুঁজে বের করল সেটা। স্কুপের সাহায্যে অনেকখানি করে কোকো দিল প্রতিটা মগে। দুধ যখন বলক এল, প্রতিটা কাপে সমান পরিমাণ ঢালল। তারপর একটুখানি করে ভ্যানিলা মিশিয়ে দিল। ‘আমার মা এভাবে ভ্যানিলা দিয়ে কোকো তৈরি করতেন। আজ এত বছর পরও ওই অভ্যাস ঝেড়ে ফেলতে পারিনি আমি। ভ্যানিলা দিলে কেমন একটু রহস্যময় হয়ে যায় গরম চকলেটের স্বাদ। বিশেষ কিছু একটাতে পরিণত হয় সেটা।’

ওই ছেলে আর মেয়ের সামনে একটা করে মগ নামিয়ে রাখল সে। ফিরে গেল টেবিলের আরেক ধারে, তৃতীয় মগটা হাতে নিয়ে। বসে পড়ল। হাসছে দুই মেহমানের দিকে তাকিয়ে। ‘আজকালকার পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে দেয়া কঠিন একটা কাজ। বেশিরভাগ মানুষকে দেখলে মনে হয়, তারা কেমন যেন হারিয়ে গেছে। খুব হতাশাজনক একটা কাজ ওটা।’

‘আপনি কোন ধর্ম অনুসরণ করেন? মিস্টার...’ জানতে চাইল কেটি কুইগলি। গ্লাভস খুলেছে এতক্ষণে। একহাতের আঙুলগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মগটা। কালো নিট ক্যাপ পরিহিত ওই লোক খেয়াল করল, মেয়েটা গরম চকলেট খাচ্ছে না।

‘আমাকে পল বলে ডাকতে পারো,’ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল ওই লোক। চুমুক দিল চকলেটে।



‘ঠিক ওই নামে ঈশ্বরের বাণীপ্রচারক ছিলেন একজন,’ নিজের মগে চুমুক দেয়ার আগে বলল ওয়েজলি।

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, আমার নামে ঈশ্বরের বাণীপ্রচারক ছিলেন একজন।’ ঠোঁট দুটো সোয়েটশার্টের হাতায় মুছে ফেলল ওই লোক। ‘ধর্মের কথা যদি বলি, মাঝেমধ্যে নিজেকে আমার একজন অনুসন্ধানকারী বলে মনে হয়। কিছু কিছু ব্যাপার আমি গ্রহণ করেছি এখান থেকে, কিছু আবার গ্রহণ করেছি সেখান থেকে। জানতে পেরেছি, আমার এই আবিষ্কার, পবিত্র কোনো ধর্মগ্রন্থের মতোই আলোকময়।’

‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে-হলরুম, সেটা এখান থেকে এক মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত। আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, সেখানে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়া উচিত আপনার। প্রতি শনিবার উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা আছে আমাদের ওখানে। সেটা শুরু হয় রাত আটটায়। চলে বড়জোর এক ঘণ্টা কিংবা তার কিছু বেশি সময় ধরে। আমি নিশ্চিত, আপনার যে-চিন্তাভাবনা, সেটা পছন্দ করবে সবাই।’ কোকোর মগে আরও একবার চুমুক দিল ওয়েজলি। তার মুখের এককোণায় লেগে আছে একটুখানি চকলেট। ‘এই জিনিস খেতে তো দারুণ মজা।’

তার পাশে বসা কেটি লাফিয়ে উঠল যেন। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে ওয়েজলির দিকে।

ওয়েজলি কি টেবিলের নিচ দিয়ে লাখি মেরেছে ওই মেয়েকে?

‘আলোচনা অনুষ্ঠানের পর আমাদের ওখানে সাধারণত কেক এবং অন্যান্য জলখাবারের ব্যবস্থা করা থাকে। আপনি চাইলে আমাদের সঙ্গে আপনার হট চকলেটের রেসিপিটা শেয়ার করতে পারেন।’

‘শুনে তো মনে হচ্ছে তোমাদের ওখানে গেলে আমার সময় দারুণ কাটবে।’

ঠোঁটের কাছে মগ তুলেছে কেটি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে লোকটা। ধোঁয়াওঠা ওই পানীয় গুঁকছে মেয়েটা। কেমন যেন দ্বিধাজড়িত কায়দায় চুমুক দিল ছোট করে। ‘ম্ম্, এটা তো আসলেই দারুণ।’ নিজের সামনে, টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল মগটা। এপাশে-ওপাশে কয়েকবার ঘোরাল মগটা। তারপর হাত দুটো নামিয়ে রাখল কোলের ওপর।

‘তোমাদের যে পছন্দ হয়েছে ওই জিনিস, সেজন্য ভালো লাগছে আমার।’

‘আপনার কোনো পরিবার আছে, পল?’ জিজ্ঞেস করল কেটি।

‘তোমার সমান বয়সের একটা মেয়ে আছে। ও একটু লাজুক প্রকৃতির।’

‘ওহ, আমি আবার অত লাজুক না।’

‘না?’

মাথা নাড়ল কেটি। গরম চকলেটের মগটা আবারও তুলে নিল ঠোঁটের কাছে। মেয়েটা আসলেই খাচ্ছে, নাকি খাওয়ার ভান করে মুখের কাছে মগ তুলে নিচ্ছে প্রতিবার, নিশ্চিত করে বলতে পারবে না লোকটা।

‘আপনার সঙ্গে একবার শুধু ভালোমতো পরিচিত হয়ে যাক কেটি, তারপর দেখবেন বাচালের মতো কত কথা বলতে শুরু করবে সে,’ হড়বড় করে বলে উঠল ওয়েজলি।

‘আপনার মেয়ে কোথায়? বাসায় আছে?’ ছোট কিচেনের এদিকে-সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছে কেটি।

‘বিশ্রাম নিচ্ছে। ওপরতলায় আছে। ইদানীং ওর শরীর খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।’

‘মিসেস পল বলে কেউ কি আছেন?’

নজর নিচু করল কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা। ‘বলতে খারাপই লাগছে... আমাদের মেয়েটা যখন জন্মাল, তখন মারা গেছে মিসেস পল। কিছু... জটিলতা হয়ে গিয়েছিল।’

‘ঈশ্বরের কাজ...’

যা বলতে চাইছে তা বলার দরকার নেই... বোঝানোর জন্য কেটির উদ্দেশে একটা হাত নাড়ল ওই লোক। ‘ঈশ্বরের রহস্যময় কাজকর্মের সঙ্গে আমি খুব ভালোভাবেই পরিচিত।’

‘তিনি পরীক্ষা নেন। তিনি আপনার পরীক্ষা নিচ্ছেন। পরীক্ষা করে দেখছেন, তাঁর ওপর আপনার বিশ্বাস ঠিক কতখানি,’ বলল ওয়েজলি।

‘তোমার কথাটা সম্পূর্ণ সঠিক হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করুক অথবা না করুক, তাতে আমার হারানোর ব্যথাটা কমে না একটুও। তোমরা খুব ভালোবাসো, এ-রকম কাউকে কখনও হারিয়েছ? কাদের কথা বলছি আমি, বুঝতে পারছ তো? যারা তোমাদের কাছে সারা দুনিয়ার সমান, তারা।’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওয়েজলি আর কেটি। তারপর মাথা নাড়ল দু’জনই।

‘তোমাদের বয়স খুবই কম। আশা করি, ও-রকম কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে না তোমাদের কাউকে। আশা করি, বন্দুক তাক করা বলতে যা বোঝায়, তোমাদের দু’জনের কারও বেলাতেই সে-রকম কিছু করার দরকার হবে না ঈশ্বরের।’

কেটি বলল, ‘যে-হলে আমাদের অনুষ্ঠান হয়, সেটার নাম কিংডম হল। আপনার মেয়েকে সেখানে নিয়ে যাবেন?’

তার দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। ‘আমি নিশ্চিত, ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যে-পরিমাণ ভালো লাগবে আমার মেয়েটার, অন্য আর কোনো কাজে ততটা খুশি হবে না সে।’

নিজের হট চকলেট শেষ করল ওয়েজলি। খালি মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় একটু ভনিতা করল। ‘পল, আমার মনে হয় এবার যাওয়ার সময় হয়েছে আমাদের। আজ আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাদের।’ ছোট একটা

পুস্তিকা ঠেলে দিল টেবিলের ওপর দিয়ে। ‘এটার পেছনদিকে আমাদের হলের ঠিকানা লেখা আছে। আগেও বলেছি, ওই জায়গা এখান থেকে খুব বেশি দূরে না। আপনার দেখা যদি পাই, সত্যিই ভালো লাগবে। আপনার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলবেন না।’

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা নিজের হট চকলেট শেষ করল। তার মাথার একপাশে যে-ক্ষতচিহ্ন আছে, চুলকাল সেটা। ওই জায়গার পেছনে আবারও হালকা একটুখানি দপদপানি শুরু হয়েছে। ‘ওয়েজলি, একটা কথা বলো তো আমাকে। পরমেশ্বরের সাক্ষীরা কী বিশ্বাস করেন... মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার ঠিক কী পরিণতি হয়?’

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল ওয়েজলি। একবার দেখে নিল কেটিকে, তারপর বসে পড়ল। ‘আমাদের বিশ্বাস, পাপকর্মের শাস্তি হিসেবে একজন মানুষের শরীরের সঙ্গে তার আত্মাও মরে যায়।’

‘তার মানে তুমি বলতে যাচ্ছ স্বর্গ বলে কিছু নেই? নরক বলেও কিছু নেই?’

‘ওহ, স্বর্গ বলে কিছু একটা আছে। কিন্তু সেখানে নিজের সঙ্গে কেবল ১,৪৪,০০০ মানুষের আত্মাকে থাকার অনুমতি দেবেন ঈশ্বর। তাঁদের সবার ওপর শাসন করবেন যিশুখ্রিষ্ট।’

‘তা হলে আমাদের বাকিদের কী হবে?’

এক হাতের ওপর আরেক হাত রাখল কেটি। ‘জেনেসিসের ৩ নম্বর অধ্যায়ের ১৯ নম্বর বাক্য অনুযায়ী যদি বলি, ঈশ্বর বলছেন, “মাটিতেই আবার ফিরে যাবে তোমরা। একদিন সেখান থেকেই বের করা হয়েছিল তোমাদেরকে। তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধূলিকণার জন্য। এবং সেই ধূলিকণাতেই ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে।” ’

‘তার মানে আশা বলতে আর কোনোকিছু বাকি নেই।’ ইঙ্গিতে ঘরের এদিক-সেদিক দেখিয়ে দিল লোকটা। ‘আমরা তা হলে ধূলিকণার চেয়ে বেশি কিছু না। আমরা তা হলে একদিন পোকামাকড় আর গাছপালার খাবারে পরিণত হবো।’ টের পেল, একটা ক্রোধ যেন জেগে উঠতে চাইছে তার কণ্ঠে। জোর করে সেটা ফেরত পাঠাল সে। ‘অথচ আমি ধরে নিয়েছিলাম, যাঁরা ন্যায়ের পথে আছেন, কঠোর চেষ্টা করলে আমরা তাঁদের কাতারে शामिल হতে পারবো। ফলে আমাদেরকে গণ্য করা হবে সেই ১,৪৪,০০০জন মানুষের মধ্যে।’

পুস্তিকাটা ঠেলে ওই লোকের আরও কাছে পাঠিয়ে দিল ওয়েজলি। ‘আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছি আমরা, তাতে অংশ নিন। পরকালের জন্য আশা বাঁচিয়ে রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় এটাই। আরেকটা কথা। ঈশ্বরের রাস্তায় ফিরে আসতে কিন্তু কখনোই অনেক বেশি দেরি হয়ে যায় না একজন মানুষের।’

কালো নিট ক্যাপ পরিহিত ওই লোক নিজের খালি মগটা পের্চিয়ে ধরল আঙুলের সাহায্যে। ‘আমি আসলে জানি না সেটা। আমাদের কারও কারও জন্য হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।’

চোখের পলকে হাত তুলল সে, শূন্যে উঠে গেল মগটা। পরমুহূর্তেই সেটা সজোরে নামিয়ে আনল ওয়েজলির মাথার একপাশে। প্রচণ্ড আঘাতের কারণে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সিরামিকের সেই মগ। তার হাতে ধরা মগের হাতলটা ছিন্কে গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। একপাশে কাত হয়ে গেল ওয়েজলি, আছড়ে পড়ল মেঝেতে। যে-চেয়ারে বসে ছিল সে, সেটাও পড়ে গেল তার সঙ্গে।

এইমাত্র যা ঘটে গেল, সেটা ঠাহর করে নিতে একটা মুহূর্ত সময় লাগল কেটির। বড় বড় হয়ে গেছে বেচারীর চোখ। তার পাশে, মেঝেতে পড়ে-থাকা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু যা দেখছে, তা মনে নিতে পারছে না তার মস্তিষ্ক।

মেয়েটার এই দ্বিধাজড়িত অবস্থার সুযোগ নিল কালো নিট ক্যাপ পরিহিত ওই লোক। লাফিয়ে আগে বাড়ল। নাগালের মধ্যে মেয়েটাকে পাওয়ামাত্র একহাত দিয়ে চেপে ধরল মেয়েটার কোটের কলার।

সেই হাতে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল কেটি। মুঠি আলগা হয়ে গেল লোকটার। হট চকলেটের যেটুকু বাকি ছিল, ছুঁড়ে মারল ওই লোকের নাকেমুখে। তারপর ঘুরেই ছুট লাগাল। হলওয়ে ধরে দৌড়ে যাচ্ছে সদর দরজার দিকে।

গরম সেই তরল যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে লোকটার দুই চোখ। জ্বালাপোড়া করছে চোখের নিচের কোমল চামড়াও। কিন্তু তাতে কোনো পরোয়া নেই ওই তার। জ্বলুনিটা যেন টের পেয়েও পাচ্ছে না। সামনে থেকে চেয়ার সরিয়ে ছুট লাগাল মেয়েটার পেছন পেছন, আরেকটু হলে চেয়ারের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। ‘কেটি! সুইচি? কেউ কি কখনও তোমাকে বলেনি, যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হচ্ছে তোমাকে, তার আগে টেবিল ছেড়ে ওভাবে চলে যাওয়াটা অভদ্রতা?’

সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে কেটি। হাতল ধরে মোচড়ামোচড়ি করছে। টানাটানি করছে ডেডবোল্ট ধরে।

চাবি রয়ে গেছে কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটার পকেটে।

দু’হাত দিয়ে দরজার গায়ে সমানে কিল মারছে কেটি। একইসঙ্গে চেষ্টাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। চিৎকারটা ওই লোক শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। কেমন যেন বসে গেছে মেয়েটার গলার আওয়াজ। মনে হচ্ছে, পানির নিচ থেকে চেষ্টাচ্ছে যেন। ঘুরল মেয়েটা। তার পিঠ এখন দরজার দিকে। ‘প্লিজ...’

হাত বাড়িয়ে সেই ক্ষতস্থান স্পর্শ করল লোকটা। আঙুলে লেগে গেল তাজা রক্ত। কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পেল, লোকে ভুলে গেছে এ-রকম কোনো কবরস্থানে

একটা কবর খোঁড়া হয়েছে যেন, সে-কবরের ধুলোমাটির ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে ওই রক্ত ।

‘প্লিজ, না...’

হার্ডউডের দরজার সঙ্গে কেটির মাথা সজোরে ঠুকে দিল ওই লোক । যে-আওয়াজ শোনা গেল, তাতে সন্তুষ্টি জাগল তার মনে । রক্তমাখা আঙুল থেকে রক্তের দাগ লেগে গেছে মেয়েটার কপালে ।

৬৫.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, দুপুর ২:০৬

‘এটার মানে কী? এই জায়গাই কি ওই মহিলার আদি নিবাস?’ জিজ্ঞেস করল সারা ওয়ার্নার।

লকারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু’জন। জেলখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

‘সেখানে যেতে পারবেন না আপনি,’ জানিয়ে দিল পোর্টার।

ওর দিকে দ্রুত কুঁচকে তাকাল ওয়ার্নার। ‘সেখানে যেতে চাইছি আমি, সে-রকম কোনো কথা বলিনি কিন্তু। যদি যেতে চাইতাম, যেতাম।’

‘আপনার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা ফন্দি আঁটছেন। এবং সেটা ঠিক ভালো লাগছে না আমার।’

‘ওই মহিলা আমার মক্কেল। কাজেই যে-ঠিকানা দিয়েছে সে, সেখানে যাওয়ার অধিকার যেমন আপনার আছে, তেমন আছে আমারও। ওই ঠিকানায় যা-ই থাকুক না কেন, সেটা এই কেসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। এমন কিছু একটা আমাদের সামনে চলে আসতে পারে, যা কাজে লাগিয়ে ওই মহিলার উপকার করতে পারবো আমি।’

‘সেখানে যা-ই থাকুক না কেন, সেটা ফোর মাস্কি কিলার কেসের একটা অংশ। এবং ওই কেসের তদন্তকাজ এখনও চলছে।’

‘আমি ওই ডায়েরিটাও পড়তে চাই।’

‘ওটা একটা প্রমাণ।’

মেকি হাসি হাসল ওয়ার্নার। ‘হ্যাঁ, ওটা এমন এক প্রমাণ, যার কোনো অস্তিত্ব নেই পুলিশের এভিডেন্স লিস্টে। ওটা এমন এক প্রমাণ, যা বয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি নিজের কাছে, যখন খুশি তখন ধরছেন... তা-ও আবার গ্লাভস ছাড়াই। ওটা এমন এক প্রমাণ, কে কখন নিজের দায়িত্বে রাখছে জিনিসটা, তার কোনো হদিসই নেই।’

নিজেদের লকারের সামনে হাজির হলো ওরা। লকারে ঢাবি ঢোকাল পোর্টার। খুলল ছোট দরজা। বের করে আনল নিজের জিনিসগুলো: বেল্ট, জুতোর ফিতা, ওয়ালেট, মোবাইল ফোন, আর একটা ছুরি... রেঞ্জার বাক নাইফ বলতে যা বোঝায়, ঠিক সে-জিনিস। ফলাটা ভাঁজ করে রাখা যায়।

বিশপের ছুরি।

‘লাঞ্ছের সময় পার হয়ে গেছে। তারপরও দেহিতে কাজটা সারার কোনো ইচ্ছা আছে আপনার?’

নিজের জিনিসগুলো বিভিন্ন পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল পোর্টার। জুতোর ফিতে বাঁধল। ‘এয়ারপোর্টে যাওয়া দরকার আমার।’

‘দেখুন, এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা দরকার আমাদের। তা ছাড়া আপনি চাইলে রেস্টুরেন্ট থেকেও ফ্লাইট বুকিং দিতে পারবেন।’ মাথাটা একদিকে একটুখানি কাত করল ওয়ার্নার। ঘন রঙের চুল লুটিয়ে পড়ছে কাঁধের ওপর। ‘খালি পেটে তো ছুট লাগানো সম্ভব না কারও পক্ষে, তা-ই না?’

‘আপনাকে না বলাটা কঠিন একটা কাজ,’ বলল পোর্টার। নিজের উরুতে সেই ছুরির ওজন অনুভব করছে।

ত্রিশ মিনিট পর।

ডুকি চেজ নামের একটা রেস্টুরেন্টের এক কোনায়, ছোট একটা টেবিলের ধারে বসে আছে ওরা দু’জন। অরলিস অ্যাভিনিউ’র কোনায়, মিরো স্ট্রিটে অবস্থিত ওই রেস্টুরেন্ট। পোর্টারের সামনে তিনটা প্লেট। একটাতে আছে চিংড়ি-মেশানো লিমা বিন। অন্যটাতে পনির-মাখানো আলু। তৃতীয়টাতে আছে একটা স্যান্ডউইচ।

নিউ অরলিস থেকে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গ্রিনভিল পর্যন্ত সরাসরি একটা ফ্লাইট পাওয়া গেছে। পোর্টারের হাতে সময় আছে দু’ঘণ্টা। গ্রিনভিলে নামার পর একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে ওকে। সিম্পসনভিলে পৌঁছাতে মিনিট বিশেক লাগবে ওর।

‘শেষ কখন খেয়েছিলেন আপনি, বলুন তো?’ জানতে চাইল ওয়ার্নার, তাকিয়ে আছে পোর্টারের সামনের প্লেটগুলোর দিকে। নিজের সামনে আছে ছোট এক বাটি গাম্বো (ঘন সজির-ঝোল)। আর আছে বরফ-দেয়া চা।

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত একটু ভাবতে হলো পোর্টারকে। ‘মনে হয় গতকাল। ক্যান্ডি বার খেয়েছিলাম।’ নজর নামিয়ে তাকাল নিজের প্লেটগুলোর দিকে। খেতে শুরু করল। খানিকটা খাবার মুখে দিয়েই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। ‘দারুণ তো!’

‘এখানকার রাঁধুনির নাম লিয়া চেজ। মহিলা গত সত্তর বছর ধরে রান্নার কাজ করছেন এখানে। এখন তাঁর বয়স নব্বইয়ের ঘরে। আমি রে চার্লসকে নিজের চোখে দেখেছি এই রেস্টুরেন্টে। এই শহরে যখনই এসেছেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, এখানে হাজির হয়েছেন। এমনকী বারাক ওবামাও এই রেস্টুরেন্টের একজন ফ্যান। আপনি এক কাজ করতে পারেন। এই গাম্বো-টা একটু চেখে দেখতে পারেন।’

নিজের বাটি থেকে এক চামচ গাম্বো নিয়ে পোর্টারের দিকে বাড়িয়ে ধরল ওয়ার্নার।

একটা মুহূর্তের জন্য একটুখানি দ্বিধা ফুটে উঠল পোর্টারের চোখেমুখে। মনে পড়ে যাচ্ছে অতীতের কথা... একবার ওকে এভাবে খাটিয়ে দিয়েছিল হিদার। ঘটনাটা আজ থেকে দু'বছর আগের। তখন ওদের বিনাহবার্গিস্কা ছিল। কাল'স ফটকহাউসে খেতে গিয়েছিল ওরা।

‘সাম?’

যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বর্তমানে ফিরে এল পোর্টার। ওয়ার্নারের হাত থেকে মল চামচটা। গাম্বোটুকু খেল। দারুণ স্বাদ।

‘আপনি ঠিক আছেন তো? একটু আগে মনে হলো কোথাও হারিয়ে গেছেন যেন।’

ওরা দু'জন যে-টেবিলে বসেছে, সেটার পাশে একটা জানালা আছে। সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে রোদ। উজ্জ্বল একটা আলো যেন খেলা করছে ওয়ার্নারের দু'চোখে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে নিজের বিয়ের আংটিতে আলতো একটু চাপ দিল পোর্টার। আঙুলগুলো বাঁকাল, তারপর হাতটা সরিয়ে নিয়ে রাখল কোলের ওপর।

‘সেকেন্ডারি ডেভেলপমেন্ট বলতে যা বোঝায়, সে-রকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে জেলখানায়,’ বলল পোর্টার। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আলুর প্লেটটা নিয়ে। ‘আপনাকে বলি-বলি করেও বলা হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার জানা উচিত।’

‘কী?’

বাঁ দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল পোর্টার। বের করে আনল ওই মোবাইল ফোন। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওটা। তারপর হাত ঢোকাল ডান দিকের পকেটে। বের করল ছুরিটা। মোবাইলের পাশে রাখল ওটা। ‘আমি যখন জেলখানায় গিয়েছিলাম, তখন আমার সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন ছিল না। কোনো ছুরিও ছিল না। অথচ এখন আছে। তার মানে, কেউ একজন এই মোবাইল আর ছুরি রেখে দিয়েছে আমার লকারে। এবং কাজটা সে করেছে, যখন আমরা কথা বলছিলাম আপনার মক্কেলের সঙ্গে, তখন।’

বড় বড় হয়ে গেছে ওয়ার্নারের চোখ। ‘জেলখানায় ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। সব কথা জানানো উচিত ওয়ার্ডেনকে।’

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘বুদ্ধিটা খারাপ। এসব কথা জানতে পারলে ওয়ার্ডেন লোকটা কী করবে? প্রথমেই বাজেয়াপ্ত করবে এই মোবাইল ফোন। তারপর শুরু করবে কোনো একজাতের তদন্ত। ধরে নিলাম, যে-লোক করেছে এই কাজ... মানে, যে-লোক আমার লকারে ঢুকিয়েছে এই ফোন আর ছুরি, তাকে শেষপর্যন্ত পাকড়াও করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ হবে? বিশপের সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা রাস্তা পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে আমার, সেটা হারিয়ে

ফেলবো আমি।’ আঙুলের সাহায্যে চাপ দিল ছুরিতে, ফলাটা বেরিয়ে এল বাইরে।
‘এ-রকম একটা ছুরির কথা নিজের ডায়েরিতে উল্লেখ করেছিল বিশপ। হতে পারে, এটাই সেই ছুরি।’

‘তার মানে আপনি ভাবছেন বিশপ দিয়ে গেছে ওসব?’

‘হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কাজটা করেনি সে। তবে কাউকে দিয়ে করিয়ে থাকতে পারে। এবং বিশেষ সেই লোক হয়তো কাজ করছে তার পক্ষে।’ নজর নামিয়ে ফোনের দিকে তাকাল পোর্টার। চালু করা অবস্থায় আছে ওটা। এমনকী ফুল চার্জও দেয়া আছে।

‘দেখতে পারি?’

ফোনটা ওয়ানারের হাতে দিল পোর্টার।

বিভিন্ন মেন্যু ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল ওয়ানার। ‘এই জিনিস তো স্মার্টফোন না। কল লগ খালি। কোনো কন্ট্যাক্ট নম্বরও স্টোর করা নেই। এমনকী কোনো টেক্সট মেসেজও নেই। আমার মনে হয় না এই ফোন কখনও ব্যবহার করা হয়েছে।’ ফোনটা ফিরিয়ে দিল পোর্টারের হাতে। ‘এবার কী করবো আমরা? কখন ফোন করবে বিশপ, সে-অপেক্ষায় থাকবো?’

স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল পোর্টার। ‘এবার আপনি ফিরে যাবেন আপনার অফিসে। আর আমি রওনা দেবো এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে।’

‘আপনি কি আসলেই ভাবছেন, এই কাজ আপনাকে একা করতে দেবো আমি?’

‘কাজটা করার জন্য কাউকে কোনো রকম নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম কি না, মনে করতে পারছি না।’

‘ওই মহিলা আমার মক্কেল। ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যায়, সেটা জানার অধিকার আছে আমার।’

‘আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেবো আমি।’

‘সেটা এই ফোনের কথা বলছেন?’ সামনের দিকে ঝুঁকল ওয়ানার। ‘বলুন তো, পুলিশের ঠিক কতজন অফিসার নিজের পিস্তল অথবা মোবাইল ফোন ছাড়া কাজে বেরিয়ে পড়ে? যদি আপনাকে বলি নিজের ব্যাজটা দেখাতে পারবেন কি না, পারবেন কাজটা করতে? এ-পর্যন্ত যা দেখেছি আমি, তা হচ্ছে শুধু আপনার বিজনেস কার্ড। যে-কোনো দোকানে গিয়ে ও-রকম জিনিস বানিয়ে নেয়া সম্ভব।’

‘কণ্ঠ নিচু করুন।’

গলা খাদে নামাল ওয়ানার। কিন্তু একটু আগে চেষ্টা করে যেসব কথা বলছিল সে, তার চেয়েও জোরে পোর্টারকে আঘাত করল নতুন এই কথাগুলো। ‘আমি কীভাবে জানবো, আপনি আসলে মানসিক বাতিকগ্রস্ত কোনো লোক না? কীভাবে জানবো, পুলিশের কোনো অফিসার সাজার নাটক করছেন না আপনি?’

‘আপনার ফোনটা একটু দিন তো,’ শান্ত গলায় বলল পোর্টার।

‘কেন?’

‘প্রিজ।’

লম্বা করে দম নিল ওয়ার্নার। তারপর পার্সের ভেতর থেকে বের করল নিজের আইফোন। ওটা দিল পোর্টারকে।

ওয়েব ব্রাউজার চালু করল পোর্টার। নিজের নাম টাইপ করল। ডজন ডজন আর্টিকেল হাজির হয়ে গেল। সেসব আর্টিকলে আছে ওর ছবি, কোনো কোনোটাতে আছে বিশপেরও ছবি। কোনোটাতে আবার জুড়ে দেয়া হয়েছে ফোর মাস্কি কিলারের শিকারদের ছবি। ফোনটা ওয়ার্নারের হাতে ফিরিয়ে দিল সে।

নজর নামিয়ে ডিসপ্লে’র দিকে তাকাল ওয়ার্নার। হেডলাইনগুলো পড়ছে। তারপর বন্ধ করে দিল ফোনটা। ‘আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনার, স্যাম। আমার ওপর ভরসা করতে পারেন আপনি। আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমি।’

ওয়ার্নারকে বিশ্বাস করল পোর্টার।

সব কথা বলে দিল ওই মহিলাকে।



পিটপিট করছে পুলের চোখ দুটো। হলওয়ার একটুখানি নজরে পড়ছে ওর। ঊর্দ্ধ দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তখনই সবকিছু আবারও অন্ধকার হয়ে এল ওর চোখের সামনে।

প্রথমবার কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল, নিশ্চিত না সে। ঠিক কখন সংজ্ঞা ফিরেছিল, তা-ও বলতে পারবে না। দ্বিতীয়বার যখন জ্ঞান ফিরল, শব্দ থাকল সে। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে হলওয়ারটা। বাসার ভেতরের কোনে আওয়াজ শোনা যায় কি না সে-আশায় কান পেতে রেখেছে। কানের ভেতরে দপদপ করছে, সে-আওয়াজ অন্য কোনোকিছু শুনতে দিচ্ছে না ওকে। সে-আওয়াজ অন্য প্রায় সবকিছুকে ডুবিয়ে মেরেছে।

টানা কয়েক মিনিট শুয়ে থাকল সে। সময়টা কয়েক সেকেন্ডও হতে পারে সময় আর সংজ্ঞার হিসেবটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে ওর মাথার ভেতরে মনে হচ্ছে, দড়ির কোনো একটা মইয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে সে। সেটার না আছে কোনো আগা, না আছে কোনো গোড়া। বুলন্ত অবস্থায় থাকার জন্য সেটার সঙ্গে যেন বেঁধে দেয়া হয়েছে ওকে।

ড্রাম বাজার যে-আওয়াজ হচ্ছিল কানে, সেটা কিছুটা কমেছে। এখন নিয়মিত ছন্দের একটা টিক টিক শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে... হলের সেই গ্র্যান্ডফাদার ক্লক হবে সম্ভবত। ওটার একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু ওটার মুখ ঘোরানো আছে আরেক দিকে।

শরীরের নিচে চাপা পড়েছিল ডান হাত, ওটা বের করল সে। টান মারল শোল্ডার রিগে আটকানো গ্লুকে।

বিশপের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

ধীরে ধীরে উঠে বসল পুল। হামাগুড়ি দেয়ার কায়দায় ঝুঁকে আছে, মাথা ঘোরানো ভাবটা চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘাড়ের পেছন দিকে যে-জায়গায় বাড়ি মেরেছে বিশপ, বাঁ হাত দিয়ে স্পর্শ করল জায়গাটা। বেশ অনেকখানি ফুলে গেছে। তবে কোথাও কেটে যায়নি, তাই রক্ত পড়ছে না। প্রচণ্ড সেই আঘাতের কারণে বড় রকমের একটা শকের মধ্যে হয়তো চলে গিয়েছিল সে, তবে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না। পা দুটোর অস্তিত্ব যেন ঠাহর করে নিতে হলো ওকে। উঠে দাঁড়াল জোর খাটিয়ে। সাদা তরঙ্গের মতো কিছু একটা খেলা করে গেল নজরের সামনে। আবারও যাতে জ্ঞান হারিয়ে না ফেলে সেজন্য দেয়ালে হেলান দিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

পিস্তলটা ভারী অনুভূত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, হাত থেকে ছুটে পড়ে যাবে। আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওটা। ট্রিগার গার্ডের চোখা কোনাটায় ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে ধরেছে একটা আঙুল। একটা ব্যথা যেন কামড় বসিয়ে দিচ্ছে ওই আঙুলে। তবে তাতে লাভই হচ্ছে বরং... মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারছে সে।

হল ধরে এগোতে শুরু করল পুল। দু'হাত একসঙ্গে করে বাড়িয়ে ধরেছে। পিস্তলের নল তাক করে রেখেছে নিজের সামনের জমিনের দিকে।

হলওয়ে ছাড়িয়ে দেখা মিলল একটা ওপেন-কনসেপ্ট ডাইনিং আর লিভিং রুমের। শেষমাথার কোনায় কিচেন আছে। আসবাবপত্র তেমন একটা নেই কোথাও। তিনটা জায়গাতেই নজর বোলাল সে। অনতিদূরে আরেকটা হলওয়ে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ দিল সেখানে। লিভিং এরিয়ার বাঁ দিকে অবস্থিত সেটা। সদর দরজার সঙ্গে যে-হলওয়ে আছে, সেটার মতো না নতুন হলওয়েটা। বরং একটু যেন সরু। সেখানে হাজির হওয়ার পর একপ্রান্তে দেখা মিলল ছোট একটা বাথরুমের। আরেক প্রান্তে একটা বেডরুম আছে। সেখানে আছে একটা ডাবল বেড। চাদরটা টান টান করে বিছানো হয়েছে। এই কাজ বিশপের।

দূরের দেয়ালটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ড্রেসার। সেটার তিনটা ড্রয়ার খোলা, এবং তিনটাই খালি। বাথরুমের সিঙ্কটা ভেজা। চিরাচরিত প্রসাধনী সামগ্রী বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনোকিছুরই দেখা পাওয়া গেল না।

কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে পুলের। মনে হচ্ছে, এই জায়গায় কিছু সময়ের জন্য ছিল বিশপ। মনে হচ্ছে, জায়গাটা ওই লোকের জন্য একটা অভয়াশ্রম ছিল যেন। লোকটা কল্পনাও করেনি, তার দরজায় হাজির হয়ে যাবে এফবিআই-এর একজন এজেন্ট। সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছে লোকটা। আর তাই প্রথম সুযোগেই কেটে পড়েছে।

মোবাইল ফোনের খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল পুল। গায়েব হয়ে গেছে ওটা।

হলে ফিরে এল সে। ভাবছে, বিশপের সঙ্গে যখন ধস্তাধস্তি করছিল, তখন হয়তো কোথাও পড়ে গেছে ফোনটা। কিন্তু না, এখানে কোথাও নেই ওটা।

ডিনার।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল পুল। হাতল ধরে মোচড় দিল।

লক করে দেয়া হয়েছে।

যখন বেরিয়ে গেছে বিশপ, সময় খরচ করে লাগিয়ে দিয়ে গেছে ডেডবোল্টটা।

থাম্ব ল্যাচটা কিছুক্ষণ হাতড়াল পুল। যা-যা করছে সে, সেসব কাজের ওপর এখনও নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই।

খুলে গেল দরজাটা। শীতের বাতাস যেন একছুটে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

রাস্তার আরেক ধারে, পরিত্যক্ত সেই বাড়ির দরজাটা খুলে হাঁ হয়ে আছে।

রাস্তা ধরে ছুট লাগাল পুল। সামনের দিকে তাক করে রেখেছে হাতেধরা পিস্তল। প্রতিবেশী বাড়ির জানালার পর্দাটা যে নেমে এল জায়গামতো, সেটা যেন বুঝতে পারল আংশিকভাবে। টেলিভিশনের বিশাল সবুজ ডিসপ্লেটা যেন হাইলাইট করে দিয়েছে সেই-বাড়ির-অধিবাসী মহিলার শরীরকে; যে-গম্ব টুর্নামেন্ট চলছিল সেখানে, গাড়ির বিজ্ঞাপনবিরতির জন্য বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেটা।

থমথমে নীরবতা যেন জেঁকে বসেছে পরিত্যক্ত ওই বাড়িতে; ডিনারের নাম ধরে যে চেষ্টা ডাকছে পুল, সুনসান সেই বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়ে চিৎকারটা ওর কানে এসে লাগার আগপর্যন্ত ঠাহর করতে পারল না ব্যাপারটা। ডিনারের নিখর শরীরটাও চোখে পড়ল না প্রথমে। যখন নজরে পড়ল ওটা, দেখতে পেল, লিভিং রুমের দেয়ালের একটা কোনা ঘেঁষে যেন ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ডিনারকে; তার ঘাড়, কোট আর শার্ট ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে রক্তে।

৬৭.
পুল
তৃতীয় দিন, দুপুর ২:২৬

রক্ত এখনও গরম আছে।

ডিনারের ঘাড়ে তর্জনীটা চেপে ধরল পুল। কী জানতে পারবে, সেটা ইতোমধ্যেই জানা হয়ে গেছে ওর। তারপরও চেক করে দেখার একটা তাড়না অনুভব করছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডিনারের নিম্ন্ত্রণ একটা চোখ। বাঁ দিকের চোখটা বের করে ফেলা হয়েছে, ওই জায়গায় যেন মুখব্যাদান করে আছে কালো একটা শূন্যস্থান। গায়েব হয়ে গেছে ডিনারের বাঁ কান আর জিহ্বাটা।

ডিনারের খুঁতনির ঠিক নিচে, রেট্রোম্যাড্রিবুলারটা শ্রেফ চুপসে দিয়েছে বিশপ। তারপর একটানে চিরে ফাঁক করে দিয়েছে নিচের দিকে, ফলে খুলে হাঁ হয়ে গেছে ধমনীটা। ডিনারের হাত আর বাহু মাখামাখি হয়ে আছে রক্ত দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, রক্তপ্রবাহ থামানোর চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা প্রমাণিত হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে খুব সম্ভব এক মিনিটের মধ্যেই মারা পড়েছে বেচার।

ডিনারের শোল্ডার হোলস্টার থেকে এখনও উঁকি দিচ্ছে তার পিস্তলের বাঁট, দেখতে পাচ্ছে পুল। তার মানে, কোনো না কোনো এক কায়দায় তাকে চমকে দিয়েছিল বিশপ... আগ্নেয়াস্ত্র বের করার সময়টুকুও পায়নি বেচার। সদর দরজা থেকে যদি কোনো আওয়াজ শুনেও থাকে ডিনার, হয়তো ধরে নিয়েছিল, পুল ফিরে এসেছে।

গায়েব হয়ে যাওয়া কান আর চোখের শূন্যস্থানে এখনও লেপ্টে আছে কিছু রক্ত। বোঝা গেল, ডিনার মারা যাওয়ার পর তার কান কেটে নেয়া হয়েছে, চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

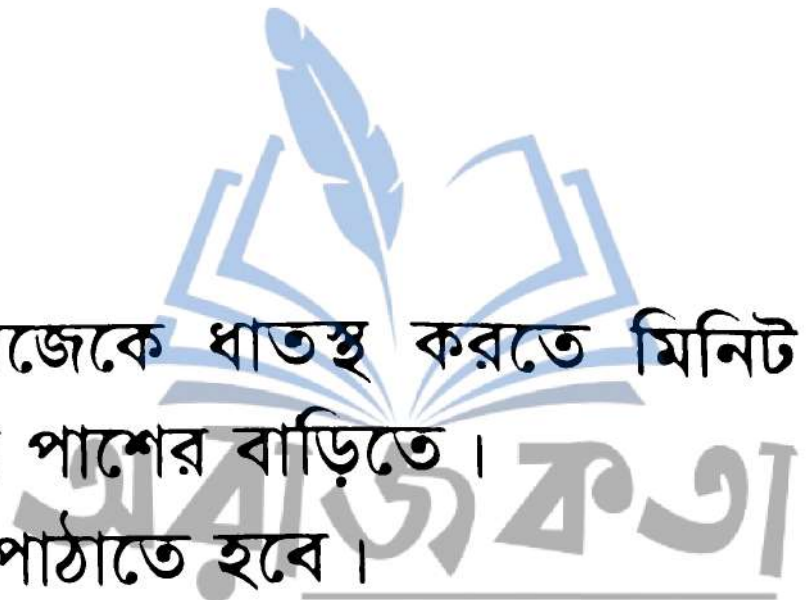
এবং ওসব খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হলো না পুলকে।

সেই ড্রাইওয়ালের গায়ে লেখা গ্রাফিতির কোনো কোনো জায়গা কেটে ফেলা হয়েছে, সেসব জায়গায় তৈরি করা হয়েছে চারটা বর্গক্ষেত্র। কালো মার্কারে লেখা কবিতাগুলোর সর্বনাশ করে ফেলেছে বিশপ; ওই চার অঙ্ককার শূন্যস্থানের তিনটা পূরণ করেছে ডিনারের চোখ, কান আর জিহ্বা দিয়ে।

পুলের বুকের ভেতরে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে আরম্ভ করেছে ওর হৃৎপিণ্ডটা। হঠাৎ করেই ব্যথা করেছে ঘাড়ের পেছনের ফুলেওঠা জায়গাটা। ঝুঁকে পড়ল সে। মোবাইল ফোনের খোঁজে হাতড়াচ্ছে ডিনারের শরীর।

নেই।

যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, হঠাৎ চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা, মনে হলো ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবে। হাত বাড়িয়ে দিল দেয়ালের উদ্দেশে। নোংরা ধুলোবালির স্পর্শ পেল আঙুলের ডগায়।



শক্তি ফিরে পেয়ে নিজেকে ধাতস্থ করতে মিনিট দশেক লেগে গেল ওর
তারপর হাজির হতে পারল পাশের বাড়িতে।
সাহায্যের জন্য খবর পাঠাতে হবে।

‘লিবি ম্যাকিনলের সঙ্গে কেন জোট বেঁধে কাজ করতে যাবে বিশপ?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

‘তার চেয়েও বড় কথা, বিশপের সঙ্গে কেন জোট বাঁধতে যাবে লিবি ম্যাকিনলে? মেয়েটার বোনকে খুন করেছে ওই লোক,’ বলল ন্যাশ।

নিজেদের সেই অফিসকক্ষে ফিরে এসেছে ওরা।

ট্রাক চালানো অবস্থায় বিশপের যে-ছবি পাওয়া গেছে, সেটা বড় করা হয়েছে, তারপর প্রিন্ট করা হয়েছে। এখন একটা হোয়াইটবোর্ডের গায়ে টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে সেটা। ঘরের সামনের দিকে রাখা হয়েছে সেই বোর্ড।

‘এই ব্যাপারটা এফবিআই-এর সঙ্গে শেয়ার করা উচিত আমাদের,’ বলল ক্রোজ। কনফারেন্স টেবিলের ধারে বসেছে সে। ‘ফোর মাস্কি কিলারের সঙ্গে যোগসূত্র আছে এই কেসের। কাজেই এই ব্যাপারটা জানা দরকার এফবিআই-এর।’

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ক্রেয়ার আর ন্যাশ দু’জনই।

আত্মরক্ষা করার কায়দায় দু’হাত তুলল সে। ‘কী? এই খবর তো গোপন রাখা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।’

‘লিবি ম্যাকিনলে এখন কোথায়? জেলখানার বাইরে, তা-ই না? কোনো প্যারোল অফিসার কি আছে মেয়েটার? অথবা এমন কেউ কি আছে, যে-লোক নজর রাখছে ওই মেয়ের গতিবিধির ওপর?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

নিজের ল্যাপটপটা আরেকটু কাছে টেনে নিল ক্রোজ। কিবোর্ডের কয়েকটা কি চাপল। আর তারপরই সাদা হয়ে গেল তার চেহারা।

‘কী?’

বড় বড় হয়ে গেছে ক্রোজের চোখ। স্ক্রিনে যে-লেখা দেখতে পাচ্ছে, চটজলদি নজর বোলাচ্ছে সেটার ওপর। ‘এই খবর তো মোটেও ভালো কিছু না।’

মাথা নাড়ল ক্রেয়ার। ঘরের এ-মাথা থেকে হাজির হলো ও-মাথায়। ল্যাপটপের স্ক্রিন ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে যাতে পড়তে পারে।

‘পড়তে থাকুন। ওই খবর পড়া সম্ভব না আমার পক্ষে,’ বলল ক্রোজ।

একটা হাত তুলল ক্রেয়ার, চুপ করিয়ে দিল ক্রোজকে।

চাকা লাগানো চেয়ারে আলতো ঠেলা মারল ক্রোজ, সরে গেল টেবিল থেকে কিছুটা দূরে।

‘ধেং, ধেং, ধেং,’ শেষপর্যন্ত কথা ফুটল ক্রেয়ারের মুখে। যা বলছে দ্রুত বলছে, বলার ভঙ্গিতে ক্রোধ স্পষ্ট। ডিসপ্লেটা ঘুরিয়ে দিল ক্রোজের দিকে।



‘হ্যাঁ,’ বলল ক্রোজ।

‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ। হাজির হয়েছে ক্রেয়ার আর ক্রোজের পেছনে।

‘গতকাল রাতে পুল এবং তার বন্ধুরা মৃত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছে স্মিথ ম্যাকিনলেকে। মেয়েটার চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে, কান আর জিভ কেটে ফেলা হয়েছে। মেরে ফেলার আগে নির্যাতনও চালানো হয়েছে তার ওপর,’ জবাবে বলল ক্রেয়ার।

দ্রুত কৌচকাল ন্যাশ। ‘লিবি আর বিশপ যদি একসঙ্গে কাজ করে থাকে, তা হলে ওই মেয়েকে কেন খুন করবে লোকটা? আমি তো মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না এসবের।’

‘বিশপের কোন কাজটারই বা মাথামুণ্ড বোঝা যায়, বলুন?’ দরজার দিকে তাকাল ক্রেয়ার। আসলে তাকাল হলের আরেক প্রান্তে অবস্থিত সেই অফিসকক্ষের দিকে, যেটা আপাতত দখল করে রেখেছে এফবিআই-এর অফিসাররা। ‘ওই লোকগুলো এই খবর আমাদেরকে জানাল না কেন?’

শব্দ করে দম ছাড়ল ক্রোজ। ‘মাত্র দুই সেকেন্ড আগেও আপনি চাইছিলেন, বিশপের ব্যাপারে যা-যা জানতে পেরেছি আমরা, সেসব নিজেদের মধ্যেই রেখে দিতে। অথচ এখন নিজেই বলছেন, লিবি ম্যাকিনলের হত্যাকাণ্ডের খবর আমাদেরকে জানাল না কেন এফবিআই?’ দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে দিল সে। ‘এই কেসটা ওদেরও, আমাদেরও। একই কেস, তারপরও দু’রকম।’

‘এখন পর্যন্ত।’

‘হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত।’

আরও একবার ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় গিয়ে হাজির হলো ক্রেয়ার। দরজার কাছে পৌঁছে উঁকি দিয়ে তাকাল হলের দিকে। ‘গতকাল থেকে এফবিআই-এর কোনো লোককে দেখিনি। আপনারা কেউ দেখেছেন? তাদের অফিসকক্ষের দরজাও বন্ধ।’

‘পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্টে সেই যে দেখেছিলাম, তারপর আর তাদের কাউকে দেখিনি আমি,’ বলল ন্যাশ।

ওর দিকে ঘুরল ক্রেয়ার। ‘স্যামের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না, আবারও চেষ্টা করে দেখা উচিত আমাদের।’

ফোন বের করল ন্যাশ। ডায়াল করল। এক মুহূর্ত পর মাথা নাড়ল। ‘এখনও ভয়েস মেইল পাওয়া যাচ্ছে। জবাব দিচ্ছে না কেউ।’

‘পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্টে একবার যাওয়া দরকার আমাদের,’ বলল ক্রোজ। ‘কিছু একটা গুণগোল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’

‘আমি তো ভেবেছিলাম, ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে এক রকমের ভয় ছিল তোমার মনে,’ বলল ক্রেয়ার।

‘সেটা এক ঘণ্টা আগের ঘটনা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা গুণগোল হয়েছে।’

নিজের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লের দিকে এখনও তাকিয়ে আছে ন্যাশ। ‘কাজ ঠিকই বলেছে। কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে আমারও। স্যাম সাধারণত এ-রকম কিছু করে না... সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আড়ালে লুপে যায় না। অন্তত আমাদের কারও না কারও ফোনকলের জবাব দেয়ার কথা ওর।’

শব্দ করে দম ছাড়ল ক্লেয়ার। ‘ঠিক আছে। আমাদের পরবর্তী কাজ কী হবে, সেটা ঠিক করি আগে। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে স্যামের অ্যাপার্টমেন্টে যাবো।’

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘ঠিক আছে।’

হোয়াইটবোর্ডের কাছে ফিরে গেল ক্লেয়ার। ‘আমরা এবার আমাদের মনোযোগ এখানে দিই। যত ডটচিহ্ন পেয়েছি, দাগ টেনে সেসব জোড়া লাগাতে হবে একটা আরেকটার সঙ্গে। সবকিছু এই যে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে, আমাদের বুঝতে হবে, এখানে বিশপের ভূমিকাটা আসলে কী।’

কে যেন টোকা দিল দরজায়। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওরা তিনজনই। সোফি রদ্রিগেজ দাঁড়িয়ে আছে গোবরাটে।

ক্লেয়ার টের পেল, ঝুলে পড়েছে ওর চেহারা। বিড়বিড় করে বলল, ‘ওহ না।’

ভেতরে ঢুকে পড়ল সোফি। চোখের নিচটা কেমন ফুলে আছে। হাত দুটো অনেকটা অসাড়ের মতো ঝুলছে শরীরের দু’পাশে। ‘মিনিট দশেক আগে একটা ফোনকল পেয়েছি আমি। ল্যারিসা বিয়েল। বয়স অন্য মেয়েদের মতোই। আজ রাতে স্কুলের একটা নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়ার কথা ছিল মেয়েটার। তার মা চমকে দিতে চেয়েছিল তাকে। আর তাই আজ দু’জনের জন্যই স্পা’র ব্যবস্থা করেছিল। সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য অফিসে গিয়েছিলেন মহিলা। যখন বাসায় ফিরে আসেন, দেখতে পান, ল্যারিসা নেই। মেয়েটার বন্ধুদেরকে ফোন করা শুরু করেন তিনি। তাদের কেউই দেখেনি মেয়েটাকে। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মেয়েদের ব্যাপারে আজকাল খবর প্রচার করা হচ্ছে নিয়মিত, সেসব দেখেছেন ল্যারিসার মা, আর তাই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এবং ফোন করেন মিসিং চিলড্রেনে।’ একটা মুহূর্তের জন্য থামল। ‘আমি ঠিক জানি না... হতে পারে আগেই খারাপ একটা ধারণা করে ফেলছি... তবে ব্যাপারটা ঠিক ভালো ঠেকছে না আমার। মনে হচ্ছে, কোথাও কোনো একটা ঘাপলা আছে।’

‘মেয়েটাকে শেষ কবে বা কখন দেখা গিয়েছিল?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

‘তার মা বলেছেন, তিনি যখন আজ সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন, মেয়েটা নাকি তখনও ঘুমিয়ে ছিল। সকাল সাড়ে ছ’টার কথা সেটা। মেয়েটার বাবা বলেছেন, তাঁদের বাসায় কোথাও নাকি জোর করে ঢুকে পড়ার কোনো চিহ্ন নেই।’

এবং তাঁর কথা অনুযায়ী, ওই মেয়ের ঘরটা দেখতে নাকি “স্বাভাবিক” ছিল। শুধু লাপাত্তা হয়ে গেছে মেয়েটার বুট, কোট আর ফোন।’

নিজের কোটটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ। ‘ল্যারিসার মা-বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরকে। কাজটা যদি বিশাপেক্ষ হয়, তা হলে তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন অন্যদের মতো।’

দ্রুত কোঁচকাল সোফি। ‘কেন আপনার মনে হচ্ছে এই কাজ বিশাপেক্ষ?’

‘চলুন, যেতে যেতে কথা বলি।’ ক্লোজের দিকে তাকাল ন্যাশ। ‘ক্লোজ...’

নিজের কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্লোজ। ‘আপনি যা বলতে চাইছেন, সেটা নিয়ে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছি আমি। মিস্টার বিয়েন্ডের নামে যেসব শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়েছে গত দু’সপ্তাহে, খুঁজছিল সেসব।’ তাকাল সোফির দিকে। ‘ওই দম্পতির নামের প্রথম অংশটা কী?’

‘ডার্লিন এবং ল্যারি,’ বলল সোফি।

‘ল্যারিসার মোবাইল ফোনের নম্বর আছে আপনার কাছে? আমি তা হলে ওই নম্বর ট্রেস করার কাজটা শুরু করে দিতে পারি।’

টুং করে একটা আওয়াজ উঠল ক্লোজের মোবাইলে।

ওকে সোফি বলল, ‘আপনাকে টেক্সট করে দিয়েছি নম্বরটা। আর ওই মেয়ের বাসার ঠিকানাও দিয়েছি।’

‘কয়েকজন পুলিশ অফিসার পাঠিয়ে দাও ওই ঠিকানায়। আমরাও যে যাচ্ছি সেখানে, জানিয়ে দিয়ো তাদেরকে,’ চিৎকার করে বলল ক্লোজ।

তারপর ন্যাশ আর সোফিকে নিয়ে ছুট লাগাল হলওয়ার উদ্দেশে।

ওই ছিন হাউসের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পুল। মানে, বিশপের বাসায়। ঘাড়ের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে একটা আইস প্যাক। হাজির হয়ে গেছে এফবিআই-এর এজেন্টরা। সারা বাড়ি টেপ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে তারা। ঘিরে দিয়েছে রাস্তার অপর প্রান্তের পরিত্যক্ত বাড়িটাও। এখন দুটো বাড়িতেই যেন পোকামাকড়ের মতো কিলবিল করছে তারা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পুল। দেখছে, ডিনারের নিষ্প্রাণ দেহটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা স্ট্রচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই লাশ, বড়জোর মিনিট ত্রিশেক আগে। তবে তার আগে প্রমাণ বলতে যা-কিছু পাওয়া গেছে, সব জোগাড় করা হয়েছে। ক্রাইম সিনের বিস্তারিত বিবরণ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গোলাপি রোব পরিহিত সেই মহিলা একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসেছে তার পিকচার উইন্ডোর ধারে। তার হাতে একটা মগ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এফবিআই এজেন্টদের কাজকর্ম। টিভির সেই গল্প টুর্নামেন্টের কথা অনেক আগেই ভুলে গেছে সে। এজেন্টরা হাজির হওয়ামাত্র ওই মহিলার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। কিন্তু পুলকে যা বলেছে মহিলা, তার বাইরে আর কিছু জানা যায়নি।

স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ ফস্টার হার্লস দাঁড়িয়ে আছে পুলের পাশে। বেশিরভাগ সময়ই চোখমুখ কুঁচকে রাখে সে, এখনও রেখেছে। ‘কী ঘটেছে, আরেকবার বলো তো আমাকে।’

‘ড্রাইভওয়েতে কোনো গাড়ি দেখতে পাইনি আমি। তার মানে এখান থেকে যে বেরিয়ে গেছে বিশপ, পায়ে হেঁটে গেছে। হতে পারে, এখনও কাছাকাছি কোথাও আছে সে। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করছি আমি, ভালো কোনো কাজ করছি না আসলে,’ বলল পুল।

‘আগে আমাদের মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্টরা দেখবে তোমাকে, ছাড়পত্র দেবে, তারপর কাজে যোগ দিতে পারবে তুমি। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আমাদের একজন এজেন্ট মারা পড়েছে। লোক লাগিয়ে দিয়েছি আমি, তারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কথা বলছে। বাইরে যে-তুমার জমেছে, সেখানে মাত্র দু’জায়গায় জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে... ওয়াকওয়েতে, আর ড্রাইভওয়েতে। এখানে গ্যারেজ বলতে কোনোকিছু নেই। এই জায়গা ছোটই বলা চলে।’

‘তবে একজায়গায় একটা গাড়ি দেখেছিলাম আমি।’

‘নিজের গাড়িটা হয়তো রাস্তায় পার্ক করে রেখেছিল বিশপ। এই রাস্তার এখানে-সেখানে কয়েকটা গাড়ি আছে।’

পুল কিছু বলল না।

‘আবার বলো আমাকে পুরো ঘটনা।’



‘বলার মতো তেমন কিছু নেই আসলে। ওই নকল পরিচয়ের সূত্র ধরে একটা ঠিকানা পেয়ে যাই আমরা। মানে, রাস্তার ও-প্রান্তের সেই পরিত্যক্ত বাড়িটার কথা বলছি। গেলাম সেখানে, কিন্তু কাউকে পেলাম না। এখানকার প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার অপ্রীতিকর কাজের দায়িত্বটা এবার পালন করতে হয় আমাকে। ডিনার ঠিক করে, ওই বাসার ভেতরের কিছু ছবি তুলবে। বিশেষ করে গ্রাফিতিওয়ালা সেই দেয়ালগুলোর। আমি তখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে পড়ি। এক মহিলার সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, এই বাসায় এক লোক থাকে, আর সে-ই নাকি ওই পরিত্যক্ত বাসার ঠিকানায় যেসব চিঠি আসে, সেসব জোগাড় করে নিজের কাছে রাখে। আমি ঘুণাঙ্করেও কল্পনা করিনি, দরজা খুলবে বিশপ। আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল সে। ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছে আমার। টেবিলের ভাঙা পায়টা যখন হাতে নিল সে, তখন আর পেরে উঠলাম না তার সঙ্গে। জ্ঞান যখন ফিরল আমার, পুরো বাসা খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না ওকে। তখন গিয়ে হাজির হলাম পরিত্যক্ত সেই বাসায়। খুঁজে পেলাম স্পেশাল এজেন্ট ডিনারের লাশ।’

‘তার মানে হচ্ছে, তোমার জানা হয়ে গিয়েছিল, কেউ একজন ওই পরিত্যক্ত বাসার ঠিকানা কাজে লাগিয়ে চিঠিপত্র সংগ্রহ করছে। তোমার জানা হয়ে গিয়েছিল, কেউ একজন এই বাসায় থাকছে এবং সে-লোকই ওই চিঠিপত্র হাতিয়ে নিচ্ছে। এরপরও হাজির হলে তুমি এই বাসায়, তা-ও আবার ব্যাকআপ ছাড়া?’

পুল টের পেল, লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা। ‘কোনো বিপদ যে হতে পারে, সে-রকম মনে করার কোনো কারণই ছিল না আমার। আর বিশপের কথা যদি বলি, কল্পনাও করিনি, এখানে থাকবে ওই লোক।’

‘কী যেন বললে তুমি তখন? বিশপ আশা করছিল, এখানে হাজির হবে স্যাম পোর্টার? শিকাগো মেট্রোর সেই ডিটেকটিভ?’

‘সে আমাকে যা বলেছে, তা যদি ভুল বলি... “আপনি স্যাম পোর্টার না।” এই কথার মানে কী, আমি নিশ্চিত না।’

‘কথাটার মানে হচ্ছে, এই বাসার দরজায় যদি এসে দাঁড়াত স্যাম পোর্টার, তা হলে আশ্চর্য হতো না বিশপ।’

মাথা নাড়ল পুল। ‘আপনি কী ভাবছেন, জানি আমি। কিন্তু কথা হচ্ছে, পোর্টার একজন ভালো পুলিশ অফিসার। হতে পারে, কয়েকটা ভুল করে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু বিশপের এসব কাজের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত না লোকটা। আমার-আপনার মতো তিনিও চান, বিশপকে খুঁজে বের করা হোক। আর কিছু না।’

নিজের থুঁতনিতে হাত দিল হার্লস। ‘হয়তো, আবার হয়তো না। একটা কথা জানতে পেরেছি আমি। কয়েক মাস আগে একটা লাশ পাওয়া গিয়েছিল... মানে, বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল যে-লোক তার কথা বলছি... সবাই তাকে ফোর মাস্কি কিলার হিসেবে ধরে নিয়েছিল। জানতে পেরেছি, ওই লোকের কাছ

থেকে নাকি একটা ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়েছিল, ডায়েরিটা বিশপের। অথচ এভিডেন্স লিস্টে ওই জিনিসের কোনো উল্লেখই করেনি পোর্টার কখনও। রিপোর্টে বলা হয়েছে জিনিসটার কথা। কিন্তু মেট্রো পুলিশের দখলে নেই সেই ডায়েরি।’

‘আমার কথা হচ্ছে, ও-রকম একটা প্রমাণ কেন নিজের কাছে রেখে দেবেন পোর্টার?’ জিজ্ঞেস করল পুল।

‘আর আমার কথা হচ্ছে, বিশপ কেন আশা করবে, তার দরজায় এসে দাঁড়াবে পোর্টার?’

ব্যথায় চেহারা কুঁচকে ফেলল পুল। ঘাড়ের সঙ্গে আরও জোরে চেপে ধরেছে আইস প্যাকটা। ‘বলুন তো, ওই ডায়েরি যদি নিজের কাছে রেখে দেয়ার পরিকল্পনাই করে থাকবেন পোর্টার, তা হলে রিপোর্টে ওটার কথা উল্লেখ করলেন কেন তিনি?’

‘ওই ডায়েরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ডিটেকটিভ ন্যাশের রিপোর্টে, পোর্টারের রিপোর্টে না। তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার টাইপ-করা একটা ডকুমেন্ট আছে পোর্টারের, সেটাতে একবারের জন্যও ডায়েরিটার কথা বলেনি সে।’

এগিয়ে এল একজন ক্রাইম সিন টেকনিশিয়ান। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল এসএআইসি হার্লসের পাশে। অপেক্ষা করছে কখন পুলের সঙ্গে কথা বলা শেষ করবে হার্লস। মেয়েটার দিকে তাকাল পুল আর হার্লস। মুখ খুলল মেয়েটা।

‘স্যর, এখানে প্রাথমিক যেসব কাজ করার কথা ছিল আমাদের, শেষ করেছি আমরা। কোথাও কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। তবে একজাতের আঠালো পদার্থের অবশিষ্টাংশ পেয়েছি কয়েক জায়গায়। তার মানে হচ্ছে, বিশপ যখন থাকত এখানে, খুব সম্ভব গ্লাভস পরে থাকত। আর... এ-রকম কয়েক জায়গার খোঁজ পাওয়া গেছে, যেসব জায়গা মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে।’

‘আমাকে টেবিলের যে-পায়া দিয়ে বাড়ি মেরেছিল লোকটা, সেটার খবর কী?’ জিজ্ঞেস করল পুল। ‘ওটাতে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকার কথা...’

‘মুছে ফেলা হয়েছে,’ বলল মেয়েটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল পুল। যে-মুহূর্তে করল ওই কাজ, সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ হলো ওর... কেন করতে গেল কাজটা। প্রচণ্ড একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘাড়ে। ‘বাথটাব অথবা শাওয়ার? সেখানেও কোনো আঙুলের-ছাপ পাওয়া যায়নি? হতে পারে, বিশপ গোসল করেছিল সেখানে?’

‘বাথটাবটা খটখটে শুকনো। ধোওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, এমন রাসায়নিক পদার্থের দাগ পাওয়া গেছে সেখানে। আমাদের ধারণা, ওটা ব্যবহার করার পর ধুয়েমুছে একেবারে সাফ করে রেখেছে লোকটা। বাথরুম আর কিচেনে যে-দুটো সিঙ্ক আছে, দুটোরই একই অবস্থা। তবে যেখানে যত পাইপ পেয়েছি আমরা, সব খুলে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি... যদি ভেতর থেকে কিছু পাওয়া যায় আর কী। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কাজে লাগিয়ে বাসার ভেতরের সবকিছু পরিষ্কার করেছি আমরা।



আশা করছি, কিছু না কিছু পেয়ে যাবো।’ আশ্বস্ত করার কায়দায় বলল মেয়েটা-
‘নিজেকে পুরোপুরি লুকিয়ে রাখা সম্ভব না কারও পক্ষেই।’

‘এখানে ঠিক কতদিন ছিল ওই লোক, জানার কোনো উপায় আছে?’ জানতে চাইল পুল।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। ‘এক মুহূর্তের নোটিশে এই বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় ছিল সে। এবং যখন এখান থেকে চলে গেছে, মনে হয় না দশ মিনিটের বেশি সময় নিয়েছে। হতে পারে, এখানে কয়েক দিন ধরে ছিল সে। অথবা হয়তো ছিল কয়েক মাস ধরে।’

‘রাস্তার অপর প্রান্তে থাকে, এ-রকম এক মহিলার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সে বলেছে, আজ থেকে ছ’মাস আগেও নাকি বিশপকে দেখেছে এই জায়গায়।’

‘তার মানে ফোর মাস্কি কিলার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে থেকেই এই বাড়ি একটা সেফ হাউস হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল বিশপ।’

‘দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে। প্রোপার্টি রেকর্ড অনুযায়ী, ট্যালবট এন্টারপ্রাইজের একটা সম্পূরক প্রতিষ্ঠান এই বাড়ির মালিক। গত প্রায় দু’বছর ধরে এই এলাকায় বিভিন্ন বাড়ি কিনে আসছিল প্রতিষ্ঠানটা। এবং ভাড়া দেয়ার কাজে লাগাচ্ছিল এসব বাড়ি। যখন কোনো ভাড়াটে থাকত না, তখনও বিদ্যুৎ চালানো হতো এসব বাড়িতে, যাতে, যেসব পাইপ আছে, সেসবের ভেতরটা জমে বরফে পরিণত না হয়। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছিল... পুরো এলাকা পরিণত হয়েছিল গৃহহীন আর অবৈধ দখলদারদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। যা হোক, বিশপকে শুধু যা করতে হয়েছিল তা হলো, এই বাসার সদর দরজার তালাটা খুলে ফেলতে হয়েছিল কৌশলে। তারপর এখানে যখন খুশি তখন আসত সে, যখন খুশি তখন যেত। সে যদি ছদ্মবেশ ধারণ করেও থাকে, সেটা এ-রকম আবহাওয়ায় ঠাहर করা মুশকিল। কারণ এখন সবারই পরনে কয়েক প্রস্থ কাপড়। কাজেই বিশেষ কোনো একজন লোককে আলাদা করে চিনে নেয়াটা বলতে গেলে অসম্ভব।’

‘আমি কী ভাবছি, জানেন? আমি ভাবছি, ফোর মাস্কি কিলার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা আগেই যদি এই সেফ হাউস চালু করে থাকে বিশপ, তা হলে অন্য আরও জায়গায় এ-রকম আরও বাসা থাকতে পারে তার।’

‘হুঁ, আমারও তা-ই মনে হয়।’

ওই টেকনিশিয়ান মেয়েটার দিকে তাকাল পুল। ‘মোবাইল ফোনের ব্যাপারে কিছু জানা গেল? আমার আর এজেন্ট ডিনারের মোবাইল ফোন দুটো নিয়ে গেছে বিশপ।’

‘আজ দুপুর দু’টা চব্বিশ মিনিটের পর থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই ওই মোবাইল দুটোতে,’ বলল মেয়েটা।

আইস প্যাকটা নামাল পুল। তাকাল এসএআইসি হার্লসের দিকে। ‘আমরা কি ওই পরিত্যক্ত বাড়িটাতে যেতে পারি? গ্রাফিটিওয়ালা ওই দেয়াল আরেকটু ভালোমতো দেখতে চাই আমি।’

ডিনারের লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরও রক্তের লাল দাগ রয়ে গেছে। ওই লোকের কণ্ঠ ছিল বিষণ্ণ প্রকৃতির; সেটা যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে পুল। লোকটার চলনভঙ্গি যেন ভাসছে চোখের সামনে। একটুখানি হলেও আশা জাগল মনে, এই বাসার পেছনদিকের কোনো একটা ঘর থেকে অন্য ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেটরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসবে ওই লোক।

কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। ঘটার কথাও না।

ইঙ্গিতে সেই গ্রাফিতি দেয়াল দেখিয়ে দিল এসএআইসি হার্লস। ‘বর্গাকারে কাটা হয়েছে এই দেয়ালের চারটা জায়গা। এ-ব্যাপারে কী বলার আছে তোমার, বলো তো?’

ধুলো-ময়লায় ভর্তি সেই দেয়ালের একটা কোনায় এখনও সেভাবেই রয়ে গেছে ডিনারের একটা চোখ। দেখে মনে হচ্ছে, ওই চোখ ওখানে রেখে দেয়ার আগে বিশপ অনিশ্চয়তায় ভুগছিল যেন। ৩৭ নম্বরযুক্ত একটা ট্যাগ রেখে দেয়া হয়েছে চোখটার পাশে।

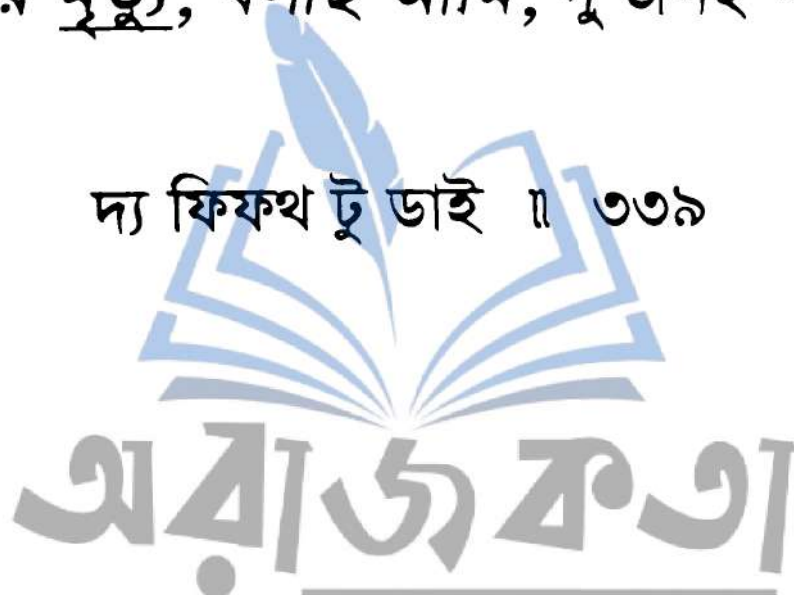
আঙুলের ডগার সাহায্যে গর্তের মুখ দেখিয়ে দিল পুল। ‘এখানে ডিকিনসনের একটা কবিতা লেখা ছিল। কালো মার্কার অথবা শার্পি কাজে লাগিয়ে লেখা হয়েছিল সেটা। তাতে বলা হয়েছিল:

আমি থামতে পারিনি, অথচ এসেছিল মরণ,
তাই সে নিজ দয়ায় করল আমায় স্মরণ;
ওই বাহনে শুধু আমাদের হয় ঠাই
এবং অমরত্বকেও সেখানে খুঁজে পাই।”

দেয়ালের দ্বিতীয় গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল সে। সেখানে এখন শুয়ে আছে ডিনারের কান। পাশে ট্যাগ লাগানো হয়েছে ৩৮। ‘এখানে লেখা ছিল হানশানের একটা কবিতা:

জীবন ও মৃত্যুর একটি উপমা আমি জানি,
সদৃশ তারা; যেমন বরফ আর পানি।
বরফে জমাট বাঁধে পানির সব বিন্দু,
সে-বরফই গলে আবার হয় কোনো জলসিন্ধু।
যা মারা যায়, পুনর্জন্ম নিশ্চিত তার,
যা জন্মে, তা মরে যায় কখনও আবার।
বরফ আর পানি কেউ করে না একে-অপরের ক্ষতি,
জীবন আর মৃত্যু, বলছি আমি, দু’জনই সুন্দর অতি।”

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৩৯



অরাজকতা



তৃতীয় গর্তের কাছে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে রাখা হয়েছে ডিনারের জিন্দা
পাশের ট্যাগে নম্বর লেখা আছে ৩৯।

পুল আউড়াতে লাগল:

চলো বাসায় প্রত্যাবর্তন করি, চলো ফিরে যাই,
চাওয়া-পাওয়ার এই হিসেবকে বলি ধেং ছাই,
আনন্দ আজ যেন সঙ্গী হয়েছে ত্বরণের।
ওদিকে নীল মহাসাগর থেকে মরণের
জীবন বয়ে চলেছে অমৃতসুধার মতো।
জীবনে মৃত্যু আছে; মৃত্যুতে আছে জীবন অবিরত।
সুতরাং ভয় কীসের; কোথায় ভয়?
আকাশের পাখিরা গাইছে “মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়!”
অমরত্বের জোয়ার যেন দিন-রাতের সরণিতে,
নেমে আসছে এখানে... অসহ্য সুন্দর ধরণীতে।”

ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল গর্তের মুখটা। ‘বাসা, ভয় আর মৃত্যু... এ-তিনটা শব্দের
নিচে দাগ টানা ছিল। পুরনো একটা তিব্বতি কবিতা ওটা।’

চতুর্থ গর্তটার কাছে গিয়ে যখন হাজির হলো পুল, তখন রীতিমতো যেন
একটা আলোড়ন জাগল ওর ভেতরে। গ্রাফিতি দেয়ালের বেশ খানিকটা উঁচুতে,
হাতের ডানদিকে তৈরি করা হয়েছে এই গর্ত। এটার ভেতরে ডিনারের শরীরের
কোনোকিছু নেই। এটা ওই ড্রাইওয়ালের গায়ে একটা শূন্যস্থান ছাড়া আর কিছু না।
কিন্তু স্পষ্ট ঠাহর করা যায়, এই গর্ত তৈরি করেছে বিশপ নিজে। অন্য তিনটা গর্ত
তৈরি করার জন্য সতর্ক যে-কৌশল অবলম্বন করেছিল সে, একই কাজ করেছে এই
গর্তের বেলাতেও। বলতে গেলে নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র যেন হারিয়ে গেছে
দেয়ালের গা থেকে।

এখানে ঠিক কী লেখা ছিল, ভালোমতো দেখেনি পুল। অথচ অন্য তিনটা গর্ত
যেসব জায়গায় আছে, সেসব জায়গার বেলায় করেছিল কাজটা। কী লেখা ছিল,
পড়েছিল সময় নিয়ে। ভালোমতো খেয়াল করেছিল হাতের লেখাটা। মনের চোখ
দিয়ে এখনও যেন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে প্রতিটা অক্ষর। কিন্তু এই গর্তটা
ব্যতিক্রম। আগেরবার এখানে হাজির হওয়ার পর বড়জোর যা করেছিল সে...
চোখ তুলে একবার কেবল তাকিয়েছিল দেয়ালের দিকে।

‘এই গর্তের কী খবর?’ জিজ্ঞেস করল হার্লস। ‘এখানে কী লেখা ছিল?’

একটা হাত তুলল পুল, চুপ করিয়ে দিল হার্লসকে। তারপর বুজে ফেলল
চোখ। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছে। পরিত্যক্ত এই বাড়িতে যখন
চুকেছিল, তখন কী কী দেখেছিল, মনে করার চেষ্টা করছে। এই দেয়াল দেখেছিল।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৪০

কিন্তু দেয়ালের বিশেষ একটা জায়গা যেন দেখেও দেখেনি। এবং যা-যা দেখেছে, সচেতন কোনো কায়দায় মুখস্ত করার চেষ্টা করেনি সেসব। আত্মস্থ করার চেষ্টা করেনি। মনে পড়ে যাচ্ছে এলোমেলো ওসব চিত্রকর্মের কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে এমন কিছু শব্দ, যা কেবল একটুখানি দাগ রেখে গেছে ওর স্মৃতিতে।

বিশপ, তুমি কি আমাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছ? নাকি কিছু একটা গোপন করছ তুমি আমার কাছ থেকে? ভাবল পুল।

স্মৃতির পর্দায় আবারও দেয়ালটা দেখতে লাগল সে। প্রতিটা ইঞ্চি দেখছে। দেখছে নিজেকে... একটু একটু করে হেঁটে পার হচ্ছে দেয়ালটা। দেখছে, রঙের ফুটকি বলতে যা-কিছু ছিল দেয়ালে, সব যেন গুঁষে নিচ্ছে ওর চোখ দুটো। দেখছে, ঠিক এই জায়গার দিকে... দেয়ালের গায়ে যে-বর্গক্ষেত্র এখন একটা শূন্যস্থান ছাড়া আর কিছুই না... তাকিয়ে আছে সে। কালো রঙের একই রকম হস্তাক্ষর ছিল এখানে। বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল। হ্যাঁ, লেখাটা দেখতে পাচ্ছে সে; কিন্তু কেন যেন মনোযোগটা সরে যাচ্ছে বার বার। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... কোনো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে সে; সেটার যে-বিষয়, সেটা দেখা যাচ্ছে চোখের ঠিক সামনে, ছবির কেন্দ্রভাগে, কিন্তু বাকি সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কালো কালিতে লেখা সেই শব্দগুলোর ওপর মনোযোগ দিল সে। কী বোঝানো হয়েছে ওসব শব্দের সাহায্যে, সেটা আর জানতে চাইছে না এখন। শুধু দেখতে চাইছে শব্দগুলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না নজরে এল প্রতিটা শব্দ, ততক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখল সে। একটা একটা করে অক্ষর পরিষ্কার হচ্ছে ওর স্মৃতির পর্দায়, আর একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করছে সে উচ্চ কণ্ঠে: ‘শয়তানের সঙ্গে যতক্ষণ না হচ্ছে পরিচয়, ঈশ্বরের ভূমিকায় কী করে করবেন অভিনয়?’



তৃতীয় দিন, বিকেল ৫:২০

যেন হঠাৎ চমকে উঠে জ্ঞান ফিরে পেল কেটি কুইগলি। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ধীরে ধীরে। শেষ মুহূর্তটাতে যেন একটা কুয়ার ভেতর থেকে লাফিয়ে বাইরে এল ওটা... কুয়ার মুখ ভেঙে বেরিয়ে এল যেন। ফলে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য হলো বেচারী।

ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাঁধা হয়েছে পা দুটোও। দুই চোখ বেঁধে ফেলা হয়েছে কাপড়ের সাহায্যে। ওর শরীরের নিচে যে-জমিন, সেটা কেমন যেন ভেজা ভেজা। বাতাসে জঘন্য গন্ধ... মলমূত্রের এবং অন্য আরও কিছু একটার।

‘হ্যালো?’

মেয়েটার কণ্ঠ তার নিজের কাছেই কেমন যেন পাতলা মনে হলো। মনে হলো, কোনো আগন্তুক কথা বলে উঠেছে যেন। চাঁদিতে দপদপ করছে একটা ব্যথা। কেন হচ্ছে ও-রকম, একটা মুহূর্তের জন্য মনে করতে পারল না সে। তারপর, যা ঘটে গেছে, সব যেন বন্যার পানির মতো ছড়মুড় করে হাজির হলো চোখের সামনে। ভয়ঙ্কর কিছু স্মৃতি হামলে পড়ল যেন। মাথার একপাশে কাটা দাগওয়ালা সেই লোক... হলওয়ে ধরে ছুটে বেড়াচ্ছে মেয়েটার পেছন পেছন... মেয়েটাকে একসময় সজোরে ধাক্কা মেরে আছড়ে ফেলল দরজার গায়ে।

ঈশ্বর।

‘ওয়েজলি?’

একপাশ থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পেল মেয়েটা। মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে।

যে-কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছে ওর চোখ, সেটা ভেদ করে ক্ষীণ একটা আলো ঢুকছে ভেতরে। কিন্তু সে-আলো দেখতে পাওয়ার মতো যথেষ্ট না প্রকৃতপক্ষে। অস্পষ্ট কিছু আকৃতি ঠাহর করতে পারছে মেয়েটা। নজরে পড়ছে কিছু ছায়া। মনে হচ্ছে, দূরে যেন নাচানাচি করছে আজব কয়েকটা দানব।

‘ওয়েজলি? আছ নাকি আমার পাশে? ঠিক আছ?’

মনে পড়ে গেল, কুৎসিত ওই লোক যেন লাফিয়ে হাজির হয়েছিল টেবিলের আরেক প্রান্ত থেকে। হাতেধরা কোকোর মগটা আছড়ে ভেঙেছিল ওয়েজলির মাথায়। ভাঙনের আওয়াজটা ছিল প্রচণ্ড। আর তারপরই মেঝেতে আছড়ে পড়ে গিয়েছিল ওয়েজলি। তখন ছুট লাগায় মেয়েটা। ওয়েজলিকে সাহায্য করা উচিত ছিল ওর। কিন্তু তা না করে দৌড় দিয়েছিল। নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কথা ভাবছিল না তখন। ওর পেছন পেছন দৌড়ে আসছিল কুৎসিত লোকটা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৪২

‘আমি দুঃখিত, ওয়েজলি,’ নিচু গলায় বলল মেয়েটা। একটা ফোঁপানি যেন উঠে আসছে গলা বেয়ে। আটকে দিতে চাইছে মেয়েটার কথাগুলো।

কয়েক ফুট দূরে গুঁড়িয়ে উঠল কে যেন... ওয়েজলি না। কণ্ঠটা একটা মেয়ের। কেমন যেন চাপা ওটা। মৃদু। তারপরও কেটি বলে দিতে পারে, অন্য একটা মেয়ের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

‘কে? তুমি কে?’ হাঁটু দুটো চেহারার কাছে তুলে আনল কেটি। হাঁটু কাজে লাগিয়ে চোখের পট्टি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ব্যর্থ হলো তার সে-চেষ্টা। ভালোমতো বাঁধা হয়েছে পট्टিটা। শক্ত করে বাঁধা হয়েছে।

শরীরটাকে একটা গুঁয়োপোকাকার মতো মুচড়ে মুচড়ে ওই কণ্ঠের উদ্দেশ্যে এগোনোর চেষ্টা করতে লাগল মেয়েটা। পা দুটো কাজে লাগিয়ে ঠেলা মারছে শরীরের বাকি অংশে। প্রতিটা নড়াচড়ার সঙ্গে যেন আতর্জিতকার করে উঠছে চাঁদির সেই ব্যথা। বমি-বমি একটা ভাব যেন তরঙ্গের মতো ছুটে আসছে মেয়েটার দিকে। তারপরও থামল না সে। এগিয়ে চলল ওই কণ্ঠের উদ্দেশ্যে। একসময় তার একটা হাত ঘষা খেল কোমল কিছু একটার সঙ্গে। উষ্ণ কিছু একটার সঙ্গে।

আরেকটা মানুষের চামড়ার স্পর্শ পাওয়ামাত্র যেন ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল অন্য মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে কোনো একজাতের কম্বল অথবা লেপ দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিল সে কেটির কাছ থেকে।

‘কে তুমি?’ আবারও বলল কেটি। একটা ঝাঁকুনি টের পাচ্ছে নিজের পাশে।

‘মেয়েটা পুতপবিত্র কেউ ছিল না। ফলে আর কখনোই দেখতে পাবে না সে। আঙনের একটা হৃদে ঝাঁপ দিয়েছে সে... নিজের রক্তে নিজেই ডুবে মরতে চায়।’

কণ্ঠটা শোনামাত্র যেন লাফিয়ে উঠল কেটি। একটা কম্পন যেন ছুটে বেড়াতে লাগল তার সারা শরীরে।

কণ্ঠটা একজন পুরুষের। মাথায় সেই বিশ্রী কাটাচিহ্নযুক্ত লোকটার। “এস” অক্ষরটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় তার। মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। যা বলেছে, তা ফিসফিসানির চেয়ে খুব বেশি কিছু না। যদিকে এইমাত্র এগিয়ে গেছে কেটি, তার ঠিক উল্টোদিকে আছে ওই লোক।

নিজের পাশের উষ্ণ ওই শরীরের দিকে আরেকটু এগিয়ে গেল কেটি। টের পেল, কম্বলের নিচে কুঁকড়ে গেল শরীরটা। ‘কোথায় আছি আমরা? ওয়েজলি কোথায়?’

কেশে উঠল লোকটা। মনে হচ্ছে, দম নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে তার। ‘তোমার বন্ধু ওয়েজলি তোমার সঙ্গেই আছে, ওই একই জায়গায়। তবে ওর অবস্থা খুব একটা সুবিধার না।’

মল-মূত্র এবং সেই অন্য কিছু একটার গন্ধ নিয়ে ভাবছে কেটি। ভাবতে চাইছে না, তবুও মনে পড়ে যাচ্ছে ওসব। ‘কিংডম হলে যাঁরা কাজ করেন আমাদের সঙ্গে, তাঁরা কিন্তু জানেন, আমরা এখানে এসেছি। জানেন আজ কোন রাত্তায় এসেছি



আমরা, কোন কোন বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। যদি আমাকে ছেড়ে দেন আপনি, যদি চলে যেতে দেন, আমি ফিরে গিয়ে বলবো, যা ঘটে গেছে তা শ্রেফ একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু না। বলবো, ওয়েজলি পড়ে গিয়েছিল, আর আপনি ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন।’

‘ওই লোকগুলো তোমাকে সাহায্য করার জন্য আসবে কি আসবে না, তা নিয়ে কোনো পরোয়া নেই আমার। তারা আমাকে ধরার জন্য আসবে কি আসবে না, পরোয়া নেই সে-ব্যাপারেও। যতক্ষণে আসবে তারা, ততক্ষণে কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের।’

আরও কাছে চলে এসেছে লোকটার কণ্ঠ। মেঝের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে সে, শুনতে পাচ্ছে কেটি। শুনতে পাচ্ছে, একটা পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে লোকটা। তার মানে ওই লোকের হাঁটাচলায় কোনো একটা সমস্যা আছে।

ঝনঝন আওয়াজ উঠল কোথায় যেন। ধাতুর সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে অন্য কোনো ধাতু। কোথাও একটা দরজা খোলা হলো।

‘আমার হয়ে একটু দেখবে তুমি?’

লোকটা এবার হাজির হয়েছে কেটির ঠিক পাশে। নিজের ঘাড়ে ওই লোকের গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে মেয়েটা।

‘কী দেখতে পেলো তুমি, সেটা কি জানাবে আমাকে?’

চোঁচিয়ে উঠল কেটি। ঠিক যে-মুহূর্তে ওই আওয়াজ বের হলো ওর মুখ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কিছু একটা গুঁজে দিল লোকটা। কোনো ন্যাতাকানি হবে হয়তো। অথবা হয়তো কাপড়ের টুকরো। কেটির মনে হচ্ছে, একগাদা ময়লা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মুখের ভেতরে। তেতো একটা স্বাদ পাচ্ছে সে। টের পেল, ওকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা। মেঝে থেকে শূন্যে তুলে ফেলল। বহন করছে এখন। মেয়েটার পাশের কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। সংক্ষিপ্ত একটা মুহূর্তের জন্য জড়িয়ে ধরল কেটির একটা বাহু। তারপরই আলগা হয়ে পড়ে গেল কোথাও।

‘তুমি ঈশ্বরে-বিশ্বাসী একটা মেয়ে। তুমি ধর্ম-অনুসারী একটা মেয়ে। তুমি ঠিকই দেখতে পাবে।’

লোকটা কোল থেকে ছেড়ে দিল কেটিকে। অথবা হয়তো নিচু করে নামিয়ে দিল। ঠিক কী ঘটল, মেয়েটা আসলে নিশ্চিত না সে-ব্যাপারে। পানির স্পর্শ পেল সে প্রথমে। তারপর টের পেল, ওকে জড়িয়ে রাখা ওই লোকের হাত দুটো আলগা হয়ে গেছে... সরে গেছে। ওই পানির গভীরে... সেটা প্রকৃতপক্ষে যা-ই হোক না কেন... তলিয়ে গেল মেয়েটা। চোখ বাঁধা অবস্থায় চেহারাটা ভাসিয়ে রাখতে পারল শুধু, শরীরের বাকিটা ডুবে গেছে পানিতে। বাতাসের জন্য খাবি খেতে আরম্ভ করেছে। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত এবং পায়ের সাহায্যে টের পাচ্ছে এই জায়গার তলদেশ। মাথাটা একদিকে একটুখানি কাত করলে ভাসিয়ে রাখতে পারছে পানির ওপর।

পানিটা কেমন যেন উষ্ণ । গরমই বলা চলে ।

কেটির চোখ যদি বাঁধা না থাকত, তা হলে সে দেখতে পেত, একটা ফ্রিজারের রূপান্তর ঘটিয়ে সেটাকে পানির ট্যাঙ্কে পরিণত করেছে কালো নিট ক্যাপ পরিহিত সেই লোক । দেখতে পেত, ফ্রিজারের পাশে রাখা আছে গাড়ির কয়েকটা ব্যাটারি, সেগুলো তারের সাহায্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে । একটা তারগুলিনের সাহায্যে ঢেকে রাখা হয়েছিল ওগুলো, এবার ওই আবরণ সরিয়ে নিল লোকটা । দেখতে পেত, বর্তনীর আকারে জুড়ে দেয়া ব্যাটারিগুলোর শেষ ব্যাটারিটা থেকে জাম্পার কেবলের দুটো প্রান্ত তুলে নিল ওই লোক । দেখতে পেত, আলাগা ওই প্রান্ত দুটো নিয়ে এসে ফ্রিজারের পানিতে ফেলে দিল লোকটা ।

কিন্তু এসবের কোনোকিছুই দেখতে পেল না কেটি ।

বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়েছে ফ্রিজারের পানিতে । সমানে খিঁচুনি উঠছে কেটির শরীরে । এবং সেটা এত জোরে যে, ছিঁড়ে আলাগা হয়ে গেল মেয়েটার হাত-পায়ের জিপ টাইয়ের বাঁধন ।

উজ্জ্বলতম সাদা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে এখন ।



‘এখানে বসে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে। তা-ও আবার সাধারণ কোনো অপরাধীর মতো বন্দি অবস্থায়। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো এক মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক যখন ধরে নিয়ে গেছে আমাদের মেয়েটাকে, তখন,’ খেঁকিয়ে উঠলেন ল্যারি বিয়েল, একনিঃশ্বাসে বললেন কথাগুলো। ছোট একটা হোটেল রুমে আছেন এই মুহূর্তে, পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন সেখানে। প্রায় দু’ঘণ্টা হতে চলল এখানে আছেন তাঁরা। আসার পর থেকে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন তিনি, কিছুতেই থামাতে পারছেন না নিজেকে।

‘ল্যারি, তোমার ওই অস্থিরতা কিন্তু কারও কোনো কাজে লাগছে না। প্লিজ এখানে এসো। আমার পাশে বসো,’ বললেন বিছানার এককোণায় বসে থাকা ডার্লিন বিয়েল।

ঘরের দরজার ঠিক ভেতরে ছোট একটা টেবিল আছে, সেটার ধারে বসে আছে ক্রেয়ার, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওই দম্পতিকে।

সে ফোন করার চার মিনিটের মধ্যে এই দম্পতির বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন পুলিশ অফিসার। দু’জনকেই সেই তিন তলা বাড়ির ভেতরে নিরাপদ অবস্থায় পাওয়া যায়। বাসাটা ওয়েস্ট সুপিরিয়র স্ট্রিটে অবস্থিত। ডার্লিন বিয়েল তখন সমানে ফোন করছেন তাঁর মেয়ের বিভিন্ন বন্ধুকে... পুলিশ অফিসাররা যখন হাজির হলো তখন পাঁচ নম্বর কলটা করছিলেন তিনি। আর তাঁর স্বামী সে-সময় বসে গেছেন ল্যারিসার কম্পিউটারটা নিয়ে, ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখছেন কিছু জানা যায় কি না। বছর দু’-এক আগে মেয়েটার কম্পিউটারে কিডবিসেফ নামের একটা প্যারেন্টাল মনিটরিং প্রোগ্রাম ইনস্টল করে দিয়েছিলেন তিনি। তাই ক্রেয়ার যখন চাইল ল্যাপটপটা, ওর হাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক কায়দায় ওটা তুলে দিলেন তিনি। সেটা নিয়ে বলতে গেলে ছুট লাগায় ক্রেয়ার, হাজির হয় মেট্রো পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সে, তুলে দেয় ক্রোজের দলের হাতে।

তারপর আবার ফিরে যায় সুপিরিয়র স্ট্রিটের সেই বাসায়। বুঝিয়ে বলে, যে-লোককে বর্তমানে সন্দেহ করছে ওরা, সে-লোকই যে তুলে নিয়ে গেছে ল্যারিসাকে, এমনটা বিশ্বাস করে নেয়ার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে যখন মেয়েটার হারিয়ে যাওয়ার বারো ঘণ্টাও অতিবাহিত হয়নি, তখন। আরও বলে, নিরাপত্তার খাতিরে ওই দম্পতিকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় সে। কিন্তু প্রস্তাবটা প্রথমে বাতিল করে দেন তাঁরা। তখন তাঁদেরকে বোঝাতে আরও মিনিট বিশেক সময় খরচ করতে হয় ক্রেয়ারকে। শেষপর্যন্ত ওই বাসা ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারে রাজি

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৪৬

করাতে সক্ষম হয়। নিজের টুকটাক জিনিস দ্রুত গুছিয়ে নিতে সক্ষম হন ডার্লিন। ওষুধ কোম্পানির সেলসে কাজ করেন তিনি। দিনের বড় একটা অংশ রাস্তায় রাস্তায় কাটাতে হয় তাঁকে। তাই একটা ট্রাভেল ব্যাগ সবসময় প্রস্তুত অবস্থাতেই রাখেন। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে বাসার সদর দরজায় হাজির হয়ে যান তিনি। কিন্তু তাঁর মতো অত চটপটে না ল্যারি। এটা-সেটা নেয়ার বাহানায় প্রতিটা ঘরে গিয়ে কালক্ষেপণ করতে থাকেন তিনি। ভাবখানা এমন, যেন আশা করছেন, ছায়ায় ঢাকা কোনো এক কোনা থেকে বেরিয়ে আসবে তাঁর আদরের মেয়েটা... শেষ হবে দীর্ঘ কোনো লুকোচুরি খেলা। শেষপর্যন্ত তাঁর জন্য একটা ব্যাগ গুছিয়ে দিতে হয় ডার্লিনকেই। তারপর অপেক্ষমান একটা গাড়িতে গিয়ে সওয়ার হন তাঁরা দু'জন।

শিকাগো মেট্রো পুলিশের মালিকানায় তিনটা সেফ হাউস আছে। কিন্তু ক্রেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, শহরের কেন্দ্রস্থলের কোনো একটা হোটেলে নিয়ে এসে রাখবে ওই দু'জনকে। নিজের মর্জিমাফিক একটা হোটেল বেছে নেয় সে। বিল চুকিয়ে দেয় নগদ টাকায়। বিশপ যদি কোনোভাবে জড়িত থাকে এসব অপহরণের সঙ্গে, কাণ্ডজে সূত্র বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনোকিছু ওই লোকের জন্য রেখে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই ক্রেয়ারের। এই মুহূর্তে কোথায় আছে ক্রেয়ার, সে-তথ্য আছে কেবল ন্যাশের কাছে। ন্যাশ আর সোফি রদ্রিগেজ এখনও রয়ে গেছে বিয়েল দম্পতির বাসায়, খোঁজ চালানোর কাজটা তদারকি করছে। পুলিশের স্টিকারবিহীন গাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা অবস্থান নিয়েছে ওই বাড়ি থেকে কয়েকটা বাড়ি পরে, ব্লকটার দু'প্রান্তেই। প্রস্তুত অবস্থায় আছে... যদি দেখা যায় অচেনা সেই লোককে।

‘ল্যারি, তুমি কিন্তু আমাকে নার্ভাস বানিয়ে দিচ্ছ। প্লিজ বসে পড়ো,’ আবারও বললেন ডার্লিন।

ঘরের ও-মাথা থেকে এ-মাথায় হাজির হলেন ল্যারি বিয়েল। তারপর ধপাস করে বসে পড়লেন বিছানায়, স্ত্রীর পাশে। লাল হয়ে যাওয়া চেহারাটা ঘুরিয়ে তাকালেন ক্রেয়ারের দিকে। ‘কী যেন বললেন আপনি তখন... কতজন মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে ওই লোক?’

‘আমাদের জানা আছে এ-রকম অন্তত আরও দু'জন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে আবারও বলি, ওই লোকই যে আপনাদের মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে, এ-রকম বিশ্বাস করার কোনো কারণ কিন্তু নেই। আপনি নিজেই বলেছেন, মেয়েটা ওর কোনো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে। আমরা শুধু যা করছি তা হলো, সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করছি।’

‘মেয়েটা ওর কোনো বন্ধুর সঙ্গে যায়নি,’ বললেন ডার্লিন বিয়েল। ‘ওদের স্কুলে একটা নাচের-অনুষ্ঠান ছিল। সেটাতে যোগ দেয়ার কথা ছিল ওর। প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য ক্যারি অ্যানের বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল সে। অথচ ক্যারি অ্যানের সঙ্গে সারাটা দিনে না একবার দেখা হয়েছে আমার মেয়েটার, না



কোনো কথা হয়েছে। ওর অন্য কোনো বন্ধুও ওর ব্যাপারে কিছু শোনেনি আজ। আজকের আগে এভাবে কখনোই গায়েব হয়ে যায়নি আমাদের মেয়েটা। যখনই কোথাও যায় সে, আমাকে বলে যায়। আমরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে কোনোকিছু গোপন করি না।’

‘আপনি বলছেন, ওই লোক সেই মেয়েদের বাবা-মাকেও খুন করেছে?’ ক্লেয়ারের উদ্দেশে বললেন ল্যারি বিয়েল, উপেক্ষা করলেন তাঁর স্ত্রীর কথাগুলো। ‘নিজের বাসার পেছনদিকের উঠানে একটা লোকের লাশ পাওয়া গিয়েছিল কয়েকদিন আগে... তুমারে মোড়া অবস্থায়। সেটার ব্যাপারেই কি কথা বলছেন আপনি?’

‘চলমান কোনো তদন্তের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব না আমার পক্ষে।’

‘সাংবাদিকেরা বলেছে, ওই লোকের গলা নাকি এত বিশ্রীভাবে কেটে ফেলা হয়েছিল যে, ধড় থেকে তার মুণ্ডটা বলতে গেলে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।’

‘আপনারা এখানে নিরাপদে আছেন। আপনাদের কপালে খারাপ কোনোকিছু ঘটতে দেবো না আমরা।’

নাইটস্ট্যান্ডের গায়ে আঙুল দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে টোকা দিচ্ছেন ল্যারি। ক্লেয়ার ইতোমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে, এই লোকের পায়চারি করে বেড়ানোটাই ভালো ছিল।

দরজায় টোকা দিল কে যেন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ল্যারি।

একটা হাত তুলল ক্লেয়ার। ‘আমি দেখছি। আপনি ওখানেই থাকুন।’

এগিয়ে গিয়ে পিপহোলে চোখ রাখল ক্লেয়ার, একটা হাত পিস্তলের বাঁটে। কে এসেছে, দেখামাত্র শিথিল হয়ে গেল ওর শরীর। দরজা খুলল। টহল দেয়ার দায়িত্বে থাকা একজন অফিসারকে পিৎজার কথা বলেছিল সে।

দুটো বাস্ক দেয়া হলো ওর হাতে।

দরজাটা লাগিয়ে দিল ক্লেয়ার। ডেডবোল্ট আর ভেতরের ল্যাচও লাগাল। তারপর বাস্ক দুটো নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। বলল, ‘প্লেইন চিজ আর পেপেরনি।’

‘কোনোকিছু খাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে,’ জানিয়ে দিলেন ল্যারি।

‘আশা করছি, যা ঘটছে, তা তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যা-ই ঘটুক না কেন, সেটা মোকাবেলা করার জন্য শরীরে শক্তি তো থাকা চাই, নাকি?’

একফালি পনির তুলে নিলেন ডার্লিন, তারপর গিয়ে বসে পড়লেন বিছানার কোনায়। তাঁকে দেখে শান্ত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাঁর হাত কাঁপছে। যে-ফালিটা তুলে নিয়ে গেছেন, সেটা থেকে একটা টুকরো পড়ে গেল মেঝেতে-বিছানো কার্পেটে। ‘আমি দুঃখিত। কাজ বাড়িয়ে ফেলেছি।’

উঠে দাঁড়ালেন ল্যারি, আবার পায়চারি শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি গিয়ে তুলে নিলেন একটুকরো পেপেরনি। ‘শহরের এখানে-সেখানে পোস্টার ঝুলিয়ে দেয়া উচিত আমাদের। কথা বলা উচিত সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। বাজি ধরে বলতে পারি, যে-কম্পট্রাকশন সাইট আছে আমাদের ওখানে, সেখান থেকে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সারা এলাকায় চিরুনি অভিযান চালানো সম্ভব। এখানে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে। আবারও বলছি, কোনো এক মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক তুলে নিয়ে গেছে আমাদের ছোট্ট মেয়েটাকে; এই অবস্থায় কিছুই না-করাটা সম্ভব না আমার পক্ষে। আর... ওই লোক আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি সে-রকম কোনো চেষ্টা করে সে, তাকে শ্রেফ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো আমি। আর আমার মেয়ের গায়ে যদি হাত দেয়, খুন করে ফেলবো তাকে।’

দশাসই বলতে যা বোঝায়, ল্যারি সে-রকম একজন মানুষ। র‍্যান্ডাল ডেভিস ছিলেন ছ’ফুটের বেশি লম্বা। নিয়মিত ব্যায়াম করার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল ভালো। ফ্লুয়েড রেনল্ডসও রোগা-পাতলা কেউ ছিলেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁরা দু’জনই এখন মৃত।

বেজে উঠল ক্রেয়ারের ফোন।

কল রিসিভ করল সে। ‘ক্রোজ, কিছু জানতে পেরেছ?’

বিছানার কোনা থেকে উঠে দাঁড়ালেন ডার্লিন। নিজের হাত দুটো দেখছেন। পিৎজা সস দিয়ে মাখামাখি হয়ে গেছে দুটো হাতই। ‘যাই, হাত পরিষ্কার করে আসি।’

তাঁর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ক্রেয়ার। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, বাথরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মহিলা। খানিক বাদে হাজির হয়ে গেলেন সেখানে, ঢুকে পড়লেন ভেতরে, অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ল্যারি এখনও আগের মতো পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

‘শোকসংবাদটা খুঁজে পেয়েছি আমি,’ ফোনের ও-প্রান্তে বলছে ক্রোজ। ‘সান হেরাল্ড পত্রিকায় দু’দিন আগে ছাপা হয়েছে ওই খবর।’

‘তার মানে শিকাগো একজামিনার-এ না?’

‘আমাদের ওই লোক মনে হয় তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। আবার এমনও হতে পারে, একের বেশি পত্রিকায় শোকসংবাদ ছাপাচ্ছে সে। হয়তো একজামিনার-এর বেলায় তার কপালটা খুলে গেছে আর কী।’

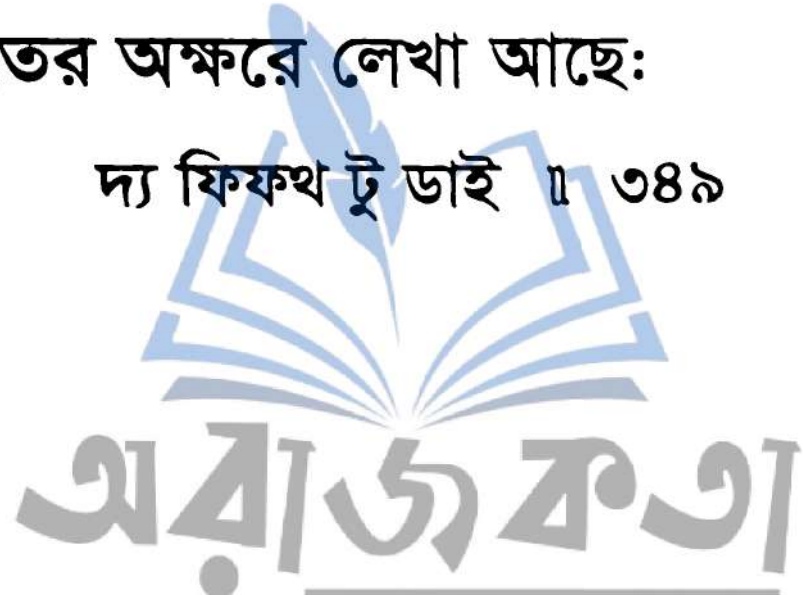
‘কী বলা হয়েছে ওই সংবাদে?’

‘আপনার কাছে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। পেয়েছেন?’

টুং করে আওয়াজ উঠল ক্রেয়ারের ফোনে। ‘হ্যাঁ। একটু লাইনে থাকো তো।’ ডিসপ্লের দিকে তাকাল সে।

ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে:

দ্য ফিফথ টু ডাই ১ ৩৪৯





একজন মাদক-ব্যবসায়ী
এবং একইসঙ্গে একজন মা এবং স্ত্রী
ডার্লিন বিয়েল শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছেন শান্তির ঠিকানা
মৃত্যুছুরির ধারালো ফলার চোখা প্রান্তটাতে ।

ধপাস করে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল বাথরুম থেকে ।
কেউ একজন আছড়ে পড়েছে সেখানকার মেঝেতে ।

৭২.
ক্লেয়ার
তৃতীয় দিন, সন্ধ্যা ৬:০৪

বাথরুমের দরজার কাছে আগে পৌঁছালেন ল্যারি। হাতল ধরে মোচড়ামোচড়ি করলেন কিছুক্ষণ। লক করা আছে ওটা। ‘ডার্লিন?’

‘সরে যান!’ চিৎকার করে উঠল ক্লেয়ার। সঙ্গে সঙ্গে কষে এক লাথি হাঁকাল ওই লকের নিচে। এক ইঞ্চিরও কম ব্যবধানের জন্য লাথিটা লাগল না ল্যারির গায়ে। থরথর করে কেঁপে উঠল পাল্লাটা। কিন্তু চৌকাঠের গা থেকে আলাগা হলো না।

খানিকটা দূর থেকে ছুটে এসে দরজার গায়ে আছড়ে পড়লেন ল্যারি, কাঁধ ব্যবহার করেছেন শরীরের অন্য যে-কোনো অংশের আগে। এবং কাজটা করেছেন সর্বশক্তিতে। ক্লেয়ার শুনতে পেল, ফাটল ধরে গেছে পাল্লার কাঠে। চৌকাঠের আলিঙ্গন থেকে আলাগা হয়ে গেছে পাল্লাটা।

বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন ডার্লিন। সমানে খিঁচুনি উঠছে তাঁর শরীরে। সাদা কিছু ফেনা বেরিয়ে এসেছে তাঁর মুখ থেকে, গড়িয়ে নামছে গাল আর থুঁতনি বেয়ে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ, সাদা হয়ে গেছে। উল্টে গেছে।

ল্যারি ছুটে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন তাঁর স্ত্রীর পাশে। টাইল্‌স-করা মেঝের সঙ্গে আলতোভাবে ধরে রাখলেন মহিলার মাথাটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল ল্যারির হাত দুটো। একই অবস্থা ডার্লিনের মাথার নিচের টাইল্‌সেরও।

এখন সমানে খিঁচুনি উঠছে ডার্লিনের শরীরে। কাঁপছে কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলগুলো। একটা টুথব্রাশ ধরে রেখেছিলেন তিনি, জোরালো শব্দ তুলে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল সেটা।

‘তাকে একপাশে কাত করে দিন! জিভটা যাতে মুখের ভেতরে আটকা পড়ে না যায়, নিশ্চিত করতে হবে সেটা! নিশ্চিত করতে হবে, দম যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তাঁর!’ চিৎকার করে কথাগুলো জানিয়ে দিল ক্লেয়ার। একইসঙ্গে তাকাচ্ছে বাথরুমের এখানে-সেখানে।

দু’টুকরো হয়ে গেছে টুথব্রাশটা।

টুথপেস্টের টিউবটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে কাউন্টারের ওপর।

দেখা যাচ্ছে একটা মাউথওয়াশও।

ডার্লিনকে একপাশে কাত করে দিলেন ল্যারি। মহিলার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ফেনা এবার জমা হচ্ছে মেঝেতে।

লিকুয়িড সোপ ডিসপেন্সারটা আঁকড়ে ধরল ক্লেয়ার, ওটা একটানে আলাগা করে ফেলল দেয়াল থেকে। তারপর গিয়ে বসে পড়ল ডার্লিনের পাশে। ‘এই জিনিস খাওয়া দরকার তাঁর!’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৫১

অরাজকতা

অরাজকতা

বড় বড় হয়ে গেল ল্যারির চোখ। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন ক্লেয়ারকে 'না... তাতে শ্রেফ মারা পড়বে বেচারী!'

ল্যারির সঙ্গে যুঝতে শুরু করে দিল ক্লেয়ার। নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ডার্লিনের মাথাটা। 'বিষ খাওয়ানো হয়েছে তাঁকে। দ্রুত কাজ করতে সক্ষম, এরকম কোনো বিষ। অনেকটা সায়ানাইডের মতো। বেশিরভাগ বিষই অম্লীয়। আর সাবান হচ্ছে ক্ষার। ফলে এখন যদি এই সাবান খাওয়ানো যায় আপনার স্ত্রীকে, বিষক্রিয়া কমে যাবে অনেকখানি। একইসঙ্গে বমি করে দেয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর।'

প্রতিবাদে ল্যারি কিছু বলা বা করার আগেই তরল সাবানের ক্যাপটা খুলে ফেলল ক্লেয়ার। ঘন বাদামি রঙের সেই তরল ঢালতে শুরু করল ডার্লিনের হাঁ হয়ে থাকা মুখের ভেতরে। খানিকটা সাবান ঢেলে জোর করে বন্ধ করে দিল মহিলার মুখ। চেপে ধরল নাক, যাতে মুখের সাবানটুকু গিলে ফেলতে বাধ্য হন তিনি।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল মহিলার শরীরটা। তাঁর মুখ আর নাক ছুটে গেল ক্লেয়ারের হাত থেকে। মাথাটা কাত হয়ে গেছে একদিকে। দুই হাত শরীরের দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সমানে লাথি ছুঁড়ছেন বাতাসে।

'আপনি তো ওর অবস্থা আরও খারাপ করে দিলেন!' চিৎকার করে বলে উঠলেন ল্যারি।

জবাবে আরও খানিকটা তরল সাবান ঢুকিয়ে দিল ক্লেয়ার ডার্লিনের মুখের ভেতরে, সেটা গিলে ফেলতে বাধ্য করল মহিলাকে। কিছুক্ষণ পর কুলকুচি করার মতো আওয়াজ পাওয়া গেল ডার্লিনের মুখের ভেতর থেকে, কাশতে লাগলেন তিনি। তরল সাবান ছিটকে বেরিয়ে আসছে, মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে দেয়াল এবং মেঝের টাইলসে। করুণা করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ক্লেয়ারের মধ্যে, আরও খানিকটা সাবান গেলাল সে ডার্লিনকে। দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয়বারের মতো বমি করলেন তিনি। শেষপর্যন্ত নিখর হয়ে গেল শরীরটা। তাঁর পাল্‌স চেক করল ক্লেয়ার।

ওর পাশে থাকা ল্যারির চেহারা সাদা হয়ে গেছে। 'আপনি তো মেরে ফেললেন ওকে! ও মাই গড, আপনি মেরে ফেলেছেন ওকে!'

দম নেয়ার চেষ্টা করল ক্লেয়ার। কিন্তু ওর শরীরের প্রতিটা পেশী যেন একত্রিত হয়ে কাজটা করতে দিল না ওকে। 'যান গিয়ে কল করুন নাইন ওয়ান ওয়ানে।'

৭৩.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, রাত ৮:০৬

রাত ৭:২৫ মিনিটে দক্ষিণ ক্যারোলিনার গ্রিনভিলে ল্যান্ড করেছে পোর্টার আর সারা ওয়ার্নারকে বহনকারী প্লেনটা। ফ্লাইটটা যখন সেটার গন্তব্যপথের মাঝখানে ছিল তখন দিগন্তের কোনো এক জায়গায় গায়েব হয়ে যায় সূর্যটা। প্লেনের জানালার গ্লাস্টিকের খড়খড়ি টেনে দেয় ওয়ার্নার। মহিলা জানালা দিয়ে আদৌ বাইরে তাকিয়ে ছিল কি না, সে-ব্যাপারে পোর্টার আসলে নিশ্চিত না। দেখে যা মনে হয়েছিল, হাতেধরা বিশপের ডায়েরির সঙ্গে চুম্বকের মতো সঁটে গেছে মহিলার চোখ দুটো। ডায়েরিটা একটানা পড়েছে সে, একটু পর পর পাতা উল্টেছে, পোর্টার সে-সময় নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল মহিলার আঙুলগুলোর দিকে। দেখেছে, বিশপের লেখা প্রতিটা শব্দ যেন আত্মস্থ করে নিয়েছে ওই মহিলা।

প্লেনের টিকেট কেনার টাকা দিয়েছে ওয়ার্নারই। বুঝতে পেরেছে, পোর্টার যা করছে, নিজেকে গোপন রেখে করার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় পোর্টারের ক্রেডিট কার্ড যত কম ব্যবহৃত হয়, তত ভালো। ওয়ার্নারকে নগদ টাকা দিতে চেয়েছিল পোর্টার, মানা করে দিয়েছে মহিলা।

প্লেন ল্যান্ড করার কিছু সময় আগে ডায়েরিটা পড়ে শেষ করল সে।

গ্রিনভিলে নিজের নামে একটা গাড়ি ভাড়া করে ফেলল সে। লাল রঙের হুন্দাই সনাটা। সুসজ্জিত।

বিশপের ডায়েরি থেকে ঠিকানাটা নিজের মোবাইল ফোনে জিপিএস অ্যাপে তুলে নিয়েছে ওয়ার্নার। এখন ওই অ্যাপ যদিকে পথ দেখাচ্ছে ওকে, সেদিকেই গাড়ি চালাচ্ছে। চুপ করে আছে। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে পোর্টার।

এয়ারপোর্টের সীমানা ছাড়িয়ে হাইওয়েতে হাজির হলো ওরা। প্রথমে মুখ খুলল ওয়ার্নার। ‘আমাদের মনে হয় একটা হোটেলে ওঠা উচিত। তারপর আগামীকাল সকালে, আলো ফোটার পর বেরিয়ে পড়া উচিত আবার। অন্ধকারে কোনোকিছু দেখতে বেগ পেতে হবে আমাদেরকে।’

আসলেই, বেশ অন্ধকার ঘনিয়েছে আশপাশে।

শহরে, নিজের জন্য বিভিন্ন কোনা খুঁজে নেয় হরেক রকমের কৃত্রিম আলো। সেসব আলোর মধ্যে আছে স্ট্রিটলাইট, ট্রাফিক লাইট, অফিসের আলো, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আলো। শহরে সবসময় কোনো না কোনো আলো থাকেই। কিন্তু এখানে, এই হাইওয়েতে তেমন কিছু নেই বলা যায়। আকাশটা কালো হয়ে আছে আলকাতরার মতো। সেটার গায়ে অনেক দূরে কোথাও মিটমিট করছে একটা-দুটো তারা। পোর্টার দেখতে পাচ্ছে, ওদের গাড়ির হেডলাইটের আলো বড়জোর ত্রিশ ফুট দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে, তারপরই সেটাকে গিলে খেয়ে ফেলছে হাইওয়ের

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৫৩

অন্ধকার। মানবসভ্যতার চিহ্ন বলতে যা-কিছু আছে, এয়ারপোর্টের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুছে গেল সেসব। ওসবের জায়গা এখন দখল করেছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মাঠ। এবং শূন্যতা।

জিপিএস-এর দিকে তাকাল পোর্টার। ‘আপনার এই থিংঅ্যামাগিজমো (জিনিস) বলছে, গন্তব্য থেকে আর মাত্র তেরো মিনিটের দূরত্বে আছি আমরা। তাই আমি বলবো, আমরা বরং যা দেখার আজ রাতেই দেখে নিই। যদি দরকার হয়, আগামীকাল সকালে আবার যাওয়া যাবে।’

‘ঘুম-টুমের কোনো দরকার কখনও হয় আপনার নাকি হয় না?’

‘পুলিশ স্কুলের ছাত্র যখন ছিলাম, তখন মাঝেমধ্যে ঘুমাতাম আর কী।’

‘বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কথাটা, কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, ওই থিংঅ্যামাগিজমো’র মতো বাহারি শব্দ কোথেকে শিখলেন আপনি, বলুন তো?’

হিদার।

ওটা হিদারের কাছ থেকে শিখেছে পোর্টার। অশব্দ বলতে যা-কিছু ছিল হিদারের অভিধানে, সেসবের মধ্যে বিশেষ ওই শব্দ বিশেষ প্রিয় ছিল পোর্টারের কাছে।

সে টের পেল, বিয়ের আংটিটা নাড়াচাড়া করছে... আনমনে।

দৃশ্যটা নজর এড়াল না ওয়ার্নারের। ‘আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু কথা বলুন আমাকে।’

চেহারা লাল হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে পোর্টার। ‘আপনি কি আসলেই কোনোকিছু শুনতে চান আমার স্ত্রীর ব্যাপারে?’

‘অবশ্যই। শুনতে পারলে ভালো লাগবে আমার।’

হিদার মারা যাওয়ার পর ওকে নিয়ে কারও সঙ্গে তেমন কোনো কথা বলেনি পোর্টার। এমোরিকে খুঁজে পাওয়ার পর হিদারের ব্যাপারে ন্যাশ আর ক্রেয়ারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু খুব বেশি কিছু বলতে পারেনি। কারণ তার আগেই, মদে পূর্ণ করে দেয়া বলতে যা বোঝায়, ওকে ঠিক তা-ই করেছিল ওই দু’জন। হাতে বেশি সময়ও পায়নি সে... ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল কর্তব্যের কাছে। ন্যাশ আর ক্রেয়ার ওর বন্ধুর মতো। কিন্তু কৌশলগত দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করা হয়, ওই দু’জনের চেয়ে বয়সে এবং পদমর্যাদায় বড় সে। শুধু তা-ই না, যতবার নিজের আবেগ অন্য কাউকে দেখাতে গেছে, ততবারই কোনো না কোনো ঝামেলা হয়েছে। হিদার মারা যাওয়ার পর ব্যক্তিগত অনেক মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হয়েছে পোর্টারকে। এখনও মাঝেমধ্যে হতচকিত হয়ে টের পায়, দিনে কমপক্ষে দু’বার করে আপনমনে কথা বলে সে হিদারের সঙ্গে। কথা বলে প্রতিদিন। কাপড় পরার সময়, বাসায় যে-ক্লজিট আছে সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে; ওটার ভেতরে হিদারের যে-কটা কাপড় আছে সবগুলোতে আলতো করে আঙুল বোলায়।

হিদারের মৃত্যু একটা শূন্যতা তৈরি করে দিয়ে গেছে ওর ভেতরে। তৈরি করে দিয়ে গেছে অনেক বড় একটা ফাঁকা জায়গা। আজও হিদারকে খুব মিস করে সে। মিস করে প্রতিদিনের প্রতিটা মুহূর্তে।

‘ওর নাম ছিল হিদার। হতশ্রী একটা কনভেনিয়েন্স স্টোরে একবার একটা ডাকাতি হয়, আর সে-ঘটনায় মারা পড়ে সে। ওই দোকানটা ছিল আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কয়েক ব্লক দূরে। আর এই ঘটনা আজ থেকে মাস ছয়েক আগের। পুলিশ অবশ্য সেই খুনিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাকে ছোকরা বলা চলে। নাম হার্নেল ক্যাম্পবেল।’ একটা মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল পোর্টার। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। ‘ওই ছোকরা কীভাবে যেন পালিয়ে গেল পুলিশের হাত থেকে। কিন্তু জেলে থাকাটাই উচিত ছিল তার। কারণ তাকে খুঁজতে খুঁজতে বের করে ফেলে অ্যানসন বিশপ। এবং মেরে ফেলে। অন্তত আমাদের ধারণা সেটাই। কারণ ছোকরার লাশ পাওয়া যায়নি আজও। যা হোক, বিশপ পরে যা করল তা হলো, ওই ছোকরার একটা কান কেটে নিয়ে সুন্দর করে রেখে দিয়ে এল আমার বিছানায়। ওটা যেন কোনো একজাতের উপহার। একদিক দিয়ে চিন্তা করলে কিন্তু তা-ই। আমি যদি হাতের নাগালে পেতাম ওই ছোকরাকে, অবশ্যই খুন করে ফেলতে চাইতাম। আমাকে তখন একটা চিন্তা রীতিমতো শেষ করে দিচ্ছিল... ওই ছোকরা কয়েকটা বছর জেলে কাটাবে, তারপর যেভাবেই হোক না কেন মুক্ত-স্বাধীন জীবনের ব্যবস্থা করবে নিজের জন্য। ওদিকে হিদার চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। যা হোক, বাসায় ফিরে গেলাম আমি, দেখতে পেলাম, সাদা একটা বাক্সের ভেতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে হিদারের খুনির কাটা-কান। সঙ্গে আছে একটা চিরকুট।’

‘কী বলা হয়েছিল সেই চিরকুটে?’

‘বলা হয়েছিল...

স্যাম,

আপনার জন্য আমার পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা উপহার...

ছেলেটা খুব চেঁচাচ্ছিল; দুঃখ লাগছে, তার সেই চিৎকার শোনানো গেল না আপনাকে।

একটা উপকার করলাম আমি আপনার, বিনিময়ে কিছু কি চাইতে পারি?

ওই যে, কথায় আছে না, টিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়... আমি আর আপনি তো বন্ধু; ধরে নিন বন্ধুত্বের খাতিরে সে-রকম কিছু একটা চাইছি আপনার কাছে।

আমার মাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করুন আমাকে।

তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা বলার সময় হয়েছে মনে হয়।

বি



‘দারুণ তো।’

‘হ্যাঁ।’

‘তার মানে সে-কারণেই আপনি হাজির হয়ে গেছেন এখানে? সে-কারণেই এসেছেন নিউ অরলিন্সে? যাতে বিশপের মাকে খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য করতে পারেন লোকটাকে?’

মাথা নাড়ল পোর্টার। ‘আমি বিশপকে পাকড়াও করতে এসেছি এখানে। আর ওই মহিলা হচ্ছে আমার জন্য একটা সূত্র, তার বেশি কিছু না। ক্যাম্পবেলকে খুন করেছে বিশপ... সেটা তার জন্য একতরফা একটা ঘটনা। আমার পক্ষ থেকে যদি কোনোকিছু পাওনা থাকে সে, তা হলে সেটা আরামদায়ক একটা প্রিজনসেল ছাড়া আর কিছু না।’

‘কিন্তু ওই লোক তো নিউ অরলিন্সে থাকতেও পারে। এমনও হতে পারে, আমাদের ওপর সারাটা সময় ধরে নজর রেখে চলেছে সে,’ বলল ওয়ার্নার। ‘জেলখানায় ঢুকে পড়াটা সম্ভব না তার পক্ষে। কারণ তাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। কিন্তু, হতে পারে, আপনার প্রতিটা পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে সে।’

‘হুঁ, হতে পারে।’

‘কাজেই এমনও হতে পারে, আমাদেরকে অনুসরণ করে এখানে হাজির হয়ে গেছে লোকটা।’

এই ব্যাপারটা মাথায় আসেনি পোর্টারের। ভেবেছিল, ওর ওপর নিউ অরলিন্সে চোখ রাখছে বিশপ। কিন্তু এখানে? ‘আমি আসলে ওই ব্যাপারে কিছু জানি না। আমাদের এবং বিশপের মায়ের মধ্যে কী কথোপকথন হয়েছে, সেসব জানার কোনো উপায় কিন্তু নেই লোকটার। আমরা ছাড়া আর কেউই দেখেনি, ওই ডায়েরিতে কী লিখেছে বিশপের মা। মানে... বিশেষ সেই ঠিকানার কথা বলছি আর কী।’

‘ওই ইন্টারভিউ রুমে কয়েকটা ক্যামেরা আছে। হতে পারে, ও-রকম কোনো একটা ক্যামেরা বেশ ভালোভাবেই ধারণ করেছে বিশপের মায়ের ছবি। একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের। ওই জেলখানার ভেতরের কেউ একজন মোবাইল ফোনটা ঢুকিয়ে দিয়েছে আপনার লকারের ভেতরে। শুধু তা-ই না, ছুরিটাও ঢুকিয়েছে। হতে পারে, সেই একই লোক আমাদেরকে অনুসরণ করে হাজির হয়েছে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। আবার এমনও হতে পারে, আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে সওয়ার হয়েছে সে। হাই প্রোফাইলের মানুষ বলতে যা বোঝায়, সে-লোক হয়তো সে-রকম... যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। হতে পারে, ছদ্মবেশ ধারণে বেশ পটু সে।’ চোখের ওপর নেমে আসা একগুচ্ছ চুল সরাল ওয়ার্নার। তারপর চোখ তুলে তাকাল রিয়ারভিউমিররের দিকে। ‘তবে এ-কথা বলতে পারি, আমাদের সঙ্গে এই হাইওয়েতে নেই লোকটা। গত বেশ কিছুক্ষণের

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৫৬

মধ্যে আর কোনো গাড়ি নজরে পড়েনি আমার। তবে হতে পারে, হেডলাইট বন্ধ করে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সে। আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, ওই কাজই করতাম।’

‘আমার মনে হয় না আমাদেরকে অনুসরণ করবে বিশপ। আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন... নিজেকে লুকিয়ে রাখার কাজে লোকটা একজন ওস্তাদ। এবং লুকিয়ে থাকার ব্যাপারেও সমান দক্ষ। আমাকে যদি বাজি ধরতে বলা হয় তো বলবো, কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে আছে ওই লোক। অপেক্ষা করছে, কখন একটু শান্ত হয়ে আসবে পরিস্থিতি। ...সাধারণ মানুষের যে-মনোযোগ, সেটার স্থায়িত্ব কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্য হয় না। বিশপের এই কেস নিয়ে যে এত লম্বা একটা সময় ধরে মেতে আছে সংবাদমাধ্যম, সেজন্য আশ্চর্যই লাগছে আমার। বড় আরেকটা খবর যখনই হাজির হবে, বিশপের ঠাঁই হবে পত্রিকার পেছনের পাতায়। সে যদি আবার কিছু একটা করার পরিকল্পনা এঁটে থাকে, তা হলে কাজটা করবে ওই সময়ে।’

‘আপনি কী করছেন, সেটা কিন্তু বুঝতে পারছি আমি,’ বলল ওয়ার্নার।

‘কী?’

‘প্রসঙ্গ পুরোপুরি বদলে ফেলেছেন। জানতে চেয়েছিলাম আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রসঙ্গ বদল করে বিশপকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন আপনি। এত সহজে মানছি না আমি সেটা। জবাব চাই আমার। আমি এমন একজন মানুষ, যে কিনা ভালোবাসার মনকাড়া কোনো গল্প শোনার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না। হিদারের সঙ্গে কখন কীভাবে দেখা হয়েছিল আপনার, বলুন। আপনি যদি আবারও ফাঁকিবাজি করার চেষ্টা করেন, যদি আবারও কথা বলতে শুরু করেন বিশপকে নিয়ে, গাড়ি থামাবো আমি, টায়ার আয়রন দিয়ে পেটাতে শুরু করবো আপনাকে। মারতে মারতে মেরেও ফেলতে পারি, ঠিক নেই। আশপাশে কিন্তু এ-রকম অনেক জায়গা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সহজেই লুকিয়ে রাখা যাবে কারও লাশ।’

‘আপনি তো ভয়ঙ্কর একটা মেয়েমানুষ।’

‘মহিলা বলুন। ভয়ঙ্কর একটা মহিলা। এবং সেজন্য রীতিমতো গর্ব হয় আমার। এবার হিদারের ব্যাপারে বলুন আমাকে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোর্টার। ‘হাসপাতালে দেখা হয়েছিল আমাদের।’

‘হাসপাতালে? কেন, কী হয়েছিল?’

‘আমি তখন নতুন নতুন কাজ শুরু করেছি পুলিশে। এবং যে-জায়গায় কাজ করছিলাম, সেটা এখান থেকে খুব একটা দূরেও না... চার্লসটনের কাছে। একবার একটা ঘটনায় আমার মাথার পেছনদিকে আঁচড় কেটে যায় একটা বুলেট। যে-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে, সেখানে একজন ট্রমা নার্স হিসেবে কাজ করছিল হিদার। কপাল আমার... তখন ইমার্জেন্সি রুমেই ছিল সে।’



বড় বড় হয়ে গেছে ওয়ানারের চোখ। ‘মাথায় গুলি খেয়েছিলেন আপনি?’

হাত তুলে মাথার পেছনদিক স্পর্শ করল পোর্টার। কাটা দাগটা রয়ে গেছে এখনও। মাথার পেছনদিকে, মাঝখানে, ছোট্ট একটা উঁচু জায়গাও রয়ে গেছে। ‘কাজটা একটা পয়েন্ট টু-টু’র। পাতি ব্যবসায়ী বলতে যা বোঝায়, সে-রকম এক মাদক-কারবারীকে ধরার চেষ্টা করছিলাম আমি এবং আমার পার্টনার। হেরোইন এবং অন্যান্য মাদকের ব্যবসা করত সে। উইজেল নামে ডাকা হতো তাকে। যা হোক, একটা গুলির ভেতরে কোণঠাসা করে ফেললাম আমরা ওই লোককে। আমি গেলাম পেছনদিক দিয়ে। আমার পার্টনার তখন সেই ব্লকের একটা কোনা ঘুরে এগিয়ে আসছে আরেক দিক দিয়ে। উইজেল করল কী... আমার পার্টনারকে দেখে ফেলল। পালানোর উদ্দেশ্যে ঘুরল। আর তখনই দেখে ফেলল আমাকে। ঘাবড়ে গেল সাংঘাতিক, কারণ আমি সে-সময় দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক তার পেছনেই। খুবই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল সে। একটা পিস্তল ছিল তার হাতে। সেটার ট্রিগারে টান লেগে যায় দুর্ঘটনাক্রমে। আমাকে গুলি করতে চায়নি সে। এমনকী ওই পিস্তলের নল তাক করা ছিল না আমার দিকে। যা ঘটে গিয়েছিল, সেটা, আমি বলবো, আকস্মিক একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু না। যা হোক, আমার পেছনের একটা ডাস্টবিনে গিয়ে লাগল বুলেটটা। সবেগে ঠিকরে উঠল। আর তারপরই এসে লাগল আমার খুলির পেছনদিকে।’

‘আরে বলেন কী! আপনি এখনও বেঁচে আছেন কীভাবে?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পোর্টার। ‘হতে পারে, আমার মাথা বেশ মোটা, সে-কারণে। মাথায় ঢোকার পর খুলির হাড়ে আটকে যায় বুলেট। আমার মগজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি শেষপর্যন্ত। তবে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।’

‘কপাল ভালো আপনার... দারুণ বাঁচা বেঁচেছেন।’

‘হ্যাঁ, তা-ই মনে হয় আমারও।’ একটা মুহূর্তের জন্য একটু বিরতি দিল পোর্টার। ‘ব্যাপারটা কিন্তু মজার। আমার এখনও মনে পড়ে ওই বুলেটবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটা। মনে হয়েছিল, কেউ যেন জোরে একটা চাপড় বসিয়ে দিয়েছে আমার মাথার পেছনদিকে। সিনেমায় দেখা যায়, গুলি খাওয়ামাত্র লুটিয়ে পড়ে অনেকেই। কিন্তু আমার বেলায় সে-রকম কিছু ঘটেনি। একটা হাবার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি তখন। ভাবছিলাম, ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়া সম্ভব হবে আমার পক্ষে। এবং সেটা চালিয়ে নিজেই হাজির হয়ে যেতে পারবো হাসপাতালে। স্পর্শ করলাম জায়গাটা। দেখতে পেলাম, আঙুলে রক্ত লেগে গেছে। মাত্র দু’কদম আগে বাড়তে পারলাম, আর তার পরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। জ্ঞানটা ফিরল প্রায় এক সপ্তাহ পর।’

গাড়ির গতি কমাল ওয়ানার। তাড়াহুড়ো করে ছোট কোনো একটা প্রাণী রাস্তা পার হয়েছে, হারিয়ে গেছে পাশের একটা ঝোপের আড়ালে। ‘ডাক্তাররা কি বুলেটটা বের করতে পেরেছিলেন? নাকি ওটা এখনও রয়ে গেছে ওই জায়গাতেই?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৫৮

‘না, বের করতে পেরেছিলেন।’ হাত বাড়িয়ে আবারও ওই জায়গা স্পর্শ করল পোর্টার। ‘যা হোক, চোখ যখন খুললাম তখন দেখি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হিদার। ঠোঁটের কোনায় ভুবনভোলানো সুন্দর একটা হাসি। সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে গেল আমার, ওকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি।’



তৃতীয় দিন, রাত ৮:০৭

পিডমন্ট হাসপাতালে, ৩১৬ নম্বর রুমের বাইরে, হলওয়াতে দাঁড়িয়ে আছে ক্রেয়ার। দু'হাত মুঠি পাকিয়ে রেখেছে। কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে পাকস্থলীতে। মিনিট দশেক আগে হাজির হয়েছে সিএসআই। ওই ঘর সিল করে দিয়েছে।

‘ক্রেয়ার?’

ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল ক্রেয়ার। এলিভেটর থেকে নামছে ন্যাশ। পরনের মোটা কোটের বোতাম খুলছে। ‘কী ঘটেছে, বলো তো?’

মাথা নাড়ল ক্রেয়ার। যা-যা ঘটে গেছে, টুকরো টুকরো সেসব ঘটনা এখনও জোড়া দেয়ার চেষ্টা করছে সে একটা-আরেকটার সঙ্গে। ‘ওই লোক বিষ খাইয়েছে এই মহিলাকে। অন্তত আমার ধারণা সে-রকমই। আমি জোর করে বমি করিয়েছি মহিলাকে। তাঁকে যখন নিয়ে গেছে প্যারামেডিকরা, তখন তাঁর অবস্থা ঠিক ছিল। অবশ্য এখন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন।’

‘বেঁচে আছেন তো?’

‘হ্যাঁ। বেঁচে আছেন এখনও।’ দু'কদম এগিয়ে গেল ক্রেয়ার, ওর পিঠ এখন ন্যাশের দিকে। ‘কীভাবে ঘটছে এসব, বুঝে উঠতে পারছি না। ওই হারামজাদাটা সবসময় আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকছে কী করে?’

‘তাকে ধরে ফেলবো আমরা।’

যখন ঘুরে তাকাল ক্রেয়ার, ওর চোখে পানি দেখা গেল। ‘কথা ছিল, আমি রক্ষা করবো ওই মহিলাকে। কিন্তু আমার ওপর টেক্কা মেরে দিল লোকটা। আমার নাকের ঠিক নিচ থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মহিলাকে।’

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার কায়দায় জড়িয়ে ধরল ন্যাশ। ওর কাঁধ একটুখানি ডলে দিল আন্তরিক ভঙ্গিতে। ‘দোষ তোমার না, ক্রেয়ার। তুমি যে অন্য কিছু একটা করবে, সে-উপায়টা পর্যন্ত ছিল না।’

‘এ-রকম কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে, দেখা উচিত ছিল আমার। র্যাভাল ডেভিসের বেলায় কী ঘটেছে? তাঁদের বাসায় গিয়ে ঢুকে পড়েছে আমাদের অচেনা সেই লোক। তাঁর কফিতে বিষ বা লিসিনোপ্রিল মিশিয়ে দিয়েছে। লোকটা জানত, ওই বাড়িতে কফি খান কেবল র্যাভাল ডেভিস। এবং তাঁকেই টার্গেট করেছে সে। এবং এবার সে কী করেছে? এবার সে বিষ মিশিয়েছে ডার্লিন বিয়েলের ব্যক্তিগত কোনো একটা জিনিসে... হতে পারে সেটা তাঁর মাউথওয়াশ, হতে পারে সেটা তাঁর টুথপেস্ট। কিন্তু সে জানত, ওই জিনিসটা নিয়ে নিয়মিত কাজে বেরিয়ে পড়েন মহিলা। তাঁর ট্রাভেল ব্যাগটাতে হাত লাগাতে সক্ষম হয়েছিল সে। এবং বিষ

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৬০

মিথিয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছিল। র‍্যান্ডাল ডেভিস যে-কায়দায় মারা গেছেন, তারপর আমার উচিত ছিল, এ-রকম কোনো ঘটনা যে ঘটতে পারে, সেটা আগেভাগেই দেখে নেয়া। উচিত ছিল...' কণ্ঠ ভেঙে গেল ক্লেয়ারের। ন্যাশের কাঁধে নিজের মুখ চেপে ধরল সে।

‘ডিটেকটিভস?’

ন্যাশের কাছ থেকে সরে গেল ক্লেয়ার, চোখ মুছল। বিব্রত হয়ে গেছে। ‘হ্যাঁ?’
ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেটর লিভিসি রোফস দাঁড়িয়ে আছে হোটেল রুমের দরজায়। ক্লেয়ারকে নিজের আলিঙ্গন থেকে ছেড়ে দিল ন্যাশ, দৃশ্যটা দেখেও না দেখার ভান করল রোফস। ‘আপনি ঠিকই বলেছিলেন। মহিলার শরীর থেকে বিষের যে-নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেছি আমরা, সেটার ফলাফলে সায়ানাইড পাওয়া গেছে।’

‘টুথপেস্ট থেকে, নাকি মাউথওয়াশ থেকে?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

‘টুথপেস্ট। ওই টিউবের গায়ে ছোট্ট একটা ছিদ্র খুঁজে পেয়েছি আমরা। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, হাইপোডার্মিক সূঁইয়ের সাহায্যে ওই বিষ টুথপেস্টের টিউবের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল লোকটা। এবং সেটা সে করেছিল টিউবের মুখ থেকে ইঞ্চিখানেক নিচে এক জায়গায়। এমনও হতে পারত, টানা কয়েক দিন ওই টুথপেস্ট ব্যবহার করছেন মহিলা, অথব বিষের সঙ্গে কোনো রকম সংস্পর্শ ঘটছে না তাঁর। অচেনা সেই লোক যদি টিউবের নিচের দিকে ইনজেক্ট করত বিষটা, তা হলে হয়তো বিষের সংস্পর্শে আসতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যেত মহিলার।’

লম্বা করে দম নিল ক্লেয়ার। কিছু বলার আগে শব্দ তুলে বেরিয়ে যেতে দিল বাতাসটাকে। ওর ওপর একের পর এক টেক্কা মেরে চলেছে ওই লোক... এ-রকম চলতে দিতে পারে না সে। ‘আর কিছু জানা গেল?’

গ্লাভ পরিহিত একটা হাত দিয়ে নাকের ওপর নেমে আসা চশমাটা ঠেলে জায়গামতো তুলে দিল রোফস। ‘আপাতত ও-টুকুই। ওই মহিলার ব্যক্তিগত আরও কিছু জিনিস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি আমরা। আপাতত ল্যাভে যাচ্ছি আমি, কাজটা শেষ করবো সেখানেই।’

‘মহিলার স্বামীর ব্যক্তিগত কোনো জিনিসে কিছু পাওয়া যায়নি?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

‘এখন পর্যন্ত সে-রকম কোনো কিছু পাইনি আমরা। যদি কোনো কিছু পাই, আপনাকে ফোন করবো।’ ঘুরল মেয়েটা, গিয়ে ঢুকে পড়ল ওই হোটেল রুমের ভেতরে।

খুঁতনিটা কিছুক্ষণ ডলল ক্লেয়ার। একটা বৃত্ত রচনা করে হলওয়েতে হেঁটে বেড়াতে লাগল ধীর গতিতে। ‘এবার কিন্তু শোকসংবাদ ছাপা হয়েছিল ডার্লিন বিয়েলের নামে। এবার তিনিই ছিলেন টার্গেট। তার মানে হচ্ছে, আমাদের অচেনা এই লোক কয়েকটা মেয়ের শুধু যে বাবাদের পেছনে লেগেছে, তা না, কারও কারও



মায়ের পেছনেও লেগেছে। কোনো না কোনো একটা যোগসূত্র অবশ্যই আছে এসব মেয়ে এবং তাদের বাবা-মায়েদের মধ্যে। আমাদের যা করতে হবে তা হলো, সূত্রটা খুঁজে বের করতে হবে।’

‘তোমার একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার,’ ক্রেয়ারকে বলল ন্যাশ। ‘টানা দুটো দিন ধরে দৌড়ে বেড়াচ্ছ তুমি, অথচ বলতে গেলে তেমন কিছু খাওনি। এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কোনোকিছু চিন্তা করাটা সম্ভব না তোমার পক্ষে। তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম, পারতাম না।’ কণ্ঠ নিচু করল সে। ‘এই হাসপাতালে যখন হাজির হলাম আমি, গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। সিট বেল্ট খুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এক কি দুই মুহূর্ত বসে থাকলাম ওভাবে। কেন উঠতে পারলাম না, বুঝবার চেষ্টা করছিলাম সেটা। রুটি যেভাবে সেকা হয়, আমার মনে হচ্ছে আমার মগজটাও সেভাবে সেকে ফেলা হয়েছে... গত কয়েক দিনে অনেক বেশি ভেবে ফেলেছি আমি আসলে। আমাদের সবারই একটু বিশ্রাম দরকার। তারপর আবার একত্রিত হয়ে নেমে পড়তে হবে কাজে।’

মাথা নাড়ছে ক্রেয়ার। ‘মেট্রো পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে যাচ্ছি আমি। ওই বোর্ডগুলো নিয়ে কাজে লেগে পড়তে হবে। সেখানে লেখা তথ্যগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে আবারও। জানি, কিছু না কিছু একটা আছে সেখানে। বিয়েল দম্পতির মেয়েকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সম্ভাবনা আছে, এখনও বেঁচে আছে মেয়েটা। সে নিখোঁজ হয়েছে মাত্র একদিন হতে চলল।’

‘আমরা আমাদের ফোর্সের বলতে গেলে অর্ধেক লোককে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি... তন্নতন্ন করে খুঁজছে তারা মেয়েটাকে।’

‘যা হোক, অফিসে ফিরে যাচ্ছি আমি।’

ন্যাশ জানে, হেরে যাওয়া এক লড়াই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে ক্রেয়ার। ‘ঠিক আছে, কিন্তু দুটো শর্ত আছে। এক, অফিসে যাওয়ার পর সেখানে যে-কাউচ আছে, সেটাতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে তুমি। দুই, আমি গাড়ি চালিয়ে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসবো তোমাকে, মানা করতে পারবে না। এই অবস্থায় গাড়ি চালানো সম্ভব না তোমার পক্ষে। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে এখনও গা কাঁপছে তোমার। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলো, আমার আশঙ্কা সেটা বড় কোনোকিছু হবে।’

‘নিজের জীবনের জন্য আমাকে নির্ভর করতে বলছেন সেই লোকের ওপর, যে কিনা সিট বেল্টটা পর্যন্ত ঠিকমতো খুলতে ভুলে যায়?’

‘আপন বলতে এখন এই এক আমিই আছি তোমার জন্য।’

‘ঈশ্বর সহায়তা করুন আমাদেরকে।’

ভোঁ ভোঁ করে উঠল ক্রেয়ারের ফোন। পকেট থেকে ওটা বের করল সে। টেক্সট মেসেজটা পড়ল। চুপসে গেল ওর হৃৎপিণ্ড। ‘ট্রাকটা খুঁজে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে হারিয়ে যাওয়া ওয়াটার ট্যাঙ্কটাও। সেই সঙ্গে আরও একটা লাশ পেয়ে গেছি আমরা।’

৭৫.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, রাত ৮:০৭

আওয়াজ করে উঠল জিপিএস। জানান দিচ্ছে, এবার ডান দিকে মোড় নিতে হবে ওদেরকে। গাড়ির গতি কমাল সারা। ওই চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে সিম্পসনভিলের উদ্দেশে।

বাইরে তাকিয়ে ছিল, আবার জানালার ওপর ফিরে এল পোর্টারের দৃষ্টি। ‘যখন দেখলাম আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে হিদার, আমার পার্টনারকেও দেখতে পেলাম তখন। রুমের কোনায় একটা চেয়ার ছিল, ওটা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল সে। ঘন্টাখানেক পর হাজির হন আমাদের ক্যাপ্টেন। একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগে আমার। আমি চিনতে পেরেছিলাম ওকে... আমার পার্টনারের কথা বলছি। কোথাও যে কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে, ঠাহর করতে পারিনি তখন। মনে পড়ে গেল সেই ড্রাগবিক্রেতার কথা... ধাওয়া করছিলাম লোকটাকে। মনে পড়ে গেল সেই গুলির কথা। সবকিছুই টাটকা একটা স্মৃতি হিসেবে ফিরে এল আমার মনের পর্দায়। হিদার তখন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করল। একটুও দেরি না করে বলে দিলাম, আমি ওর জীবনের ভালোবাসা। সে-সময়ের প্রেসিডেন্টের নাম জানতে চাইল সে। বললাম। তারপর সে বলল, “বলুন তো, আমাদের দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের আগে কে প্রেসিডেন্ট ছিলেন?” সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁপা হয়ে গেল আমার। আমার বিশেষ এই অনুভূতি বর্ণনা করার আর কোনো উপায় জানি না। আজও মনে হয় আমার, কেউ যেন একটা ইরেজার তুলে নিয়েছিল হাতে, আর সেটা দিয়ে আমার স্মৃতি থেকে মুছে দিয়েছিল বিশেষ সেই নাম। সে-সময়ের প্রেসিডেন্টের আগের প্রেসিডেন্টের চেহারা স্পষ্ট মনে করতে পারছিলাম আমি, কিন্তু তাঁর নামটা মনে করতে পারছিলাম না কিছুতেই। এবং এই ব্যাপারটা ঠাহর করতে পারার পর আমাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিলেন ডাক্তাররা।’

‘কোনো একজাতের অ্যামনেশিয়া, তা-ই তো?’

‘ফুইড ইলিসিট রেট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়া... ডাক্তারি পরিভাষা অনুযায়ী। আমার যে হাঁটাচলা করতে অথবা হাত-পা নাড়াতে কোনো সমস্যা হচ্ছিল, তেমনটা না... কপালটা ভালো ছিল আর কী। এবং আমার স্মৃতিতে যেসব তথ্য ছিল, সেসবের বেশিরভাগই ঠিক ছিল। আমার ছেলেবেলার কথা বলুন, কিশোর-বয়সের কথা বলুন, এমনকী সাম্প্রতিক সময়ের বেশিরভাগ ঘটনার কথা বলুন... মনে করতে পারছিলাম প্রায় সবই। কিন্তু তারপরও স্মৃতির পর্দায় কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছিল বড় আর কালো কিছু দাগ। স্মৃতির খাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আমার জীবনের কোনো কোনো মাস, কোনো কোনো বছর।’ একটা মুহূর্তের জন্য

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৬৩



অরাজকতা



থামল পোর্টার। জানালার কাছে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে আঙুল দিয়ে। ‘আমি যাতে স্মরণ করতে পারি, সেজন্য একটা ব্যায়াম দেয়া হলো আমাকে। আর সেই ব্যায়াম করতে আমাকে সাহায্য করতে লাগল হিদার। সময়ের হিসেব অনুযায়ী আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা লিখিয়ে নিত সে আমাকে দিয়ে। কোন ঘটনা করে ঘটেছে, তারিখ অনুযায়ী লিখতে বলত... যতখানি আমার পক্ষে সম্ভব আর কী। প্রতিদিন এই কাজ করতাম আমরা। শুরু করতাম খালি একটা সাদা কাগজ নিয়ে। যা-যা মনে করতে পারতাম আমি, সব লিখে ফেলতাম ওটাতে। প্রথম কয়েক দিন, যতবার চেষ্টা করছিলাম আমি, তালিকাটা বড় হচ্ছিল। তার মানে উন্নতি করতে পারছিলাম আর কী। সপ্তাহখানেক পর বন্ধ হয়ে যায় সেটা। আমার স্মৃতি থেকে নতুন করে মুছে যাচ্ছিল না কিছুই। কিন্তু যেসব কালো দাগের কথা বলেছি একটু আগে, সেসব যেন শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিল স্মৃতির বিশেষ কিছু জায়গায়। ডাক্তাররা তখন আমাকে আশ্বস্ত করলেন... ওসব ঘটনা সময়মতো মনে পড়ে যাবে। কিছু কিছু ঘটনা ফিরে এসেছে বলে মনে হয় আমার। কিন্তু আজকের দিন পর্যন্ত কিছু কিছু ঘটনা অন্ধকারেই রয়ে গেছে আমার জন্য।’

‘যতদিন এসব চলছিল, হিদার আপনার সঙ্গেই ছিলেন?’

মাথা ঝাঁকাল পোর্টার। ‘ওকে ডেটিঙে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগপর্যন্ত রাজি হয়নি সে। যা হোক, গুলি খাওয়ার মাসখানেক পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাই। আমি আর হিদার তখন আমাদের মাঝখানে একটা স্কলিঙ্গ অনুভব করতে পারি যেন। বুঝতে পারি, কিছু একটা ঘটে গেছে আমাদের ভেতরে। কোনো হাসপাতালে যখন অনেকদিন ধরে থাকে কোনো রোগী, তার সেবায়ত্ন করে যে-মানুষটা, দেখা যায় সে-মানুষটার ওপর এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছে ওই লোক। সাধারণ একটা ঘটনা এটা। কিন্তু আমি জানতাম, হিদারের প্রতি আমার যে-দুর্বলতা, সেটা, এইমাত্র যে-দুর্বলতার কথা বললাম, তার চেয়ে বেশি কিছু। যা হোক, হিদারের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতে লাগল আমার। উদ্দেশ্য একটাই... আমাকে লিখে যেতে হবে আমার সেই “তালিকা”। হিদার আমাদের এই অভিসারের নাম দিয়েছিল “রানিং দ্য লিস্ট”। অফিশিয়াল ডেটিং বলতে যা বোঝায়, সেটাতে যেতে রাজি হচ্ছিল না সে এতকিছুর পরও। একসময় আবারও যোগ দিতে পারলাম আমি পুলিশ ফোর্সে। অর্থাৎ আমি সেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মাস তিনেক পর। তখন আমার সঙ্গে একদিন বাইরে যেতে রাজি হলো হিদার... ডিনার করবো আমরা, একসঙ্গে সিনেমা দেখবো। দ্য প্রিন্সেস ব্রাইড মুভিটা দেখেছিলাম আমরা। এই ঘটনার মাস চারেক পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই দু’জনে।’

‘হারিয়ে যাওয়া এই যে সময়, এটা নিয়ে বিরক্তি লাগে না আপনার?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পোর্টার। ‘আমার জীবনের সেরা স্মৃতিগুলো হিদারকে নিয়ে। আমরা দু’জন একসঙ্গে যত সময় কাটিয়েছি, সব মনে করতে পারি আমি। আর তাই অন্য কোনো স্মৃতির দরকার নেই আমার।’

‘আপনার সেই পুলিশ ফোর্সের কী হলো? কর্তব্য পালনে কোনো সমস্যা হতো?’

‘কিছু না কিছু সমস্যা তো হতোই। কিন্তু ওসব বাদ দিয়ে যদি বলি, ঠিকই ছিলাম আমি। শারীরিক দিক দিয়ে আমার কোনো সমস্যা ছিল না। আবারও কাজ শুরু করার জন্য আমাকে কয়েকটা লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। শারীরিক কিছু পরীক্ষাও দিতে হয়েছিল। অংশ নিই ইন্টারভিউতে। তারপর আবার কাজ শুরু করার সুযোগ পেয়ে যাই। তবে হ্যাঁ, পার্টনার বদল হয়ে গিয়েছিল আমার। আগেরজনকে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরে বদলি করে দেয়া হয়েছিল ফুলটাইমের জন্য। বিশেষ এই ঘটনা আমার জীবন থেকে আরও কিছু একটা কেড়ে নিয়ে যায়।

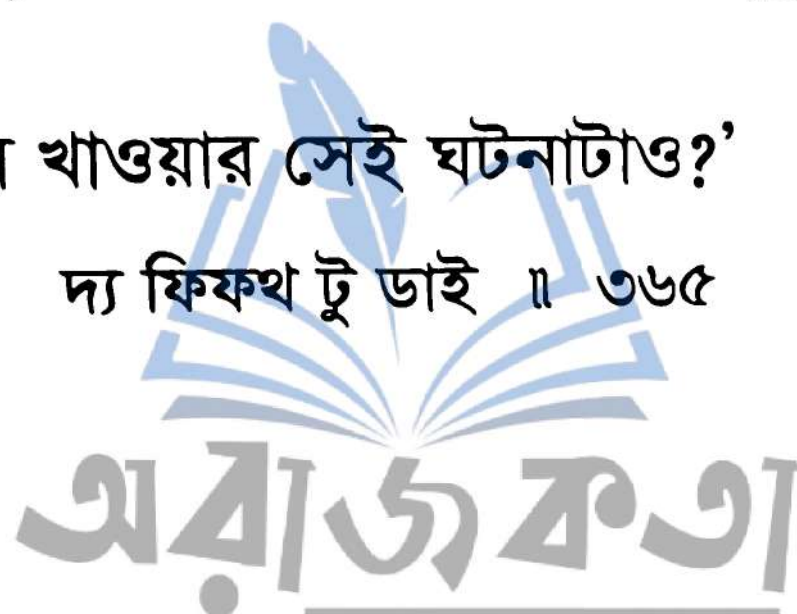
‘চার্লসটন শহরটা ততদিনে বলতে গেলে ধ্বংস হয়ে গেছে। ওই শহর আমার কাছে আরও বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হতো। আরও বেশি নোংরা বলে মনে হতো। যে-গলিতে ঘটে গিয়েছিল এত সব ঘটনা, সেটার ধারে-কাছে গেলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতাম। একটা সময় মনে হতে লাগল, এই উদ্বেগ যেন আহত করে দিচ্ছে আমাকে। মনে হতে লাগল, ভুল কোনো মুহূর্তে যেন চিত্তবিক্ষেপ ঘটছে আমার। আমি আর হিদার এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, শিকাগোতে চলে আসবো... নতুন কোনো জায়গায় সবকিছু নতুনভাবে শুরু করা আর কী। বদলির আবেদন করলাম শিকাগো মেট্রো পেক্ট্রোলে। তারপর যখন হোমিসাইডে একটা সুযোগ এসে গেল, লুফে নিলাম সেটা। এসব অনেকদিন আগের কথা। আমাকে তখন, এখনকার তুলনায়, ছোকরাই বলা চলে।’

‘বাচ্চাকাচ্চা নেননি আপনারা?’

‘নেয়ার কথা ভেবেছিলাম। যতবার গণনা করা সম্ভব আমার পক্ষে, তার চেয়েও বেশিবার কথা বলেছিলাম এই ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সময়টা কখনোই উপযুক্ত মনে হয়নি আমাদের কারও। উঠতি তারকা বলতে যা বোঝায়, শিকাগো জেনারেল হাসপাতালে অনেকটা সে-রকম একজন নার্স ছিল হিদার। ওদিকে আমিও তখন ভালো করছি শিকাগো মেট্রো পুলিশে। আমরা নিজেদেরকে তখন প্রতি বছরই বলছি, বাচ্চা নেয়ার জন্য আগামী বছরটা ভালো একটা সময় হবে। বলছি, আগামী বছর আর এত ব্যস্ততা থাকবে না, সবকিছু একটু থিতিয়ে আসবে। খরচাপাতি হাতের নাগালে চলে আসবে। আর তাই, প্রতি বছরই আমরা বার বার মনে করেও ভুলে যাচ্ছিলাম বাচ্চা নেয়ার কথাটা। তারপর একদিন হঠাৎ করেই উপলব্ধি করতে পারলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। যা হোক, এই যে বাচ্চাকাচ্চা শেষপর্যন্ত হলো না আমাদের, এটা নিয়ে কোনো আফসোস নেই আমার। মনে হয় না, জীবনের একটা কোনো মুহূর্ত সামান্য একটুখানি বদলও করতে পারতাম আমি।’

‘এমনকী মাথায় গুলি খাওয়ার সেই ঘটনাটাও?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৬৫





‘হ্যাঁ, এমনকী মাথায় গুলি খাওয়ার সেই ঘটনাটাও। আরে, ওখানে একটু থামুন তো!’ হাতের ডান দিকে কাছিয়ে আসছে ছোট একটা স্টপ-অ্যান্ড-গো পেট্রোল পাম্প, আঙুলের ইশারায় ওটা দেখিয়ে দিল পোর্টার।

‘কীসের জন্য থামতে চাইছেন? গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্ক তো প্রায় ভর্তি।’

‘কিছু জিনিসপত্র নিতে হবে।’

গাড়ির গতি কমাল সারা। দুই লেনের সরু হাইওয়ে থেকে নুড়িপাথরে-ছাওয়া পার্কিং লটে নামাল গাড়িটা। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে একটা সেটার, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বহুল ব্যবহৃত একটা ফোর্ড পিকআপ। এগুলোর কথা বাদ দিয়ে বললে, পুরো এলাকা পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। ওই পিকআপের পাশে নিয়ে গিয়ে গাড়ি থামাল সারা, পার্ক করল। বিশপের ডায়েরিটা হাতে নিয়ে দেখাল পোর্টারকে। ‘যান, কী কী লাগবে আপনার, জোগাড় করে নিন। এই ডায়েরিতে এমন কিছু জায়গা আছে, যেগুলোর ওপর আরও একবার নজর বুলিয়ে নিতে চাই আমি।’

‘আসছি তা হলে।’ সিটবেল্ট খুলে ফেলল পোর্টার। বেরিয়ে পড়ল।

ওই দোকানের দরজা ঠেলে যখন ঢুকল সে, একটা ইলেকট্রনিক ঘণ্টা বেজে উঠল কোথাও। কাউন্টারের পেছনে বসে আছে একজন ক্লার্ক, মুখ তুলে একটা মুহূর্তের জন্য তাকাল পোর্টারের দিকে। অটোম্যাটিক-এর একটা কপি তার হাতে, আবার মনোযোগ দিল ওই ম্যাগাজিনে।

দোকানটা বেশি বড় না; এখানে হাঁটাচলা করার জন্য শেলফের আশপাশে পথের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। প্রতিটা পথেই একবার করে হানা দিল পোর্টার। দুটো ফ্ল্যাশলাইট নিল। সি-সেল ব্যাটারি নিল এক বাক্স। জিপলক ব্যাগ এবং লেটেক্স গ্লাভস নিল এক বাক্স করে। সস্তা একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দেখতে পেয়ে নিল ওটাও। চিটোস চিপসের বড় একটা প্যাকেটও নিল। এসব বহন করে নিয়ে এল দোকানের সামনের দিকে, কাউন্টারের ওপর রাখল।

ক্যাশিয়ারের বয়স ষোলো কি সতেরো বছরের বেশি মনে হচ্ছে না কিছুতেই। তার গোলাপি খুঁতনিতে বড় একটা ফুসকুড়ি আছে। নাকটাও সরু চেহারার তুলনায় বেজায় বড়। হাতেধরা ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রাখল। মাথা ঝাঁকাল পোর্টারের উদ্দেশে। যা-যা নিয়ে এসেছে পোর্টার, দেখছে সেসব। গ্লাভসের বাক্সটা বারকোড রিডারে চারবার স্ক্যান করতে হলো তাকে, তারপর মূল্য জানা গেল সেটার। খানিকটা কৌতূহল অনুভব না করে পারল না পোর্টার... এই ছোকরাকে যদি যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া হিসেবের কাজটা করতে বলা হতো, তা হলে সেটা সে পারত কি না।

‘তেইশ ডলার আটচল্লিশ সেন্ট,’ মোট দাম কত হয়েছে, জানিয়ে দিল ছোকরা।

তাকে পঁচিশ ডলার দিল পোর্টার। যা-যা কিনেছে, সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছোকরা তখন খুচরো টাকা গুনে নিজের জন্য আলাদা করে নেয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

গাড়িতে ঢুকে চিটোসের প্যাকেটটা আলাদা করে নিল পোর্টার। তারপর ব্যাগটা রেখে দিল গাড়ির মেঝেতে। তাকাল সারার দিকে। ডায়েরিটা খোলা অবস্থায় স্টিয়ারিং হুইলের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখেছে মহিলা, পড়ছে এখনও। পোর্টারের উপস্থিতি টের পেয়ে পড়া থামাল, সরিয়ে রাখল ওই ডায়েরি। ওর পাশে বসে যখন সিটবেল্ট বাঁধছে পোর্টার, তখন রওয়ানা করল আবার। উঠল হাইওয়েতে।

‘আপনি পুরো ডায়েরিই পড়লেন, অথচ ওটার ব্যাপারে একটা কোনো কথা বললেন না। কী মনে হচ্ছে আপনার, বলুন তো?’

শব্দ করে দম ছাড়ল সারা। ‘কী যে মনে করবো আর কী যে করবো না, বুঝতে পারছি না। ওই ছেলের জন্য কিছুটা যে খারাপ লাগছে না আমার, তা না। কিন্তু যখনই মনে পড়ে যাচ্ছে কত মানুষকে আঘাত করেছে সে, যখনই মনে পড়ে যাচ্ছে কত মানুষের জীবন বরবাদ করে দিয়েছে, ততবার আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই ডায়েরির লেখক আসলে একটা দানব ছাড়া আর কিছু না। তার মায়ের কথাও বলতে হয়। মহিলা জেলখানায় কী বলেছে আমাদেরকে? ডায়েরিতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সব ঘটনা নাকি সেভাবে ঘটেনি। এই কথার মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছে সে? কোনো ঘটনাই কি ডায়েরির বর্ণনামতো ঘটেনি? নাকি কোনো কোনো ঘটনা ঘটেনি? হুঁশ’ মাইল উড়ে এসেছি আমরা। কারণ কী? অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কেউ একজন বিশেষ একটা ঠিকানা লিখে দিয়েছে এই ডায়েরিতে।’

পোর্টার কিছু বলল না।

ওর কোলে ডায়েরিটা আলতো করে ছুঁড়ে মারল সারা। ‘আমাকে কিছু চিটোস দিন তো।’

প্যাকেট খুলে ওটা ওই মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিল পোর্টার।

একটা চিটোস নিল সারা, চালান করে দিল মুখের ভেতরে। ‘প্রশ্ন হচ্ছে, এই ডায়েরিতে যা-যা বলা হয়েছে, আমার মক্কেল সেসব কাজের অর্ধেকও করেছে কি না আসলেই?’ মাথা নাড়ল সে। আঙুল চাটল। ‘ও-রকম ভয়ঙ্কর কারও প্রতিনিধিত্ব করা তো সম্ভব না আমার পক্ষে। কিছুতেই না।’

আওয়াজ দিয়ে উঠল জিপিএস। বাঁ দিকে মোড় নিতে বলছে ওদেরকে। বলছে, আর হাজার ফুট এগোলে জেনকিন্স ব্রিজ রোডে হাজির হয়ে যাবে ওরা। ব্রিঙ্কারে ক্লিক করল সারা।

শহর ছাড়ার পর প্রকৃতির যে-অবস্থা দেখেছিল পোর্টার, তাতে আশপাশ ঘোর অন্ধকারে ঢাকা বলে মনে হয়েছিল ওর। আর এখন মনে হচ্ছে, অবস্থা আরও



থারাপ হয়েছে। যতদূর চোখ যায়, একটা কোনো বাড়ি বা গাড়ি নেই। আছে শুধু রাস্তা। আর আছে কৃষিজমি।

জেনকিন্স ব্রিজ রোডটা বাঁধাই করা, কিন্তু এবড়োখেবড়ো। রাস্তার মানবপানের বড় একটা গর্ত এড়ানোর জন্য স্টিয়ারিং ধরে বাঁ দিকে মোচড় দিল সারা। এবং তার পর পরই আরও একটা গর্ত এড়ানোর জন্য ডানদিকে মোচড় দিতে হলো ওকে। রাস্তার দু'পাশের অংশগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে প্রকৃতি। ঢালাইয়ের কাজটা সারা হয়েছিল আলকাতরার সাহায্যে, জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে কালো সেসব অংশ, সেখান থেকে এখন বেরিয়ে আছে নলখাগড়া আর আগাছার জঙ্গল। রাস্তার কোনো কোনো অংশে আবার চিড় ধরেছে।

জিপিএস জানিয়ে দিল, আর এক শ' ফুট এগোনোর পর বাঁ দিকে মোড় নিতে হবে। গাড়ির হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল করে দিয়ে মোচড় কাটল সারা। 'কোন দিকে বাঁক নিতে হবে, কিছু দেখতে পাচ্ছেন? আমি কিন্তু ও-রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সত্যি বলতে কী, আমি কোনোকিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

সামনের দিকে ঝুঁকল পোর্টার। 'ওই যে, পৌঁছে গেছি মনে হয়। বড় একটা পাথর দেখতে পাচ্ছেন না? ওটার ঠিক পরেই।'

বাঁ দিকে মোড় নিল সারা। রাস্তাটা এখন নুড়িপাথর আর ঘাসের একটা মিশ্রণ বলে মনে হচ্ছে। 'আপনি যদি এই জায়গায় আমাকে খুন করেন, আর তারপর আমার লাশ অগভীর কোনো এক কবরে নামিয়ে দেন, তা হলে আমি যে-মাছটা পালি, সেটার জন্য অন্তত ভালো কোনো বাসার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

'মাছ পালেন নাকি আপনি?'

'একটা। ওটার নাম মনরো। শ্রোতা হিসেবে এককথায় দারুণ। বিচারবুদ্ধিও খানিকটা আছে বলে মনে হয়।'

কৃষিজমির পরিমাণ শেষ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন চোখে পড়ছে গাছপালার বিস্তার। ডগউড, ওক, এভারগ্রিন... চলতি পথে ওদের গাড়ির ওপর যেন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে ওসব। সরু পথের ওপর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে ওগুলো। হাড় জিড়জিড়ে কিছু আঙুল একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরে রাখলে যেমন দেখায়, ওসব ডালপালা যেন জড়াজড়ি করে আছে ঠিক সেকায়দায়।

'আপনার গন্তব্য আর এক শ' ফুট দূরে আছে,' জানান দিল জিপিএস। 'ডানদিকে দেখা যাবে সেটা।'

ড্রা কুঁচকে ফেলল সারা। 'কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না? আপনি পাচ্ছেন? কী মনে হয় আপনার... মহিলা মিথ্যা কথা বলেছে?'

'কী যে মনে করবো আমি, বুঝতে পারছি না।'

জিপিএস-এর পরবর্তী ঘোষণাটা কেমন যেন খুশি খুশি শোনাল: 'চলে এসেছেন আপনি।'

ব্রেক প্যাডেলে জোরে চাপ দিয়ে গাড়ি থামাল সারা। ‘কিছুই নেই এখানে। ওই মহিলা আমাদেরকে নিয়ে খেলেছে আসলে।’

উইন্ডশিল্ড ভেদ করে তাকিয়ে আছে পোর্টার। সামনে দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা ধীরে ধীরে গায়েব হয়ে গেছে যেন... বুনো কিছু ঝোপঝাড় আর গাছপালার আড়ালে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে। ওসব ছাড়িয়ে ঘন একটা জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সিট বেল্ট খুলে ফেলল সে, দরজা খুলল। বেরিয়ে পড়ল রাতের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসে।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বের হলো সারাও।

রাস্তার নুড়িপাথরে মচমচ আওয়াজ তুলেছে পোর্টারের জুতো। রাস্তার একটা পাশ ধরে এগিয়ে চলেছে সে। ওর মনে হচ্ছে, শক্তি বলতে যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল শরীরে, সব বেরিয়ে যাচ্ছে যেন আস্তে আস্তে। নুয়ে পড়েছে কাঁধ দুটো। ‘আমি একটা গাধা,’ বলল সে। ‘এই ব্যাপারটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।’

গাড়ির একটা কোনা ঘুরে এগিয়ে এল সারা, দাঁড়াল পোর্টারের পেছনে। একটা হাত রাখল পোর্টারের কাঁধে। ‘আপনি ভালো একজন পুলিশ অফিসার। একটা সূত্র পেয়েছিলেন, সেটার পেছনে ধাওয়া করেছেন। সব সূত্র যে সবসময় কাজে লেগে যায়, এমন তো না।’

ওদের হাতের বাঁ দিকে, ঝোপঝাড় ভেদ করে দ্রুত ছুটে এল কিছু একটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পোর্টার। দেখতে পেল, একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ তাকিয়ে আছে ওদের দু’জনের দিকে। থমকে গিয়ে একটা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকল ওই চোখ দুটোর মালিক। তারপরই গায়েব হয়ে গেল ঝোপজঙ্গলের আড়ালে। ‘কী ওটা?’

‘আমার ধারণা রেকুন-টেকুন কিছু একটা হবে।’

বাঁ দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেল পোর্টার। ‘জন্তুটার কথা বলিনি আমি...’

একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। কিছু একটাকে অবলম্বন করে ঘন হয়ে জন্মে আছে লতাগুল্ম, ওটা জড়িয়ে ধরল ওর আঙুলগুলো...

‘কোনো মেইলবক্স নাকি?’

ওসব লতাগুল্ম ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে পোর্টার। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা মিলল একদিকে-কাত-হয়ে-থাকা একটা খুঁটির। সেটার মাথায় বসানো আছে সাদা একটা বাক্স, তবে ভেঙে গেছে বাক্সটা।

বাক্সের গায়ে, কালো কালিতে লেখা আছে কিছু একটা; কালের ছোবলে মলিন হয়ে গেছে লেখাটা। ওই লেখার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে পোর্টার। অনুজ্জ্বল আলোয় লেখাটা পড়া যায় কি যায় না।

বিশপ।



শিকাগো মেট্রো পুলিশের বেসমেন্ট অফিসে ঢুকে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক পুল। জ্বালিয়ে দিল লাইটের সুইচ। গুঞ্জন তুলে প্রাণ পেল ফুরোসেন্ট আলো। হলুদ একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল পুরো জায়গায়। নাক কুঁচকে উঠল ওর। দূরের একটা কোনা থেকে কেমন অদ্ভুত গন্ধ আসছে। ওটা কীসের গন্ধ, আজও ঠাহর করতে পারেনি ওরা... মানে, এফবিআই-এর এজেন্টরা। তবে ওই জায়গায় পুরনো একটা ডেস্ক আছে, সেটার নিচে আছে কার্পেট; ওটা তুললে মেঝের একদিকে নজরে পড়ে ডিম্বাকৃতির একটা দাগ। অদ্ভুত সেই গন্ধের উৎস সেটাই।

কোট, স্কার্ফ আর হ্যাট খুলে ফেলল পুল। দরজার কাছে একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওগুলো। গিয়ে হাজির হলো ঘরের মাঝখানে। এখানে আরেকটা ডেস্ক আছে, নিতম্বের ভার ছেড়ে দিল সেটার এককোণায়। ঘরের সামনের দিকে হোয়াইটবোর্ড আছে, তাকিয়ে আছে সেদিকে।

বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত ওর।

ঘুমানো উচিত।

কিন্তু কোনোটাই করতে পারছে না সে।

পুল জানে, যে-মুহূর্তে চোখ দুটো বুজবে সে, ঠিক তখনই হাজির হয়ে যাবে লিবি ম্যাকিনলে... ব্যাপারটা যেন এ-রকম, ওর জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটা। কী ঘটে গেছে, ওকে সেটা ওকে বলার জন্য যেন উদ্গ্রীব হয়ে আছে ওই মেয়ে। কিন্তু পারছে না কাজটা করতে। কেউ একজন চুপ করিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে।

দরজার পাশে, মেঝেতে, নিজের স্কার্ফটা ফেলে গেছে ডিনার।

ওটা আর কোনোদিন তুলতে পারবে না বেচারী।

স্টুয়ার্ট, নিজেকে মনে করিয়ে দিল পুল, ডিনারের নামের প্রথম অংশ স্টুয়ার্ট।

পুলের সঙ্গে তেমন একটা জানাশোনা ছিল না ওই লোকের। স্মৃতি ঘাঁটলে মনে পড়ে, শিকাগো ব্যুরো অফিসে কয়েকবার দেখেছে পুল লোকটাকে। কিন্তু এবারই প্রথম কোনো একটা কেসে একসঙ্গে কাজ করছিল ওরা দু'জন। বিয়ে করেনি ডিনার। বান্ধবী বলতেও কেউ ছিল না তার। অন্তত তেমন কারও কথা কখনও বলেনি সে। ব্যক্তিগত তথ্য বলতে যা বোঝায়, ডিনারের ব্যাপারে সে-রকম কিছু জানা নেই পুলের। জানে না, কোথায় বড় হয়েছে ডিনার। কোন স্কুলে পড়েছে। তার কোনো ভাই বা বোন আছে কি না। স্পেশাল এজেন্ট ইন-চার্জ হার্লস বলেছিল, সে নাকি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবে ডিনারের পরিবারের সঙ্গে। এই “পরিবার” বলতে ঠিক কার কথা বুঝিয়েছিল লোকটা, সেটা আর বলেনি।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৭০

অরাজকতা

পুল জানে, যেহেতু সে-ই শেষবারের মতো জীবিত অবস্থায় দেখেছে ডিনারকে, সেহেতু ডিনারের পরিবারের কারও না কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত তার। এমন কারও সঙ্গে কথা বলা উচিত, যে-মানুষটা স্টুয়ার্ট ডিনারের জন্য ছিল বিশেষ কেউ। মনের গভীরে কোথাও একটা আফসোস টের পেল পুল। ইস্‌স্‌... হাতে যদি আরও কিছু সময় পেত... স্টুয়ার্টের সেই বিশেষ মানুষটা কে, জেনে নিতে পারত।

‘ধেৎ, ডিনার,’ বিড়বিড় করে বলল পুল। মাথা নাড়ছে।

এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে। একেবারে ডানদিকের একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিল নিজের জন্য। সেখানে লিখল:

গ্রিন হাউস ... ৫১৮ ফর্টি-ফাস্ট স্ট্রিট

বিশপ ... সেখানে কবে থেকে লুকিয়ে ছিল?

সবকিছু মুছে ফেলা হয়েছে ... কোনো সূত্র রেখে যাওয়া হয়নি পেছনে ... দ্রুত যাতে পালিয়ে যাওয়া যায়, সে-পরিকল্পনা করা হয়েছিল আগেই

ড্রপ হাউস ... ৫১৯ ফর্টি-ফাস্ট স্ট্রিট

লিবি ম্যাকিনলের নকল পরিচয় ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল সেখানে ... বিশপ কি তা হলে সংঘবদ্ধ কেউ?

লিবি ম্যাকিনলেকে কেন সাহায্য করতে গেল বিশপ?

লিবিই বা কেন সাহায্য করতে রাজি হলো?

তা-ও আবার যে-লোক খুন করেছে তার বোন বারবারা ম্যাকিনলেকে, তাকে?

বিশপ কেন খুন করতে গেল লিবি ম্যাকিনলেকে?

এ-পর্যন্ত লিখে বিরতি দিল পুল। কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না এ-সবের। লিবি ম্যাকিনলেকে যদি কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করে থাকবে বিশপ, তা হলে মেয়েটাকে সে খুন করল কেন? এ-রকম কি হতে পারে, কোনো এক কারণে সাংঘাতিক বাকবিতণ্ডা হয়েছিল ওই দু’জনের মাঝখানে? আর তার ফলে একজন আরেকজনের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, শুরুতে কোনো একজাতের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল দু’জনের মধ্যে। সেটা কী রকম হতে পারে? বিশপ খুন করেছে লিবির বোনকে। শুধু খুন করেছে বললে কম বলা হয় আসলে... প্রথমে অকথ্য নির্যাতন করেছে, তারপর খুন করেছে। আচ্ছা, এ-রকম কি হতে পারে, বিশপ আর লিবি একজন আরেকজনকে চিনত আগে থেকেই? জবাবটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে তাদের সেই পরিচয় কি বারবারার হত্যাকাণ্ডের আগে থেকেই? নাকি লিবি যখন জেলে ছিল, তখন কোনো

একভাবে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল বিশপের? সে-রকম কোনোকিছু যদি ঘটে থাকে, তা হলে কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো রেকর্ড থাকার কথা। চিঠি চালাচালি হবে, একজন আরেকজনকে ফোন করবে, একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা করবে... অথচ কোথাও কোনো রেকর্ড থাকবে না, এ-রকম হতে পারে না।

বোর্ডে একটা কথা লিখল পুল:

স্টেটভিল কারেকশনাল

লিবি ম্যাকিনলের সমস্ত প্রিজন রেকর্ড জোগাড় করতে হবে পুলকে। যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, ওই মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল বিশপ। সেসব মেসেজ যদি জোগাড় করা যায়, কাজে লাগতে পারে।

বোর্ডের আরেকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিল পুল। ড্রপ হাউসের দেয়ালে তিনটা কবিতা আর বিশেষ একটা লাইন লেখা ছিল, বিশপ কেটে ফেলেছিল সেসব; ওই কবিতাগুলো আর লাইনটা লিখল বোর্ডে।

বিশপ কেন পুল আর ডিনারের মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে? ওরা দু'জন ওই ফোন দুটো কাজে লাগিয়ে এটা-সেটা বিভিন্ন ছবি তুলেছিল, সেজন্য? বিশপের কিছু লেখালেখির রেকর্ড রেখে দিয়েছিল, সেজন্য? পুল অবশ্য ধারণা করে নিয়েছিল, বিশপ ওই ফোন দুটো নিয়ে গেছে যাতে কাজের গতি ধীর হয়ে যায় পুলের... অর্থাৎ পুলিশ অথবা অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থার। তাকে পিছু ধাওয়া করছে যে বা যারা, তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চেয়েছিল অনেকখানি। চেয়েছিল, কোনো একজায়গায় গিয়ে যাতে হাজির হতে না পারে পুল, যাতে সাহায্যের জন্য খবর পাঠাতে না পারে। কিন্তু এখন এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না পুল।

বিশপ আশা করছিল, ওর সেই বাড়ি খুঁজে বের করবে ডিটেকটিভ স্যাম পোর্টার, এফবিআই-এর এজেন্টরা না। তার মানে হচ্ছে, সে চেয়েছিল, দেয়ালের সেই লেখাগুলো যাতে খুঁজে বের করতে পারে পোর্টার। চেয়েছিল, ওসব লেখার মানে যাতে বুঝতে পারে পোর্টার। বিশেষ এই ব্যাপারটা মাটি করে দিয়েছে পুল আর ডিনার। জায়গামতো হাজির হয়ে গেছে পোর্টারের আগেই। যে-সময় নাগাদ ঘটনাটা ঘটবে বলে ভেবে রেখেছিল বিশপ, নষ্ট করে দিয়েছে সেটা। ওই দেয়ালের ছবি তুলবার জন্য মোবাইল ফোন বের করেছিল পুল। কিন্তু ডিনার তখন আগ বাড়িয়ে সে-কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয়। পুল কোনো ছবি তুলবার আগেই ওকে থামিয়ে দেয়।

ডিনারকে কেন খুন করেছে বিশপ? কারণ বিশেষ সেই দেয়াল দেখে ফেলেছিল ডিনার? ছবি তুলেছিল সে-দেয়ালের? বিশপ কি ডিনারের ফোনে সেসব

ছবি দেখেছে? পুলের ফোনে কোনো ছবি খুঁজে পায়নি বিশপ, পাওয়ার কথাও না। আর সে-কারণেই কি প্রাণে মারেনি পুলকে? ঠাহর করে নিয়েছিল, দেয়ালের ওসব লেখা দেখেনি পুল?

হতে পারে। সম্ভব ব্যাপারটা।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, ওই দেয়ালের লেখাগুলো দেখেছে পুল। এবং প্রতিটা শব্দ মনে আছে ওর।

কবিতাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে এই মুহূর্তে। বিশেষ করে আন্ডারলাইন-করা শব্দগুলোর দিকে।

বরফ
পানি
জীবন
মৃত্যু
বাসা
ভয়
মৃত্যু

‘শয়তানের সঙ্গে যতক্ষণ না হচ্ছে পরিচয়, ঈশ্বরের ভূমিকায় কী করে করবেন অভিনয়?’ বিড়বিড় করে আউড়াল পুল।

আন্ডারলাইন করা ওই শব্দগুচ্ছের মধ্যে একমাত্র মৃত্যু শব্দটাই দু’বার এসেছে। দুটো শব্দের চারপাশে একটা করে বৃত্ত ঐকে দিল পুল। তারপর নিচের দিকে লিখল:

Death x2

মাথার পেছনদিকে যে-জায়গায় বাড়ি মারা হয়েছে ওকে, ব্যথা করছে জায়গাটা। প্যারামেডিক বলেছে, মৃদু একটা কনকেশন হয়তো হয়েছে ওর। ঘুম দরকার এই অবস্থায়। কিন্তু জানে, ঘুমানো উচিত না এখন। ঘুমাতে চায়ও না। যে-সমস্যায় পড়েছে, সেটা নিয়ে কাজ করে যেতে চায়।

তবে যদি ঘুমাতে পারে, তা হলে মনে হচ্ছে মাথাটা পরিষ্কার হবে।

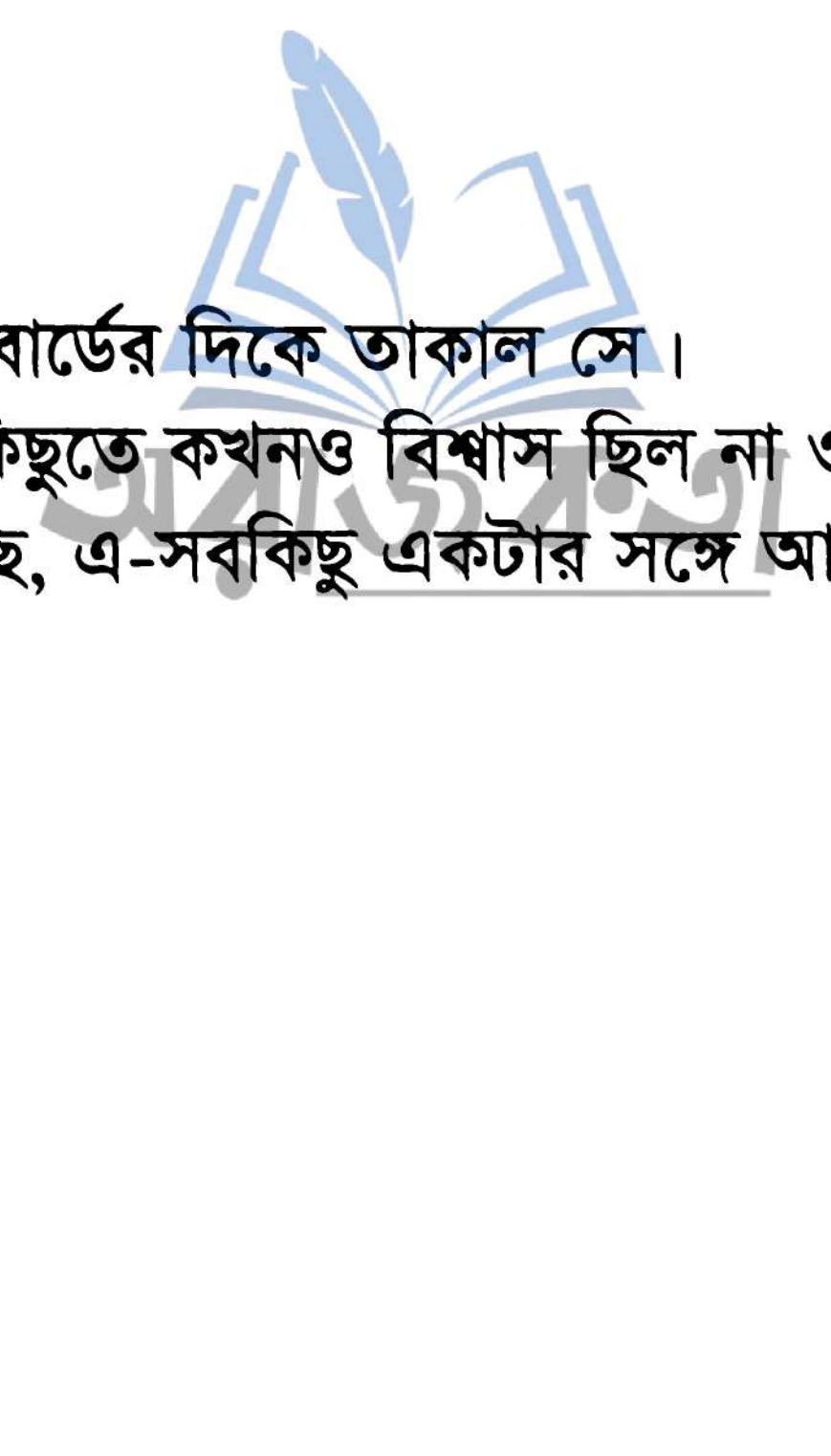
ডেস্কের কাছে ফিরে গেল সে। নিজের ব্রিফকেসটা হাতাচ্ছে। অ্যাডভিলের একটা বোতল খুঁজে পেয়ে বের করল। পানি ছাড়াই খেল তিন চুমুক।

বিশপের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটা বাক্স, ওটার ভেতরে যা-যা ছিল সব বের করে ডেস্কের ওপর রেখেছিল পুল। চোখের সামনে এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু পোলারয়েড ছবি এবং স্প্রেডশিট।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৭৩

এরাজকতা

অরাজকতা



মুখ তুলে আবারও বোর্ডের দিকে তাকাল সে।
কাকতালীয় কোনোকিছুতে কখনও বিশ্বাস ছিল না ওর।
কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ-সবকিছু একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পর্কযুক্ত।

৭৭.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, রাত ৮:০৭

মেইলবক্সের দিকে তাকিয়ে আছে পোর্টার।

ওটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর। বাক্সের গায়ে, একপাশে, নিজের নামটা লিখেছে বিশপ... হাতের লেখা কেমন যেন বাচ্চাদের মতো। পরিচিত বলে মনে হচ্ছে এই মেইলবক্স, এই জায়গা। স্মৃতির পর্দায় ঘাঁটল ডায়েরিটা। কিন্তু ওটার কোথাও এ-রকম কোনো জায়গার বর্ণনা আছে কি না, স্মরণ করতে পারল না। তারপরও কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানে আগে কখনও না কখনও এসেছিল সে। এখন যা-যা দেখতে পাচ্ছে, আগে কখনও না কখনও দেখেছে সেসব।

‘স্যাম? ঠিক আছেন আপনি?’

চোখ বুজে ফেলেছিল পোর্টার। কখন করেছিল কাজটা, মনে করতে পারল না। যখন খুলল, দেখতে পেল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে সারা। মহিলার চেহারা জুড়ে উদ্বেগ। তবে ফেকাসে চাঁদের-আলোয় সে-উদ্বেগ দেখা যায় কি যায় না।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল মহিলা। ‘জেলখানায় এভাবে একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন আপনি আত্মচিন্তায়, আবারও করলেন কাজটা। আমি কিন্তু সত্যিই এখন ভাবছি, কোনো একটা হোটেলে যাওয়া দরকার আমাদের। তারপর আগামীকাল সকালে দিনের আলো যখন ফুটবে, তখন ফিরে আসবো আবার। আমাদের দু’জনেরই একটু ঘুমানো দরকার। তা ছাড়া বড় কথা হচ্ছে, এখন এখানে কোনোকিছুই দেখা সম্ভব না আমাদের পক্ষে।’

পোর্টারের বুকের খাঁচায় বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। এখন ঘুমানো সম্ভব না ওর পক্ষে। অন্তত এই মুহূর্তে তো না-ই। ‘ঠিক আছি আমি। ফ্ল্যাশলাইট কিনেছি।’

গাড়ির দিকে ঘুরল সে। নুড়িপাথরে ছাওয়া রাস্তাটা পার হতে গিয়ে হেঁচট খেয়েছিল আরেকটু হলে। গাড়ির কাছে পৌঁছে ওটার কাঠামোয় ভর দিয়ে দাঁড়াল।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল সারা। ‘আপনি মোটেও ঠিক নেই, স্যাম। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন এখনই। গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসুন। দম নিন। ভূতের মতো ফেকাসে হয়ে গেছে আপনার চেহারা।’

একটা হাত দিয়ে গাড়ির কাঠামো ধরে রাখল পোর্টার। অন্য হাত দিয়ে ডলল মাথার পেছনদিকটা... যেখানে গুলি খেয়েছিল সে-জায়গা। ‘আমি ঠিক আছি।’

যতখানি আশা করেছিল সে, তার চেয়ে বেশি কর্কশ শোনাল ওই শব্দগুলো। এককদম পেছনে সরে গেল সারা।

‘দুঃখিত। এসব যে সত্যি হয়ে যাবে, আশা করিনি আমি।’ ওই ডায়েরির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। ওটা এখনও রয়ে গেছে গাড়ির সামনের সিটে। ‘আশা করিনি, শেষপর্যন্ত সত্যি প্রমাণিত হবে ওই জিনিস। যা হোক, এখন এই জায়গা

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৭৫

ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে। কী আছে এখানে, দেখতে হবে আমাকে। ভয় হচ্ছে... যদি এখন চলে যাই, আগামীকাল ফিরে এসে দেখবো, এই জায়গা আর এখানে নেই। জানি, বোকার মতো শোনাচ্ছে আমার কথা। হয়তো তা-ই। কিন্তু... এখানে এখন থাকতে হবে আমাকে। আপনি যদি না চান, তা হলে আপনার দরকার নেই কাজটা করার। কিন্তু আমার অন্য কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।’

হাত বাড়িয়ে দিল সারা। দু’পাশ দিয়ে স্পর্শ করল পোর্টারের চেহারাটা।

মনে মনে মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল পোর্টার। এই স্পর্শটুকুর দরকার ছিল ওর।

‘আপনি এখানে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকবেন, হোঁচট খেতে থাকবেন, আর আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাবো... এমনটা হবে না। এই ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন, একসঙ্গে করবো আমরা কাজটা। তবে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই আপনাকে। মানুষের বসবাস আছে এমন কোনো জায়গায় যখন ফিরে যাবো আমরা, তখন আমাকে জম্পেশ একটা ডিনার করাতে হবে আপনার।’

‘রাজি।’ হাসি দেখা গেল পোর্টারের ঠোঁটের কোনায়।

ওখানে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা মিনিট দশেক। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পেল পোর্টার। মাথা পরিষ্কার হলো ওর। কখনও কখনও হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরল সারা। বিশেষ এই মুহূর্তগুলো পরে আর মনে করতে পারল না পোর্টার। তবে মনে করতে পারলে ভালো হতো, ভাবল সে। বিশেষ এসব মুহূর্ত মনে করার মতো। ওর মাথার ভেতরে অন্য যেসব চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, সেসবের মতো না এই চিন্তাটা। সারার হাতটা আলতো একটুখানি মুচড়ে দিল সে। ‘আমার মনে হয় আমি এখন ঠিক আছি। একটু বেশিই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম বোধহয়, অন্য কিছু না।’

কনভেনিয়েন্স স্টোরটা থেকে মালসামান কিনে যে-ব্যাগে রেখেছিল, গাড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সেটা বের করে আনল পোর্টার। ব্যাগটা রাখল গাড়ির ছাদে। ভেতর থেকে বের করল দুটো ফ্ল্যাশলাইট। ব্যাটারি ভরল দুটোতেই। একটা লাইট দিল সারাকে। তুলে নিল ডায়েরিটা, রাখল পকেটে।

নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাল সারা। পরিত্যক্ত এই রাস্তার এখানে-সেখানে আলো ফেলল। পোর্টার টেনে নিয়েছে ডিজিটাল ক্যামেরাটা। ওটার গায়ে লেখা নির্দেশনাগুলো পড়ছে।

‘নুড়িপাথরে ছাওয়া একটা ড্রাইভওয়ে দেখতে পাচ্ছি,’ জানান দিল সারা। ‘ওটা পুরনো কোনো রাস্তাও হতে পারে। ঠিক বলতে পারবো না আমি আসলে। নলখাগড়া আর আগাছার কারণে প্রায় পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে ড্রাইভওয়েটা।’ পোর্টারের চেয়ে ফুট পাঁচেক দূরে, ওই মেইলবক্সের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। ‘আরও কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি এখানে। দেখে মনে হচ্ছে, বিশপ লেখা এই

মেইলবক্সের পাশে আরেকটা মেইলবক্স আছে। খুঁটিটা দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু জমিন থেকে ফুট দু’-এক ওপরে মাথা তুলবার পর গায়েব হয়ে গেছে মেইলবক্সের বাকিটা।’

‘ওটার গায়ে হয়তো কার্টার শব্দটা লেখা ছিল। বিশপরা ছিল কার্টারদের প্রতিবেশী।’

‘ও হ্যাঁ, ডায়েরিতে তা-ই লেখা আছে।’

ক্যামেরাটা মোটামুটি আয়ত্বে আনা গেছে... নিজের ওপর সম্ভ্রষ্ট হলো পোর্টার। গ্লাভস, জিপলক ব্যাগ আর ক্যামেরাটা ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল সে। লাগিয়ে দিল গাড়ির দরজা। ফিরে গেল সারার কাছে। গায়েব হয়ে যাওয়া মেইলবক্সটার খুঁটির ওপর এখনও আলো ধরে রেখেছে মহিলা। পোর্টারের উপস্থিতি যখন টের পেল নিজের পাশে, নুড়িপাথরে ছাওয়া সেই পথের ওপর নাচাল হাতেধরা ফ্যাশলাইটের আলো। ‘এটার কথাই বলছিলাম তখন। আমার মনে হয় না গত কয়েক বছরে এখানে পা পড়েছে কোনো মানুষের।’

দৃষ্টি দিয়ে আলোটা অনুসরণ করছে পোর্টার। দেখছে, নুড়িপাথরে ছাওয়া এবড়োখেবড়ো জমিনের ওপর নাচছে ওই আলো। ওই জমিনের এখানে-সেখানে জন্মে আছে নলখাগড়া আর আগাছা। সারাটা জমিন ঢাকা পড়ে আছে ধুলোর আবরণে। দেখছে, ওই আলো কখনও কখনও গিয়ে নাচছে অনতিদূরের কিছু গাছপালার ওপর। চাঁদের মরা আলোয় থেকে থেকে একটু-আধটু আন্দোলিত হচ্ছে ওসব গাছ... নিঃশব্দে। দেখছে, আলোটা যে-পর্যন্ত গিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে, সে-জায়গায় ওটাকে যেন গিলে খেয়ে ফেলছে অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সারার খালি হাতটা ধরল সে। হাঁটা ধরল ওই অন্ধকারের উদ্দেশে।

আর একটা কোনো শব্দের বিনিময় ঘটল না ওদের দু’জনের মধ্যে।



অ্যাশল্যান্ড অ্যাভিনিউ-এ যখন হাজির হলো, পুলিশের গাড়ির লাল-নীল আলোর ঝলকানি দেখতে পেল ক্রেয়ার। আঙুলের ইশারায় উইন্ডশিল্ড ভেদ করে দেখিয়ে দিল বাইরে। ‘ওই যে, ওখানে।’

‘দেখতে পেয়েছি,’ জবাবে বলল ন্যাশ। ওয়ালমার্টের পার্কিং লটের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে গাড়ির নাক।

অনতিদূরে দীর্ঘ একটা বিল্ডিং; সেটার চারপাশে আছে বিভিন্ন চিহ্ন, সেগুলো অনুসরণ করে পেছনের লোডিং ডকে হাজির হয়ে গেল ওরা। একটা কোনা ঘুরেছে, এমন সময় দেখা মিলল পুলিশের দুটো টহল গাড়ির। গাড়ি দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে একটা ব্যারিকেড, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রাস্তাটা। বাঁ দিকে থাকা পুলিশ অফিসারটা ব্যারিকেডের একটা কোনা তুলে ধরল, হাতের ইশারায় ভেতরে যেতে বলল ক্রেয়ারদেরকে। ওরা ভেতরে ঢোকার পর আবার জায়গামতো নামিয়ে দেয়া হলো ওই ব্যারিকেড। ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশনের একটা ভ্যান আর একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেল ন্যাশ, ও-দুটোর পেছনে থামাল নিজের গাড়িটা। দু’জন প্যারামেডিককে দেখা যাচ্ছে। তারা দু’জনই ওই অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর তেমন কোনোকিছু করার নেই তাদের এই মুহূর্তে।

‘তেলের গন্ধ পাচ্ছেন?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার।

‘ওটা আমার কনি’র গন্ধ,’ ব্যাখ্যা করার কায়দায় বলল ন্যাশ। ‘যখন পার্ক করে রাখা হয় আমার এই গাড়ি, নিচের কোনো এক জায়গা থেকে ওই গন্ধটা আসে। দেখি, সময়-সুযোগমতো যাবো মেকানিকের কাছে, একটু চেক করাবো আমার গাড়িটা।’

‘এই গাড়ি একটা মৃত্যুফাঁদ, জানেন তো সেটা, নাকি?’

‘দেখো, কনি আমার কাছে আমার বাচ্চার মতো। এটাকে নিয়ে হাসিতামাশা করবে না। এটার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, তার বেশি কিছু না। সেরে যাবে। কি, ঠিক বলেছি না, কনি খুকি?’ হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ, ড্যাশবোর্ডের গায়ে আদর করল কিছুক্ষণ। তারপর বাতাসে একটা চুমু ছুঁড়ে দিল ওটার উদ্দেশে।

‘আপনি আসলে একটা পাগল,’ বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ক্রেয়ার। রাতের বাতাস ভীষণ ঠাণ্ডা। গাড়ির দরজাটা দড়াম করে লাগিয়ে দিল সে। হাত দুটো ঢুকিয়ে ফেলেছে পকেটে। ওকে অনুসরণ করল ন্যাশ। রাস্তার এককোণায় জমে থাকা বরফে পা পিছলে গিয়েছিল আরেকটু হলে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৭৮

লোডিং ডকের দিকে ঢালু হয়ে উঠে গেছে একটা পাটাতন, সেটার একধারে পার্ক করে রাখা আছে ধূসর একটা টয়োটা টান্ড্রা, ওই পিকআপ ট্রাকের পিঠে দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক। সিএসআই-এর লোকজন ঘেরাও করে রেখেছে ট্রাকটা। আশপাশে জ্বলছে বড় আকারের হ্যালোজেন ফ্লাডলাইট। কাজ করার সুবিধার্থে যেটুকু জায়গা নেয়া দরকার, সেটুকু জায়গা উজ্জ্বল হলুদ টেপ দিয়ে ঘেরাও করে দিয়েছে সিএসআই। কাছেপিঠেই দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন টহল অফিসার... সংখ্যায় কমপক্ষে ছ'জন হবে। উৎসুক জনতার ভিড় বাড়ছে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তারা। ওই লোকগুলোর বেশিরভাগই ওয়ালমার্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী। দোকানটা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা বুঝে নিয়েছে, এই জায়গায় ঘটনা কিছু একটা ঘটেছে, এবং খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে বন্ধুদের। কারণ উৎসুক সেই জনতার বেশিরভাগের গায়েই ওয়ালমার্টের ইউনিফর্ম নেই। পার্কিং লটের আরেক দিক দিয়ে একটা গাড়ি এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে হ্যালোজেন লাইটগুলোর দিকে। ক্রেয়ার জানে, খবর যদি ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে জনতার এই ভিড় বেড়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ হতে বেশি সময় লাগবে না। আর সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা যদি হাজির হয়, তা হলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে।

সিএসআই-এর ইনভেস্টিগেটরদের সংখ্যাটা গুনল ক্রেয়ার। তিন। যে-জায়গা ঘিরে ফেলা হয়েছে, সেটার ভেতরই অবস্থান করছে তারা। অপেক্ষা করছে আদেশের জন্য।

ন্যাশ আর ক্রেয়ারকে দেখতে পেল লেফটেন্যান্ট বেলকিন, জনতার ভিড় পেছনে রেখে এগিয়ে এল। লোকটার পরনে স্ফীত একটা নেভি কোট। সেটার বুকের কাছে জুড়ে দিয়েছে নিজের ব্যাজ। বড় হাতের সাদা অক্ষরে ওই কোটের পিঠে ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে, সহজেই পড়া যাচ্ছে শিকাগো মেট্রো কথাটা। 'এখানে আসামাত্র পুরো জায়গা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।' ফুট পঞ্চাশেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সেমি-আইডলিং ট্রাক দেখিয়ে দিল ইশারায়। 'রাত আটটার কয়েক মিনিট আগে এখানে হাজির হয়েছিল ওই ট্রাক। ভেতরে ঢোকার কথা ছিল ওটার। পিকআপ ট্রাকটা তখন রাখা ছিল পাটাতনের সামনে, ফলে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেমি-আইডলিংটার। ঘটনা কী, দেখার জন্য তখন বাধ্য হয়েই বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ওয়্যারহাউসের সুপারভাইজারকে। লোকটা তখন দেখতে পায়, পিকআপের ভেতরে কেউ একজন আছে। তাকে ওই পিকআপ-সহ সরে যেতে বলার জন্য এগিয়ে যায় সে। কিন্তু কাজটা না করে পিছিয়ে আসে সে, ফোন করে নাইন ওয়ান ওয়ানে। কারণ... কী কারণে কাজটা করেছে সে, সেটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন একটু পরে। যা হোক, পিকআপের দরজার গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছিল সে। তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট জোগাড় করে নিয়েছি আমরা, পরে বাদ দেবো সেটা। তার জুতোর একটা ছাঁচও নিয়েছি, ওই পিকআপের আশপাশ থেকে



অন্য যেসব প্রিন্ট পাওয়া যাবে, সেসব থেকে বাদ দিতে হবে ছাঁচটা। তুমারের গায়ে দ্বিতীয় আরেক সেট জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু এই আবহাওয়ায় খুব একটা ভালো না ওটার অবস্থা। সিএসআই অবশ্য ওই নমুনায় ও ছাঁচ তৈরি করে নিয়েছে। এবং সেটা সম্ভবত আপনাদের সেই রহস্যময় লোকের জুতোর ছাপ। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, পিকআপটা ঘিরে বার কয়েক চক্কর লাগিয়েছিল ওই লোক। হয়তো কিছু একটা নিয়ে গেছে পিকআপ থেকে। সুপারভাইজারের নাম উইলিস কটেজে। বিল্ডিংয়ের ভেতরে আপাতত আটকে রেখেছি আমরা তাকে। আপনারা ইচ্ছা করলে কথা বলতে পারেন লোকটার সঙ্গে। তবে আমার মনে হয় না বলার মতো আর তেমন কিছু আছে তার।’

লোডিং ডকের ওপর সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে ইঙ্গিত করল ন্যাশ। ‘কোনো ফুটেজ পাওয়া গেছে?’

মাথা নাড়ল বেলকিন। ‘এখানে মোট তিনটা ক্যামেরা আছে। গত মঙ্গলবার কেউ একজন অকেজো করে দিয়েছে তিনটাই। মেইনটেনেন্স-কে খবর দেয়া হয়েছিল। তারা ওগুলো বদল করে নতুন ক্যামেরা বসিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়নি এখনও।’

‘অকেজো করে দিয়েছে কীভাবে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ওগুলো অনেক ওপরে লাগানো আছে।’

‘প্রথমে ভিডিয়ো লাইন কেটে দিয়েছে। তারপর ভারী কোনোকিছু দিয়ে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলা হয়েছে প্রতিটা ক্যামেরা। কীভাবে করা হয়েছে কাজটা, সেটা এখনও বোঝা যায়নি, কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রতিটা ক্যামেরাই এখন শ্রেফ জঞ্জাল। যে-ই করে থাকুক না কেন ওই ভাঙচুর, সিসিটিভি ক্যামেরা কীভাবে কাজ করে, ভালোমতো জানা আছে তার। এমন এক কায়দায় হাজির হয়েছে তিনটা ক্যামেরার কাছেপিঠে, ভিউয়িং অ্যাঙ্গেলে ধরা পড়েনি একবারও। সিকিউরিটি বলছে, লাইভ ভিডিয়ো চলছিল, তারপর হুট করেই সবকিছু কালো হয়ে যায়। কে বা কারা ভেঙেছে ওই ক্যামেরা তিনটা, তাদের কোনো ভিডিয়োই ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আমি আমার একজন লোককে লাগিয়ে দিয়েছি। সে হার্ডওয়্যার আর ফুটেজ চেক করে দেখছে, কোথাও কোনোকিছু মিস হয়ে গেছে কি না।’

ক্রেয়ারের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে নিল ন্যাশ। একই কথা ভাবছে ওরা দু’জন... বিশপ।

বুড়ো আঙুলের ইশারায় পেছনের পিকআপ ট্রাকটা দেখিয়ে দিল বেলকিন। ‘জগাখিচুড়ি পাকানো বলতে যা বোঝায়, ওটার অবস্থা ঠিক তা-ই। ও-রকম কোনোকিছু কখনও দেখিনি আমি।’

‘দেখান আমাদেরকে,’ বলল ক্রেয়ার।

মাথা ঝাঁকাল বেলকিন। ঘুরল ওই ট্রাকের দিকে। মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল হলুদ টেপের সীমানার ভেতরে। উঁচু করে ধরে রাখল ওটা যাতে ঢুকতে পারে

ক্রেয়ার আর ন্যাশ। ড্রাইভারের দিকে যে-দরজা আছে, সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার জানালাটা খোলা। ‘বেশির চেয়ে বেশি যা বলতে পারি আমরা তা হলো, আপনাদের সেই রহস্যময় লোক ওয়াটার ট্যাক্টের হোস খুলে দিয়েছিল। ওই ট্যাক্টের ভেতরে যা ছিল, সব খালি করেছে পিকআপের ক্যাবে। ট্যাক্টার ধারণক্ষমতা পাঁচ শ’ গ্যালনের মতো। কাজেই ধরে নেয়া যায়, কাজটা করতে কিছু সময় লেগেছে তার। সেটা বিশ মিনিট হতে পারে, ত্রিশ মিনিটও হতে পারে, আবার তার চেয়ে বেশি সময়ও লেগে থাকতে পারে। আমি যখন এলাম এখানে, তাপমাত্রা তখন সাত ডিগ্রি। মাইনাস দুই ডিগ্রির বাতাস যতখানি ঠাণ্ডা হয়, ঠিক সে-রকম বাতাস বইছিল। আর তাই, কাজটা কীভাবে করা হয়েছে, সেটা এখনও ঠাহর করার চেষ্টা করছে সিএসআই-এর অফিসাররা। তারা বলছে, যে-ই করে থাকুক না কেন ওই কাজ, প্রথম কয়েক মিনিটের জন্য স্প্রে করতে হয়েছে লোকটাকে। তারপর সে বিরতি দিয়েছে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য। তারপর আবার স্প্রে করেছে। তারা বলছে, স্তরে স্তরে করা হয়েছে ওই কাজ। একবারে যদি খালি করা হতো ওই ট্যাক্ট, তা হলে অবস্থা এখন এ-রকম হতো না।’

লেফটেন্যান্ট বেলকিন যা-যা বলছে, মন দিয়ে শোনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্রেয়ার। যা দেখছে ওরা এখন চোখের সামনে, সে-অবস্থা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করছে লোকটা। আরও কিছু খুঁটিনাটি বর্ণনা করছে ওই লোক। শুনতে পেল, ন্যাশ জিজ্ঞেস করছে, ট্যাক্টের ভেতরের পানি লবণাক্ত ছিল কি না। শুনতে পেল, জবাবে বেলকিন বলল, না, ছিল না। এই তাপমাত্রায় জমে বরফে পরিণত হওয়ার কথা না লবণাক্ত পানির। এসব কথা শুনছে মেয়েটা, আর চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, সেসব যেন আত্মস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করছে ওর মস্তিষ্ক।

পিকআপ ট্রাকটার ক্যাবের ভেতরে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষকে। সে-মানুষটা সিট বেল্ট পরে আছে। তার দুই হাত স্টিয়ারিং হুইলে। নিম্প্রাণ চোখের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে। যেন দূরের কোনো অস্তিত্বহীন জিনিসের ওপর আটকে গেছে ওই দৃষ্টি।

ওই দেহের চারপাশে জমাট বেঁধেছে বরফ। লাশের চেহারা আর মাথার আশপাশে বরফের সে-আবরণ তুলনামূলক পাতলা, কিন্তু পিকআপের সিটে আর মেঝেতে ওই একই আবরণ বেশ পুরু।

জমাটবাঁধা মৃত চাহনিত্তে সামনের কিছু একটা এখনও দেখে চলেছে ওই লাশ।

লাশটা একটা ছেলের।

কিশোর-বয়সী কোনো এক ছেলের।



৭৯.

পোর্টার

তৃতীয় দিন, রাত ৯:১০

এবার প্রথমে নজরে পড়ল বাড়িটা।

বলা ভালো, ওই বাড়ির অবশিষ্টাংশ।

ড্রাইভওয়েতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পোর্টার আর সারা। অনতিদূরের ওই বাড়ির তক্তাগুলো ছেয়ে গেছে নলখাগড়া আর আগাছায়, ওগুলোর ওপর নেচে বেড়াচ্ছে ওদের হাতেধরা ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

কোনো এককালে আগুন লেগেছিল এই বাড়িতে... ভুলের কোনো অবকাশই নেই এ-ব্যাপারে। গায়েব হয়ে গেছে ছাদটা। দেয়াল বলতে যা-কিছু বাকি আছে, কয়লায় পরিণত হয়েছে সেসব, কালো হয়ে গেছে। বাড়ির গঠনকাঠামোর বেশিরভাগই ধসে পড়েছে। সেটা ওই আগুনের কারণেও হতে পারে, আবার পরে কোনো একসময়ও ঘটে থাকতে পারে ঘটনাটা।

ক্যামেরা বের করল পোর্টার, দিল সারার হাতে। ‘ছবি তুলবার দায়িত্ব আপনার।’

‘ঠিক আছে। বিশেষ কোনোকিছুর ছবি তুলতে হবে কি না, আগেভাগেই বলে দিন।’

‘আপনার হাতের ওই জিনিসে এক হাজার ছবি আঁটবে। কাজেই অত চিন্তার কিছু নেই। আমি চাই, যা-ই দেখবেন, সেটারই ছবি তুলবেন আপনি। এখানে কোন জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ না, সেটা কিন্তু জানা নেই আমাদের।’

ক্যামেরাটা চোখের সামনে তুলল সারা। ভিউফাইন্ডার ভেদ করে তাকিয়ে আছে ওই বাড়ির ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামোর দিকে।

এখন যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন বাড়িটা, বোঝা যায়, এককালে তেমন একটা বড় ছিল না ওটা আকারের দিক দিয়ে।

বড়জোর আট কি ন’শ” বর্গফুট, অনুমান করে নিল পোর্টার। বিশপের সেই ডায়েরিতে একটা পোর্চের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পোর্টার যেমনটা আশা করেছিল, আর এখন চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, দুটো এক না। যখন সে পড়েছিল ওই ডায়েরি, বড়সড় একটা পোর্চ কল্পনা করে নিয়েছিল। শুধু তা-ই না, অনুমান করে নিয়েছিল, সেই পোর্চ ঘিরে বিস্তৃত হয়েছে বড় একটা বাড়ি। কিন্তু এখন সে-সবের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পোর্চটা, বলা ভালো, পোর্চ বলতে যা-কিছু বাকি আছে আর, চওড়ায় মাত্র ফুট ছয়েক। গভীরতায় চার ফুট। ওটার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে পুরনো সিঁড়ার কাঠের কিছু ব্লক, কিন্তু ওগুলো ওই কাজ ঠিকমতো করতে পারছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। কাঠ

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৮২

কেটে বানানো ধাপ আছে দুটো। কিন্তু ও-দুটোর কোনোটাই ওর ভর সইতে পারবে কি না, নিশ্চিত না পোর্টার। দেখেই বোঝা যায়, অনেক আগেই পচে গেছে ওসব কাঠ।

‘আমি ভেবেছিলাম, এই বাড়ি আরও বড় হবে,’ বলল সারা, পোর্টারের পাশেই আছে। ‘ডায়েরিতে যে-বর্ণনা দেয়া হয়েছিল বাড়িটার, সেটা পড়ে সে-রকমই মনে হয়েছিল আমার।’

সারা যখনই কোনো ছবি তুলছে, মৃদু ক্লিক আওয়াজ করছে ক্যামেরাটা। লোকে যে-কায়দায় অতীত আঁকড়ে ধরে রাখে কখনও কখনও, দেখলে মজা লাগে পোর্টারের। ছবি তুলবার সময় কি আওয়াজ করার কোনো দরকার আছে একটা ডিজিটাল ক্যামেরার? তারপরও কেউ একজন বিশেষ ওই শব্দ উৎপন্ন করার কাজে খরচ করেছে নিজের কিছু না কিছু সময়।

‘একটা বাচ্চার নজর... আমার যা মনে হয় আর কী। একটা বাচ্চা যখন কোনোকিছু দেখে, তখন সেটা তার নজরে কিছুটা বড় বলে মনে হয়।’

‘হুঁ, হবে হয়তো।’

পোর্টটা ভর সইতে পারবে কি না, পরীক্ষা করার কায়দায় একটা পা সেখানে রাখল পোর্টার। টিকে থাকল পোর্টটা, ধসে পড়ল না। ক্ষয়ে যাওয়া ওই পাটাতনের ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে এদিকে-সেদিকে। যে-জায়গায় এককালে দাঁড়িয়ে ছিল সদর দরজাটা, সে-জায়গা নজরে পড়ল ওর। এখন সেখানে যেন মুখব্যাদান করে আছে একটা গর্ত।

‘ভেতরে যাবেন না?’ জিজ্ঞেস করল সারা।

‘বেসমেন্টটা দেখা দরকার আগে।’

বাড়ির বাইরের দিকের দেয়াল অবশিষ্ট আছে দুটো। সে-দুটোতে যেন প্রতিফলিত হয়ে ফেরত আসছে সারার ফ্ল্যাশলাইটের আলো। দেয়াল দুটোর ওপর খোলা একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে; বোঝা গেল, ওখানে ছাদ থাকার কথা ছিল। মেঝের আর যে-টুকু বাকি আছে, শেষপর্যন্ত সেখানে আলো ফেলল সে। ‘হাঁটাচলা করার জন্য ওই জায়গা কিন্তু খুব একটা নিরাপদ ঠেকছে না আমার কাছে।’

আরেক কদম আগে বাড়ল পোর্টার। ওর পায়ের নিচে কঁ্যাচকোঁচ আওয়াজ তুলে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে পাটাতনটা। যেন আতঁনাদ করছে, ব্যথা পাচ্ছে।

‘দেখুন, যদি ভেঙে নিয়ে নিচে পড়ে যান, জোরে ব্যথা পেতে পারেন। এই জায়গা কিন্তু দুনিয়াছাড়া, চাইলেই সাহায্য পাওয়া যাবে না এখানে।’

পুরনো একটা রেফ্রিজারেটর দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে... বলা ভালো, ওই জিনিসের অবশিষ্টাংশ নজরে পড়ছে। ওটার সঙ্গে আছে একটা স্টোভ। রেফ্রিজারেটরের দরজা থেকে বেরিয়ে আছে মরচে-ধরা একটা প্যাডলক।

আনমনা হয়ে গেল পোর্টার। মনে পড়ে যাচ্ছে বিশপের সেই ডায়েরির বিশেষ কিছু অংশ:



মা আবার তাঁর কাজ শেষ হলে লক করে দেন ওই রেফ্রিজারেটর। ঠিক ন'টার সময় কাজটা করেন তিনি। লাঞ্ছের আগপর্যন্ত তালাবন্ধ অবস্থাতেই থাকে ওটা। একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে সাপারেও। আমি আবার না খেয়ে থাকতে পারি দুপুর পর্যন্ত। কিছু একটা আমাকে এখন জানিয়ে দিচ্ছে, পেটে যদি দানাপানি পড়ে, গতকাল রাতে মদ খাওয়ার যে-মহোৎসব করেছি, সেটার প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবো। কিছু একটা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, এখন পেটে দানাপানি পড়লে আজকের বাকি দিন ঠিকঠাক কাটিয়ে দিতে পারবো।

দু'ফুট বাই চার ফুটের খণ্ড খণ্ড দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে, দেখে মনে হচ্ছে, কালো হয়ে যাওয়া বিশাল কিছু টুথপিক যেন মাথা তুলেছে মেঝে থেকে। একধারে পড়ে আছে ইট-কাঠ-পাথরের বেশকিছু টুকরো, সেগুলোর নিচে চাপা পড়েছে পুরনো একটা বাথটাব।

সাবধানে আরও এককদম আগে বাড়ল পোর্টার। মেঝের একজায়গায় বেশ বড় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। ধারণা করে নিল, এখানে এককালে ছিল বাসার লিভিং রুমটা, পরে ধসে পড়েছে। ভাঙাচোরা যেসব জিনিস পড়ে আছে নিচে, সেগুলো থেকে বিশেষ কোনো কিছু ঠাহর করা অথবা বিশেষ কোনো কিছু উদ্ধার করে নিয়ে আসা এককথায় অসম্ভব। একটা মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, কার্টার দম্পতিকে যে-ধাতব পাইপের সঙ্গে হাতকড়ার সাহায্যে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেটা যেন দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল, ওটা আসলে একটা গাছ। ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাওয়া কঙ্কিটের মেঝেতে যেভাবেই হোক না কেন শেকড় বিস্তৃত করেছে গাছটা। এবং এতখানি লম্বা হয়েছে যে, সূর্যের আলোর খোঁজে মাথা তুলে দিতে পেরেছে বাড়ির বাইরে।

‘কিছু দেখতে পাচ্ছেন?’ জিজ্ঞেস করল সারা।

‘বিশেষ কোনো কিছু দেখতে হলে আমার মনে হয় পুরো জায়গা খনন করতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে ভেঙে পড়তে পড়তে আজ এই হাল হয়েছে জায়গাটার।’

‘কোনো লাশ অথবা ওই জাতীয় কোনো কিছু তো নজরে পড়ছে না, ঠিক না?’

‘সে-রকম কোনো কিছু অনেক আগেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখান থেকে।’ মনে মনে নিজেকে বলল পোর্টার... যা বলেছে সে, ঠিকই বলেছে। কিন্তু একইসঙ্গে কল্পনা করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না ওর... ডজন ডজন লাশ পড়ে আছে এই বাড়ির কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো অবশিষ্টাংশ এখনও লেগে আছে ওগুলোর গায়ে। চামড়া-মাংস সব পুড়ে গেছে ওগুলোর। কালো হয়ে গেছে। মৃত্যুর বীভৎস একটা গন্ধ আছে এই জায়গায়।

‘ক্যামেরাটা ছুঁড়ে দিতে পারবেন আমার দিকে? বেশি কাছে আসার দরকার নেই। আমি চাই না, আপনি হাজির হয়ে যান এই জায়গায়।’

দ্বিধা করছে সারা। কীভাবে এবং কত জোরে ছুঁড়ে দেবে ক্যামেরাটা, সে-চর্চা করে নিল কয়েকবার। তারপর হাত নিচু করে রাখা অবস্থায় ওই ক্যামেরা ছুঁড়ে দিল পোর্টারের দিকে।

জিনিসটা লুফে নিল পোর্টার। ‘ধন্যবাদ।’

ওটা যাতে খসে পড়ে না যায় ওর হাত থেকে, সাবধান আছে সে-ব্যাপারে। যে-গর্তের পাশে আছে সে এখন, সেটার ভেতরে নামিয়ে দিল ক্যামেরাটা, একটা ঝাঙল রেখেছে শাটারে। ক্যামেরাটা সামনে-পেছনে ঘুরিয়ে তুলে নিল ডজনখানেক ঘূর্ণি। থেকে থেকে ঝলঝল দেখা গেল উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইটের।

‘আমি একটা গাড়ি খুঁজি পেয়েছি!’ পোর্টারের পেছনের কোনো এক জায়গা থেকে শোনা গেল সারার উঁচু কণ্ঠ।

বেসমেন্টের অবশিষ্টাংশের ওপর শেষবারের মতো নজর বুলিয়ে নিল পোর্টার, তারপর পাটাতনের যেখানে যেখানে পা ফেলে হাজির হয়েছিল এখানে, সেসব জায়গা দিয়ে হেঁটে ফিরে এল নিরেট জমিনের ওপর। মূল বাড়ি থেকে ফুট বিশেক সরে একজায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারা। আগাছার বিক্ষিপ্ত একটা জঙ্গলের দিকে ধরে রেখেছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

গাড়িটা প্রথমে নজরে পড়ল না পোর্টারের। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ওটার সঙ্গে আরেকটু হলে ধাক্কা খেয়েছিল সে। উঁচু ঘাস সরানোর কাজে ব্যস্ত সারা। ‘আমার ধারণা এটা একটা ভক্সওয়্যাগন। তবে নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল।’

‘ভক্সওয়্যাগন? কিন্তু... সেটার তো কোনো মানে দাঁড়ায় না?’ চোখের সামনে মরচে-ধরা ধাতব একটা স্তূপ দেখতে পাচ্ছে পোর্টার। দেখতে পাচ্ছে সেটার ভাঙাচোরা জানালাগুলো। ওটার ভেতরটা পরিণত হয়েছে অরণ্যচারী কিছু প্রাণীর বাসস্থানে। এককালে যে-জিনিস গাড়ির সিট হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সেটা এখন ঢেকে গেছে ছোপ ছোপ ঘাসে। গাড়ির ধ্বংসাবশেষ ঘিরে চক্রর দিতে আরম্ভ করল সে। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে কাঠামোটা। পেছনদিকের বাম্পারের ওপর যখন পড়ল ওর ফ্ল্যাশলাইটের আলো, থামল সে, আরও কাছে ঝুঁকল। ‘আমি আসলে কোনো কাজের না।’

‘কী হয়েছে?’

এগিয়ে এল সারা, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পোর্টারের পাশে। বাম্পারের গায়ে একটা স্টিকার সাঁটানো আছে, ইঙ্গিতে সেটা দেখিয়ে দিল পোর্টার। মলিন হয়ে গেছে স্টিকারটা। সেটার গায়ে যা লেখা আছে তা পড়া যায় কি যায় না।

‘বেচারি একজন মানুষের পোশে,’ স্টিকারের লেখাটা শব্দ করে পড়ল সারা।

সঙ্গে সঙ্গে আবারও আনমনা হয়ে গেল পোর্টার। মনে পড়ে গেল বিশপের সেই ডায়েরির বিশেষ কিছু অংশ:

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৮৫

অরাজকতা

অরাজকতা



১৯৬৯ মডেলের একটা পোর্শে চালাতেন তিনি। গাড়িটা ছিল এককথায় বিস্ময়কর। শিল্পের ছাপ ছিল ওটাতে। ইগনিশনে চাবি মোচড় দেয়ামাত্র কেমন যেন গর্জন করে উঠত ওটা। রাস্তা ধরে যখন এগিয়ে যেত সহজাত ভিজিতে, সেই গর্জন যেন বেড়ে যেত আরও।

বাবা কতই না ভালোবাসতেন ওই গাড়িটা।

‘এই গাড়ি আসলে একটা ভরুওয়াগন বাগ। আমার ধারণা, গাড়িটা বিশপের বাবার।’ সিধে হয়ে দাঁড়াল পোর্টার। ওই গাড়ির যেসব অংশ এখনও দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর ওপর আলো ফেলছে ফ্ল্যাশলাইটের। ‘দেখতে পাচ্ছেন, হুড আর ট্রান্স দুটোই কীভাবে খুলে রাখা হয়েছে? দেখতে পাচ্ছেন, চুরমার করে দেয়া হয়েছে গাড়ির লাইট আর জানালার কাচ? এসব ঘটনা যে ঘটেছিল, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে বিশপের সেই ডায়েরিতে। ওই লোক বলেছিল, তার বাবার গাড়িটা নাকি পোর্শে, কিন্তু আসলে তা না।’

‘গাড়িটা আসলে বেচারী একজন মানুষের পোর্শে।’

‘হ্যাঁ।’

নোংরা লাইসেন্স প্লেটের একটা ছবি তুলে রাখল পোর্টার। ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ওই লাইসেন্সের।

উঠে দাঁড়াল সারা। ডানদিকের কোনো এক জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে ইঙ্গিতে। ‘ওখানে আরেকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।’

মহিলার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল পোর্টার। তারপর কয়েক কদম আগে বাড়ল। ‘ওটা কোনো বাড়ি না আসলে। বরং একটা ট্রেইলার।’

ক্যামেরাটা সারার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

‘আপনি বোধহয় ট্রেইলার বলতে “মোবাইল হোম” বুঝিয়েছেন, না?’ বলল সারা।

জবাব না দিয়ে উঁচু নলখাগড়ার জঙ্গল ভেদ করে এগোতে লাগল পোর্টার। ওকে অনুসরণ করছে সারা। ট্রেইলারটার কাছে পৌঁছে নিজের জন্য কাল্পনিক একটা বৃত্ত তৈরি করে নিল পোর্টার, সেটা ধরে চক্রর দিতে আরম্ভ করল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে ফেলে দেখছে চারপাশ। একসময় আবার মুখোমুখি হলো ওই মোবাইল হোমের... ছোট কাঠামোটোর। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। দ্রুত ভাবছে। ‘আসলে... আমার মনে হয় এই মোবাইল হোমেই থাকত কার্টার দম্পতি। কারণ আশপাশে আর কোনোকিছুই নেই।’

কাটারদের বাড়ির পেছনদিকে যে-স্থান ডোর আছে, সেটা খোলা। ওটা এখন চলে গেছে বাতাসের মালিকানায়। সাদা রঙ করা ফ্রেমের সঙ্গে সমানে বাড়ি খাওয়াচ্ছে ওটাকে। হাত বাড়িয়ে হাতলটা ধরলাম আমি। দরজাটা খুলে ধরে রাখলাম মিসেস কাটারের জন্য। আমাকে ছাড়িয়ে ভেতরে, কিচেনে ঢুকে পড়লেন তিনি। কিচেনটা অন্ধকার। যতটুকু পথ হেঁটে এসেছি আমরা, একটা কথাও বলেননি তিনি। আমরা দু'জনের কেউই বলিনি। থেকে থেকে তাঁর নাক টানার আওয়াজ যদি না পেতাম, ধরে নিতাম, আমার পাশে না, পেছনে ছিলেন তিনি।

মোবাইল হোমের একধারে কঙ্কিটের কয়েকটা ধাপ আছে, সেখানে পা রাখল সারা। দরজার হাতল ধরে মোচড়ামোচড়ি করছে। বহু বছর ধরে মরচে পড়ে থাকার কারণে ভেঙে গেল কোনো একটা কজা, আলাগা হয়ে গেল ধাতব পাল্লাটা থেকে। 'দরজা খোলাই আছে।'

জানালাগুলো... বলা ভালো, এককালে যে-দুটো জানালা ট্রেইলারের সামনের দিকে ছিল... গায়েব হয়ে গেছে। ওই ফোকর দুটো যে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সেটা প্রমাণ করতেই আজও যেন সেখানে ঝুলছে পলকা কিছু পর্দা; মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে সেগুলো। মোবাইল হোমের ভেতরের অন্ধকারে ঝাপ্টাচ্ছে যেন।

'আমাকে আগে যেতে দিন,' সারার উদ্দেশে বলে উঠল পোর্টার। মহিলাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। 'আপনি কাছাকাছিই থাকুন।'

ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, হাজির হলো একটা ছোট একটা কিচেনে। ফরমিকা কাঠ দিয়ে ছোট একটা টেবিল আর একটা বেঞ্চ বানিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে একদিকের দেয়ালের সঙ্গে। আরেকদিকে আছে কিছু তৈজসপত্র, মরচে ধরে গেছে প্রতিটাতে। মেঝেটা কেউ যেন লেপে দিয়েছে কাদা দিয়ে। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে এখানকার প্রতিটা জিনিস। হাঁ হয়ে খুলে আছে রেফ্রিজারেটরের দরজাটা, ভেতরের সব তাক খালি। কেবিনেটের বেশিরভাগ পাল্লাই গায়েব। মোবাইল হোমের যেখানে যত জানালা আছে সব হয় ভেঙে পড়ে গেছে নয়তো খুলে রাখা হয়েছে, ফলে শিস দেয়ার আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ছে রাতের বাতাস।

কিচেনের ঠিক পরই আছে ছোট একটা লিভিং স্পেস। এখানে দেখা মিলল একটা কাউচের। সাংঘাতিক মলিন হয়ে গেছে ওটা। জায়গায় জায়গায় পচন ধরেছে। ফলে এককালে কেমন ছিল ওই জিনিস, সেটা ঠাহর করার কোনো উপায় নেই এখন আর। সমতল জায়গা বলতে যা-কিছু আছে আশপাশে, সেসবের প্রায় প্রতিটা ইঞ্চি দখল করে নিয়েছে গ্রাফিতি। সেইসঙ্গে আছে উজ্জ্বল রঙের কিছু ছবি। আরও আছে বিক্ষিপ্ত কিছু আকৃতি, হাবিজাবি কিছু লেখা, আবোলতাবোল কয়েকটা নাম এবং বিভিন্ন জাতের ট্যাগ।



‘এ-সবকিছুর ছবি তুলে নিতে পারবেন? তা হলে পরে ওগুলো ভালোমতো দেখতে পারবো আমরা।’

‘স্থানীয় ছেলে-ছোকরার দল নিশ্চয়ই আড্ডা জমায় এখানে,’ বলল সারা। ক্যামেরা তুলছে। ‘যারা বথে যায় কিশোর বয়সেই, মদ-গাঁজা খাওয়ার জন্য জুৎসই কোনো একটা জায়গা তো দরকার তাদের, তা-ই না? তারপর নেশায় ধরলে ওই জায়গায় শান্তিমতো শুয়েও তো পড়তে হবে তাদেরকে, ঠিক কি না?’

কোনো মন্তব্য করল না পোর্টার। কিচেন এবং ছোট ওই লিভিং স্পেস পার হলো। হাজির হলো ছোট্ট একটা বাথরুমের সামনে। শুকনো কিন্তু দাগযুক্ত টয়লেট দেখা যাচ্ছে। এককোণায় আছে একটা বাথটাব, শাওয়ারের পর্দা গুটিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। আয়নাটা ভাঙা। ওটার ওপর যখন আলো ফেলল, দেখতে পেল, নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ওর মন আবার ফিরে গেল সেই ডায়েরিতে। ফিরে গেল এমন এক বালকের কাছে, যে কিনা এই একই স্রু হলওয়াে ধরে হেঁটে গিয়েছিল কোনো একদিন।

এগোতে শুরু করলাম ওই হল ধরে। ছুরিধরা হাতটা চেপে রেখেছি বুকের কাছে। ফলাটা তাক করে রেখেছি সামনের দিকে। বিশেষ এই আঁকড়ে ধরার কোঁশল আমাকে শিখিয়েছেন বাবা। যদি দরকার হয়, হাতের পেশীগুলোর পূর্ণ শক্তি দিয়ে ওই ছুরি সামনের দিকে চালাতে পারবো আমি। সেক্ষেত্রে আঘাতটা হবে গুলিভর্তি কোনো বন্দুকের মতোই নিখুঁত। ছুরিটা ইচ্ছা করলে খাড়াভাবেও চালাতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই আঘাত ঠেকিয়ে দিতে পারে আমার প্রতিপক্ষ। কিন্তু এখন যে-কায়দায় ছুরিটা চালাতে যাচ্ছি... আক্রমণের ভাষায় যাকে বলে কিনা জ্যাব... এই কায়দাটা ঠেকানো মুশকিল। এভাবে ছুরি ধরা এবং হামলা চালানোয় আরও একটা উপকার আছে। প্রতিপক্ষের হুৎপিও অথবা পাকস্থলী বরাবর আঘাত হানতে পারবো। সেক্ষেত্রে ফলাটা হয় একটু ওপরে উঠিয়ে নিতে হবে আমাকে, নয়তো একটু নিচে নামিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি খাড়াভাবে হামলা করা হয়, তা হলে আঘাত হানতে হয় শুধু নিচের দিকে। সেক্ষেত্রে তড়িৎ আঘাত হানা যায় বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই গভীর কোনো ক্ষত তৈরি করা যায় না।

এসব ব্যাপারে আমার বাবা আবার খুবই দক্ষ একজন মানুষ।

পোর্টার যেন নিজের পেছনে দেখতে পাচ্ছে বিশপকে। ঘাড়ের পেছনদিকে টের পাচ্ছে বিশপের নজর। শেষ কবে এই জায়গায় এসেছিল বিশপ? যখন সে বালক ছিল, তখন? এত বছর আগে? নাকি পরে কোনো একসময় ফিরে এসেছিল আবার? ফিরে আসার পর কি এই হল ধরে হেঁটে গিয়েছিল?

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৩৮৮

‘পেছনদিকে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বেডরুম,’ পোর্টারের পেছন থেকে বলল সারা।

দুটো দরজাই লাগানো।

বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, যদি চুপিসারে কারও পশ্চাৎদ্বার করা হয়, তা হলে ওই লোক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে তার ওপর হামলা করবার জন্য এক কি বেশি হলে দু’সেকেন্ড সময় পাওয়া যায়। এ-রকম কোনো কাজ “প্রক্রিয়াজাত” করতে একটু সময় লেগে যায় মানব-মস্তিষ্কের... ধীরে ধীরে করে ওটা ওই কাজ। যার ওপর হামলা চালানো হচ্ছে, সেই মানুষটা বরফের মতো জমে যায় একটা মুহূর্তের জন্য। হামলাকারী যে হাজির হয়ে গেছে এত কাছে, সেটা বুঝে নিতে একটু সময় লেগে যায় তার। তা-ও আবার এমন একটা ঘরে হাজির হয়েছে, যেখানে, শিকারে পরিণত হতে যাওয়া মানুষটা ধরেই নিয়েছিল, সে একা। বাবা বলেছিলেন, কোনো কোনো “শিকার” নাকি বরফের মতো জমেই থাকে। তাকিয়েই থাকে হামলাকারীর দিকে... যেন টেলিভিশনে কোনো প্রোগ্রাম দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকে স্থানুর মতো, অপেক্ষা করতে থাকে কী ঘটবে পরবর্তীতে। কখনও কখনও তারা কিন্তু ভালোমতোই জানে, একটু পর যা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আদৌ ভালো কোনো কিছু না তাদের জন্য।

আফসোস হলো পোর্টারের... এখন পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে খুব কাজে লাগত। স্থানীয় কোনো একটা দোকান থেকে একটা শটগান কিনে নিলেও তো পারত সে। কেন করল না কাজটা?

একটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিল সে। আঙুলগুলোর সাহায্যে পেঁচিয়ে ধরল বিশপের ছুরির হাতলটা।

হাতের বাঁ দিকে যে-দরজা আছে, সেটার হাতলের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল অন্য হাতটা।

ওর পেছনে এমন সময় গলা ফাটিয়ে চৈঁচিয়ে উঠল সারা।



৮০.

কেটি

তৃতীয় দিন, রাত ৯:১১

‘ওঠো!

‘ওঠো!

‘ওঠো!’

কণ্ঠটা কেমন যেন চাপা।

মনে হচ্ছে, যে-মানুষটা কথা বলছে, সে যেন ভেজা কোনো টাওয়েলে পঁচিয়ে নিয়েছে নিজের মুখ।

একটা মেয়ের গলার আওয়াজ।

‘প্লিজ, ওঠো...’

যেন কানের ওপর মুখ রেখে বলা হচ্ছে কথাগুলো। গরম নিঃশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, আসলে কথা বলছে না মেয়েটা, বরং ফিসফিস করছে বেশ জোরে।

চোখ খুলল কেটি। কাজটা করতে এত কষ্ট হলো ওর যে, মনে হলো আবার বন্ধ হয়ে যাবে এখনই। জ্ঞান ফিরে আসছে আস্তে আস্তে। সেই সঙ্গে ফিরে আসছে ব্যথা-বেদনার অনুভূতিটা। বিশেষ সেই অনুভূতি যেন গরম কোনো তরলের মতো ধুয়ে দিচ্ছে ওই মেয়ের ভেতরটা। পুড়িয়ে দিচ্ছে তার সমস্ত পেশীকে। অস্থিগুলোকে।

যে-পট্টা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল চোখ দুটো, গায়েব হয়ে গেছে সেটা।

দুই হাত আর পা-ও বাঁধা অবস্থায় নেই আর।

একটা মেয়ে ঝুঁকে আছে কেটির ওপর। বয়স কেটির সমানই হবে। একজনের চেহারার সঙ্গে আরেকজনের চেহারা বলতে গেলে লাগালাগি অবস্থা। কেটির মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে ওই মেয়ে।

কেটির নজর স্থির হলো ওই মেয়ের চেহারার ওপর। নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল মেয়েটা। অর্থাৎ ইশারায় কোনো আওয়াজ করতে নিষেধ করছে কেটিকে। আগেরবারের মতো ফিসফিস করে বলল, ‘ওই লোক যাতে শুনতে না পায়। আমাদের একটা কোনো কথা শুনতে দেয়া যাবে না তাকে। আমি চাই না, আবারও নিচে নেমে এখানে হাজির হোক সে।’

এই মেয়ের কণ্ঠে কিছু একটা গুণ্গোল আছে। শুনে মনে হচ্ছে, কড়া ঠাণ্ডা লেগে গেছে তার। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটার চোখ দেখে ওই ব্যাপারটা ঠাহর করে নিতে পারছে কেটি। শুকনো রক্ত লেগে আছে বেচারীর ঠোঁটে।

উঠে বসার চেষ্টা করল কেটি। পারল না। ওর মাথাটা পড়ে গেল ওই মেয়ের কোলে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৯০

কেটির চুলে হাত বুলিয়ে দিল অন্য মেয়েটা। ‘তোমার কাপড় বদল করে দিয়েছি। আমি নিজে করেছি কাজটা, ওই লোক করেনি। সে শুধু কিছু কাপড় দিয়ে গিয়েছিল তোমার জন্য। তোমার সব কাপড় ভিজে গিয়েছিল। এখানে ওই ভেজা কাপড় পরে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার। তোমাকে ওভাবে ফেলে রাখতে পারিনি আমি। অসুস্থ হয়ে পড়লে চলবে না তোমার। শক্তি ধরে রাখতে হবে শরীরে। এই জায়গা থেকে বের হতে হবে আমাদের। আমার পক্ষে একা করা সম্ভব না কাজটা। যা করার, আমাদের দু’জনকে একসঙ্গে করতে হবে।’

একটানা কথা বলতে পারছে না ওই মেয়ে, থেমে থেমে বার বার দম নিয়ে তারপর বলতে হচ্ছে। প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

অস্পষ্টভাবে সেই ওয়াটার ট্যাঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল কেটির। মনে পড়ে গেল, সেখানে পড়ে গিয়েছিল সে।

তারপর কী হয়েছে, কিছু মনে করতে পারছে না।

‘তড়িতাহত করা বলতে কী বোঝায়, জানো তো? তোমাকে তা-ই করার চেষ্টা করেছিল ওই লোক। এবং কাজটা করেছিল সে। আমি দেখেছি। ওই যে ওখানে বড় ওয়াটার ট্যাঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ না... সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ফেলে দিয়েছিল সে। তারপর দুটো জাম্পার কেবল ছেড়ে দিয়েছিল পানিতে। বিস্ফোরণের মতো বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম আমি। আর তারপর... তারপর... কিছু একটা পোড়ার গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। আমার ধারণা, তোমার কিছু চুল পুড়ে গেছে। তবে আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারবো না ওই ব্যাপারে। তোমার চুল এখনও ভেজা। যা হোক, তোমাকে একসময় ওই ট্যাঙ্ক থেকে বের করল লোকটা। তারপর সিপিআর (কার্ডিয়োপালমোনারি রিসাসিটেশন) দিল। অনেকক্ষণ ধরে করল কাজটা। একসময় কাশতে শুরু করলে তুমি। কিন্তু জ্ঞান ফিরল না তোমার। কিছুক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। তারপর তোমাকে এখানে, আমার সঙ্গে রেখে চলে গেল ওপরতলায়। এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি আর। যা হোক, একেবারে চুপ করে থাকতে হবে আমাদের, যাতে নিচে নেমে না আসে লোকটা। সে যদি টের পায় জ্ঞান ফিরে পেয়েছ তুমি, নিচে নেমে আসবে। আমি জানি কাজটা করবে সে।’

কেশে উঠল মেয়েটা।

ব্যথায় কঁচকে উঠল তার চোখমুখ।

মুখ থেকে যখন হাত সরাল সে, রক্তমিশ্রিত থুতু দেখতে পাওয়া গেল তার তালুতে। ‘আমি... আমি কাচ গিলে ফেলেছিলাম... ওই লোককে আমার কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য। কাজে লেগেছে আমার বুদ্ধি। আমাকে এখন পর্যন্ত আর ছোঁয়নি সে।’ দুর্বল একটুখানি হাসি দেখা দিল মেয়েটার চেহারায়। ‘কী ভাবছ? একহাত দেখিয়ে দিয়েছি আমি ওই লোককে, তা-ই না?’ সবুজ একটা লেপ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে মেয়েটা, রক্তলাগা হাতটা মুছে ফেলল সেটাতে। ‘আমি ল্যারিসা।’



‘আমি কেটি,’ কোনোরকমে নিজের পরিচয় দিতে পারল কেটি। পশুর ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যেন। পানি খাওয়া দরকার ওর। ‘কোপায়... ওয়েজলি কোথায়?’

‘কে?’

‘আমি... আমি এখানে এসেছিলাম ওয়েজলি হার্টজলারের সঙ্গে। আমার সঙ্গে ছিল সে।’

‘আমি অন্য কাউকে দেখিনি। শুধু তোমাকে দেখেছি। ওই লোক শুধু তোমাকে নিয়ে এসেছিল এখানে।’

‘আমি ওয়েজলির সঙ্গে এসেছিলাম,’ আবারও বলল কেটি।

এই কথা শুনে উজ্জ্বল হলো ল্যারিসার চোখ। ‘এ-রকম কি হতে পারে, ওয়েজলি যেভাবেই হোক না কেন পালাতে পেরেছে? সে কি সাহায্য চাইতে গেছে কোথাও?’

নিকট অতীত যেন ভেসে উঠল কেটির চোখের সামনে। দেখতে পেল, অদ্ভুত সেই লোক লাফিয়ে আগে বাড়ল টেবিলের একটা কোনা ঘেঁষে। দেখতে পেল, লোকটা তার হাতেধরা কোকো-মগ একবাড়িতে চুরমার করল ওয়েজলির মাথায়। মেঝেতে পড়ে গেল ওয়েজলি। ‘জানি না। আমার মনে হয় ওই লোক আঘাত করেছে ওয়েজলিকে। এবং আঘাতটা প্রচণ্ড জোরে করা হয়েছে।’

‘তুমি যতটা জোরে ভাবছ, ওই লোক হয়তো তত জোরে আঘাত করতে পারেনি ওয়েজলিকে। আবারও বলছি, ওয়েজলি হয়তো পালাতে পেরেছে যেভাবেই হোক না কেন। নইলে আমার ধারণা আমাদের সঙ্গে এখানেই থাকত সে। ওই লোক ওয়েজলিকেও এখানে আটকে রাখত।’

ল্যারিসার দিকে তাকাল কেটি। এখনও ওকে ধরে রেখেছে ল্যারিসা। দেখছে, ঘরের এদিকে-সেদিকে মরিয়া দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ল্যারিসা। তারপর একসময় ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি স্থির হলো ল্যারিসার।

‘তুমি কতক্ষণ ধরে আছ এখানে?’

কেটির ওপর নজর ফিরে এল ল্যারিসার। সে-চাহনি কেমন যেন দ্রুত, কেমন যেন বুনো পশুর মতো। ‘আমি... আমি নিশ্চিত না আসলে। একদিন হবে, সম্ভবত। ওই কাচ গিলে ফেলার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আর তাই সময়ের হিসেব রাখাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার জন্য। আজ কী বার?’

‘শনিবার,’ বলল কেটি। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে উঠে বসল। মাথা ঘোরাচ্ছে। চাঁদির বাঁ দিকটা স্পর্শ করল সে, কুঁচকে উঠল ওর চোখমুখ।

চেহারা ঝুলে পড়েছে ল্যারিসার। ‘আমাকে আজ সকালেই তুলে নিয়ে এসেছে লোকটা। তার মানে এখনও একটা দিনও পার হয়নি। ঈশ্বর, আমার মনে হচ্ছে, গত এক সপ্তাহ ধরে আমি আছি এখানে।’ আবারও কেশে উঠল সে। আরও রক্ত বেরিয়ে এল।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কেটি। পারল না, পড়ে গেল। ওকে স্থির থাকার ব্যাপারে সাহায্য করছে ল্যারিসা। ‘সাবধান। আমার মনে হয় তুমি এখনও দুর্বল।’

মাথা ঝাঁকাল কেটি। দম নিল বড় করে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে আবারও। এবার চেইনলিঙ্ক আঁকড়ে ধরে নিজেকে টেনে তুলছে ওপরে। দু’পায়ে খাড়া হলো একসময়। খাঁচাটা ঘিরে চক্কর দিতে আরম্ভ করল। ওই চেইনলিঙ্কের প্রতিটা জয়েন্ট চেক করছে। খোলা জায়গা বলতে যা-কিছু দেখাচ্ছে, চেক করছে সেগুলোও।

‘এই খাঁচা কম করে হলেও এক ডজনবার চেক করে দেখেছি আমি। জয়েন্ট বলতে যা-কিছু আছে এই খাঁচায়, সব ঝালাই করে দিয়েছে লোকটা। এবং পুরো খাঁচাটা বল্টুর সাহায্যে আটকে দিয়েছে মেঝের সঙ্গে। খাঁচার ওপরদিক দিয়ে বের হওয়ার কোনো উপায়ই নেই। ওদিকে দরজায় দুটো প্যাডলক লাগিয়েছে ওই লোক। এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায়ই নেই আসলে।’

একটা কোনা ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কেটি। তালা দুটো দেখাচ্ছে। ‘চাবি কোথায় রাখে লোকটা?’

‘গলায় একটা চেইন পরে সে, সেটাতে। আচ্ছা, তুমি কি জানো এখন আমরা কোথায় আছি? মানে, এই বাড়ি কোথায়, জানতে চাইছি আর কী।’

‘তুমি জানো না?’

মাথা নাড়ল ল্যারিসা। ওকে কীভাবে তুলে নিয়ে এসেছে ওই লোক, জানাল কেটিকে।

‘এই জায়গার নাম লোওয়েল। আশপাশে প্রতিবেশী আছে বেশ কয়েকজন। “পরমেশ্বরের সাক্ষী” নামের একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি আমি আর ওয়েজলি। ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই এই বাড়িতে এসেছিলাম আমরা।’

‘তুমি এখন কোথায় আছ, জানে কেউ?’

দ্রুত কোঁচকাল কেটি। একটা তালা ধরে রেখেছিল হাতে, ছেড়ে দিল সেটা। ধাতব ফ্রেমের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলল ওই তালা। ‘না। আমরা আজ সকালে প্রায় দুই ডজন কিশোর-কিশোরী একত্রিত হয়েছিলাম আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানে। তারপর পুরো এলাকা কভার করার জন্য একেকজন একেকদিকে রওনা হয়ে যাই। কাজ শুরু করার কয়েক ঘণ্টা পর এই বাসায় হাজির হয়েছিলাম আমি আর ওয়েজলি। অন্যরা ততক্ষণে হারিয়ে গেছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। যাতে নিরাপদে থাকতে পারি, সেজন্য আমি সাধারণত ছোট কোনো দলের সঙ্গে থাকি সবসময়। আজ ওয়েজলির সঙ্গে ছিলাম, কারণ সে বলেছিল, এই এলাকা নাকি চেনে সে। এখানকার রাস্তাঘাটও নাকি চেনে।’

ল্যারিসার পাশে গিয়ে গুড়ি মেরে বসে পড়ল কেটি। ‘তুমি তখন বললে, লোকটা নাকি আমার অথবা তোমার কারও গায়েই হাত দেয়নি। সে কি সেজন্যই এভাবে আটকে রেখেছে আমাদেরকে? সেক্ষেত্রে করতে চায় আমাদের সঙ্গে?’

অশ্রু দেখা দিল ল্যারিসার চোখের কোনায়, নোংরা হাত দিয়েই সেটা মুছে ফেলল সে। ‘প্রথমে আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে যা করল লোকটা... তোমার মনে আছে কি না জানি না... তোমাকে বলেছিল, তার পক্ষে কিছু একটা দেখে দিতে পারবে কি না। বলেছিল, যা দেখতে পেয়েছ তুমি, সেটা তাকে বলতে পারবে কি না। তা-ও আবার যখন তোমাকে পানিতে নামাতে যাবে সে, তখন... তোমাকে তড়িতাহত করার কিছুক্ষণ আগে। যখন তোমার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছিল সে, বার বার তোমাকে আলো থেকে ফিরে আসতে বলছিল। বার বার তোমাকে তার কাছে ফিরে আসতে বলছিল। ওই লোক আসলে একটা উন্মত্ত... একটা বদ্ধ পাগল। তুমি কোনো কারণে মরে যাও, সেটা চায়নি সে। অথচ তোমাকে মেরে ফেলার সব রকমের আয়োজনই করেছিল। আমি...’

কথা শেষ করতে পারল না ল্যারিসা।

সিঁড়ির ওপরভাগে যে-দরজা আছে, খুলে গেছে সেটা।

ভারী পায়ের-আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে।

চট করে শুয়ে পড়ল ল্যারিসা, লেপে আবৃত করে নিয়েছে নিজেকে। ফিসফিস করে বলল, ‘তুমিও শুয়ে পড়ো, ঘুমানোর ভান করো। তা হলে তোমাকে আর ঘাঁটাবে না পাগলটা।’ বুজে ফেলল দু’চোখ।

ওর কথামতো কাজ করল না কেটি। যেখানে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল... খাঁচার দরজার পাশে। কালো নিট ক্যাপ পরিহিত ওই লোক সিঁড়ি বেয়ে নামল নিচে, হাজির হলো বেসমেন্টে। ডান পা কিছুটা টেনে টেনে হাঁটছে।

‘তুমি দেখছি জ্ঞান ফিরে পেয়েছ,’ খাঁচার দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। ‘আরে আমার মেয়ের কাপড় তো দেখছি ভালোই মানিয়েছে তোমার গায়ে। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাক, চাইনি আমি। তোমাকে ওই ট্যাঙ্কে চুবানোর আগে তোমার জামাকাপড় সব খুলে নেয়া উচিত ছিল আমার। ওই কাজ করলেই ভালো হতো। কিন্তু... আমার মাথাটা তখন ঠিক পরিষ্কার ছিল না, ঠিকমতো ভাবতে পারছিলাম না সবকিছু।’

চেইনলিঙ্ক আঁকড়ে ধরল লোকটা। ‘এবার একটা কথা বলতেই হবে তোমাকে। বলো, যখন মারা যাচ্ছিলে, কী দেখতে পেয়েছ?’

লোকটার হাত দুটোর দিকে তাকাল কেটি। নখগুলো ময়লা। কালো কালো বিচিত্র দাগে ভরে আছে লোকটার প্রায় সব আঙুল। কোনো মার্কার বা কলমের দাগ হবে সম্ভবত। মাথার একপাশে, পরনের ক্যাপের একটা কোনা দিয়ে আংশিক দেখা যাচ্ছে বড় ওই ক্ষতচিহ্ন। কেমন যেন লাল হয়ে আছে জায়গাটা... গনগনে দেখাচ্ছে, বিশেষ করে ওই লোকের পাণ্ডুর চামড়ার তুলনায়। শুকনো রক্তের উপস্থিতি নজরে পড়ে সেখানে। লোকটা মনে হয় ইচ্ছামতো চুলকিয়েছে জায়গাটা।

‘বলো, যখন মারা যাচ্ছিলে, কী দেখতে পেয়েছ?’ আবারও বলল ওই লোক। ইংরেজি “এস” অক্ষর উচ্চারণ করতে কেমন যেন অসুবিধা হয় তার... আধো আধো উচ্চারণ বলতে যা বোঝায়, অনেকটা তেমন। কেটির দিকে উদ্ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। চোখের পলক পড়ছে না।

হাত বাড়িয়ে দিল কেটি। নিজের আঙুলগুলো বুলিয়ে দিল ওই লোকের আঙুলগুলোর ওপর। তারপর একসময় আঁকড়ে ধরল লোকটার নোংরা হাত, ধরেই রাখল। ঝুঁকল সামনের দিকে। ওই লোকের চেহারা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আছে এখন মেয়েটার চেহারা। ‘বিস্ময়কর কিছু একটা দেখতে পেয়েছি আমি,’ বলল সে। ‘ঈশ্বরের চেহারাটা দেখতে পেয়েছি।’



৮১.

পোর্টার

তৃতীয় দিন, রাত ৯:১৩

বাথরুম থেকে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে এল রেকুনটা। ছুট লাগাল হল ধরে। তারপর গায়েব হয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে। মোবাইল হোমের সামনের দিকে এখনও খোলা আছে দরজাটা।

একলাফে পেছনে সরে গেছে সারা। বিব্রত একটা চাহনি দেখা যাচ্ছে তার চোখে মুখে। ‘ওই জন্তু নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দেয়নি আপনাকে, তা-ই না?’

‘আরে আমি তো ভেতরে ভেতরে কাঁপছি,’ মহিলাকে বলল পোর্টার। হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

সরু হলুয়ের বাঁ দিকে যে-দরজা আছে, সেটার হাতলের উদ্দেশে আবারও হাত বাড়িয়ে দিল সে। মোচড় দিল ওটা ধরে, খুলল দরজাটা।

ছোট একটা বেডরুম।

খালি। কিন্তু এককোণায় জড়ো করে রাখা হয়েছে ভাঙা কয়েকটা বিয়ারের বোতল। জানালাটা, এই মোবাইল হোমের অন্য জানালাগুলোর মতোই গায়েব হয়ে গেছে।

হাতের ডানদিকে যে-দরজা আছে, সেটার দিকে ফিরল পোর্টার। ‘আরও একটা রেকুনের দেখা যদি পাওয়া যায়, আপনাকে রক্ষা করবো আমি।’

‘আপনি তো দেখছি আমার হিরো।’

দরজাটা খুলল পোর্টার।

আরও একটা বেডরুম। তবে এটা আগেরটার তুলনায় সাজানো-গোছানো। কিছু আসবাবপত্রও আছে এখানে।

বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে একটা ফুল সাইজ বিছানা। সেটার দু’ধারে দুটো নাইটস্ট্যান্ড। উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্লজিট। সেটার দু’দিকের পাল্লায় এককালে আয়না লাগানো ছিল। বহু আগেই চুরমার করে ফেলা হয়েছে ওই আয়না দুটো। আয়নার নিচে যে-প্রেসবোর্ড আছে, সেটার গায়ে এখন নজরে পড়ে গ্রাফিতি। নাইটস্ট্যান্ডের সব ড্রয়ার খুলে ফেলা হয়েছে। দুটো গায়েব। অন্য দুটো পড়ে আছে ক্লজিটের কাছে, এককোণায়। বিছানায় যে-ম্যাট্রেস দেখা যাচ্ছে, অনেক রঙের দাগ লেগে আছে সেটাতে। এই ঘরের বন্ধ বাতাসে কেমন যেন ছাতলার গন্ধ।

‘এখানে কারও পা পড়েনি অনেক লম্বা একটা সময়,’ বলল সারা। ‘ওই ম্যাট্রেসে শুতে রুচিতে কুলাবে না এমনকী বাচাদেরও।’

‘দেখুন, কিশোরবয়সী কোনো ছেলের হরমোনের শক্তিকে কিন্তু খাটো করে দেখা উচিত না। ষোলো বছর বয়স, এমন যে-কেউ এই মোবাইল হোমকে চিলেকোঠা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৩৯৬

‘কেউ এখানে বাস করছে... এমনটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। তবে এই মোবাইল হোম যে কোনো এককালে কোনো একজনের বাসা ছিল, সন্দেহ নেই।’

কুজিটের ড্রয়ারগুলোর দিকে এগিয়ে গেল পোর্টার। ওপরের দিকে দুটো ড্রয়ার খুলল। দুটোই খালি। দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে একটা ড্রেসার, সেটার তিনটা ড্রয়ারও গায়েব। বিশপের সেই ডায়েরিতে ফিরে গেল ওর মন। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, বিশপের মা টেনে টেনে খুলছেন এসব ড্রয়ার, খুঁজছেন কিছু একটা।

বলল, ‘যে-জায়গার ঠিকানা লিখে দিলাম, সেখানে গিয়ে ভালোমতো খুঁজে দেখবেন, ডিটেকটিভ। ওখানেই লুকিয়ে থাকে ওই দানবটা। ওখানে গেলে আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।’

‘কী?’

‘জেলখানায় বিশপের মা ওই কথাই বলেছিল আমাকে।’

‘দানবরা তো সাধারণত বিছানার নিচে লুকিয়ে থাকে।’

এগিয়ে গিয়ে ম্যাট্রেসটা তুলল পোর্টার। জোর খাটিয়ে উঁচু করল ওটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে করতে ওটাকে নিয়ে গেল একদিকের দেয়ালের কাছে, ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। ম্যাট্রেসের নিচে বক্স স্প্রিংয়ের যে-কাপড় ছিল, সেটা হয় পচে গেছে, নয়তো বাসা বানানোর কাজে ব্যবহার করার জন্য নিয়ে গেছে বুনো কোনো জন্তু। কাঠের ফ্রেমের চারপাশে কাপড় বলতে এখন যা আছে তা শ্রেফ ন্যাতাকানি। ‘দানব থাকুক বা না থাকুক, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার ভালো ভালো জিনিস নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতাম ম্যাট্রেসের নিচে।’

ওই বক্স স্প্রিংয়ের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল সারা। ‘ভালো জিনিস বলতে আপনি যদি ধুলোময়লা এবং আরও বিয়ারের বোতল বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে আমি বলবো, আসলে সোনার টুকরো জমিয়েছেন। একটা কথা সত্যি করে বলুন তো... আপনি আসলে কী খুঁজছেন?’

‘আমি নিজেও নিশ্চিত না,’ স্বীকার করে নিল পোর্টার। বিশপের ডায়েরিতে ধূসর বর্ণের বড় একটা ধাতব বাস্কের কথা বলা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল, এখানেই কোথাও ছিল সেটা।’

‘এখন নেই। গায়েব হয়ে গেছে।’

বক্স স্প্রিংটা তুলে ফেলল পোর্টার। ওটা বয়ে নিয়ে গিয়ে হেলান দিয়ে রাখল ম্যাট্রেসের পাশে। তারপর ফিরে এল বিছানার কাছে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। একহাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরে রেখে অন্য হাতের আঙুলগুলো বোলাচ্ছে ফ্লোরবোর্ডের ওপর। ‘এই বোর্ডটা কেমন যেন উঁচুনিচু বলে মনে হচ্ছে আমার।’

‘শুধু ওই বোর্ড? পুরো জায়গাই তো এবড়োখেবড়ো ঠেকছে আমার কাছে।’

‘আমি আসলে সেটা বোঝাতে চাইনি। বরং বোঝাতে চেয়েছি, বোর্ডটা তুলেছিল কেউ একজন, তারপর আবার জায়গামতো রেখে দিয়েছে। কিন্তু ঠিকমতো করতে পারেনি কাজটা, তাই কিছুটা উঁচুনিচু রয়ে গেছে এই বোর্ড।’

পোটারের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল সারা। ‘আমার মনে হয়, ডায়েরিতে যেসব খারাপ লোকের কথা বলা হয়েছিল, তারা সরিয়েছে ওই বোর্ড, চেক করে দেখেছে। আপনার কী ধারণা?’

‘এমনও হতে পারে, হয়তো অনেক পরে সরানো হয়েছে এই বোর্ড। জুডাইভার জাতীয় কিছু একটা লাগবে আমার।’

‘আপনি যদি ভেবে থাকেন এখানে আসার আগে একটা প্যাকেটে ভরে জুডাইভার নিয়ে এসেছি, তা হলে বলতেই হয়, আমাকে চেনা এখনও বাকি আছে আপনার। আমার আইফোনের চার্জারটার কথা যখন মনে পড়ে, তখনই গায়ে কেমন একটা শিহরণ বয়ে যায়... এই দেখুন, বলতে বলতেই মনে পড়ে গেল, ওটা আমার ডেস্কে ফেলে এসেছি।’

আঙুলের সাহায্যে ওই বোর্ড সরানো যায় কি না, সে-চেষ্টা করে দেখল পোটার। লাভ হলো না খুব একটা। ঠিকমতো ধরাই যাচ্ছে না বোর্ডটা। ‘গাড়ির চাবি আছে না আপনার কাছে?’

‘আছে তো। এই নিন।’ চাবিটা পকেট থেকে বের করল সারা, দিল পোটারের হাতে।

ফ্ল্যাশলাইটটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল পোটার। নিজের ফ্ল্যাশলাইটের আলো ওই বোর্ডের দিকে ধরে রাখল সারা। পোটার তখন চাবিটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, দুই বোর্ডের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ওটা, যতখানি সম্ভব জোরে খোঁচা মেরে আলাগা করার চেষ্টা করছে যে-কোনো একটা বোর্ড। প্রথমে কিছুই হলো না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা ফটাস আওয়াজ হলো। দেখা গেল, বেশ কয়েকটা বোর্ডের প্রথমটা আলাগা হয়ে গেছে মেঝে থেকে। হাত থেকে গাড়ির চাবি রেখে দিল পোটার। এবার দু’হাতে ধরল বোর্ডটা, সাবধানে আলাগা করার চেষ্টা করছে ওটা। খানিক বাদে খুলে ফেলতে পারল ওই বোর্ড, সরিয়ে রাখল। কাজে লেগে পড়ল পরের বোর্ডটা নিয়ে। সহজেই আলাগা করা সম্ভব হলো ওটা। এবং তৃতীয়টাও। এভাবে মোট পাঁচটা বোর্ড সরাল সে। মেঝেতে এখন দেখা যাচ্ছে দু’ফুট বাই দু’ফুটের প্রায় বর্গাকৃতির একটা খোলা জায়গা।

নিজের ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিল পোটার, আলো ফেলল ওই গর্তের ভেতরে।

‘কী দেখতে পাচ্ছেন?’

গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল পোটার, টেনে বের করে আনল একটা স্লিপিং ব্যাগ। ওটা ধরিয়ে দিল সারার হাতে। ‘এই জিনিস দেখে তো একটা ক্যাম্পিং গিয়ার বলে মনে হচ্ছে আমার। গর্তের ভেতরে আরও একটা স্লিপিং ব্যাগ আছে। আর আছে একটা ব্যাকপ্যাক।’

আবারও হাত ঢুকিয়ে দিল ওই গর্তের ভেতরে। বের করে আনল দ্বিতীয় স্লিপিং ব্যাগ আর ব্যাকপ্যাকটা। কোনোকিছু মিস করেছে কি না, নিশ্চিত হওয়ার জন্য খোঁজ চালান গর্তে। বলে উঠল, ‘না, আর কিছু নেই।’

ব্যাকপ্যাকের জিপার ধরে টান দিল সারা।

‘একটু দাঁড়ান,’ বলল পোর্টার। পকেট থেকে বের করল এক জোড়া লেটেক্স গ্লাভস, দিল মহিলাকে। ‘আগে এগুলো পরে নিন।’

জ্র কোঁচকাল সারা। ‘আপনি কি সত্যিই ভাবছেন এই ব্যাকপ্যাকের ভেতরে এমনকিছু পাওয়া যেতে পারে, যেটা প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে? পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই একটা ছেলেখেলা হতে পারে।’

‘যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হতে পারছি ওই ব্যাপারে, ততক্ষণ সাবধান থাকাই ভালো,’ আরেক জোড়া গ্লাভস পরে নিল পোর্টার নিজে।

গ্লাভস পরল সারা। ব্যাকপ্যাকের জিপার খোলার কাজে মন দিল আবার। ‘মরচে পড়ে গেছে। নড়তে চাইছে না।’ দাঁতে দাঁত চেপে টান মারল জিপার ধরে। শেষপর্যন্ত খুলে গেল ওটা। ধাতব একটা খুলে-যাওয়ার-আওয়াজ শোনা গেল।

ছাতলার গন্ধযুক্ত বাসি বাতাস বেরিয়ে এল ওই ব্যাগের ভেতর থেকে। আরও খারাপ কোনো একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ব্যাগটার তলদেশ থেকে।

‘আপনি এক কাজ করুন। আমাকে দিন। আমি দেখছি।’ সারাকে বলল পোর্টার, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাকপ্যাকটা নেয়ার জন্য।

ব্যাগের ভেতরে আলো ফেলে ফেলে দেখছে পোর্টার। নাকের বদলে মুখ দিয়ে দম নেয়ার চেষ্টা করছে যাতে দুর্গন্ধ টের পাওয়া না যায়। ব্যাগের যেটা সেন্টার পকেট, সেখান থেকে একে একে বিভিন্ন জিনিস বের করতে লাগল সে। মেঝেতে সারি করে সাজিয়ে রাখছে ওগুলো। ব্যাগটা যখন খালি হয়ে গেল, ঝুঁকল পেছনদিকে, ফ্যাশলাইটের আলোয় দেখছে ওসব জিনিস।

‘এত বাজে একটা গন্ধ কেন আসছে এই ব্যাগের ভেতর থেকে?’

‘কোনো এক সময়ে যে-কোনোভাবেই হোক না কেন পানি ঢুকে গিয়েছিল এই ব্যাগের ভেতরে। এবং সেটা, আমার অনুমান, অনেক দিন আগের ঘটনা না। যা হোক, পানির কারণে পচে গেছে ব্যাগের ভেতরের সবকিছু। আজ বহু বছর ধরে ওই গর্ভের ভেতরে ছিল ব্যাগটা,’ জবাবে বলল পোর্টার।

ছ’টা শার্ট গুনল সে। আরও গুনল চার জোড়া জিন্স, মোজা, অন্তর্বাস... পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই। কেমন সঁতসঁতে হয়ে আছে কাপড়গুলো। হাত দিয়ে যখনই ধরছে ওসব কাপড়, মনে হচ্ছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বুঝি। একটা মোজার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কী যেন, ফলে বলের মতো আকৃতি পেয়েছে ওটা, প্রান্তভাগ গিঁট দিয়ে আটকে ফেলা হয়েছে। ভেতরের ওই জিনিস যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য সাবধানে গিঁটটা খুলল সে।

দৃষ্টি বিনিময় করল সারার সঙ্গে। হাত ঢুকিয়ে দিল মোজার ভেতরে, আঁকড়ে ধরল ভেতরের জিনিসটা। ওটা বের করে এনে নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

পোর্টারের বুকের খাঁচায় বাড়ি মারছে ওর হৃৎপিণ্ডটা। ‘একটা ছবি তুলে নিন এই জিনিসের।’



মাথা ঝাঁকাল সারা । ক্যামেরা তুলল ।

একটা লকেট । ছোট । গোল্ড প্লেট করা । সঙ্গে আছে একটা চেইন, সেটার মাথায় মরচে-ধরা একটা চাবি । সারার ছবি তুলবার কাজ শেষ হওয়ার পর পোর্টার খুলল লকেটটা, ওই কাজ করতে বেগ পেতে হলো ওকে । ভেতরে এককালে একটা ফটোগ্রাফ ছিল । এখন মলিন হয়ে গেছে ওটা, বলা চলে হারিয়ে গেছে ওই ছবি । লকেটের ভেতরে একটা আদ্যাক্ষর দেখা যাচ্ছে ।

L.M.

ওটারও একটা ছবি তুলে নিল সারা ।

মেট্রো অফিসে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল ওদের। অফিসেই কোথাও গুয়ে-বসে একটু জিরিয়ে নেয়া উচিত ছিল। বহু পুরনো একটা কাউচ আছে অফিসে, ওই কাজে ব্যবহার করা যেত সেটা। শিকাগো শহরের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কার্যালয়ে নিজের জীবন শুরু করেছিল কাউচটা। তা-ও আবার কখন... অ্যাল ক্যাপোন এবং ডায়মন্ড জো এসপোসিটো যখন তাদের মায়েদের সঙ্গে দোকানে দোকানে যেত, এবং তাঁদের অগোচরে চুরি করে নিত ক্যান্ডি। বাদামি চামড়ায় মোড়া কাউচটা মলিন হয়ে গেছে বহু কাল আগেই। ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ভাঁজ পড়ে গেছে এখানে-সেখানে। ভেতরের প্যাড শক্ত হয়ে গেছে।

ওই কাউচ এখন দরকার ক্রেয়ারের।

একটু ঘুমানো দরকার ওর।

‘আমি জানি, এখনও একটা চাবি আছে আমার কাছে,’ ক্রেয়ারের পাশে থাকা ন্যাশ বলে উঠল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। হাতেধরা রিঙটার চাবিগুলো ঘাঁটছে একটা একটা করে। ‘এই যে, পেয়ে গেছি মনে হয়।’

সোনালি একটা চাবি বেছে নিল সে। পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্ট দরজার লকে ঢুকিয়ে দিল ওটা। কাজ হলো না।

ভুল চাবি বেছে নিয়েছে ন্যাশ।

টেনে চাবিটা বের করে নিল সে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল।

‘আপনার কাছে এত চাবি থাকে কেন?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বিশালদেহী ন্যাশ। ‘এদিকে-সেদিকে যাই আমি, আগের চাবিগুলো রয়ে যায় আমার সঙ্গে, নতুন কিছু চাবি যুক্ত হয়। তুমিও যদি এই কাজ করো, তা হলে দেখবে, একদিন তোমার কাছেও অনেক চাবি থাকবে।’

‘বেশিরভাগ লোক পুরনো চাবি ফেলে দেয়। অথবা যদি কোথাও যায়, সেগুলো বাসায় রেখে যায়। ওসব জিনিস তো বয়ে বেড়ানোর মতো না।’

এবার অন্য একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করে দেখল ন্যাশ। এটা রূপালি। মাথাটা অষ্টভুজাকৃতির। এই চাবিও কাজ করল না।

‘মাত্র তিনটা চাবি রাখলেই কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে আপনার। একটা গাড়ির, একটা আপনার অ্যাপার্টমেন্টের, অন্যটা আমাদের অফিসের। তার বেশি কোনো চাবি বয়ে বেড়ানোর কোনো কারণ কিন্তু দেখি না আমি।’

খুঁজতে খুঁজতে আরেকটা সোনালি চাবি বের করল ন্যাশ। এটার মাথা গোলাকার। লকের ভেতরে মসৃণভাবে ঢুকে গেল সেটা। ওটা দিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজার ডেডবোল্ট।

আলতো ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল ন্যাশ। ‘পুরনো চাবিগুলো যদি সঙ্গে না রাখি আমি, তা হলে এ-রকম কোনো কাজ করার দরকার যখন হবে, তখন করতে পারবো না।’

‘স্যাম? বাসায় আছেন আপনি?’ পোর্টারের নাম ধরে কেন ডেকে উঠল ক্লেয়ার, সে-ব্যাপারে সে নিজেও নিশ্চিত না। এই অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ার আগে সদর দরজায় তিনবার টোকা দিয়েছিল ওরা, কেউ সাড়া দেয়নি।

গাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে সারা অ্যাপার্টমেন্ট।

খানিকটা আগে বাড়ল ন্যাশ। লিভিং রুমের লাইট জ্বালিয়ে দিল।

উল্টে পড়ে থাকা চেয়ারটা দেখতে পেল ওরা দু’জনই।

‘শশালা,’ বিড়বিড় করে বলল ন্যাশ।

হোলস্টার থেকে টেনে পিস্তল বের করে ফেলল ক্লেয়ার। একটা একটা করে চেক করে দেখছে প্রতিটা ঘর। যখনই কোনো ঘরে গিয়ে ঢুকছে, লাইট জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

লিভিং রুমে রয়ে গেছে ন্যাশ। ধীর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওই ঘরের এখানে-সেখানে। তারপর একসময় হাজির হলো চেয়ারটার কাছে। ‘ক্লেয়ার, স্যাম নেই এখানে। এবং ওর অনুপস্থিতিতে কেউ জোর করে ঢোকেওনি এই অ্যাপার্টমেন্টে।’

বেডরুমে গিয়ে ঢুকেছিল ক্লেয়ার, ফিরে এল সেখান থেকে। ওর পেছনে জ্বলছে বাথরুমের লাইট। শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল পিস্তলটা। কফি টেবিলের ওপর আলগোছে পড়ে আছে একটা মোবাইল ফোন, ওটার ওপর নজর পড়ল ওর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল আইফোনটা। হোম বাটনে চাপ দিল। কিছুই হলো না। ‘স্যামের ফোন এটা। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।’

আনমনা হয়ে আছে ন্যাশ, শুনছে না ক্লেয়ারের কথা। ওই চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়েছে ওটার ওপর। চেয়ারটার তলদেশে আলগা হয়ে আছে কিছু ভেলক্রো ফাসেনার্স (কোনোকিছু আটকে রাখার জন্য আঠায়ুক্ত একজাতের ফিতা), আঙুল বোলাচ্ছে ওগুলোর গায়ে।

‘কী করছেন?’ ন্যাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ক্লেয়ার।

পেছনের সোফাটার গায়ে হেলান দিল ন্যাশ। ‘তোমাকে বলার মতো কিছু একটা আছে আমার। এবং সেটা শুনলে বিরক্ত হবে তুমি।’

‘কী?’

‘ওই ডায়েরি।’

‘কী হয়েছে ওটার?’

বড় করে দম নিল ন্যাশ। তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল সেটা। ‘ওই ডায়েরি জমা দেয়নি স্যাম। ওটা রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে।’ একটা হাত তুলল সে, ক্রেয়ার কিছু বলার আগেই চুপ করিয়ে দিল ওকে। ‘তবে ডায়েরিটা জমা দেয়ার পরিকল্পনা ছিল ওর। জমা দিতে চেয়েছিলও। কিন্তু কাজটা করতে চেয়েছিল বিশপ ধরা পড়ার পর। ওর মনে হয়েছিল, ডায়েরিটা যদি জমা দেয়, মিডিয়া কোনো না কোনোভাবে জেনে যাবে ওটার খবর, এবং তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে ওটার ব্যাপারে। ফলে বিশপ যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাবে। স্থির বিশ্বাস ছিল স্যামের, বিশেষ ওই উদ্দেশ্যেই ডায়েরিটা “জায়গামতো” রেখে দিয়েছিল বিশপ। স্যাম ভেবেছিল, ডায়েরির কথা যদি জানাজানি হতে না দেয় সে, ডায়েরির বিষয়বস্তু যদি ফাঁস হতে না দেয়, তা হলে যে-খেলা খেলছে বিশপ, সেটা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হবে। স্যাম বলেছিল, বিশপ আসলে মাথাগরম স্বভাবের একটা মানুষ। আর তাই সে ধরে নিয়েছিল, যদি কোনো না কোনোভাবে উন্মত্ত করে দেয়া যায় লোকটাকে, তা হলে ওই লোক কোনো একটা ভুল করে বসবে। ফলে তাকে পাকড়াও করার একটা সুযোগ পেয়ে যাবো আমরা।’

‘তার মানে এসব জানতেন আপনি? এই কুকর্মে স্যামের সঙ্গে হাত ছিল আপনারও?’

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘প্রথমে আমি ওকে বলেছিলাম, ডায়েরিটা ওর কাছে রাখার জন্য বড়জোর একটা সপ্তাহ সময় দিতে পারি। কিন্তু সেই এক সপ্তাহ গিয়ে ঠেকল এক মাসে। তারপর সেটা পরিণত হলো চার মাসে। সময় যেতে লাগল, আর এই ব্যাপারটাও আস্তে আস্তে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল।’

‘আমি কিন্তু আমার রিপোর্টে ওই ডায়েরির কথা উল্লেখ করেছি। তার মানে ওটা রেকর্ডে রয়ে গেছে,’ বলল ক্রেয়ার।

‘আমিও করেছি কাজটা। এবং আমি নিজের কাছে কোনোকিছুই রেখে দিইনি। স্যামও জানে সেটা। সে বলেছিল, কিছু আসবে-যাবে না তাতে। বলেছিল, কেউ যদি জানতে চায় তো বলবে, ডায়েরিটা অনেক দিন আগে চেক করে দেখেছে সে, তারপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেবে এভিডেন্স রুমের ওপর... সেখান থেকে তো হরহামেশাই গায়েব হয়ে যায় এটা-সেটা বিভিন্ন প্রমাণ। স্যামকে তো চেনোই তুমি। নিজের সাফাই গাওয়ার জন্য বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা বলে দিত সে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে ওই চেয়ার দেখিয়ে দিল ক্রেয়ার। ‘তার মানে হচ্ছে, এই চেয়ারেই ভেলক্রো ফাসেনার্স দিয়ে ডায়েরিটা আটকে রেখেছিলেন স্যাম?’

‘হ্যাঁ।’

একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারটা ধরে দেখল ক্রেয়ার। ‘কোনোকিছু লুকিয়ে রাখার জন্য ভালো জায়গা।’

হাতটা সরিয়ে নিল। আবার বসে পড়ল ন্যাশের পাশে, হেলান দিল ওই কাউচের গায়ে। হাল ছেড়ে দেয়ার কায়দায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘স্যাম এখন তা হলে কোথায়?’



পোর্টারের মোবাইল ফোনের দিকে তাকাল ন্যাশ। ওটা এখনও আছে ক্রেয়ারের হাতে। ‘আমার ধারণা, ডায়েরিতে বিশেষ কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে সে। এবং এখন সেই সূত্রের পেছনে ছুটছে।’

‘তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু মোবাইল ফোন রেখে যেতে হবে কেন? এবং আমাদেরকে না বলে এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ কী?’

‘স্যাম ওর কাজ থেকে দূরে রাখতে চায় আমাদেরকে। আসলে রক্ষা করতে চায় আমাদেরকে।’

‘সাসপেনশনে আছেন তিনি। এসব থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে তাঁকে। এমনকী বিশপকে পাকড়াও করার পর তিনি যদি মার্চ করতে করতে হাজির হন আমাদের মেট্রো অফিসে, তবুও ছিনিয়ে নেয়া হবে তাঁর ব্যাজ। চাকরি হারাবেন তিনি।’

‘আমার মনে হয় না কোনো পরোয়া করে সে... অন্তত হিদার মারা যাওয়ার পর। মানুষটার মৃত্যু পুরোপুরি বদলে দিয়েছে স্যামকে। তা ছাড়া গতবার সেই বিল্ডিংয়ের ভেতরে হাতের এত কাছে পেয়েছিল সে বিশপকে... ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে লোকটা... এই ঘটনাও কেমন যেন বদলে দিয়েছে স্যামকে। আমার মনে হয়, স্যাম এখন ভাবছে, বিশপকে যদি ধরতে পারে সে, সেটা হবে ওর জন্য অসমাপ্ত কোনো কাজ শেষ করার মতো। এবং আমার আরও মনে হয়, বিশপকে ধরার জন্য যা-যা করা দরকার, করবে সে। হয়তো একটা অপরাধবোধ এখনও কাজ করে চলেছে ওর মনে... ওর ভুলের কারণেই আজও মুক্ত-স্বাধীন জীবন যাপন করে চলেছে বিশপ। তাই হয়তো চাইছে, সে-ই শেষ করবে এ-সবকিছু।’

‘কাজটা বিপজ্জনক।’

‘ওই যে বললাম... তাতে কোনো পরোয়া নেই ওর।’

‘এভাবে একা কাজ করাটা উচিত না তাঁর।’

‘কিছু করার নেই... একাই কাজ করতে চায় সে,’ বলল ন্যাশ।

বুকের কাছে দুই হাঁটু ভাঁজ করল ক্রেয়ার, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল হাঁটু দুটো। ‘ন্যাশ, পিকআপ ট্রাকের ওই ছেলের কথা বলি। এককথায় ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। কাজটা যদি বিশপের হয়ে থাকে, তা হলে স্বীকার করতেই হবে, অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে লোকটার।’

‘আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, আমাদেরকে সবসময়ই কিছু না কিছু বলতে চেয়েছে ওই লোক। কী বলতে চেয়েছে, সেটা খুঁজে বের করা দরকার আমাদের। খুঁজে বের করা দরকার বিশেষ সেই মেসেজটা। যদি পারি কাজটা করতে, ল্যারিসার খোঁজ পেয়ে যাবো। এমনকী খোঁজ পেয়ে যেতে পারি বিশপেরও।’ কোমল কিন্তু একঘেয়ে কণ্ঠে কথাগুলো বলল ন্যাশ। ‘ক্রেয়ার, আমরা যা-যা জানি, সব শেয়ার করা দরকার এফবিআই-এর সঙ্গে। এমনকী সেই

ডায়েরির কথাও । আর কোনোকিছু চেপে রাখা সম্ভব না আমাদের পক্ষে । বিশেষ করে এই অবস্থায় ।’

‘জানি,’ হাই উঠল ক্লেয়ারের, সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করল সে, হাত তুলল মুখের কাছে । বুঝতে পারছে, যদি এভাবেই বসে থাকে এখানে, ঘুমিয়ে পড়বে যে-কোনো সময় । ‘আমরা অফিসে ফিরে যাওয়ামাত্র করবো কাজটা ।’

ওর পাশে বসা ন্যাশও হাই তুলল ।

‘মিনিট পাঁচেক জিরিয়ে নিই । তারপর রওনা হবো মেট্রো অফিসের উদ্দেশে ।’

জবাব দিল না ন্যাশ । ঘুমিয়ে পড়েছে ইতোমধ্যেই । নাক ডাকার মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ।



পকেটে বিশপের ছুরির ওজন অনুভব করতে পারছে পোর্টার।

ভালো কোনো দিকে মোড় নিচ্ছে না এই ঘটনা। মোটেও ভালো কোনো দিকে মোড় নিচ্ছে না ঘটনাটা। জিন্সের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিলাম আমি। আমার সেই বাক নাইফের পরিচিত হাতলটা খুঁজছি। কিন্তু ছুরিটা নেই সেখানে। যদি থাকত, তা হলে এখন হয়তো দু'ফাঁক করে দিতে পারতাম সামনে দাঁড়ানো লোকটার গলা। কল থেকে যেভাবে পানি বের হয়, সে-কায়দায় রক্ত বের হতো ওই লোকের ক্ষতস্থান থেকে। আমি দ্রুত হামলা চালাতে পারি। কথাটা জানা আছে আমার। কিন্তু সেই দ্রুততা কি যথেষ্ট? অতিরিক্ত ওজনের কারণে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে যে-সময় নষ্ট করে ফেলবেন লোকটা, ততক্ষণে তাঁকে পরপারে পাঠানো হয়ে যাবে আমার। এখন যদি বাবা থাকতেন আমার সামনে, তা হলে চাইতেন আমি যাতে শেষ করে দিই লোকটাকে। মা-ও তা-ই চাইতেন। আমি জানি, আমাকে দিয়ে ওই কাজ করিয়ে নিতে চাইতেন তাঁরা।

ডায়েরিতে লেখা বিশপের কথাগুলো যেন বার বার ফিরে আসছে পোর্টারের মনে।

কার্টার দম্পতির সেই ট্রেইলারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে, সঙ্গে আছে সারা। সবকিছুর ছবি তোলা শেষ ওদের। ওই লকেট আর চাবি ঢুকিয়ে নিয়েছে একটা ব্যাগে। কাপড়গুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাকপ্যাকে, তারপর ওসব রেখে দিয়েছে বেডরুমের মেঝেতে। ম্যাট্রেস আর ফ্লোরবোর্ডগুলো সেভাবেই হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে দেয়ালের সঙ্গে।

মাথার ওপরে বেশ অনেকখানি উঠে এসেছে চাঁদ। মনে হচ্ছে, কালো কোনো পর্দা সরিয়ে হাজির হয়েছে যেন... চুপিসারে একঝলক দেখে নিতে চায় নিচের পৃথিবীটা। বাতাস নিঃসন্দেহে ঠাণ্ডা। শিকাগোর আবহাওয়ার মতো না, তারপরও হাড়কাঁপানো একটা ভাব আছে। পোর্টারকে জ্বালাতন করছে ওই বাতাস।

শহরে ফিরে যেতে চাইছে সারা। একটা হোটেল খুঁজে বের করতে চাইছে, বিশ্রাম নিতে চাইছে। এবং এই কথা দ্বিতীয়বার বলার দরকার নেই তার। কথাটা তার চোখে পড়তে পারছে পোর্টার। মহিলা ক্লান্ত। যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে, তা ওর বেলায় একরাতের জন্য যথেষ্ট।

মহিলার দিকে উল্টো ঘুরল পোর্টার। দুটো “বাড়ির” পেছনেই যেন সীমানাখাচীর গড়ে দিয়েছে সারি সারি কিছু গাছ, তাকিয়ে আছে সেদিকে। তাকিয়ে আছে ছোট যে-পথ এগিয়ে গেছে ওই জঙ্গল অভিমুখে, সেটার দিকে।

কেমন একটা স্পন্দন টের পাচ্ছে পাকস্থলীর ভেতরে। চামড়ায়, মনে হচ্ছে, অদ্ভুত এক শিহরণ জেগেছে।

পোর্টারের পায়ের কাছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরে রেখেছে সারা। ওই জমিন থেকে আস্তে আস্তে আগে বাড়তে লাগল সেটা, গিয়ে মিলিত হলো যে-জায়গায় নিজের ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলেছে পোর্টার, সেখানে।

‘এই জায়গায় গত বেশ কয়েক বছর ধরে বসবাস করছে না কেউ। তা হলে বলুন তো, ওই পথ এখনও ওখানে রয়ে গেছে কী করে? এতদিনে তো আগাছার জঙ্গলে ভরে ওঠার কথা ছিল ওটার।’

‘ওখান দিয়ে সম্ভবত চলাচল করে বুনো জন্তুর দল। আবার ছেলেছোকরারাও হতে পারে... যারা কিনা পার্টি করতে আসে ওই ট্রেইলারের ভেতরে।’

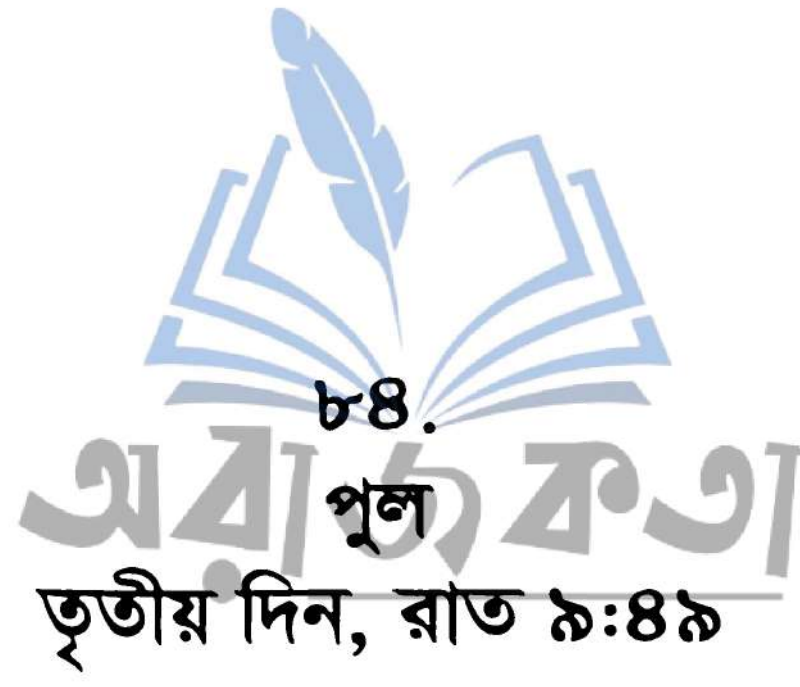
অথবা অন্য কিছু একটা। আরও খারাপ কিছু একটা।

ছুরিটা এখন গরম অনুভূত হচ্ছে। কখন যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে পোর্টার, কখন যে আঁকড়ে ধরেছে ছুরির হাতল, টের পায়নি নিজেই। হাতলের গায়ে পিছলে গেল ওর আঙুলগুলো।

‘আপনি চাইলে থাকতে পারেন এখানে,’ পরামর্শ দেয়ার কায়দায় বলল সারাকে।

ইতোমধ্যেই মাথা নাড়তে শুরু করে দিয়েছে ওই মহিলা। ‘ওই জায়গায় একা যাচ্ছেন না আপনি।’

আর কোনো কথা হলো না ওদের দু’জনের মধ্যে। লন পার হলো ওরা, এগিয়ে চলেছে ওই পথের উদ্দেশে। পথটার প্রবেশমুখের কাছে পড়ে আছে একটা গাছের গুঁড়ি, টপকাল ওটা। তারপর গায়েব হয়ে গেল ওই পথের প্রবেশমুখের ভেতরে। অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুঝছে ওদের দু’জনের ফ্ল্যাশলাইটের আলো।



‘ওই একই বাক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি আমি কম করে হলেও বারোবার। ঘাঁটাঘাঁটি করেছি ওই পাগলাটে এবং মস্তিষ্ক বিকল করে দেয়া অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডগুলো নিয়েও।’

স্প্রেডশিটের স্ক্রুপে ডুবে ছিল পুল, মুখ তুলে তাকাল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েমানুষটার দিকে। গোলাপি একটা ক্যাপ পরেছে ওই মেয়ে। গলায় বেগুনি মাফলার। ওটা ঝুলে আছে জিপার-খোলা ভারী একটা জ্যাকেটের ওপর। মেয়েটাকে আগেও দেখেছে পুল।

‘ভেতরে আসতে পারি?’ জানতে চাইল ওই মেয়ে।

চেয়ারে হেলান দিল পুল। মাথা ঝাঁকাল। চাঁদি চুলকাল একটুখানি। ঘাড়ের ব্যথাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে মাথার সামনের দিকে, ছড়িয়েছে মাথার দু’পাশেও। ‘কী করতে পারি আপনার জন্য?’

এগিয়ে এল মেয়েটা, হ্যাডশেক করার জন্য বাড়িয়ে দিল হাত। ‘আনুষ্ঠানিক পরিচয় বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনোকিছু ঘটেনি আমাদের মধ্যে। আমি ডিটেকটিভ ক্রেয়ার নর্টন। ডিটেকটিভ পোর্টার এবং ন্যাশের সঙ্গে ফোর মাস্কি কিলার টাস্ক ফোর্সে ছিলাম। তারপর একসময় হাজির হলেন আপনি এবং আপনার দলের সদস্যরা। কেসটা চুরি করে নিলেন আমাদের কাছ থেকে।’

ক্রেয়ারের হাতটা ধরল পুল। ‘আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল।’

‘ইতোমধ্যেই জানি সেটা। একটু আগে যে বললাম আমি একজন ডিটেকটিভ, সেটা বোধহয় খেয়াল করেননি আপনি।’

এখন অনর্থক বাক্যালাপ করতে চাইছে না পুল। ‘আপনার জন্য কী করতে পারি, ডিটেকটিভ?’

‘আমি চাই, আপনি একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসবেন... পার হবেন হলটা।’

‘আপনাদের অফিসরুমে যেতে বলছেন? পোর্টার কিন্তু বলেছিলেন, আমার ওই জায়গায় যাওয়া বারণ। আমি শেষবার যখন গিয়েছিলাম সেখানে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য যে-লোক ছিলেন তখন, তাঁরা দু’জন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কথাটা।’

‘আপনাকে এবং আপনার বন্ধুদের ধন্যবাদ... স্যামকে কয়েকদিনের জন্য একটা বিরতি দেয়া হয়েছে। তিনি যতদিন ফিরে না আসছেন, ওই রুমের দায়িত্বে আছি আমি,’ বলল ক্রেয়ার।

‘তাতে আমার কী?’

‘আপনারই কিছু একটা। কারণ কেউ একজন দুর্ঘটনাক্রমে এমন কিছু একটা দিয়ে গেছে আমাদেরকে, যা আসলে পাওয়া উচিত ছিল আপনার।’

হল ধরে ডিটেকটিভ ক্রেয়ার নটনকে অনুসরণ করে জায়গামতো হাজির হলো পুল। আগে থেকেই একটা উত্তেজনা কাজ করছিল ওই ঘরের ভেতরে, পুল ঢোকামাত্র সেটা আরও ঘন হলো যেন। পুল টের পেল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে ক্লান্ত কিছু চোখ। ওর জন্য কনফারেন্স টেবিলের ধারে একটা চেয়ার টেনে দিল ন্যাশ, সেটা দেখতে পেয়ে লোকটার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল সে। ওই টেবিলের ধারে বসে আছে তিনজন মানুষ, তাদের মধ্যে কেবল ন্যাশকেই চেনে পুল।

‘ফ্র্যাঙ্ক,’ বিড়বিড় করে বলল ন্যাশ, হাতটা একটুখানি নাড়ল পুলের উদ্দেশ্যে।

টেবিলের ধারে বসে থাকা অন্য দু’জনের সঙ্গে পুলের পরিচয় করিয়ে দিল ক্রেয়ার। ‘ইনি সোফি রদ্রিগেজ, মিসিং চিলড্রেন-এ আছেন। আর ওই যে... ওই কোনায় সবকিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে না একজনকে... সে এডউইন ক্রোজোয়োস্কি। আমাদের ইনফর্মেশন টেকনোলোজি ডিভিশনের প্রধান।’

‘আমাকে শুধু ক্রোজ বলে ডাকবেন,’ উঠে দাঁড়াল ক্রোজ। টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল পুলের দিকে।

‘ক্রোজ, মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক পুল একজন ফেডেরাল এজেন্ট। তাঁকে এত তোষামোদ করে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই,’ বলল ক্রেয়ার।

বাড়ানো হাতটা ফিরিয়ে নিল ক্রোজ, বসে পড়ল চেয়ারে। ‘ঠিক।’

‘আপনাদের ইন-চার্জ কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ। ‘তাঁকে দেখছি না যে?’ ফর্টি ফাস্ট স্ট্রিটের ওই বাড়ি দুটোর কথা ক্রেয়ারদেরকে বলল পুল। বলল ডিনার আর বিশপের কথাও।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ন্যাশ আর ক্রেয়ার।

ক্রেয়ারই কথা বলল প্রথমে। ‘আমি খুবই দুঃখিত।’

আরও একবার মাথা ঝাঁকাল পুল।

‘এবার কী করবে এফবিআই? এই কেস নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে দেবে আপনাকে?’ জানতে চাইল ন্যাশ।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পুল। ‘কাজ চালিয়ে যেতে দেবে না, এ-রকম কোনো কিছু এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি আমাকে। আমাদের শিকাগো অফিসে লোকবলের স্বল্পতা আছে এমনিতেই। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সন্ত্রাসী হামলার হুমকি এসেছে, বেশিরভাগ এজেন্ট কাজ করছে ওসব নিয়ে। হয়তো নতুন কাউকে দেয়া হবে আমার সঙ্গে, তবে আপাতত আমি একাই কাজ করছি এই কেসে। এই কেস আমার চেয়ে ভালো জানে না আর কেউ।’ ঘরের এদিকে-সেদিকে তাকাল সে। ‘সম্ভবত আপনারা সবাই বাদে আর কী।’

‘স্যামও আছেন ওই তালিকায়,’ নিচু গলায় বলল ক্রোজ। ‘আমাদের যে-কারও চেয়ে এই কেস ভালো জানেন তিনি।’

পুল বলল, ‘তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি আমি কয়েকবার। কিন্তু তাঁর ফোনে বার বার শুধু ভয়েস মেইল পাওয়া যাচ্ছে।’



আরও একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করার পালা ন্যাশ আর ক্লেয়ারের।

ক্লেয়ার বলল, ‘আমি আর ন্যাশ এই কিছুক্ষণ আগে এসেছি স্যামের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। দেখলাম, তাঁর মোবাইল ফোনটা লিভিং রুমে একটা টেবিলের ওপর রাখা আছে। বন্ধ। একপাশে কাত হয়ে উল্টে পড়ে আছে তাঁর প্রিয় চেয়ারটা।’

‘কী মনে হয় আপনাদের? বিশপ গিয়ে পাকড়াও করেছে তাঁকে?’

‘না। আমাদের মনে হয়, স্যাম স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে বাইরে কোথাও গেছেন। কারণ তাঁর সুটকেসটাও গায়েব হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা, কোথাও চলে গেছেন তিনি,’ বলল ক্লেয়ার।

‘এমন কোথাও, যে-জায়গার কথা আমাদেরকে জানাতে চায় না সে,’ যোগ করল ন্যাশ।

‘কোথায় গিয়ে থাকতে পারেন তিনি?’

প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ।

‘এ-রকম কি হতে পারে, তিনি আসলে কাজ করছেন বিশপের সঙ্গে? এ-রকম কি হতে পারে, ওই লোককে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করছেন তিনি?’

‘কোনো সম্ভাবনাই নেই,’ বলল ন্যাশ।

বুকের ওপর দু’হাত ভাঁজ করল ক্লেয়ার। ‘অসম্ভব।’

বাকি কথা বলার আগে ওই দু’জনের চেহারা দেখে নিল পুল। ‘বিশপের ডায়েরির ব্যাপারে কী জানা আছে আপনাদের?’

আবারও নীরবতা নেমে এল সারা ঘরে। একজন আরেকজনের চেহারার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কেউই কিছু বলছে না।

শব্দ করে দম ছাড়ল পুল, উঠে দাঁড়াল। ঘুরল দরজার দিকে। ‘এসবের জন্য আমার কাছে সময় নেই আসলে।’

দু’হাতের তালু টেবিলের ওপর রাখল ন্যাশ। ক্লেয়ার আর ক্লেজের ওপর নজর বুলিয়ে নিল একবার। ‘ফ্র্যাঙ্ক, দাঁড়ান। প্লিজ বসুন।’

চেয়ারে বসে পড়ল পুল। ‘ওই ডায়েরি কোথায় আছে, জানা আছে আপনাদের, তা-ই না?’

ন্যাশের দিকে তাকাল ক্লেয়ার।

ন্যাশ বলল, ‘স্যাম ওটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।’

‘তার মানে প্রমাণ গোপন করেছেন তিনি।’

‘না, সে আসলে ওই ডায়েরি লুকিয়ে রেখেছে সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে। প্রমাণ হিসেবে ওটা যদি জমা দিত সে, তা হলে খবরটা যেভাবেই হোক না কেন, চলে যেত পত্রিকাওয়ালাদের কাছে। ওই খবর ফাঁস হতোই। ও-রকম কোনো খবর ফাঁস হতোই হতো।’

‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন অত বড় একটা প্রমাণ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন তিনি? এবং আপনারা সবাই জেনে-বুঝে সে-কাজ করতে দিয়েছেন তাঁকে?’

‘ডায়েরিটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে স্যাম। ওটা যে ওর কাছে আছে, সেটা জানা ছিল শুধু আমার। শুধু আমি আর স্যাম জানতাম সেটা। অন্য কেউ না।’ হাত দুটো উল্টাল ন্যাশ। তাকিয়ে আছে তালুর দিকে।

‘ওই ডায়েরি এখন কোথায়?’

‘স্যামের অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমে একটা চেয়ার আছে... একটু আগে যেটার কথা বলা হয়েছে... উল্টে পড়ে আছে; ওটার নিচে ওই ডায়েরি লুকিয়ে রেখেছিল স্যাম।’

‘তার মানে তিনি যেখানেই গিয়ে থাকুন না কেন, সঙ্গে ওই ডায়েরি নিয়ে গেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘এবং ডায়েরিটার কোনো কপি তৈরি করেনি কেউ?’

‘আমরা চাইনি ওটার কোনো কপি তৈরি করা হোক।’

এসব কথা আত্মস্থ করে নিতে একটু সময় লাগল পুলের। তারপর ক্লেয়ারের দিকে ঘুরল সে। ‘এ-কারণেই কি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন আপনি? দায়মুক্ত হতে চাইছেন আপনারা সবাই?’

‘না। আরও কিছু কথা আছে,’ বলল ক্লেয়ার। টেবিলের ওপর রাখা একটা ম্যানিলা ফোল্ডার থেকে টেনে বের করল আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চির একটা ছবি। ওটা ঠেলে দিল পুলের দিকে।

ছবিটা তুলে নিল পুল। একটা ছেলের ছবি। বরফের স্তরের নিচে জমে গেছে ওই ছেলে। একটা পিকআপ ট্রাকের ক্যাব থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা।

উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার, এগিয়ে গেল হোয়াইটবোর্ডের দিকে। ঘরের সামনের দিকে হোয়াইটবোর্ড আছে, সেখান থেকে খুলে নিয়ে এল আরেকটা ছবি। ওটা নামিয়ে রাখল পুলের সামনে। জুম করা অবস্থায় বিশেষ একটা গাড়ির উইন্ডশিল্ড দেখা যাচ্ছে। কোনো একটা ট্রাফিক ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয়েছে এই ছবি।

‘এ তো দেখছি বিশপ,’ নিশ্চয় গলায় বলল পুল।

‘ছবিতে যে-পিকআপ ট্রাক চালাতে দেখা যাচ্ছে বিশপকে, আর ওই ছেলের লাশ পাওয়া গেছে যে-ট্রাকের ভেতর থেকে, দুটো বাহন একই,’ পুলকে বলল ক্লেয়ার। ‘আজ থেকে সপ্তাহ তিনেক আগে জ্যাকসন পার্কের সিকিউরিটি ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল ওই ট্রাক। ওটা কাজে লাগিয়ে অচেনা একজন লোক একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিয়ে গিয়েছিল পার্কের ভেতরে। তারপর ট্যাঙ্কের ভেতরের পানি কাজে লাগিয়ে এলা রেনল্ডসের লাশ লুকিয়ে ফেলেছিল লেগুনের উপরিতলের নিচে। ওই ট্যাঙ্ক চুরি করা হয়েছিল ট্যাঙ্কস আ লট নামের একটা অ্যাকুয়ারিয়াম স্টোর থেকে।

কাহিনি এখানেই শেষ না। বিশপের পঞ্চম শিকার বারবারা ম্যাকিনলের বোন লিবি ম্যাকিনলে একটা চাকরির জন্য আবেদন করেছিল ট্যাক্সস আ লটে। এবং মাত্র একদিন কাজ করেছে সেখানে। আমার মনে হয় বিশপকে ওই দোকানে চুরি করার সুযোগ দেয়ার জন্য ওই একটা দিনই যথেষ্ট। যেভাবেই হোক না কেন, বিশপ আর লিবি ম্যাকিনলে একসঙ্গে কাজ করছে। বলা ভালো, একসঙ্গে কাজ করছিল ওই দু'জন।

ছবি দুটোর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে পুল। 'এসব খবর কবে জানতে পেরেছেন আপনারা?'

'গত কয়েক ঘণ্টায়,' জবাবে বলল ক্লেয়ার।

'ওই ছেলের পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?'

'এখনও না। কাজ চলছে এই ব্যাপারটা নিয়ে।'

'লিবি ম্যাকিনলের কী হয়েছে, সে-ব্যাপারে কিছু জানেন আপনাদের কেউ? আমরা কী অবস্থায় খুঁজে পেয়েছি মেয়েটাকে, জানেন কিছু?' জিজ্ঞেস করল পুল।

'জানি মানে খবরে দেখেছি আর কী।'

'খবরে দেখেছেন,' বিড়বিড় করে বলল পুল। এখনও চোখ বুজলেই লিবি ম্যাকিনলের লাশটা দেখতে পাচ্ছে সে। ওই মেয়ের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে এজেন্ট ডিনারের লাশও। মনে পড়ে যাচ্ছে বিশপের চেহারাটা... মনে পড়ে যাচ্ছে, দরজা খুলে দিয়েছিল লোকটা।

আপনি স্যাম পোর্টার না।

কথাটা বলার পর একটা হাসি দেখা গিয়েছিল ওই লোকের চেহারায়া।

ঘরের সামনের দিকে যে-দুটো হোয়াইটবোর্ড আছে, সে-দুটোর দিকে তাকাল পুল। টের পেল, কয়েকটা মেয়ের ছবি যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তারপর তাকাল কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে। এবার টের পেল, ওকেই দেখছে ওসব মানুষ। 'পোর্টার বলেছিলেন, নতুন এসব ঘটনার সঙ্গে নাকি কোনো যোগসূত্র নেই বিশপের।'

'ভুল বলেছিল স্যাম।'

'দেখুন, একটা কথা সরাসরি বলি আপনাদেরকে। প্রমাণ জমা না দেয়া, বিশেষ একটা ডায়েরি নিজেদের কাছে রেখে দেয়া, তা-ও আবার যখন কেসটা পরিণত হয়েছে একটা ফেডেরাল কেসে তখন... এসব অপকর্মের ফলে আপনাদের যে শুধু চাকরিই চলে যেতে পারে তা না, আপনাদের কেউ কেউ জেলেও যেতে পারেন। ওই ডায়েরি অনেক বড় একটা সূত্র হতে পারত এই কেসে, অথচ এখন সেটাই নেই আমাদের হাতে। কোথায় আছে সেটা, তা-ও জানি না।'

'অন্য কারও কোনো দোষ নেই এই ব্যাপারে। ডায়েরির কথা যদি বলেন, তা হলে সেটার সঙ্গে জড়িত শুধু আমি আর স্যাম,' আবারও জানিয়ে দিল ন্যাশ।

আরও একবার নীরবতা নেমে এল ঘরে।

ন্যাশের নজরের সঙ্গে মিলিত হলো ক্লেয়ারের নজর। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল দু'জনই। ওদিকে সোফির নজর যেন চুম্বকের মতো আটকে গেছে ওর মোবাইলের স্ক্রিনের ওপর। তবে দেখে মনে হচ্ছে না, আদৌ কিছু একটা পড়ছে সে। বোঝা যাচ্ছে, চাইছে না, কারও সঙ্গে চোখাচোখি হোক।

মিনিটখানেক পর উঠে দাঁড়াল পুল। 'এখানেই অপেক্ষা করুন আপনারা। আসছি আমি।'

বেরিয়ে গেল সে।

ফিরে এল কিছুক্ষণ পরই। এফবিআই-এর রুম থেকে একটা হোয়াইটবোর্ড নিয়ে এসেছে সঙ্গে। এই ঘরের সামনের দিকে অন্য যে-দুটো বোর্ড আছে, সে-দুটোর সঙ্গে রাখল বোর্ডটা। তারপর আবারও বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল হলের উদ্দেশে।

'কিছু বলবেন না আমাদেরকে?' পেছন থেকে ডাক দিল ক্লোজ।

'এই কেস নিয়েই এখন কাজ করবো আমরা।'

এতক্ষণ দম চেপে রেখেছিল ক্লেয়ার, এবার শব্দ করে ছাড়ল সেটা।



কালো নিট ক্যাপ পরিহিত লোকটা বসে আছে কেটির মুখোমুখি, ছোট কিচেন টেবিলের ধারে। রক্তলাল হয়ে আছে লোকটার দু'চোখ... ডান দিকেরটার চেয়ে বাঁ দিকেরটা বেশি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে লোকটা কেটিকে। এবং সে-কাজ করতে গিয়ে কিছুটা ঘুরিয়ে রেখেছে মাথা। ভাবখানা এমন, বাঁ চোখ দিয়ে দেখছে কেটিকে, আর ডান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে দূরের কোনোকিছুর দিকে... ওই মেয়ের পেছনের কিছু একটার দিকে।

ধাতব যে-চেয়ারে বসে আছে কেটি, সেটার সঙ্গে জিপ টাইয়ের সাহায্যে বেঁধে রাখা হয়েছে তার হাত-পা।

শক্ত করে বাঁধা হয়েছে।

বেশ শক্ত করে।

রক্ত চলাচল যাতে চালু থাকে, সেজন্য আঙুলগুলো মোচড়ামোচড়ি করছে কেটি।

মুখোমুখি বসে থাকা লোকটার ওপর মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছে মেয়েটা। পারস্পরিক কোনো আলাপচারিতার সময় একজন মানুষ যেভাবে তাকিয়ে থাকে অন্য একজন মানুষের দিকে, সেভাবে তাকিয়ে আছে ওই মেয়ে। চেষ্টা করছে যাতে লোকটার মাথার ওই ক্ষতস্থানের ওপর নজর না পড়ে। শুকনো রক্ত এখনও লেপ্টে আছে ওই জায়গায়। বিশ্রী লাল মাংস দেখা যাচ্ছে জায়গাটার, কালো নিট ক্যাপ যেন বার বার ঘষা দিচ্ছে সেখানে; ওটার দিকে একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে না থাকার চেষ্টা করছে মেয়েটা। টেবিলের ওপর এবং মেঝেতে কোকোর গাড় একটা দাগ পড়ে গেছে, না তাকানোর চেষ্টা করছে সেদিকেও। এখন শুকিয়ে গেছে ওসব দাগ। কেমন যেন খসখসে হয়ে গেছে। রক্তের দাগ লেগে আছে মেঝেতে, সেটার দিকে না তাকানোর চেষ্টাটা সবচেয়ে বেশি করছে ওই মেয়ে। মাথায় কোকো মগের বাড়ি খেয়ে মেঝের ঠিক ওই জায়গাতেই লুটিয়ে পড়েছিল ওয়েজলি। রক্তের গোলাকার একটা জলাশয় তৈরি হয়েছিল সেখানে। এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে গিয়ে রক্তের ক্ষুদ্র কিছু খাঁড়ি তৈরি করেছিল ওই জলাশয়। তারপর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল ওসব খাঁড়ির। সবশেষে লিনোলিয়ামের গায়ে বেশকিছু রক্তবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ওগুলো। রক্তের ছিটা লেগে আছে দেয়ালেও।

তাকিয়ে তাকিয়ে এসব দৃশ্য দেখতে পারে না কেটি।

দেখবেও না।

ওই লোকের ডান হাতে একটা বোতল আছে। সেটার ভেতরে কয়েকটা বড়ি দেখা যাচ্ছে। বোতলটা এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে সে যে, রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে আঙুলগুলো।

বোতলটার গায়ে একটা লেবেল সাঁটা আছে। ওটা ভালোমতো দেখার চেষ্টা করল কেটি। কিন্তু পারল না... ওই লোকের আঙুলের কারণে ঢাকা পড়ে গেছে লেবেলের বেশিরভাগ অংশ। কাঁপছে লোকটা... তবে অত বেশি না। বোতল থেকে বের করে কিছুক্ষণ আগে একটা বড়ি খেয়েছে। ওটা খাওয়ার আগে আরও খারাপ অবস্থা ছিল তার কাঁপুনির।

‘আরও একবার বলো তো আমাকে,’ বলল লোকটা। খানিকটা সামনে ঝুঁকল, আরেকটু কাছাকাছি হলো কেটির। লোকটার নিঃশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছে ওই মেয়ে। এবং বিশেষ এই গন্ধ পেতে চায় না বেচারী। জানে, এই নরক থেকে যদি পালাতে চায়, তা হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে, ওই লোকের বিশ্বাস জিতে নেয়া। ওকে যে বিশেষ কোনো কারণে দরকার লোকটার, সেটা বুঝিয়ে দেয়া দরকার লোকটাকে। যে-কারণটা বুঝিয়ে দিতে পারেনি অথবা বুঝিয়ে দেয়নি বেসমেন্টের অন্য মেয়েটা। যে-কারণটা, এই লোকের শিকারে পরিণত হওয়া মেয়েরা বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না হয়তো।

‘আমার হাত-পায়ের বাঁধন কি একটু আলগা করে দিতে পারবেন? কথা দিচ্ছি, আমি পালানোর চেষ্টা করবো না। মনোযোগ দিতে এখনও কষ্ট হচ্ছে আমার। এবং যে-ব্যথা অনুভব করছি, সেটা আরও নষ্ট করে দিচ্ছে আমার মনোযোগ।’ কথায় জোর দেয়ার জন্য হাত দুটো চেয়ারের সঙ্গে ঘষটে আওয়াজ তুলবার চেষ্টা করল কেটি। কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিল, এ-রকম কিছু আর করবে না। এ-রকম কিছু করাটা উচিত না ওর। শরীরে শক্তি যে বাকি রয়েছে গেছে এখনও, সেটা প্রদর্শন করাটা উচিত হবে না। ওকে এখন প্রদর্শন করতে হবে শুধু দুর্বলতা। বুঝিয়ে দিতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে চাইছে সে ওই লোকের কাছে।

‘ব্যথা-বেদনা মানুষের চিন্তাভাবনাকে আরও ধারালো করে দেয়। তুমি যদি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারো, মনোযোগ দেয়ার কাজে তোমাকে সাহায্য করবে ব্যথা-বেদনার অনুভূতি। তোমার মনোযোগ কমাবে না কিছুতেই।’

ওই বড়ি খাওয়ার আগে কথা কেমন জড়িয়ে আসছিল লোকটার, ওটা খাওয়ার পর বেশ অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। আধো আধো যে-উচ্চারণ ওর, সেটাও কেটে গেছে প্রায়। তবে এখন ঘামছে লোকটা। ঘামের ছোট ছোট বিন্দু দেখা দিয়েছে তার ক্রুর ওপরে আর ঘাড়ে।

‘ওয়েজলিকে একটু দেখতে চাই আমি,’ বলল কেটি। ‘দেখাতে পারবেন? আমরা দু’জনই তা হলে কথাটা বলতে পারতাম আপনাকে। আমরা দু’জনই যদি একই জিনিস দেখে থাকি, তা হলে সেটা আরও ভালোমতো জানতে সুবিধা হতো আপনার। ঠিক বলেছি না?’



একটা মুহূর্তের জন্য কেটির ওপর থেকে নজর সরে গেল ওই লোকে মেঝের দিকে তাকিয়েছে সে। বলা ভালো, মেঝের যে-জায়গার দিকে কিছুতে তাকাচ্ছে না মেয়েটা, তাকিয়ে আছে সেদিকে। কিছুক্ষণ পর আবারও ওই মেয়ে ওপর মনোযোগ দিল লোকটা। ‘ওয়েজলিকে নিয়ে কোনো কথা বলবো না আমরা ওই ছেলেকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না আমি আসলে। বরং চাই, কথাটা আবার বলো তুমি আমাকে।’

বেঁধে রাখা দুই হাতে আবারও টান মারল কেটি, তবে এবার নিঃশব্দে। ডান হাতের তুলনায় বাঁ হাতের বাঁধন একটু আলাগা হয়েছে বলে মনে হলো ওর। কিন্তু সেটা বাঁধনমুক্ত হওয়ার মতো না। অন্তত ওর সে-রকম মনে হয় না। নিশ্চিত হওয়ারও কোনো উপায় নেই আপাতত। ‘আমি যা দেখেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো কি না, জানি না। অপূর্ব সুন্দর কিছু একটা দেখেছি আমি। জাদুকরি কিছু একটা দেখেছি। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... আমি দাঁড়িয়ে আছি কোনো সুরের মাঝখানে। অথবা, যেন স্পর্শ করছি কোনো একজন শিল্পীর আবেগ, আর ওই শিল্পী যেন স্পর্শ করছেন তাঁর সাবজেক্টের শ্বাসপ্রশ্বাস। আমার এই অনুভূতির সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোনো শব্দ নেই কোথাও।’

‘তুমি বলেছিলে, ঈশ্বরের চেহারাটা নাকি দেখতে পেয়েছ।’

আবারও ফিরে এসেছে সেই আধো আধো উচ্চারণ। ইংরেজিতে *said, saw*, এবং *face* শব্দ তিনটা বলেছে ওই লোক; তিনটা শব্দই কেমন যেন আটকে গেছে তার মুখের ভেতরে।

‘আমি... আমি আসলে ভেবেছিলাম, যা দেখতে পেয়েছিলাম, তা ঐশ্বরিক কিছু একটা। ভেবেছিলাম, স্বয়ং ঈশ্বরই যেন হাজির হয়েছেন আমার চারপাশে। একটা উষ্ণতা অনুভব করতে পেরেছিলাম। এবং সেটা যেন বিরাট কিছু একটা... সেটা যেন ঘিরে ধরেছিল আমাকে। আচ্ছা, এ-রকম কি কখনও হয়েছে আপনার... ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়েছেন, কিন্তু তার আগে সংক্ষিপ্ত একটা মুহূর্তের জন্য অনুভব করতে পেরেছেন, পড়ে যাচ্ছেন আপনি? এবং ঠিক তার পরই অনুভব করেছেন, আপনি যেন ভাসছেন... কোনো রকম ব্যথা-বেদনার অনুভূতি ছাড়াই নিখুঁত ওজনহীনতা বলা হয় যে-অবস্থাকে? এ-রকম কি কখনও হয়েছে আপনার, অনুভব করতে পেরেছেন, আপনার শরীরের ওপর কোনো চাপই নেই? ...স্পষ্ট কোনো শব্দ শুনতে পাইনি আমি, তারপরও আমার মনে হয়েছে, অন্তর শীতল করা খুবই চমৎকার কোনো আওয়াজ শুনছি যেন। মোদা কথা, আমি যেন কিছুই দেখিনি, আমি যেন কিছুই শুনতে পাইনি, তারপরও আমি যেন সবই দেখেছি, সবই শুনেছি। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... আমি একইসঙ্গে একই সময়ে চলে গিয়েছিলাম আলাদা দুটো জায়গায়।’

‘নিজেকে দেখতে পেয়েছিলে?’

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভাবল কেটি। তারপর মাথা নাড়ল। জিপ টাইয়ের বাঁধন থেকে প্রায় আলাগা করে ফেলেছে বাঁ হাতের আঙুলগুলো। ‘না, সে-রকম কিছু না আসলে। আমার মনে হয়, ও-রকম ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ঘটে শুধু সিনেমায়। অথবা টিভিতে। কিন্তু... আমি সত্যিই কিছু একটা অনুভব করতে পেরেছিলাম। অনুভব করতে পেরেছি, আমি যেন আলাদা হয়ে গেছি আমার শরীর থেকে। শরীরের সব সীমাবদ্ধতা থেকে।’

মেয়েটার আঙুলগুলো বলতে গেলে বেরিয়ে এসেছে জিপ টাইয়ের বাঁধন থেকে। চেয়ারের প্লাস্টিক কাঠামোয় ওই বাঁধনের মোচড়ামোচড়ির আওয়াজ লোকটা শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আর শুনে থাকলেও হয়তো পান্ডা দিচ্ছে না। আনমনে টোকা মারছে ওষুধের সেই বোতলের গায়ে।

ওই লোকের বিশ্বাস জিতে নাও, মনে মনে নিজেকে বলল কেটি। শান্ত থাকো। যদি তুমি নিজে শান্ত থাকতে পারো, ওই লোক শান্ত থাকবে। যা সে শুনতে চায়, তা-ই শুনিয়ে দাও তাকে।

মনে পড়ে যাচ্ছে বেসমেন্টের সেই মেয়ের কথা। বেচারী বোধহয় মরতে বসেছে এখন। কাচ গিলে ফেলেছিল সে। একঅর্থে ভালোই করেছে... ওকে আঘাত করার কোনো সুযোগ দেয়নি মুখোমুখি-বসে-থাকা এই রান্সসকে। মেয়েটাকে এই রান্সস স্পর্শ করার আগে নিজের মতো করে আত্মহননের পথ বেছে নিতে চেয়েছিল সে। মনে মনে ওই মেয়ের প্রশংসা করল কেটি। কিন্তু মরার কোনো ইচ্ছাই নেই কেটির। এই নরক থেকে যেভাবেই হোক না কেন বেরিয়ে যাবে সে।

সিঙ্কের ওপর একটা জানালা আছে। বাইরে অন্ধকার ঘনিয়েছে। তারপরও প্রতিবেশী একটা বাড়ি আবছাভাবে ঠাহর করতে পারছে মেয়েটা। ওটা এই বাড়ি থেকে বড়জোর ফুট দশেক দূরে। ওই বাড়ির একদিকের একটা জানালায় আলোর আভাও দেখা যাচ্ছে। সে-জানালায় ঝুলছে সাদা পর্দা; কেটির ধারণা, ওই পর্দার আড়ালে কোনো না কোনো মানুষের নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে সে।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল মেয়েটা। শুকিয়ে গেছে ঠোঁট দুটো। ‘একটু পানি দেয়া যাবে আমাকে?’

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওই লোক। কেটি প্রথমে ঠাহর করতে পারল না, ওর কথা লোকটা শুনতে পেয়েছে কি না। আবারও পানি খেতে চাইবে, এমন সময় উঠে দাঁড়াল ওই লোক। এগিয়ে গেল সিঙ্কের কাছে। ঝাপসা হয়ে আসা একটা গ্লাস তুলে নিল কাউন্টারের র‍্যাক থেকে। কল ছেড়ে পানি দিয়ে ভর্তি করল ওটা। যখন ফিরে এল টেবিলের কাছে, কেটি দেখতে পেল, গুঁড়া গুঁড়া কীসব যেন ভাসছে গ্লাসের পানিতে। তার মানে হচ্ছে, আগে কিছু একটা ছিল ওই গ্লাসে, আর ধোয়া হয়নি। যেমন নোংরা ছিল গ্লাসটা, তেমনই রয়ে গেছে।



কালো নিট ক্যাপ পরিহিত ওই লোক এখন দাঁড়িয়ে আছে কেটির পাশে। পানির গ্লাস ধরে রেখেছে মেয়েটার মুখের কাছে। পানি খাচ্ছে মেয়েটা। খাচ্ছে, এবং একটু আগে কী দেখেছে গ্লাসের পানিতে, ভুলে থাকার চেষ্টা করছে সে-দৃশ্য। এখন আত্মতুষ্ট থাকতে হবে ওকে। যে-কোনো কাজ করার ব্যাপারে আন্তরিক একটা ইচ্ছা প্রদর্শন করতে হবে। নিরুদ্ভিগ্ন একটা ভাব ফুটিয়ে রাখতে হবে চেহায়ায়। যদি বেঁচে থাকতে চায়, জানে, ওসব করতেই হবে ওকে যেভাবেই হোক না কেন। পানিটা কেমন যেন টক টক লাগছে। ওর মুখের কাছ থেকে গ্লাস সরিয়ে নিল ওই লোক। হাসল মেয়েটা। অস্বস্তিতে ভুগছে, এ-রকম কোনো ভাব প্রদর্শন করা যাবে না এখন।

টেবিলের ওপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল ওই লোকের। ফিরে গিয়ে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে।

কেন কেঁপে উঠল লোকটা, নিশ্চিত না কেটি... স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে হতে পারে, আবার এখন যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে ওই লোকের সঙ্গে, সেসবের কারণেও হতে পারে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত কেটি। ভয় বা দুর্বলতার কারণে কেঁপে ওঠেনি লোকটা।

‘আপনি যখন আমাকে ওই ট্যাক্সে নামিয়ে দিলেন,’ বলতে লাগল সে, ‘তখন কালো একটা পর্দা যেন নেমে এল আমার চোখের ওপর। অন্ধকারেই সংজ্ঞা ফিরে পেলাম আমি... কতক্ষণ পরে, বলতে পারবো না। কোথায় আছি, মনে করতে পারলাম না। একসময় বুঝতে পারলাম, পানিতে পড়ে গেছি আমি, নেমে যাচ্ছি আরও গভীরে, আমার আশপাশে সবকিছু নীরব হয়ে যাচ্ছে, আর তারপর...’ গলা ভেঙে গেল মেয়েটার। চোখে চোখ রাখল লোকটার। ‘তারপর একসময় ছুট করেই ঠিক হয়ে গেল সবকিছু। খেয়াল করলাম, আর কোনো ভয় লাগছে না আমার। চাওয়া-পাওয়া বলে আমার যেন আর কোনো কিছু নেই। আমি যেন পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছি।’

ওকে এখন রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করছে লোকটা। একটুখানি হাঁ হয়ে আছে তার মুখ। এবং তার ফলে সামান্য একটু থুতু বেরিয়ে এসেছে মুখের বাঁ কোনা ঘেঁষে। ওটা মুছে ফেলার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না লোকটার মধ্যে। যে-হাতে ধরে রেখেছে প্লাস্টিকের বোতলটা, সে-হাতের তর্জনী দিয়ে এখনও বার বার টোকা দিয়ে চলেছে ওই বোতলের গায়ে। ‘তোমাকে কেন বিশ্বাস করবো আমি, বলো তো?’ জানতে চাইল শেষপর্যন্ত।

‘কারণ আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলার কোনো কারণ নেই আমার।’

‘নেই?’

‘না, নেই। কারণ আমি বলতে গেলে মরেই গিয়েছিলাম। অন্য যে-মেয়ে এখন আছে বেসমেন্টে, সে আমাকে বলেছে, আমি নাকি মরে গিয়েছিলাম। আপনি ফিরিয়ে এনেছেন আমাকে। আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।’

‘তোমার হুৎপিণ্ড কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। তিন মিনিটের কিছু বেশি সময় ধরে মরার মতোই অবস্থা হয়েছিল তোমার। আর তাই আমার সন্দেহ, তুমি হয়তো কিছুই দেখতে পাওনি। আমি কী শুনতে চাই তা অনুমান করে নিয়েছ, এবং এখন মনগড়া একটা কাহিনি শুনিয়ে দিচ্ছ।’

‘ও-রকম কাজ করার কোনো কারণ নেই আমার।’

‘আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, ওই কাজ আরও একবার করা উচিত আমাদের। এবং এবার একটু বেশি সময় নিয়ে করতে হবে। সেটা পাঁচ মিনিট ধরে হতে পারে, আবার ছ’মিনিটও হতে পারে। কোনো মানুষ যদি একটানা পাঁচ মিনিট দম নিতে না পারে, তা হলে তার মস্তিষ্ক মরে যায়। আর তাই এবার তোমাকে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে রাখতে হবে ওই ট্যাঙ্কে। পাঁচ মিনিটের চেয়ে কম কোনো সময় যথেষ্ট না আসলে।’

জিপ টাইয়ের বাঁধনে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিল কেটি। কেন যেন কিছুতেই আলগা করতে পারছে না বাঁধনটা। ‘মেবেল কে?’

বড় করে দম নিল লোকটা। হেলান দিল চেয়ারে।

‘মেবেল মার্কেল?’ আবারও বলল কেটি। ‘হ্যাঁ, মার্কেলই তো। কে সে?’

‘ওই নাম কোথেকে শুনেছ তুমি?’

‘আমি যখন পানির নিচে ছিলাম, তখন নামটা শুনতে পেয়েছিলাম। মনে হলো, কেউ যেন আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে নামটা। আরেকবার মনে হলো, অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে চিৎকার করা হচ্ছে ওই নাম ধরে। আমি আসলে নিশ্চিত না এই ব্যাপারে। যা হোক, কে ওই মেয়ে?’

আরেকটা বড়ি নিল লোকটা। বোতলের ক্যাপটা খুলতে গিয়ে বেগ পেতে হলো তাকে। কিন্তু খুলতে পারল শেষপর্যন্ত। পানি ছাড়াই গিলে ফেলল ওষুধটা।

‘আপনি বলেছিলেন, আপনার নাকি একটা মেয়ে আছে। বলেছিলেন, আমি নাকি ওই মেয়েরই কাপড় পরে আছি। আপনার সেই মেয়ের নামই মেবেল মার্কেল নাকি?’

‘নিশ্চয়ই আমিই কোনো এক ফাঁকে নামটা বলেছি তোমাকে।’

‘না, বলেননি।’

দেখে মনে হচ্ছে, দ্বিধায় পড়ে গেছে ওই লোক। স্মৃতি হাতড়াচ্ছে... মনে করার চেষ্টা করছে, নিজের মেয়ের নাম আসলেই বলেছিল কি না কেটিকে। তার চাহনিতে এতক্ষণ লেপ্টে ছিল একটা অস্পষ্টতা, ওষুধের প্রভাবে সেটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

বাঁ হাতটা আবারও টান মারল কেটি। এবার বেশ জোরে। টের পেল, প্রায় মুক্ত করে ফেলেছে ওটা। আরও টের পেল, জিপ টাইয়ের কারণে কেটে গেছে হাতের একদিকের চামড়া। ব্যথা করছে কজির গোড়াটা। শুধু তা-ই না, গরম



লাগছে ওই জায়গায়, কেমন যেন ভিজে উঠেছে জায়গাটা। ভাবল, রক্তের কারণে যে-পিচ্ছিলতা তৈরি হয়েছে, তার ফলে হাত মুক্ত করাটা সহজ হবে কি না 'আমার মনে হয়, মেবেল আমার মাধ্যমে আপনাকে যা বলতে চেয়েছে তা হলো এখন ঠিকঠাক আছে সে। শান্তিতে আছে।'

'বলেছে নাকি?' উদ্বেগ টের পাওয়া গেল ওই লোকের কণ্ঠে, আগে শোনা যায়নি ও-রকম কিছু। 'তুমি নিশ্চিত?'

মাথা ঝাঁকাল কেটি। 'হ্যাঁ, তা-ই মনে হয় আমার।'

পিটপিট করছে ওই লোকের রক্তলাল চোখ দুটো। তারপর একসময় কেটির ওপর স্থির হলো তার নজর। মনে হচ্ছে, ওই মেয়েকে ভেদ করে যেন ঢুকে যাবে সে-দৃষ্টি। এত দ্রুত এবং এত জোরে উঠে দাঁড়াল যে, ধাক্কা লেগে লাফিয়ে উঠল টেবিলের উপরিভাগ। ছিটকে গেল গ্লাসটা, মেঝেতে পড়ে চুরমার হলো। ব্যাটারিং রাম যেভাবে আঘাত হানে, কেটির পাজরের একদিকে সেভাবে বাড়ি মারল টেবিলের একটা কোনা। যে-চেয়ারে বসে ছিল মেয়েটা, টলে উঠল সেটা। তারপর একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ব্যথা টের পেল ওই মেয়ে। একইসঙ্গে টের পেল, ওর একটা হাত চাপা পড়েছে চেয়ারের নিচে, মেঝের সঙ্গে। সে-হাতের ওপর সওয়ার হয়েছে ওর নিজের ওজন।

'মিথ্যুক!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠেছে ওই লোক। সে-চিৎকারে মিশে আছে নিখাদ ক্রোধ আর যন্ত্রণাদায়ক আবেগ।

চেষ্টা করে উঠেছে কেটিও। পড়ে গেছে বলে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে চুপ করে আছে। ওয়েজলি যে-জায়গায় পড়ে গিয়েছিল, সে-জায়গার ওপর স্থির হয়ে আছে মেয়েটার নজর। ওর থেকে ওই জায়গা মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। ছেলেটার চটচটে রক্তের স্পর্শ নিজের চুলে অনুভব করতে পারছে সে। ওই ছেলে যে-জায়গায় পড়ে ছিল, বলা ভালো, তার মাথা যে-জায়গায় পড়ে ছিল, রক্তের ছোটখাটো একটা জলাশয় তৈরি হয়েছিল সেখানে; এখনও একটা ছোট আর হালকা দাগ লেগে আছে জায়গাটাতে।

চোখের কোনা দিয়ে আরও কিছু একটা দেখতে পেল কেটি।

একটা ড্রয়িং।

ওয়েজলির সঙ্গে যখন প্রথমবার কিচেনে ঢুকেছিল সে, তখনও দেখতে পেয়েছিল ওটা। রেফ্রিজারেটরের সঙ্গে ডমিনো'স পিৎজার চুম্বক দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। ছবিটা মূলত একটা ঘোড়ার। সেটার সঙ্গে আছে একটা কুকুর। আরও আছে একজন বাবা এবং তার মেয়ে। ওই দু'জন দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটার সামনে। একজন আরেকজনের হাত ধরে রেখেছে। ছবির নিচে, ডানদিকে, গোটা গোটা লাল অক্ষরে লেখা আছে একটা নাম... মেবেল মার্কেল।

কেউ একজন হাজির হয়েছে এই ঘরে। বাসার সামনের দিকের দরজা খোলা এবং লাগানোর আওয়াজ পাওয়া গেছে। ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে কেউ একজন উপস্থিত হয়েছে এখানে। ‘কী করছ তুমি এসব?’

‘মিথ্যা কথা বলেছে এই মেয়ে। কিছুই দেখতে পায়নি সে। ওরা কেউই কিছু দেখতে পায়নি। কেউ না।’

‘সবাই দেখতে পাবে... আর বেশি দেরি নেই।’



পুল
তৃতীয় দিন, রাত ৯:৫২

কনফারেন্স টেবিলটা ঘিরে বসে আছে এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল, শিকাগো মেট্রোর ডিটেকটিভ ক্লেয়ার নর্টন আর ব্রায়ান ন্যাশ, মিসিং চিলড্রেন-এর সোফি রদ্রিগেজ এবং ইনফরমেশন টেকনোলোজির এডউইন ক্লোজোয়োস্কি। ঘরের সামনের দিকে এখন ছ'টা হোয়াইটবোর্ড। সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ সবার।

ওদের পেছনে আওয়াজ করে উঠল কফিমেকারটা। কিন্তু কেউই উঠল না চেয়ার ছেড়ে।

‘পুরো ব্যাপারটা আসলে অভিভূত করে দেয়ার মতো,’ শেষপর্যন্ত বলল ক্লোজ। গত পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই প্রথম কথা বলল কেউ একজন।

ব্যাপারটা সত্যিই অভিভূত করে দেয়ার মতো, ভাবছে পুল। আজ ষোলো বছর ধরে এফবিআই-এ কাজ করছে সে। এর মধ্যে চার বছর ছিল কোয়ান্টিকোর বাইরে, বিহেভিরালা সাইন্স ইউনিটে। তারপর বদলি হয়ে এসেছে শিকাগোতে। কিন্তু গত কয়েকদিনে যা-যা দেখতে পেয়েছে, সে-রকম কোনো কিছু দেখেনি কখনও। বিশেষ করে কোনো একটা তদন্তকাজে। এমনকী, আজ পর্যন্ত যে-ক’টা কেস হিস্টোরি ঘেঁটেছে সে, সেসবের কোনোটাতেও না। অপরাধবিজ্ঞানের ভাষায় “মিল” বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো কিছুই নেই এ-কেসে। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণও ঠাহর করা যাচ্ছে না। এমনকী, বুঝতে পারা যাচ্ছে না নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিও। সিরিয়াল কিলাররা সবসময়ই কোনো না কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের কাজ করে। এবং বিশেষ সেই পদ্ধতিকে বলা হয় তাদের স্বাক্ষর বা সিগনেচার। ওই পদ্ধতির যে পরিবর্তন ঘটে না, তেমনটা না। কারণ খুনিরা কখনও কখনও তাদের চেষ্টাচরিত্র বদলে ফেলে। খুন করতে করতে একরকম নিরুদ্বেগ ভাব চলে আসে তাদের ভেতরে... ধরেই নেয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে তারা। কিন্তু নিজেদের সেই পদ্ধতির বাইরে গিয়ে এলোমেলো কিছু করে না কখনও। পদ্ধতি... তাদের প্রত্যেকের বেলায় কোনো না কোনো পদ্ধতি রয়ে যায় সবসময়ই।

বিশপের পদ্ধতি কেন নজরে পড়ছে না আমার?

নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করল পুল মনে মনে।

‘অনেক বেশি আওয়াজ হচ্ছে,’ নিচু গলায় বলল পুল।

ওর দিকে তাকাল ন্যাশ, জ্র কুঁচকে গেছে। ‘মানে কী কথাটার?’

‘ওই আওয়াজ থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার আমাদের,’ আবারও বিড়বিড় করল পুল।

দ্য ফিফথ টু ডাই ৯ ৪২২

উঠে দাঁড়াল সে, গিয়ে হাজির হলো ঘরের সামনের দিকে। বা-বা লেখা আছে ওই বোর্ডগুলোতে, সব আত্মস্থ করে নিচ্ছে। আত্মস্থ করে নিচ্ছে প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা অক্ষর... মুখস্ত করে নিচ্ছে যেন। কিছুক্ষণ পর প্রথম বোর্ডটা উল্টে দিল সে। একটু আগে যা লেখা ছিল বোর্ডটাতে, হারিয়ে গেল সব; চোখের সামনে হাজির হলো পরিষ্কার, সাদা আরেকটা সার্ফেস। এভাবে একে একে ছ'টা বোর্ডই উল্টে দিল সে, গায়েব করে দিল প্রতিটা বোর্ডের লেখা। সবগুলো বোর্ড এখন মুখ করে আছে দেয়ালের দিকে। আর ওরা... ঘরে উপস্থিত মানুষগুলো... তাকিয়ে আছে ছ'টা সাদা বোর্ডের দিকে, কিছুই দেখছে না প্রকৃতপক্ষে।

এবার বোর্ডগুলোর পেছনে গিয়ে হাজির হলো পুল। যে-কটা ছবি জুড়ে দেয়া ছিল, টেনে খুলে ফেলল সব। একধারের একটা ট্রে থেকে তুলে নিল কালো একটা মার্কার। তারপর আবার হাজির হলো ঘরের সামনের দিকে। 'গত কয়েক দিনে অনেক বেশি জেনে ফেলেছি আমরা আসলে। বড় বেশি জানা হয়ে গেছে আমাদের। এই ব্যাপারটা আমার কাছে একটা কোলাহলের মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অকারণ কিছু শব্দের ভিড়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় শব্দটা। সত্যিকার অর্থেই যা গুরুত্বপূর্ণ, সেটার প্রতি এখন মনোনিবেশ করা দরকার আমাদের। খুঁজে বের করা দরকার আসল প্রমাণটা। জোড়া লাগানো দরকার সেটা। এবং এমনভাবে কাজটা করা উচিত, যাতে মনে হয়, একেবারে নতুন কিছু একটা পেয়ে গেছি আমরা হাতে।'

'ধাঁধাটার সমাধান করে ফেলুন তা হলে,' বলল ক্রোজ।

ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ন্যাশ আর ক্রোয়ার দু'জনই। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্রোজ।

অ্যানসন বিশপের ফটোগ্রাফটা হাতে নিল পুল। ওটা টেপ দিয়ে আটকে দিল একটা বোর্ডের একেবারে ওপরের এককোণায়। হাতেধরা অন্য ছবিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করল কিছুক্ষণ। তারপর সেগুলো একে একে জুড়ে দিল বিশপের ছবির নিচে:

এলা রেনল্ডস

লিলি ডেভিস

ফ্রয়েড রেনল্ডস

র্যাভাল ডেভিস

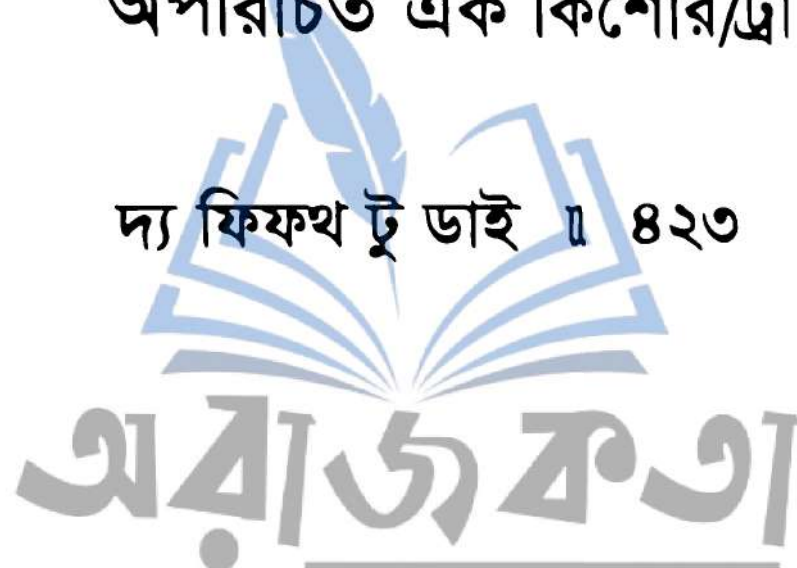
লিবি ম্যাকিনলে

ল্যারিসা বিয়েল

ডার্লিন বিয়েল

অপরিচিত এক কিশোর/দ্রাক

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪২৩



অরাজকতা



‘এই কেসের কারণে কোনো না কোনো প্রভাব সরাসরি পড়েছে, এ-রকম মানুষের তালিকা এটাই,’ বলতে শুরু করল পুল। ‘এরা শিকারে পরিণত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এদেরকে শিকারে পরিণত করার ইচ্ছা ছিল কারও না কারও।’

‘কারা কারা বাদ গেল?’ জানতে চাইল ক্লেয়ার।

হাতেধরা বাকি ছবিগুলো উঁচু করল পুল। ‘তিনজন... লিয়ান রেনল্ডস, গ্রেস ডেভিস, আর ল্যারি বিয়েল। এবং এসব পরিবারের বাকি সন্তানেরা।’ কনফারেন্স টেবিলের ওপর উপুড় করে নামিয়ে রাখল ছবিগুলো। ‘যাদের ছবি নামিয়ে রাখলাম, তারা ঠিক কী কারণে জড়িত এই কেসের সঙ্গে, সেটা যদি বের করতে পারি আমরা, তা হলে ছবিগুলো আবার জুড়ে দেবো বোর্ডের গায়ে। আপাতত মনোযোগ দেয়া যাক অন্যদের ওপর।’

টেবিলের ওপর আঙুলের সাহায্যে ড্রাম বাজাল ন্যাশ। ‘ধরে নিই এই খুনগুলোও বিশপই করেছে। ধরে নিই, আগের শিকারদের বেলায় যে-কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছে সে, এবারও তা-ই করেছে। তার মানে হচ্ছে, বাবা-মায়ের কোনো না কোনো অপরাধের কারণে খুন করেছে বাচ্চাগুলোকে। অর্থাৎ ওসব বাচ্চাকে মনোযোগের বাইরে রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই আমাদের।’

‘এবার কিন্তু শুধু বাচ্চাদের দিকেই না, তাদের বাবা-মায়ের দিকেও হাত বাড়িয়েছে লোকটা,’ বলে উঠল সোফি। ‘খুন করেছে তাঁদের কাউকে কাউকে।’

‘এবং ওই বাচ্চাগুলোকে কীভাবে খুন করেছে সে এবার, সেটাও একটু দেখা দরকার আমাদের,’ বলল ক্লেয়ার। ‘দুটো মেয়েকেই ডুবিয়ে মারা হয়েছে লবণাক্ত পানিতে। আর অচেনা সেই ছেলেকে জমিয়ে ফেলা হয়েছে একটা ট্রাকের ভেতরে। তার মানে জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে সে বাচ্চাগুলোর ওপর।’

‘তবে এবার কোনো বাচ্চারই চোখ উপড়ে নেয়নি সে। জিভ অথবা কান কেটে নেয়নি। তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি, নতুন একটা কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে লোকটা,’ বলল ন্যাশ। ‘অতীতে যা করেছে সে, সেসবের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা।’

‘লিবি ম্যাকিনলের বেলায় তো ওই কাজ করেছে লোকটা,’ বলল পুল।

‘হুঁ, তা করেছে বটে, কিন্তু খুনটা তার অতীতের শিকারদের মতো না। লিবি ম্যাকিনলের হাত ও পায়ের আঙুলগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। এ-রকম কোনো কাজ আগে কখনও করেনি বিশপ।’

‘তার মানে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে সে... অন্তত লিবি ম্যাকিনলের বেলায়,’ বলল ন্যাশ।

‘অন্য রকম একটা অত্যাচার। ওই লোকের অন্য সবকিছুর চেয়ে আলাদা,’ বলল পুল। কফিকাপগুলো তুলে নিল টেবিল থেকে, এগিয়ে গেল কফিমেশিনটার দিকে। মেশিন থেকে কফি ভরছে প্রতিটা কাপে। ‘হাত আর পায়ের আঙুল সাধারণত কেটে নেয়া হয় বিশেষ কোনো তথ্যের প্রয়োজনে। এই কাজ বিশপের

চিরাচরিত রীতির সম্পূর্ণ বাইরে। অন্য শিকারদের চোখ উপড়েছে সে, কান আর জিভ কেটে নিয়েছে... যে বা যারা খুঁজে পেয়েছে ওসব মৃতদেহ, তাদের জন্য বিশেষ একটা মেসেজ পাঠিয়েছে আসলে। একইসঙ্গে উপহাস করেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকদেরকে। এসব হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে একটা চাঞ্চল্য তৈরি করতে চেয়েছে আর কী। ট্যালবটের অর্থনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিশেষ কিছু তথ্য হাতিয়ে নিয়েছিল সে, আর সেসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতেই একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নিজের শিকারে পরিণত করবে কাদেরকে। ওই শিকারদের কাছ থেকে কোনোকিছু জেনে নেয়ার দরকার ছিল না তার। প্রয়োজনীয় তথ্য আগে থেকেই ছিল তার কাছে।’

টেবিলের কাছে ফিরে গেল পুল। কফি পরিবেশন করল।

হাত বাড়িয়ে নিজের মগটা নিল ক্লেয়ার, চুমুক দিল ছোট করে। ‘আমার মতে, লিবি ম্যাকিনলে আর সবার চেয়ে আলাদা। কিছু একটা জানত ওই মেয়ে। এমন কিছু একটা, যা দরকার ছিল বিশপের। এবং বিশেষ সেই তথ্যের জন্য মেয়েটার ওপর নির্যাতন চালাতেও দ্বিধাবোধ করেনি সে।’

বোর্ডের কাছে ফিরে গেল পুল। ‘ওই তথ্যের জন্য লিবির ওপর অন্য সবার চেয়ে বেশি নির্যাতন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লোকটা।’

লিবি ম্যাকিনলের ছবিটা বোর্ডের মাঝখানে জুড়ে দিয়েছিল সে, খুলে নিল, এবার আটকে দিল বোর্ডের একেবারে ডান কোনায়, ওপরের দিকে। ‘এই মেয়ের হত্যাকাণ্ড অন্য কোনো খুনের মতো না। আসুন, এই মেয়েকেও আপাতত আলাদা করে রাখি অন্যদের থেকে।’

‘লিবি ম্যাকিনলের ব্যাপারে কী কী জানি আমরা? তাকে বিশেষভাবে টার্গেট করতে গেল কেন বিশপ?’ জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

ওই মেয়ের ফাইলটা টেনে নিল পুল, পাতা উল্টাচ্ছে, খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ‘২০০৭ সালের মার্চ মাসে অভিযোগ দায়ের করা হয় এই মেয়ের বিরুদ্ধে। এবং ওই বছরই মানুষ-হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে। ফ্র্যাঙ্কলিন কার্ভি নামের এক লোককে গাড়িচাপা দিয়েছিল সে। শাস্তি হিসেবে দশ বছরের জেল হয়ে যায় তার। ওই দশ বছরের মধ্যে মেয়েটা জেল খেটেছে সাত বছর এবং কয়েক মাস। তারপর, আজ থেকে সপ্তাহ ছয়েক আগে, প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয় তাকে।’

‘ওই মেয়ের কারণে যে-লোক মারা পড়েছিল, তার নামটা যেন কী বললেন?’ জানতে চাইল ন্যাশ।

‘ফ্র্যাঙ্কলিন কার্ভি।’ কনফারেন্স টেবিলের দিকে এককদম এগিয়ে গেল পুল। ‘এই নামের কোনো একটা মানে ছিল পোর্টারের কাছে। কিন্তু তিনি কী জানেন এই ব্যাপারে, তা নিয়ে মুখ খোলেননি আমাদের কাছে। আপনারা কেউ কি জানেন... কে ওই ফ্র্যাঙ্কলিন কার্ভি?’

‘আরে শালা, এই ব্যাপারটা কী করে মিস করে গেলাম আমরা সবাই?’



মাথা নাড়ল ক্লেয়ার। ‘বিশপের সেই ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে নামটা। বলা হয়েছে, একসময় ট্যালবটের হয়ে কাজ করত কার্বি লোকটা। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে অনেক টাকা হাতিয়ে নেয় সে ট্যালবটের কাছ থেকে। এবং শেষপর্যন্ত বিশপের মাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। বিশপ তখন নেহাতই এক বালক। ডায়েরিতে আরও বলা হয়েছে, বিশপের বাবাকে গুলি করে খুন করেছে কার্বি।’

‘আবারও সেই ডায়েরি,’ ড্র কুঁচকে গেছে পুলের। ‘ওটা দেখা দরকার আমার।’

‘তা হলে বরং আমি একটু চেষ্টা করে দেখি এবং সোজাসাপ্টা কিছু কথা বলি,’ বলল ন্যাশ, ‘কারণ ওই ডায়েরি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কার্বি খুন করল বিশপের বাবাকে। কার্বি বিশপের মাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এই ঘটনার অনেক বছর পর লিবি ম্যাকিনলে কী করল? দুর্ঘটনাক্রমে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলল কার্বিকে। তারপর বিশপ পাকড়াও করল লিবির বোন বারবারাকে, শেষ করে দিল। কেন করল কাজটা? কার্বির মৃত্যুর বদলা নিতে। এবং তারপর শেষপর্যন্ত খুন করল লিবিকে। অথচ, এখন পর্যন্ত যে-তথ্য আছে আমাদের হাতে সে-অনুযায়ী, বিশপ আর লিবি কোনো একটা সময়ে একসঙ্গে মিলে কিছু কাজ করেছে। যা হোক, এই পুরো ব্যাপারটার কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না আসলে। বিশপকে চিনতে যদি ভুল না হয়ে থাকে আমার... কার্বির কাটা মাথাটা হাতে পেলে সেটা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নাচত সে।’

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ক্লেজ। ‘যদি বলি, বিশপ খুন করেনি লিবিকে, তা হলে? যদি বলি, অন্য কেউ একজন করেছে ওই কাজ? এবং তারপর এমনভাবে সাজিয়েছে পুরো ব্যাপারটা, যাতে দেখলে মনে হয়, কাজটা বিশপ ছাড়া অন্য কারও না। আমরা যদি ধরে নিই, যা বলছি আমি তা ঠিক, তা হলে লিবি ম্যাকিনলের হাত ও পায়ের আঙুলগুলো কেটে নেয়া হলো কেন, সেটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমি আবারও বলছি, বিশপ বাদে অন্য কেউ একজন খুন করেছে লিবি ম্যাকিনলেকে। বিশপ বাদে অন্য কেউ একজন লেগেছে কিছু একটার পেছনে।’

‘কে?’

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ক্লেজ। ‘যদি বলি, বারবারা ম্যাকিনলেকেও খুন করেনি বিশপ, তা হলে?’

মাথার পেছনদিকটা চুলকাল ক্লেয়ার। ‘আমরা জানি বিশপই করেছে ওই কাজ।’

‘আসলেই?’

আবারও নীরবতা নেমে এল ঘরে।

কফির মগটা আঙুলের সাহায্যে পেঁচিয়ে ধরল ক্লেজ। মগের ভেতরের কফিটুকু দেখে নিল একনজর। দেখল, কীভাবে পাক খাচ্ছে ওই কফি। ‘বিশপের

আগের যেসব শিকারের কথা জেনেছি আমরা, একটা মাত্র কারণে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাদেরকে... পরিবারের কেউ না কেউ কোনো না কোনো অপরাধকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রত্যেকের বেলাতেই এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়েছে... হয়নি শুধু একজনের বেলায়— বারবারা ম্যাকিনলে। আমরা সবাই ধরে নিয়েছি, বারবারার বোন লিবি কোনো একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল বলে বিশপ খুন করেছে বারবারাকে। আমরা সবাই গাড়িচাপা দেয়ার ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়েছি।’ ন্যাশের দিকে তাকাল সে। ‘আপনি যা বলেছেন, আমার মনে হয় সেটাই ঠিক... লিবি ম্যাকিনলেকে খুন করার কোনো কারণই নেই বিশপের, বিশেষ করে যখন ফ্র্যাঙ্কলিন কার্বির মতো কারও মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল মেয়েটা। আমি নিশ্চিত এই ব্যাপারে।’

‘খুনটা কে করেছে তা হলে?’ জিজ্ঞেস করল পুল।

নিচু গলায় জবাবটা দিল ক্রোজ। ‘বিশপের মা।’



‘বিশপের মা?’ জ্র কুঁচকে গেছে পুলের।

মাথা নাড়ল ক্লোজ। ‘কার্বির সঙ্গে প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল ওই মহিলার। আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি ওই মহিলা। সুতরাং... কে জানে? লিবির হাত ও পায়ের আঙুল কিম্ব বলে দিচ্ছে, বদলা নেয়ার জন্য খুন করা হয়ে থাকতে পারে মেয়েটাকে। শিকারের একটা কান কেটে ফেলা, জিভ কেটে আলাগা করে নেয়া, একটা চোখ উপড়ে ফেলা, এবং তারপর ওসব কোনো একটা সাদা বাক্সের ভেতরে ভরে ফেলা... বিশপের স্বাক্ষর নকল করা কিম্ব কঠিন কোনো কাজ না।’

‘সাদা ওই বাক্সগুলো... বিশপ নিজে যে-খুনগুলো করেছে, সেগুলোর বেলায় যেসব বাক্স ব্যবহার করেছে, আর লিবি ম্যাকিনলের বেলায় যেসব বাক্স ব্যবহার করা হয়েছে, ওগুলো কি একই রকম?’ জানতে চাইল ক্লেয়ার।

মাথা ঝাঁকাল পুল। ‘হ্যাঁ। হুবহু এক।’

‘ধরে নিলাম, মুক্ত-স্বাধীন জীবন যাপন করছে বিশপের মা। সেক্ষেত্রে একটা কথা স্বীকার করে নিতে হবে আমাদেরকে... মহিলা কী করতে পারে, সে-ব্যাপারে আমাদের কিম্ব কোনো ধারণা নেই। ছেলে যে-রকম বাক্স ব্যবহার করেছে, হুবহু একই রকম বাক্স ব্যবহার করা ওই মহিলার জন্য কষ্টসাধ্য কোনো কাজ না-ও হতে পারে,’ বলছে ন্যাশ। ‘আর্থিক সামর্থ্য কিম্ব ছিল তার। প্রতিবেশী মহিলার স্বামী ট্যালবটের কাছ থেকে যে-টাকা চুরি করেছিল, সব পরে হাতিয়ে নিয়েছিল সে।’

বোর্ড আর টেবিলের মাঝখানের জায়গায় পায়চারি শুরু করে দিয়েছে পুল। ‘পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্টে যখন গিয়েছিলাম আমরা, তিনি তখন বলেছিলেন, বারবারা ম্যাকিনলের হত্যাকাণ্ড নাকি বিশপের অন্য খুনগুলোর চেয়ে আলাদা। বলেছিলেন, একমাত্র ওই মেয়েই নাকি স্বর্ণকেশী।’

‘মনে আছে আমার,’ বলল ক্লেয়ার। ‘বারবারা ম্যাকিনলের ছবির সামনে গিয়ে হুট করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিশপ, ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। কী একটা অসঙ্গতির কথা যেন বলেছিল তখন।’

ধীর পায়ে বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল পুল। লিবি ম্যাকিনলের ছবির পাশে লিখল: বিশপের মা খুন করেছে এই মেয়েকে? তারপর আবার গিয়ে হাজির হলো বোর্ডের পেছনে। যখন ফিরে এল, ওর হাতে দেখা গেল পুরনো একটা পোলারয়েড ছবি, সঙ্গে একগোছা সোনালি চুল। এভিডেন্স ব্যাগের ভেতরে আছে দুটোই। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওগুলো।

‘আপনাদের কাছে এসবের মানে কী, বলুন তো?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪২৮

পোলারয়েড ছবিটা হাতে তুলে নিল ক্লেয়ার। ‘এই জিনিস কোথেকে পেলেন আপনি?’ ন্যাশ আর ক্রোজকে দেখাল ছবিটা।

‘লিবি ম্যাকিনলের বাসার একটা ড্রয়ার থেকে,’ বলল পুল। ‘কিছু কাপড়ের নিচে লুকানো অবস্থায় ছিল। ছবির সঙ্গে ছিল ওই চুলের গোছা।’

ছবিটা রেখে দিল ক্লেয়ার। ‘নিজের ডায়েরিতে কিছু ছবির কথা উল্লেখ করেছিল বিশপ। এই ছবি, ওসব ছবির একটা হতে পারে। যদি তা-ই হয়, এখানে যে-দু’জন মেয়েমানুষকে দেখা যাচ্ছে, তাদের একজন বিশপের মা। অন্যজন বিশপদের প্রতিবেশী লিসা কার্টার।’

‘দুই মহিলারই ফেশিয়াল রিকগনিশন করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। দুটো প্রতিবন্ধকতা হাজির হয়েছিল আমাদের সামনে... ছবির বয়স এবং যে-অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা হয়েছিল ছবিগুলো, সেটা। আচ্ছা, ওই চুলের গোছার কী খবর? ও-রকম কোনোকিছুর কথা কি উল্লেখ করা হয়েছে বিশপের ডায়েরিতে?’

‘না। ওই চুল কি লিবির?’ পরামর্শ দেয়ার কায়দায় বলল ক্লেয়ার।

‘লিবি অথবা তার বোন বারবারা... কারও চুলের সঙ্গেই ম্যাচ করেনি ওই চুল।’

‘কার্বি? কার্বির চুলের সঙ্গে কি ম্যাচ করেছে?’ বলল ক্রোজ। ‘ওই লোকেরও কিন্তু লম্বা সোনালি চুল ছিল।’

এভিডেন্স ব্যাগটা আরও কাছে টেনে নিল ন্যাশ। ‘প্রশ্ন হচ্ছে, লিবির কাছে কেন কার্বির চুল থাকবে? আর যদি থাকেও, এই চুলের গোছা কোথেকে পেল সে?’

এসব প্রশ্নের জবাব নেই কারও কাছেই।

বোর্ডের কাছে ফিরে গেল পুল। ফটো আর চুলের তথ্যগুলো লিখে ফেলল। তারপর লিখল বিশেষ একটা নাম: ক্যালিন সেলকে। ‘আপনারা সবাই হয়তো জানেন, লিবি ম্যাকিনলেকে এই নকল পরিচয় পেতে সাহায্য করেছিল বিশপ। মেয়েটা যখন জেলে ছিল, তখন যোগাযোগ হয়েছিল তাদের দু’জনের মধ্যে।’

‘যোগাযোগটা কীভাবে হয়েছিল, সে-ব্যাপারে কিছু জানেন?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

মাথা নাড়ল পুল। ‘জেলখানায় যাওয়ার কোনো সুযোগ এখন পর্যন্ত পাইনি আমি। তবে লিবি ম্যাকিনলের প্যারোল অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে পেরেছি, জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সমস্যা হচ্ছিল মেয়েটার। লোকটার ধারণা, আবার জেলে ফিরে যেতে চাইছিল লিবি।’

‘কোন জেলখানায় ছিল সে? স্টেটভিল?’

‘হ্যাঁ। আমরা ওই মেয়ের বাসায় একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ পিস্তলও পেয়েছি। প্যারোলে যাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়, কোনো রকম আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা



অথবা রাখার অনুমতি দেয়া হয় না তাদেরকে; সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, লিবি প্যারোলের চুক্তি ভঙ্গ করেছে,' বলছে পুল। 'মেয়েটা আসলে জানত, তার পিছু ধাওয়া করেছে কেউ একজন। কার্বি আর বিশপের মায়ের ব্যাপারে যা-যা বললেন আপনারা আমাকে, সেসব যদি সত্যি হয়, তা হলে পুরো ঘটনার একটা মানে দাঁড় করানো সম্ভব। আমাদের শুধু জানতে হবে, বিশপ লিবিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল কেন।'

বোর্ডের ওপর মনোযোগ দিল পুল। 'ঠিক আছে। ভালো হয়েছে। সত্যিই ভালো হয়েছে। কাজ এগিয়ে নেয়ার মতো সম্পূর্ণ অন্য রকম কিছু একটা পেয়ে গেছি আমরা। আমাদের মনোযোগ এখন লিবি ম্যাকিনলের ওপর। আসুন এবার একটু ভালোমতো তাকাই অন্য সবকিছুর দিকে।'

বাঁ দিকে কয়েক কদম সরে গেল পুল। যে-বোর্ডে লিবি ম্যাকিনলের ব্যাপারে লিখেছে, সেটা ছাড়িয়ে চলে এল। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম হোয়াইটবোর্ডটার সামনে। এখানে, বোর্ডের একেবারে মাথায়, লেখা হয়েছে অ্যানসন বিশপের নামটা। সেটার নিচে জুড়ে দেয়া হয়েছে সাতটা ছবি... ওই মেয়েগুলো হয় হারিয়ে গেছে নয়তো তাদেরকে খুন করা হয়েছে।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ন্যাশ। 'একটু আগে যা বলেছিলাম আমি, ফিরে যাই সে-কথায়। ধরে নিলাম, সমস্ত কুকীর্তি শুধুই বিশপের। ধরে নিলাম, অতীতের শিকারদের বেলায় যে-কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছে সে, এবারও তা-ই করছে। তা হলে তার মানে দাঁড়ায়, ওই বাচ্চাদের বাবা-মা এমন কোনো খারাপ কাজ করেছে, যার মাশুল নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে চুকাতে হচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। অর্থাৎ এখানে আসল ফোকাস কিন্তু ওই বাচ্চাগুলো না।'

'ঠিক,' বলল ক্লেয়ার। 'পুল, আপনি কি একটু কষ্ট করে ওই ছবিগুলো অন্যভাবে সাজিয়ে নিতে পারবেন? বাচ্চাগুলোর বাবা-মায়ের ছবি ওপরে রাখুন। তাঁদের নিচে জুড়ে দিন ওই বাচ্চাদের ছবি।'

মাথা ঝাঁকাল পুল। নতুনভাবে সাজাল ছবিগুলো:

ফ্রয়েড রেনল্ডস

এলা রেনল্ডস

র্যাভাল ডেভিস

লিলি ডেভিস

ডার্লিন বিয়েল

ল্যারিসা বিয়েল

টয়োটা টাভ্রা পিকআপ ট্রাকের ভেতরে জমে বরাফে পরিণত হওয়া ছেলেটার ছবি হাতে নিয়ে দেখাল সে। ‘নাম-পরিচয় না-জানা এই ছেলের ছবি কিছ্র বাকি রয়ে গেল।’

‘যত জলদি সম্ভব ছেলেটার পরিচয় বের করা দরকার আমাদের,’ বলল ক্লেয়ার। ‘তারপর খুঁজে বের করতে হবে তার বাবা-মাকে, গিয়ে কথা বলতে হবে তাঁদের সঙ্গে। ওই দম্পতিই হয়তো বিশপের পরবর্তী টার্গেট।’

‘অন্য দম্পতিদের ব্যাপারে কী জানি আমরা?’

নিজের ফোনটা হাতে নিল ক্লেয়ার। নোটস অ্যাপ চালু করল। ‘ফ্রয়েড রেনল্ডস কাজ করতেন ইউনিমেড আমেরিকা হেল্থকেয়ারে। বীমার বিক্রয়প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। তাঁর কোনো ঋণ খুঁজে পাইনি আমরা। কোনো রকম আর্থিক সমস্যার মধ্যে ছিলেন তিনি, এ-রকম কিছুও জানতে পারিনি। পারিবারিক জীবন নিয়েও তাঁর কোনো ঝামেলা ছিল বলে জানা যায়নি। মেয়েকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন তিনি... তাঁর স্ত্রী তেমনটাই বলেছেন। আমাদের অচেনা সেই রহস্যময় লোক পিয়ানোর তার কাজে লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বেচারাকে। তা-ও আবার কোথায়... তাঁদেরই পারিবারিক গাড়ির ভেতরে। লাশটা পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের বাসার পেছনদিকের উঠানে, একটা স্লোম্যানের ভেতরে। ড্রাইভারের সিটের পেছনদিকে একটা জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। আমাদের ধারণা, রেনল্ডসকে যখন দম বন্ধ করে হত্যা করছিল অচেনা সেই লোক, তখন জোর পাওয়ার জন্য নিজের একটা পা রেখেছিল ওই জায়গায়। জুতোর সাইজ এগারো।’

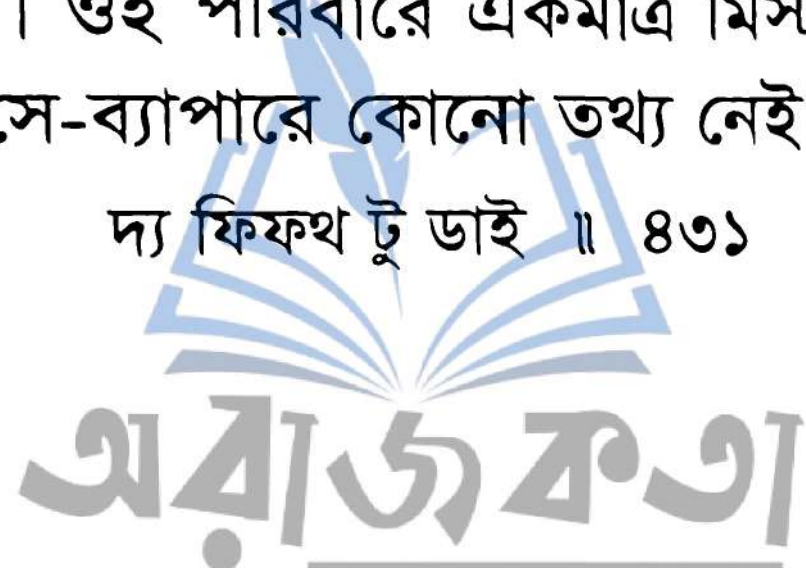
‘বিশপ কী সাইজের জুতো পরে, সে-ব্যাপারে কোনো রেকর্ড তো নেই আমাদের কাছে, না?’

‘না।’

এই তথ্য বোর্ডে লিখে নিল পুল। তারপর মার্কারের সাহায্যে নির্দেশ করল র‍্যাভাল ডেভিসকে। ‘মিস্টার ডেভিসের কী খবর?’

‘তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। কাজ করতেন স্ট্রজার জুনিয়র হাসপাতালে। মিস্টার রেনল্ডসের মতোই তাঁর পারিবারিক জীবনেও কোনো অশান্তি ছিল না, টাকাপয়সার কোনো টানাটানি ছিল না। লিসিনোপ্রিলের উচ্চ মাত্রার একটা ডোজ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। এই ওষুধ সাধারণত ব্যবহৃত হয় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ও-রকম কোনো ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে কোনো রকম পরামর্শ দেননি কোনো ডাক্তার। আমাদের ধারণা, অচেনা সেই লোক ডেভিসদের বাড়ির পেছনদিকের দরজার তালা খুলে ঢুকে পড়েছিল বাসার ভেতরে। তারপর লিসিনোপ্রিল মিশিয়ে দিয়েছিল ওই পরিবারের কফিমেকারে। ওই পরিবারে একমাত্র মিস্টার ডেভিসই কফি খেতেন... অন্য কেউ খেত কি না সে-ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই আমাদের কাছে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৩১



অরাজকতা



জ্র কোঁচকাল পুল। ‘তার মানে হচ্ছে, অচেনা সেই লোক জানত, শুধু মিস্টার ডেভিসই কফি খেতেন ওই পরিবারে। অথবা, লিসিনোপ্রিল-মেশানো কফি খেয়ে কে মরল না-মরল, সে-ব্যাপারে কোনো পরোয়া ছিল না তার।’

‘ডেভিসদের রান্নাঘরে বড় কয়েকটা জানালা আছে... কোনোটাতেই পর্দা নেই। সেখানে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, রাস্তা থেকে দেখা যায়,’ বুঝিয়ে বলার কায়দায় বলল ন্যাশ। ‘কাজেই, হতে পারে, ওই পরিবারে কে কী খায় না-খায়, সেটা একটু নজরদারির মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল অচেনা সেই লোক।’

‘হতে পারে। আমার মনে হয় না, প্রাপ্তবয়স্ক যাদেরকে টার্গেট করেছে অচেনা সেই লোক, হুটহাট করেছে কাজটা। এবং এই কাজ যদি বিশপের হয়ে থাকে, তা হলে শিকার হিসেবে যাদেরকে বেছে নিয়েছে সে, উপযুক্ত কারণেই নিয়েছে,’ বলল পুল। ‘প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এখন কেবল বাকি থাকল সেই মহিলা।’

‘হ্যাঁ, ডার্লিন বিয়েল। যে-হাসপাতালে আছেন তিনি, সেখানে একজন অফিসারকে বসিয়ে রেখেছি আমরা... পাহারা দিচ্ছে মহিলার রুম। অবস্থা মোটামুটি ভালো তাঁর। কিন্তু কোমায় আছেন আপাতত। তাঁর টুথপেস্টের টিউবের ভেতরে সায়ানাইড ইনজেক্ট করে দিয়েছিল আমাদের সেই অচেনা লোক। দাঁত ব্রাশ করার সময় ওই বিষ ঢুকে গিয়েছিল তাঁর মুখের ভেতরে। অথচ যে-জায়গায় ঘটেছে এই ঘটনা, সেটা নিরাপদ একটা জায়গা হওয়া উচিত ছিল তাঁর জন্য।’ বড় করে দম নিল ক্লেয়ার, তাকাল নিচের দিকে। ‘এই ব্যাপারে সমস্ত দোষ আমার। আমারই হেফাজতে, আমারই তত্ত্বাবধানে ছিলেন ওই মহিলা।’

ওর কাঁধে সাত্তনার হাত রাখল ন্যাশ। ‘তুমি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছ। তোমার জায়গায় অন্য কেউ যদি থাকত, এতক্ষণে মারা যেতেন তিনি।’

ডার্লিন বিয়েলকে কীভাবে জোর করে তরল সাবান গিলিয়েছে ক্লেয়ার, পুলকে সে-বর্ণনা দিল ন্যাশ।

‘সাবানের ক্ষার কাজ করেছে সায়ানাইডের অ্যাসিডের বিরুদ্ধে? এই ব্যাপারটা জানতে পারলেন কোথেকে?’

‘হাই স্কুলে,’ বলল ক্লেয়ার। ‘আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষক একবার দুর্ঘটনাক্রমে আক্রান্ত হয়েছিলেন সায়ানাইডের বিষক্রিয়ায়। কী ঘটে গেছে, সেটা যখন বুঝতে পারলেন তিনি, একদৌড়ে বের হয়ে গেলেন ক্লাস থেকে, গিয়ে হাজির হলেন ছেলেদের বাথরুমে। সাবান গিলে ফেললেন। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। এই ব্যাপারটা রয়ে গিয়েছিল আমার মাথায়।’

‘ডার্লিন বিয়েলের ব্যাপারে নিজেকে দোষারোপ করছেন আপনি... আমার মনে হয় আসলে অবিচার করছেন নিজের ওপর,’ ক্লেয়ারকে বলল পুল। ‘সায়ানাইড দ্রুত কাজ করে। আর এক কি দু’মিনিট দেরি হলেই মরে যেতেন মহিলা। ওই হোটেলে আপনার সঙ্গে ছিলেন বলেই বেঁচে গেছেন তিনি। একই ঘটনা যদি তাঁর বাসায় ঘটত, তা হলে সম্ভবত বাঁচতে পারতেন না তিনি।’

এই প্রশংসা গায়ে মাখল না ক্লেয়ার। কপালে ভাঁজ পড়েছে ওর। এবং সেটা দেখে পুল ঠাহর করে নিতে পারছে, অন্য কিছু একটা ভাবছে মেয়েটা... আগ বাড়িয়ে ভাবছে কিছু একটা। যখন কথা বলল ওই মেয়ে, পুলের এমন একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল, যে-প্রশ্ন পুরো দলের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিল পুল। ‘ওষুধ কোম্পানির বিক্রয়-প্রতিনিধি বলতে যা বোঝায়, বিয়েল ছিলেন... মানে, বিয়েল তা-ই। কাজের প্রয়োজনে অনেক জায়গায় যেতে হতো তাঁকে। আমি যখন তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে তাঁদের বাসা ছেড়ে চলে আসতে বললাম আমার সঙ্গে, খেয়াল করলাম, একটা ব্যাগ প্রস্তুত অবস্থায় আছে মহিলার। বিষ-মেশানো সেই টুথপেস্ট ওই ব্যাগের ভেতরেই ছিল। তাঁদের বাসার মাস্টার বেডরুম-সংলগ্ন বাথরুমে যে-টুথপেস্ট পাওয়া গেছে, সেটার নমুনা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে সিএসআই। বিষের কোনো উপস্থিতিই পাওয়া যায়নি সেটাতে। আরও বড় কথা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী দু’জন ওই টুথপেস্ট শেয়ার করতেন। তার মানে হচ্ছে, শুধু ডার্লিন বিয়েলকেই টার্গেট করেছিল অচেনা সেই লোক... র‍্যাভাল ডেভিসের মতোই। এবং বিশেষ কিছু তথ্য জেনে নিয়েছিল অগ্রীম। জেনে নিয়েছিল মহিলার ট্রাভেলিং ব্যাগটার ব্যাপারে। আর তারপর পিছু লেগেছিল তাঁর।’

‘যা-যা শুনলেন এতক্ষণ, আপনাদের কেউ কি বিশেষ কোনো কর্মপদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন এসব ঘটনায়?’

‘প্রাপ্তবয়স্ক তিনজনের সবাই কাজ করতেন মেডিকেল ফিল্ডে। অচেনা সেই লোকের শিকারদের মধ্যে একজন ডাক্তার পেয়েছি আমরা। আরও পেয়েছি দু’জন বিক্রয়-প্রতিনিধি,’ বলল ন্যাশ।

‘তাঁদের স্বামী অথবা স্ত্রীরা কী করেন?’

নিজের নোটের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। ‘গৃহিণী বলতে যা বোঝায়, গ্রেস ডেভিস আর লিয়ান রেনল্ডসের দু’জনই তা-ই। আর ল্যারি বিয়েল জড়িত আছেন নির্মাণকাজের সঙ্গে।’

‘এঁরা আবার সবাই নন-মেডিকেল।’

‘হুঁ,’ একমত হলো ক্লেয়ার। ‘তার মানে, প্রাপ্তবয়স্ক এসব মানুষের মধ্যে কোনো একটা পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে।’

মাথা ঝাঁকান পুল। তাকিয়ে আছে বোর্ডের লেখার দিকে। ‘ঠিক আছে, ভালো। কাজ এগিয়ে নেয়ার মতো আরও কিছু একটা পাওয়া গেল।’ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল এলা রেনল্ডসের নামটা। ‘এবার আসুন ওই বাচ্চাদের নিয়ে কিছু কথা বলি।’

অন্য যে-মেয়েমানুষ বসে আছে কনফারেন্স টেবিলের ধারে, তার দিকে তাকাল ক্লেয়ার। ‘সোফি, আপনি কি...’

ইতোমধ্যেই মাথা ঝাঁকান সোফি। ‘হ্যাঁ, ঠিক আছে। এলা রেনল্ডস, বয়স পনেরো। তার লাশ পাওয়া গেছে ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখে, জ্যাকসন পার্ক



লেগুনের বরফের নিচে। প্রাথমিক অবস্থায় এই ঘটনা আমাদের জন্য ছিল বড় রকমের একটা ধাক্কা। কারণ, ওই লেগুনের পানি জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়েছিল জানুয়ারি মাসের শুরুতেই... ওই মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার অন্তত বিশ দিন আগে। তারপর আমরা জানতে পারি, লেগুনের জমাটবাঁধা পানিতে একটা গর্ত তৈরি করেছিল অ্যানসন বিশপ, সেখান দিয়ে পানিতে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এলার লাশ। এরপর চুরি-করা সেই ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে পানি ঢেলেছিল গর্তে, পুরনো বরফের সমান্তরালে তৈরি করেছিল নতুন বরফের একটা স্তর। আমাদের ধারণা, লোগান স্কোয়ার থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই মেয়েকে। মেয়েটা যে-বাসায় থাকত, সেখান থেকে সেই স্কোয়ারে যেতে মিনিট সাতেক লাগে। আমরা জানতে পেরেছি, সাম্প্রতিক সময়ে একটা গাড়ি কিনেছিল ওই মেয়ে... কারস আর ইউএস নামের একটা প্রতিষ্ঠান থেকে। তাদের সেই বাসা থেকে খুব একটা দূরে না প্রতিষ্ঠানটা। নগদে মূল্য চুকাচ্ছিল মেয়েটা। এবং এই ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না তার বাবা-মায়ের। মাত্র কিছুদিন আগে নিজের ড্রাইভিং লার্নার'স পারমিট পেয়েছিল সে।

‘অচেনা সেই লোকের দ্বিতীয় শিকার লিলি ভেডিসের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পাওয়া গেছে এলা রেনল্ডসের লাশ,’ যোগ করল ক্লেয়ার। ‘আমার মনে হয়, বিশপ আসলে এমন কিছু একটা করতে চাইছে, যার ফলে আলোড়ন তৈরি হয় তার কাজ নিয়ে। এমন কিছু একটা করতে চাইছে, যার ফলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তার কুকীর্তিগুলো।’

‘একমত,’ বলল পুল। ‘আলোচনার শুরুতে একটা কোলাহলের কথা ছিলাম আমি। এসব হচ্ছে সেই কোলাহলের একটা অংশ। আমরা আপাতত রাখি এসব। যদি প্রাসঙ্গিক মনে হয়, পরে আবার আলোচনা করা যাবে এসব। আসি লিলির কথায়। ওর ব্যাপারে কী কী জানি আমরা?’

‘বয়স সতেরো,’ তথ্যের জোগান দেয়ার কাজটা আরও একবার করতে হচ্ছে সোফিকে। ‘শেষ যে-বার দেখা গেছে মেয়েটাকে, তখন স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সে... পায়ে হেঁটে। ওর স্কুলের নাম উইলকক্স অ্যাকাডেমি। এই ঘটনা ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখের। যা হোক, স্কুলে আর যাওয়া হয়নি মেয়েটার শেষপর্যন্ত। ওর সেই স্কুল ওদের বাসা থেকে খুব একটা দূরে না... মাত্র চার ব্লকের ব্যবধান। মেয়েটার লাশ পাওয়া গেছে লি গ্যালারিতে। সেখানেই কাজ করত সে। গ্যালারির পেছনদিকে একটা স্টোরেজ রুম আছে, ওই জায়গাতেই কায়দা করে রেখে দেয়া হয়েছিল বেচারীর লাশ। খুনি চেয়েছে যাতে ওভাবেই আবিষ্কৃত হয় লাশটা। এবার আমাদের সেই অচেনা লোক কালো একটা ইলেকট্রিকাল তার পেঁচিয়ে দিয়েছিল মেয়েটার গলায়... উদ্দেশ্য ছিল যাতে একদিকে কাত হয়ে পড়ে না যায় লাশটা। আমরা জানতে পেরেছি, এই ঘটনার আগেই মারা গিয়েছিল ওই মেয়ে। এলার মতো লিলিকেও বার বার চুবানো হয়েছে লবণাক্ত পানিতে।

আরেকটা কথা। এলা রেনল্ডসের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পাওয়া গেছে লিলি ডেভিসের লাশ। তার মানে হচ্ছে, আমাদের সেই অচেনা লোক যেভাবেই হোক না কেন ওই দু'জনের কাপড় অদলবদল করেছে।'

এতক্ষণ ল্যাপটপে মাথা গুঁজে রেখেছিল ক্লোজ, এবার তুলল। 'আপনি না একবার একটা কথা বলেছিলেন... এলার মতো লিলিও একটা গাড়ি কেনার চেষ্টা করেছিল?'

মাথা ঝাঁকাল ক্লেয়ার। 'আমি আর সোফি কথা বলেছি ওই মেয়ের সবচেয়ে ভালো বন্ধু গ্যাব্রিয়েল ডিগানের সঙ্গে। মেয়েটা বলেছে, লিলির বাবা নাকি বলেছিলেন, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর গাড়ি কিনে দেবেন লিলিকে। কিন্তু লিলি আরও তাড়াতাড়ি কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিতে চেয়েছিল।'

'কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?' ক্লোজকে জিজ্ঞেস করল পুল। 'এলা যে-প্রতিষ্ঠান থেকে গাড়ি কিনেছিল, ওই একই জায়গা থেকে গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছিল লিলি?'

'ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলাম আমরা,' বলল ন্যাশ। 'তারা বলেছে, লিলিকে নাকি চেনে না। সেখানে যারা কাজ করে, তাদের ব্যাপারেও কিছু খোঁজখবর করেছি আমরা। কিন্তু তেমন কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি। কিশোর-বয়সী সব ছেলে বা মেয়েই কিন্তু নিজের জন্য গাড়ি চায়। আর তাই আমার মনে হয় বিশেষ এই ব্যাপারটা আসলে কাকতালীয় ছাড়া অন্য কিছু না। আরও বেশি কোলাহল... যেমনটা বলেছেন আপনি একটু আগে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে বোর্ডের দিকে তাকাল পুল। 'ঠিক আছে। এবার বলুন ল্যারিসা বিয়েলের কী খবর।'

'এই মেয়ে আবার আলাদা,' বলছে সোফি। 'আজ সকাল থেকে কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটার। এবং এখন পর্যন্ত তার লাশ পাওয়ার কোনো খবরও নেই কোথাও। হতে পারে, এখনও বেঁচে আছে মেয়েটা এবং সে-সম্ভাবনাই বেশি। এই অবস্থায় আমরা আর কোনো তথ্য জানি না ওই মেয়ের ব্যাপারে। মেয়েটা যে-স্কুলে পড়ে, আজ রাতে সেখানে একটা নাচের-অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এবং সেটাতে যোগ দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল ওই মেয়ে। তার বাবা-মা দু'জনই আজ সকালে যখন কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান, তখনও বাসাতেই ছিল সে। তাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য আজ স্পা-য় যাওয়ার কথা ভেবে রেখেছিলেন তার মা।'

'এলা রেনল্ডস এবং বিশেষ করে লিলি ডেভিসের বেলায় যা দেখেছি আমরা, সে-অনুযায়ী যদি বলি, হাতে খুব বেশি সময় নেই ল্যারিসার। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার একদিনের মাথায় মারা গেছে লিলি,' ক্লোজের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। 'ল্যারিসার ল্যাপটপ অথবা মোবাইল ফোন থেকে কিছু জানা গেল?'

'ওই মেয়ের বাবা-মা কিডবিসেসইফ নামের একটা সফটওয়্যার ইন্সটল করে দিয়েছিলেন মেয়েটার ল্যাপটপে। আজ দু'বছর হতে চলল মনে-যা-আসে-তা ওই



সফটওয়্যারে শেয়ার করে চলেছে কিশোর-বয়সী ছেলে-মেয়েরা। কিছু হ্যাকিং সফটওয়্যারও পাওয়া গেছে মেয়েটার ল্যাপটপে। তবে ল্যারিসা চাইলেই ওই মনিটরিং সফটওয়্যার চালু বা বন্ধ করতে পারত... ওর বাবা-মা কী দেখছেন না-দেখছেন সেসব সীমিত করে দিতে পারত।’ শরীরের ভার বদল করল ক্রোজ। ‘ওই মেয়ের ল্যাপটপের ব্যাকগ্রাউন্ডে পিভাশিল্ড নামের আরেকটা সফটওয়্যার পেয়েছি আমরা। এই পিভাশিল্ড এমন এক সফটওয়্যার, যা কিনা ক্যাশে ডেটাকে রীতিমতো ধ্বংস করে দেয়। তার মানে হচ্ছে, ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলতে আর কোনোকিছুই বাকি থাকে না... সব মুছে যায়। আমি বলবো, এই মেয়ে চতুর প্রকৃতির। সে যা করেছে তা হলো... কম্পিউটারের ভাষায় যদি বলি... ওর বাবা-মাকে পর্যাপ্ত ডেটা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা দিয়েছে এমন এক কায়দায়, যাতে তাঁরা মনে করেন ঠিকমতোই তদারকি করা হচ্ছে তাঁদের মেয়ের কাজকর্ম। অথচ কিছু না কিছু ডেটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল মেয়েটা। এখনও খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। তবে একটা কথা বলে রাখি... এই ল্যাপটপটা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ এক অনুসন্ধানের পরিণত হতে পারে আমাদের জন্য। আর ওর মোবাইলের কথা যদি বলি... আমাদের ধারণা, যখন অপহরণ করা হয়েছে ওকে, তখন মোবাইলটা ওর সঙ্গেই ছিল। আজ সকালে কোথায় ছিল না-ছিল সে, সেসব ট্র্যাক করেছি আমরা। জানতে পেরেছি, ওয়েস্ট শিকাগো অ্যাভিনিউ এবং নর্থ ড্যামেনের এককোণায় ছিল সে। তারপর হুট করেই উধাও হয়ে যায় মোবাইলের সিগনাল। খুব সম্ভব অচেনা সেই লোক ব্যাটারি বের করে নিয়েছে মোবাইল থেকে অথবা চুরমার করে দিয়েছে মোবাইলটা। ওই মোবাইলের সমস্ত তথ্য জরুরিভিত্তিতে চেয়েছি আমরা মোবাইল কোম্পানির কাছে, তবে তারা এখন পর্যন্ত সে-রকম কিছু দিতে পারেনি আমাদেরকে। এ-ব্যাপারে কোনোকিছু জানতে পারামাত্র জানাবো আপনাদেরকে।’

কনফারেন্স টেবিলে ফিরে এল পুল। পিকআপ ট্রাকের ভেতরে জমে-যাওয়া ছেলেটার ছবি দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ওই ছবি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরল বাকিদের দিকে। ‘আমাদের হাতে এখন কেবল বাকি আছে এই ছেলে।’

‘আমি নিশ্চিত ছেলেটার নাম-পরিচয় জানার জন্য যা-যা করা সম্ভব, করছে আইজলি। কিন্তু ওই বরফের কারণে কাজের গতি ধীর হয়ে যাবে তার,’ বলল ক্রোজ। তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে।

‘ওই ট্রাক কার নামে রেজিস্ট্রেশন করা ছিল, জানেন? ক্যালিন সেলকে,’ জানাল ক্রোজ।

‘লিবি ম্যাকিনলের ছদ্মনাম,’ বলল ন্যাশ। ‘তার মানে আরেকটা কানাগলি।’

‘হ্যাঁ।’

বোর্ডের দিকে তাকাল পুল। ‘যা-যা লেখার দরকার ছিল, সব কি লিখতে পেরেছি? নাকি কিছু বাকি রয়ে গেছে?’

‘শোকসংবাদ নিয়ে কথা বলিনি আমরা এখনও,’ জানিয়ে দিল ন্যাশ।

টেবিলের দিকে আরও একবার ঘাড় ঘোরাতে হলো পুলকে। ‘শোকসংবাদ?’

মাথা ঝাঁকাল ক্রেয়ার। ‘আজ সকালে নাইন ওয়ান ওয়ান-এ একটা কল এসেছিল। বয়স্কা এক মহিলা দাবি করেছেন, ফ্রয়েড রেনল্ডস নাকি দু’বার মারা গেছেন। তার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। একই খবর প্রকাশিত হয়েছে গত বুধবারের পত্রিকাতেও। আমরা আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলাম ব্যাপারটা নিয়ে, জানতে পারলাম আরও কিছু তথ্য। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে তা হলো, আমাদের সেই অচেনা লোক স্থানীয় একটা পত্রিকায় তার শিকারদের ব্যাপারে ছাপিয়ে চলেছে একের পর এক মৃত্যুসংবাদ। এবং তা-ও আবার কখন... ওই মানুষগুলোকে খুন করার আগে। এ যেন রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে খুন করা আর কী।’

পুলকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, এসব কথা শুনছে না সে। ‘দু’বার মারা গেছেন,’ বলল ধীরে ধীরে, তারপর আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বোর্ডের দিকে। উঠে এগিয়ে গেল বোর্ডগুলোর দিকে; যে-বোর্ডে কবিতা লেখা আছে, সেটা ঘুরিয়ে দিল টেবিল বরাবর... যাতে অন্যরাও পড়তে পারে। ‘আমার ধারণা, স্পেশাল এজেন্ট ডিনার এসব কবিতা দেখে ফেলেছিল বলেই তাকে খুন করেছে বিশপ। পরিত্যক্ত ওই বাসার ভেতরে, একটা দেয়ালের গায়ে লেখা ছিল এই কবিতাগুলো। বিশেষ কোনো কোনো শব্দের নিচে দাগ দেয়া আছে, খেয়াল করেছেন আপনারা? এবং একমাত্র যে-শব্দ দু’বার এসেছে তা হলো, মৃত্যু।’ সেই ড্রাইওয়ালের গায়ে কীভাবে লেখা হয়েছিল কবিতাগুলো, এবং পরে কীভাবে সেসব কেটে ফেলা হয়েছে, ব্যাখ্যা করে বাকিদেরকে বলল সে।

‘আন্ডারলাইন-করা অন্য শব্দগুলোও খেয়াল করুন একটু,’ বলল ক্রেয়ার। ‘বরফ, পানি, ভয়... প্রতিটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিন্তু মিল আছে এসব শব্দের।’

‘নাইন ওয়ান ওয়ান-এর সেই কল... কে ফোন করেছিল, সেটা কি জানা গেছে? ট্রেস করা হয়েছে কলটা?’

সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ক্রোজের দিকে। একটা মুহূর্তের জন্য একটা আঙুল উঁচু করল সে, তারপর জ্র কোঁচকাল। ‘রিপোর্ট বলছে, লাস্টিং হারমোনি রিটায়ারমেন্ট সেন্টার থেকে কলটা করা হয়েছিল। সেখানকার কর্মচারীরা বলছে, তিরানব্বই বছর বয়সী এক মহিলা নাকি করেছেন সেই ফোনকল, নাম ইনগ্রিড নেসবিট। প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় মৃত্যুসংবাদ পড়াটা তাঁর অভ্যাস। ফ্রয়েড রেনল্ডসের খবরটা পড়ে ভেবাচেকা খেয়ে যান তিনি। আর তাই নাইন ওয়ান ওয়ান-এ ফোন করার জন্য চাপাচাপি করতে থাকেন।’

‘তার মানে আরও একটা কানাগলি,’ ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করল ন্যাশ।

কবিতা-লেখা বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রেয়ার। ‘ধরে নিলাম, কবিতাগুলো যে লিখেছিল সেই দেয়ালে, তার সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক ছিল ওসব কবিতার। ধরে নিলাম, লোকটা চেয়েছিল, আমরা যাতে খুঁজে বের করি



তাকে। সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পরে কবিতাগুলো গায়েব করে দেয়ার মানে কী? এজেন্ট ডিনারকে খুন করারই বা মানে কী?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পুল। ‘আমার মনে হয়, বিশপ চেয়েছিল, পোর্টার যাতে খুঁজে বের করতে পারেন ওসব... আমি না। এমনকী আপনাদের কেউও না সম্ভবত।’

ক্লোজের দিকে তাকাল ক্লেয়ার। ‘আপনি বলেছিলেন, বানোয়াট ওসব মৃত্যুসংবাদ পাঠানো হয়েছিল একই কম্পিউটার থেকে। খোঁজ চালিয়ে আর কিছু জানা গেছে এই ব্যাপারে?’

জবাব দিল না ক্লোজ। ওর দুই চোখ আঠার মতো সঁটে আছে নিজের ল্যাপটপের স্ক্রিনের সঙ্গে।

‘ক্লোজ?’

‘আহ, না। আইপি ট্রেস করে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে শহরের ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা যদি কাজে লাগিয়ে থাকে ওই কম্পিউটার, জেনে নিতে পারবো আমি সেটা। আমার মনে হয়...’ কথা শেষ করল না সে, ল্যাপটপের ওপর ঝুঁকে পড়েছে আরও খানিকটা।

‘কী?’ জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

‘কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি আমি। তবে এই কিছু একটা কোনোকিছু না-ও হতে পারে শেষপর্যন্ত। হতে পারে, আমার মস্তিষ্ক কিছু একটা খুঁজছে। এবং সেটা আসলে নেই এখানে,’ বলল ক্লোজ।

উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার, এগিয়ে গেল ক্লোজের দিকে। ‘ঝেড়ে কাশুন তো, ক্লোজ। নইলে আমার পক্ষ থেকে আবারও কোনো একটা মার হজম করতে হবে আপনাকে।’

‘যেসব জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওসব বাচ্চাকে এবং যেসব জায়গায় লাশ পাওয়া গেছে, সেগুলো সাজাচ্ছিলাম আমি একটা এরিয়া ম্যাপে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যদি কোনো সরলরেখা আঁকি, তা হলে দেখা যাচ্ছে, জন এইচ. স্ট্রজার, জুনিয়র হাসপাতালটা কমবেশি কেন্দ্রস্থলে থাকছে প্রতিবারই।’

ওই ম্যাপ ভালোমতো দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ল ন্যাশ। ‘র্যান্ডাল ডেভিস তো কাজ করতেন সেখানেই।’

‘বীমা-প্রতিনিধি এবং ওষুধ কোম্পানির বিক্রয়-প্রতিনিধি,’ বলল ক্লেয়ার। ‘ডার্লিন বিয়েল এখন ওখানেই আছেন।’

ঝুঁকল পুলও। ‘ওই হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটা তালিকা যদি জোগাড় করি আমি, শোকসংবাদগুলোর সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দেখতে পারবেন নাকি? এমনও হতে পারে, কপাল ভালো হবে আমাদের... আর কোনোকিছু ঘটে যাওয়ার আগেই জেনে যেতে পারবো পরবর্তী শিকার কে।’

ইতোমধ্যেই টাইপ করতে শুরু করে দিয়েছে ক্রোজ। ‘কাজ শুরু করে দিলাম।’

উঠে দাঁড়িয়েছে ন্যাশ। তাকিয়ে আছে বোর্ডগুলোর দিকে। ‘আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখনও কিছু একটা মিস করছি আমরা।’

‘কী?’ জানতে চাইল পুল।

‘বিশপ এসব কাজ একাই করছে কি না, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না আসলে। সে যদি কোনো না কোনোভাবে লিবি ম্যাকিনলের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েও থাকে, এত কাজ একজন মানুষের পক্ষে আসলেই অনেক বেশি হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছে, আরও বড় কিছু একটা ঘটছে এই শহরে।’

‘সম্ভবত।’

‘শয়তানের সঙ্গে যতক্ষণ না হচ্ছে পরিচয়, ঈশ্বরের ভূমিকায় কী করে করবেন অভিনয়?’ কথাটা শব্দ করে বলল ন্যাশ। ‘এই বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কি ওই কাজই করছে লোকটা? খতম করে দিচ্ছে তাদেরকে এবং তারপর ফিরিয়ে আনছে? ঈশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করছে?’

‘শয়তানের সঙ্গে...’ বলল ক্লেয়ার।

‘প্রতিটি কবিতাই জীবন আর মৃত্যু নিয়ে। ওই লোক হয়তো সেটাই বলতে চাইছে আমাদেরকে।’ হাতের সাহায্যে চুল ব্যাকব্রাশ করল পুল। ‘স্লিপ প্যাচ লাগিয়ে ঘুমাতে হচ্ছে আমাকে গত কয়েকটা দিন। কোনোকিছুর ওপর মনোযোগ দিতে সমস্যা হচ্ছে আমার।’

ঠিক এ-সময়ই বেজে উঠল ওর ফোন।

পকেট থেকে ফোনটা বের করল সে। তাকাল ছোট স্ক্রিনটার দিকে।

আননোন কলার।

টক বাটনে চাপ দিল সে।

কিছু বলার আগেই ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

‘ফ্র্যাঙ্ক, আমি স্যাম।’



৮৮.

পুল

তৃতীয় দিন, রাত ১০:১৫

বুকের খাঁচায় যেন জোরে বাড়ি খেল পুলের হুৎপিণ্ডটা। হাতেধরা ফোন নামিয়ে রাখল কনফারেন্স টেবিলের ওপর, চাপ দিল একটা বাটনে। ‘স্যাম, আপনাদের অফিসেই আছি আমি, আপনার দলের লোকদের সঙ্গেই আছি। আপনাকে স্পিকারে দিলাম।’

‘আপনাকে আমাদের অফিসে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে?’

‘তঁাকে আমি নিয়ে এসেছি এখানে, স্যাম,’ বলল ক্রেয়ার। ‘এই কেস অনেক জটিল হয়ে গেছে। এবং বিশপের সঙ্গে একটা যোগসূত্র পাওয়া গেছে। বলা ভালো, যা পাওয়া গেছে, সেটা যোগসূত্রের চেয়েও বেশি কিছু। এই কেসের সবজায়গায় ওই লোকের উপস্থিতি।’

মোবাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল পুল। ‘আপনি কোথায়? ওই ডায়েরিই বা কোথায়?’

পোর্টারের দম ছাড়ার আওয়াজ শোনা গেল লাইনের ও-প্রান্ত থেকে। কিন্তু জবাব দিল না সে।

মুখ তুলে বাকিদের দিকে তাকাল পুল, তারপর আবার মনোযোগ দিল ফোনের ওপর। ‘লিবি ম্যাকিনলে মারা গেছে।’

পোর্টার কিছু বলল না।

‘তার লাশ খুঁজে পেয়েছি আমরা। বিছানার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সাদা বাক্সের ভেতরে পাওয়া গেছে মেয়েটার কান, চোখ, জিহ্বা। মানে, বিশপের অন্য শিকারদের বেলায় যে-রকম ছিল, অনেকটা সে-রকম। হত্যা করার আগে নির্যাতন চালানো হয়েছে মেয়েটার ওপর। চিরে ফালাফালা করে দেয়া হয়েছে তার শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি।’

পোর্টার যখন কথা বলল, তার কণ্ঠে কোনো পরিবর্তন টের পাওয়া গেল না। এবং বোঝা গেল, যা বলছে সে, মেনে মেনে বলছে। ‘ওই কাজ বিশপের না। বারবারা ম্যাকিনলেকেও খুন করেনি সে, লিবি ম্যাকিনলেকেও না।’

ক্লোজের দিকে তাকাল পুল। ‘আইটি’র যে-লোক আছে আপনাদের, তাঁর ধারণা, ওই কাজ বিশপের মায়ের। আপনার কী ধারণা, সেটা জানতে ইচ্ছা করছে আমার।’

আরও একবার চুপ হয়ে গেল পোর্টার।

পুল শুনতে পেল, কোনো একজনের সঙ্গে কথা বলছে পোর্টার। কণ্ঠ কেমন যেন চাপা। মনে হচ্ছে, ফোন চাপা দিয়ে রেখেছে কিছু একটার সাহায্যে। তারপর আবার শোনা গেল, লাইনে ফিরে এসেছে সে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৪০

‘স্যাম?’

‘একটা ঠিকানা টেক্সট মেসেজ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে। যখন সেখানে পৌঁছে যাবেন, জায়গাটার পেছনদিকে একটা পথ আছে, সেটা অনুসরণ করবেন। আগাছা আর ঝোপের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে ওই জায়গা, তবে যদি ভালোমতো খেয়াল করেন, খুঁজে পাবেন পথটা... বনের ভেতরে হরিণ চলাচলের পথ যে-রকম হয়, অনেকটা সে-রকম। ওই পথ আপনাকে নিয়ে যাবে একটা লেকের কাছে। আর হ্যাঁ, একা আসবেন না, একটা দল নিয়ে আসবেন। কারণ লেকটা পরিষ্কার করা দরকার,’ পুলকে বলল পোর্টার।

‘আপনি কোথায় আছেন, স্যাম?’

‘লেকের কাছে যখন পৌঁছাবেন, বেড়ালটার খোঁজ করবেন।’

‘আপনার কথার মাথামুণ্ডে কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যাম। আপনি যদি...’

লাইন কেটে দেয়া হলো ও-প্রান্ত থেকে।

বিড়বিড় করে শাপশাপান্ত করল পুল।

ভাইব্রেট করে উঠল ওর ফোন। একটা ঠিকানা হাজির হয়েছে:

১২ জেনকিন্স ক্রল রোড

সিম্পসনভিল, এসসি

‘সে নিশ্চয়ই গিয়ে খুঁজে বের করেছে ওটা,’ বলল ন্যাশ, এখনও তাকিয়ে আছে পুলের ফোনের দিকে।

‘ওটা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?’

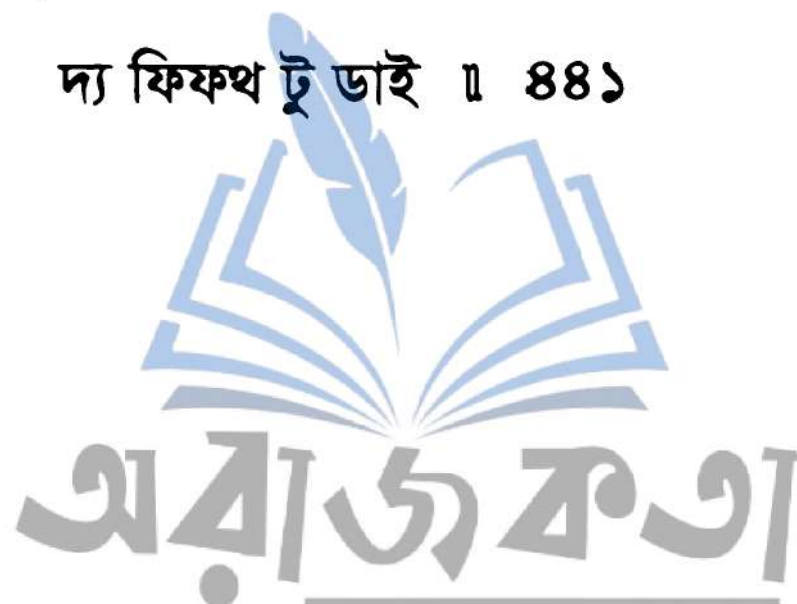
‘বিশপের ছেলেবেলার বাসা।’

‘আমার খুব একটা ভালো লাগছে না এসব,’ বলল ক্লেয়ার। ‘স্যাম সবকিছু এভাবে গোপন করতে চাইছেন কেন? একটু আগে ফোনে কথা বললেন তিনি, কিন্তু শুনে মনে হলো, অন্য কেউ কথা বলছেন যেন। আর... তখন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি?’

নিজের কম্পিউটারের একটা ব্রাউজারে ওই ঠিকানা টাইপ করা হয়ে গেছে ক্রোজের। স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিল যাতে সবাই দেখতে পায়। ‘দুনিয়াছাড়া একটা জায়গায় ওই ঠিকানার অবস্থান। মানে... ওই জায়গা প্রকৃতপক্ষে কোনো জায়গাই না।’

‘পোর্টারকে কেন বিশ্বাস করা উচিত, সে-ব্যাপারে আমি নিজেও আসলে নিশ্চিত না,’ বলল পুল। ‘ওই ডায়েরি চুরি করেছেন তিনি। এবং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা নিজের কাছে গোপন করে রাখছেন তিনি। লিবি যে মারা গেছে, মনে হলো না সে-খবর শুনে একটুও বিস্মিত হয়েছেন তিনি। আর কী কী জানেন তিনি এই কেসের ব্যাপারে?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৪১



অরাজকতা



চেয়ারে হেলান দিল ন্যাশ। ‘আমার মনে হয় পোর্টার যদি এমন কিছু জানত যে-তথ্য কোনো না কোনো কাজে লাগত আমাদের, তা হলে সেটা শেয়ার করত আমাদের সঙ্গে। কোনোকিছু লুকিয়ে রাখার কোনো কারণ নেই ওর।’

‘তারপরও ওই ডায়েরি নিয়ে গায়েব হয়ে গেছেন তিনি। এবং নিজের ফোনটা রেখে গেছেন যাতে তাঁকে অনুসরণ করতে না পারি আমরা।’

‘এই কেসে এখনও কাজ করছে স্যাম,’ বলল ন্যাশ। ‘ওকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি।’

জিভ দিয়ে বিচিত্র এক আওয়াজ করল পুল, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘শার্লট অফিসে ফোন করছি আমি। কয়েকজনের একটা দলকে পাঠিয়ে দিতে বলছি বিশেষ ওই ঠিকানায়। ও’হেয়ার-এ একটা প্লেন আছে আমাদের। দরকার হলে আমিও সেখানে হাজির হয়ে যেতে পারবো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।’

উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার, এগিয়ে গেল বোর্ডের দিকে। ‘স্ট্রজার হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকাটা যদি জোগাড় করে দিতে পারেন আমাদেরকে, আমরা তা হলে সেই অ্যাঙ্গেল থেকে কাজ শুরু করে দিতে পারবো। সেক্ষেত্রে হয়তো দু’দিক দিয়েই খাঁচাবন্দি করে ফেলা সম্ভব হবে বিশপকে।’

মাথা ঝাঁকাল পুল, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। শোনা যাচ্ছে ওর পায়ের আওয়াজ। দ্রুত হাঁটছে, হাঁটার গতি বাড়তে বাড়তে দৌড়ানোর মতো হয়ে যাচ্ছে।

এভিডেন্স বোর্ড
অ্যানসন বিশপ

ফ্রয়েড রেনল্ডস

ইউনিমেড আমেরিকা হেল্থকেয়ার/বীমার বিক্রয়প্রতিনিধি
শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে/মরদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটা স্লোম্যানের
ভেতরে

এলা রেনল্ডস

জ্যাকসন পার্ক লেগুনে পাওয়া গেছে/কিছুদিন আগে একটা গাড়ি কিনেছিল
পানিতে চুবিয়ে মারা হয়েছে, লবণাক্ত পানি

র্যান্ডল ডেভিস

ক্যাসার-বিশেষজ্ঞ

কাজ করতেন জন এইচ. স্ট্রজার, জুনিয়র হাসপাতালে
লিসিনোপ্রিলের ওভারডোজ দেয়া হয়েছিল

লিলি ডেভিস

লি গ্যালারির গুদামঘরে পাওয়া গেছে পোজ দেয়া অবস্থায়
পানিতে চুবিয়ে মারা হয়েছে, লবণাক্ত পানি

ডার্লিন বিয়েল

ওষুধ কোম্পানির বিক্রয়-প্রতিনিধি
সায়ানাইড বিষ খাওয়ানো হয়েছে

ল্যারিসা বিয়েল

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ সকালে পশ্চিম শিকাগো অ্যাভিনিউ এবং নর্থ
ড্যামেন-এর এককোনা থেকে হারিয়ে গেছে

নাম-না-জানা কিশোর

লিবি ম্যাকিনলে

কে খুন করেছে এই মেয়েকে? বিশপের মা?
এই মেয়ের কাছে বিশপের মা এবং ওই মহিলার প্রতিবেশী/কার্টারের ছবি পাওয়া
গেছে

আরও পাওয়া গেছে একগোছা সোনালি চুল

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৪৩



অরাজকতা



ওই চুল কার? সম্ভবত কার্বির?
মেয়েটা ওই চুল পেল কী করে?
আইডি কার্ডে নাম পাওয়া গেছে ক্যালিন সেলকে/বিশপের সাহায্য নিয়ে করেছে
এই কাজ
জেলখানায় থাকার সময় যোগাযোগ করেছিল বিশপের সঙ্গে/কীভাবে করেছিল
কাজটা জানা যায়নি
একটা .৪৫ পাওয়া গেছে এই মেয়ের কাছে
জেলখানায় থাকতে নিরাপদ বোধ করত, বাইরে করত না

যেসব কবিতা পাওয়া গেছে

আমি থামতে পারিনি, অথচ এসেছিল মরণ,
তাই সে নিজ দয়ায় করল আমায় স্মরণ;
ওই বাহনে শুধু আমাদের হয় ঠাই
এবং অমরত্বকেও সেখানে খুঁজে পাই।

জীবন ও মৃত্যুর একটি উপমা আমি জানি,
সদৃশ তারা; যেমন বরফ আর পানি।
বরফে জমাট বাঁধে পানির সব বিন্দু,
সে-বরফই গলে আবার হয় কোনো জলসিন্ধু।
যা মারা যায়, পুনর্জন্ম নিশ্চিত তার,
যা জন্মে, তা মরে যায় কখনও আবার।
বরফ আর পানি কেউ করে না একে-অপরের ক্ষতি,
জীবন আর মৃত্যু, বলছি আমি, দু'জনই সুন্দর অতি।

চলো বাসায় প্রত্যাবর্তন করি, চলো ফিরে যাই,
চাওয়া-পাওয়ার এই হিসেবকে বলি ধেং ছাই,
আনন্দ আজ যেন সঙ্গী হয়েছে তুরণের।
ওদিকে নীল মহাসাগর থেকে মরণের
জীবন বয়ে চলেছে অমৃতসুধার মতো।
জীবনে মৃত্যু আছে; মৃত্যুতে আছে জীবন অবিরত।
সুতরাং ভয় কীসের; কোথায় ভয়?
আকাশের পাখিরা গাইছে “মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়!”
অমরত্বের জোয়ার যেন দিন-রাতের সরণিতে,
নেমে আসছে এখানে... অসহ্য সুন্দর ধরণীতে।

শয়তানের সঙ্গে যতক্ষণ না হচ্ছে পরিচয়,
ঈশ্বরের ভূমিকায় কী করে করবেন অভিনয়?

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৪৪

যেসব শব্দের নিচে দাগ দেয়া ছিল

বরফ

পানি

জীবন

মৃত্যু

বাসা

ভয়

মৃত্যু

দ্য ফিফথ টু ডাই । ৪৪৫



অরাজকতা



৮৯.

পোর্টার

তৃতীয় দিন, রাত ১০:১৬

ফোনের ভেতর থেকে ব্যাটারি বের করে নিল স্যাম। তারপর ও-দুটোই ছুঁড়ে ফেলে দিল লেকে। পানি পুরোপুরি গিলে ফেলল জিনিস দুটোকে। ছোট কিছু তরঙ্গ জেগে উঠল লেকের মাঝখানে; তারপর একসময় অস্তিত্বহীনতায় মিলিয়ে গেল ওই ফোন আর ব্যাটারি। লেকের কালো কন্মলের তলায় যেন ঢাকা পড়ল আরও একটা গোপনীয় ব্যাপার।

‘ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কেন? আমরা যে এখানে আছি, সেটা তো তাঁদেরকে বলেই দিয়েছেন আপনি,’ বলল পোর্টারের পাশে থাকা সারা।

পানির কিনারা থেকে কয়েক ফুট দূরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পোর্টার। ধুলো লেগে আছে ওর আঙুলগুলোতে। মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

জঙ্গলে ছাওয়া সেই পথ ধরে সিকি মাইল এগোনোর পর ছোট খোলা একটা জায়গায় হাজির হয়েছিল ওরা দু’জন... যেমনটা বর্ণনা করা হয়েছে বিশপের ডায়েরিতে। ছোট সেই খোলা জায়গা যেন মুখ করে আছে লেকের দিকে।

বিশপ বলেছিল, এখানকার পানি নাকি শীতকালে জমে বরফে পরিণত হয়।

কিন্তু কথাটা মিথ্যা।

দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় তাপমাত্রা হিমাক্ষের নিচে নেমে যেতে পারে, কিন্তু আরও উত্তরে অত কর্কশ রূপ ধারণ করে না শীতকাল, বিশেষ করে শিকাগোর মতো তো না-ই। তাপমাত্রা যদি কখনও হিমাক্ষের নিচে নামেও, সে-অবস্থা এত লম্বা সময় ধরে বিরাজ করে না যে, জমিনের সবকিছু জমে বরফ হয়ে যাবে। বিশেষ করে একটা লেকের মতো বড় কোনো জলাশয় তো না-ই। এখানে যে-লেক দেখা যাচ্ছে, সেটা কোনো সংজ্ঞাতেই বিশাল কোনোকিছু না; তারপরও ভীষণ বাজে কোনো শীতকালের ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো বড় ওটা। এই ব্যাপারে পোর্টার নিশ্চিত। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, বিশপ কেন ও-রকম লিখেছিল? লিখেছিল, কারণ, সে হয়তো লেকটা ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত, তা গোপন করতে চেয়েছিল। এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণের কথা এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না পোর্টারের। অর্থাৎ ভুল দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দুটো ফ্ল্যাশলাইটই এখন সারার কাছে। আলোকরশ্মি তাক করে রাখা হয়েছে বড় একটা ওক গাছের গোড়ার দিকে। এটা একটা লরেল ওক। গাছের গোড়ায় ছোট একটা গর্ত আছে। পোর্টারকে যে অনেক গভীর কোনো গর্ত খনন করতে হয়েছে, তেমনটা না। ওই গর্তের খানিকটা অংশ আগে থেকেই বেরিয়ে ছিল জমিনে। এবং সেটা সারার নজর এড়ায়নি।

দ্য ফিফথ টু ডাই । ৪৪৬

গর্তের ভেতর থেকে পাওয়া গেল সাদা একটা ধাতব লাঞ্চবক্স। জিনিসটার গায়ে জায়গায় জায়গায় মরিচা ধরে গেছে।

একটা মরা বেড়ালের কঙ্কাল যে খুঁজে পেতে হবে, এমনটা আশা করেনি পোর্টার।

এমনকী, ওই লাঞ্চবক্সের মতো কোনোকিছু যে পাওয়া যাবে, আশা করেনি সেটাও।

বাক্সটা এই মুহূর্তে খোলা। ভেতরে আছে একটা খাম। কাগজটা বয়সের- কারণে হলুদ হয়ে গেছে। কালো দড়ির সাহায্যে একটা কম্পোজিশন বুকের সঙ্গে বাঁধা আছে ওই জিনিস। খামের গায়ে শ্রেফ একটামাত্র কথা লেখা আছে...

মা

‘স্যাম, ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কেন আপনি?’ আবারও জানতে চাইল সারা।

দড়িতে বাঁধা জিনিস দুটো বাক্সের ভেতর থেকে আলাগা করে নিল পোর্টার, দিল ওই মহিলার হাতে। ‘আমরা কোথায় আছি, সেটা পুল জেনে গেলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে... এ-রকম আশঙ্কা করছি না আমি। বরং চাইছি, সে যাতে জানতে না পারে, কোথায় যাচ্ছি আমরা এরপর,’ বলল মহিলাকে।

‘বিশপের কী হবে? ওই ফোন বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে আপনাকে দিয়েছিল সে।’

‘তাকে একটা ঝাঁকুনি দেয়া দরকার আমাদের। তার কাজে ব্যাঘাত ঘটানো দরকার। আমরা তার খেলার পুতুল না। ওই ফোনের সাহায্যে যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে সে, তা হলে কাজটা করার কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে তাকেই। এবং তার ফলে হয়তো অবস্থান ফাঁস হয়ে যেতে পারে লোকটার,’ বলল পোর্টার।

পকেট থেকে বের করল বিশপের ডায়েরিটা। রেখে দিল লাঞ্চবক্সের ভেতরে। তারপর লাগিয়ে দিল ঢাকনাটা। আলাগা কিছু মাটি ফেলে প্রায় ঢেকে দিল বাক্সটা। মরচে-ধরা ধাতুর গায়ে একটা “হ্যালো কিটি” নকশা খোদাই করা ছিল, গায়েব হয়ে গেল সেটা।

বিশপের বেড়াল।

‘চলুন,’ বলল পোর্টার। ‘চলে যাই এখান থেকে।’



৯০.

পুল

তৃতীয় দিন, রাত ১০:২৩

‘স্যর, এটা ভালোমতো দেখা দরকার আমার,’ বলল পুল। নিজের চেরোকি জিপের স্টিয়ারিং হুইলটা জোরে মোচড় দিল বাঁ দিকে। ডান দিকের লেনে নিখর দাঁড়িয়ে থাকা চারটা গাড়িকে পাশ কাটাল।

এত রাতেও রাস্তায় এত গাড়ি কেন? এখন প্রায় এগারোটা বাজে।

মাথার ওপর দিয়ে ভাঁ আওয়াজ তুলে উড়ে গেল একটা সেভেন টু সেভেন। পেট দেখা যাচ্ছে ওটার। ও’হেয়ার এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে প্লেনটা।

‘তোমার এখন ছুটিতে থাকা উচিত। তোমার পার্টনারকে আজই হারিয়েছ তুমি। সুতরাং নিজের পক্ষ থেকে শেষ যে-কাজ তুমি করতে পারো সেটা হচ্ছে, আবার মাঠে নেমে পড়া। এবং সেটাই করতে চলেছ তুমি এখন,’ বলল এসএআইসি হার্লস, জিপের স্পিকারফোনে শোনা গেল কণ্ঠটা।

‘জেটপ্লেনটা দরকার আমার। এয়ারপোর্টের কাছে চলে এসেছি আমি।’

‘জিপের নাক ঘুরিয়ে নেয়া দরকার তোমার। আমাদের ফিল্ড অফিসের ফিরে আসা দরকার। এবং সবকিছু আমাকে বলা দরকার যাতে অন্য কাউকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে পারি,’ বলল হার্লস।

লম্বা করে দম নিল পুল, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। আরও একবার মোচড় দিল স্টিয়ারিং হুইলে। সংঘর্ষ ঘটতে চলেছিল একটা বাদামি মিতসুবিশি আউটল্যান্ডারের সঙ্গে, একটুর জন্য বেঁচে গেল। বাঁ দিকে মোচড় কাটতে যাচ্ছিল ওই গাড়িটা। হর্নে চাপ দিল ওটার ড্রাইভার, চেপে ধরে রাখল।

‘টেকনিশিয়ানদের বক্তব্য অনুযায়ী, পোর্টার তোমাকে ফোন করেছিল একটা বার্নার ফোন (প্রি-পেইড সার্ভিসযুক্ত এমন মোবাইল ফোন, যা পরবর্তীতে নষ্ট করে ফেলা সম্ভব; ব্যবহারকারীর প্রকৃত পরিচয় বা অবস্থান গোপন রাখার জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয় এ-রকম ফোন) থেকে। তার সবচেয়ে কাছের সেল টাওয়ার থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সে যে-ঠিকানা দিয়েছে তোমাকে, সেটার সঙ্গে মিলে গেছে ওই তথ্য। সুতরাং সে যে-লেকের কথা বলেছে, সেটারই কাছাকাছি কোথাও আছে এই মুহূর্তে। স্যাটেলাইট থেকে ছবি জোগাড় করেছি আমি ওই জায়গার। তবে কাজে লাগার মতো তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। সেখানে ঘন হয়ে জন্মে আছে গাছপালা, ফলে ভারী একটা আড়াল তৈরি করেছে। আর তাই স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি দিয়ে বোঝা সম্ভব না, জমিনে ঠিক কী ঘটছে। যা হোক, একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগল আমার কাছে...’

‘কী?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৪৮

‘ওই ফোন ছিল একটা বার্নার ফোন। কেনা হয়েছিল নিউ অরলিন্স থেকে, চালুও করা হয়েছে সেখানে,’ হার্লসের কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা দেখে-দেখে পড়ছে যেন।

‘নিউ অরলিন্স? কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না তো?’

কয়েক ঘণ্টা আগেও শিকাগোতে ছিল বিশপ। আর পোর্টার ছিল দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গ্রিনভিলে, দুনিয়াছাড়া কোনো একটা জায়গায়।

‘তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করে লাইন কেটে দেয়ার পরই পোর্টারের সেই ফোনের আর কোনো সিগনাল পাচ্ছি না আমরা। হতে পারে, মোবাইলের ভেতর থেকে ব্যাটারি বের করে নিয়েছে সে, যাতে ওকে অনুসরণ করতে না পারি আমরা। সে তোমাকে ঠিক কী বলেছে, বলো তো?’

পোর্টারের সঙ্গে ফোনে যা-যা কথা হয়েছে, সব আবার বলল পুল... একটা শব্দও বাদ দিল না।

‘এসব ভালো লাগছে না আমার। পোর্টারের কথাবার্তা আর কাজকর্ম যেন কেমন কেমন ঠেকছে,’ পুলের কথা শেষ হওয়ার পর বলল হার্লস। ‘বিশপের সঙ্গে যদি সত্যিই হাত মিলিয়ে থাকে সে, তা হলে বলতেই হয়, আমাদের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করছে লোকটা।’

‘আমার কী ধারণা, জানেন? আমার ধারণা, এ-সবকিছুর সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে লিবি ম্যাকিনলের। বিশপকে পাকড়াও করার কোনো একটা চাবিকাঠি আছে ওই মেয়ের কাছে। আমার আরও ধারণা, পোর্টার যা-যা বলছেন আমাদেরকে, তার চেয়েও বেশি কিছু জানা আছে তাঁর। কিন্তু আমার মনে হয় না, আমাদেরকে ভুল কোনো পথে পরিচালিত করতে চাইছেন লোকটা। বরং তিনি যে বলছেন দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় গিয়ে একটা লেক সাফসুতরো করে দেখা দরকার আমাদের, আমার মনে হয় কোনো না কোনো কারণ আছে বলেই বলছেন কথাটা। তা ছাড়া এই মুহূর্তে করার মতো তেমন কিছু নেইও আমাদের হাতে। একটু দেখুন না, জেটপ্লেনটা যদি ব্যবস্থা করে দেয়া যায় আমার জন্য।’

কেনেডি থেকে এয়ারপোর্টের এক্সিটে ঢুকে পড়ল পুল। এখানে কিছু দিকনির্দেশক চিহ্ন আছে, সেগুলো অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ফিফথ-বেস অপারেটর হ্যাঙ্গার অভিমুখে। চার্টার এবং প্রাইভেট ফ্লাইটগুলো সেখানেই রাখা হয়। ‘লিবি ম্যাকিনলে যখন স্টেটভিল কারেকশনাল-এ ছিল, তখন তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ করেছিল বিশপ। ওই মেয়ের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে পারল লোকটা, সেটা জানা দরকার আমাদের। জানা দরকার, নকল সেই পরিচয়পত্র কীভাবে জোগাড় করে দিতে পেরেছিল লোকটা ওই মেয়েকে। যদি জ্ঞানতে পারি, তা হলে আরও এক কদম কাছে যেতে পারবো আমরা। পোর্টার টুকরো টুকরো কিছু সূত্র দিয়েছেন, সেগুলো অনুসরণ করছি আমি। আশা করছি,

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৪৯





সেক্ষেত্রে আরও একটা পদক্ষেপ নেয়া হবে আমাদের। স্যর, একটা সেকেন্ড একটু লাইনে থাকবেন...'

সিকিউরিটি গেটের সামনে গাড়ি থামল পুল। নিজের পরিচয়পত্র হুঙ্গে দিল গার্ডের হাতে। ইউনিফর্ম পরিহিত লোকটার দিকে তাকানোমাত্র কিছু একটা পেঙ্গে গেল ওর মাথায়। 'স্যর, জেলখানায় গিয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করে দেখবো আমি। খোঁজখবর করবো সেখানকার সব অফিসারের ব্যাপারেও। মেইল বলি, ফোন বলি, অথবা যোগাযোগ করার জন্য অন্য কোনো ইলেকট্রনিক উপায় বলি... সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হয় ওই সবকিছুর ওপর। সুতরাং বিশপ যদি এসব উপায় বাদ দিয়ে অন্য কোনো কায়দায় যোগাযোগ করে থাকে লিবি ম্যাকিনলের সঙ্গে, তা হলে তার মানে হচ্ছে, কোনো না কোনো মানুষের সাহায্য নিতে হয়েছে তাকে।'

সিকিউরিটি গার্ড একটা ক্লিপবোর্ড ধরিয়ে দিল পুলের হাতে। বিশেষ একটা লাইন দেখিয়ে দিল আঙুলের ইশারায়। সেখানে নিজের নামটা স্বাক্ষর করল পুল। লোকটা এরপর ডানদিকের লটটা দেখিয়ে দিল ইঙ্গিতে, মুখে বলল, 'ওখানকার কোনো এক জায়গায় হবে।'

বুঝতে পারার কায়দায় মাথা ঝাঁকাল পুল। জিপ নিয়ে এগোতে শুরু করল আবার, কিছুদূর গিয়ে থামল ছোট এক বিল্ডিংয়ের ধারে একটা ফাঁকা জায়গায়। এই বিল্ডিং নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করছে হোমল্যান্ড এফবিআই এবং এটিএফ।

জিপটা পার্ক করল পুল।

'জায়গামতো পৌঁছে গেছি, স্যর। এবার বলুন, কী করতে চান আপনি?'

লাইনের ও-প্রান্তে দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল এসএআইসি হার্লসের। 'মিনিট দশেক আগে প্লেনে তেল ভরার আদেশ দিয়েছি আমি। বিশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে নিয়ে উড়াল দেয়ার কথা প্লেনটার। তুমি যখন আকাশে থাকবে, স্থানীয় ফিল্ড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবো আমি। অফিসটা শার্লট-এ, দায়িত্বে আছে বব গ্র্যাঙ্গার। অ্যাকাডেমিতে যখন ছিলাম, তখন থেকে লোকটার সঙ্গে পরিচয় আমার। সে গিয়ে যোগাযোগ করবে স্থানীয় শেরিফের অফিসে, তারপর খুঁজে বের করবে পোর্টারের সেই লেক আসলে কোথায়। পানিতে নামার জন্য একটা দলও গঠন করে ফেলতে পারবে। তুমি এক কাজ করো... প্লেন ল্যান্ড করামাত্র ফোন দিয়ো আমাকে।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'তুমি যে-জিনিসের পেছনে লেগেছ, সেটা যাতে শেষপর্যন্ত ঠিক প্রমাণিত হয়, মনে রেখো।'

৯১.
পোর্টার
তৃতীয় দিন, রাত ১০:২৬

ভাড়া-করা গাড়ির কাছে ফিরে এসেছে পোর্টার আর সারা। দু'জনই চুপ করে আছে, তেমন কোনো কথা বলছে না। এখন গাড়ি চালাচ্ছে পোর্টার। সারা ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে... ফ্লাইট রিজার্ভেশন দেয়ার চেষ্টা করছে।

বলল, 'পরের ফ্লাইটটা দেখতে পাচ্ছি ভোর চারটার আগে ছাড়বে না। তার মানে হচ্ছে, হাতে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পাচ্ছি আমরা। কী করবো? বুকিং দেবো এই ফ্লাইট?'

'কী?'

প্রশ্নটা আরও একবার জিজ্ঞেস করতে হলো ওই মহিলাকে।

'হ্যাঁ, দুঃখিত। আমার মন অন্য কিছু একটার পেছনে ছুটছিল।'

উইন্ডশিল্ড ভেদ করে রাস্তার দিকে তাকাল পোর্টার। রাস্তার ওপর ঐকে রাখা সাদা কিছু দাগ যেন উড়ে চলে যাচ্ছে চলন্ত গাড়ির পাশ ঘেঁষে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওদের দু'জনের পেছনে। রাতের এই সময়ে ওদের আশপাশে বলতে গেলে আর কোনো গাড়িই নেই। এবং এজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে পোর্টার। ওর মনে হচ্ছে, সে আর সারা যেন মালিক হয়ে গেছে এই রাস্তাটার। গ্রিনভিলের আলো অনেক দূর থেকে কাছিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। 'আমরা বরং এক কাজ করি। এয়ারপোর্টের কাছে কোনো একটা হোটেলে যাই, একটা রুম খুঁজে নিই। সেখানে একটু সাফসুতরো হতে পারবো। জামাকাপড় বদল করতে পারবো।'

রিজার্ভেশন কনফার্ম করে দিল সারা। কেটে দিল লাইন। 'একটা কথা মনে করিয়ে দেবো আপনাকে? আমাকে ডিনার কিনে দেয়ার কথা ছিল আপনার, সে-কাজ এখনও করেননি আপনি। আগেও বলেছি আবারও বলছি, প্রথমবারের ডেটিং হিসেবে আমাদের এই সাক্ষাৎ কিন্তু অনন্য; তারপরও আপনার সঙ্গে হুট করে কোনো মোটেলে গিয়ে ঘণ্টাখানেক সময় কাটাতে পারবো কি না সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না, মিস্টার পোর্টার।'

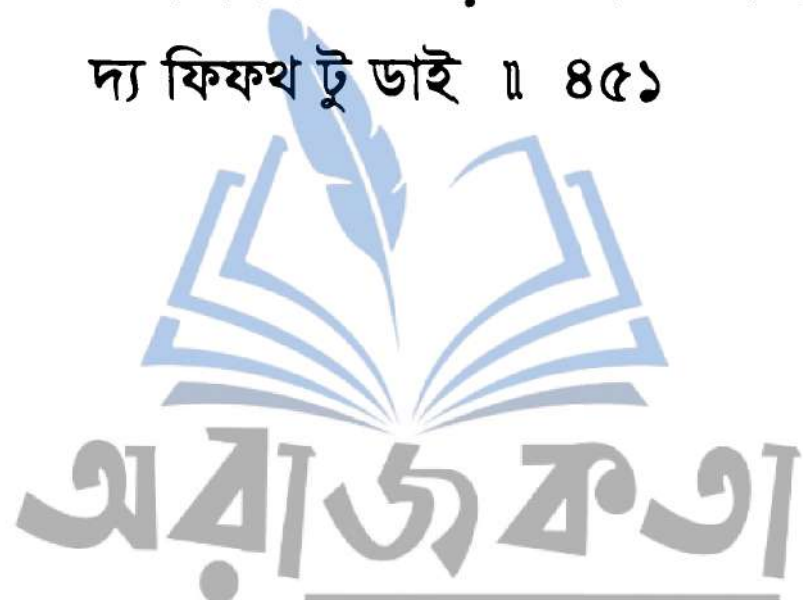
লেকের কিনারায়, লাঞ্চবক্সের ভেতর থেকে বেঁধে-রাখা-অবস্থায় যা-যা পাওয়া গেছে, গাড়ির সেন্টার কনসোলে রেখে দেয়া হয়েছে ওসব। অনুজ্জ্বল আলোয় খামের গায়ে "মা" শব্দটা পড়া যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। আর সেই কম্পোজিশন বুক থেকে যেন শোনা যাচ্ছে বিশপের কণ্ঠ... ওই লেকের প্রতিটা শব্দ, যেন চিৎকার করে কথা বলছে লোকটা।

ডিনার।

নিউ অরলিন্সের পর পেটে দানাপানি বলতে আর কিছু পড়েনি ওদের।

পাকস্থলীর ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল পোর্টারের।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৫১



অরাজকতা



ত্রিশ মিনিট পর।

খিনভিল এয়ারপোর্ট মোটেল এইট-এর ছোট একটা রুমে, দুটো ডাবল বেডের একটার এককোণায় বসে আছে পোর্টার। দোকান থেকে কেনা খাবারের কিছু মোড়ক পড়ে আছে দরজার কাছে একটা টেবিলের ওপর। সারা গিয়ে ঢুকেছে বাথরুমে, গোসল সেরে নিচ্ছে।

ওই প্যাকেটটা... ওটা বেশ ভারী অনুভূত হচ্ছে পোর্টারের কাছে। যতখানি ভারী অনুভূত হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে। এমন না যে, কাগজের ওজনই অনেক বেশি। বরং অন্য কিছু একটার ওজন বেশি বলে মনে হচ্ছে। পোর্টার ওর আঙুল ছোঁয়াতে পারছে না ওই জিনিসে। মনে হচ্ছে, ওটার ভেতরে কোনো একজনের জীবন আটকা পড়ে গেছে কোনো একটা ফাঁদে।

অথবা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে কোনো এক বদ্ধ উন্মাদের বকবকানি, ভাবল সে।

ডায়েরিটা প্রথমবার যখন পড়েছিল সে, তখন সে-রকমই মনে হয়েছিল ওর। কিন্তু ঘণ্টা দু'-এক আগে সে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এমন এক জায়গায়, ডায়েরিতে বর্ণিত সব ঘটনা ঘটে গেছে যেখানে।

কার্টার দম্পতি।

বিশপের মা।

বিশপের বাবা।

আরও দু'জন মানুষ। পোর্টার পরে নাম জেনেছে ওই দু'জনের... কার্বি এবং ব্রিগস।

তারা সবাই।

প্রতিটা মানুষের বর্ণনা সত্যি। ডায়েরিতে বর্ণিত প্রতিটা ঘটনা সত্যি।

কালো রঙের একটুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে ওই এনভেলপ এবং কম্পোজিশন বুকটা। একটা কথা না ভেবে পারছে না পোর্টার... বিভিন্ন মেয়েকে খুন করার পর তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা সাদা বাক্সে ভরে কালো দড়ি দিয়ে সেসব বাক্স বেঁধেছিল বিশপ; সেসব দড়ি যে-বাড়িলের ছিল, এই কালো দড়িও কি ওই একই বাড়িলের?

আনমনে, আলগোছে দড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। বিশপের মায়ের উদ্দেশে লেখা খামটা খুলল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিছু কাগজ। ওর আঙুলের চাপে কেমন যেন মচমচ আওয়াজ করে উঠল ওগুলো।

এই খামের ভেতরে কতদিন ধরে আছে কাগজগুলো?

এই চিঠি কতদিন ধরে পড়ে আছে এমন এক মায়ের জন্য, যে-মহিলাকে আর কখনও দেখেনি কেউ?

হাতের লেখাটা চিনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না পোর্টারের। ডায়েরির সেই হাতের লেখাই... তবে সে-লেখার আরও ছোটবেলার সংস্করণ বলা যেতে পারে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৫২

মান্নি। আমি জানি, তুমি সবসময় চেয়েছ, আমি যাতে মা বলে ডাকি তোমাকে। কিন্তু আমি আবার তোমাকে শুধু মান্নি বলে ডাকতে চেয়েছি। আমার সেই চাওয়া কি অনেক ভুল কোনোকিছু হয়ে গেছে?

মান্নি

মান্নি

মান্নি

মান্নি।

দুঃখিত, মা।

আমি আসলে খুবই দুঃখিত। আমাকে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তুমি, এবং আমারই কিছু কাজের কারণে সে-সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলে। আমি আমার সেসব কাজের জন্য খুব দুঃখিত। আমার যেসব কাজের কারণে আমাকে সজ্ঞা না নিয়েই পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে তুমি, সেসব কাজের জন্য আমি সত্যিই খুবই দুঃখিত।

তুমি কি এজন্য চলে গিয়েছিলে যে, তোমার আর কোনো উপায় ছিল না?

ওই লোকগুলো এসে হাজির হয়েছিল আমাদের বাসায়, আর সেজন্যই কি চলে যেতে হয়েছিল তোমাকে? চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় কি ছিল না তোমার?

মূল কারণ সেটাই, তা-ই না?

নইলে তো আমাকে ওভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার কথা না তোমার। যেভাবে চলে গিয়েছিলে তুমি, সেভাবে চলে যাওয়ার কথা না।

সেদিন লেকের কিনারা থেকে বাসায় ফিরে যেতে সত্যিই বড় বেশি দেরি করে ফেলেছিলাম আমি। যদি আরও তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারতাম, তা হলে হয়তো আমাকে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়তে বলতে তুমি। তার আগে চটজলদি গুছিয়ে নিতাম আমার ব্যাগটা। তারপর আমরা সবাই মিলে চলে যেতে পারতাম। নতুন একটা জীবন একসঙ্গে শুরু করতে পারতাম আমি আর তুমি দু'জনে। গাড়ির রিয়ারভিউ মিররে যেমন কোনো প্রতিবিম্ব দেখি আমরা, এই জীবনকে সেভাবে পেছনে ফেলে যেতে পারতাম।

এই চিঠি লিখতে চাইনি আমি। কিন্তু ডাক্তার আমাকে বললেন, চিঠিটা নাকি লেখা উচিত আমার। আশ্বাস দিয়ে আরও বললেন, এটা নাকি পড়বেন না তিনি। কিন্তু আমি জানি, কাজটা করবেন তিনি আসলে। কেউ যখন মিথ্যা বলে, তখন সেটা

দ্য ফিক্স টু ডাই ৷ ৪৫৩



অরাজকতা



কীভাবে ধরে ফেলতে হয়, সে-শিক্ষা আমাকে দিয়েছিলেন বাবা। এবং একজন খুব ভালো মিথ্যুক বলতে যা বোঝায়, ডক্টর জোসেফ অগলেসবি সে-রকম কেউ না। কিন্তু নিজের ব্যাপারে তাঁর ধারণা সে-রকমই। আসলে তা না, মোটেও না। তিনি যখন গুল মারেন, তাঁর মড়ার-মতো দু'চোখ কুঁচকে যায়। তাঁর সঙ্গে শেষ যে-সেশন করেছি আমি, তখন বত্রিশবার ঘটেছে ও-রকম ঘটনা।

হ্যালো, ডক্টর।

আপনার চুল কাটা উচিত। আপনার মাথায় টাক পড়ে গেছে, সেটা ঢেকে রাখার জন্য বিশেষ কায়দায় চুল আঁচড়ান আপনি, কিন্তু ভাববেন না, আপনার ওই কায়দায় বোকা বনে যাবে অন্যরা। ওভাবে চুল আঁচড়ালে দেখতে হাবাগোবা লাগে আপনাকে।

আমি দুঃখিত।

এসব কথা আসলে বলা উচিত না আমার।

বাবা আরও ভালো শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাকে।

তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, কারও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া ভালো। অতিরিক্ত প্রশংসা করা হলে বেশিরভাগ লোকই সে-প্রশংসায় সাঁতরাতে শুরু করে; বাবা বলেছিলেন, ওসব লোক হাবুডুবু খেতে শুরু করার আগে তাদেরকে ওভাবেই থাকতে দেয়া উচিত। বলেছিলেন, একসময় তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে তারা, শক্ত করে ধরবে তোমার হাত, তারপর সারাজীবনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে তোমার।

কিন্তু, মা, তুমি কখনও ও-রকম কোনো কাজ করেনি। তুমি যদি কখনও টের পেতে, আমি কাউকে অনেক বেশি প্রশংসা করছি, তা হলে সেসব ফিরিয়ে নিতে বলতে আমাকে।

কতই না আলাদা ছিলে তুমি আর বাবা।

সম্পূর্ণ আলাদা ছিলে।

বাবা।

ওহ, আমার বাবা।

আসলে ওই ব্যাপারে এখন কিছু লেখা সম্ভব না আমার পক্ষে। জানি, ডক্টর অগলেসবি চান, আমি যেন কিছু না কিছু লিখি ওই ব্যাপারে। কিন্তু সেটা সম্ভব না আমার পক্ষে। কারণ খুব কষ্ট লাগে আমার। লেকের কিনারায় আমার বেড়ালটা যেখানে পড়ে ছিল, সে-জায়গার নিচে একটা গর্ত খুঁড়তে যতখানি কষ্ট লেগেছিল, ততখানি খারাপ লাগে। ওই জায়গায় আমার ছুরিটা খুঁজে পেয়ে যতখানি খারাপ লেগেছিল, ততখানি খারাপ লাগে।

ওই ছুরির মানে কী, জানা আছে আমার।
আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে তুমি, মা।
অথচ আমি আজও বিশ্বাস করতে চাই, কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে
করেনি তুমি। বিশ্বাস করতে চাই, আমাকে রেখে ওভাবে
পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না তোমার। অথচ জানি, আমি
যা ভাবছি তা আসলে সত্যি না।
যে-মুহুর্তে ওই ছুরি দেখতে পেয়েছিলাম, কথাটা তখনই
জানা হয়ে গিয়েছিল আমার।
মা, আমাকে তুমি এত ঘৃণা করো কেন?
বাবাকে তুমি এত ঘৃণা করতে কেন?

আমাদের বাসায় যখন আগুন লাগল... ওই আগুনের ঘটনাটা কি
মনে আছে তোমার? যা হোক, বিশেষ সেই ঘটনার পর আমাকে
নিয়ে আসা হলো ক্যামডেন ট্রিটমেন্ট সেন্টারে। জায়গাটা
চার্লসটনের ঠিক বাইরে।

এখানকার লোকজন খুব ভালো। এমনকী ডক্টর অগলেসবি,
যিনি কিনা এত মিথ্যা কথা বলেন, তিনিও ভালো। আমার জন্য
আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁরা। একটা জানালা
আছে এই ঘরে। কিন্তু সেটা খোলে না। আর তাই গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ
বাতাস এসে ঢোকে না আমার এখানে। আমি শুধু শুনতে পাই
এয়ার কন্ডিশনারের একটানা গুঞ্জনধ্বনি।

ডক্টর অগলেসবি একদিন আমাকে বললেন, আমি যেন
ডায়েরি লিখতে শুরু করি।

সাদা-কালো একটা কম্পোজিশন বুক দিলেন তিনি আমাকে।
বললেন, ওটা নাকি নিখুঁত একটা ডায়েরি হতে পারে।

আমি তাঁকে বললাম, ডায়েরি নামের জিনিসটা লেখে শুধু
মেয়েরা। তখন তিনি আমাকে বললেন, রোজনামচা লিখতে।
বললেন, ছেলেরা নাকি ওটা লিখে।

আমি তখন তাঁকে বললাম, ভেবে দেখবো।

আসলে আমি কিন্তু চালাক-চতুর একটা ছেলে। জানি, এই
যে আমাকে রোজনামচা লিখতে বলছেন তিনি, তাঁর আসল
উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার পেট থেকে কথা বের করা... যাতে তিনি
পড়ে নিতে পারেন সেসব। যাতে তিনি আরও ভালোমতো বুঝতে
পারেন আমাকে।

ওই কাজ কি অনেক বড় কোনো ভুল?

কেউ যদি আমাকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করে, তা হলে সেটা কি
বড় কোনো ভুল হয়ে যায়?

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৫৫



অরাজকতা



চিন্তা কোরো না, মা। তোমার গোপন কথাগুলো বলবো না
আমি ওই লোককে।

তোমার গোপন কথাগুলো আমার কাছে নিরাপদ।
বলা ভালো, তোমার বেশিরভাগ গোপন কথা আমার কাছে
নিরাপদ।
তোমার ভালোবাসার ছেলে,
এবি

পুনশ্চ, মিসেস কাটারকে বোলো, তাঁকে হ্যালো জানিয়েছি
আমি। হ্যালো বলেছি লম্বা বাদামি চুলের সেই লোককেও। আমি
নিশ্চিত, কোনো একদিন আবার দেখতে পাবো তোমাদের
সবাইকে। সেদিন পর্যন্ত নিজের ছুরিটা হাতের কাছেই রাখবো।
এবং ধারালো অবস্থায় রাখবো। ছুরিটা আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার
জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

‘ভালো কোনোকিছু পাওয়া গেল?’
মুখ তুলে তাকাল পোর্টার।
বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সারা। পরনে সাদা একটা টাওয়েল।
লম্বা চুলে জড়িয়ে নিয়েছে আরেকটা টাওয়েল। এই কাজ কীভাবে করা সম্ভব, তা
কেবল জানে মেয়েমানুষরা। সারার পেছন থেকে ধোঁয়া উঠছে।
পোর্টার টের পেল, সারার রোদেপোড়া চামড়ার পা দুটোর দিকে তাকিয়ে
আছে সে। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তাকাল ওই মহিলার চেহারার দিকে।
‘আমার মনে হয় কাপড় পরে নেয়া উচিত।’
‘না। হ্যাঁ। মানে, দেরি না করে কাপড় পরে নিন। আমি যাই, গোসলটা সেরে
নিই।’ ঢোক গিলল পোর্টার। টের পেল, চেহারাটা জ্বালাপোড়া করছে ওর।
এটা হাই স্কুল না। নিজেকে সামলাও।
আরেক দিকে তাকাল পোর্টার। ওই কম্পোজিশন বুকের ওপর ফেলে দিল
চিঠিটা। হাজির হলো ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায়, ঢুকে পড়ল
বাথরুমে। নিজের পেছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা।
একটু আগে কেমন যেন লাইলাক ফুলের মতো ঘ্রাণ আসছিল সারার গা
থেকে।

৯২.
পোর্টার
চতুর্থ দিন, ভোর ৩:৪২

জানালার পাশের সিটে বসে পড়ল সারা।

দেখে বিধ্বস্ত বলে মনে হচ্ছে ওকে।

ওর পাশের সিটে ধপাস করে বসে পড়ল পোর্টার। টের পেল, সিট বেল্টের ওপর বসেছে। যতখানি সম্ভব উঠে দাঁড়াল, সিট বেল্টের দুটো প্রান্ত খুঁজে বের করল। বসে পড়ল আবার। সিট বেল্ট বাঁধল।

ওকে দেখছে সারা। সেইসঙ্গে দাঁত বের করে হাসছে নিঃশব্দে। ‘আপনি কি আসলেই মনে করেন, এই প্লেন যদি অ্যালাবামার কোনো জায়গায় নাকটা নিচের দিকে দিয়ে জমিনে আছড়ে পড়ে, ফালতু ওই বেল্ট সেক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে?’

‘আমি চাই না, অ্যাটেনডেন্ট এসে হাজির হোক এখানে, তারপর চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিক আমার সঙ্গে। আপনি যদি ওই মানুষগুলোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন, সব নিয়মকানুন যদি ঠিকমতো মেনে চলেন, তা হলে এক কাপ সোডার বদলে পুরো এক ক্যান দেয় তারা কখনও কখনও।’

মুখ খুলল সারা, কিছু একটা বলতে চাইছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করল। হেলান দিল সিটে। বুজে ফেলল চোখ। ‘আমরা জায়গামতো পৌঁছানোর পর ঘুম থেকে ডেকে দি যেন আমাকে, ডিটেকটিভ স্যাম পোর্টার।’

‘ধন্যবাদ।’

‘কীসের জন্য?’

‘আমার সঙ্গে আসার জন্য। ভেবেছিলাম, এই কাজ আমি একাই করবো। কিন্তু আপনি সঙ্গে আসায় আরও ভালো হয়েছে,’ মহিলাকে বলল পোর্টার।

‘আপনি যখন একা, তখন এই জীবনে খুব কম জিনিসই আপনার জন্য ভালো।’

‘সেটা অনুধাবন করতে শুরু করেছি আমি।’

‘আপনার কাজে লাগতে পেরেছি, সেজন্য আমি খুশি,’ কেমন অস্থির কণ্ঠে বলল সারা। ‘পাই হলেই চলবে আমার।’

‘কী?’

‘আমাকে আরও পাই খাইয়ে দি যেন, তা হলেই হবে।’

‘এই প্লেনে যে পাই আছে, জানা ছিল না আমার।’

‘প্লেনের কথা বলিনি। আমরা ল্যান্ড করার পর খাইয়ে দিলেই চলবে।’

‘ঠিক আছে। এবার ভালোমতো ঘুমান, মিস ওয়ার্নার।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৫৭





যেভাবেই হোক না কেন, কাজটা করতে পারল সারা। কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্লাইটটা দুই-তৃতীয়াংশও পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি। পোর্টারের পাশের সিটটা খালি।

প্রেনটা বাতাসে উড়াল দেয়ার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করল স্যাম। তারপর ছালিয়ে দিল মাথার ওপরের ছোট লাইটটা। খুলল কম্পোজিশন বুকের প্রথম পাতা। অন্য সবকিছুকে ঘেন গায়েব করে দিচ্ছে বিশপের লেখা শব্দগুলো।

৯৩. ডায়েরি

‘আরাম লাগছে তো তোমার, অ্যানসন?’

আমার উদ্দেশ্যে হাসলেন ডক্টর অগলেসবি। তবে সে-হাসি আসল না। লোকের মুখে এ-রকম মেকি হাসি সাধারণত দেখা যায় কোনো ডিনার পার্টিতে। অথবা দেখা যায় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে টাকা সংগ্রহ করার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে। অথবা দেখা যায় পুরস্কার-বিতরণীতে। যে-মানুষটা হাসছেন, তিনি যে-মুহুর্তে চলে যান কোনো বন্ধ দরজার আড়ালে, যে-মুহুর্তে চলে যান উৎসুক কিছু দৃষ্টির আড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হয়ে যায় ও-ধরনের হাসি। আমি কখনও কোনো ডিনার পার্টিতে যাইনি। টাকা সংগ্রহ করার জন্য আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানেও যাইনি। এমনকী কোনো পুরস্কার বিতরণীতেও অংশ নিইনি। তবে এসব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পড়েছি। মা একবার “পিপল ম্যাগাজিন”-এর একটা কপি কিনে এনেছিলেন বাসায়। সেটার অনেক পৃষ্ঠা ভর্তি হয়ে ছিল এ-রকম মেকি হাসিতে। এ-রকম হাসিতে বিনয় আছে বটে, কিন্তু সেটা ফাঁপা।

‘গলা ভেজানোর জন্য কিছু নেবে?’

‘না, স্যর।’

‘আহা কী বিনয়ী ছেলে,’ বললেন ডক্টর অগলেসবি। হাতেধরা ক্লিপবোর্ডের কাগজে কিছু টুকে রেখেছেন তিনি, তাকালেন সেদিকে। ‘সপ্তাহখানেক ধরে আছ তুমি আমাদের এখানে। অথচ তারপরও আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা একজন আরেকজনকে ঠিকমতো চিনি না।’

দশাসই বলতে যা বোঝায়, ডক্টর অগলেসবি মোটেও সে-রকম কেউ না। আমার চেয়ে বড়জোর এক কি দু’ইঞ্চি লম্বা হবেন। সবাই তাঁকে ডাকে “ডক্টর” বলে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁকে একবারের জন্যও সাদা কোনো ল্যাব কোট পরতে দেখিনি আমি। আজ তিনি পরেছেন ধূসর কালচে একটা আর্গাইল সোয়েটার। সঙ্গে খাকি প্যান্ট। তাঁর ওজন একটু বেশি। পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন তিনি, তাঁর পেটের চারপাশে যে-চর্বি আছে সেসব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্যান্টের ওপর দিয়ে। তবে... ওই চর্বির পরিমাণ খুব বেশি না। মানুষটা সম্ভবত প্রতি সপ্তাহে কয়েক দিন ব্যায়াম করেন। তবে সে-ব্যায়ামের পরিমাণ সামান্য।

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৫৯





তাঁর ওজন বাড়তে চায়, শরীর মোটা হতে চায়, কিন্তু তিনি নিজের স্থূলত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। এই মুহূর্তে একটা কথা না ভেবে পারছি না আমি... আগামী দশ বছর পর ওই মানুষটাকে দেখতে ঠিক কেমন লাগবে। ল্যাব কোটের ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত কি বদল করবেন তিনি? আমি যদি কোনো ডাক্তার হতাম, অবশ্যই সাদা ল্যাব কোট গায়ে দিতাম।

যা হোক, ডক্টর অগলেসবির অফিসটা বড় একটা বাক্সের মতো।

হালকা ধূসর একটা রঙ করা আছে দেয়ালে। একদিকের দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ডক্টর অগলেসবির বিভিন্ন ডিগ্রি। ঝুলছে তাঁর বিভিন্ন ফটোগ্রাফও। সেসব ছবিতে তিনি মেকি হাসি হাসছেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানো অন্য কিছু লোকও করছে ওই একই কাজ। এই ক্যামডেন ট্রিটমেন্ট সেন্টারের বেশিরভাগ ডেস্ক কাঠে বানানো না। তবে ডক্টর অগলেসবির ডেস্কটা আবার কাঠ দিয়ে বানানো। খুব সম্ভব ওই জিনিস তিনি নিজে কিনেছেন। এই সেন্টারের বেশিরভাগ ডেস্ক বানানো হয়েছে একজাতের ধূসর ধাতু ব্যবহার করে।

ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে আছি আমরা, মুখোমুখি অবস্থায়। দেয়ালে যেসব ডিগ্রি প্রোগ্রাম ঝোলানো আছে, সে-রকম কোনো একটা প্রোগ্রামে আমাদের ডাক্তার সাহেবকে বোধহয় বলা হয়েছিল, সমান সমান অবস্থায় রোগীর মুখোমুখি হওয়া ভালো। আর তাই ডেস্কটার পেছনে চামড়ায় মোড়া দামি ও আরামদায়ক যে-চেয়ার আছে, সেটা বাদ দিয়ে তিনি চলে এসেছেন আমার সামনে... যাকে বলে কিনা আমজনতার কাতারে।

মেঝেতে টাইলস করা আছে। সে-মেঝের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে বিছানো আছে প্রাচ্যদেশীয় একটা রাগ। কিন্তু আমার ধারণা, এই রাগও আসলে নকল। আসল প্রাচ্যদেশীয় রাগ বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো জিনিস কখনও দেখিনি আমি। কিন্তু এখন চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, সেটাতে এমন কিছু একটা আছে যে, ওটা যেন চোঁচিয়ে জানান দিচ্ছে: “আমি নকল, আমি নকল!” হতে পারে, ওই জিনিসের দূরের এক কোনায় রহস্যময় একটা দাগ লেগে আছে, আর সে-কারণেই ওটা মেকি বলে মনে হচ্ছে আমার। একটা পাত্রে ফার্ন গাছ লাগানো আছে, আর সে-পাত্র রাখা হয়েছে বিশেষ ওই দাগের ওপর; পাত্রটার কারণে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে দাগটা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৬০

‘এক সপ্তাহ,’ বিড়বিড় করলেন ডক্টর অগলেসবি। কোলের ওপর রাখা ক্লিপবোর্ডে টোকা দিলেন। ‘তুমি কি কোনো ওষুধ খাচ্ছ, অ্যানসন? মানে... এখানে আসার আগের কথা বলছি আর কী। কোনো ওষুধ-টষুধ খেতে নাকি আদৌ?’

এই প্রশ্ন আমাকে আগেও জিজ্ঞেস করেছেন তিনি। সত্যি বলতে কী, এই নিয়ে প্রশ্নটার চারবার জানতে চেয়েছেন। অন্য যে-ক’বার যে-জবাব দিয়েছি আমি, এবারও তা-ই বললাম।

‘না।’

‘তোমাকে কেন যেন নার্ভাস বলে মনে হয়। মনে হয়, তুমি যেন ঘাবড়ে আছ কোনো কারণে। মনে হয়, অনেকদিন ধরে কোনো একটা ওষুধ খাচ্ছিলে, সেটা ছেড়ে দেয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছ এখন, আর তাই কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে তোমার মধ্যে। তোমার ফাইলে কয়েকজন নার্স এই মন্তব্য লিখেছে। আরও দেখা গেছে, রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে ঘাম হয় তোমার। শুধু তা-ই না, কখনও কখনও ঘুমের মধ্যে কাঁপতে থাকে তোমার শরীর। এ-সবকিছু কিন্তু ওষুধ ছেড়ে দেয়ার লক্ষণ।’

কিছু বললাম না আমি।

‘আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি ক্লোরপ্রোমাজিন খেতে? নাকি ফ্লুফিনাজিন খেতে? কেউ কেউ কিন্তু আবার হ্যালোপেরিডল অথবা লক্সাপাইনও খায়।’

আমি মুখে তালো মেরে রেখেছি।

‘হ্যালোপেরিডল? দেখো, আমি যখন নামটা উচ্চারণ করলাম, তোমার বাঁ চোখের নিচে একটুখানি জায়গা খানিকটা কুঁচকে উঠেছিল। বিশেষ সেই ঘটনা আমাকে কী বলে দিয়েছে, জানো? বলেছে, ওই ওষুধের কথা জানা আছে তোমার। এখন বলো তো, তোমার সমান বয়সের একটা ছেলে কেন ও-রকম কোনো ওষুধের নাম জানবে? হ্যাঁ, জানতে পারে... যদি ওই ওষুধ ছেলেটাকে খেতে দেয় কোনো ডাক্তার। জানতে পারে... যদি ওষুধের বোতলে বিশেষ সেই নাম প্রতিদিনই দেখতে পায় ছেলেটা।’

টের পাচ্ছি, লাল হয়ে গেছে আমার চেহারা। দম নিলাম লম্বা করে।

‘হ্যালোপেরিডল এমন এক ওষুধ, যেটা চাইলেই হুট করে ছেড়ে দেয়া যায় না পুরোপুরি। যদি কোনো ডাক্তার চান তাঁর রোগীর ওপর থেকে এই ওষুধ সরিয়ে নেবেন, অথবা ওষুধের মাত্রা কিছু কম-বেশি করবেন, তা হলে বেশ লম্বা একটা সময় ধরে

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৬১



অরাজকতা



করতে হয় কাজটা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার যোগ করতে হয় অন্য একটা কম-ক্ষতিকর ওষুধ। তবে সেটা করতে হয় অস্থায়ীভাবে। ফলে কী হয়, জানো? হ্যালোপেরিডলের ক্ষতির মাত্রাটা কমে আসে।’

ডক্টর জোসেফ অগলেসবি চশমা পরেন। তবে সে-চশমার কাচ তত পুরু না। আর তাই একটা কথা না ভেবে পারছি না আমি। ওই চশমা কি আসলেই দরকার তাঁর? তাঁকে দেখলে মনে হয়, তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি কিনা নিজের ডাক্তারি ভূমিকাটা একটু জোরালো করার জন্য... ওই ভূমিকায় আরেকটু ভালোমতো অভিনয় করার জন্য চশমা চোখে দেন। রূপালি একটা চেইন দিয়ে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে রাখেন তিনি ওই চশমা। একটু পর পর পরেন ওটা, একটু পর পর খোলেন। চেইনের সাহায্যে চশমা চোখে দেয়ার তাঁর এই ভঙ্গি দেখে লাইব্রেরিয়ানদের কথা মনে পড়ে যায় আমার। তবে ডাক্তার অগলেসবি কোনো লাইব্রেরিয়ান না। যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাঁর যেসব বুকশেল্ফ আছে, সেসবের বইগুলোতে ভালোই ধুলো জমেছে।

‘হ্যালোপেরিডল সেবন করছে, এ-রকম কোনো রোগীর ওষুধ যদি ছুট করে বন্ধ করে দেয়া হয়, তা হলে কী হতে পারে, জানো? অনিদ্রা রোগ শুরু হয়ে যেতে পারে বেচারার। সেইসঙ্গে সে ভুগতে পারে অস্থিরতায়। মাথা ঝিমঝিম করা অথবা মাথা ঘোরানো তো আছেই। খিঁচুনি হতে পারে। এমনকী হ্যালুসিনেশনও হতে পারে। খেয়াল করেছ, কীভাবে পা নাচাচ্ছ তুমি? ওটা কিন্তু সুস্পষ্ট একটা লক্ষণ। আচ্ছা, অ্যানসন, একটা কথা বলো তো। তুমি যে ওষুধ খেতে চাও না, সেটার কি বিশেষ কোনো কারণ আছে? আর সে-কারণেই কি মিথ্যা কথা বলছ আমার সঙ্গে?’

পা নাচানো বন্ধ করলাম আমি। কখন যে ও-রকম করছিলাম, টেরই পাইনি।

আর কখনও করবো না ও-রকম কোনো কাজ।

হাতেধরা কলমের ডগাটা নিজের ঠোঁটের কাছে তুললেন ডাক্তার। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তারপর তাঁর সেই ফাইলে কিছু একটা লিখলেন। ‘মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে। অথচ এর মধ্যেই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। তারপরও ওই ওষুধ নতুন করে শুরু করার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি এই মুহূর্তে। যদি ওটার কোনো প্রয়োজন কখনও বোধ করো

তুমি, বোলো আমাকে। তখন না হয় ওই ওষুধের প্রয়োজনীয়তা
নিয়ে কথা বলা যাবে তোমার সঙ্গে।’

সম্মতি জানানোর কায়দায় মাথা ঝাঁকাতে চাইনি আমি,
তারপরও করলাম কাজটা।

পাতলা আর মেকি সেই হাসি আবারও দেখা দিল তাঁর
ঠোঁটের কোনায়।

দ্য কিংডম টু ডাই । ৪৬৩



অরাজকতা



৯৪.

ডায়েরি

‘আগুন লাগার সেই ঘটনাটা নিয়ে কথা বলার জন্য তুমি কি প্রস্তুত, অ্যানসন?’

আমি পা নাচানো বন্ধ করার আগেই সে-দৃশ্য দেখে ফেললেন তিনি। হাঁটুর ওপর একটা হাত রাখলাম আমি।

‘তোমাদের সেই বাড়ির ভেতরে কত লাশ পাওয়া গেছে, জানা আছে তোমার?’

আবারও নাচতে চাইছে আমার পা-টা, কিন্তু সেটা ঘটতে দেয়া যাবে না।

‘তিন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশ ভালো একটা যোগাযোগ হয়েছিল আমার... তুমি যখন থেকে এখানে থাকছ আমাদের সঙ্গে, তার পর। অথচ আজ পর্যন্ত একটা কোনো লাশের প্রকৃত শনাক্তকরণ করতে পারেনি তারা। কারণ পুড়ে গিয়ে খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে প্রতিটা লাশেরই। আর তাই এখন তাঁরা কাজ করছেন ডেন্টাল রেকর্ড নিয়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বিশেষ সেসব রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করার মতো কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কঠিন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছেন বেচারারা। তাঁরা এখন অপেক্ষা করছেন যে-কোনো একটা ঘটনার জন্য... হয় কেউ একজন গিয়ে হাজির হবে কোনো পুলিশ স্টেশনে, কোনো মিসিং রিপোর্ট দাখিল করবে, নয়তো দাঁতের সেই রেকর্ড থেকে কোনো না কোনো ম্যাচ পাওয়া যাবে। আমাদের শেষ ভরসা হচ্ছে তুমি নিজে। তুমি হয়তো আমাদেরকে এমন কোনো তথ্য দিতে পারবে, যার ফলে আমরা শনাক্ত করবে পারবো লাশ তিনটা। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, ওই লোকগুলো আসলে কারা, সেটা জানা আছে তোমার। এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছেন তাঁরা। কিন্তু যাকে বলে কিনা মাইনর... মানে, অপ্রাপ্তবয়স্ক... তুমি এখনও তা-ই। আরও বড় কথা, তুমি এখন আমার তত্ত্বাবধানে আছ। আর তাই আমি তাঁদেরকে ওই কাজ করার অনুমতি দিতে পারি না। তবে এই ব্যাপারটা কিন্তু বদলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাকে শুধু যা করতে হবে তা হলো, দুটো ফর্মে স্বাক্ষর করতে হবে, আর তারপরই তাঁরা ঢুকে পড়তে পারবেন এখানে। তারপর তাঁরা তোমাকে নিয়ে যাবেন এমন কোনো জায়গায়, যেখানে নিয়ে গিয়ে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৬৪

তোমার ওপর জোর খাটাতে পারবেন, তোমার পেট থেকে কথা বের করে নিতে পারবেন। সে-রকম কোনো জায়গা যে ভালো কোনো কিছু, সেটা কল্পনাও করতে পারি না আমি। মনেপ্রাণে ঘৃণা করি, তোমার মতো কমবয়সী কোনো ছেলের সঙ্গে সে-রকম কোনো ঘটনা ঘটুক। কিন্তু ও-রকম কোনো ঘটনা যে খুব বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে আমার পক্ষে, তা-ও না। অ্যানসন, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলতে কী বোঝায়, জানা আছে তোমার?’

জানি আমি। যেসব কমিক বই পড়তাম, সেসবে প্রায়ই দেখা মিলত ও-রকম কিছু মানুষের। কিন্তু সে-কথা বলা যাবে না ডাক্তার অগলেসবিকে। তাঁকে কোনো কিছু বলারই কোনো ইচ্ছা নেই আমার।

‘অ্যানসন, যে-তিনজন মানুষের লাশ পাওয়া গেছে, তাঁদের একজন কি তোমার বাবা?’

আমার পা আর নাচছে না। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার অগলেসবি। আমার মনে হচ্ছে, কোনো একটা হুঁদুরের দিকে যেন তাকিয়ে আছে একটা বাজপাখি।

‘তোমাদের সেই বাসার ভেতরে যে-তিনটা লাশ পাওয়া গেছে, তিনজনই পুরুষমানুষ। ওদিকে পুলিশ বলছে, আগুন লাগার পর থেকে আর কাজে যাননি তোমার বাবা। আর তাই তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে, ওই আগুনে পুড়ে মারা গেছেন তিনি। তোমার মাকে নিয়েও বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে তারা। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে তা হলো, গায়েব হয়ে গেছেন তিনিও। সত্যি কথাটা যদি বলি তোমাকে... পুলিশ আসলেই বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। আমার কী ধারণা, জানো? আমার ধারণা, পুলিশের কারও কারও বিশ্বাস, তোমার মা-ই সেই আগুন লাগিয়েছেন। তার আগে কোনো একজাতের অ্যাক্সিলারেন্ট... মানে, আগুনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে এ-রকম কোনো দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল তোমাদের সারা বাড়িতে। এবং সেটা খুব সম্ভব গ্যাসোলিন। আমাকে যা বলা হয়েছে, তোমাদের পুরো বাড়ি গ্যাসোলিন দিয়ে একেবারে ভিজিয়ে ফেলা হয়েছিল। তার মানে, চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি কেউ একজন। আচ্ছা একটা কথা বলো তো। তোমার বাবা আর মায়ের মধ্যে কি ভালো সম্পর্ক ছিল? নাকি তোমার মা কোনো কারণে চাইতেন, কোনো না কোনো ক্ষতি হোক তোমার বাবার? আচ্ছা, তোমার বাবা কি তোমার মায়ের গায়ে হাত তুলতেন?’

‘বাবা কখনোই মায়ের গায়ে হাত তোলেননি।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৬৫





কথা বলতে চাই না আমি। জানি, এসব ব্যাপারে কথা বলা উচিত না আমার। কিন্তু কেউ একজন আমার বাবার নামে যা খুঁশী তা-ই বলবে আর আমি চুপ করে সেসব শুনে যাবো... এমনটা হতে পারে না। বিশেষ করে মুখোমুখি বসে থাকা ওই মানুষটা তো না-ই। সত্যি বলতে কী, কেউই না।

‘কিন্তু যখন আগুন লাগে তোমাদের বাড়িতে, তখন তো তোমার বাবা সেখানেই ছিলেন, তা-ই না?’

‘জানি না। আমি তখন লেকে গিয়েছিলাম।’

চশমা চোখ দিলেন ডাক্তার। ঠেলা মেরে নাকের ডগায় তুলে দিলেন সেটা। ‘প্রথমে দমকলকর্মীদের এবং তারপর পুলিশের অফিসারদের তুমি বলেছ, সেদিন নাকি লেকে মাছ ধরতে গিয়েছিলে, আর সে-কাজে তোমার খরচ হয়েছে কয়েক ঘণ্টা। পরে যখন বাসার কাছাকাছি ফিরে আসো, ধোঁয়া দেখতে পাও। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তোমার সঙ্গে মাছ ধরার কোনো সরঞ্জামই ছিল না। ও-রকম কিছু যে আদৌ ছিল তোমার সঙ্গে, সে-নমুনাও দেখা যায়নি লেকের কিনারায়। আর তাই অনেকেরই ধারণা, তুমি মিথ্যা বলেছ।’

‘আমি মিথ্যা বলিনি।’

‘বলেছ তো। ওষুধের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছ আমার সঙ্গে। হ্যালোপেরিডল খেতে তুমি, অথচ বলেছ, খেতে না। ওষুধের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ওটা কিন্তু সাংঘাতিক কিছু একটা।’

‘মিথ্যা কথা বলিনি। এমনি গুল মেরেছি আর কী।’

‘মিথ্যা কথা বলা এবং গুল মারার মধ্যে পার্থক্য কী, অ্যানসন?’

নেচে উঠল আমার পা। তবে সেটা মাত্র একবারের জন্য।

‘অ্যানসন, তোমার মা কোথায় গেছেন, সেটা কি জানো তুমি? মানে, আমি যা বলতে চাইছি...’ যে-আগুনে পুড়ে মারা গেছেন তোমার বাবা, সে-আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোথায় গেছেন তোমার মা?’

মা বাবাকে খুন করেননি। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, ওই আগুন মা লাগাননি। এই কথাটা আমি বলতে চাইছি ডক্টর অগলেসবিকে। চিৎকার করে বলতে চাইছি। চাইছি, একলাফ দিয়ে এই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে। তারপর ছোঁ মেরে কলমটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে। প্রচণ্ড এক ঘা-এ ওই কলম ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে লোকটার গলার গভীরে। দেখতে ইচ্ছা করছে,

কথা বলতে চাহ না আম। জ্ঞান, এসব ব্যাপারে কথা বলা উচিত না আমার। কিন্তু কেউ একজন আমার বাবার নামে যা খুশি তা-ই বলবে আর আমি চুপ করে সেসব শুনে যাবো... এমনটা হতে পারে না। বিশেষ করে মুখোমুখি বসে থাকা ওই মানুষটা তো না-ই। সত্যি বলতে কী, কেউই না।

‘কিন্তু যখন আগুন লাগে তোমাদের বাড়িতে, তখন তো তোমার বাবা সেখানেই ছিলেন, তা-ই না?’

‘জানি না। আমি তখন লেকে গিয়েছিলাম।’

চশমা চোখ দিলেন ডাক্তার। ঠেলা মেরে নাকের ডগায় তুলে দিলেন সেটা। ‘প্রথমে দমকলকর্মীদের এবং তারপর পুলিশের অফিসারদের তুমি বলেছ, সেদিন নাকি লেকে মাছ ধরতে গিয়েছিলে, আর সে-কাজে তোমার খরচ হয়েছে কয়েক ঘণ্টা। পরে যখন বাসার কাছাকাছি ফিরে আসো, ধোঁয়া দেখতে পাও। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তোমার সঙ্গে মাছ ধরার কোনো সরঞ্জামই ছিল না। ও-রকম কিছু যে আদৌ ছিল তোমার সঙ্গে, সে-নমুনাও দেখা যায়নি লেকের কিনারায়। আর তাই অনেকেরই ধারণা, তুমি মিথ্যা বলেছ।’

‘আমি মিথ্যা বলিনি।’

‘বলেছ তো। ওষুধের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছ আমার সঙ্গে। হ্যালোপেরিডল খেতে তুমি, অথচ বলেছ, খেতে না। ওষুধের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ওটা কিন্তু সাংঘাতিক কিছু একটা।’

‘মিথ্যা কথা বলিনি। এমনি গুল মেরেছি আর কী।’

‘মিথ্যা কথা বলা এবং গুল মারার মধ্যে পার্থক্য কী, অ্যানসন?’

নেচে উঠল আমার পা। তবে সেটা মাত্র একবারের জন্য।

‘অ্যানসন, তোমার মা কোথায় গেছেন, সেটা কি জানো তুমি? মানে, আমি যা বলতে চাইছি...’ যে-আগুনে পুড়ে মারা গেছেন তোমার বাবা, সে-আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোথায় গেছেন তোমার মা?’

মা বাবাকে খুন করেননি। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, ওই আগুন মা লাগাননি। এই কথাটা আমি বলতে চাইছি ডক্টর অগলেসবিকে। চিৎকার করে বলতে চাইছি। চাইছি, একলাফ দিয়ে এই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে। তারপর ছোঁ মেরে কলমটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে। প্রচণ্ড এক ঘা-এ ওই কলম ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে লোকটার গলার গভীরে। দেখতে ইচ্ছা করছে,

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৬৬



অরাজকতা



রক্ত কীভাবে বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দেয় তাঁর সেই আর্গাইল সোয়েটার। দেখতে ইচ্ছা করছে, রক্তের ছিটা কীভাবে গিয়ে লাগে মের্কি-হাসির যেসব ছবি ঝুলছে দেয়ালে সেগুলোর গায়ে। কিন্তু করলাম না কাজটা। কিছু বললামও না।

‘মানুষ আজপর্যন্ত ভয়ঙ্কর যেসব ঘটনা জানতে পেরেছে, সেসবের মধ্যে অন্যতম ভয়ঙ্কর ঘটনা কোনটা, জানো? সন্তানকে বাঁচানোর জন্য একজন মা যে কতখানি নৃশংস হয়ে উঠতে পারেন কখনও কখনও, সেটা। আচ্ছা বলো তো, তোমার বাবা কি কখনও খারাপ কোনো উদ্দেশ্যে হাত দিয়েছেন তোমার গায়ে? আর তাই তোমার মা শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন তোমার বাবাকে?’

‘বাবা কখনও ও-রকম কোনো কাজ করেননি।’

‘এখানে নিয়ে আসার আগে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। সেখানে তোমার কিছু শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। শিশু-নির্যাতন বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি তোমার শরীরে। আর তাই ধরে নিচ্ছি, যা বলছ, সত্যি কথাটাই বলছ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও একটা কথা বলতেই হয়... কতটা ভালোভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে তোমাকে, সেটা জানি না আমি। তবে ওই লোকগুলোর ওপর আস্থা আছে আমার। ও-রকম কোনো পরীক্ষা করার যোগ্যতা আমার এখানকার লোকদেরও আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, একটা কাউন্টি হাসপাতালের কর্মীদের দক্ষতা এবং সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি না আমি। ও-রকম কোনো কোনো জায়গা যাকে বলে কিনা বর্বরোচিত। ও-রকম কোনো কোনো জায়গায় যাওয়া মানে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের কোনো তাঁবু-শহরে পা রাখা।’

‘আমি আসলে লেকের পানিতে পাথর ছুঁড়িছিলাম।’

‘কী?’

‘একটু আগে আপনি বললেন, আমি নাকি দমকলকর্মীদের এবং পুলিশের অফিসারদের বলেছি, লেকে মাছ ধরিছিলাম। কিন্তু সে-রকম কোনো কথা কখনও বলিনি আমি। আসলে লেকের পানিতে পাথর ছুঁড়ে মারছিলাম। এই খেলাটা খেলতে ভালো লাগে আমার।’

‘অ্যানসন, পুলিশের রিপোর্টে কিন্তু এ-রকম কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি। মিথ্যা কথা বলা অথবা গুলি মারা দুটোই কিন্তু খারাপ। ও-রকম কোনো কাজ করবে না আমার সঙ্গে।’

‘ওই রিপোর্ট ভুল।’

চশমা খুলে ফেললেন ডাক্তার অগলেসবি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সে-চশমা খসে পড়ল, তারপর আলগাভাবে ঝুলতে লাগল তাঁর গলায়।

তাঁর অফিসে যে-জানালা আছে, সেটাতে কোনো গরাদে নেই। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

‘তুমি কোন স্কুলে পড়ো, অ্যানসন?’

‘মা আমাকে বাসাতেই লেখাপড়া করাতেন।’

‘আসলেই? ইন্টারেস্টিং তো।’

‘কেন?’

‘তুমি এখানে আসার পর দ্বিতীয় দিন তোমার কয়েকটা পরীক্ষা নিয়েছিলাম আমরা, মনে আছে? প্রতিটা পরীক্ষাতেই তুমি খুবই ভালো নম্বর পেয়েছিলে।’

‘পরীক্ষা ভালো লাগে আমার। মজা লাগে।’

‘তার মানে তোমার মা নিশ্চয়ই খুবই বুদ্ধিমতী একজন মহিলা। জীবিকা উপার্জনের জন্য কী করতেন তিনি?’

‘বলেছি তো আপনাকে। প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত আছেন মা।’

কী যেন টুকে নিলেন তিনি ওই ক্লিপবোর্ডে, অথচ নিচের দিকে তাকালেন না। ‘হ্যাঁ, ওই কথা আমাকে আগেও বলেছ বটে, কিন্তু যা বলেছ সে-ব্যাপারে কোথাও কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। কোথায় কাজ করেন অথবা করতেন তোমার মা, জানা যায়নি। না জানা গেছে সাম্প্রতিক কোনো সময়ের জন্য, না জানা গেছে অতীতের কোনো সময়ের জন্য। তোমার বাবা-মা যৌথ ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেছেন। কিন্তু তোমার মা ঠিক কী কাজ করতেন, সেটা উল্লেখ করা হয়নি সে-ফাইলে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কথা তো একটু আগে বলেছি তোমাকে; তাঁর অনুরোধে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস বিস্তারিত কিছু খোঁজখবর করেছে। ওই মানুষটা আসলে একটা বুলডগের মতো। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য রীতিমতো চুলকানি উঠে গেছে তাঁর।’

‘মা এখন কোথায়, জানি না আমি।’

‘আচ্ছা, এই যে তোমাকে এভাবে ফেলে রেখে চলে গেছেন ওই মহিলা, তোমার খারাপ লাগে না? একটু আগে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মায়ের বিশেষ একটা প্রবৃত্তির কথা বলেছি; আর তাই একমাত্র সন্তানকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার ঘটনাটা মেনে নিতে খুব কষ্ট করতে হচ্ছে আমাকে। শুধু যে চলেই গেছেন তোমার মা, তা না, সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... তোমাকে ত্যাজ্য করে দিয়ে গেছেন

দ্য ফিক্স টু ডাই ৯ ৪৬৮



অরাজকতা



তিনি। তোমার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই তাঁর কাছে। আমরা যেভাবে আগের রাতের ময়লা-আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তোমাকে যেন সেভাবে ফেলে রেখে গেছেন তিনি। ঠিক কী কারণে এ-রকম কোনো কাজ করতে বাধ্য হবেন একজন মহিলামানুষ, নিশ্চিত না আমি। এই যে তোমাকে এতখানি ঘৃণা করেন তিনি, ঠিক কী করেছিলে তুমি, বলো তো?’

আমার পা নাচতে শুরু করল আবার। এবার আমি আর থামালাম না সেটা। বরং বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম।

৯৫.

পুল

চতুর্থ দিন, ভোর ৪:৩৮

রাত একটার কিছু পরে গ্রিনফিল্ড-স্পার্টানবার্গ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছিল পুলকে বহনকারী প্লেনটা। এফবিআই-এর লাইসেন্স প্লেটযুক্ত একটা কালো সুবারু ফরেস্টার তখন অপেক্ষা করছিল টারম্যাকে। ওটার ড্রাইভিং সিটে ছিল এসএআইসি রবার্ট গ্র্যাঙ্গার। লাল হয়ে ছিল ওই লোকের দু'চোখ, ঘুমে ভারী হয়ে ছিল।

হ্যান্ডশেক করার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা পুলের উদ্দেশে। জেট প্লেনের ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্ক। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় স্বাগতম।'

এই লোকের বয়স কমপক্ষে পঞ্চাশ হবে, ধারণা করে নেয় পুল। কারণ এসএআইসি হার্লসের বয়স চুয়ান্ন। হার্লস বলেছিল, অ্যাকাডেমিতে থাকার সময় থেকে গ্র্যাঙ্গারের সঙ্গে পরিচয় তার। একজন চুয়ান্ন বছর বয়সী লোকের চেয়ে অনেক বেশি দেখায় গ্র্যাঙ্গারের বয়স। যদি এই লোকের ব্যাপারে কিছু জানা না থাকত পুলের, যদি এই লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যেত ওর, তা হলে লোকটার বয়স আরও বছর দশেক বেশি অনুমান করত সে। মানুষটা গাঁটগোঁটা, দশাসই। টেকো। থুঁতনিতে ঘন ছাগলা দাড়ি আছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল পুলের কাছে। কারণ এফবিআই-এর ড্রেস কোডে এ-রকম দাড়ি রাখার কোনো নিয়ম নেই। কে জানে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য হয়তো ওসব নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

ইঙ্গিতে গাড়ির প্যাসেঞ্জার ডোর দেখিয়ে দিল গ্র্যাঙ্গার। দু'জনই উঠে পড়ল গাড়িতে। ইঞ্জিন চালু করল গ্র্যাঙ্গার, গাড়িটা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছে জেট প্লেনের কাছ থেকে। সিট বেল্ট বেঁধে নিল পুল। টারম্যাক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিকিউরিটি স্টেশনের উদ্দেশে হাত নাড়ল গ্র্যাঙ্গার। এগিয়ে চলেছে হাইওয়ের দিকে। 'তো... ফোর মাস্কি কিলার, না? লোকটা হাজির হয়ে গেছে আমাদের এখানেও?'

'আমাদের ধারণা, এখনও শিকাগোতেই আছে সে। কিন্তু যে-লোকের কথা বলা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে সেটার সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে লোকটার,' গ্র্যাঙ্গারকে বলল পুল।

'ওই ব্যাপারে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাদেরকে। যা হোক, মাঝরাতের কিছু পরে শেরিফ ব্যানিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি আমি শেষপর্যন্ত। মহিলার পুরো নাম হ্যানা ব্যানিস্টার। তাকে দেখামাত্র পছন্দ হয়ে যাবে

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৭০



অরাজকতা



তোমার। আতশবাজি বলতে যা বোঝায়, মহিলা অনেকটা সে-রকম। গত প্রায় বিশ বছর ধরে সিম্পসনভিলের শেরিফের দায়িত্ব পালন করছে। এবং তা-ও আবার বলতে গেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাতে অবশ্য স্থানীয় লোকজনের তেমন একটা আপত্তি নেই। যে-জায়গার কথা বলছি, সেখানে লোকজন খুব বেশি থাকেও না। যা হোক, মহিলা যা বলেছে আমাকে তা হচ্ছে, তার শহরে নাকি দু'জন অভিজ্ঞ ডুবুরি আছে। আর আমাদের শার্লটে আছে তিনজন। ওই পাঁচজনকে একত্রিত করে ফেলেছি আমরা, পাঠিয়ে দিয়েছি তোমার সেই লেকে। বিশেষ সেই জায়গা মোটামুটি চেনে হ্যানা ব্যানিস্টার। বলেছে, যে-বাড়ির কথা বলা হয়েছে, সেটাতে আগুন লেগে গিয়েছিল অনেক বছর আগে, আর তারপর থেকে একরকম খালিই পড়ে আছে পুরো জায়গা। কাছেপিঠে একটা ট্রেইলারও আছে। কিশোর-বয়সে ছেলেছোকরারা যেসব কাজ করে, সেসব করার জন্য ওই বয়সেরই কিছু ছেলেপেলে আজকাল ব্যবহার করে ট্রেইলারটা। তবে সেখানে দেখার মতো তেমন কিছু নেই... আমাকে যা বলেছে ওই মহিলা।’

‘অন্ধকারে কাজ করতে পারবে ডুবুরিরা?’

‘অন্ধকার নামলে যে দমে যায় আমাদের ডুবুরিরা, তাদেরকে দেখলে সে-রকম মনে হয় না। বরং আমি বলবো, সুযোগ পাওয়ামাত্র পানিতে লাফ দেয় তারা।’

‘ওই জায়গা এখান থেকে কত দূরে?’

জবাব দেয়ার আগে ফোনের জিপিএস-এর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিল গ্র্যাঙ্গার। ‘আরও মিনিট ত্রিশেক পথ চলতে হবে আমাদের। দেখে যা মনে হচ্ছে, হাইওয়ে থেকে বেশ ভালোই ভেতরে অবস্থিত ওই জায়গা।’

দু'ঘণ্টা পর।

লেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে পুল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ডুবুরিদের কাজ। একটু পর পর চিৎকার করে নিজেদের ডুবুরি দলের উদ্দেশে এটা-সেটা আদেশ জারি করছে গ্র্যাঙ্গার এবং শেরিফ ব্যানিস্টার (এই মহিলা দেখতে আসলেই আতশবাজির মতো)।

দূরে ভোঁ ভোঁ শব্দে চলছে একটা জেনারেটর। সেটা থেকে বেরিয়ে সাপের মতো ঐক্যেবঁকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে বিদ্যুতের কয়েকটা তার। পানির কিনারায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে বড় বড় কয়েকটা ফ্লাডলাইট। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে কালো ওই জলাশয়।

পানির ওপর মাথা তুলল এক ডুবুরি-মহিলা। তারপর তুলল একটা হাত। ‘আরেকটা পেয়েছি আমি! একুশ ফুট নিচে। যেখানে আছি এখন, ঠিক সে-জায়গা বরাবর। একটা দড়ি লাগিয়ে দিয়েছি ওই জিনিসের সঙ্গে। এবার যুক্ত করে দিচ্ছি

একটা বেলুন।' কোমরের বেল্ট থেকে ছোট একটা ক্যানিস্টার টেনে আলাগা করল চাপ দিল একটা সুইচে। ফটাস করে আওয়াজ উঠল ওই ক্যানিস্টারে। দেখা গেল, উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বেলুন ফুলে উঠতে শুরু করেছে। মহিলার আরেক হাতে ধরা আছে একটা দড়ি। সেটা লাগিয়ে দিল ওই ক্যানিস্টারের সঙ্গে। তারপর ছেড়ে দিল হাত থেকে। পানির উপরিতলে ভাসতে লাগল জিনিসটা।

'ঈশ্বর,' বলল পুলের পেছনে কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যানিস্টার, 'এ-রকম আর ক'টা পাওয়া যাবে?'

ডান দিকে তাকাল পুল। সেখানে একজায়গায়, লেকের তীরে, লাইন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা বডি-ব্যাগ। 'চার। এই নিয়ে এখন পর্যন্ত চারটা হলো।'

'লাশের পুরো শরীর পাওয়া যাচ্ছে? নাকি খণ্ডাংশ?' চিৎকার করে জানতে চাইল গ্র্যাঙ্গার ওই মহিলা-ডুবুরির উদ্দেশে।

'পুরো।' নিজের রেগুলেটর জায়গামতো বসিয়ে নিল ডুবুরি মহিলাটা। তারপর আরও একবার গায়েব হয়ে গেল পানির নিচে। অত্যন্ত শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট আছে তার সঙ্গে, তারপরও সেটার আলো মিলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না।

ছোট ছোট কিছু গার্বেরজ ব্যাগও খুঁজে পাওয়া গেছে। সেগুলোর সংখ্যা এখন পর্যন্ত ছয়। ও-রকম মাত্র একটা ব্যাগ খোলা হয়েছিল। ভেতরে পাওয়া গেছে মানুষের পায়ের হাড়। লাশ বা কঙ্কালের এ-রকম খণ্ডাংশ পানির নিচে যে-অবস্থায় পাওয়া গেছে সে-অবস্থাতেই ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে স্বচ্ছ প্লাস্টিক-ব্যাগের ভেতরে। তারপর তুলে নিয়ে আসা হয়েছে পানির ওপরে, জমা করা হয়েছে প্লাস্টিকের একটা বিনে। যা-যা পাওয়া যাচ্ছে, ওরা কেউই চাইছে না কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যাক ওসব। আর তাই যতখানি সম্ভব সংরক্ষণ করতে চাইছে ওই প্রমাণগুলো। পরে এগুলো নিয়ে যাওয়া হবে শার্লটে, এফবিআই-এর বিল্ডিং। সেখানে মেডিকেল একজামিনারের অফিসে খোলা হবে সব ব্যাগ। বিশেষ এই ব্যাপারে কীভাবে কী করতে হবে সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পুল আর গ্র্যাঙ্গারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে শেরিফ ব্যানিস্টার, কোনো উচ্চবাচ্যই করেনি এসব নিয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যা ঘটছে এখন লেকের তীরে, সেসব ওই মহিলার ডিপার্টমেন্টের সামর্থ্যের বাইরে।

শীত অনুভব করলে যে-কায়দায় দু'হাত জড়ো করে লোকে, সেভাবে নিজের দুই হাত একত্রিত করল পুল। এই জায়গা শিকাগো না। এখানে শিকাগোর মতো ঠাণ্ডাও পড়েনি। কিন্তু লেকের বাতাসে হাড় কাঁপিয়ে দেয়ার মতো কিছু একটা আছে। টের পেল, ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শেরিফ ব্যানিস্টার। মহিলার হাতেধরা জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে পড়েছে অনতিদূরের বিশাল এক গাছের শেকড়ের কাছে। 'এজেন্ট পুল? আমার মনে হয় আপনার সেই বেড়ালটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৪৭২



অরাজকতা



কী যেন বলেছিল পোর্টার? লেকের কাছে যখন পৌঁছাবেন, বেড়ালটার খোঁজ করবেন।

কিছু বলল না পুল। যদিকে আলো ফেলেছে মহিলা, তাকাল সেদিকে।

মরচেধরা একটা ধাতব লাঞ্চবক্স দেখা যাচ্ছে। একটা লরেল গাছের গোড়ায় দাফন করে রাখা হয়েছিল সেটা। পুল যখন হাজির হয়েছিল এই জায়গায়, লেকের পুরো পরিধি ধরে হেঁটেছিল। ওর নজর তখন স্থির ছিল জমিনের ওপর, খোঁজ করছিল কোনো একটা বেড়ালের। ভেবেছিল, পোর্টার যে-জিনিসের কথা বলেছে, সেটা হয়তো লেকের কিনারায় কোথাও পাওয়া যাবে। ঠিক তখন আবিষ্কৃত হয় প্রথম লাশটা। আর তাই বেড়ালের ব্যাপারটা পুরোপুরি বেরিয়ে গিয়েছিল পুলের মাথা থেকে। এখন খেয়াল করল, লেকের কিনারা থেকে ফুট দশেক দূরে, কয়েকটা গাছের আড়ালে লুকানো অবস্থায় ছিল ওই বাক্স।

বাক্সটার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল সে। কাছে পৌঁছে ঝুঁকে পড়ল। উপরিতলে লেগে আছে কিছু ধুলোময়লা, সাফ করে ফেলল সেসব।

হ্যালো কিটি।

‘সুন্দর।’ মুখ তুলে শেরিফের দিকে তাকাল পুল। ‘আপনার কাছে গ্লাভস আছে?’

‘হ্যাঁ, এই যে।’ জ্যাকেটের পকেট থেকে টেনে একজোড়া লেটেক্স গ্লাভস বের করল ব্যানিস্টার, দিল পুলকে। ধূসর কিছু ছোঁয়া লেগেছে মহিলার সোনালি চুলে, সে-চুল পনিটেইল করে বেঁধে রেখেছে সে। যে-রাবার ব্যান্ড দিয়ে চুল বেঁধেছিল, খুলল সেটা। তারপর সব চুল একসঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধল শক্ত করে, জায়গামতো বসিয়ে দিল ব্যান্ডটা। একহাত দিয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় সারল ওই কাজ। অন্য হাতে ধরা জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইটের আলো একবারের জন্যও সরেনি ওই লাঞ্চবক্সের ওপর থেকে।

একটা কথা না ভেবে পারল না পুল। এই মহিলা একই দক্ষতায় পিস্তল-বন্দুকও সামলাতে পারে নাকি? যদি কোনো কারণে এখানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার দরকার হয়, কী করবে মহিলা?

‘আমি আরেকটা পেয়েছি!’ লেক থেকে শোনা গেল অন্য কোনো একজন ডুবুরির চিৎকার।

এই নিয়ে পাঁচটা হলো।

এগিয়ে এল গ্র্যাঙ্গার। তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে মিলিত হয়েছে ব্যানিস্টারের ফ্ল্যাশলাইটের আলোর সঙ্গে। ‘ওটাই নাকি? পুল, তুমি আসলে কী খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলে, বলো তো?’

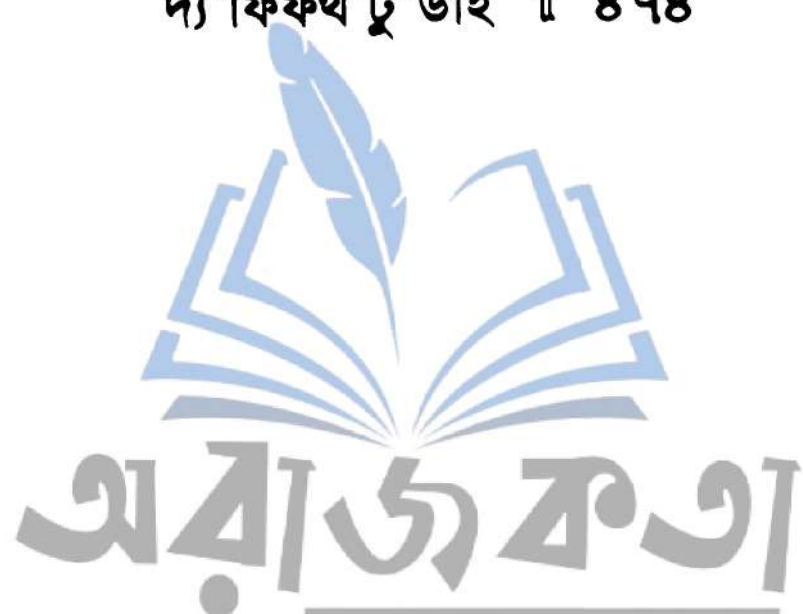
লাঞ্চবক্সের সামনের দিকে ছোট একটা ধাতব হুড়কো আছে, সেটা আলগা করে দিল পুল। খুলল ঢাকনাটা।

ভেতর থেকে ওর দিকে যেন তাকিয়ে আছে একটা ডায়েরি।

‘এখানকার সহায়সম্পত্তির সমস্ত রেকর্ড, ভূমিরেকর্ড, এবং ও-রকম আর যা-
যা আছে এই জায়গার জন্য, সব দরকার আমার। এখানে আসার সময় যেসব
বাড়ি পার হয়ে এসেছি আমরা, সেসবের রেকর্ডও দরকার।’

নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল ব্যানিস্টার, হিমশীতল বাতাসে সাদা ধোঁয়া তৈরি
করেছে তার নিঃশ্বাস। ‘টাউন হলে জমা করে রাখা আছে ওসব। ফোন করছি
আমি, ঘুম থেকে ডেকে তুলছি কয়েকজনকে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই । ৪৭৪



অরাজকতা



৯৬.

ডায়েরি

মাথার ওপর জ্বলছে ফুরোসেন্ট আলো। ভেঁ ভেঁ আওয়াজ আসছে। আমার মনে হচ্ছে, ছাদের কোনো একজায়গায় লুকিয়ে আছে কম করে হলেও দশ লক্ষ মৌমাছি। কর্কশ সেই আলো যেন টুঁইয়ে টুঁইয়ে নামছে ওসব মৌমাছির নষ্ট-হয়ে-যাওয়া মধুর মতো। শব্দটা উপেক্ষা করার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু খেয়াল করলাম, পারছি না। পাতলা একটা বালিশ দেয়া হয়েছে আমাকে, সেটাতে মাথা নামিয়ে রাখলাম আবার।

আমার ঘরটা মাত্র ছ'ফুট চওড়া। আট ফুটের মতো গভীর। এই সেন্টারের লোকজনের বক্তব্য অনুযায়ী, এটা নাকি আমার ঘর। আমি তাদের এই কথা মেনে নিয়েছি। অথচ আমার অবচেতন মন ফিসফিস করে বলে, এই ঘর আসলে যেন কোনো কারাগার। কারণ কাউকে যখন কোনো ঘরে নিয়ে এসে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, বাইরে থেকে সে-ঘরের দরজায় তালা মেরে দেয়া হয় না। সাধারণ যে-কোনো ঘরে একটা না একটা জানালা থাকে। আমার এই ঘরে ও-রকম কোনো কিছু নেই।

প্রথম যে-রাতে এখানে ছিলাম আমি, তখন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। হামাগুড়ি দিয়ে নেমেছিলাম বিছানা থেকে, উদ্দেশ্য ছিল বাথরুমে যাবো। কিন্তু যে-মুহুর্তে শীতল মেঝের স্পর্শ পায় আমার পা দুটো, ঠাহর করতে পারি, আলাদা কোনো এক অনুভূতি হচ্ছে আমার। আমার বাথরুমের দরজাটা যে-জায়গায় থাকা উচিত ছিল, ঠিক সেখানে হাজির হওয়ার আগপর্যন্ত চেতনা পুরোপুরি ফিরে পাইনি সে-রাতে। এবং তখনই বুঝতে পারি, আমি মোটেও আমাদের সেই বাসায় নেই। বরং আছি অদ্ভুত কোনো এক জায়গায়।

বুঝতে পারি, এই ঘর আসলে আমার ঘর না।

এই বিছানা আমার বিছানা না।

এই জায়গা সম্পূর্ণ অন্য কোনো এক জায়গা।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার যে-তাড়না পেয়ে বসেছিল আমাকে, সেটা বিদায় নেয় হঠাৎ করেই। আবারও যেন হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসি আমার সেই সরু বিছানায়। ভোর ঠিক ছ'টা বাজতেই মাথার ওপর জ্বলে ওঠে সেই উজ্জ্বল আলো, ততক্ষণ পর্যন্ত একটানা ঘুমাই। ফুরোসেন্ট বাতির একটানা গুঞ্জন শুনতে শুনতে আমার মনে হয়, পূর্বনির্ধারিত কোনো একটা কাজ সম্পাদন

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৭৫

করার জন্য যেন জেগে উঠেছে ওই মৌমাছির দল। বাতিটা সারাদিন জ্বলতেই থাকে... নিভে যায় রাত ঠিক দশটায়।

আমার এই ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। দরজার পাল্লায় কায়দা করে তৈরি করা হয়েছে ছোট একটা জানালা, তবে সেটা দিয়ে কোনোকিছু দেখতে পারি না আমি। কিন্তু আমার শরীরের ভেতরে যে-ঘড়ি আছে, সেটা নিখুঁত সময় বলে দেয় আমাকে। আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, মনের সাহায্য নিয়ে কীভাবে সময় নির্ণয় করতে হয়, আমাকে সে-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন বাবা। বলেছিলেন, কল্পনা করে নিতে হবে, আমার অবচেতন মনের কুলুঙ্গিতে রাখা আছে কোনো একটা ঘড়ি, বিরতিহীনভাবে টিক টিক করে চলেছে সেটা। আরও বলেছিলেন, আমি যখন সেই ঘড়িকে বিশ্বাস করতে শিখে যাবো, তারপর থেকে ওটা দেয়ালে-ঝুলন্ত যে-কোনো ঘড়ির চেয়ে সঠিক সময় দেবে।

আমাদের সেই বাসাতেও কিন্তু কোনো ঘড়ি ছিল না।

আবার হাতঘড়ি পরারও কোনো অনুমতি ছিল না আমার।

গুধু ছিল আমার অবচেতন মনের কুলুঙ্গিতে রাখা ঘড়িটা... আমার শরীরের ভেতরের ঘড়িটা। সে-ঘড়ি ঠিক সময় দিচ্ছে কি না, নিয়মিত পরীক্ষা নিতেন বাবা। ক'টা বাজে, জানতে চাইতেন তিনি আমার কাছে। কখনও কখনও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন খুবই অদ্ভুত কিছু সময়ে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে ভুল হওয়াটা ছিল আমার জন্য বিরল একটা ঘটনা।

সময়কে কীভাবে চাপা দিয়ে রাখতে হয়, আমাকে সে-পদ্ধতিও শিখিয়েছিলেন বাবা। বিশেষ এই দক্ষতাকে ধ্যানের সঙ্গে তুলনা করতেন তিনি। বলতেন, এটা নাকি ধ্যানের চেয়েও বেশি কিছু। এই দক্ষতা অবশ্য সেভাবে কখনও দরকার হয়নি আমার। কিন্তু বাবা বলেছিলেন, একদিন না একদিন কাজে লাগবে। বাবা যখন কোনোকিছু শেখাতে চাইতেন আমাকে, আমি আবার সেটার জন্য বেশ উৎসুক হয়ে থাকতাম। আর তাই আমার জন্য সময়কে চাপা দিয়ে রাখার মানে হচ্ছে, দুই চোখ শ্রেফ বুজে ফেলা এবং নিজের সবকিছু বন্ধ করে দেয়া। এই কাজ পাঁচ মিনিটের জন্যও করতে পারি আমি, আবার চাইলে পাঁচ ঘণ্টার জন্যও করতে পারি। ঠিক কতক্ষণের জন্য করবো ওটা, সে-সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি গুরুতেই। বিশেষ এই ব্যাপার কিন্তু ঘুমের মতো না। আমি যখন সময়কে চাপা দিয়ে রাখি, আমার মস্তিষ্ক কাজ করতে থাকে তখনও... নিজের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বিশেষ কোনো সমস্যার ওপর। আমি চাইলে এই

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৭৬



অরাজকতা



ব্যাপারটাও বন্ধ করে দিতে পারি। যদি করি, একঘেয়েমির মুহূর্তগুলোতে অলীক যেসব চিন্তা কাজ করতে থাকে আমাদের মনে, সে-রকম কিছু ভাবনা পেয়ে বসে আমাকে... খুব দ্রুত গতিতে আসা-যাওয়া করতে থাকে মনের পর্দায়।

আমাকে যখন এই ঘরে এভাবে তালা মেরে রাখা হয়, সময়কে তখন চাপা দিয়ে ধরে রাখি আমি।

আমার সঙ্গে ঠিক কী করার চেষ্টা চলছে, বুঝতে পারি সেটা। যখন বাথরুমে যাওয়ার দরকার হয় আমার, শুধু তখনই ঘর ছেড়ে বের হতে দেয়া হয় আমাকে। আর হ্যাঁ, যখন ডষ্টর অগলেসবির সঙ্গে দেখা করা দরকার, তখনও বের হতে দেয়া হয়। দিনের বাকি সময়টা আমি কাটিয়ে দিই এই ঘরের ভেতরে। এই সেন্টারের লোকজন কী চায়, আমি বুঝে গেছি। ওরা চায়, আমি যাতে ভুগি একঘেয়েমিতে। চায়, আমি যাতে ঘৃণা করি এই ঘর। আমাকে যে সময়ে সময়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় এখান থেকে, ওই লোকগুলো চায়, আমি যেন উপভোগ করি সেটা। চায়, আবার কখন গিয়ে কথা বলতে পারবো ডাক্তার অগলেসবির সঙ্গে, আমি যেন মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকি সেটা। আমি নিশ্চিত, আমার আগে যে বা যারা ছিল এই ঘরে, তাদের বেলায় কাজে লেগে গেছে ওই কৌশল। কিন্তু আমার বেলায় সেটা খাটবে না। অন্তত যতক্ষণ আমি সময়কে চেপে রাখতে পারছি, ততক্ষণ না। আমি আসলে এই বন্দিদশাকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখছি। এবং সে-সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমি আমার বর্তমান অবস্থাটা যাচাইবাছাই করতে পারছি। একটা সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। একটা ধাঁধার উত্তর বের করার চেষ্টা করছি।

আগেও বলেছি, ভোর ছ'টায় জ্বালিয়ে দেয়া হয় ফ্লুরোসেন্ট বাতি। বন্ধ করে দেয়া হয় রাত দশটায়। একই নিয়ম চলতেই থাকে চক্রাকারে। এই নিয়ে আজপর্যন্ত আটবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নিয়মটার। এখন বিকেল ৪:৩২। এই সেন্টারে আজ আমার অষ্টম দিন চলছে। আমার এই ঘর থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। যে-জানালার কথা বলেছি কিছুক্ষণ আগে, সেটা বেশ শক্ত করে আটকানো আছে। ওটা যদি কোনোভাবে খুলে ফেলতেও পারি, গরাদে ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। তালা খুলবার মতো কোনোকিছু যদি পেতাম হাতের নাগালে, তা হলে সে-জিনিস কাজে লাগিয়ে দরজার তালাটা খুলে ফেলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে-রকম কিছু নেই আমার কাছে। আমি জানি, আমার ঘরের বাইরে একটা হলওয়ে আছে। সেটার

যেদিকে আমার ঘর, সেদিকে এ-রকম আরও চারটা ঘর আছে। তার মানে, আমার ঘরটা পঞ্চম। বাথরুমটা হলের শেষমাথায়, ডানদিকে। অন্য ঘরগুলোতে যারা আছে, তাদের কাউকে এখনও দেখিনি আমি। তবে তাদের কথা বলার অথবা হাঁটাচলার আওয়াজ পেয়েছি, বিশেষ করে রাতের বেলায়। চিহ্নিত করেছি, ওসব কণ্ঠের যারা মালিক, তাদের তিনজন পুরুষমানুষ, আর দু'জন মেয়েমানুষ। এবং একটা মেয়েমানুষের কণ্ঠ শুনে আমার মনে হয়েছে, তার বয়স বড়জোর পনেরো হবে।

রাতের বেলায় কাঁদে সে। প্রতি রাতেই কাঁদে।

মেয়েটার নাম জানি না আমি। আগে বলা হয়নি... এই সেন্টারের লোকজন কিন্তু এখানকার কোনো বাসিন্দাকে তার নাম ধরে ডাকে না। শুধু ডক্টর অগলেসবি করেন কাজটা।

হলওয়েটা দৈর্ঘ্যে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ফুটের মতো হবে। আমাকে যখন এই ঘর থেকে বের করে ডক্টর অগলেসবির অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়, খেয়াল করেছি, তখন বাঁ দিকে মোড় নিই আমরা। বেশ কয়েকটা বন্ধ দরজা পার হই। ডাক্তার সাহেবের অফিস থেকে ফিরে আসার সময় মনে মনে কিছু নোট নিয়েছি আমি... হলওয়ের আরেক মাথায় বাঁ দিকে আছে নার্স স্টেশন। আর ডান দিকে আছে একটা গার্ড রুম। এই দুটো ঘরের মাঝখানে আছে একটা বন্ধ দরজা। আমি এখন পর্যন্ত একবারের জন্যও খোলা অবস্থায় দেখিনি ওই দরজা। তবে ইলেকট্রনিক একটা গুঞ্জন শুনেছি বেশ কয়েকবার... তার মানে, খুলে দেয়া হয়েছিল দরজাটার তালা। কল্পনা করে নিয়েছি, গার্ড যেখানে থাকে, সেখানকার কাছাকাছি কোনো এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওই দরজা। তবে এমনও হতে পারে, বিশেষ সেই জায়গায় প্রবেশাধিকার আছে নার্সদেরও। কল্পনার চোখে আমি দেখে নিয়েছি ছোট একটা বোতাম... বছরের পর বছর ধরে আঙুলের চাপ লাগতে লাগতে ময়লা হয়ে গেছে সেটা।

হলওয়ের দু'মাথাতেই ক্যামেরা লাগানো আছে। ছাদের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় বুদ্ধবুদের মতো ছোট এবং ঘন কালো চোখে তাকিয়ে আছে ওগুলো। ডক্টর অগলেসবির অফিসে কোনো ক্যামেরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ওই জায়গার কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো ক্যামেরা আছে। আমার ঘরেও আছে একটা। এবং সেটা আছে সেই ফ্লুরোসেন্ট বাতির পাশে, ঘরে বাতাস চলাচল করার জন্য যে-ঝাঁঝি লাগানো আছে সেটার আড়ালে। অর্থাৎ মাথার ওপর থেকে কেউ একজন

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৭৮



অরাজকতা



সার্বক্ষণিক দেখছে আমাকে। ওই জিনিস কোনো আওয়াজ করে না। তবে আমি যেন ঠাহর করতে পারি, চোখ পিটিপিট করছে ওটা।

ডক্টর অগলেসবি, একটা কথা জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছে আমার... আপনি কি এই মুহূর্তে বসে আছেন আপনার ডেস্কের ধারে, কোনো একটা মিনিটরে দেখছেন আমাকে? থেকে থেকে কিছু কথা টুকে নিচ্ছেন আপনার সেই নোটপ্যাডে? কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, যা লিখছেন আপনি, কেমন একটা ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে লিখছেন। আপনার লেখা প্রতিটা শব্দ, সেটার আগের শব্দের চেয়ে আরও বেশি অর্থহীন ঠেকছে আমার কাছে। নিজেকে এখন একজন গোবেচারা বলে মনে হচ্ছে আমার। বেচারা অ্যানসন বিশপ। আগুনের কারণে এতিম হয়ে গেছে যে-ছেলে।

ওই মেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে আবার। অদ্ভুত। এই সময়ে তো কাঁদার কথা না ওর।

৯৭.
পোর্টার
চতুর্থ দিন, সকাল ৭:১৩

টুং করে আওয়াজ উঠল সারার ফোনে।

পোর্টার প্রথমে ঠাহর করতে পারল না, ওই শব্দ কীসের অথবা কোথেকে এসেছে। তারপর খেয়াল করল, ফোনটা আলগোছে পড়ে আছে সারার কোলের ওপর।

একটুখানি নড়ে উঠল মহিলা। পোর্টারের কাঁধে এলিয়ে দিল মাথা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

তার মোবাইল টুং করে উঠল আবারও।

মাথার ওপর যে-আলো জ্বলছিল, সেটা নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল; এখন প্রাণ ফিরে পেল সেটা। ইন্টারকমে শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

‘সম্মানিত যাত্রীরা, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যার যার সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন। ট্রে-টেবিলগুলো যদি খোলা অবস্থায় থাকে, সরিয়ে দিন জায়গামতো। নিউ অরলিন্সের উদ্দেশে নিচে নামতে চলেছি আমরা। স্থানীয় সময় এখন সকাল সাতটা তেরো। তাপমাত্রা ঊনষাট ডিগ্রি ফারেনহাইট। আপনাদের সঙ্গে উড্ডয়নের পুরো সময়টা সত্যিই উপভোগ করেছি আমরা। আশা করছি, আপনারা আপনাদের সময় উপভোগ করবেন নিউ অরলিন্সে।’

চোখ কয়েকবার পিটপিট করে মেলল সারা। কিন্তু উজ্জ্বল আলোর কারণে কুঁচকে ফেলল পরক্ষণেই। ‘শুভ সকাল, রোদ,’ বলল বিড়বিড় করে। ঠোঁট চাটল।

আরও একবার টুং করে উঠল তার ফোন।

‘আমি ভেবেছিলাম, প্লেনে চড়লে ওসব জিনিস এয়ারপ্লেন মুড়ে দিয়ে রাখতে হয়। নয়তো পুরো প্লেন ধ্বংস হয়ে যায়।’

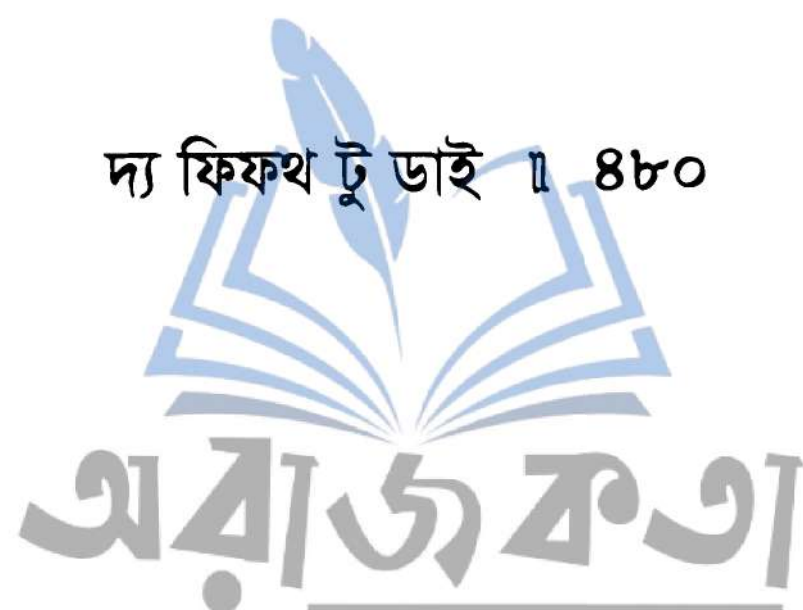
‘কপাল ভালো আপনার... সিটবেল্ট বেঁধে রেখেছেন। আপনাকে রক্ষা করার জন্য আছে ওই জিনিস।’ ফোনটা তুলে নিল সারা। তাকাল ডিসপ্লের দিকে। ‘প্লেনে সওয়ার হয়ে যখন কোথাও যান আপনি, যখনই জমিনের কাছাকাছি চলে আসেন, টাওয়ার থেকে সিগনাল রিসিভ করতে শুরু করে আপনার মোবাইল ফোন।’ জ্র কুঁচকে গেছে। ‘টেক্সট মেসেজ পাচ্ছি আমি এখন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব মেসেজ আমার জন্য না। এসব মেসেজ আপনার জন্য।’

‘কী?’

‘নিজেই দেখুন।’ পোর্টারের হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দিল সারা।

স্যাম, ওই ফোন নষ্ট করে ফেলাটা উচিত হয়নি আপনার।
কাজটা ভালো হলো না।
মোটোও ভালো হয়নি।

দ্য ফিফথ টু ডাই ১ ৪৮০



অরাজকতা

‘বিশপ আপনার নম্বর পেল কীভাবে?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সারা। ‘জানি না। আমার অফিসের বাইরে একটা সাইনবোর্ড আছে, হতে পারে সেটা থেকে জোগাড় করে নিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, কোনো ফোনবুকের সাহায্য নিয়েছে লোকটা। ইন্টারনেট থেকেও খুঁজে বের করে থাকতে পারে। অথবা হয়তো আমার কোনো ভিজিটিং কার্ড কোনো না কোনোভাবে গিয়ে পড়েছে তার হাতে। আবার এমনও হতে পারে, ওর মা ওকে দিয়েছে নম্বরটা। স্যাম, আমি কিন্তু একজন উকিল। আমার নম্বর বলতে গেলে সব জায়গাতেই আছে।’

টেক্সট মেসেজের জবাবে পোর্টার লিখল:

বিশপ?

কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না। তারপর সাড়া পাওয়া গেল বিশপের পক্ষ থেকে:

মেমোরি লেনে আপনাদের সেই যাত্রা উপভোগ করেছেন তো?

পোর্টার টাইপ করল:

তোমার বেড়ালটা খুঁজে পেয়েছি আমি।

বিশপ জবাব দিল:

আপনি বোধহয় বোঝাতে চাইছেন, “আমরা” খুঁজে পেয়েছি বেড়ালটা।

সারার দিকে তাকাল পোর্টার। মহিলা দু’চোখ আঠার মতো সঁটে আছে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে।

বিশপ:

অসুবিধা নেই, স্যাম। আপনি যে একা নন এখন, সেটা জানি আমি। যা হোক, আপনার কথা ভেবে খুশি লাগছে আমার। সারা কিন্তু দেখতে-শুনতে চমৎকার একজন মেয়েমানুষ। হিদার যদি বেঁচে থাকতেন, পছন্দ করতেন ওই মহিলাকে। আমি নিশ্চিত, পরিচয় হওয়ার পর দ্রুত বন্ধুত্ব হয়ে যেত তাঁদের দু’জনের মধ্যে।

পোর্টার:

লিবির লকেটটা আমার কাছে আছে

কোনো সাড়া নেই।

পোর্টার:

ওই লকেট লিবির, তা-ই না? কার্টার দম্পতির ট্রেইলারে ফ্লোরবোর্ডের নিচে
পেয়েছি আমি যেটা, সেটার কথা বলছি। ওই মেয়ে তোমার জন্য আসলে কে ছিল,
বলো তো? মেয়েটা যে মরে গেছে, সেটা জানো তুমি, তা-ই না?

কোনো সাড়া নেই।

পোর্টার:

বিশপ?

বিশপ:

আমি আমার মাকে খুব মিস করি, স্যাম। লিবির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা
বলার জন্য আমি রীতিমতো মরিয়া হয়ে আছি।

পোর্টার:

আইনের হাতে ধরা দাও। তোমাকে যাতে তোমার মায়ের পাশের সেলে দেয়া
হয়, সে-ব্যাপারে ব্যবস্থা করে দেবো আমি।

বিশপ:

কোনো দরকার নেই। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন আপনি।

জবাবে বিড়বিড় করে একটা গালি দিল পোর্টার।

পোর্টার:

তিনি কোথাও যাবেন না।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৮২



অরাজকতা



বিশপ:

আমি এখন একটা ছবি পাঠাবো আপনার কাছে, স্যাম। ওটা পছন্দ হবে না আপনার, আগেই বলে দিলাম। ছবিটা আপনি দেখার পর ওটার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার আমার।

আবারও টুং করে উঠল মোবাইলটা। ছোট একটা ইমেজ হাজির হলো স্ক্রিনে। দুটো মেয়ে। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে কঙ্কিটের মেঝেতে।

বিশপ:

স্যাম, আছেন নাকি?

ওই ইমেজের ওপর যেন চিমটি কাটল সারা, বড় করল ওটা। বিস্তারিত জানতে চায়।

একটা মেয়ের গায়ে, দেখা যাচ্ছে, সবুজ একটা লেপ পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে। মরা মানুষের মতো পাগুরতা ভর করেছে তার চেহারায়। ঠোঁট রক্তাক্ত। অন্য মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে, নদীতে ডুবে গিয়েছিল যেন, এইমাত্র সেখান থেকে তোলা হয়েছে তাকে। ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে সমস্ত কাপড় আর চুল। চ্যাপ্টা হয়ে সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে।

দুটো মেয়ের কাউকেই চিনতে পারল না পোর্টার।

পোর্টার:

ওরা কারা?

বিশপ:

আমার এক বন্ধুর অতিথি। খুব একটা ভালো করতে পারছে না মেয়ে দুটো। বলতে খারাপই লাগছে... আমি যদি আমার সেই বন্ধুর তত্ত্বাবধানে আরও কিছুদিন রেখে দিই মেয়ে দুটোকে, তা হলে এলা রেনল্ডস আর লিলি ডেভিসের কপালে যা জুটেছে, সে-রকম যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে তাদেরকে।

আপনি নিশ্চয়ই চান না সে-রকম কিছু? নিশ্চয়ই চান না, আরও রক্ত লাগুক আপনার হাতে? সুতরাং, সোজাসাপ্টাই বলি... একটা লেনদেন করতে চাই... শুধু

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৮৩

আমি আর আপনি। মেয়ে দুটোকে যদি জীবিত দেখতে চান, আমার মাকে বের
করে আনতে হবে জেলখানা থেকে। ওই যে, সেকেলে একটা কথা আছে না...
টিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়? অনেকটা সে-রকম আর কী। তা ছাড়া
আপনি কিন্তু এমনতেই ঋণী হয়ে আছেন আমার কাছে— শেষ যে-ঘটনাটা ঘটেছে,
সেটার কথা বলছি।

পোর্টার:

ওই কাজ করা সম্ভব না আমার পক্ষে।

বিশপ:

স্যাম, আমার সেই বন্ধুর পক্ষে কিন্তু আরও মেয়ে জোগাড় করে নেয়াটা খুব
কঠিন কোনো কাজ না।

জবাবে কিছু বলল না পোর্টার।

বিশপ:

আপনারা যাঁরা পুলিশে চাকরি করেন, ব্লু অ্যালাট্ জারি করা বলতে একটা টার্ম
চালু আছে না আপনাদের মধ্যে? আপনার বন্ধুদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য সে-
রকম কোনোকিছু যদি করেন, শ্রেফ মারা পড়বে ওই মেয়ে দুটো। আমার কাছে
কিন্তু এখনও আরও অনেক বাস্তব রয়েছে...

এবারও চুপ করে থাকল পোর্টার।

বিশপ:

এর পরেরবার যখন জেলখানায় যাবেন, টাকাপয়সা বলতে যা-কিছু আছে
আপনার সঙ্গে, সব রেখে আসবেন সেখানকার লকারে।

পোর্টার:

না।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৮৪



অরাজকতা



বিশপ:

আরেকটা কথা, স্যাম। এই কথা একটুও ভালো লাগবে না আপনার। যদি কোনো কারণে ওই মেয়ে দুটোকে মরতে দেয়ার ইচ্ছা থাকে আপনার মনে, তা হলে বিশ্বাস করুন, পরেরবার এমন কোনো মেয়েকে জোগাড় করে নেবো আমি, এমন এক কায়দায় তাকে শেষ করে দেবো যে, হত্যাকাণ্ডটা হবে দেখার মতো কিছু একটা। রীতিমতো হইচই পড়ে যাবে সে-ঘটনা নিয়ে। সে-রকম কিছু ঘটুক, চাই না আমি। কিন্তু আপনি যদি আমার মাকে জেলখানা থেকে বের করে না আনেন, তা হলে ওই কাজ করতে বাধ্য হবো, বলে রাখলাম।

বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না পোর্টার।

বিশপ:

আপনাদের দু'জনকে... মানে, আপনাকে এবং মিস ওয়ার্নারকে যেতে হবে জেলখানায়। শুধু যদি আপনি যান, তা হলে কারা-কর্তৃপক্ষ আপনার হাতে ছেড়ে দেবে না আমার মাকে। যত যা-ই হোক, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছেই তো হস্তান্তর করা উচিত একজন জেলঘুঘুকে, তা-ই না? আমার কথার সঙ্গে আপনি একমত তো?

জবাব দিল না পোর্টার।

বিশপ:

রাত ঠিক আটটা পর্যন্ত সময় দিলাম আপনাদেরকে। একটুও যদি দেরি হয়, তা হলে...

‘দেরি হলে কী হবে?’ বলল পোর্টার।

‘সিগনাল চলে গেছে। টাওয়ারের সঙ্গে খুব সম্ভব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের।’

রানওয়ের ওপর নামল প্লেনের চাকা। সিটে বসে থাকা অবস্থাতেই ঝাঁকুনি খেল পোর্টার আর সারা। দ্রুত গতি কমাচ্ছে প্লেনটা। পোর্টার আর সারা যে-জানালার পাশে বসেছে, সেটার ধার ঘেঁষে যেন ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্টের আউটবিল্ডিংগুলো।

সারার চোখ দুটো এখনও স্টেটে আছে ফোনের সঙ্গে। ‘এবার চেষ্টা করে দেখুন। সিগনাল ফিরে এসেছে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৮৫

পোর্টার:

বিশপ?

মেসেজ নট ডেলিভার্ড

লাল রঙের একটা লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে... সেটাতে লেখা আছে ট্রাই
এগেইন... ওই লিঙ্কে চাপ দিল পোর্টার।

মেসেজ নট ডেলিভার্ড

আবারও একই পদ্ধতি অনুসরণ করল পোর্টার।

মেসেজ নট ডেলিভার্ড

‘এসব ছাইপাঁশের মানে কী?’ ভ্রু কুঁচকে গেছে পোর্টারের।

‘বিশপ হয়তো তার মোবাইল ফোনের ব্যাটারি বের করে নিয়েছে,’ জবাবে
বলল সারা। ‘অথবা হয়তো ওই ফোন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কোনো লেকে।’
তাকাল পোর্টারের দিকে। ‘ওই লোকের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য কতকিছু
করলাম আমরা। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি কিছুই। তার গতি কমানো যায়নি।’

টেক্সট মেসেজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছে পোর্টার। মেয়ে দুটোর ওই ছবি যখন
আবার হাজির হলো ওর চোখের সামনে, কেমন যেন কুঁচকে গেল পাকস্থলীটা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৮৬



অরাজকতা



৯৮.

পোর্টার

চতুর্থ দিন, সকাল ৭:৫৭

‘ভিজিটিং আওয়ার শুরু হওয়ার আগে ঘণ্টাখানেক সময় আছে আমাদের হাতে,’ বলল সারা ওয়ানারের বিএমডব্লু গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসা পোর্টার।

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা জেলখানায় হাজির হয়েছে ওরা।

আর কোনো উপায় ছিল না পোর্টারের।

এবং সেটা জানে সে।

‘ওই মহিলাকে কোনো না কোনো কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,’ প্রস্তাব দেয়ার ভঙ্গিতে বলল সারা। ‘পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না তাকে। তার কাছাকাছি থাকতে হবে। তারপর আপনি যখন জানতে পারবেন মেয়ে দুটো নিরাপদে আছে, সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে আবার তুলে দিতে হবে পুলিশি হেফাজতে। কৌশলগতভাবে যদি বলি, পুলিশি হেফাজত থেকে প্রকৃতপক্ষে বের হতে পারছে না ওই মহিলা। আপনি এক কাজ করতে পারেন। একটা হ্যান্ডকাফ দিয়ে নিজের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারেন মহিলাকে। আপনারা পুলিশের অফিসাররা তো ওই কাজই করেন, না? আমি আসলে জানি না।’

বিশপ তখন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার দশ মিনিট পর জেলখানা থেকে একটা ই-মেইল এসেছিল সারার কাছে। মেইলটা প্রকৃতপক্ষে একটা অটোমেটিক রেসপন্স; তাতে বলা হয়েছে, কয়েদি # ২১৩৮-এর জন্য যে-কাগজপত্র আছে, সেসব গ্রহণ করা হয়েছে, এবং কারা-কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী ওসব কাগজ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বিশপ পৃষ্ঠার মতো আরও একটা ডকুমেন্ট আছে। তাতে বলা হয়েছে, একজন জিম্মাদারের দায়িত্বে যদি কোনো কয়েদিকে মুক্তি দেয়া হয়, তা হলে ওই জিম্মাদারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কী কী হবে।

যে-মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে সারার মোবাইলে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছিল বিশপ, সে-নম্বরে বার বার ফোন করার চেষ্টা করেছে পোর্টার। প্রতিবারই একই জবাব পেয়েছে: আপনি যে-নম্বরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, তা এখন আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। অথবা সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। অনুগ্রহ করে...

একই কথা আর শুনতে চায় না সে। লাইন কেটে দিল।

‘আপনার কাছে আর কত টাকা বাকি আছে?’ জিজ্ঞেস করল সারা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোর্টার। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে চাপড় দিল। ‘দু’হাজার তিন শ’ বারো ডলার।’

পার্কিং লটের মাঝখানে গাড়ি পার্ক করল সারা। ভিজিটর এন্ট্রেন্সের দিকে তাক করে রেখেছে গাড়ির নাক। ‘সাধারণ লোকের জন্য ন’টার সময় শুরু হয় ভিজিটিং

দ্য ফিফথ টু ডাই ৯ ৪৮৭

আওয়ার। কিন্তু যারা উকিল, তারা সকাল আটটার পর যে-কোনো সময় ঢুকে পড়তে পারে ভেতরে।’

‘এই কাজ আমার একা করা উচিত,’ বলল পোর্টার। ‘আমি ইতোমধ্যেই জড়িয়ে গেছি ঝামেলার সঙ্গে। আপনারও জড়িয়ে পড়ার কোনো দরকার নেই।’

‘কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে, জানেন? আমার মনে হচ্ছে, আমি এখন এই কেসের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছি আষ্টেপৃষ্ঠে।’

‘আমরা প্রকৃতপক্ষে যা করতে যাচ্ছি তা হলো, জেল ভেঙে বের করে আনতে যাচ্ছি একজন কয়েদিকে। ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবেন আপনি। অন্য শাস্তিগুলোর কথা তো বাদই দিলাম, ওকালতি করার অধিকার বাকি-জীবনের জন্য হারাবেন আপনি, নিশ্চিত ধরে রাখুন।’

‘কথার মাধ্যমে কাউকে অনুপ্রেরণা জোগানোর কাজটা একেবারেই পারেন না আপনি।’

‘নিজের জীবনটা এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার কোনো প্রয়োজনই কিন্তু নেই আপনার।’

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা সারার। ‘বিশপ যা বলেছে, পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। বলেছে, আমাদের দু’জনেরই জেলখানার ভেতরে যাওয়া দরকার। সুতরাং আমরা দু’জনই যাচ্ছি সেখানে। এবার আমাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হলো, প্রচুর ঘামছি আমি... বন্ধ করতে হবে সেটা।’

‘আপনি ঘামছেন? আবহাওয়া তো বেশ ঠাণ্ডা।’

‘শুধু ঘামছিই না, আমি কাঁপছিও। আর সে-কারণেই বোধহয় এত ঘাম হচ্ছে আমার। যা হোক, এই কাঁপুনিও থামাতে হবে আমাকে।’

সত্যিই কাঁপছে মহিলা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পোর্টার, মহিলার হাত দুটো রীতিমতো লাফাচ্ছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। বলল, ‘আমি একা গিয়ে ঢুকছি জেলখানায়। নিকুচি করি বিশপের। সে একটা...’

ইগনিশন বন্ধ করে দিল সারা। পোর্টারের মনের ভেতরে যা ছিল, সেটা সে মুখে উচ্চারণ করার আগেই গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল মহিলা। বলল, ‘চলুন, যাই, ডিটেকটিভ।’

‘ধেং,’ বিড়বিড় করল পোর্টার। পকেট থেকে বের করল বিশপের ছুরি আর লিবির লকেটটা। দুটোই ছুঁড়ে দিল গ্লাভ বক্সের ভেতরে। কিছুক্ষণ হাতড়াল সিটবেল্টা, ওটার বাঁধন থেকে আলাগা করল নিজেকে। তারপর ছুট লাগাল সারার পেছন পেছন।



সকালটা কেবল শুরু হয়েছে। আর তাই ভিজিটর সেন্টার বলতে গেলে জনশূন্য। আগেরবারের মতোই পোর্টারের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাইল গার্ড। তারপর ওকে বেল্ট আর জুতোর ফিতে খুলে ফেলতে বলা হলো। ওসব জিনিস একটা লকারে ঢুকিয়ে রাখল সে। সঙ্গে রাখল নিজের ওয়ালেট আর জ্যাকেট। নগদ টাকা বলতে যা-কিছু ছিল ওর সঙ্গে, সব রয়ে গেল ওই জ্যাকেটের পকেটে। লকারের ছোট দরজাটা লাগিয়ে দিল গার্ড। তারপর একটা চাবি ধরিয়ে দিল পোর্টারের হাতে। এরপর ওর শরীরের এখানে-সেখানে থাবা দিল... নিশ্চিত হয়ে নিল, আগ্নেয়াস্ত্র অথবা অন্য কোনো অস্ত্র বহন করছে না সে। একটা হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টরও ব্যবহার করা হলো ওই কাজে। গার্ডের কাছ থেকে “ছাড়পত্র” পেয়ে যাওয়ার পর, লকার-সংলগ্ন হলওয়ায়েতে পা রাখল পোর্টার। কিছুক্ষণ পর ওর সঙ্গে যোগ দিল সারা।

‘এবার কী?’ জানতে চাইল পোর্টার।

ওর প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন গুঞ্জন তুলে খুলে গেল একটা ধাতব দরজা। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল আরেকজন গার্ড। ভিন্ন উইডনার। মানে, বিশপ তার মায়ের যে-ছবি দিয়েছিল, সেটাতে ওই মহিলার সঙ্গে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল জেলখানার একজন প্রহরীকে... সেই লোক। মোবাইল ফোনে কথা বলছে। একটা আঙুল উঁচু করল লোকটা, মাথা ঝাঁকাল পোর্টারদের উদ্দেশে। কথা বলা শেষ করে পথ দেখিয়ে ওই দু’জনকে নিয়ে গেল ছোট একটা ঘরে। ‘এখানে একটু অপেক্ষা করুন, প্লিজ।’

পোর্টার খেয়াল করল, হলওয়ার সেই দরজা যতবার গুঞ্জন তুলছে, ওর বুকের খাঁচায় ততবার জোরে একটা বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা।

আরও পাঁচবার গুঞ্জন তুলল দরজাটা। তারপর ফিরে আসতে দেখা গেল উইডনারকে। সঙ্গে আরও দু’জন গার্ড আছে। ওই দু’জনের মাঝখানে আছে জেন ডো। পা টেনে টেনে ধীর গতিতে হাঁটতে হচ্ছে মহিলাকে। হাত-পা বাঁধা আছে শেকলে।

একটা ক্লিপবোর্ড বের করল উইডনার, ধরিয়ে দিল পোর্টারের হাতে। ‘এখানে, এখানে, আর এখানে স্বাক্ষর করুন, প্লিজ।’

পোর্টার টের পাচ্ছে, ওর ওপর স্থির হয়ে আছে জেন ডো’র দৃষ্টি। ওর মাথার একটা পাশ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে সে-দৃষ্টি। হিজিবিজি হস্তাক্ষরে নিজের নাম সই করল সে।

‘আজ মাত্র একদিনের জন্য ছাড়া হচ্ছে এই মহিলাকে। আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে এখানে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে। আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকবে সে, হাত-পায়ের শেকল যথাস্থানে থাকতে হবে। একটা মনিটরিং ডিভাইস পরিয়ে দেয়া হয়েছে তার গোড়ালিতে। অরলিসের সীমানা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে

না সে। যদি করে, আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করার দায় বহন করতে হবে আপনাকে।’

আদালতের আদেশ? বিশপ কীভাবে...

‘আমাদের এখানে সাধারণ একটা নিয়ম হচ্ছে, জেলখানার একজন গার্ড আপনাদের সঙ্গে যাবে,’ বলে চলল উইডনার। ‘কিন্তু আপনি নিজেই যেহেতু আছেন আইনপ্রয়োগকারী একটা সংস্থায়, এবং যেহেতু আপনার হেফাজতে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দেয়া হচ্ছে মহিলাকে, তা-ও আবার চলমান একটা তদন্তকাজের স্বার্থে, সেহেতু সমস্ত দায়-দায়িত্ব এখন আপনার। এবার বলুন, কী চান আপনি? একজন গার্ড সঙ্গে নেবেন? নাকি একের বেশি লাগবে?’

মাথা নাড়ল পোর্টার।

ওর হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিল উইডনার। কার্ডের পেছনদিকে টেপের সাহায্যে আটকে দেয়া হয়েছে ছোট একটা চাবি। ‘যদি কোনো কারণে আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে এই মহিলাকে এখানে ফিরিয়ে আনাটা সম্ভব না হয় আপনার পক্ষে, তা হলে, ডিটেকটিভ, এই নম্বরে ফোন করবেন। ঘটনাটা জানাতে একটুও দেরি করবেন না ডিউটি চিফকে।’

ওই কার্ড পকেটে ঢুকিয়ে রাখল পোর্টার।

ক্লিপবোর্ডটা হাতে নিল উইডনার। পাতা উল্টে চলে গেল দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। তারপর বোর্ডটা ধরিয়ে দিল সারার হাতে। ‘আপনি যেহেতু এই মহিলার উকিল, এখানে আপনার স্বাক্ষর নেয়া দরকার আমার। ডিটেকটিভ পোর্টারের হেফাজতে যে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে মহিলাকে কিছু সময়ের জন্য, সেটা অনুমোদন করে দেবেন আপনি।’

সই করে দিল সারা। বোর্ডটা ফিরিয়ে দিল উইডনারের হাতে।

দুটো পৃষ্ঠাই ভালোমতো দেখল উইডনার। তারপর তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড দু’জনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। হলওয়ার এক কোনায় লাগিয়ে রাখা সিকিউরিটি ক্যামেরার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল এরপর। আরও একবার গুঞ্জন তুলল দরজাটা। জেন ডোকে ভেতরে নিয়ে গেল ওই দুই গার্ড। তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ইস্পাতের দরজাটা।

সারা আর পোর্টারের দিকে তাকাল উইডনার। ‘মালসামান যা-যা জমা দিয়েছেন আপনারা, সব নিয়ে নিন। তারপর গিয়ে উঠুন গাড়িতে। গেট নম্বর ১২-এর কাছে নিয়ে আসুন গাড়িটা। ভিজিটর সেন্টারের একপাশে আছে ওই দরজা।’

চলে গেল লোকটা।

একটা মুহূর্তের জন্য একে-অপরের দিকে তাকিয়ে থাকল পোর্টার আর সারা। বিশপের মাকে তুলে দেয়া হলো ওদের হাতে, এবং এই বিনিময়ের পুরো কাজটা শেষ হতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৯০



অরাজকতা



লকারের কাছে ফিরে এল ওরা। বুঝে নিল নিজেদের জিনিসপত্র। পোর্টার খেয়াল করল, ওর জ্যাকেটটা আগের চেয়ে হালকা লাগছে। পকেট থেকে গায়েব হয়ে গেছে নগদ টাকা।

গেট ১২-এর কাছে যখন গাড়ি নিয়ে হাজির হলো ওরা, দেখতে পেল, চেইনলিঙ্ক ফেন্সের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে জেন ডো। তার দু'পাশে দু'জন গার্ড। বেশ জোরালো একটা গুঞ্জন শোনা গেল। জেলখানার ভেতরে ধাতব দরজাগুলো যেভাবে খুলে গিয়েছিল, অনেকটা সে-কায়দায় খুলে গেল চেইনলিঙ্কটা। সারার অপেক্ষমান বিএমডব্লু'র কাছে বিশপের মাকে নিয়ে এল গার্ড দু'জন। মহিলা যাতে উঠে বসতে পারে গাড়ির পেছনের সিটে, সেজন্য সাহায্য করল তাকে। তারপর লাগিয়ে দিল দরজাটা।

পেছনের সিটে বসা জেন ডো হাসছে। 'মিস ওয়ার্নার, আপনার অফিসে যাওয়া দরকার আমাদের। জলদি।'

৯৯.
গ্যাবি
চতুর্থ দিন, সকাল ৮:০৩

বিছানায় শুয়ে আছে গ্যাবি ডিগান। ইসটগ্রাম ঘাঁটছে।

কেউ একজন একটা হ্যাশট্যাগ বানিয়েছে। #লিলিডেভিসমেমোরিয়াল। স্কুলের অনেকেই লিলির এটা-সেটা বিভিন্ন ছবি দিচ্ছে ওই ট্যাগে। দ্রুত ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ট্যাগটা। এমনও অনেকে ছবি দিচ্ছে, যাদেরকে চেনে না গ্যাবি। এবং তারাও যে লিলিকে চিনত না, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত মেয়েটা। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছে সে।

এখন এত দরদ উথলে উঠছে কেন ওই মানুষগুলোর?

অ্যালি উইন্টার্স এবং ম্যাগেন প্ল্যান্টস নামের দু'জন অনেক পোস্ট দিয়েছে ওই হ্যাশট্যাগে। লিলি যখন বেঁচে ছিল, তখন ওই দু'জনের কেউই বলতে গেলে পাত্রাই দিত না মেয়েটাকে। অথচ এখন ছুট করেই এমন এক ভূমিকা পালন করছে, যার ফলে মনে হচ্ছে, লিলির সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল তারা। শেষ যে-বার লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল অ্যালির, তখন অ্যালি লিলিকে বলেছিল, লিলির চুল দেখলে নাকি হুঁদুরের কথা মনে পড়ে যায়। লিলির নাকি একজন আসল স্টাইলিস্টের কাছে যাওয়া দরকার। বাসার কাছের এক মলে গিয়ে চুল কাটাত সে; সেখানে যাওয়ার আর কোনো দরকার নাকি নেই। ওদিকে গত বছর ম্যাগেন করেছিল কী... জিম ক্লাসের সময় লকার থেকে বের করে নিয়েছিল লিলির অন্তর্বাস। এবং সেটা লুকিয়ে রেখেছিল স্কুলের লাইব্রেরিতে। ওই জিনিস খুঁজে বের করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল গ্যাবি আর লিলির। ফলে সেদিনের চতুর্থ পিরিয়ডটা মিস করে ওরা। পরে টিচারের কাছে ধরা পড়ে দু'জন, কথা শুনতে হয়। কুত্তী আসলে একেকটা... ভাবল গ্যাবি... ওই মেয়েগুলোর অনেকেই। যা হোক, সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার কিন্তু ওটাই না। যারা রীতিমতো আগন্তুক, ছবি পোস্ট করছে তারা। কোনো কোনো ছবি এককথায় ভয়ঙ্কর। কেউ কেউ ছবি দিচ্ছে লি গ্যালারির। কেউ কেউ আবার গিয়ে হাজির হয়েছিল ওই গ্যালারির বাইরে, গ্যালারিটার নামের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় সেলফি তুলেছে। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার @EddieKnowsStuff নামের কেউ একজন তো আরেক কাঠি সরেস। পুরনো সেই মুভি দ্য সাইলেন্স অভ দ্য ল্যান্স-এর বাফেলো বিলের একটা ছবি পোস্ট করে দিয়েছে সে। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে একটা ক্যাপশন: “শি ডিড নট পুট দ্য লোশন ইন দ্য বাস্কেট!” এই লোক এমন কেউ না, যে চিনত লিলিকে। বরং সে মাথামোটা এমন কেউ একজন, যে-লোকের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করে দেয়া উচিত।

দ্য ফিফথ টু ডাই ১ ৪৯২



অরাজকতা

উইলকক্স অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ আজ রাতে একটা মোমবাতি-প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে লিলির স্মরণে। গ্যাবি যাবে কি যাবে না, সে-ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। যুক্তিটা কী আসলে? কোনো একটা জায়গা ঘিরে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকবে বেশকিছু মানুষ। তাদের হাতে ধরা থাকবে জ্বলন্ত মোমবাতি। কিন্তু তাতে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না লিলিকে, তা-ই না? তা ছাড়া সবাই জানে, গ্যাবি ছিল লিলির সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আর তাই সবাই হয়তো তাকিয়ে থাকবে গ্যাবির দিকে।

ইন্সটাগ্রাম বন্ধ করে দিল মেয়েটা। আইমেসেজ খুলল। গত কয়েক মাসে সে আর লিলি নিজেদের মধ্যে যেসব গাড়ির ছবি আদানপ্রদান করেছিল, সেগুলো ঘাঁটতে লাগল। এখন আর কোনোদিন কোনো গাড়ি কেনা হবে না লিলির। আর কোনোদিন কোনো গাড়ি চালাতে পারবে না বেচারী। বিয়ে করতে পারবে না। বাচ্চাকাচ্চার মা হতে পারবে না। আর কখনও...

অশ্রু আবারও দেখা দিল গ্যাবির চোখে। নিজেকে সামলে রাখতে রীতিমতো যুঝতে হচ্ছে ওকে। প্রতি রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ার আগে চেহারার সমস্ত মেকআপ ধুয়ে ফেলে, গতকাল সে-কাজ করতে পারেনি পুরোপুরি। এখন ওর আইলাইনার কেমন দেখাচ্ছে, কল্লনা করে নিল সেটা।

‘তুমি ঠিক আছ, সোনামণি?’ দরজার ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল গ্যাবির মায়ের কণ্ঠ।

‘হ্যাঁ।’

দরজার হাতল ধরে মোচড় দেয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। ‘লক করে রেখেছ কেন?’

কোনো জবাব দিল না গ্যাবি। চোখ মুছল।

‘নাস্তা খেয়ে নেয়া উচিত তোমার। কিছু খেলে ভালো লাগবে।’

ঠিকই বলেছেন মা। ক্যাপ্টেন ক্রাঞ্চ ওটস ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল খেলে ঠিক হয়ে যায় অনেককিছুই।

‘পরে খাবো, মা।’

পাশ ফিরল গ্যাবি। ওর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিছানার চাদর। ফোনে ফটোঅ্যাপ চালু করল। ঘাঁটতে লাগল লিলির অ্যালবাম। শত শত ছবি। একসঙ্গে পার্কে গিয়েছিল ওরা দু’জন। শহরের কোথাও না কোথাও ঘুরতে গিয়েছিল। ছবি তুলেছিল স্কুলে। এখানে লিলির সঙ্গে স্ল্যাপচ্যাটের কিছু স্ক্রিনশটও সেভ করে রেখেছে গ্যাবি। যখন ব্যক্তিগত কথাবার্তার দরকার হতো, গ্যাবি আর লিলি তখন স্ল্যাপচ্যাট ব্যবহার করত। কাজটা করতে ভালো লাগত ওদের। কারণ এই যোগাযোগমাধ্যমে একজন প্রাপক যখন কোনো মেসেজ দেখে, সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হয়ে যায় সেটা। বাবা-মায়েরা তো শকুনের মতো শিকারী দৃষ্টিতে সবসময় তাকিয়ে থাকেন তাঁদের বাচ্চাকাচ্চার দিকে, ওদের সবকিছু পড়েন; আর তাই তাঁদের নজর

এড়িয়ে মন খুলে এখানে কথা বলতে পারত গ্যাবি আর লিলি... মনে যা আসত তা-ই এখানে বলতে কোনো বাধা ছিল ওদের। আইমেসেজ ব্যবহারের বেলাতেও সতর্ক ছিল ওই দু'জন। যেসব কথা ওদের বাবা-মাকে দেখাতে চাইত, শুধু সেসব বলত আইমেসেজে। কিন্তু আসল কথা হতো স্ল্যাপচ্যাটে। লিলি যদি এমন কোনো কথা বলত যেটা গ্যাবি রেখে দিতে চাইত নিজের কাছে; যেমন, বিজ্ঞান ক্লাস চলার সময় ফিলিপ ক্রেভালের প্যান্টের ভেতরে দেখা গিয়েছিল ছেলেটার দুই পাছার ভাঁজ... তা হলে গ্যাবি ওই মেসেজ স্ল্যাপচ্যাট থেকে গায়েব হয়ে যাওয়ার আগেই ওটার স্ক্রিনশট রেখে দিত নিজের কাছে। তারপর সেটা সেভ করে রাখত লিলির ফটো অ্যালবামে। পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখত, লুকিয়ে রাখত... যাতে ওসব স্ক্রিনশট কিছুতেই খুঁজে বের করতে না পারেন ওর বাবা-মা।

ইন্সটাগ্রামে লিলিকে স্মরণ করে যেসব ছবি দেয়া হচ্ছে, সেসব দেখে বিরক্ত হয়েছে গ্যাবি, আবেগতাড়িত হয়েছে। কিন্তু স্ল্যাপচ্যাটের এই স্ক্রিনশটগুলো দেখতে দেখতে মুচকি হেসে ফেলল। এক লাইনের যেসব ট্যাগ হয়, লিলি ছিল সেসবের রানি। বড় বড় লোমওয়ালা তিব্বতি একটা কুকুর ছিল ওর, নাম জ্যাপি। ওটার ছবি তুলে গ্যাবির কাছে পাঠিয়ে দিতে ভালো লাগত মেয়েটার। সঙ্গে জুড়ে দিত ছোট ছোট কিছু কথা। গাড়ির ছবিও পাঠিয়েছে অনেক। অনলাইনে যেসব গাড়ির ছবি পেয়েছিল, সেগুলোই পাঠায়নি শুধু, স্থানীয় ডিলারদের শোরুমে গিয়ে যেসব গাড়ি পছন্দ হয়েছিল ওর, সেসবও পাঠিয়েছে। ওর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ২০১০ ক্যামারো। শহরের কোন এক জায়গায় যেন খুঁজে পেয়েছিল সে ওই গাড়ি। ওটা চালিয়ে যদি স্কুলের পার্কিং লটে হাজির হতে পারত বেচারী, সব ছেলের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারত। ঘুরিয়ে দিতে পারত সব মেয়ের মাথাও।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিশেষ একটা ছবিতে হাজির হলো গ্যাবি, থামল। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নিজের হাস্যোজ্জ্বল চেহারার পাশে আইপ্যাড নিয়ে ক্যামেরার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে লিলি। ছবিটার ক্যাপশনে লেখা আছে: “#উইনারউইনারচিকেনডিনার।” এই ছবির কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিল গ্যাবি। এবার মনে পড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় একটা ড্রাইভিং স্কুল অনলাইনে কোনো একজাতের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। গ্যাবি লিলিকে বলেছিল, কেউ একজন খুব সম্ভব কোনো একজাতের ধাপ্লাবাজি করছে। বলেছিল, ছেলে-মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদেরকে বিশেষ কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই আসলে আয়োজন করা হয়েছে ওই প্রতিযোগিতা। তারপর হয়তো তাদের হাতে অতিরিক্ত দামে গছিয়ে দেবে কিছু একটা। শিকাগো শহরে ড্রাইভিং শেখানোর যেসব স্কুল আছে, তাদের অর্ধেকই করে ও-রকম কাজ। বিশেষ করে যখন থেকে এই রাজ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার আগে ত্রিশ ঘণ্টার বিশেষ কিছু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তার পর।



লিলি বলেছিল, ওই প্রতিযোগিতা আসলে কী, সেটা যেভাবেই হোক না কেন
চেক করে দেখতে যাবে সে। যদি সে করেও থাকে কাজটা, ঠিক কী নাটকীয়,
গ্যাবিকে সেটা বলে যাওয়ার সুযোগ পাবনি বেচারী।

বিছানায় উঠে বসল গ্যাবি।

মনে পড়ে যাচ্ছে, ওকে কী জিজ্ঞেস করেছে পুলিশ। কোনো একজন
আগন্তকের সঙ্গে কি গাড়িতে সওয়ার হয়েছিল লিলি? জবাবে “না” বলেছিল
গ্যাবি। কিন্তু...

বিশেষ সেই ইমেজের ওপর চিমটি কাটল গ্যাবি, জুম করল। একসময় পড়তে
পারল ওই ড্রাইভিং স্কুলের নাম: ডেজিগনেটেড ড্রাইভার। ওই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
খুঁজে বের করতে দশ সেকেন্ড সময় লাগল মেয়েটার।

মিনিট বিশেক বাদে কাপড় পরে রুম থেকে বেরিয়ে এল সে। বাসা ছেড়ে যে
বেরিয়ে গেল, সেটা শুনতে পেলেন না ওর মা।

১০০.
পোর্টার
চতুর্থ দিন, সকাল ৮:২৪

‘ওই যে, ওই পাশে গাড়ি থামান, সারা। আপনাকে নাম ধরে ডাকলে কিছু মনে করবেন?’

পোর্টার জানে, এই মহিলা যা-যা করতে বলছে, সেসব অন্ধের মতো কন্ট্রোল ঠিক হচ্ছে না ওদের। বুঝতে পারছে, যা করছে ওরা, ভুল হচ্ছে। তারপরও ঠিক ওই কাজই করছে।

জেলখানা ছেড়ে যখন বেরিয়ে এসেছিল ওরা, মহিলা তখন বসে ছিল গাড়ির পেছনের সিটে। সেখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সে পোর্টার আর সারাকে দেখেছে, গাড়ির জানালার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরের পৃথিবীটা।

যা করতে বলা হয়েছে সারাকে, করল সে। বিল্ডিংয়ের সামনে যেসব পার্কিং স্পেস আছে, সেগুলোর কোনোটাতেই গাড়ি পার্ক করল না। বরং বিল্ডিংয়ের কোনা ঘেঁষে যে-গলি বেরিয়ে গেছে, সেখানে গিয়ে থামল।

‘গাড়ি পার্ক করে ফেলুন। দু’বার হর্ন বাজান।’

আবারও কথামতো কাজ করল সারা। গলির দু’ধারের বিল্ডিংগুলোতে যেন বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হলো হর্নের আওয়াজ।

‘ডিটেকটিভ, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, অনেক উঁচু কোনো জায়গায় যেন গিয়ে উঠেছেন, পড়ে যাওয়ার ভয় যেন পেয়ে বসেছে আপনাকে। মনে হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে গেছে আপনার। কয়েক মিনিট পর পর কিছু শ্বাস নেয়া উচিত আপনার। সেটা আমাদের সার্কুলেটরি সিস্টেমের জন্য ভালো।’

মহিলার কথা পাত্তা দিল না পোর্টার।

কেউ একজন বেরিয়ে এসেছে গলিতে, এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। লোকটাকে চিনতে পারল পোর্টার। সেই গৃহহীন ভবঘুরে লোকটা। এই লোককে ফুটপাথের ওপর পেশাব করতে দেখেছিল সে।

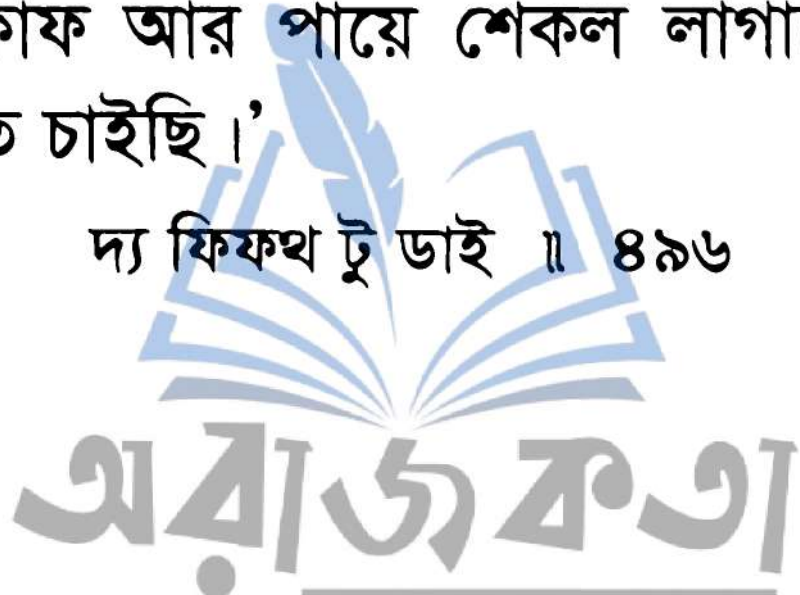
ওই ঘটনা কি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগের?

‘আমি কি চাবিটা পেতে পারি, ডিটেকটিভ?’

কোন চাবি, আরেকটু হলে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল পোর্টার। তখনই মনে পড়ে গেল, একটা ভিজিটিং কার্ড দেয়া হয়েছে ওকে, সেটার সঙ্গে দেয়া হয়েছে বিশেষ একটা চাবি। পকেট হাতড়ে ওই জিনিস বের করল পোর্টার, চালান করে দিল বিশপের মায়ের হাতে।

‘আমার হাতে হ্যান্ডকাফ আর পায়ে শেকল লাগানো আছে। আমি এসবের ব্যাপারে কিছু একটা করতে চাইছি।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৪৯৬



অরাজকতা

‘ওসব যেভাবে যেখানে আছে, সেভাবে সেখানেই থাকবে।’

‘দেখুন, সামনে কিন্তু অনেক লম্বা একটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে।’

‘জীবন কখনও কখনও খুবই নিষ্ঠুর হয়,’ বিড়বিড় করে বলল পোর্টার।

আরও একবার হাসল বিশপের মা। হাসল মানে, তার ঠোঁটের একটা কোনা বেকে অদ্ভুত এক কায়দায়। ‘হ্যাঁ, আমারও সে-রকমই মনে হয়।’

হাসিটা ভালো লাগল না পোর্টারের।

একটুও ভালো লাগল না।

গাড়ির জানালায় টোকা দিল গৃহহীন সেই লোক। ঘুরে তাকাল পোর্টাররা তিনজনই।

নজর ফিরিয়ে নিল পোর্টার, দেখছে বিশপের মাকে। ভিজিটিং কার্ডের পেছন দিক থেকে চাবিটা আলগা করে নিয়েছে মহিলা। ঝুঁকে পড়ল এবার। তার গোড়ালিতে যে-অ্যাক্সেল মনিটর লাগানো ছিল, সেটা খুলে ফেলল চাবির সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে বিপ বিপ আওয়াজ করতে শুরু করল ছোট ওই বাক্স।

‘জেলখানার লোকজন টের পেয়ে যাবে না?’ জিজ্ঞেস করল সারা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রিয়ারভিউমিররের দিকে।

গাড়ির জানালার কাচ নামাল জেন ডো। মনিটর ধরিয়ে দিল অপেক্ষমান সেই লোকের হাতে। লোকটা দেরি না করে ওই মনিটর পরে নিল নিজের পায়ে।

বন্ধ হয়ে গেল বিপ বিপ আওয়াজ।

এবার গাড়ির ছাদে টোকা দিল গৃহহীন সেই লোক। তারপর গিয়ে ঢুকে পড়ল গলির ভেতরে। কোনো কথা বলল না জেন ডোর সঙ্গে।

পোর্টার বলল, ‘আমজনতা যে-রকম ভাবে, ওই অ্যাক্সেল মনিটর কিন্তু ততখানি ভরসা করার মতো উপযোগী না। যখন কোনো মোবাইল টাওয়ারের সংস্পর্শ পায় না ওসব জিনিস, তখন নিজের ভেতরেই সঞ্চয় করে রেখে দেয় বিশেষ কিছু ডেটা। তারপর আবার যখন সংস্পর্শ পায়, তখন সঞ্চয়-করে-রাখা ডেটা আপলোড করে। যেসব মনিটর পুরনো হয়ে গেছে, মানে যেসব মনিটর পায়ে নিয়ে কোনো না কোনো কয়েদি কোনো না কোনো জায়গায় গিয়েছে, দেখা যায়, সেগুলো প্রায়ই ভুলভাল ডেটা রিপোর্ট করে। যদি কোনো ডিভাইস থেকে কোনো ঝামেলার রিপোর্ট পাওয়া যায় এবং সেটা এক মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়, তা হলে সতর্কতা জারি করে দেয়া হয়। কিন্তু সেটা যদি এক মিনিটের কম হয়, তা হলে উপেক্ষা করা হয় ব্যাপারটা। জियो-ফেন্স বলে একটা কথা আছে এসব ডিভাইসের বেলায়। সেটার মানে হচ্ছে, জিপিএস-নিয়ন্ত্রিত একটা সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয় প্রতিটি কয়েদির বেলায়। জেন ডোর বেলাতেও সে-রকম কোনো একটা প্রোগ্রাম সেট করে তারপর ছাড়া হয়েছে তাকে। ওই ফেন্স যতক্ষণ পর্যন্ত না অতিক্রম করছে মহিলা, কেউ মাথাও ঘামাবে না তার ব্যাপারে। যা হোক, একটু আগে যে-লোককে দেখলাম আমরা, গতকালও তাকে দেখেছি আমি। আমার ক্যাব

ড্রাইভার বলল, লোকটা নাকি এখানকার কেউ না। আমার ধারণা, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল লোকটা।’

এসব আত্মস্থ করতে একটু সময় লাগল সারার। নার্ভাস দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে রিয়ারভিউমিররের দিকে। শেষে আবার তাকাল পোর্টারের দিকে।

ঘাড় না ঘুরিয়ে পোর্টার জানতে চাইল, ‘এবার ঠিক কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘কেন, আমার ছেলে কিছু বলেনি এ-ব্যাপারে? অবশ্যই শিকাগো। ওই শহরের কাছাকাছি যখন পৌঁছাবো আমরা, বিশেষ একটা ঠিকানা জানিয়ে দেবো আপনাদেরকে।’

আরও একবার হাসল জেন ডো।

বলা ভালো, আরও একবার সেই শয়তানি হাসি হাসল মহিলাটা।

বলল, ‘অ্যানসন না একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে? ওটা পড়তে চাই আমি। দেবেন, প্লিজ?’

“না” বলতে খুব ইচ্ছা হলো পোর্টারের।

মহিলাকে চোখের সামনে থেকে দূর হতে বলতে ইচ্ছা করছে ওর। বলতে ইচ্ছা করছে, সিটে বসে থাকুন, মুখটা বন্ধ রাখুন। কিন্তু সে-রকম কিছুই বলল না সে। বরং হাত বাড়িয়ে দিল গ্লাভ বক্সের উদ্দেশে। কুঁচকে যাওয়া হলদেটে কাগজগুলো বের করে নিল সেখান থেকে। তারপর ছুঁড়ে দিল গাড়ির পেছনের সিটের দিকে।

শুনতে পেল, কাগজগুলো হাতড়ে হাতড়ে কুড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে মহিলা। দৃশ্যটা দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না।

তাকাবেও না।

‘একটা ডায়েরিও না আছে? ইস্‌স্‌, ছেলেটার লেখা যে কী মিস করি আমি!’

বিশপের ছুরি এবং লিবি ম্যাকিনলের লকেটও রাখা আছে গ্লাভ বক্সের ভেতরে, জেন ডো ওই জিনিস দুটো দেখে ফেলার আগে বক্সটা লাগিয়ে দিল পোর্টার। তারপর খুলল সাদা-কালো সেই কম্পোজিশন বুক। ওটার যে-জায়গা পর্যন্ত পড়েছিল, হাজির হলো সেখানে। ‘আগে আমি পড়ে শেষ করবো এটা। তারপর আপনি নিতে পারবেন।’

সারার দিকে তাকাল জেন ডো। রিয়ারভিউমিররে একত্রিত হলো দু’জনের নজর। ‘আমি যতদূর জানি, আজ রাত আটটা পর্যন্ত আপনাদেরকে সময় দিয়েছে অ্যানসন। আর তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, কোথাও না থেমে একটানা এগোবো আমরা। ছেলেটা কোনো কারণে অপেক্ষা করতে থাকুক, এমন কিছু চাই না আমি। ওর মেজাজ আবার বিশেষ সুবিধার না, হুটহাট রেগে যায়। খেলা করার মতো কিছু একটা যে আছে ওর কাছে, বুঝতে পারছি। কাজেই জলদি যান, জলদি।’

পোর্টার বলল, ‘আপনার সঙ্গে যদি আমাদের কেউ কথা না বলে, তা হলে আপনি আর একটা কথাও বলবেন না। বোঝা গেছে?’



হ্যান্ডকাফ পরিহিত দুই হাত ঠোঁটের কাছে তুলল জেন ডো। অদৃশ্য একটা চাবি ঘোরাল... বিশেষ কোনো একটা ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করল পোর্টারকে। তারপর পড়তে শুরু করল হাতেধরা চিঠিটা।

নার্ভাস ভঙ্গিতে শেষবারের মতো রিয়ারভিউমিরর দেখে নিল সারা... দেখে নিল ওর পেছনে বসা মহিলাটাকে। তারপর মনোযোগ দিল রাস্তার ওপর। গতি বাড়াল বিএমডব্লু'র।

বলল, 'শিকাগো। ভালো কোনো পথযাত্রার মতো আর কোনোকিছু হয় না।'

১০১.
ডায়েরি

আজ একটা সবুজ আর্গাইল সোয়েটার পরেছেন ডক্টর অগলেসবি। তবে থাকি সেই প্যান্ট আছে আজও। কম্পনার দৃষ্টিতে দেখছি, তাঁর ক্লজিট ভরে উঠছে আর্গাইল সোয়েটারে। ও-রকম সোয়েটার নিয়মিত পরলে কেউ কি মনে মনে ডাক্তার হয়ে যেতে পারে? এই মানুষটা যদি সোয়েটারের বদলে প্রতিদিন টি-শার্ট, শার্টস আর ফ্লিপ-ফ্লপস পরতেন, তা হলে কি তিনি নিজের পছন্দের কারণে অন্য কোনো মানুষে পরিণত হতেন? কাপড় কি তাঁর ব্যক্তিত্ব বদলে দিতে পারত? কাপড় কি একটা মানুষকে বদলে দিতে পারে? নাকি উল্টোটা ঘটে? প্রথমে পরিবর্তন আসে ব্যক্তিত্বে, তারপর ক্যাজুয়াল কাপড় পরার একটা বাসনা আরও পেয়ে বসে একজন মানুষকে? আমি আসলে...

‘অ্যানসন? এখন ঠিক কোথায় আছ তুমি?’

‘দুঃখিত।’

‘ঠিক আছে, দুঃখপ্রকাশ করার কিছু নেই। তুমি যখন রুম ছেড়ে বের হও, তখন তোমার মন তোমাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যায়, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল আমার।’

‘এখানেই ছিলাম। কোথাও যাইনি।’

‘শারীরিকভাবে এখানে ছিলে। কিন্তু তোমার মন ছিল দূরের কোনো এক জায়গায়। কী নিয়ে ভাবছিলে, বলো তো?’

চশমাটা খুলে ফেলা হলো আবার। ওটা এখন ঝুলছে তাঁর ঘাড় থেকে।

‘ওই হলের কোনো একটা ঘরে একটা মেয়ে থাকে। কে সে?’

‘কীসের মেয়ে?’

‘আমার রুম থেকে দুই রুম পরে।’

কথাটা শুনে ভ্রু কুঁচকে গেল ডাক্তার সাহেবের। ‘তোমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে নাকি?’

চশমাটা উঠে গেল জায়গামতো। খসখস শব্দে নোটপ্যাডে কী যেন লিখলেন তিনি।

মাথা নাড়লাম আমি। ‘না, দেখা হয়নি। তবে ওই মেয়েকে কাঁদতে শুনেছি আমি। সেই কান্না শুনলে মনে হয়, মেয়েটার মনে অনেক দুঃখ।’

‘মেয়েটার কান্না শুনলে তোমার মনেও কষ্ট লাগে, তা-ই তো?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫০০



অরাজকতা



‘কষ্ট লাগা কি উচিত?’

‘অ্যানসন, তুমি কি কখনও কান্নাকাটি করো?’

জবাব দেয়ার আগে প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে হলো আমাকে। আমি এই সেন্টারে আসার পর খুব সম্ভব এই প্রথম এমন একটা প্রশ্ন আমাকে করলেন ডক্টর অগলেসবি, যেটা কৌতূহলী করে তুলেছে আমাকে, যেটার জবাব আমাকে দিতেই হবে। যা হোক, শেষ কবে কেঁদেছি, মনে করতে পারছি না। বাবা আমাকে কাঁদতে শিখিয়েছিলেন। ইচ্ছা হলেই কাঁদতে পারি আমি। ব্যাপারটা যেন এ-রকম... আমি তুড়ি বাজালেই আমার চোখে চলে আসে অশ্রু। কিন্তু শেষ কবে ও-রকম কোনো কাজ করার দরকার হয়েছিল আমার, মনে করতে পারছি না। আমি এসব নিয়ে ভাবতেও চাইছি না আসলে। তবে আমার মনে হয়, শেষ যে-বার কেঁদেছিলাম, সে-বারের ঘটনাটা ছিল রিডলি’র কুকুরছানাগুলো নিয়ে। এবং ওই কুকুরছানাগুলোর ব্যাপারে একটা কোনো কথা বলতে চাই না আমি... এখন তো না-ই, কখনোই না। বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, আমি যদিও জানি কীভাবে কাঁদতে হয়, তারপরও যারা আসল পুরুষমানুষ, কখনও কাঁদতে নেই তাদের... ওই কাজ করে না তারা। সত্যিকারের পুরুষমানুষ কখনোই কাঁদে না। সিনেমায় ডার্টি হ্যারিকে দেখলেই কেমন একটা ট্রাসের সঞ্চার হতো মনে। সে যখন খারাপ মানুষদের উদ্দেশে নিজের পিস্তল নাচাত, তখন যদি কোনো কারণে ভেঙে পড়ত কান্নায়, তা হলে কেমন হতো? আবার খারাপ মানুষরা যদি ওর উদ্দেশে নাচাত নিজেদের পিস্তল, আর তখন যদি চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে থাকত বেচারার, তখন আরও খারাপ হতো না ব্যাপারটা?

‘তুমি যখন জানতে পারলে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছ, প্রথমবারের মতো যখন বুঝতে পারলে তোমার বাবা-মা দু’জনই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছেন চিরতরে, যখন বুঝতে পারলে এই পৃথিবীতে তুমি ভীষণ একা, তখন কেঁদেছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

কথাটা বললাম, কারণ আমি জানি, ঠিক ওই কথাই শুনতে চাইছেন ডক্টর অগলেসবি। আমার মনে হয়, তিনি যে-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন আমাকে, সেটার জবাবে ওই উত্তরই সঠিক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, বিশেষ ওই সময়ে কাঁদিনি আমি একটুও। কাঁদার কোনো যুক্তিই নেই। যদি কাঁদতাম, সেটা কোনো কাজেই লাগত না আমার। আমার সেই কান্না কোনোকিছু বদলে দিতে পারত না। ওই সময়ে অশ্রু-বিসর্জন হতো সময়ের অপচয়মাত্র।

আমি আবার এই কাজ করি না। এমন কিছু করি না অথবা করতে চাই না, যার ফলে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে আবেগ।

‘এই সেন্টারে আসার পর থেকে একবারও কাঁদোনি তুমি।’

চশমাটা নেমে গেল আবারও।

‘অ্যানসন, কোনো মানুষ যদি না কাঁদে, তা হলে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন একটা লজ্জার না। বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের আবেগী প্রতিক্রিয়া দেখাই আমরা। তাতে কী হয়, জানো? তাতে বিভিন্ন রকমের দুর্দশা মোকাবেলার শক্তি পায় আমাদের শরীর। আর কেউ যদি আবেগ নামের ব্যাপারটা কোনো বোতলে ভরে রেখে দেয়, যদি নিজের ভেতরে চেপে রাখে, তা হলে সেটা হতে পারে সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আচ্ছা বলো তো, তুমি কি কখনও সোডার কোনো ক্যান নিয়েছ হাতে? তারপর সেটা ভালোমতো ঝাঁকিয়েছ? এবং এরপর ওপরের অংশটা ফটাস করে খুলেছ?’

‘আমি সোডা খাই না।’

‘ও-রকম কোনো ক্যান ঝাঁকালে যা ঘটে তা হলো, ভেতরের গ্যাস আন্দোলিত হয়। তারপর যখন খোলা হয় ক্যানের ঢাকনা, সেই আন্দোলন বেরিয়ে আসে। তুমি যদি না খোলো ওই ক্যান, গ্যাসের শক্তিটা রয়ে যায় ক্যানের ভেতরে। ব্যাপারটা ক্ষতিকর হতে পারে। অণুগুলো ছোটছুটি করতে থাকে ক্যানের ভেতরে, ক্রমেই আরও উত্তেজিত, আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে। কারণ তারা বুঝতে পারে, কোনো একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে, যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। এখন মনে করো সোডার কোনো একটা ক্যান ঝাঁকালে তুমি। তারপর সেটা দীর্ঘ সময়ের জন্য রেখে দিলে কোনো এক জায়গায়। এবার কী হবে, জানো? শেষপর্যন্ত যখন খুলবে ওই ক্যান, সোডাটা খেতে কিন্তু খারাপ লাগবে।’

‘সোডা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।’

‘তুমি ওই মেয়ের কথা বলছিলে। মেয়েটা কাঁদে, কারণ ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে ওর সঙ্গে। আরেকজন রোগীর বিস্তারিত ঘটনা তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারি না আমি, করাটা উচিতও না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যা ঘটে গেছে ওই মেয়ের সঙ্গে, তা এককথায় অচিন্তনীয়... এমন কিছু, যা আমি চাই না ঘটুক কারও বেলায়। এমনকী যে-মানুষটা আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে, গুল মারে, তার বেলাতেও না। ওই মেয়ে কাঁদে, কারণ কাঁদলে ভালো লাগে ওর। সে কাঁদে, কারণ কাঁদলে ওর মনের

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫০২



অরাজকতা



যন্ত্রণা কিছুটা হলেও কমে। কান্নাকাটি করা কিন্তু স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া। সঠিক প্রতিক্রিয়া। এখন কথা হচ্ছে, ওই মেয়েকে নিয়ে আমি যতটা না দুশ্চিন্তায় ভুগি, তার চেয়ে বেশি চিন্তা করি সেই মানুষটার জন্য, যে কিনা একেবারেই কাঁদে না। তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে চাই না আমি, অ্যানসন। কিন্তু ভুগছি।’

‘আমি ভালো আছি।’

‘হ্যাঁ।’ উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর অগলেসবি। গিয়ে হাজির হলেন তাঁর ডেস্কের আরেক দিকে। বাঁ দিকের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা টেনে খুললেন। ভেতর থেকে বের করলেন প্লাস্টিকের একটা জিপলক ব্যাগ। কী যেন লেখা আছে ব্যাগটার বাইরের দিকে। কিন্তু সেটা পড়তে পারছি না আমি। আমার সেই রেঞ্জার বাক নাইফটা দেখা যাচ্ছে ব্যাগের ভেতরে।

ব্যাগটা আমাদের দু’জনের মাঝখানে, ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর ফিরে এলেন তাঁর চেয়ারের কাছে। কলম দিয়ে খোঁচা মারলেন ব্যাগের গায়ে, খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেন সেটা। ‘ছুরিটা এককথায় দারুণ, অ্যানসন। ওটা কি তোমার বাবা দিয়েছিলেন তোমাকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাজি ধরে বলতে পারি, এই জিনিস ফিরে পেতে চাও তুমি।’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু আমি যদি নিজের কাছে রেখে দিই এই জিনিস, তা হলে? অথবা এটা যদি ছুঁড়ে ফেলে দিই কোথাও, তা হলে? আবার এমনও হতে পারে, এখানকার কর্মচারীদের কাউকে এই জিনিস দিয়ে দিতে পারি আমি। এত চমৎকার একটা ছুরি এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, ভাবলেও কেমন যেন লাগে।’

‘ওই ছুরি তো আপনার না যে, যাকে খুশি তাকে দিয়ে দেবেন।’

‘আমার না? কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ওটা আমারই। আইন কী বলে, জানো? আইন বলে, কোনো জিনিস যার দখলে থাকে, সেটার দশ ভাগের ন’ভাগ মালিক ওই মানুষটাই হয়ে যায়। এ-রকম কোনো কিছু কখনও শুনেছ তুমি? যা হোক, ছুরিটা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, সেজন্য ওটা আমাকে দিয়েছে পুলিশ। যে-কোনো ছুরি আসলে একটা অস্ত্র। তোমার মতো একটা ছেলে কেন কোনো অস্ত্র বয়ে বেড়াবে, সে-ব্যাপারে আসলে নিশ্চিত না আমি।’

ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছি একদৃষ্টিতে।

আসলে চাইছি আমার ওই ছুরির দিকে তাকাতে। কিন্তু ডক্টর অগলেসবি চাইছেন, আমি যাতে ওই কাজই করি। তিনি আমাকে দিয়ে যেসব কাজ করতে চান, সেগুলো করবো না আমি। কিছুতেই না।

ওই ব্যাগের গায়ে আরও একবার খোঁচা মারলেন তিনি। তারপর গিয়ে আরাম করে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে। ‘আচ্ছা মনে করো, এই ছুরি তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম আমি। এবার বলো তো, ওটা দিয়ে কী করবে? আমি কি সেক্ষেত্রে কোনো বিপদে পড়ে যাবো? এই সেন্টারে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে, তারা কি চিন্তায় পড়ে যাবে? তোমার মতো একটা ছেলে, যে কিনা কাঁদে না, সে এ-রকম একটা ছুরি দিয়ে ঠিক কী করবে, বলো তো?’

বুঝতে পারছি, কিছু একটা খোয়া গেছে ওই প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে। এমন কিছু একটা, যেটার ব্যাপারে রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠে ডক্টর অগলেসবিকে প্রশ্ন করতে চাইছে আমার মন। কিন্তু আমি জানি, ওই কাজ করতে পারবো না। আরেকটা কথা। মা এবং মিসেস কাটারের বিশেষ সেই ছবি আমার পকেটে ছিল। এখন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় আছে ওটা এই মুহূর্তে?

কল্পনার চোখে যেন দেখতে পেলাম, অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনো এক জায়গায় ওই ছবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর অগলেসবি। গভীর মনোযোগে দেখছেন ওটা। তাঁর ছোট মাথাটার ভেতরে খেলা করছে একগাদা নোংরা চিন্তাভাবনা। কোনো সন্দেহ নেই, সেসব নোংরা চিন্তাভাবনাকে বাতিল কোনো আর্গাইল সোয়েটার দিয়ে মুছে সরিয়ে ফেলছেন তিনি।

কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে না।

কোনো কাজই হবে না আসলে।

তাকালাম ওই ছুরির দিকে। ‘ওটা স্কুড্রাইভারের বিকল্প হিসেবে ভালো কাজে দেয়। তা ছাড়া ওটা কাজে লাগিয়ে আমি বিভিন্ন বাক্সপেটরাও খুলতাম। কখনও আবার কেটে আলাগা করে দিতাম পুরনো কোনো গাছের ছালবাকল। কখনও কখনও বাবা অথবা মায়ের গাড়ির টায়ারে ঢুকে আটকে যেত ছোট ছোট পাথর, ছুরিটার সাহায্যে সেসব বের করে আনতাম আমি। আসলে পকেটনাইফ সজ্জা-রাখার-মতো কাজের একটা জিনিস। এখন আমার এই ছুরি যদি নিজের কাছে রেখে দিতে ইচ্ছা করে

দ্য ফিফথ টু ডাই ৯ ৫০৪



অরাজকতা



আপনার, যদি ওটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে ভালো বোধ করেন আপনি, তা হলে করতে পারেন কাজটা, আমার আপত্তি নেই।’

হাসলেন ডক্টর অগলেসবি। ‘তুমি যে ওই কাজের অনুমতি দিলে আমাকে, সেজন্য খুশি হয়েছি, অ্যানসন। একটা কথা এক শ’ ভাগ ঠিক বলেছ... পকেটনাইফ কাজের একটা জিনিস। আমার বয়স যখন তোমার মতো ছিল, তখন আমিও পকেটে বয়ে বেড়াতাম একটা সুইস আর্মি নাইফ। যেখানেই যেতাম না কেন, আমার সঙ্গে থাকত ওই জিনিস।’

বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন, সুইস আর্মি নাইফ নাকি আসলে একটা মশকরা। বেটপ আকৃতির একটা জিনিস ওটা। কাজে লাগবে না, এ-রকম হাবিজাবি অনেককিছু দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একেজো বানিয়ে ফেলা হয়েছে ওই ছুরিকে। অথচ যে-মানুষটা একজন সত্যিকারের পুরুষ, সে কেবল একটা ছুরির সাহায্যেই সেরে নিতে পারে নিজের অনেক কাজ। যে-মানুষটা নিজের পকেটে কর্কস্কু, ছুরি, কিংবা ধাতব টুথপিক বয়ে বেড়ায়, সে আসলে করিৎকর্মা বলতে যা বোঝায় সে-রকম কেউ না। সে আসলে কেঁদে বুক ভাসানোর মতো একজন মানুষ। ডাটি হ্যারিকে কখনও কোনো সুইস আর্মি নাইফ বয়ে বেড়াতে দেখা যায়নি। কাজটা সে করতও না।

তবে এসব কথা আমি বললাম না ডক্টর অগলেসবিকে। কারণ আমার শেষ প্রতিক্রিয়ায়, মনে হচ্ছে, খুশি হয়েছেন তিনি।

নাকের একটা পাশ চুলকালেন ডাক্তার সাহেব। আঙুলটা চোখের সামনে মেলে ধরে দেখলেন কী যেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিতে দেখিয়ে দিলেন নিজের ডেস্কটা। ‘অ্যানসন, একটা কথা তুমি জানো কি না জানি না। পুলিশ ওই ছুরি আমাকে দেয়ার আগে ওটার ফলা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তারা আসলে কী খুঁজে পাওয়ার আশা করছিল, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না আমি। কিন্তু তোমার এই ছুরি ভালোমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তাদেরকে বাধ্য করেছে কিছু একটা।’

মিস্টার কার্টারের কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ে গেল, শেষপর্যন্ত কী দশা হয়েছে ওই লোকের। বাবা ওই লোককে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। তারপর সব টুকরো সুন্দরভাবে পেন্টিয়ে দিয়েছিলেন প্লাস্টিকের আবরণে। এরপর আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আমি যাতে ওসব টুকরো পাঠিয়ে দিই আমাদের সেই লেকের তলদেশে। প্লাস্টিকের প্রতিটা ব্যাগ লেকে ছুঁড়ে মারার আগে আমার ছুরিটা দিয়ে ওগুলো ফুটো করে

দিয়েছিলাম। তারপর ভারী পাথর বেঁধে দিয়েছিলাম সব ব্যাগে। লেকের মাছগুলোকে মাঝেমধ্যে ভালোমন্দ কিছু খেতে দেয়া উচিত... একবার আমাকে বলেছিলেন বাবা।

‘অ্যানসন, পুলিশ কী জানতে পেরেছে, জানো?’ চশমাটা নাকে দেয়ার জন্য ওটার উদ্দেশে হাত বাড়ালেন ডক্টর অগলেসবি। তারপর কী ভেবে করলেন না কাজটা। ঝুঁকলেন সামনের দিকে। ‘ব্লিচিং পাউডার-জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ভালোমতো ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলা হয়েছে তোমার এই ছুরির প্রতিটা জায়গা। আবার এমনও হতে পারে, আগের ছুরি বদল করে সম্পূর্ণ নতুন কোনোকিছু ব্যবহার করছ তুমি। ধরে নিলাম, যা বলেছ তুমি তা সত্যি... বাক্স খোলা, গাছের ছালবাকল তোলা, এবং কখনও কখনও স্কুড্রাইভারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা... এসব কাজেই ব্যবহার করেছ তোমার ছুরিটা। তারপরও আমার কাছে আশ্চর্য কী লাগছে, জানো? ছুরির গায়ে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করার দরকার হলো কেন তোমার। আমার ধারণা, পুলিশও এই ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।’

‘ঝকঝকে পরিষ্কার একটা ছুরির-ফলা ব্যবহার করতে ভালো লাগে আমার।’

সহসা আর কিছু বললেন না ডক্টর অগলেসবি। চুপ করে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় বললেন, ‘হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়।’

মিনিট দশেক পর।

আমাকে নিয়ে নিজের অফিস ছেড়ে বের হয়েছেন ডক্টর অগলেসবি, হল ধরে ফিরে এসেছেন আমার ঘরে।

ডাক্তার সাহেব যখনই নার্স স্টেশন ছাড়িয়ে আসেন, আমাকে দেখে হাসে গিলম্যান নামের এক নার্স। আমি কখনও হাসি না ওই মহিলার উদ্দেশে। আজ হাসলাম। একজোড়া চপ্পল আছে আমার পায়ে। আমার পায়ের মাপের চেয়ে বড়। ওটা ঠিক করার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। কখনও কখনও আমার পা পিছলে বেরিয়ে আসে এই চপ্পল জোড়া থেকে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫০৬



অরাজকতা



চতুর্থ দিন, সকাল ৮:২৮

ঠিকই বলেছিল ক্রোজ।

এখন পর্যন্ত আটটা শোকসংবাদ জোগাড় করতে পেরেছে সে; এগুলোর সবই জন এইচ. স্ট্রুজার, জুনিয়র হাসপাতালের কোনো না কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এবং তারচেয়েও বড় কথা, সেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সবই জলজ্যান্ত।

এসব মানুষের নাম ম্যাচ করা হয়ে গেল ওর। ক্রেয়ার তারপর লেগে গেল আরেক কাজে। যোগাযোগ করল হাসপাতালের এইচআর ডিপার্টমেন্টে। জোগাড় করে নিল ওসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর মোবাইল নম্বর। যা-যা ঘটে চলেছে, ফোন করে সবাইকে জানিয়ে দিল সেসব। তাদেরকে তুলে আনার জন্য পুলিশের কয়েকটা গাড়ি পাঠিয়ে দিল শহরের এখানে-সেখানে বিভিন্ন জায়গায়।

ওই মানুষগুলোকে এখানে, এই হাসপাতালে জড়ো করার কাজে গতকাল রাতের বেশিরভাগ সময় খরচ হয়েছে ওর। তাদেরকে আগেই বলে দেয়া হয়েছিল, সঙ্গে করে যাতে কিছুই না নিয়ে আসে। কোনো খাবার আনা যাবে না, প্রসাধনী সামগ্রী আনা যাবে না। বই, মোবাইল ফোন, এমনকী ব্যক্তিগত অন্য কোনো কিছুও আনা যাবে না। সঙ্গে থাকবে শুধু পরনের কাপড়। যা-যা লাগবে, সবাই আসার পর সেসব দেয়া হবে। যাদের পরিবার আছে, তাদেরকে পরিবারসহ আসতে বলা হয়েছিল। কাউকে কোথাও ফোন করার অনুমতি দেয়া হয়নি... বাসা থেকে বেরোনোর আগেও না, হাসপাতালে পৌঁছানোর পরও না।

সবাইকে এখানে, হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় জড়ো করেছে ক্রেয়ার।

সবাই বিরক্ত।

একজায়গায় বসে থাকতে থাকতে একরকমের অস্থিরতা পেয়ে বসল তাদেরকে। তাদের বেশিরভাগই অপেক্ষা করছে কখন ডিউটি শুরু হবে... যাতে এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। বাচ্চাকাচ্চাদের অবস্থা আরও খারাপ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বামী বা স্ত্রী যারা আছে, তাদের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না।

ক্যাফেটেরিয়াটা হাসপাতালের কেন্দ্রস্থলে। সহজেই পাহারা দেয়া যায় এই জায়গা। এখানে খাবার আছে প্রচুর পরিমাণে, আশ্রয় নেয়ার মতো জায়গাও আছে। কোনো একটা সেফ হাউসে নিয়ে গিয়ে এত লোককে রাখাটা সম্ভব হতো না ক্রেয়ারের পক্ষে। এমনকী একের বেশি সেফ হাউসে নিয়ে গিয়ে রাখাও সম্ভব হতো না। সেই সংস্থান নেই শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫০৭

ক্রেয়ার দেখতে পেল, ঘরের দূরের এক কোনা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে ন্যাশ। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ক্রেয়ারকে খুঁজে নিল লোকটা। ক্যাফেটেরিয়া পেরিয়ে এগিয়ে এল। এই জায়গা যে এখন একটা শরণার্থী শিবিরের মতো লাগছে, বুঝতে পারছে।

‘ট্রাকের সেই ছেলের নাম-পরিচয় জানা গেছে,’ কাছে এসে ক্রেয়ারকে বলল ন্যাশ। ‘নাম ওয়েজলি হার্টজলার। ঈশ্বরের সাক্ষী নামের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। সেটার একজন কর্মী ছিল সে। গতকালের কোনো এক সময় থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ছেলেটার। সকালে ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে কিছু আচার-অনুষ্ঠান থাকে, সেগুলোতে অংশ নিয়েছিল সে। তারপর বেরিয়ে পড়েছিল শহরে, নিজেদের দলে নতুন কাউকে ভেড়ানো যায় কি না, সে-চেষ্টায়।’

‘কোথায় গিয়েছিল ছেলেটা, জানা গেছে?’

মাথা নাড়ল ন্যাশ। ‘কর্মীরা কে কখন কোথায় যাবে, সে-রকম কোনো পরিকল্পনা করা হয় না ওই প্রতিষ্ঠানে। শুনলে মনে হয় নিয়ম-শৃঙ্খলা বলতে তেমন কিছু নেই প্রতিষ্ঠানটাতে। ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে যার যখন খুশি বেরিয়ে যাচ্ছে, যার যদিকে খুশি সেদিকে যাচ্ছে।’

‘একা গিয়েছিল ছেলেটা?’

‘না। তার সঙ্গে কেটি কুইগলি নামের একটা মেয়ে ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম মেয়েটার মায়ের সঙ্গে। ওই মেয়েও নাকি নিখোঁজ। অ্যান্ডার অ্যালাট জারি করে দিয়েছি আমরা। ওয়েজলি আর কেটির বাবা-মাদেরকে সোজা এখানে চলে আসতে বলেছি আমি, যাতে তাঁদের বিবৃতি নিতে পারি। আমার মনে হয়েছে, তাতে কাজের গতি বাড়বে।’ একটুখানি থামল ন্যাশ। ‘আরও কথা আছে। আইজলি জানিয়েছে, ভোঁতা কিছু একটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারা হয়েছিল ওই ছেলের মাথায়, আর সে-কারণেই মারা গেছে বেচারি। তার ফুসফুসে কোনো পানি পাওয়া যায়নি।’

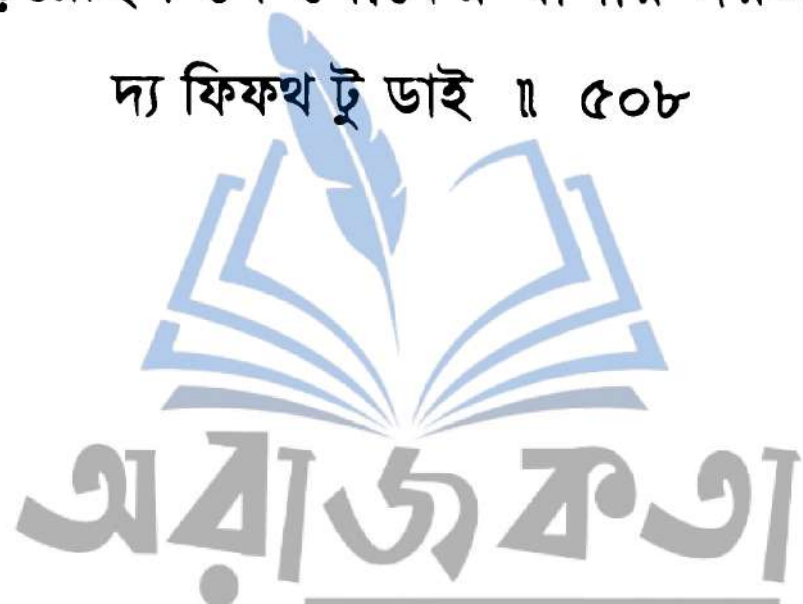
‘তার মানে হচ্ছে, কোনো রকমের অত্যাচার চালানো হয়নি ছেলেটার ওপর?’

‘আমার কী মনে হচ্ছে, জানো? আমার মনে হচ্ছে, ওই ছেলে আসলে কোনো একজনের পথে হাজির হয়ে গিয়েছিল... চলন্ত গাড়ির সামনে পড়ে গেলে একজন পথচারীর যে-অবস্থা হয়, অনেকটা যেন সে-রকম। আমাদের সেই রহস্যময় অচেনা লোক মেয়েটাকে রেখে দিয়েছে নিজের কাছে।’

নিজের মোবাইল ফোনে নোটস অ্যাপ চালু করল ক্রেয়ার। ওকে ক্রোজ যেসব নাম দিয়েছে, সেগুলো দেখতে লাগল। ‘কুইগলি অথবা হার্টজলার নামের কারও কোনো শোকসংবাদ দেখতে পাচ্ছি না।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ। ‘এমনও হতে পারে, ওরা আসলে হাজির হয়ে গিয়েছিল আমাদের বিশেষ সেই লোকের সামনে। হতে পারে, ঈশ্বরের ওই দুই সাক্ষী গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে-লোকের বাসার দরজায়। তারপর বিনা মেঘে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫০৮



অরাজকতা

বজ্রপাতের মতো দেখে ফেলেছিল এমন কিছু একটা, যা দেখাটা উচিত হয়নি ওদের...' থেমে গেল সে। কিন্তু কী বলতে চাইছে আসলে, বুঝতে পারছে ক্রেয়ার।

ঘরের এদিকে-সেদিকে তাকাল মেয়েটা। মোট আটজন সম্ভাব্য শিকারকে চিহ্নিত করেছে ক্রোজ। তাদের মধ্যে চারজনের ছেলে-মেয়ে আছে। সেসব ছেলে-মেয়েকেও হিসেবের মধ্যে রাখা হয়েছে। এবং তারা সবাই এখানেই আছে।

ক্রেয়ারের দৃষ্টি অনুসরণ করল ন্যাশ। 'ওই লোক যদি সত্যিই কেটিকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে থাকে, তা হলে আমি বলবো, কাজটা করতে তার সুবিধা হয়েছে বলেই করেছে সে। এমন না যে, এখানে যেসব বাচ্চা আছে, আমরা তাদের কাউকে তুলে নিয়ে যেতে দিইনি বলে কাজটা করেছে ওই লোক। আরেকটা কথা। আমরা খুঁজে পেয়েছি ছেলেটাকে, মেয়েটাকে পাইনি। আর তাই আমার মনে হচ্ছে, ওই মেয়ে এখনও বেঁচে আছে।'

'এমনও হতে পারে, জঘন্য সেই লোক এই মুহূর্তে অত্যাচার চালাচ্ছে মেয়েটার ওপর।'

'লোকটার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমছে।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। কেটি আর ওয়েজলি যেসব জায়গায় গিয়েছিল, সেখানে কি হেঁটে গিয়েছিল? যেখান থেকে রওনা হয়েছিল ওরা দু'জন, দরকার হলে সেখানে ইউনিফর্ম-পরিহিত পুলিশ অফিসারদের পাঠিয়ে দিন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর জোগাড় করতে বলুন তাদেরকে। আরেকটা কথা। অবশ্যই বলে দেবেন, যে-বাড়িতেই যাক না কেন তারা, কমপক্ষে যেন দু'জন যায় একসঙ্গে। আমরা চাই না, পুলিশ অফিসারদের কেউ একা গিয়ে হাজির হোক বিশপের সামনে। অথবা রহস্যময় সেই অচেনা লোকের সামনে।'

'ইতোমধ্যেই লোক লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এই কাজে। আইজলির সঙ্গে কথা বলা শেষ করামাত্র ডিসপ্যাচে ফোন করে যা বলার বলে দিয়েছি। আমিও এখন যাচ্ছি ওই জায়গায়।'

মাথা ঝাঁকাল ক্রেয়ার। তারপর ফোন করল এজেন্ট পুলকে।

শিকাগো থেকে সাত শ' আট মাইল দূরে, মোবাইলটা দ্বিতীয়বার বেজে ওঠামাত্র কল রিসিভ করল স্পেশাল এজেন্ট পুল। ওকে ওয়েজলি হার্টজলারের ঘটনাটা জানাল ক্রেয়ার। আরও জানাল, বিশপের সম্ভাব্য শিকারদের খোঁজ পাওয়া গেছে, ওই মানুষগুলোকে নিরাপদে একত্রিত করা হয়েছে হাসপাতালে।

'আমি চাই, এখন আমার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলে আপনি ফোন করবেন এসএআইসি হার্লসকে। আমার কমান্ডিং অফিসার তিনি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কী জানতে পারছে আপনাদের অফিসাররা, জানান তাঁকে। দরকার হলে লোক দিয়ে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন তিনি,' বলল পুল।

ক্লেয়ার টের পাচ্ছে, ওকে দেখছে ক্যাফেটেরিয়ার লোকজন। এখানে যাদেরকে নিয়ে এসেছে সে, তারা সবাই যেন চোখ দিয়ে দেখে মনের পর্দায় ধারণ করে রাখছে ওর প্রতিটা কাজকর্ম আর চালচলন। ক্যাফেটেরিয়ার প্রবেশমুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের দু'জন অফিসার, তাদেরকে ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে, হাজির হলো হলওয়াতে। 'খেলার শেষপর্যায়ে চলে গিয়েছিল বিশপ, আমরা বিঘ্ন ঘটিয়েছি সেটাতে। কাজেই এখন কোনো না কোনোভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইবে সে।'

'ওসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এখন না। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, যাদেরকে নিয়ে এসেছেন, তাদেরকে কীভাবে নিরাপদে রাখতে পারবেন, সে-ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া। আমরা খুঁজে বের করবো বিশপকে।' ও-প্রান্ত থেকে আসা শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে পুল। কণ্ঠ নিচু হলো ওর। 'ডিটেকটিভ, এখানে, এই লেক থেকে আরও পাঁচটা লাশ উদ্ধার করেছি আমরা। ছ'নম্বর লাশও পেয়েছি সম্ভবত। তবে সেটা পাওয়া গেছে খণ্ডিত অবস্থায়। টুকরোগুলো প্রথমে ভরা হয়েছিল প্লাস্টিকের কিছু ব্যাগে, তারপর সেসব ব্যাগ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল লেকের পানিতে। ওগুলো যাতে ডুবে যেতে পারে সেজন্য ভেতরে পাথর ঢুকিয়ে বাড়ানো হয়েছিল ওজন। পানিতে পচে নষ্ট হয়ে গেছে সব লাশ।'

'ঈশ্বর!'

'সেই ডায়েরিও এখন আমার হাতে। পোর্টার ওটা রেখে গেছেন আমার জন্য।' আবারও শোনা গেল কাগজের খসখস শব্দ। 'এখানকার একটা বাড়িতে লাগোয়া-অবস্থায় পাওয়া গেছে একটা মেইলবক্স। "বিশপ" শব্দটা লেখা আছে সেটার গায়ে। আমি এখন হাজির হয়েছি কাউন্টি প্রোপার্টি অ্যাগ্রেইজার-এর অফিসে। রেকর্ডপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছি।'

ক্লেয়ার বলল, 'ওসব নিয়ে কয়েক মাস আগে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম আমরাও। কিন্তু শেষপর্যন্ত নির্রেট একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছুই পাইনি। ন্যাশনাল ডেটাবেইস বলতে কিছুই নেই ওখানে। কাউন্টি ডেটা পাওয়ার জন্য আন্দাজে টিল ছুঁড়েছিলাম আমরা তখন। পৌরসভার রেকর্ড ঘেঁটে বিশপ নামের মানুষ পাওয়া গেছে বেশ কয়েকজন। শেষপর্যন্ত ইলিনয় এবং সেটার আশপাশের কয়েকটা রাজ্যে আমাদের খোঁজ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। সত্যি কথাটা যদি বলি... দক্ষিণ ক্যারোলিনাকে কখনও সেভাবে বিবেচনা করিনি আমরা।'

'হ্যাঁ, কখনও কখনও...' কথা শেষ না করে থেমে গেল পুল।

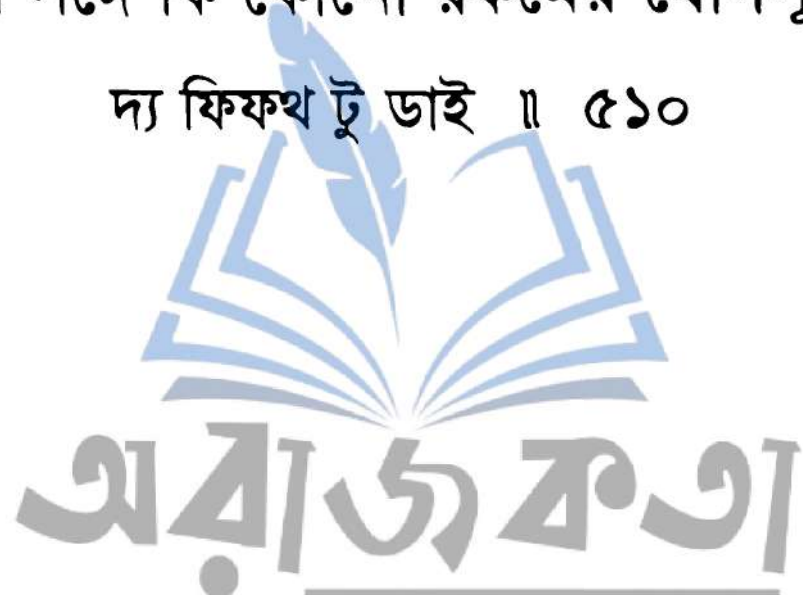
'কিছু একটা পেয়ে গেছেন নাকি?'

জবাব নেই ও-প্রান্তে।

'এজেন্ট পুল?'

'দক্ষিণ ক্যারোলিনার সঙ্গে কি কোনো রকমের যোগসূত্র আছে স্যামের?'

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫১০



অরাজকতা



‘চাকরিজীবনের শুরুতে ওখানে... আরও নির্দিষ্ট করে যদি বলি... চার্লসটনে ছিলেন তিনি। তারপর এসেছিলেন শিকাগোতে। কেন?’

‘ঠিক কোন বছরে শিকাগোতে গিয়েছিলেন তিনি?’

‘কেন?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পুল, আওয়াজ পাওয়া গেল ও-প্রান্ত থেকে। ‘ওই লোক এবং সংলগ্ন দুটো বাড়ির মালিকের নাম দেখতে পাচ্ছি স্যাম পোর্টার।’

পুলের এই কথা কেমন যেন ভারী ঠেকল ক্লেয়ারের কানে।

১০৩.
গ্যাবি
চতুর্থ দিন, সকাল ৮:৪৯

৫৭ নম্বর বাস থেকে ওয়েস্ট রুজভেন্টে নেমে পড়ল গ্যাবি ডিগান। এখান থেকে তিন ব্লক এগোলে ডেজিগনেটেড ড্রাইভারের অফিস। তুষার পড়ছে। বরফে ঢাকা ফুটপাতে দু'বার প্রায় পিছলে গিয়েছিল মেয়েটা।

ওই বিন্ডিং আকারে বেশি বড় না। কেমন যেন হোঁতকা। বর্গাকৃতির। ছাদটা সমতল। বিন্ডিংয়ের আশপাশে দেখা যাচ্ছে আধ ডজন সাদা হ্যাচব্যাক গাড়ি। ওসব গাড়ির গায়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে ডেজিগনেটেড ড্রাইভারের ব্র্যান্ডিং। শুধু তা-ই না, প্রতিটা গাড়ির বডিতে খালি-জায়গা বলতে যা-কিছু বাকি ছিল, সেখানে উজ্জ্বল লাল রঙে লিখে দেয়া হয়েছে “স্টুডেন্ট ড্রাইভার”। এই মুহূর্তে তুষারে ঢেকে আছে প্রতিটা গাড়ি। আবহাওয়ার কারণে আপাতত “সাইডলাইনে” বসিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিটা গাড়িকে, সন্দেহ নেই।

বাড়ির সামনের দিকের দরজাটা টেনে খুলল গ্যাবি। কাজটা করতে ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধতে হলো ওকে। মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর বয়সী এক মহিলা মুখ তুলে তাকাল। ট্রিবিউন পত্রিকা পড়ছিল সে। ক্রুঁচকে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। ‘সোনামণি, আজ তো আমাদের অফিস বন্ধ। কাগজপত্র নিয়ে কিছু কাজ ছিল আমার, সেগুলো করার জন্য এসেছি। যদি চাও তো আগামী সপ্তাহের জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে রাখতে পারি তোমার। ততদিনে আশা করছি আবহাওয়া ভালো হয়ে যাবে।’

গ্লাভস আর হ্যাট খুলে ফেলল গ্যাবি। এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে, যেখানে বসে আছে ওই মহিলা। কাউন্টারের আশপাশে কেমন যেন পোড়া কফির মতো গন্ধ আছে। ‘আমি আসলে এখানে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য আসিনি।’

ক্রুঁচ আরও কুঁচকে গেল মহিলার। মনোযোগ দিল হাতেধরা পত্রিকায়। ‘আজ কোনোকিছু কেনাটা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।’

‘আমার মনে হয়, আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল। ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমি।’ মোবাইল ফোনে লিলি ডেভিসের একটা ছবি বের করল গ্যাবি। তারপর স্ক্রিনটা বাড়িয়ে ধরল ওই মহিলার দিকে।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলো মহিলার। একটা মুহূর্তের জন্য মেয়েটার মনে হলো, ওকে চলে যেতে বলবে মহিলা। কিন্তু সে-রকম কিছু করল না মহিলাটা। বরং হাতের পত্রিকা নামিয়ে রাখল। তাকাল গ্যাবির ফোনের দিকে। ‘বাহ, মেয়েটা সুন্দর তো। ওকে কেন যেন পরিচিত লাগছে আমার।’ হাত বাড়িয়ে নিল ফোনটা। চেহারার সামনে নিয়ে গেল ওই জিনিস, চোখ-মুখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। ‘তোমরা

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫১২





ছোঁকরা-ছুকরিরা কীভাবে ব্যবহার করো এসব ছোট্ট জিনিস, মাথায় ঢোকে না আমার। আমার মোবাইলটা আবার আকারে ট্যাবলেটের সমান।’

‘এমনও হতে পারে, আমার বন্ধু এই সপ্তাহের কোনো এক সময়ে এসেছিল এখানে।’

মাথা একদিকে কাত হয়ে গেল মহিলার। একনজর তাকিয়ে নিল পত্রিকার দিকে। তারপর ফোনটা ফিরিয়ে দিল গ্যাবির হাতে। ক্র কুঁচকে রেখেছে এখনও। ‘জানি না কোন খেলা খেলার জন্য এখানে হাজির হয়ে গেছ তুমি। কিন্তু... তোমার কাজের কোনো প্রশংসা করতে পারছি না।’

‘আমি কোনো খেলা...’

কাউন্টারের পেছনে বসা মহিলা পত্রিকাটা তুলে নিল, বিশেষ এক কায়দায় ভাঁজ করল সামনের পৃষ্ঠা, তারপর সেটা নামিয়ে রাখল গ্যাবির সামনে। ‘আমার বোধহয় পুলিশে ফোন করা উচিত। তারপর তোমাকে জানানো উচিত, তারা কী বলল।’

আজ সকালের ট্রিবিউন পত্রিকাটার দিকে তাকাল গ্যাবি। আজ প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে লিলির ছবি। সঙ্গে ছাপা হয়েছে আরও দুটো মেয়ের ছবি। এদেরকে চেনে না গ্যাবি। একটা ছেলের ছবিও দেখা যাচ্ছে। হেডলাইনে লেখা হয়েছে: খুনির তৃতীয় শিকার। আরও একজন নিখোঁজ। পুলিশ হতভম্ব।

‘আমার বন্ধু কি এখানে এসেছিল?’

‘অবশ্যই না। যদি আসত, অবশ্যই মনে করতে পারতাম আমি। এখন তুমি যদি গিয়ে জনে-জনে বলে বেড়াও তোমার বন্ধু এখানে এসেছিল, তা হলে আমাদের উকিলের মোকাবেলা করতে হবে তোমার বাবা-মাকে।’

এই ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে ইচ্ছে হলো গ্যাবির। ইচ্ছে হলো, ওই মহিলার মুখের ওপর কিছুক্ষণ চিৎকার-চেষ্টামেচি করে। ইচ্ছে হলো মহিলাকে বলে, আপনার রেকর্ড চেক করে দেখুন। কিন্তু এসব কিছুই করল না সে। ওর পাশে, কাউন্টারের ওপর ছোট একটা স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিছু ভিজিটিং কার্ড। একটা কার্ড তুলে নিল সে। তারপর পরে ফেলল হ্যাট আর গ্লাভস। আর একটা কথাও না বলে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়।

এবং বাইরে আসামাত্র মোবাইলে লোড করল বিশেষ একটা ছবি। ওকে এই ছবি পাঠিয়েছিল লিলি। চিমটি কেটে জুম করল ওটা।

লিলির হাতে একটা আইপ্যাড দেখা যাচ্ছে। মেসেজ বলছে, একটা পুরস্কার জিতেছে সে। হাতের সেই ভিজিটিং কার্ডের দিকে তাকাল গ্যাবি। তারপর তাকাল ওই বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে।

ভিজিটিং কার্ডের ফোন নম্বর। এই বিল্ডিং। নিখর দাঁড়িয়ে থাকা ওই গাড়িগুলো। ছবিতে লিলির হাতেধরা আইপ্যাড। পুরস্কারটা নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ একটা নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল লিলিকে, ওই নম্বর।

কোনোকিছুই মিলছে না।

সবই কেমন যেন আলাদা মনে হচ্ছে।

এমনকী এরিয়া কোডও।

যে-নম্বর দেয়া হয়েছিল লিলিকে, সেটাতে ফোন করল গ্যাবি। মোবাইল ঠেসে ধরেছে কানের সঙ্গে। রীতিমতো গর্জন তুলে বয়ে চলেছে শীতের বাতাস, কানের পর্দায় বন্ধ করে দিতে চাইছে মোবাইলের আওয়াজ।

পাঁচবার রিং হওয়ার পর কেউ একজন জবাব দিল গ্যাবির ফোনকলের।

মেয়েটা যেন মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে একটু আগের সেই মহিলাকে... এখনও পত্রিকা পড়ছে।

‘ডেজিগনেটেড ড্রাইভার ড্রাইভিং স্কুল। কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’ লাইনের ও-প্রান্তের কণ্ঠ কেমন যেন কর্কশ। এবং সে-কণ্ঠ একজন পুরুষমানুষের। স্কুল শব্দটার “এস” উচ্চারণ করতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে লোকটার।



পুল

চতুর্থ দিন, সকাল ৮:৫০

‘ফোনে আপনি কী বলছেন, কান পেতে সে-কথা শুনতে চাইনি আমি। কিন্তু কাজটা করে ফেলেছি। আর তাই এখন জিজ্ঞেস না করে পারছি না... স্যাম কে?’

পুল যে-টেবিলের ধারে বসে কাজ করছে, সেটার আরেক প্রান্তে একটা টুলে বসে আছে শেরিফ হ্যানা ব্যানিস্টার। ওদের দু’জনের মাঝখানে আছে বেশ কয়েকটা ফাইল এবং বাক্স। কম্পিউটারে রেকর্ডের ঘাটতি আছে বলে বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে ওই মহিলা। এই কাউন্টি ছোট, তাদের বাজেট আরও ছোট। এখনকার সিস্টেমে ডেটা ইনপুট দেয়ার পরিকল্পনা যে ছিল না কর্তৃপক্ষের, তা না। কিন্তু যতবারই বিষয়টা সামনে এসেছে, আরও জরুরি কোনো না কোনো কাজে তহবিল খরচ করার দরকার হয়ে পড়েছে। ফলে কম্পিউটার থেকে যে-ডেটা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা মাত্র কয়েক বছরের পুরনো।

নিজের একপাশে ওই সহায়-সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ সুন্দর করে স্তূপ করে রেখেছে পুল। পোর্টারের নামটা যেন জ্বলজ্বল করছে ওসব কাগজে। ‘স্যাম পোর্টার একজন ডিটেকটিভ,’ হ্যানা ব্যানিস্টারের প্রশ্নের জবাবে বলল সে। ‘শিকাগো মেট্রো পুলিশে কাজ করছেন বর্তমানে। এই কিছুদিন আগেও ফোর মাস্কি কিলার টাস্ক ফোর্সের প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন তিনি।’

‘তো... কী এমন ঘটেছে এই কিছুদিনের মধ্যে?’

এই প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব না পুলের পক্ষে, অন্তত এখনই না। কারণ ঠিক কী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, সে-ব্যাপারে সে নিজেই নিশ্চিত না পুরোপুরি। ‘একটা ভুল করে ফেলেছেন তিনি। এমন কিছু কাজ করেছেন, যার ফলে ওই কেস পেয়ে বসেছে তাঁকে। ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে ফেলেছেন তিনি।’ যে-বাক্সটা নিয়ে কাজ করছিল পুল, সেটার দলিলপত্র দেখা শেষ করল, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ওটা। ‘অন্য কোথাও তাঁর নাম আর দেখতে পাচ্ছি না আমি। শুধু দেখতে পেয়েছি বিশেষ ওই সম্পত্তির বেলায়।’

টুলের ওপর আরাম করে বসল ব্যানিস্টার। হাই উঠতে চাইছিল, জোর খাটিয়ে চাপা দিল সেটা। ‘পোর্টার নামটা শুনে কিন্তু বিশেষ কোনো কিছু মনে পড়ছে না আমার। অথচ আমি এই এলাকাতেই বড় হয়েছি। এই যে এখানে এখন কাজ করছেন আপনি, এখান থেকে মাত্র চারটা বাড়ির পরে একটা ক্লিনিক আছে, সেখানে জন্ম হয়েছে আমার। আমাদের এখানকার যে-সমাজ, আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেশ গাঢ়ই বলা চলে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। কোনো কোনো পরিবার আবার করেছে কী... গত কয়েক বছরে তাদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে ডেভেলপারদের কাছে। যা হোক, একটা কথা ভাবতে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫১৫

ভালোই লাগে... এখানকার লোকজনের সঙ্গে ভালো একটা বোঝাপড়া আছে আমার। উচ্ছৃঙ্খল ছেলেপেলে যে একেবারেই নেই এখানে, তা না। কিন্তু সেটার বড় একটা কারণ হচ্ছে, এখানে করার মতো তেমন কিছু নেই। এই যে আজ এখানে এত লাশ আবিষ্কৃত হলো, অথচ এখানে শেষ খুনটা কবে হয়েছে, জানেন? প্রায় ছ'বছর আগে। এডিসন লিভলি নামের এক লোক প্রতারণা করছিল তার স্ত্রীর সঙ্গে। মহিলা একদিন ছুট করেই সিদ্ধান্ত নেয়, স্বামীর ওসব ছলচাতুরির সমাপ্তি ঘটাবে। আর তাই কয়েক চামচ আর্সেনিক মিশিয়ে দেয় ওই লোকের স্যুপে। তারপর ফোন করে সব কথা স্বীকারও করে পুলিশের কাছে। আমি যখন গিয়ে হাজির হই ঘটনাস্থলে, তখন দেখি, মহিলা চুপচাপ বসে আছে তাদের বাড়ির পোর্চে, অপেক্ষা করছে আমার জন্য। তার হাতে একগ্লাস লেমোনেড। শতাব্দীর জঘন্যতম অপরাধ বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনোকিছু ছিল না ওই ঘটনা।

পুল বলল, 'ডেভেলপারদের কথা বললেন আপনি। আচ্ছা, আর্থার ট্যালবট নামের কারও কথা কি জানেন আপনি? অথবা ট্যালবট এন্টারপ্রাইজের নাম কি কখনও শুনেছেন?'

'ওই নাম জানি আমি। তবে সেটা খবরের কল্যাণে। যা ঘটে গেছে ওই লোকের সঙ্গে, তা এককথায় পাগলামি। যা হোক, ওই লোক যদি এখানকার কোনো সহায়-সম্পত্তির ওপর নজর দিতেন, টাউন হলে বসেই সে-খবর পেয়ে যেতাম আমি। এখানে যখন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, আর আমাকে সেটার রিপোর্ট দাখিল করতে হয়, তখন ওই কাজে যে-সময় লাগে, তার চেয়ে কম সময়ে এখানকার কোনো জমিজমা বিক্রির খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।' মাথার ওপর লিগাল সাইজের একটা ফোল্ডার তুলে ধরল ব্যানিস্টার। 'পেয়ে গেছি।'

'কী পেয়ে গেছেন?'

'ওই যে এখানকার একটা বাড়িতে আগুন লেগেছিল না? যার ফলে পুড়ে বলতে-গেলে ছাই হয়ে গিয়েছিল মেইন হাউসটা? ওই ঘটনার রিপোর্ট।'

টেবিলের ওপর রেখে ফোল্ডারটা খুলল মেয়েটা। ভেতরে যা-যা আছে, উল্টেপাল্টে দেখছে। 'অগাস্ট, ১৯৯৫। তার মানে আমার জন্মেরও আগের ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। যে-মানুষটা এই রিপোর্ট লিখেছেন, তাঁর নাম টম ল্যাংলিন। এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত একজন মানুষ। তবে এই এলাকাতেই থাকেন। আপনি যদি মনে করেন তাঁর সঙ্গে কথা বললে কোনো ফায়দা হবে, তা হলে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে জায়গামতো নিয়ে যেতে পারি আমি। যা হোক, রিপোর্ট বলছে, পুরো বাড়ি নাকি ভিজিয়ে দেয়া হয়েছিল গ্যাসোলিন দিয়ে। দমকলকর্মীরা যতক্ষণে হাজির হয় জায়গামতো, ততক্ষণে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় সারা বাড়ি। ভেতরে পাওয়া যায় তিনটা মরদেহ। তিনজনই পুরুষ। রিপোর্ট বলছে, আগুনে ওই তিন লাশ এত বেশি পুড়ে গিয়েছিল যে, মৃত্যুর কারণটা পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়নি। তবে একজন বেঁচে গিয়েছিল। নাম

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫১৬



অরাজকতা



অ্যানসন বিশপ। সে-সময় বয়স ছিল বারো বছর। ছেলেটা লেকে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ফিরে আসে। দমকলকর্মীদের বিশ্বাস, যে-তিনজন পুরুষমানুষের লাশ পাওয়া গেছে ওই বাড়ির ভেতরে, তাদের একজন বিশপের বাবা। তাঁদের সন্দেহ, বিশপের মা-ই ওই আগুন লাগিয়েছিলেন। এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, জঘন্য সেই কাজ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মহিলার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠানো হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান জানতে পারেনি কেউ। যা হোক, ওই বাড়ির পেছনে একটা ট্রেইলার আছে। ওটা ভাড়া দেয়া হয়েছিল সাইমন এবং লিসা কার্টার নামের এক দম্পতির কাছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আগুন লাগার পর থেকে এই দম্পতিও নিখোঁজ। সন্ধান করা হয়েছিল এঁদেরকেও। কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। যা হোক, ক্যামডেন ট্রিটমেন্ট সেন্টার নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে... এই জায়গা থেকে বেশি দূরে না... ওই ছেলেকে পরে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় সেখানে।’

‘দেখতে পারি রিপোর্টটা?’

ফাইলটা পুলের দিকে বাড়িয়ে দিল ব্যানিস্টার।

বেজে উঠল পুলের ফোন। কল রিসিভ করল সে, স্পিকার মুড়ে দিল।

‘ফ্র্যাঙ্ক? আমি গ্র্যাঙ্গার। এইমাত্র কথা বললাম হার্লসের সঙ্গে। সবকিছু বললাম তাকে। লেকের পানিতে খোঁজ চলছে এখনও। তবে আমার মনে হয়, যা পাওয়ার ছিল, পেয়ে গেছি আমরা। পূর্ণাঙ্গ লাশ পেয়েছি পাঁচটা। আরও একটা লাশের খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে... আলাদা বেশ কয়েকটা ব্যাগের ভেতরে। তবে মেডিকেল একজামিনার না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আমি ওসব নিয়ে যাচ্ছি শার্লটে... এই জায়গা থেকে শার্লটই সবচেয়ে কাছের ল্যাবরেটরি আমাদের।’

‘ধন্যবাদ। কী পেলেন, জানাবেন আমাকে। যদি কোনো কারণে যোগাযোগ করতে না পারেন আমার সঙ্গে, হার্লসকে জানিয়ে দেবেন।’

‘আমি এখন আছি ওই বাড়িতে... এখানে আর কিছু বাকি রয়ে গেছে কি না, জানতে। আগুন যে লেগেছিল এখানে, কোনো সন্দেহই নেই। আমার অফিস রেকর্ডপত্র বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি।’

‘আমি কিছু ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছি। বিশেষ একটা ফাইল পেয়েও গেছি। দেখি শেরিফ ব্যানিস্টারকে দিয়ে স্ক্যান করিয়ে ওটা ই-মেইলে পাঠানো যায় কি না আপনার কাছে।’

‘কী পাওয়া গেছে ওই ফাইলে?’

ব্যানিস্টার যা-যা বলেছে, পুনরাবৃত্তি করল পুল।

‘আগুনের কবল থেকে বেঁচে গেছে ট্রেইলারটা। এবং দেখে যা মনে হচ্ছে, কেউ একজন সাম্প্রতিক সময়ে গিয়ে ঢুকেছিল ওটার ভেতরে। ওই ট্রেইলারের পেছনদিকে একটা বেডরুম আছে, তখনই করে ফেলা হয়েছে সেটা। কেউ একজন

বিছানা সরিয়েছে, মেঝের তক্তা খুলেছে। একটা ব্যাকপ্যাক উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। সেটা কাপড়ে-ভর্তি। কিছু ক্যাম্পিং গিয়ারও পাওয়া গেছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সবকিছু। কেউ একজন কিছু একটার খোঁজ চালিয়েছে সেখানে।’

টেবিলের এককোণায় রাখা ডায়েরিটা একনজর দেখে নিল পুল। ‘আমার মনে হয় ওই কাজ ডিটেকটিভ পোর্টারের।’

‘যা খুঁজছিল লোকটা, তা পেয়েছে কি না, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। যা হোক, ট্রেইলারের ভেতরে যা-যা পাওয়া গেছে, সেসবও শার্লটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবকিছুর ছবি তুলে রাখবো। চেষ্টা করে দেখছি ভারী কিছু যন্ত্রপাতি আনাতে পারি কি না। যদি পারি, অবশিষ্টাংশ বলতে যা আছে ওই বাড়ির, খোঁজ চালাবো সেখানে। লম্বা একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হয়তো এমন কিছু পেয়ে যেতে পারি আমরা, যার সঙ্গে লেকের ওই লাশগুলোর কোনো না কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে।’

টেবিলের ওপর রাখা পুলের মোবাইল ভাইব্রেট করে উঠল। কলার আইডি দেখা যাচ্ছে। ‘এসএআইসি হার্লস ফোন করেছেন আমার আরেকটা নম্বরে। আপাতত বিদায় বলতে হচ্ছে আপনাকে। কী কী জানতে পারলেন, জানাবেন আমাকে।’

‘ঠিক আছে।’

অন্য ফোনকলটা রিসিভ করল পুল। ‘এজেন্ট পুল।’

‘ফ্র্যাঙ্ক। আমার মনে হয় কিছু একটা পেয়ে গেছি আমরা। প্লেনে আবারও উঠে পড়ার সময় হয়েছে তোমার।’

‘কী পেয়েছেন?’

‘স্টেটভিলের প্রিজনগার্ডদের ব্যাপারে একটা কথা বলেছিলে তুমি। ঠিকই বলেছিলে। সেখানকার ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। এমন একজন গার্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে, লিবি ম্যাকিনলের তথ্য আদান-প্রদানের কাজে যে-লোক জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট কোনোকিছু প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি ওই লোকের বিরুদ্ধে। আর তাই অভিযুক্ত করা হয়নি তাকে। এসব খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরই বদলি করে দেয়া হয়েছিল লোকটাকে। সে কোথায় গেছে, অনুমান করতে পারো?’

‘কোথায়?’

‘নিউ অরলিন্সে।’

পোর্টারের সেই ডিসপোজেবল ফোন।

‘এ-রকম কোনো রেকর্ড কি পাওয়া গেছে, পোর্টারের সঙ্গে আগে থেকে চেনাজানার সম্পর্ক ছিল ওই গার্ডের? অথবা... তাঁরা দু’জন একসঙ্গে কাজ করছেন?’



‘এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে কথা হচ্ছে, আমি মাত্র পেলাম এসব তথ্য। এবং আমি এখনই এসবের পেছনে লোক লাগিয়ে দিচ্ছি।’ পুলকে বলল হার্লস। ‘বিশেষ সেই গার্ডের নাম ভিনসেন্ট উইডনার। এখন ডিউটি পালন করছে লোকটা, আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত তা করার কথা আছে। ওই জায়গায় যাওয়া দরকার তোমার। অরলিংসের ওয়ার্ডেনের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমার। তিনি বলেছেন, চেষ্টা করে দেখবেন কোনো বাহানায় উইডনারকে একটু আটকে রাখা যায় কি না... যাতে তুমি গিয়ে কথা বলতে পারো ওই লোকের সঙ্গে। তুমি যাওয়ার আগপর্যন্ত লোকটাকে কিছুই জানানো হবে না। আমরা চাইছি না, গোপন কোনো খবর চলে যাক লোকটার কাছে। যা হোক, গ্র্যাঙ্গারের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমার। লোক থেকে কী কী পাওয়া গেছে, আমাকে জানিয়েছে সে। এবার আমাদের যা করতে হবে তা হলো, ভালোমতো চেপে ধরতে হবে উইডনারকে... যা-যা জানে সে, জেনে নিতে হবে। আরও একটা কাজ করতে হবে আমাদের... পোর্টারের যত কাছে যাওয়া সম্ভব, যেতে হবে। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে ওই লোক।’

বিশেষ ওই সম্পত্তির দলিলপত্রে কী পাওয়া গেছে, হার্লসকে বলল পুল।

‘এসব খবর যাতে ফাঁস না হয়, খেয়াল রেখো। ভালোমতো না জেনে কোনো খবর নিয়ে নাচানাচি শুরু করে দিক সংবাদমাধ্যম, এমনটা চাই না আমি।’

‘জি, স্যর।’

‘ডিটেকটিভ নর্টনের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমার। শিকাগো পুলিশ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য চারটা দল পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, যাচ্ছে তারা জায়গামতো। পোর্টারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও কথা বলবো। কী ঘটছে না-ঘটছে, জানা দরকার তাঁর।’

‘জি, স্যর।’

লাইন কেটে দিল হার্লস।

শেরিফ ব্যানিস্টারের দিকে তাকাল পুল। ‘আপনার গাড়িতে করে আমাকে গ্রিনভিল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন?’

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড ওই মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিল পুল। ‘আর কোনোকিছু যদি খুঁজে পান, জানাবেন আমাকে। এসএআইসি হার্লসকেও জানাতে পারেন। কার্ডের উল্টোপিঠে তাঁর নম্বর আছে। আর ওই ফাইলটা যত জলদি সম্ভব পাঠিয়ে দেবেন গ্র্যাঙ্গারের কাছে।’

হেঁ মেরে ডায়েরিটা তুলে নিল পুল। তারপর রওয়ানা হলো দরজার উদ্দেশে। প্রেনে পড়বে ওই ডায়েরি।

১০৫.
ডায়েরি

এখন রাত তিনটা বেজে সাত মিনিট।

বিছানায় শুয়ে আছি আমি। জেগে আছি।

ওই মেয়ে আবারও কাঁদতে শুরু করেছে। কান্নার ভিজিটা কেমন যেন উগ্র।

ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি আমি।

আমার ওই ছুরি, কোনো সন্দেহ নেই, ডক্টর অগলেসবির ডেস্কের ড্রয়ারে আছে।

ছবিটাও কি আছে সেখানে?

এই ব্যাপারে আমি আসলে নিশ্চিত না। তবে কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, ডাক্তার সাহেব ওই ছবি নিজের কাছে রাখতে চাইছেন। আমি ছবিটা দেখতে চাইছি এই মুহূর্তে। যদি চোখ বুজি, পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে স্বরণ করতে পারি ছবিটা। মনে করতে কোনো কষ্টই হয় না, একটা বিছানায় শুয়ে আছেন মিসেস কাটার। শরীরটা জড়িয়ে রেখেছেন চাদর দিয়ে। তাঁর পাশে শুয়ে আছেন আমার মা। মিসেস কাটারকে যেদিন লেকের ধারে দেখেছিলাম, সে-দিনটা যেভাবে মনে করতে পারি, ঠিক একইভাবে মনে করতে পারি ওই ছবিও। মনে করতে পারি সেদিনের কথা, যেদিন ওই মহিলাকে দেখেছিলাম তাঁদের কিচেনে...

কাঁপছেন তিনি। ‘আমার মনে হয় আমি চেয়েছিলাম তুমি যাতে দেখো। মাছ ধরার ছিপ নিয়ে ওই জায়গায় যেতে দেখেছিলাম আমি তোমাকে। তুমি যে সেখানে আছ, সেটা জানা ছিল আমার।’

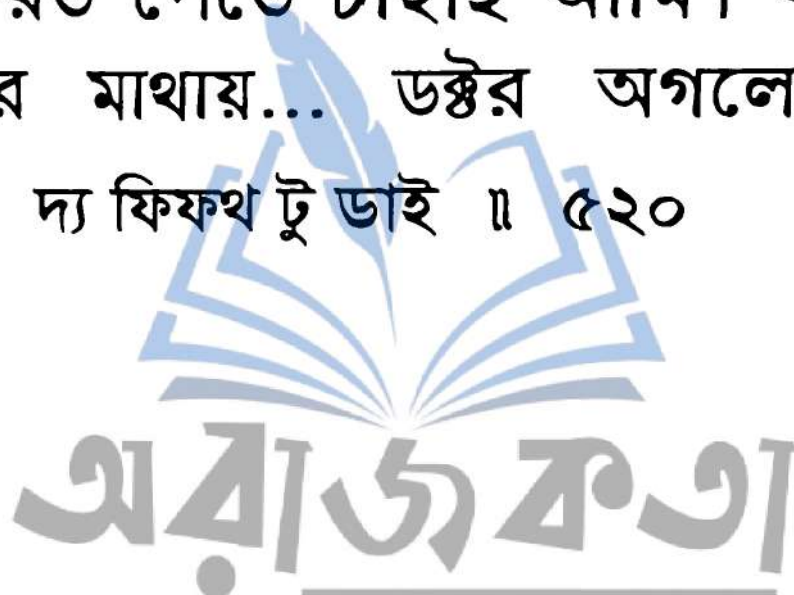
‘তা হলে আপনি কেন...’

‘কখনও কখনও কোনো কোনো মেয়েমানুষ চায়, তাকে কামনা করুক কেউ না কেউ, এর বেশি কিছু না।’ আমার হাত থেকে বোতলটা বলতে গেলে ছিনিয়ে নিলেন তিনি, চুমুক দিলেন আবারও। ‘কী মনে হয় তোমার, বলো তো? আমি কি সুন্দরী?’

হ্যাঁ, মিসেস কাটার যে সুন্দরী একজন মেয়েমানুষ ছিলেন, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই আমার।

ছবিটা এখন ফেরত পেতে চাইছি আমি। যখনই একটা চিন্তা ঢুকে পড়ছে আমার মাথায়... ডক্টর অগলেসবি হাতে ধরে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫২০



রেখেছেন ওই ছবি, নির্নিমেষ দেখছেন ওটা, বলতে গেলে ঢুকে যাচ্ছেন ছবিটার ভেতরে... তখনই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে আমার পাকস্থলী। ওই ছবি দেখার কোনো অধিকার নেই তাঁর। বিশেষ সেই ছবি তাঁর জন্য না।

কান্নার আওয়াজ আরও বেড়েছে। মনে হচ্ছে, মেয়েটার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

হলের টাইলস-করা মেঝেতে শোনা গেল নার্স গিলম্যানের জুতোর আওয়াজ।

মহিলা এবার গিয়ে শান্ত করবে ওই মেয়েকে। পুরো ব্যাপারটা যেন কোনো পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় রীতিমতো চেষ্টাতে শুরু করে মেয়েটা। তখন শোনা যায় নার্স গিলম্যানের আওয়াজ। ওই মেয়ে যে-ঘরে আছে সে-ঘরের দরজা থেকে ক্লিক-জাতীয় একটা আওয়াজ আসে। তারপর একসময় আন্তে আন্তে শান্ত হয়ে আসে মেয়েটা, ফোঁপাতে থাকে। এবং শেষপর্যন্ত চুপ হয়ে যায়।

চাদরের নিচ দিয়ে একটা পেপারক্লিপের অস্তিত্ব ঠাহর করে নিচ্ছি আঙুলের সাহায্যে, নাড়াচাড়া করছি ওটা। একটা কথা মাথায় আছে আমার। সেই ক্যামেরা। আমি নিশ্চিত, এয়ার ভেন্টের আড়াল থেকে ওটা সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলেছে আমার ওপর।

টাইলস-করা মেঝে থেকে এই পেপার ক্লিপ তুলে নিয়েছি আমি... স্লিপার ঠিক করার জন্য যখন ঝুঁকে পড়েছিলাম, তখন। কার কাছ থেকে কীভাবে ওটা পড়ে গিয়েছিল ওই জায়গায়, জানি না। জানার কোনো ইচ্ছাও নেই। এ-মুহূর্তে আমার জন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ওই জিনিস আছে আমার কাছে। জানি, ওটা দিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলতে পারবো। এবং করবো আমি কাজটা... যখন সময় হবে, তখন। সে-সময় এখনও হয়নি।

কেমন একটা চাপা ফোঁপানির আওয়াজ ভেসে এল ওই মেয়ের ঘর থেকে। তারপর সবকিছু চুপচাপ।

আচ্ছা, মেয়েটা দেখতে কেমন?

ওর বয়স কত?

আমি মেয়েটাকে যেন দেখতে পাই চোখের সামনে। দেখতে পাই, পলকা সেই মেয়ে চাদরে-মোড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে বিছানায়। তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে নার্স গিলম্যান। তারা দু'জন...

বিশেষ সেই ছবি ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে।
ওই ছবি ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব না।

রাতের বেলায় বের হতে হবে আমাকে।

এখানে রাতে কর্মচারীদের সংখ্যা কমে যায় অনেক।

হলে দু'জন নার্সের বেশি কারও আওয়াজ পাইনি আমি একবারও রাতের বেলায়। কখনও আবার মনে হয়েছে, পুরো হলে আমি যেন একা। আবার কখনও আমার মনে পড়ে গেছে, হলের শেষমাথায় একজন গার্ড আছে। আমাকে যা করতে হবে তা হলো, আমার ঘর থেকে পালিয়ে বের হতে হবে, হাজির হতে হবে হলে। তারপর নার্স স্টেশনটা ছাড়িয়ে এগোতে হবে ডক্টর অগলেসবির অফিসের উদ্দেশে। খুলে ফেলতে হবে ওই অফিসের দরজার তালা (আমার দরজায় যে-তালা আছে সেটা খুলবার চেয়ে ওই তালা খোলাটা সহজ বেশি)। ভেতরে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হলো... ছুরিটা উদ্ধার করে নেয়া কঠিন কিছু হবে না।

ওই ছুরি দরকার আমার।

ওটা ছাড়া গার্ড আর নার্সদের সামলানোটা ঝামেলা হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, গার্ড আর নার্সদের পার না হয়ে ছুরিটা হাসিল করা সম্ভব না আমার পক্ষে। এবং এটাও একটা সমস্যা। সত্যি বলতে কী, এটা বড় রকমের একটা সমস্যা।

আরও কথা আছে। হলের জায়গায় জায়গায় ক্যামেরা আছে।

আজ যদি আমার জায়গায় বাবা থাকতেন, বুঝে যেতেন কী করতে হবে তাঁকে। কখন কী করতে হবে, সবসময়ই জানা ছিল বাবার।

বৃষ্টি থামেনি এখনও। আমার ঘরের জানালায় বৃষ্টির ঝাপটা গুনতে পাচ্ছি নিয়মিত বিরতিতে।

এখানকার বৈদ্যুতিক বাতিগুলোর আলো কেমন যেন মিটমিট করছে।

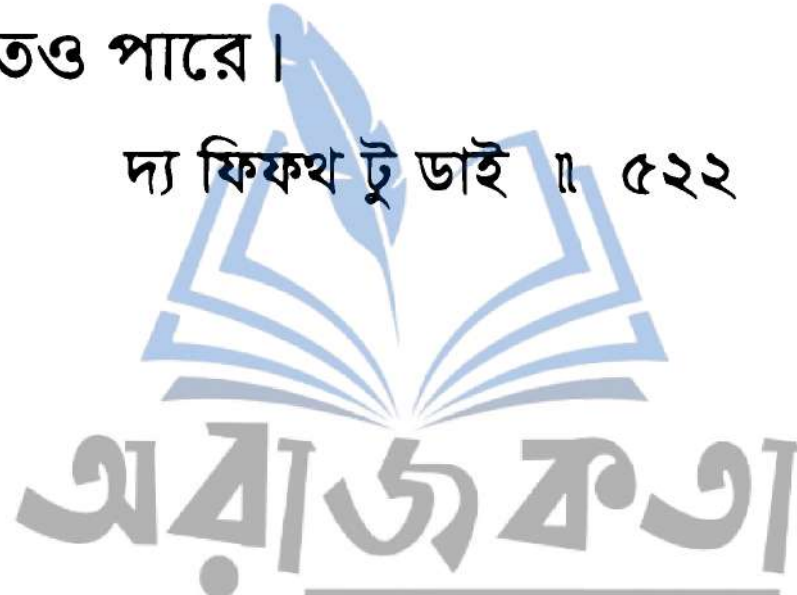
আচ্ছা, এখন যদি কোনো কারণে বিদ্যুৎ চলে যায়, তা হলে কাজ করবে কোনো ব্যাকআপ জেনারেটর?

কল্পনার চোখে দেখে নিলাম, ও-রকম কিছু একটা আছে এখানে।

আবার হয়তো না-ও থাকতে পারে।

অথবা থাকতেও পারে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫২২



অরাজকতা



তবে একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই... নার্স গিলম্যানের হাসিটা সুন্দর।

আচ্ছা, ওই যে মেয়েটা... প্রতিদিন কাঁদে যে... সে কি কখনও হাসে? যদি হাসে, তখন দেখতে কেমন লাগে ওকে?

চোখ বুজে ফেললাম আবার। মনের পর্দায় ফিরিয়ে এনেছি হলুয়েটা।

আমার জায়গায় আজ যদি বাবা থাকতেন, এই ধাঁধার সমাধান বের করাটা কোনো ব্যাপারই হতো না তাঁর জন্য।

আমিও বের করবো ধাঁধার সমাধান।

১০৬.
ক্রেয়ার
চতুর্থ দিন, সকাল ১০:১২

জন এইচ. স্ট্রজার, জুনিয়র হাসপাতালে হাজির হয়ে ছোট একটা অফিস রুমকে নিজের বলে দাবি করে নিয়েছে ক্রোজ; সেখানে, একটা স্পিকারফোনের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে আর ক্রেয়ার। দু'জনের দেহভঙ্গিমায় কাজ করছে কেমন একটা অনিশ্চয়তা। এই ঘর অব্যবহৃত কোনো একজামিনেশন রুমের চেয়ে বেশি কিছু না। এখানে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেক বাক্স। সঙ্গে আছে সেকলে আর প্রায় অচল কিছু যন্ত্রপাতি। ক্যাফেটেরিয়ার পাশে যে-হল আছে, সেটার একপ্রান্তে অবস্থান এই ঘরের। খুশির খবর হচ্ছে, ঘরটা, ক্যাফেটেরিয়ায় যেসব মানুষ আছে, তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

ফোন লাইনের ও-প্রান্তে আছে ন্যাশ। পুল যা-যা জানিয়েছে ক্রেয়ারকে, সেটা আবার ন্যাশ আর ক্রোজকে বলেছে মেয়েটা।

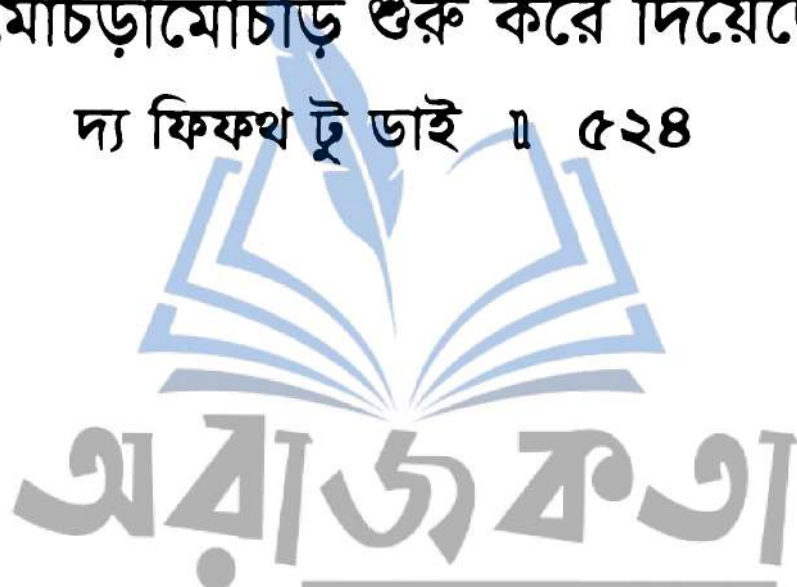
ন্যাশ সম্ভবত হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে ওর মোবাইল। কারণ চিৎকার করে কিছু একটা বলল সে, কিন্তু সেটা শুনতে পেল না ক্রেয়ার। কেমন যেন চাপা মনে হলো ন্যাশের কণ্ঠ। কিছুক্ষণ পর ঠিকমতো শোনা গেল ওর গলার আওয়াজ। 'এসব ফালতু কথা। এবং তোমরাও জানো সেটা। ঠিক না?'

পাণ্ডুর হয়ে গেছে ক্রোজের চেহারা। ওর বড়সড় ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে যে-আলো বের হচ্ছে, সেটাতে কেমন যেন স্বচ্ছ মনে হচ্ছে চেহারাটা। 'এই কাজ বিশপের,' বলল সে। 'কীভাবে জানি না, কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, কাউন্টি প্রোপার্টি রেকর্ড নিয়ে প্রতারণা করেছে লোকটা।'

এই কথা বিশ্বাস করতে চাইছে ক্রেয়ারও। 'ব্যাপারটা যদি ইলেকট্রনিক কোনো কিছু হতো, তা হলে হয়তো প্রতারণা করাটা সম্ভব ছিল বিশপের পক্ষে। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ? পুল বলেছেন, ডজনখানেক বাক্স নাকি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে তাঁকে। ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন পুরনো কয়েকটা ফাইল কেবিনেটও। তাঁর সঙ্গে তখন ছিল ওই জায়গার শেরিফ। এবং ওসব দলিল খুঁজে বের করার জন্য পৌরসভা ভবনের বেসমেন্টে হাজির হতে হয়েছিল তাঁদের দু'জনকে। এখন কথা হচ্ছে, যদি ধরেও নিই বিশপ গিয়ে হাজির হয়েছিল ওই একই জায়গায়... আমার কোনো সন্দেহ নেই কাজটা করেছিল সে-লোক... সে জানল কী করে আসল কাগজ কোথায় আছে? কারণ পুলের কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, কাগজপত্রের একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থা ওই জায়গায়। আসল দলিল সরিয়ে নকল দলিল জায়গামতো রেখে দিতে পারল সে... কীভাবে করল কাজটা?'

ক্রোজের মনে হচ্ছে, মোচড়ামোচড়ি শুরু করে দিয়েছে ওর মস্তিষ্ক।

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৫২৪





এবং এই ব্যাপারটা ওই লোকের চোখ দেখে ঠাহর করে নিতে পারছে ক্রেয়ার। ‘কাজটা যে এত সহজ কোনোকিছু, তা মনে হয় না আমার। একটু ভাবুন। কাগজের কোনো ডকুমেন্ট। তার মানে ওই পৌরসভা ভবনে যদি গিয়েও থাকে বিশপ, কাজটা দু’বার করতে হয়েছে তাকে। প্রথমবার গিয়ে চুরি করেছে আসল দলিল। তারপর দ্বিতীয়বার যখন গেছে, তখন আসলটা সরিয়ে নকলটা রেখে এসেছে। আরেকটা কথা। আসল দলিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য টুকে নিতে সময় লেগেছে তার। নকল দলিলে একই ফন্ট ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে। ব্যবহার করতে হয়েছে একই ফরম্যাট। কাগজের ধরনও একই রকম রাখতে হয়েছে। এসব কাজের তুলনায় ইলেকট্রনিক কোনো রেকর্ডে কারচুপি করা কিন্তু অনেক সহজ। শুধু হ্যাক করতে পারলেই হলো... দূরে কোথাও বসে কিবোর্ডে কয়েকটা কি চাপলেই হলো। ব্যস, মুছে গেল আগের সমস্ত রেকর্ড। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ হলো সেকেলে জিনিস। ওসব নিয়ে কারচুপি করা কঠিন।’

‘কঠিন, কিন্তু অসম্ভব কোনোকিছু তো না,’ বলল ন্যাশ।

‘ঠিক। যা হোক, মনোযোগ ধরে রাখা দরকার আমাদের,’ বলল ক্রেয়ার। ‘মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে চলবে না। যে-খোঁজ চলছে, সেটার খবর কী?’

‘চারটা ব্লক দেখা শেষ আমাদের। এখানে আমরা আছি, এফবিআই-এর লোকেরা আছে। অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। আবহাওয়া খারাপ। আমাদের কাজের গতি তাই ধীর,’ বলল ন্যাশ।

ক্রেয়ার দিকে তাকাল ক্রেয়ার। ‘শোকসংবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর কাউকে পাওয়া গেছে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রেয়ার। একটা কলম তুলে নিল। দু’আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে লাগল ওটা। নজর ফিরে গেছে ল্যাপটপের ওপর। ‘আরও ডেটা দরকার আমার।’

‘আপনার জন্য তো ডেটার ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর রেকর্ড দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাকে।’

মাথা ঝাঁকাল ক্রেয়ার। ‘কাজে লেগেছে ব্যাপারটা। শোকসংবাদের সঙ্গে মিলিয়ে অ্যানসন বিশপের আরও আটজন সম্ভাব্য শিকারকে চিহ্নিত করতে পেরেছি আমি। এই শহরে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেসবের কোনো না কোনোটাতে ছাপা হয়েছিল ওসব খবর। ক্যাফেটেরিয়ায় আপনি যে-তাঁবু শহর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানেই আছে ওসব লোক। যা হোক, একটা ঝামেলাও কিন্তু আছে। যে-তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে নিজের শিকারে পরিণত করেছে বিশপ... মানে, রেনল্ডস, ডেভিস আর বিয়েলের কথা বলছি... তাঁদের মধ্যে একমাত্র ডেভিসই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ করতেন এই হাসপাতালে। রেনল্ডস কাজ করতেন ইউনিমেড হেল্থকেয়ার আমেরিকাতে, বীমার বিক্রয়-প্রতিনিধি হিসেবে। ডার্লিন বিয়েল ছিলেন ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি। এই হাসপাতালের যারা ভেঙে, তাদের কিন্তু কোনো এমপ্লয়ি রেকর্ড নেই এখানে।’

‘নেই তো কী হয়েছে? জোগাড় করে নিন,’ বলল ক্লেয়ার।

তুড়ি বাজাল ক্লেজ। ‘আপনি বললেন আর হয়ে গেল, নাকি? এই হাসপাতাল যে-রকম বড়, এ-রকম বড় কোনো হাসপাতালে কতজন ভেড়র কাজ করতে পারে, সে-ব্যাপারে কোনা ধারণা আছে আপনার?’

‘ক্লেজ, কোনো খেলা খেলার মতো সময় কিন্তু নেই আমাদের হাতে।’

‘দু’শ’ তেত্রিশ,’ বলল ক্লেজ। ‘মিনিট বিশেক আগে ওই তালিকা এসেছে আমার হাতে। আমাদের মেট্রো অফিসে একটা দলকে কাজে লাগিয়ে এসেছি... বিশেষ সেই তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে ওরা। তবে সময় লাগবে কাজটা শেষ করতে।’

ক্লেয়ার বলল, ‘যা হোক, মোদা কথা হচ্ছে, আরও আটজন সম্ভাব্য শিকারকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন আপনি, যাঁরা কিনা এখন এই হাসপাতালেই আছেন। কিন্তু বিশপ ইতোমধ্যেই যে-তিনজনকে নিজের শিকারে পরিণত করেছে, তাঁদের দু’জনই কাজ করতেন এই হাসপাতালের বাইরে। তার মানে, যাদেরকে শেষ করে দিতে চাইছে বিশপ, তাদের সংখ্যাটা আরও বেশি?’

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ক্লেজ। ‘সে-কথাই বলছি আমি। মাত্র আটটা পরিবারকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু আমার মনে হয় না তাতে বিশপের কাজের গতি ধীর হবে। অথবা বলা যায়, আমাদের সেই অচেনা লোকের কাজের গতি ধীর হবে। অথবা ওই দু’জনেরই কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে বিশপ যা করবে তা হলো, কোনো তোয়াক্কাই করবে না এসবের, তার তালিকায় থাকা অন্য কোনো একজনকে খুঁজে বের করবে, তারপর হাত বাড়াবে ওই লোকের দিকে।’

ক্লেজের ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লেয়ার। ‘এখানে যে-তালিকা দেখতে পাচ্ছি, এটাই কি সেই ভেড়রদের তালিকা?’

‘হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত এ-ক’জনকেই খুঁজে বের করতে পেরেছি আমরা।’

নামগুলো সময় নিয়ে পড়ল ক্লেয়ার। ‘আমার মনে হয়, যখন যাকে খুশি লাগছে তখন তাকে নিজের শিকারে পরিণত করছে না বিশপ। কোনো না কোনো একটা পদ্ধতি অনুসরণ করছে সে।’

‘সে-কারণেই তো আজ এখানে হাজির হয়েছি আমরা। একটা কথা বলা যায়... বিশপের হাতে এখন পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক যে-ক’জন খুন হয়েছেন, তাঁদের সবাই কাজ করতেন মেডিকেল ফিল্ডে।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু মেডিকেল ফিল্ডে বিশেষ কী কাজ করতেন তাঁরা? মানে, আমি বলতে চাইছি... এমন কী ছিল ওই তিনজনের মধ্যে, যা তাঁদেরকে গঁথে ফেলেছে একই সুতোয়? কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো সুতো তো আছে অবশ্যই। আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না।’

বিশপের শিকার এবং সম্ভাব্য শিকারদের নামের পাশে, কে কোন পেশায় জড়িত, উল্লেখ করা আছে; কলমটা হাতে নিল ক্লেজ, ওসব পেশার পাশে টিক

চিহ্ন দিতে আরম্ভ করল। ‘বীমা কোম্পানির বিক্রয়-প্রতিনিধি। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। ওষুধ কোম্পানির বিক্রয়-প্রতিনিধি। এক্স-রে টেকনিশিয়ান। এমআরআই টেকনিশিয়ান। দু’জন নার্স। একজন সার্জন। একজন সার্জিকাল নার্স। একজন শিডিউলিং অ্যাসিস্টেন্ট। রোগীদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পেশেন্ট ইনটেক সেন্টার আছে এই হাসপাতালের নিচতলায়, সেখানে কাজ করে যে-মেয়ে, সে-ও আছে ওই তালিকায়। এবার বলুন, বিশেষ কোনো পদ্ধতি কি নজরে পড়ছে আপনার? নিজের ঢোল নিজে পেটাচ্ছি না... সিরিয়াল কিলারদের বেলায় ও-রকম কোনো পদ্ধতি খুঁজে বের করার কাজটা কিন্তু ভালোই পারি আমি, কিন্তু বিশপের বেলায় কিছুই পারছি না।’

ক্লোজের হাত থেকে কলমটা নিল ক্লেয়ার। তারপর বসে পড়ল মেকশিফট টেবিলটার একপ্রান্তে। ‘এবার কিশোরবয়সী কয়েকটা মেয়েকে খুন করেছে বিশপ... পানিতে চুবিয়ে মেরেছে তাদেরকে। কিন্তু ওই মেয়েগুলোর পাশাপাশি তাদের বাবা অথবা মায়ের ওপরও কেন হামলা চালানো হলো, পরিষ্কার না আমার কাছে। আর তাই আমার ধারণা, গৌণ কোনো একটা উপাদান কাজ করেছে এবার।’

স্পিকার ফোনে ন্যাশ বলল, ‘আমার মনে হয়, বিশপের পুরো খেলাটাই আসলে প্রতিশোধের নেশা... অন্য কিছু না। ওই মেয়েগুলোর বাবা অথবা মা কিছু-না-কিছু একটা করেছে। এমন কিছু, যা এখনও নজরে পড়ছে না আমাদের আগেরবার বিশপের কাজের পদ্ধতি ছিল এ-রকম... বাবা অথবা মা অন্যায় যে-কাজ করেছে, তার জন্য শাস্তি দাও তাদের সন্তানদেরকে।’

বেজে উঠল ক্লেয়ারের মোবাইল ফোন। ওটা পকেট থেকে বের করল সে। ‘সোফি রদ্রিগেজ।’ কল রিসিভ করল। ‘সোফি? আপনাকে স্পিকারে দিলাম। এখানে ক্লোজের সঙ্গে আছি আমি। আরেকটা লাইনে আমাদের সঙ্গে আছেন ন্যাশ।’

ও-প্রান্ত থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, জোরে জোরে দম নিচ্ছে সোফি। হাঁপিয়ে গেছে বেচারী। ‘কোথায় আছেন আপনি? গ্যাব্রিয়েল ডিগান...’

‘কী হয়েছে মেয়েটার?’

‘এই ব্যাপারে কথা বলা দরকার আমাদের।’

১০৭.
পুল
চতুর্থ দিন, বেলা ১২:৫৮

ছিনভিল থেকে প্লেনে সওয়ার হয়ে নিউ অরলিন্সে হাজির হতে তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল। অ্যালাবামার আকাশে যখন ছিল বিমানটা, তখন ওটা টার্বুলেন্সের শিকার হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যাবে বুঝি। ছোট সেই প্লেন তখন এমন সব আওয়াজ করছিল, যা শুনতে চায় না বিমানে আরোহন করা কোনো যাত্রীই... ক্রমাগত ক্যাচকোঁচ, মুহূর্মুহু গোঙানি এবং থেকে থেকে যান্ত্রিক প্রতিবাদ। পুল কালেভদ্রে সওয়ার হয় প্লেনে। কাজেই এসব ঘটনার কোনোকিছু যদি প্রত্যক্ষ করত সে, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত ওর। কপাল ভালো, এসব চাক্ষুষ করতে হয়নি ওকে। প্লেনটা যতক্ষণ আকাশে ছিল, ততক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়ে গেছে বিশপের সেই ডায়েরি।

যত জলদি সম্ভব ডায়েরিটা শ্রেফ গিলেছে সে, একটা পৃষ্ঠার চেয়ে তার পরের পৃষ্ঠাটা পড়েছে আরও দ্রুত গতিতে। পড়তে পড়তে ডায়েরির কয়েকটা পাতার কোনো ভেঙে মুড়িয়ে রেখেছিল; পুরো ডায়েরি পড়া শেষ করে ফিরে গেছে সেসব পাতায়, আরও একবার নজর বুলিয়েছে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার যে-জায়গায় বিশপদের বাড়ি ছিল, সে-জায়গা সংক্রান্ত বর্ণনা আছে ওসব পাতায়। সেই লেকটা। বিশপদের বাড়িটা। সেটার সঙ্গে ট্রেইলারটা। বিশপের বাবা-মায়ের বর্ণনা আছে যেসব পাতায়, মুড়িয়ে রেখেছিল সেগুলোও।

ধেং, এখন তো দেখা যাচ্ছে, বলতে গেলে সব পাতাই মোড়ানো।

এসব পাতা থেকে এমন কী ছাতার মাথা জানতে পারবে সে?

পোর্টার কেন এই ডায়েরি রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে?

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডায়েরিটার কথা বেমালুম চেপে গিয়েছিল লোকটা?

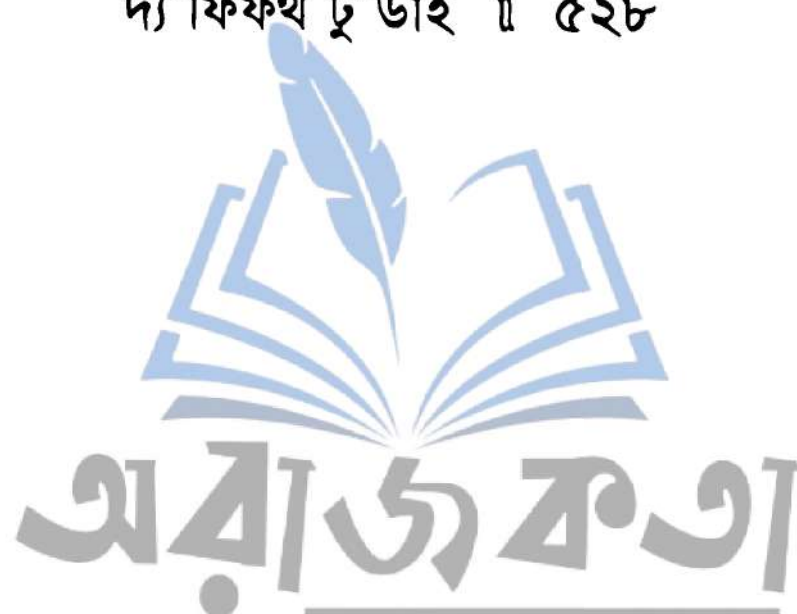
শয়তানের সঙ্গে যতক্ষণ না হচ্ছে পরিচয়, ঈশ্বরের ভূমিকায় কী করে করবেন অভিনয়?

বিশেষ এই শব্দগুলো, মালবাহী কোনো ট্রেনের মতো বার বার আসছে-যাচ্ছে পুলের অবচেতন মনে।

পোর্টার আসলে ঠিক কতদূর যেতে চেয়েছিল?

ডায়েরির বেশিরভাগ বর্ণনাই বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেছে। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনা আবার কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকেছে। যেমন ডায়েরিতে বলা হয়েছে একটা পোর্শে গাড়ির কথা। কিন্তু জায়গামতো গিয়ে দেখা গেছে, ড্রাইভওয়েতে খোলা আকাশের নিচে অনেক বছর পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে একটা ভব্বওয়াগন। তা ছাড়া বিশপ বলেছে তাদের বাড়ির পেছনে আরেকটা বাড়িতে নাকি থাকত প্রতিবেশী

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫২৮



কাঁটার দম্পতি। অথচ সন্ধান পাওয়া গেল একটা ট্রেইলারের। শুধু এসবই না, আরও কিছু একটা আছে এই ডায়েরিতে। আরও গভীর কিছু একটা আছে। পুরো লেখা পড়লে কেমন যেন রূপকথার গল্প পড়ার মতো অনুভূতি জাগে মনে। একসময় টেলিভিশনে “বিভার ক্লিভার” নামের একটা সিরিজ প্রচারিত হতো। ওই সিরিজ দেখার সময় যে-রকম লাগত পুলের, বিশপের ডায়েরি পড়ে সে-রকম একটা শিহরণ জেগেছে ওর শরীরে। মনে হয়েছে, প্রামাণ্য তথ্যের সীমানা ছাড়িয়ে এই ডায়েরি যেন চলে গেছে সতর্ক কোনো কায়দায় রচনা-করা কল্পকাহিনির জগতে। ওই শিহরণের কোনো এক জায়গায় সত্য বাস করে, পুল নিশ্চিত। ছোট একটা বালকের কথা এসব; সে এমন কেউ, যে কিনা হেঁটেচলে বেড়িয়েছে বিশেষ সেই সম্পত্তিতে, জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে বাস করেছে সেখানে। সন্দেহ নেই, এসব কথা সেই সত্যের একটা অংশ। একটা বাচ্চা পৃথিবীকে যে-দৃষ্টিতে দেখে, সেটা, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ যে-দৃষ্টিতে দেখে, তার চেয়ে অনেক আলাদা। এই ডায়েরিতে যে-কাহিনির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেটাও সাজানো হয়েছে একই কায়দায়। আর তাই ডায়েরিটা যদি কোনো বাচ্চা ছেলে লিখত, তা হলে সেটার কোনো একটা মানে দাঁড়াত পুলের কাছে, কিন্তু এখন সে কোনোকিছুই ঠাহর করতে পারছে না। বিশপের হাতের লেখা দেখেছে সে। এবং শুধু দেখেছে বললে কম বলা হয় আসলে, রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করেছে। জানে, বয়সের সঙ্গে মানুষের হাতের লেখাও বদলে যায়।

প্রতিটা মানুষের হাতের লেখাই, সে-মানুষটার শৈশবকালে, যাকে বলে কিনা শেকড় গাড়া, সে-রকম একটা অবস্থায় থাকে। কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে, হাতের লেখার কোনো কোনো কোনা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কোনোটা আবার কোমল হয়ে যায়। প্রতিটা বাচ্চার হাতের লেখাতেই একধরনের কোমলতা থাকে। এক ধরনের দ্বিধা থাকে। একজন মানুষ কোনো একটা কাগজে কোনো একটা অক্ষর বা শব্দ লেখার আগে বিশেষ সেই শব্দ বা অক্ষর স্মরণ করে তার মস্তিষ্ক। বয়স যত বাড়ে ওই মানুষটার, স্মরণ করার এই ব্যাপারটা তত ঝাপসা হয়ে আসে। তখন অবচেতন মন থেকে কিছু একটা জোগাড় করে নেয়ার চেষ্টা করে অনেকেই। সুতরাং যতই ভাবপ্রবণ মনে হোক না কেন, একটা বাচ্চা প্রকৃতপক্ষে বেশ সতর্কতার সঙ্গে লেখে। ধীরেসুস্থে লেখে। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্করা লেখে তাড়াহুড়ো করে, কোনো না কোনো শর্টকাট উপায়ে। কোয়ান্টিকোতে যখন ছিল, একের পর এক বেশ কয়েকটা হ্যান্ডরাইটিং অ্যানালাইসিস কোর্স করেছে পুল। একটা বাচ্চা আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতের লেখায় যে-পার্থক্য আছে, সেটা বার বার হাজির হয়েছে ওর সামনে।

এই ডায়েরির যে-ভাষা, শব্দনির্বাচন, গল্প বলে চলার যে-গতি... সবই যেন কোনো বাচ্চার। কিন্তু হাতের লেখাটা প্রাপ্তবয়স্ক কারও। পুল নিশ্চিত, বিশপের বর্তমান সময়ের হাতের-লেখা জোগাড় করে নিয়ে যদি এই ডায়েরির লেখার সঙ্গে

মেলানো হয়, তা হলে ওর ধারণা আরও দৃঢ় হবে। বিশপ এই ডায়েরি লিখেছে বেশিদিন হয়নি। ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিদ্রূপ করেছে সে পুলিশ বাহিনীকে। এবং এই কাজ যে শুধু ওই একটা পৃষ্ঠাতেই করেছে সে, তা না। বরং ডায়েরির বিভিন্ন জায়গায় করেছে। তারপরও বিশেষ একটা চেষ্টা করেছে সে... এমন এক কায়দায় লিখেছে ডায়েরিটা, যাতে ওটা পড়লে মনে হয়, কাজটা কোনো বাচ্চা ছেলের।

বিশেষ এই কারণেই একটা চিন্তা বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে পুলের মাথায়।

এই ডায়েরিতে যা-যা পড়েছে সে, সব হয়তো সত্যি না।

ডায়েরির বেশিরভাগ কথাই সত্যি কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে পুলের মনে।

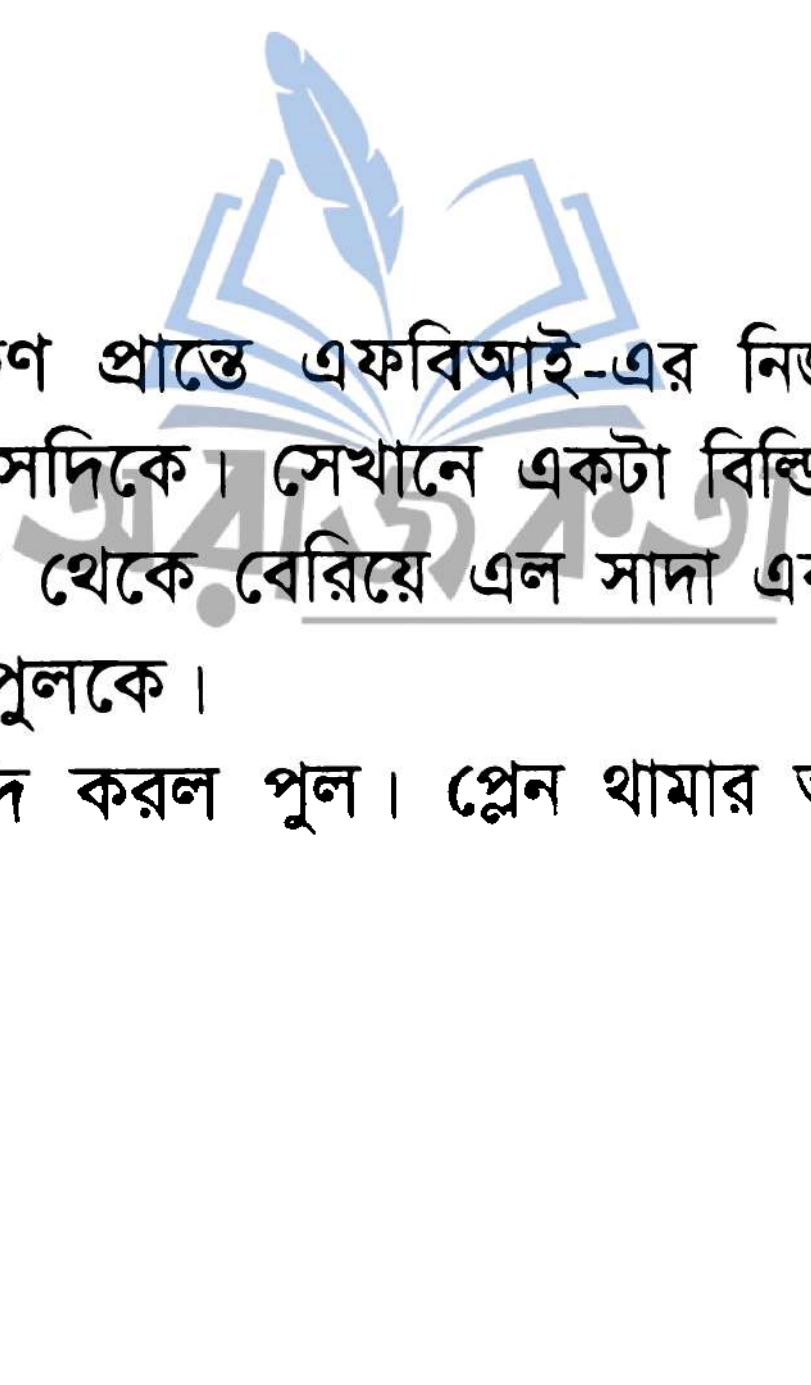
এই ডায়েরি আসলে কেন লিখেছে বিশপ? একটা গল্প বলার জন্য? না। বরং কাজটা সে করেছে বিশেষ কোনো একটা কাহিনির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য। তার এই ডায়েরি যে বা যারা পড়বে, তাদের মনের ভেতরে বিশেষ কোনো বীজ বুনে দেয়ার জন্য। এবং তাকে যে বা যারা অনুসরণ করার চেষ্টা করবে, তাদের নিয়ে খেলা করার জন্য। এ-পর্যন্ত যা-যা পড়েছে পুল, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছে... টুকরো টুকরো যেসব দেহাবশেষ পাওয়া গেছে লেক থেকে, সেসব সাইমন কার্টারের। কিন্তু লাশটা লেকে গেল কী করে, সাইমনকে কে কেন খুন করল, ডায়েরি পড়ে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না ওসব ব্যাপারে।

আরও যে-পাঁচটা লাশ পাওয়া গেছে লেক থেকে, বিশপের ডায়েরিতে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি ওগুলোর। বিশপদের তথাকথিত বাড়ির ভেতরে একাধিক লাশ পাওয়া গেল কেন, সত্যিকার অর্থে সেটারও কোনো ব্যাখ্যা নেই এই ডায়েরিতে। আগুনটা লেগেছিল ঠিক কোন কারণে, ব্যাখ্যা নেই সেটারও। বরং ব্যাখ্যা বলতে যা-কিছু আছে তা হচ্ছে সেসব কথা, যা বিশপ চেয়েছে বিশ্বাস করুক পুলিশ।

পুল আর যা-ই করুক, এই ডায়েরির একটা কোনো কথা বিশ্বাস করবে না।

ওর কেবলই মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ অন্য কোনো একটা কোণ থেকে দেখা দরকার ডায়েরিটা। বিশপ চায়, তার বিশেষ কিছু কথা বিশ্বাস করুক পুলিশ; সুতরাং তার সেই চাওয়ার একটা তালিকা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত এই ডায়েরি। ওই তালিকা সত্যি নাকি মিথ্যা, তাতে কিছু যায়-আসে না।

চোখ মুছল পুল। ছোট জানালাটা দিয়ে তাকাল বাইরে। আকাশ থেকে একটু একটু করে সরে গিয়ে নিচের সবুজ গাছপালার জন্য সূর্যের আলোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে মেঘ। তাকিয়ে তাকিয়ে সে-দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখল সে। শহরের রাস্তাঘাট আর দালানকোঠা তাদের আসল রূপ ফিরে পাচ্ছে যেন। নজরে পড়ছে এয়ারপোর্ট আর রানওয়েটাও। প্লেনের চাকা একসময় স্পর্শ করল রানওয়েকে। মৃদু ঝাঁকুনি লাগল। তবে সেটা ঠাহর করা গেল কি গেল না।



এয়ারপোর্টের দক্ষিণ প্রান্তে এফবিআই-এর নিজস্ব হ্যাঙ্গার আছে। প্লেনটা এখন এগিয়ে চলেছে সেদিকে। সেখানে একটা বিল্ডিংয়ের কোনো ঘেঁষে অবস্থিত ছোট একটা পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল সাদা একটা এসইউভি- এই গাড়িই জেলখানায় নিয়ে যাবে পুলকে।

ডায়েরিটা মুঠোবন্দি করল পুল। প্লেন থামার আগেই খুলে ফেলল প্লেনের ছোট হ্যাচটা।

১০৮.

ডায়েরি

‘আজ সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে একটা ইন্টারেস্টিং ফোন কল এসেছে আমার। তারা কী জিজ্ঞেস করেছে আমাকে, জানতে চাও?’

লাল আর্গাইল।

আজকের সোয়েটার।

ব্রেকফাস্টে প্যানকেক আর ওয়্যাফল খেয়েছেন ডক্টর অগলেসবি। তাঁর কলারের নিচে সিরাপের ছোট একটা দাগ লেগে আছে। চিনির গন্ধ পাচ্ছি। ক্ষুধা লেগে যাচ্ছে আমার। আমাকে নাস্তায় চিরিয়োস আর দুধ দেয়া হয়েছিল আজ সকালে। ওসব খেতে বেশ ভালো লাগে আমার। কিন্তু প্যানকেক বা ওয়্যাফলের মতো অত ভালো লাগে না।

মায়ের বানানো প্যানকেকগুলো মিস করি আমি এখন। সাংঘাতিক প্যানকেক বানাতেন তিনি।

‘অ্যানসন, তুমি আবারও কী যেন ভাবতে শুরু করেছ। কেউ যখন তোমার সঙ্গে কথা বলবে, কী বলছে লোকটা, মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তাদের চোখের দিকে তাকাবে। তোমার মাথার ভেতরে যেসব চিন্তা খেলা করে, সেসব বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করবে সে-সময়।’

আমি এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছি ডাক্তার সাহেবের চোখের দিকে। তবে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

বিশেষ এই কায়দা রপ্ত করে ফেলেছি আমি। যদি চাই, দেখতে পারি তাঁকে। দেখতে পাই তাঁর মাথার ভেতরটা, এবং...

‘অ্যানসন।’

বাতাসে সিরাপের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

তাকালাম ডাক্তার সাহেবের চোখের দিকে।

হাসলাম।

‘জি, ডক্টর?’

‘পুলিশ আমাকে কী জিজ্ঞেস করেছে, জানতে চাও?’

‘জি, চাই। জানতে খুব ইচ্ছে করছে।’

কিছু নোট লিখে এনেছেন তিনি, নজর নামিয়ে তাকালেন সেগুলোর দিকে। ‘যিনি ফোন করেছিলেন তাঁর নাম ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান। গ্রিনভিল পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছেন। বলেছেন, তাঁরা নাকি কয়েকবার গিয়েছেন তোমাদের সেই বাড়িতে।

দ্য ফিক্স টু ডাই ৯ ৫৩২



অরাজকতা



উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের প্রতিবেশীদের সাক্ষাৎকার নেয়া। প্রতিবেশী বলতে কাটার দম্পতির কথা বোঝাচ্ছি... সাইমন আর লিসা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা বোঝা গেছে তা হলো, বাসায় ফেরেননি তাঁরা। কয়েকবার গিয়েও যখন পাওয়া যায়নি তাঁদেরকে, তখন বাধ্য হয়ে সাইমন যেখানে কাজ করতেন সেখানে যোগাযোগ করেছেন ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন হলো কাজে যাচ্ছেন না সাইমন। এই লোকের স্ত্রী আবার কোথাও কোনো চাকরিবাকরি করতেন না। তাই পুলিশের ধারণা, মহিলা নিখোঁজ হয়ে গেছে। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সে-রকমই মনে হচ্ছে আর কী।’

হাতেধরা নোটপ্যাডের ওপর একটা মুহূর্ত নজর স্থির হয়ে থাকল ডাক্তার সাহেবের। লেখাটা দেখে নিচ্ছেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। ভ্রু কুঁচকে ফেললেন। ‘তার মানে হচ্ছে, তোমার বাবা-মাকেও যদি গণনায় ধরি, তা হলে পূর্ণ বয়স্ক চারজন মানুষ নিখোঁজ। আবার এমনও হতে পারে, মারা গেছেন তাঁরা চারজনই। ভয়ঙ্কর এক আগুন লেগেছিল তোমাদের বাড়িতে। পরে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটা মরদেহ। পুলিশি তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে, আগুনটা এমনি এমনি লাগেনি, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছে। আর তারপর আমরা পেয়েছি এমন একজন বালককে, যে কিনা কাঁদে না। যাকে কিনা ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। এবং যে এই মুহূর্তে আমার অফিসে মুখোমুখি বসে আছে।’ চশমা খুললেন তিনি। তবে এবার ওই কাজে লোক দেখানোর মতো কোনোকিছু আছে বলে মনে হলো না আমার। শ্রেফ নাকের ওপর থেকে খুললেন চশমাটা, ছেড়ে দিলেন, তাঁর বুকের ওপর ঝুলে পড়ল ওই জিনিস। ‘অ্যানসন, একটা কথা সরাসরি বলি তোমাকে। এই ব্যাপারটা কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না। একটুও ভালো দেখাচ্ছে না। সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই, পুলিশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে তারা। এবং সে-কাজ করার জন্য রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছে। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, তাদেরকে আমি জানিয়ে দিয়েছি, সম্ভব না ওই কাজ। তুমি এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হওনি। তার চেয়েও বড় কথা, আমার তত্ত্বাবধানে আছ।’ সামনের দিকে ঝুঁকলেন তিনি, কণ্ঠ নিচু করলেন। ‘ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যানের সঙ্গে কথা বলে শেষ করেছি, এক ঘণ্টাও হয়নি তখন, আরেকটা ফোন চলে এল আমার। সেদিন এক অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলেছিলাম

তোমাকে, তিনি। মনে আছে তাঁর কথা? ওই যে, তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন যে-লোক। বললেন, আমি যদি পুলিশকে কথা বলতে দিই তোমার সঙ্গে, তা হলে সেটা নাকি আমার জন্যই ভালো হবে। আরও বললেন, আমি যদি চাই, উপস্থিত থাকতে পারি সে-সময়। আমি যাতে কাজটা করি, সে-ব্যাপারে জোরাজুরি করছিলেন তিনি বার বার। তোমার ব্যাপারে যেসব নোট লিখেছি, সেগুলোও দেখতে চাইছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি, তোমার সঙ্গে আমার যে-কথাবার্তা, সেসব সম্পূর্ণ গোপনীয়। তুমি আমাকে এখন পর্যন্ত যা-যা বলেছ, সবই ব্যক্তিগত। আরও জানিয়ে দিয়েছি, তিনি যা চাইছেন, সেটা করা সম্ভব না। তোমার কপালে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছিল, অ্যানসন, তোমারই খাতিরে সেটা ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছি আমি। কিন্তু ওসব লোক... মানে, পুলিশের কথা বলছি আর কী, বিশেষ করে ওই অ্যাটর্নি জেনারেল... কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তাঁদের সবার ধারণা, তুমি কোনো না কোনোভাবে জড়িত এ-সবকিছুর সঙ্গে। একটা সত্যি কথা বলি তোমাকে। এখনও যেহেতু কিছুই বলোনি তুমি আমাকে, সেহেতু অ্যাটর্নি জেনারেল বা পুলিশ যা বলছেন, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো কিছু কিন্তু বিশ্বাস করে নেয়ার উপায় নেই আমার। আমি বড়জোর যা করতে পারি তা হলো, তাঁদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারি আরও কিছুদিন। অ্যানসন, যা ঘটে গেছে তোমাদের সেই বাড়িতে, সেটা কিন্তু এবার আমাকে বলতেই হবে তোমার।’

ডক্টর অগলেসবির ডেস্কের ওপর দেখতে পাচ্ছি আমার ছুরিটা। আমার মনে হয় না ওটা ভুলে ওখানে রেখেছেন তিনি। কারণ আজ দেখতে পাচ্ছি, ডেস্কের এককোণায় আছে ওই জিনিস। বলা ভালো, আমার হাতের নাগালেই আছে। আমি চাইলেই হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে পারি ওটা। চাইলেই প্লাস্টিকের সেই ব্যাগ থেকে বের করে নিতে পারি ছুরিটা, তারপর ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিতে পারি ডাক্তার সাহেবের গলায়। এই কাজ এত দ্রুত আমি করতে পারি যে, তাঁর সেই নোটপ্যাডে আমার নামের পাশে “বিপজ্জনক” শব্দটা লেখার মতো অবকাশও পাবেন না তিনি... ওই শব্দের নিচে দাগ টানার কথা তো বাদই দিলাম।

আবারও আমাকে দেখছেন তিনি। জানি, আগামী একটা ঘণ্টা এখানে ওভাবে চুপ থেকেই কাটিয়ে দিতে পারবেন তিনি। অপেক্ষা করতে থাকবেন... কখন মুখ খুলবো আমি। নিজের এই



কৌশল বার বার প্রয়োগ করছেন তিনি আমার ওপর। খুব সহজেই তাঁর এই কায়দা ধরে ফেলতে পারি আমি, ওটা নিতান্তই স্বচ্ছ হয়ে গেছে আমার কাছে।

‘বাবা ওই আগুন লাগিয়েছেন। তারপর মাকে নিয়ে চলে গেছেন।’

আবারও জায়গামতো উঠে গেল চশমাটা। ‘ইন্টারেস্টিং একটা কথা বললে তো। যা হোক, তোমার বাবা যদি চলেই গিয়ে থাকবেন, গাড়িটা রেখে গেলেন কেন? তোমার মা-ও কেন সওয়ার হলেন না তাঁর গাড়িতে? তার চেয়েও বড় কথা, কোথায় গেছেন তাঁরা দু’জন? সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে ওভাবে রেখে চলে গেলেন কেন?’

‘তাঁরা কোথায় গেছেন, জানি না আমি। আমাকে এভাবে রেখে চলে গেছেন কেন, তা-ও জানি না।’

‘তোমাদের বাসায় তিনজন মানুষের লাশ পাওয়া গেছে। তাঁরা কে?’

‘জানি না।’

‘তোমাদের কোনো প্রতিবেশী?’

‘জানি না।’

‘আগুনটা লাগিয়েছিল কে?’

‘বাবা।’

আমাকে বিশেষ ওই ছবির ব্যাপারে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছেন ডক্টর অগলেসবি। ছবিটা যে এখনও তাঁর কাছেই আছে, জানি আমি। এমনকী এ-রকমও হতে পারে, ওই ছবি তাঁর পরনের খাকি প্যান্টের পকেটেই আছে। আবার, তাঁর নোটপ্যাডের পৃষ্ঠার ভেতরেও লুকানো অবস্থায় থাকতে পারে।

‘তোমার বাবা ওই আগুন লাগাতে গেলেন কেন?’

‘জানি না।’

‘যাঁদের লাশ পাওয়া গেছে তোমাদের বাসায়, তাঁরা আসলে কারা? কেন গিয়েছিলেন তোমাদের ওখানে? তোমার বাবাকে মারতে? তোমার মায়ের গায়েও কি হাত তুলবার চেষ্টা করেছিলেন ওই লোকগুলো?’

এসব আর ভালো লাগছে না আমার।

একটুও ভালো লাগছে না।

একই ধরনের প্রশ্ন বার বার দ্রুত গতিতে জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছেন ডক্টর অগলেসবি। আমিও জবাব দিচ্ছি দ্রুততার সঙ্গে।

অথচ প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে ভালোমতো চিন্তাভাবনা করা উচিত আমার। আমাদের এই যে কথোপকথন, এটা এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করছেন ডক্টর অগলেসবি। আমার জায়গায় বাবা থাকলে এ-রকম কোনোকিছু ঘটতে দিতেন না। কাজেই আমার এখন যা করা দরকার তা হলো, এই কথোপকথনের নিয়ন্ত্রণ কী করে তুলে নেয়া যেতে পারে নিজের হাতে, সে-উপায় বের করা।

‘অ্যানসন, কাইনেসিক্স নামের কোনোকিছু শুনেছ কখনও?’

মাথা নাড়লাম আমি।

‘বলতে পারো, বিভিন্ন ধরনের দেহভঙ্গিমার ব্যাখ্যাই হচ্ছে কাইনেসিক্স। কেউ কেউ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা শারীরিক ভাষাও বলে এটাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় আমাদের চেহারায়ে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করি আমরা। বিভিন্ন রকম আচরণ করি বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কোনো শব্দ উচ্চারণ করি না, অথচ আমাদের ওসব আচরণের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকে আমাদের শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গের। যা হোক, কাইনেসিক্সের ওপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ নিয়েছি আমি। শারীরিক ভাষার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন সময়ে কী কী জানাতে চায়, শিখেছি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও একটা উপকার হয়েছে আমার। কথা বলার সময় কেউ যদি আমার সঙ্গে সৎ না থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে, তা হলে সেটা ধরে ফেলতে পারি। কেউ যখন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে, অথবা গুল মারে, তখন আমার কেমন লাগে, সেটা আমরা আলোচনা করেছি ইতোমধ্যেই। কেউ যখন ও-রকম কোনো কাজ করে, তখন তার মুখ বাদে শরীরের বাকি কোনো না কোনো অঙ্গ এমন কু দেয় আমাকে, যার ফলে আমি বুঝে যাই, মিথ্যা বলছে লোকটা। আমি যত বেশি সময় কথা বলি কারও সঙ্গে, এই ব্যাপারটা ধরা তত সহজ হয় আমার পক্ষে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে পার পেয়ে যাবে, যে-কারও বেলায় সেই কাজ এককথায় অসম্ভব। অ্যানসন, আমি আর তুমি কিন্তু সেই অসম্ভব কাজের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আচ্ছা বলো তো, এই যে তুমি মিথ্যা বলছ, তোমার কাছে এ-কাজের মানে কী? এই কাজের মানে হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলতেই থাকবে, আর আমি বুঝে যাবো, সে-কাজ করছ তুমি। কিন্তু তুমি যদি সত্যি কথাটা বলো আমাকে, সেক্ষেত্রে আমি

দ্য ফিফথ টু ডাই ৥ ৫৩৬

অরাজকতা

অরাজকতা

বুঝতে পারবো, তুমি সত্যি বলেছ। আমার কথাই মানে হচ্ছে, কোনো একটা চৌরাস্তার মোড়ে হাজির হয়েছ তুমি। এবার তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন দিকে যাবে। তুমি চাইলে আমার প্রশ্নের সত্যি জবাব দিতে পারো। ডাক্তারদের সঙ্গে রোগীদের বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে... বলতে পারো, রোগীরা ডাক্তারদের কাছ থেকে বিশেষ একটা সুবিধা পায়। আর তা হচ্ছে, গোপনীয়তা। তুমি যা-যা বলবে, তা গোপন থাকবে আমার কাছে। এবং সেসব কথা ব্যবহার করা হবে না তোমার বিরুদ্ধে। কিন্তু যদি চাও, মিথ্যা কথা চালিয়ে যেতে পারো আমার সঙ্গে। আবারও বলছি, কোন পথে যাবে, সে-সিদ্ধান্ত তোমার। এবং ওই ব্যাপারে করার মতো তেমন কিছু নেই আমার।’ চেয়ারে হেলান দিলেন অগলেসবি। ‘ভাবছি, তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতিটা দিয়েই দেবো ডিটেকটিভদেরকে। সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে যে-কাজ করাটা ভালো বলে মনে করবেন তাঁরা, তা করবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল যে-কাজ করতে চাইছেন, সেটাতেও তাঁকে সাহায্য করবো ভাবছি। সেক্ষেত্রে এখান থেকে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। এখানে এই যে এত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছ, অন্য কোথাও গেলে এসব আর পাবে না। ও-রকম কোনো জায়গায় তোমার মতো কম-বয়সী সুদর্শন ছেলেপেলেদের কী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, জানো? শ্রেফ কোনো একটা জিনিস হিসেবে। ও-রকম কোনো জায়গায় ব্যবহার করা হয় তোমার মতো ছেলেপেলেদের, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তুমি সেক্ষেত্রে। প্রতিদিন একটু একটু করে মরবে। ফিরে যে আসবে আবার, সে-রকম কোনো উপায়ও থাকবে না। তোমার মতো কোনো ছেলে যদি ও-রকম কোনো জায়গায় যায়, আর ফিরে আসতে পারে না। অতল কোনো গহ্বরে কেবল তলিয়েই যেতে থাকে তারা। দেখবে, তোমার সারাটা দিন কেটে যাবে গাঁইতি নিয়ে। গভীর থেকে আরও গভীর কোনো গর্ত খুঁড়তে চাইবে তুমি নিজের জন্যই। এবং সে-গর্তের ভেতরে যখন লুকিয়ে পড়বে, টের পাবে, মানুষরূপী দানবেরা আসলে অন্ধকারে থাকতেই পছন্দ করে বেশি।’

চশমা খুললেন তিনি। ‘আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, অ্যানসন। আশা করছি, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তুমি। এখন কথা হচ্ছে, সময় কিন্তু খুব বেশি নেই আমাদের হাতে।’

আমাদের আজকের সেশনের সমাপ্তি টানলেন ডক্টর অগলেসবি। অন্য সময়ে যতক্ষণ কথা বলেন তিনি আমার সঙ্গে, আজ তার চেয়ে দশ মিনিট বেশি বলেছেন। এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন হল ধরে। নার্স স্টেশনটা পার হলাম আমরা। এগিয়ে যাচ্ছি আমার ঘরের দিকে।

যেতে যেতে খেয়াল করলাম, সেই মেয়ের ঘরের দরজাটা খোলা। মেয়েটাকে লাঞ্ছ দিচ্ছে নার্স গিলম্যান। বিছানায় বসে আছে ওই মেয়ে। হাঁটু ভাঁজ করে শক্ত করে চেপে ধরেছে বুকের সঙ্গে।

আমাকে দেখছে সে। আমিও দেখছি ওকে।

কেন যেন নজর সরিয়ে নিতে পারছি না মেয়েটার ওপর থেকে। যদি চাইতাম ওই কাজ করতে, তবুও পারতাম কি না, সন্দেহ।



চতুর্থ দিন, দুপুর ১:১২

‘দেখুন, আপনাকে কিন্তু আগেও বলেছি আমি, আমাদের এখানে কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় না। কাজেই কী বলছেন আপনি, সে-ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।’

ডেগিজনেটেড ড্রাইভার ড্রাইভিং স্কুলে, কাউন্টারের পেছনে বসা মহিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রেয়ার। টের পাচ্ছে, রক্ত এসে জমা হয়েছে ওর চেহায়ায়, কেমন একটা গরম অনুভূত হচ্ছে সেখানে। ওর দিকে ভোঁতা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওই মহিলা। সে-দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। কাউন্টারের ওপর দিয়ে দু’হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাকে খামচে ধরতে ইচ্ছা করছে ক্রেয়ারের। ইচ্ছা করছে, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসে বাইরে।

আইপ্যাড হাতে নিয়ে যে-ছবি তুলেছিল লিলি ডেভিস, সেটা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ক্রোজের কাছে। ছবিটা বড় করেছে ক্রোজ। বিস্তারিত কিছু তথ্য জেনে নিয়েছে। ক্রেয়ারের ফোনে এখন ওই ছবির যে-ভার্সন আছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ড্রাইভিং স্কুলের বিল্ডিংটা। দেখা যাচ্ছে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাড়িও। ‘ছবিগুলো আরেকবার দেখুন,’ বলল ক্রেয়ার। যেসব মেয়ে নিখোঁজ এবং যেসব মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে, তাদের ছবি একত্রিত করে একটা পাতায় প্রিন্ট করা হয়েছে; ওই পাতা কাউন্টারের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল মহিলার দিকে।

দৃষ্টি নামিয়ে ছবিগুলো একটু দেখে নিল মহিলা। তারপর আবার তাকাল ক্রেয়ারের দিকে। ‘আপনাকে তো বলেছি, এই মেয়েদের কাউকেই কখনও দেখিনি আমি। এদের কেউই কখনও পা রাখেনি এই জায়গায়। যদি আসত, আমি অবশ্যই জানতাম। এমনও হতে পারে, কেউ একজন এই জায়গার ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে একটা তামাশা করেছে। আর ওই যে ফোন নম্বরটা... ওটা আমাদের না। ওটা পুরোপুরি বানোয়াট।’

ছবিতে যে-ফোন নম্বর দেখা যাচ্ছে... গ্যাবি ডিগান যে-নম্বরে ফোন করেছিল, সে-নম্বরটা ট্রেস করার চেষ্টা করেছিল ক্রোজ। কিন্তু জানা গেছে, ওটা আসলে একটা বার্নার ফোন। এবং এখন আর অনলাইনে নেই। ক্রোজ আর ন্যাশ মিলে কাজ করছে ওই ফোন কোম্পানির লোকদের সঙ্গে। গ্যাবির কলটা ট্রেস করার চেষ্টা করছে ওরা। যদি সফল হয়, তা হলে বিশেষ ওই নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে কোন কোন জায়গা থেকে, সেটাও জানা যাবে।

ছোট এই বিল্ডিংয়ের এককোণায় একটা চেয়ারে বসে আছে গ্যাবি। ওর পাশে বসেছে সোফি, ধরে রেখেছে গ্যাবির একটা হাত। বলল, ‘সোনামণি, ওটা আরেকবার চালাও তো।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৫৩৯

চোখ মুছল গ্যাবি। ‘লিলিকে ওভাবে একা যেতে দেয়াটাই উচিত হয়নি আমার। দোষ আমারই। আমি যদি যেতাম ওর সঙ্গে, আজ বেঁচে থাকতে পারত বেচারী।’

‘ওই ফোনকলের ব্যাপারে বলো আমাদেরকে। যে-লোক কল রিসিভ করেছিল, তার ব্যাপারেও কিছু বলো। লোকটা কী বলেছে তোমাকে? অদ্ভুত কোনো আওয়াজ শুনতে পেয়েছ তুমি? এমন কোনো কিছু, যা থেকে অনুমান করে নেয়া সম্ভব, কোথায় আছে ওই লোক?’

মাথা নাড়ল গ্যাবি। ‘লোকটা ফোন রিসিভ করে দু’-চারটা কথা বলল, আর তারপরই লাইন কেটে দিয়েছিলাম আমি। তার উচ্চারণ কেমন যেন মজার... শুনলে হাসি পায়। আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাকিয়ে ছিলাম এই বিল্ডিংয়ের দিকে। ওই মহিলাকে দেখতে পাচ্ছিলাম স্পষ্ট। দেখলাম, কলটা রিসিভ করেননি তিনি। এখানে যে-ফোন আছে, সেটা বেজেছিল কি না, সে-ব্যাপারেও সন্দেহ আছে আমার।’

‘আজ সারাদিনে একটা কোনো কল রিসিভ করিনি আমি,’ বলল কাউন্টারের সেই মহিলা।

‘ওই লোকের উচ্চারণ শুনে মজা লাগল তোমার... কেন?’ জিজ্ঞেস করল ক্রেয়ার, এগিয়ে আসছে গ্যাবি ডিগানের দিকে।

‘আমার তখন মনে হয়েছিল, এইমাত্র যেন ঘুম থেকে জাগল লোকটা। মনে হয়েছিল, ঘুম যেন যায়নি তার চোখ থেকে। “স্কুল” শব্দটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেনি সে।’

‘কেন? তোতলা নাকি সে?’

দ্রুত কোঁচকাল গ্যাবি। ‘না, তোতলা না। তবে... আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। ইংরেজি “এস” অক্ষরটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না ওই লোক। মানে, তার সেই উচ্চারণ আসলে হয় না। “স্কুল” শব্দটা সে তখন উচ্চারণ করল “থ্কুল”।’

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, উচ্চারণে সমস্যা আছে লোকটার?’ জানতে চাইল কাউন্টারের পেছনে বসা মহিলা।

মাথা ঝাঁকান গ্যাবি। ‘হ্যাঁ, তা-ই হবে। উচ্চারণে সমস্যা আছে লোকটার।’

কাউন্টারের কাছে ফিরে গেল ক্রেয়ার। ‘বিশেষ এই ব্যাপারটার কোনো মানে কি আছে আপনার কাছে?’

ফোনটা তুলে নিল ওই মহিলা, ডায়াল করতে আরম্ভ করেছে। ‘এই প্রতিষ্ঠানের মালিককে খবর দেয়া দরকার আমার।’

তার হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিল ক্রেয়ার, রেখে দিল যথাস্থানে। ‘আপনি যা-যা জানেন, এই মুহূর্তে বলুন আমাকে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪০





প্রথমে ক্রেয়ারের দিকে, তারপর সোফির দিকে, সবশেষে গ্যাবির দিকে তাকাল মহিলা। এরপর আবার ক্রেয়ারের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। দম নিল লম্বা করে। ‘আমাদের এখানে একজন প্রশিক্ষক আছে। তার উচ্চারণে সমস্যা আছে। তবে সমস্যাটা সাম্প্রতিক সময়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় কোনো একজাতের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।’

‘কীসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া?’

কাউন্টারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল মহিলা। অফিসের বাঁ দিকে যে-দেয়াল আছে, এগিয়ে গেল সেদিকে। এখানে সারি করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটার কয়েকজন এমপ্লয়ির ফটোগ্রাফ। হাত বাড়িয়ে দেয়াল থেকে একটা ছবি খুলে নিল মহিলা। ‘পল আপচার্চ। আমাদের সঙ্গে প্রায় দশ বছর ধরে কাজ করছেন তিনি। আজ থেকে মাস ছয়েক আগের কথা। হুট করেই একদিন বললেন তিনি, কীসব গন্ধ নাকি পেতে আরম্ভ করেছেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, আমার গা থেকে নাকি কাজুবাদাম আর ভ্যানিলার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। ভেবেছিলাম, আচার-ব্যবহারে আরেকটু ভালো হওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। অবশ্য... আগে যে খারাপ ব্যবহার করতেন তিনি, এমনটা না। তাঁর ব্যবহার সবসময়ই ভালো ছিল। বরং বলা উচিত, আমাদের এখানে যে-ক’জন প্রশিক্ষক কাজ করেন, তাঁদের সবার মধ্যে পল আপচার্চের ব্যবহার সবচেয়ে ভালো। তিনি মানুষ হিসেবেও মজার। যা হোক, একদিন হলো কী... কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তাঁর। তারপর থেকে নিয়মিত ঘটতে লাগল ঘটনাটা, রীতিমতো খিঁচুনি যাকে বলে আর কী। হুটহাট ঘটত ঘটনাটা, আবার চলেও যেত হুট করেই। বুঝতেই পারছেন, এ-রকম সমস্যায়ুক্ত কাউকে দিয়ে আর যা-ই হোক, গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব না। তাই আমাদের মালিক নিয়মিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন পলকে... রীতিমতো জোর খাটাতে হলো কাজটা করতে। পলকে বাধ্য করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে। আমাদের প্রশিক্ষণ গাড়িগুলোর ভেতরে কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা থাকে, তাদের প্রশিক্ষকের আচমকা কিছু একটা হয়ে যাক... এ-রকম ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা। যা হোক, বেশকিছু টেস্ট করা হলো পলের। সপ্তাহখানেক লেগে গেল সে-কাজে। শেষপর্যন্ত ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন— মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছে বেচারার। অসুখটা আসলে কী রকম, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন পল। কিন্তু তাঁর সেসব কথাবার্তা এত বেশি টেকনিকাল ছিল যে, আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে।’

ক্যানসার, ভাবল ক্রেয়ার।

বীমা।

ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ।

ওষুধ কোম্পানি।

এক্স-রে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪১

এমআরআই।

সার্জন।

হাসপাতাল।

‘পল আপচার্চ এখন কোথায়?’

‘বাসায়, আমার ধারণা। আমি যতদূর জানি, অসুখটা ধরা পড়ার পর এখন পর্যন্ত তিনবার সার্জারি করতে হয়েছে তাঁকে। সংখ্যাটা আরও বেশিও হতে পারে। এক সপ্তাহের কিছু বেশি দিন হবে আর কোনো খোঁজখবর নেই তাঁর। আমি ভাবছিলাম, গাড়ি চালিয়ে যাবো তাঁর বাসায়, একটু দেখে আসবো তাঁকে। আগামী কয়েক দিন তিনি কাজে আসতে পারবেন কি না, জেনে নেবো।’

‘ঠিকানাটা দিন। লাগবে আমার।’

‘অবশ্যই।’ হাতেধরা ছবির দিকে এখনও তাকিয়ে আছে মহিলা। সে-ছবিতে দেখা যাচ্ছে বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সের এক লোককে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। ‘পলের পক্ষে কারও গায়ে হাত তোলাও সম্ভব না, কাউকে খুন করার কথা তো বাদই দিলাম। আচার-ব্যবহার বলুন, কথাবার্তা বলুন... তাঁর মতো চমৎকার মানুষ আমি আর দেখিনি। দিন যেভাবে কাটছে তাঁর, তা এককথায় ভয়ঙ্কর। এত কম বয়স মানুষটার, কেমন একটা আধ্যাত্মিক ভাব আছে চালচলনে, মানুষ হিসেবেও তিনি ভালো।’

ন্যাশকে ইতোমধ্যেই ফোন করতে শুরু করে দিয়েছে ক্রেয়ার।



পুল

চতুর্থ দিন, দুপুর ৩:৪৭

পুল শুনতে পেল, অফিসে ঢুকলেন ওয়ার্ডেন, দরজা লাগিয়ে দিলেন।

‘একটা ঝামেলা হয়েছে,’ বললেন লোকটা। ‘আমরা যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি।’

আরও একজন লোক আছে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে।

ডেস্কের ধারে, পলকা একটা চেয়ারে বসে ছিল পুল; উঠে দাঁড়াল। বিমানযাত্রার কারণে এখনও কেমন যেন অসাড় হয়ে আছে ওর পা।

পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন ওয়ার্ডেন ভিনা। ‘ক্যাপ্টেন ফ্রেড ডিরেঞ্জো। জেলখানার নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে। ক্যাপ্টেন, উনি ফ্র্যাঙ্ক পুল, এফবিআই থেকে এসেছেন। আমাকে যা-যা বলেছ, তাঁকেও সেসব বলো, প্লিজ।’

ডিরেঞ্জোর সঙ্গে হাত মেলাল পুল। ওই লোকের হাত কেমন যেন ঠাণ্ডা আর চটচটে। বোঝা গেল, নার্ভাস হয়ে পড়েছে লোকটা।

যা ঘটছে, সেসব আদৌ পছন্দ হচ্ছে না তার।

একটুও পছন্দ হচ্ছে না।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ডিরেঞ্জো। ‘এসএআইসি হার্লস ফোন করার পর আমরা কড়া নজর রাখা আরম্ভ করেছিলাম উইডনারের ওপর। তাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি আমরা। বরং আমাদের পরিকল্পনা ছিল, স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকুক সে। পরিকল্পনা ছিল, আপনি এখানে আসার আগপর্যন্ত সিকিউরিটি ক্যামেরার সাহায্যে নজর রাখতে থাকবো তার ওপর। ফলে আপনি যখন কথা বলবেন তার সঙ্গে, নিজের অপকর্ম ঢাকার জন্য মিথ্যা কোনো গল্প বানাতে পারবে না সে। এ-রকম পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য কাউকে চমকে দেয়াটাই সবচেয়ে ভালো উপায়, ঠিক কি না?’

মুখে কিছু বলল না পুল, শুধু মাথা ঝাঁকাল।

ওয়ার্ডেনের দিকে একঝলক তাকিয়ে নিল ক্যাপ্টেন ডিরেঞ্জো। তারপর আবার তাকাল পুলের দিকে। ‘পালিয়ে গেছে লোকটা। কীভাবে পালিয়েছে, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। কিন্তু যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, পালিয়ে গেছে।’

‘কখন?’

আত্মসমর্পণ করার কায়দায় দু’হাত তুললেন ওয়ার্ডেন। ‘আপনি অতি-উত্তেজিত হয়ে ওঠার আগেই বলি... ধরা পড়েছে লোকটা। স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন করেছিলাম আমি। একটুও দেরি না করে উইডনারের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হয় তারা, সেখানেই কোণঠাসা করে ফেলে লোকটাকে। ওই জায়গা এখান থেকে বেশি দূরে না। যা হোক, পুলিশ সেখানে গিয়ে দেখে, কোথাও পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মালসামান গোছগাছ করছে ওই লোক। তাকে এখানে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪৩

ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এখন, বিশ কি ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগার কথা না। ক্যাপ্টেন, তোমার কথা চালিয়ে যাও, প্লিজ।’

মাথা ঝাঁকাল ডিরেঞ্জো। ‘এখানে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে কয়েদিদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য, গার্ডদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য না। সিকিউরিটি ক্যামেরার বেলায় “ব্লাইন্ড স্পট” বলতে যা বোঝায়, সে-রকম বেশকিছু জায়গা আছে এই জেলখানায়। সেসব জায়গায় আবার প্রবেশাধিকার আছে গার্ডদের। যা হোক, উইডনার করেছিল কী... গিয়ে ঢুকেছিল লকার রুমে। সেখানে ইউনিফর্ম বদল করেছে। তারপর, বেলা তিনটার সময় জেলখানার যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ডিউটি শেষ হয়, তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওয়ার্ডেন যেমনটা বলেছেন একটু আগে... লোকটাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়েছে। আর কোথাও পালাতে পারবে না সে, কথা দিচ্ছি আপনাকে। যা হোক, পদাঙ্ক অনুসরণ করা বলতে যা বোঝায়, উইডনারের বেলায় আজ সে-কাজ শুরু করেছি আমরা। কীসের পেছনে লেগেছিল সে আসলে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি সেটা। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, যেভাবেই হোক না কেন, সম্পূর্ণ বানোয়াট একটা কোর্ট অর্ডারের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল লোকটা। এবং সেটা কাজে লাগিয়ে আজ সকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে কয়েদি নম্বর ০৮০০-এর।’

‘কে?’

পুলের দিকে একটা ফাইল বাড়িয়ে ধরলেন ওয়ার্ডেন। ‘এক মহিলা। তার প্রকৃত নাম জানা নেই আমাদের। এমনকী কোনো আইডি বা পরিচয়পত্রও নেই। আমাদের কোনো সিস্টেমেই তার কোনো নাম-পরিচয় নেই। এ-ধরনের মহিলা কয়েদিদেরকে আমরা বলি জেন ডো। যা হোক, আরেকটা তথ্য দিই আপনাকে। আপনাদেরই একজন গোয়েন্দা, নাম স্যাম পোর্টার, গতকাল হাজির হয়েছিলেন এখানে, দেখা করতে চেয়েছিলেন ওই মহিলার সঙ্গে। এই জেলখানারই একটা ইন্টারভিউ রুমে ওই মহিলা এবং তার উকিলের সঙ্গে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে গেছেন তিনি। আমাকে নিজের মুখে বলেছেন, শিকাগোর ফোর মাস্কি কিলার কেসের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক আছে ওই মহিলার।’

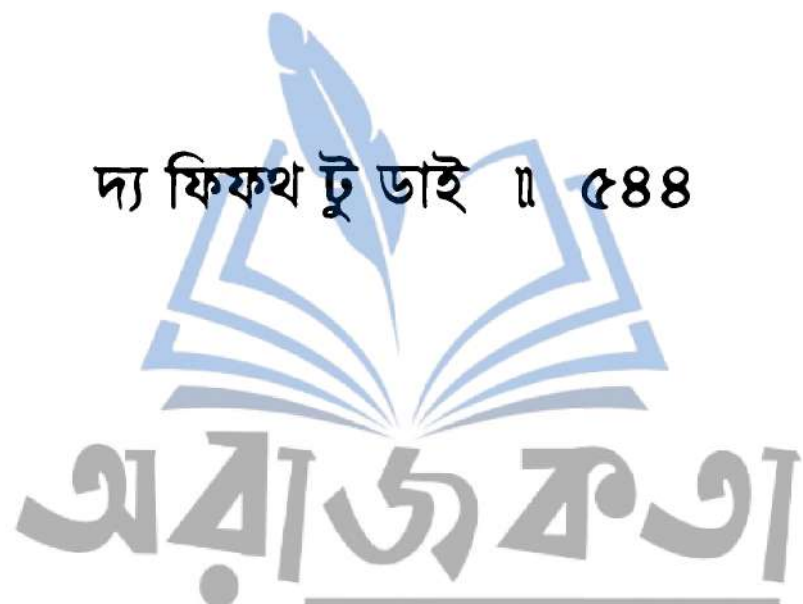
‘আপনাদের সিকিউরিটি ক্যামেরায় ধারণ করা আছে এসব?’

‘আমাদের এখানে একটা নিয়ম আছে। যখন কোনো কয়েদি তার উকিলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, তখন সিকিউরিটি ক্যামেরা বন্ধ করে দেয়া হয়।’

‘ওই মহিলার উকিলের নাম কী?’

‘স্থানীয় একজন। সারা ওয়ার্নার,’ বললেন ওয়ার্ডেন। ‘যা হোক, একটা অ্যাস্কেল মনিটর পরিয়ে দেয়া হয়েছিল জেন ডোকে। আমরা সেটার সিগনাল ট্রেস করতে পেরেছি। এখন ওই উকিলের অফিসেই আছে সে। ডেটা-টা কিন্তু লাইভ... মানে, মুহূর্তে মুহূর্তে জেন ডো’র অবস্থানের তথ্য পাঠিয়ে চলেছে আমাদের কাছে। সে অন্য কোথাও চলে যাবে আর আমরা সেটা জানতে পারবো না, এমনটা সম্ভব না।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪৪



অরাজকতা



‘ওই মহিলাকে যে-সেলে রাখা হয়েছিল, সেটা একবার দেখতে পারি আমি?’
‘আমরা ইতোমধ্যেই ভালোমতো খোঁজ চালিয়েছি সেখানে। কিছু পাওয়া যায়নি।’
‘আমি নিজে একবার একটু দেখতে চাই।’

সত্যিই, ভালোমতো খোঁজ চালানো হয়েছে ওই কারাগারকোঠে।

ছোট্ট সেই ঘরে পা রাখল পুল। ওর মনে হচ্ছে, চারদিকের দেয়াল যেন চেপে আসছে, পিষ্ট করে ফেলতে চাইছে ওকে।

একটা ম্যাট্রেস বিছানো ছিল ধাতব একটা খাটে, এখন একদিকের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে সেটা। কেমন যেন নগ্ন দেখাচ্ছে খাটটা। মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কিছু কাপড়... একটা টি-শার্ট, আর দু'জোড়া সোয়েটপ্যান্ট। একটা শ্যাম্পুর বোতল আর একটা টুথপেস্ট টিউবের ভেতরে যা-যা ছিল, সব ফেলে দেয়া হয়েছে সিন্কে।

‘কয়েদিরা কখনও কখনও ছোট ছোট কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখে শ্যাম্পুর বোতল আর টুথপেস্টের টিউবের ভেতরে। এবং লুকিয়ে রাখা ওসব জিনিসের বেশিরভাগই হচ্ছে চোখা আর ধারালো কোনো অস্ত্র।’

‘কোনোকিছু খুঁজে পেয়েছেন এখানে?’

‘না।’

ম্যাট্রেসটার দিকে এগিয়ে গেল পুল। ওটার কোনাগুলোয় আঙুল বোলাচ্ছে। যেখানে যেখানে সেলাই আছে, পরখ করে দেখছে সেসবও।

‘ওটাও চেক করে দেখেছি আমরা,’ বলল ক্যাপ্টেন ডিরেঞ্জো। ‘কিছুই পাওয়া যায়নি।’

তবুও নজর বুলিয়ে গেল পুল। কিন্তু ম্যাট্রেসের কোথাও কোনো ছেঁড়া-কাটা নজরে পড়ল না ওর।

‘বলেছি তো, কিছু নেই এখানে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পুল। ম্যাট্রেসটা বয়ে নিয়ে এসে ধপাস করে ফেলে দিল খাটের ওপর। ঝনঝন আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু ওই খাটের ওপর এখন আর কোনো মনোযোগ নেই পুলের। বরং ম্যাট্রেসটা যে-দেয়াল আড়াল করে রেখেছিল এতক্ষণ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে। দেয়ালের গায়ে কোনো জিনিস দিয়ে দাগ কেটে কেটে লেখা হয়েছে কিছু শব্দ। এদিকে-সেদিকে তাকাল পুল। দেখতে পাচ্ছে, শুধু ওই দেয়ালেই না, কয়েদপ্রকোষ্ঠের সব দেয়ালেই লেখা আছে কিছু না কিছু শব্দ। এখানে বছরের পর বছর ধরে বন্দি ছিল যেসব কয়েদি, তারা তাদের পরের কয়েদিদের জন্য লিখে রেখে গেছে ওসব কথা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪৫

প্রতিটা শব্দ খুব ভালোমতো জানা আছে পুলের। ওসব শব্দ যেন একসাথে
হাজির হয়ে গেল ওর চোখের সামনে:

চলো বাসায় প্রত্যাবর্তন করি, চলো ফিরে যাই,
চাওয়া-পাওয়ার এই হিসেবকে বলি ধেং ছাই,
আনন্দ আজ যেন সঙ্গী হয়েছে ত্বরণের।
ওদিকে নীল মহাসাগর থেকে মরণের
জীবন বয়ে চলেছে অমৃতসুধার মতো।
জীবনে মৃত্যু আছে; মৃত্যুতে আছে জীবন অবিরত।
সুতরাং ভয় কীসের; কোথায় ভয়?
আকাশের পাখিরা গাইছে “মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়!”
অমরত্বের জোয়ার যেন দিন-রাতের সরণিতে,
নেমে আসছে এখানে... অসহ্য সুন্দর ধরণীতে।

বাসা, ভয়, মৃত্যু... তিনটা শব্দের নিচেই দাগ টানা আছে। ঠিক যেমনটা ছিল
শিকাগোর সেই বাড়ির দেয়ালে। পার্থক্য একটাই... এবার নতুন একটা লাইন
দেখা যাচ্ছে:

তোমার মৃত্যুই আসল পাপ।

‘ওই কথার মানে কী?’

পুল টের পেল, ওর ঠিক পেছনে হাজির হয়েছে ক্যাপ্টেন ডিরেঞ্জো। ওর
কাঁধের ওপর দিয়ে পড়ছে নতুন লেখাটা। লোকটা যে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছিল
সেলের ভেতরে, টেরই পায়নি সে।

সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল একটা হাত। নতুন লেখাটার প্রতিটা শব্দ ছুঁয়ে
ছুঁয়ে দেখছে। ওর আঙুলের চাপে দেয়ালের কিছু রঙ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খসে
পড়ছে। দেখলে বোঝা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে লেখা হয়েছে ওই লাইন। আগের
গ্রাফিতি মুছে গেছে নতুন লেখাটার জন্য।

বলল, ‘বাইবেলে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে, আসল পাপ। শেক্সপিয়ার
বলেছেন, ওই কথার মানে হচ্ছে, কোনো একজন ব্যক্তির পাপের দায়ভার তার
সন্তানদের ওপরও গিয়ে পড়ে। তার মানে হচ্ছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের
পাপের কারণে দোষী হয়ে আছি। আবার, একইভাবে, তাঁরাও দোষী হয়ে আছেন
আমাদের পাপের কারণে।’

‘শেক্সপিয়ার, নাকি? আমাদের সেই জেন ডোকে দেখে কিন্তু একবারের জন্যও
মনে হয়নি, শেক্সপিয়ারের ভক্ত সে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪৬



অরাজকতা



ক্যাপ্টেন ডিরেঞ্জোর কাঁধে আটকানো আছে একটা রেডিয়ো, খড়খড় করে উঠল সেটা। একটা বাটনে চাপ দিল ওই লোক। ওয়ার্ডেনের কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে।

‘ক্যাপ্টেন? উইডনারকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তোমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের বন্ধুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো তিন নম্বর ইন্টারভিউ রুমে।’

‘বুঝতে পেরেছি।’

১১১.
ডায়েরি

আবারও রাত নেমেছে।

কিন্তু আজ বৃষ্টি হচ্ছে না।

নার্স গিলম্যান যখন আমার জন্য ডিনার নিয়ে এসেছিল, আমি তখন তাকে সেই মেয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু মহিলা একটা কোনো কথা বলেনি আমাকে। এমনকী ওই মেয়ের নামটা পর্যন্ত বলেনি। আমি আশা করেছিলাম, নামটা অন্তত বলবে। কিন্তু কিছুই বলেনি ওই মহিলা, শুধু আমার ট্রে-টা নামিয়ে রেখেছে বিছানায়, আর তারপর হেসেছে। বলেছে, ‘খেয়ে নেয়া উচিত তোমার।’

খেতে চাই না আমি। ওই মেয়ের নামটা জানতে চাই। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর কাছাকাছি যেতে চাই। এত কাছাকাছি যে, যাতে ওর শরীরের উষ্ণতা টের পেতে পারি, ওর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাই।

ওকে কাঁদতে শুনেছি আমি। এবার জানতে চাই, মেয়েটা হাসতে পারে কি না।

আমি এখনও খাইনি।

আত্মচিন্তায় এত বিভোর হয়ে ছিলাম যে, নার্স গিলম্যান কখন যে চলে গেছে আমার ঘর থেকে, টেরই পাইনি।

আমার বিছানার এককোনায় এখনও পড়ে আছে খাবারগুলো। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাই না আমি।

ডক্টর অগলেসবি যে-অ্যার্টার্ন জেনারেলের কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

এবং, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য যে-জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি, একটুও যেতে চাই না সে-জায়গায়।

এখন যদি বাবা থাকতেন, চাইতেন, আমি যাতে সমাধান করি এই ধাঁধার। আমি অবশ্য ইতোমধ্যে একটা পরিকল্পনা করে ফেলেছি।

রাতের বেলায় এখানে মাত্র একজন গার্ড এবং দু’জন নার্স থাকে। ডাক্তাররা সবাই চলে যান। বাকি সবাই গিয়ে ঢুকে পড়ে যার যার ঘরে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪৮





কাজেই আমাকে যা করার, রাতেই করতে হবে।

অপেক্ষা করবো, কখন আবার কাঁদতে শুরু করবে মেয়েটা।

আমি চাই না সে কাঁদুক।

চাই না, আর কখনও কাঁদুক বেচারী। কিন্তু জানি, আবারও কাজটা করবে সে। এবং যখন করবে সে ওই কাজ, তখন কমপক্ষে একজন নার্স এগিয়ে এসে খুলবে মেয়েটার ঘরের দরজা, ওই মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঢুকে পড়বে ঘরের ভেতরে। আমি যখন নিশ্চিত হবো, দু'জন নার্সের মধ্যে একজন গিয়ে ঢুকেছে ওই মেয়ের ঘরে, তখন খুলে ফেলবো আমার ঘরের দরজার তালা। হল ধরে এগোবো চুপিসারে। তারপর চোরের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়বো মেয়েটার ঘরে।

আমাকে দেখে তখন গলা ফাটিয়ে চোঁচিয়ে উঠবে সেই নার্স।

আশা করছি, মানুষটা আর যে-ই হোক, নার্স গিলম্যান হবে না। তাকে পছন্দ করি আমি। কিন্তু সে যদি তখন থাকে ওই মেয়ের ঘরে, চোঁচিয়ে উঠতে বাধ্য করবো আমি মহিলাকে। কাজটা কীভাবে করতে হয়, আমাকে শিখিয়েছেন বাবা। নার্স গিলম্যানকে এত জোরে চোঁচাতে বাধ্য করবো আমি যে, অন্য নার্স আর গার্ড তখন ছুটে আসবে ওই মেয়ের ঘরের উদ্দেশে। এরপর তাদের সবাইকে ওই ঘরে আটকিয়ে ফেলবো আমি।

একটা মুহূর্তের জন্য একটু থামি এখানে। একটু বিরতি দিই।

একটা কথা সাফ জানিয়ে দিতে চাই।

কাউকে আঘাত করতে চাই না আমি।

একটুও চাই না কাজটা করতে।

কিন্তু যদি দরকার হয়, করবো কাজটা।

ওই মানুষগুলোকে যখন সে-ঘরে আটকে ফেলবো, তখন তাদেরকে ওখানেই থাকতে হবে। এবং আমাকে চলে যেতে হবে এই সেন্টার থেকে।

এখন একমাত্র ফলাফল এটাই, অন্য আর কিছু হতে পারে না।

আশা করছি, কাউকে আঘাত করা লাগবে না আমার।

চাই না, ওই মেয়ে দেখুক, কাউকে আঘাত করছি আমি।

আমি ওই মানুষগুলোকে মেয়েটার ঘরে বন্দি করে ফেলবো। তারপর গিয়ে হাজির হবো ডক্টর গিলম্যানের অফিসে। আমার ছুরিটা নেবো। জানি, ঝুঁকি আছে এই কাজে। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, ঝুঁকিটা নেয়া যায়।

সবশেষে এখান থেকে চলে যাবো আমি।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৪৯

চলে যাওয়ার আগে সিকিউরিটি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে। আমার যতদূর ধারণা, রেকর্ডারটা আছে গার্ডের ডেস্কে।

আমার সঙ্গে যদি ছুরিটা থাকে, তা হলে ওই মেয়ের ঘরে যখন থাকবো, তখন কারও না কারও বিরুদ্ধে হয়তো ব্যবহার করতে হবে জিনিসটা। আবার, ওই মানুষগুলোকে ওই ঘরে আটকে ফেলার আগে যদি তাদের কারও বিরুদ্ধে ব্যবহার করি ছুরিটা, সেক্ষেত্রে আমাকে যা করতে হবে তা হলো, আবারও ফিরে যেতে হবে ঘরটাতে, উপর্যুপরি আঘাত করে শেষ করে ফেলতে হবে মানুষটাকে। বাবা যদি থাকতেন এখন, চাইতেন, সে-কাজই যেন করি আমি। আর মা যদি থাকতেন, মেয়েটাকেও শেষ করে দিতে বলতেন। যা হোক, যদি দরকার হয় তো সবাইকেই শেষ করে দেবো আমি। তারপর ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে পালিয়ে যাবো। বাবা আর মা যদি থাকতেন এখন, আমার এই কাজে সম্মত হতেন।

মেয়েটাকে আঘাত করতে চাই না আমি। কিন্তু যদি দরকার হয়, করতে হবে ওই কাজ।

রাতের বেলায় এই যে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি এঁটেছি আমি, একটা ঝামেলা আছে এ-কাজে। বলা ভালো, বড় রকমের একটা ঝামেলা আছে। সে-সমস্যার সমাধান আমি করতে পারবো কি না, জানি না। সমস্যাটা হচ্ছে, ডক্টর অগলেসবিকে বিদায় জানানোর জন্য রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি।



‘ন্যাশ, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে?’ ন্যাশের পুরু জ্যাকেটের ভেতর নিচে লুকানো আছে ছোট একটা ইয়ারপিস, ওটাতে খড়খড় করে উঠল এসপিনোজার কণ্ঠ।

ওই ইয়ারপিসের গায়ে টোকা দেয়ার ইচ্ছেটা জোর করে সংবরণ করল ন্যাশ। ‘কপি, সোয়াট লিডার, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।’

‘আমি এক থেকে তিন গুনে শেষ করামাত্র প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে,’ এবারের কণ্ঠটা ব্রোগানের, হাঁপাচ্ছে। কিছুটা চাপা শোনাচ্ছে ওর গলার আওয়াজ। পল আপচার্চের বাড়ি থেকে এক ব্লক দূরে গাড়ি পার্ক করেছে সে এবং তার দল। এই মুহূর্তে তুষার ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে ওই বাড়ির পেছনদিকের উদ্দেশে।

ডেজিগনেটেড ড্রাইভারের অফিস থেকে পল আপচার্চের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে নিয়েছিল ক্রেয়ার। ডিপার্টমেন্ট অভ মোটর ভেহিকেল এবং কাউন্টি রেকর্ড ঘেঁটে ঠিকানাটা নিশ্চিত করেছে ক্রোজ। একটা চুক্তিপত্রে পাওয়া গেছে পলের নাম। গত প্রায় দশ বছর ধরে এই বাড়ির মালিকানা পলের।

নিজের গাড়িতে বসে আছে ন্যাশ... পলের বাসা যে-রাস্তায়, সেখান থেকে দূর ব্লক দূরে। অ্যামাজন ডট কমের বড়সড় একটা বাক্স রাখা আছে গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে। ওই বাক্সের ভেতরে আছে একটা অ্যাসল্ট রাইফেল। আরও আছে দশ পাউন্ড ওজনের দুটো লৌহদণ্ড। পুরু কোটের নিচে বডি আর্মার পরে আছে সে।

‘আমি এখন ওই বাড়ির পেছনদিকটা দেখতে পাচ্ছি,’ বলল ব্রোগান। ‘আর দ্বিতীয় তলায় দেখতে পাচ্ছি তিনটা জানালা। চিলেকোঠা আছে, সেখানে জানালা আছে একটা। আর নিচতলায় দেখতে পাচ্ছি দুটো। ধেং...’

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইল এসপিনোজা।

‘বাড়ির পেছনদিকের উঠানে চার ফুট উঁচু চেইনলিঙ্ক আছে। আমাদের পায়ের নিচে তুষার জমেছে দু’ফুট উঁচু হয়ে। এবং যত আগে বাড়ছি আমরা, তুষারের উচ্চতা বাড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, চেইনলিঙ্কের কাছে তুষার এত উঁচু হয়ে জমেছে যে, ওই বেড়ার মাথা ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়। মনে হচ্ছে ওই বেড়া টপকাতে হবে আমাদের। ধারণা করে নিচ্ছি, ফেন্সের কাছে হাজির হতে আরও ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগবে আমাদের। ওটা টপকাতে লাগবে দশ সেকেন্ড। বাড়ির পেছনদিকের দরজায় হাজির হতে সময় লাগবে আরও বিশ সেকেন্ড। তারপর দরজাটা ভাঙা যায় কি না, সে-চেষ্টা করবো আমরা। এই পুরো পথে লুকানোর মতো একটা কোনো আড়াল নেই আমাদের জন্য। এখানে সবই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।’

‘বুঝতে পেরেছি,’ বলল এসপিনোজা। ‘ন্যাশ, আমার পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে যান আপনি। যদি ডোরবেল দেখতে পান, তা হলে বাজাবেন না বেলটা।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৫৫১

বরং টাকা দেবেন দরজায়। এ-রকম অনেক পুরনো-বাড়িতেই কিন্তু ডোরবেল কোনো কাজ করে না। এবং বাইরে থেকে দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় থাকে না। কাজেই ডোরবেল চাপ দিয়ে তারপর অপেক্ষা করতে গেলে মূল্যবান সময় নষ্ট হতে পারে আমাদের। আপনি যা করতে পারেন তা হলো, জোরে টাকা দিতে পারেন দরজায়... চাইলে কিলও মারতে পারেন। যে-মুহূর্তে করবেন কাজটা, তারপর এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনবো আমি। আসলে সাড়া দেয়ার জন্য একটু সময় দেবো আপচার্চকে। আমি পাঁচ গুনে শেষ করামাত্র রাস্তার দু'প্রান্ত থেকে হাজির হয়ে যাবে আমাদের ভ্যানগুলো। ওদিকে ব্রোগান আর তার দল বাড়ির পেছনের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে ভেতরে।' একটা মুহূর্তের জন্য থামল সে। 'এগিয়ে যান আপনি, বাড়ির সামনে যে-জায়গায় থামবেন সেটা ছোট একটা পোর্চ। একটা রেলিং উঠে গেছে ওই পোর্চের দিকে। কাজটা একটু কঠিন হবে আপনার জন্য, কারণ পোর্চের ওপর কোনো রণকৌশল খাটানোর জন্য বেশি জায়গা পাবেন না আপনি। আপচার্চ যদি দরজা খোলে, ওর ওপর দিয়েই দৌড়ে ছড়মুড় করে ঢুকে পড়বেন বাসার ভেতরে। ব্যাটারিং র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করবেন আপনার সেই ওজনদার বাস্কেট। ওই লোককে একটু খতমত খাইয়ে দিতে পারলেই চলবে। সে যদি দূরে থাকে আমাদের রাস্তা থেকে, বাকিটুকু সামলে নিতে পারবো আমরা।'

‘আর যদি সে জবাব না দেয় তা হলে কী হবে?’

‘যদি সে জবাব না দেয়, তা হলে আমাদের রাস্তা থেকে দূরে সরে যাবেন আপনি। এবং আপনি সরে যাওয়ামাত্র আমাদের একটা দল হাজির হয়ে যাবে বাড়ির সদর-দরজায়, ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে ওটা। তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়বে। ততক্ষণে পেছনের দরজা দিয়ে ওই বাসায় ঢুকে পড়তে পারবে ব্রোগানের দল। ব্রোগান?’

‘জি, স্যর?’

‘তোমরা দুই দল ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার পর নিশ্চিত করবে, নিচতলায় কোনো ঝামেলা নেই। তারপর আমি চাই তুমি বেসমেন্টে যাবে। যদি সাববেসমেন্ট থাকে ওই বাড়িতে, তা হলে সেখানেও যাবে। আমি যাবো দ্বিতীয় তলায় আর চিলেকোঠায়।’

‘বুঝতে পেরেছি।’

‘ন্যাশ, আমাদের রাস্তা থেকে যত বেশি সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করবেন আপনি। আপনার পরনে কিন্তু হেডগিয়ার নেই। চাই না, একগুলিতে আপনার খুলি উড়িয়ে দিক কেউ।’ একটুখানি বিরতি দিল এসপিনোজা। তারপর আবার বলতে লাগল, ‘আমাদের অ্যান্ডুলেসগুলো হাজির হয়ে গেছে। রাস্তার দু'প্রান্ত থেকে সোয়াট টিমের ভ্যানের পেছন পেছন এগিয়ে আসবে ও-দুটো। অ্যান্ডুলেসের পেছনে থাকবে পুলিশের টহল গাড়ি। এই ব্লক পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৫২

অরাজকতা

অরাজকতা

করবো আমরা। ওই লোক যদি কোনোভাবে বেরিয়েও পড়ে বাড়ি থেকে, যাত্রে পালাতে না পারে, সে-চেষ্টা করবো। সব দল জায়গামতো আছ?’

‘বাড়ির পেছনে পৌঁছে গেছি,’ জানান দিল ব্রোগান। ‘পজিশন নিয়েছি।’

‘ইস্ট স্ট্রিট, কপি।’

‘ওয়েস্ট স্ট্রিট, কপি।’

‘পেট্রোল সিক্স, ওয়ান ফোর ফোর, থার্টি এইট এবং ওয়ান টু ওয়ান এইট... সব আছে জায়গামতো।’

নীরবতা।

‘ন্যাশ?’ আওয়াজ দিল ব্রোগান।

লম্বা করে দম নিল ন্যাশ। ‘আমি প্রস্তুত, কপি।’

‘ঠিক আছে। এগিয়ে যান। আপনার হাতের ডান দিকে থাকবে থার্টি এইট... নীলের ওপর সাদা দাগওয়ালা গাড়িটা। আপনি যেদিক দিয়ে যাবেন, সেদিক দিয়েই এগোবো আমরা পরে।’

‘বুঝতে পেরেছি।’

মুখ দিয়ে বড় করে দম নিল ন্যাশ, ধরে রাখল কিছুক্ষণ। নাক দিয়ে ছাড়ল ধীরে ধীরে।

একটুও লাভ হলো না। শান্ত হলো না বুকের ভেতরটা।

খেয়াল করল, হাত কাঁপছে ওর। বুকের খাঁচায় জোরে জোরে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। চাকরিজীবনের সারাটা সময় ধরে আজ এই নিয়ে এক শ’বারেরও বেশি হানা দিয়েছে কোনো না কোনো সন্দেহভাজন লোকের বাসায়। তারপরও, এখন যে-অনুভূতি হচ্ছে, এটা কেন যেন বিদায় নেয় না। ওকে একবার একটা কথা বলেছিল পোর্টার... যেদিন দেখবে কারও বাসায় হানা দিতে গিয়ে তোমার আর কোনো উত্তেজনাই হচ্ছে না, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে না, বুঝে নিয়ো, গুলিটা সেদিনই খাবে তুমি।

‘প্রস্তুত থাকি অথবা না থাকি,’ বলল ন্যাশ, ‘রওনা দিচ্ছি।’

পার্ক করে রাখলে ওর গাড়ির গিয়ার কেমন যেন আঁকড়ে যায়। গাড়িটা গিয়ারে ফেলে চালু করতে একটু জোর খাটাতে হলো ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে আগে বাড়ল পুরনো গাড়িটা।

‘ধীরে ধীরে এগোন, ন্যাশ। ধীর গতিতে আগে বাড়ুন, অসুবিধা নেই, কিন্তু একটানা চলতে থাকুন। তুমারের ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। আজ সকালে সাফ করা হয়েছে ওসব। কিন্তু তারপরও জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে রাস্তায়,’ বলল এসপিনোজা। ‘আপনার হাতের ডান দিকে আরও ছ’টা বাড়ি আছে... ওই পাহাড়ের ওপর যখন হাজির হবেন, দেখতে পাবেন।’

ঠিকমতো এগোতে পারছে না ন্যাশের গাড়ির টায়ারগুলো। তুমার বা বরফের ওপর গাড়ি চালাতে গেলে বেশ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। গতি যদি বেশি হয়ে যায়,

অথবা কম থাকে, চাকা পিছলে যায় বার বার। ন্যাশের গাড়িটা দ্রুত আগে বাড়তে চাইছে, কিন্তু সে রাশ টেনে ধরে রেখেছে যেন। যে-বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, সেটার নীল-সাদা ছাদটা নজরে পড়ছে। দূর থেকে দেখতে কেমন যেন চূড়ার মতো লাগছে ওই ছাদ। আরেকটু এগোনোর পর নজরে পড়ল সদর দরজাটা, সেই সঙ্গে বাসার ঠিকানা। রাস্তার একধারে পার্ক করে রাখা আছে দুটো গাড়ি। কিন্তু তুষারের নিচে চাপা পড়েছে বলে ওগুলোকে এখন দৈত্যাকৃতির সাদা টিবি বলে মনে হচ্ছে। গাড়ি দুটোর রঙ কী, কোন প্রতিষ্ঠান বানিয়েছে ওগুলো, মডেল কী... কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওই বাড়ির সামনের অংশটা খালি। অনেকখানি জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে সেখানে, আর তাই ওই গাড়ি দুটোর সঙ্গে একসারিতে পার্কিং করার দরকার হবে না ন্যাশের। কায়দা-কসরত করে নিজের গাড়িটা একধারে পার্ক করে ফেলল সে।

ছোট এয়ারপিসে খড়খড়ানি উঠল আবারও, শোনা গেল এসপিনোজার কণ্ঠ। ‘জায়গামতো পৌঁছে গেছেন ন্যাশ। আমার কথামতো আগে বাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকো সব টিম।’

গাড়িটা চালু রেখেই নেমে পড়বে কি না, একটুখানি ভাবল ন্যাশ। ওর জায়গায় যদি আসলেই একজন ডেলিভারি ম্যান হাজির হতো এখন, তা হলে কী করত? গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে পড়ত? ঠিক বুঝতে পারছে না সে। আসলে কোনো ডেলিভারি ম্যান কী করে এ-রকম পরিস্থিতিতে, খেয়াল করেনি কখনও। তবে যদি ইঞ্জিন চালু রেখে নেমে পড়ে, তা হলে সেটার একটা মানে থাকে। এই আবহাওয়ায় কিছু না কিছু জিনিস ডেলিভারি দেয়ার জন্য গাড়ি থেকে বার বার বের হওয়া, এবং তারপর আবার এসে গাড়িতে ঢোকা... ইঞ্জিন বন্ধ করার বিশেষ কোনো কারণ নেই আসলে।

তোমার গাড়িটা নিয়ে সটকে পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতে পারে আপচার্চ।

মনে মনে নিজেকে বলল ন্যাশ। তারপরই একটা সন্দেহ খেলা করে গেল ওর মনে... এই জায়গা থেকে গাড়ি চালিয়ে রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারবে কি না ওই লোক। কিন্তু বিশেষ সেই চিন্তা কেমন যেন লটকে রয়ে গেল ওর মনে। আর তাই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে, চাবি ঢোকাল পকেটে। খুক খুক শব্দে যেন কেশে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন। ওটা যেন বুঝতে পারছে, দৌড়ানোর কাজটা আপাতত বন্ধ। শেষবারের মতো একটা আর্তনাদ তুলে চুপ হয়ে গেল ওটা।

অ্যামাজন কোম্পানির বাক্সটা দু’হাতে তুলে নিল ন্যাশ, গাড়ির দরজা খুলল। তুষারঝড় চলছে, বেরিয়ে পড়ল সে-ঝড় উপেক্ষা করে। তুষারপাতের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। একেকটা তুষারকণা এখন এক ইঞ্চির মতো পুরু। ন্যাশ জানে, এই ব্যাপারটা দৃষ্টিসীমার ওপরও প্রভাব ফেলবে। ওর অনাবৃত দু’গালে যেন চাবুকের বাড়ি মারছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। গাড়ির একটা কোনা ঘুরে এগিয়ে

চলেছে সে। যে-ফুটপাত এগিয়ে গেছে ওই বাড়ির দিকে, কল্পনার চোখে দেখে নিয়েছে সেটা। তুষারের একটা কম্বলের নিচে ঢাকা পড়ে আছে সেটা।

‘বাড়ির ভেতরে নড়াচড়া লক্ষ করতে পারছি আমরা,’ ন্যাশের কানে যেন মন্ত পড়ছে এসপিনোজা। ‘আপনার হাতের বাঁ দিকে, দ্বিতীয় তলায়, জানালার পর্দার আড়ালে।’

কিন্তু ওই নড়াচড়া নজরে পড়েনি ন্যাশের।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়ির পোর্চের দিকে, সেখানে পৌঁছে গেছে সে।

ধাপগুলো বেয়ে উঠতে লাগল সাবধানে। একহাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে বাস্কেট, অন্য হাত দিয়ে ধরে রেখেছে ধাতব রেলিং।

পোর্চটা বেশি বড় না, ছোটই বলা চলে। সেখানে যখন হাজির হলো সে, একটা ডোরবেল নজরে পড়ল। হাত বাড়তে যাচ্ছিল ওটার দিকে, এমন সময় মনে পড়ে গেল, কয়েক মিনিট আগে ওকে কী বলেছিল এসপিনোজা।

গর্দভ কোথাকার, মনে মনেই নিজেকে গালমন্দ করল সে, কাজে মনোযো দাও।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাতে ইচ্ছা করছে ওর। তাকাতে ইচ্ছা করে রাস্তার এদিকে-সেদিকে। জানতে ইচ্ছা করছে, বাকি সবার যেসব জায়গায় থাকার কথা, তারা সেখানে আছে কি না। কিন্তু করল না ও-রকম কিছু। বরং তার বদলে টোকা দিল দরজায়... তিনবার, বেশ জোরে। এত জোরে যে, ব্যথা পেল আঙুলের গাঁটে।

চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, সোয়াট টিমের ভ্যান দুটো দ্রুত এগিয়ে আসছে রাস্তার দুই প্রান্ত দিয়ে। রাস্তার মাঝখানে একজায়গায় পিছলে গেল দুটো ভ্যানের চাকাই, তুষারের সঙ্গে টায়ার ঘষা খাওয়ার আওয়াজ উঠল। দুটো ভ্যানেরই পেছনদিকের দরজা খুলে গেছে ইতোমধ্যে। লাফিয়ে নামতে শুরু করেছে কালো বডি আর্মার পরিহিত লোকেরা।

ন্যাশের কানে নিজের লোকদের উদ্দেশে রীতিমতো গর্জন করে চলেছে এসপিনোজা। ‘যাও, যাও, যাও!’

দরজায় টোকা দিয়েছিল ন্যাশ, কিন্তু সাড়া দেয়নি কেউ।

দরজার পাশে পাতলা কাচের একটা জানালা আছে, ওটা দিয়ে বাসার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ন্যাশ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তুষারের ওপর বুটের মচমচ আওয়াজ শুনতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল বাঁ দিকে, দরজা থেকে দূরে। টমাস বা টিবিডো’র যে-কোনো একজন... কে, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না ন্যাশ... বড় আর কালো একটা ধাতব ব্যাটারিং র‍্যাম নিয়ে আছড়ে পড়ল দরজার পুরনো কাঠের পাল্লার ওপর। পর পর দুই আঘাতেই আলাগা হয়ে গেল ডেডবোল্ট, হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা। ন্যাশ শুধু দেখতে পেল, কালো ইউনিফর্ম পরিহিত একদল লোক ওকে ছাড়িয়ে একছুটে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

জোরালো একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেল বাড়ির পেছনদিক থেকে, প্রচণ্ড ধাক্কায় খটখট শব্দে নড়ে উঠল জানালাগুলো। স্টান গ্রেনেড ফাটানো হয়েছে।

শোনা গেল ব্রোগানের গলা। ‘আমরা ভেতরে ঢুকে পড়েছি! কিচেন-টেবিলের ওপর পড়ে আছে কেউ একজন! একটা মেয়ে! আর কেউ নেই এখানে!’

‘লিভিং রুমেও কেউ নেই!’

‘বেসমেন্টে যাওয়ার সিঁড়ি দেখতে পেয়েছি! নিচে যাচ্ছি আমরা!’

‘আমি এসপিনোজা, দ্বিতীয় তলার ল্যান্ডিংয়ে আছি।’ কণ্ঠটা নিচু। কেমন যেন ফিসফিসানির মতো। ‘বাথরুমে কেউ নেই। প্রথম বেডরুমে কেউ নেই। দ্বিতীয় বেডরুমে...’

বাকিটা আর শোনা গেল না।

ইয়ারপিসটা কানের আরও ভেতরে ঢুকিয়ে নিল ন্যাশ।

‘নড়বেন না! একদম নড়বেন না! না...’

বাকি কথা শোনার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না ন্যাশ। অ্যামাজন বাল্কের ভেতর থেকে হ্যাঁচকা একটানে বের করল অ্যাসল্ট রাইফেলটা, একছুটে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। লিভিং রুমের পেছনদিকে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় তলায় ওঠার সিঁড়িটা। একদৌড়ে সেখানে হাজির হলো সে, একেকবারে দুটো করে ধাপ টপকে উঠতে লাগল ওপরদিকে।

দ্বিতীয় তলায় হাজির হওয়ামাত্র দেখা গেল ছোট একটা ল্যান্ডিং। দ্বিতীয় বেডরুমটার ভেতরে আছে কিছু একটা অথবা কোনো একজন; এবং সেদিকে নিজের অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে এসপিনোজা। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারই দলের আরেক সদস্য। ওই লোক নিজের অস্ত্র তাক করে রেখেছে মেঝের দিকে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ন্যাশ। যে-কোনো জরুরি মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় আছে ওর রাইফেল। বেডরুমের ভেতরে ঢুকে পড়ল এসপিনোজা।

ইয়ারপিসে ব্রোগানের কণ্ঠ আবারও শুনতে পেল ন্যাশ। কিন্তু এবার আর চোঁচাচ্ছে না লোকটা।

‘ঈশ্বর... এসব কী... আরও একটা মেয়েকে পেয়েছি আমরা এখানে। বেসমেন্টে আর কেউ নেই!’



মেঝের সঙ্গে বন্টু দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে ধাতব একটা চেয়ার; সেটাতে বসে পড়ল উইডনার। সে-চেয়ারের সামনে আছে একটা টেবিল, সেটাও মেঝের সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে একই কায়দায়। ঘরের এদিকে-সেদিকে চঞ্চল চাহনিতে বার বার তাকাচ্ছে সে। অস্থিরতা দেখা দিয়েছে হাতের আঙুলগুলোতেও। বার বার এক হাত দিয়ে ধরছে সে নিজের অন্য হাত। কখনও আবার একটা হাত রাখছে টেবিলের ওপর, অন্যটা কোলের ওপর।

লোকটাকে ওয়ান-ওয়ে জানালা দিয়ে দেখছে পুল। ‘পুলিশ যখন পাকড়াও করল ওই লোককে, তখন কি কিছু বলেছে সে?’

মাথা নাড়লেন ওয়ার্ডেন ভিনা। ‘ওসব ক্ষেত্রে অনেকেই ধস্তাধস্তি করে। কিন্তু উইডনার সে-রকম কিছু করেনি। শ্রেফ আত্মসমর্পণ করেছে। আগেও বলেছি, একটা ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছিল সে। সঙ্গে নিয়েছিল হাজার দু’-এক ডলার। আরও নিয়েছিল শিকাগোতে যাওয়ার একটা বাস টিকেট। যদি ওর সেই অ্যাপার্টমেন্টে যেতে আর দশ মিনিটও দেরি হতো পুলিশের, আমাদের হাত ফসকে পালিয়ে যেত লোকটা।’

‘তার সঙ্গে যদি কথা বলি আমি, কিছু মনে করবেন?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ার্ডেন। ‘আমি কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে না লোকটা। শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি।’

পুলের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন ডিরেঞ্জো। পুল টের পাছে, ওই লোকের গা থেকে যেন তাপের বিকিরণ ঘটছে।

‘আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে লোকটা আবার আপনাদের,’ ভিনাকে বলল পুল।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ডিরেঞ্জো, কিন্তু কিছু বলল না।

উইডনার যে-ঘরে আছে এবং পুলরা যে-ঘরে আছে, দুটো ঘরকে আলাদা করেছে ধাতব একটা দরজা; সেটা খুলল পুল। পা রাখল ইন্টারভিউ রুমে। লাগিয়ে দিল দরজাটা।

মুখ তুলে তাকাল উইডনার। একটা হাত রাখল টেবিলের ওপর।

ওই লোকের মুখোমুখি একটা চেয়ার আছে, এগিয়ে গিয়ে সেখানে বসে পড়ল পুল। ‘হ্যালো, ভিনসেন্ট। আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল, এফবিআই-এ আছি। শুনে যা মনে হলো, আজকের সকাল বেশ ঘটনাবহুল হয়েছে আপনার জন্য। এক কাজ করুন। লিবি ম্যাকিনলে আপনার জন্য আসলে কে, সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়ে শুরু করুন কথোপকথন।’

আঙুলের সাহায্যে টেবিলে খটাখট আওয়াজ তুলেছিল উইডনার, থেমে গেল সেটা। ‘উকিল। সারা ওয়ার্নার। এখনই।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। ওই পথে এগোনোর সব রকমের আইনি অধিকার আছে আপনার। ধারণা করে নিচ্ছি, আপনি আসলে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন এই জেলব্যবস্থায়, তাই কোন ব্যাপারটা আপনার কাজে লাগবে সে-জ্ঞান ভালোই রাখেন,’ বলল পুল। ‘আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, আপনি যদি চান আমার আর আপনার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াক কোনো একজন উকিল, তা হলে আমার পক্ষেও সাহায্য করা সম্ভব হবে না আপনাকে। তার মানে হচ্ছে, আপনার বিরুদ্ধে সব রকমের অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হবো আমরা... দুষ্কর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করা, প্ররোচনা দেয়া, জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কাজে একজন কয়েদিকে সাহায্য করা এবং শেষপর্যন্ত আইনের হাত ফসকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা। বিশ্বাস করুন, অনেক বছরের জেল হবে আপনার। কিন্তু যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেন, যদি সাহায্য করেন আমাকে, কথা দিচ্ছি, বিনিময়ে আমিও সাহায্য করবো আপনাকে।’ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল পুল, আরেকটু কাছে গেল উইডনারের। ‘একটা কথা পরিস্কার জানিয়ে দিই আপনাকে, ভিনসেন্ট। এখানে, সত্যি বলতে কী, আপনার সঙ্গে দেখা করতে অথবা কথা বলতে আসিনি আমি। কিছু একটার পরিসমাপ্তি চাইছি, এবং আপনি হচ্ছেন গিয়ে সেটার উপায় মাত্র, আর কিছু না। আপনার সঙ্গে কঠোর আচরণ করার কোনো কারণই নেই আমার। ওই যে কাচের জানালাটা দেখতে পাচ্ছেন... ওটার আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার ওয়ার্ডেন এবং ক্যাপ্টেন। তাঁদের দু’জনের কেউই আপনাকে নিয়ে খুশি না। আপনাকে যদি এখানে ফেলে রেখে যাই আমি, তা হলে আপনার এমন কোনো হাল করবেন তাঁরা যে, অন্যদের জন্য শ্রেফ উদাহরণ হয়ে থাকবেন আপনি। কিছু একটা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে কাজে লাগাবেন তাঁরা। কিন্তু আপনি যদি সাহায্য করেন আমাকে, তা হলে আপনাকে আমার সঙ্গে শিকাগোতে নিয়ে যাবো। সেক্ষেত্রে নিজেকে আপনি বাঁচাতে পারবেন আপনার ওয়ার্ডেন এবং ক্যাপ্টেনের কবল থেকে। তা ছাড়া আপনি তো এমনিতেও যাচ্ছিলেন শিকাগোতে, তা-ই না? বাসের কথা ভুলে যান। লুই আর্মস্ট্রংয়ের টারম্যাকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে একটা প্লেন।’

এবার সামনের দিকে ঝুঁকল উইডনার। ‘উকিল সারা ওয়ার্নার। এখনই।’

‘অ্যানসন বিশপের ব্যাপারে বলুন আমাকে। আপনি কেন সাহায্য করছেন লোকটাকে?’

কিছু বলল না উইডনার।

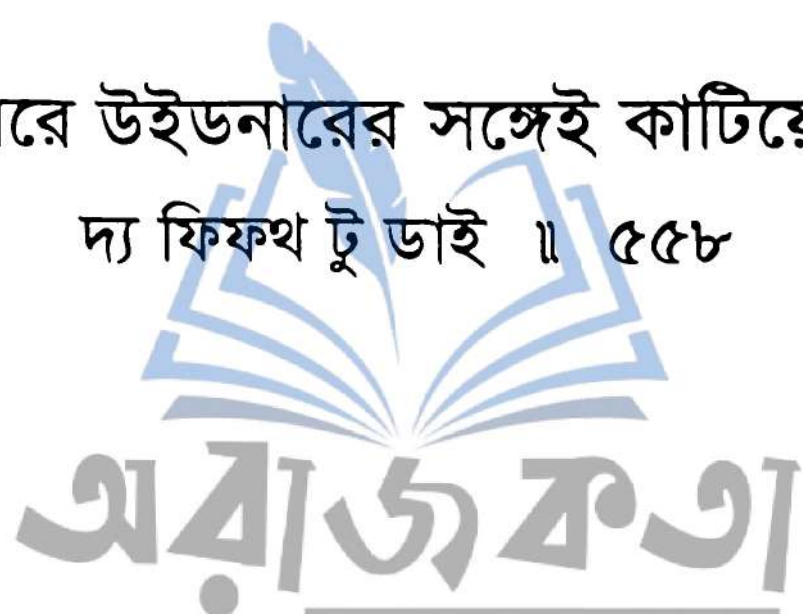
‘আপনি যে-মহিলাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, সে আসলে কে? বিশপের মা?’

নীরবতা।

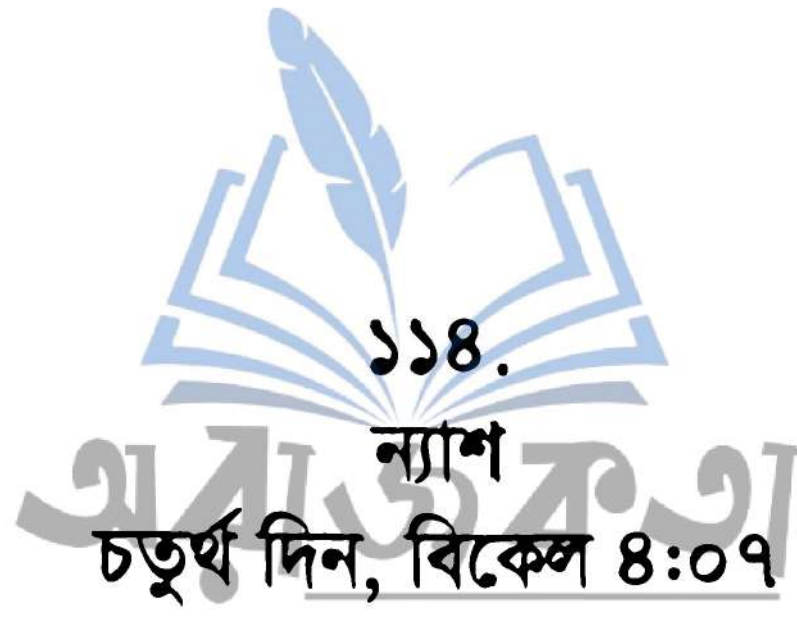
বুঝতে পারছে পুল।

আগামী দু’ঘণ্টা এই ঘরে উইডনারের সঙ্গেই কাটিয়ে দিতে হবে ওকে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৫৮



অরাজকতা



বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পা রাখল ন্যাশ।

ঘরটা ছোট। এখানে ইতোমধ্যেই ঢুকে পড়েছে এসপিনোজা। অস্ত্র তাক করে রেখেছে একটা লোকের দিকে। ঘরের একধারে একটা জানালা আছে, সেটার সামনে আছে একটা ডেস্ক, সে-ডেস্কের ধারে বসে আছে ওই লোক। এই জানালা দিয়েই কোনো একজনের নড়াচড়া দেখা গিয়েছিল তখন বাইরে থেকে।

ন্যাশদেরকে এই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছিল লোকটা।

কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি সে।

এখনও বসেই আছে লোকটা, তার পিঠটা ন্যাশদের দিকে, বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা, তাকিয়ে আছে ডেস্কের দিকে। আঙুলগুলো মেলে দেয়া অবস্থায় দু'হাত রেখেছে ডেস্কের ওপর। 'আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই।'

ওই লোকের কাছে পৌঁছে গেছে এসপিনোজা। বেণ্টের পেছনদিক থেকে বের করে ফেলেছে পুরু একটা জিপ টাই। আঁকড়ে ধরল লোকটার বাঁ হাত, মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের দিকে। একই কায়দা অবলম্বন করল ডান হাতের বেলাতেও। জিপ টাই ব্যবহার করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল হাত দুটো। সোয়াটের অন্য অফিসার টিবিডো পুরোটা সময় নিজের অস্ত্র তাক করে রাখল ওই লোকের মাথার দিকে।

ন্যাশ তাকিয়ে আছে আরেক দিকে— সার্জিকাল একটা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে লোকটার মাথায়... শুরু হয়েছে বাঁ কানের কাছ থেকে, চলে গেছে তার পরনের কালো নিট ক্যাপের নিচে। লাল হয়ে আছে বিশেষ ওই জায়গার মাংস। কেমন যেন দগদগে দেখাচ্ছে। শুকনো রক্তও দেখা যাচ্ছে সেখানে। ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় হাজির হয়ে গেল সে। আরেকটু হলে উল্টে ফেলে দিয়েছিল কাপড়ের একটা স্তুপ। কালো সেই ক্যাপ সরাল।

লোকটা বলতে গেলে টেকো। কয়েক দিন আগে চাঁদি কামিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। চাঁদির এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পাতলা কিছু চুল গজাতে আরম্ভ করেছে।

'কেমোথেরাপি দিচ্ছি আমি, আর তাই এই দশা হয়েছে আমার। দুঃখিত। আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক লাগছে। ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেজন্য।'

স্পষ্টভাবে কথা বলতে অসুবিধা হয় লোকটার। ইংরেজি "সরি" উচ্চারণ করতে গিয়ে শব্দটা কেমন যেন বাধল তার মুখে।

'পল আপচার্চ?' বলল এসপিনোজা, চেয়ার থেকে তুলছে লোকটাকে। 'আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় চুপ থাকার অধিকার আছে তোমার...'

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৫৯

আর কী কী বলল এসপিনোজা, খেয়াল করল না ন্যাশ। টের পেল, ঘরের এখানে-সেখানে তাকাতে আরম্ভ করেছে সে।

এই ঘর ছোট কোনো মেয়ের। ঘরটা গোলাপি, উজ্জ্বল। ছোট একটা বিছানা আছে একধারে। সেটা ঢেকে রেখেছে হ্যালো কিটি'র একটা লেপ। স্টাফ-করা কিছু জন্তু-জানোয়ারও দেখা যাচ্ছে বিছানার ওপর। দেয়ালে দেয়ালে আছে বিভিন্ন আঁকাআঁকি। কোনো কোনো ড্রয়িং দেখলেই বোঝা যায়, ওটা কোনো বাচ্চার কাজ। কোনোটা আবার প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মানুষের মেধাবী হাতের। নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে বিশেষ ওই ছবিগুলো। নিখুঁতভাবে রঙ করা হয়েছে।

ঘরের এককোণায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ম্যানিকুইন... বাচ্চাদের আকৃতির একটা মানবপুতুল। শুধু বাচ্চা বললে কম বলা হয় আসলে, ওটা ছোট একটা মেয়ের আকৃতির। কোনো খুকির কাপড় পরিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে... লাল সোয়েটার, নীল শর্টস।

ডেস্কের কাছ থেকে টানতে টানতে ওই লোককে সরিয়ে নিচ্ছে এসপিনোজা। ডেস্কের ওপর একটা ড্রয়িংয়ের ওপর নজর পড়ল ন্যাশের। নিজের দু'হাত ওটার ওপরই রেখেছিল ওই লোক একটু আগে। ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়েকে... ম্যানিকুইনের মতোই কাপড় পরে আছে। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে... ছবির পুতুলটা রঙ করার চেষ্টা করছিল ওই লোক। কিন্তু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছে সে কাজটা করতে গিয়ে। ক্যাপ-খোলা বেশ কয়েকটা রঙ পেন পড়ে আছে ডেস্কের ওপর এখানে-সেখানে।

‘প্লিজ, ওই মেয়ের গায়ে হাত তুলবেন না,’ এসপিনোজা আর টিবিডো মিলে ধরাধরি করে লোকটাকে নিয়ে চলেছে ঘরের দরজার উদ্দেশে, ম্যানিকুইনটা পাশ কাটাল তারা, এমন সময় বলে উঠল লোকটা। রক্তলাল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দেয়ালের ছবিগুলোর ওপর।

‘ডিটেকটিভ ন্যাশ?’ ইয়ারপিসে শোনা গেল ব্রোগানের কণ্ঠ।

‘হ্যাঁ?’

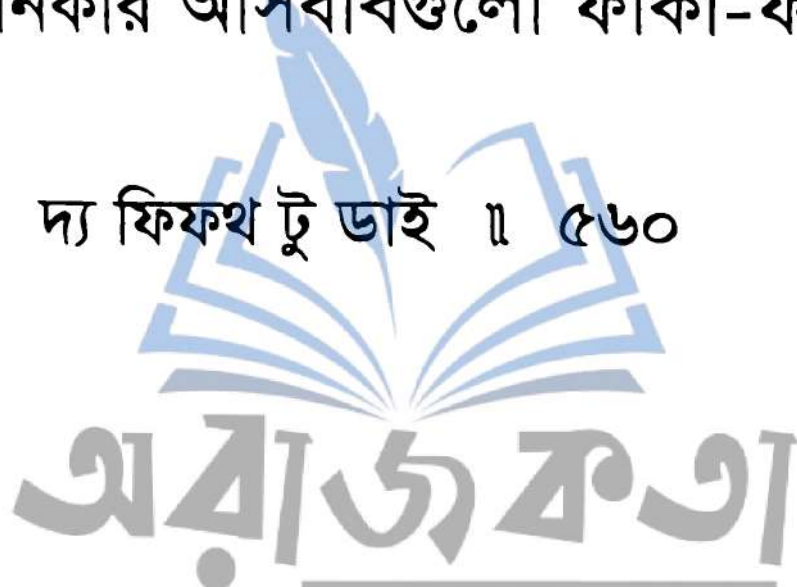
‘কিচেনে একটু আসুন তো।’

‘আসছি।’

সিঁড়ির গোড়ার কাছে যখন পৌঁছে গেল ন্যাশ, মুখ তুলে তাকাল ওপরের দিকে। দ্বিতীয় তলার হলওয়াতে একঝলক দেখতে পেল আপচার্চকে। লোকটাকে এখন ঘিরে ফেলেছে সোয়াট টিমের অনেকেই। তারা সবাই মিলে এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। ফোঁপাচ্ছে ওই লোক, মাইক্রোফোনে শোনা যাচ্ছে সেটা। পাত্তা দিল না ন্যাশ।

লিভিংরুমটা ছোট, এখানকার আসবাবগুলো ফাঁকা-ফাঁকাভাবে সাজানো; ঘরটা পার হলো ন্যাশ।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৬০



অরাজকতা



কিচেন টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক।

টেবিলটার ওপর শায়িত অবস্থায় আছে একটা মেয়ে। বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটু আগে ওপরতলার ম্যানিকুইন এবং সেই ড্রয়িংয়ের গায়ে যে-রকম সোয়েটার আর শার্টস ছিল, টেবিলের মেয়েটার গায়েও তেমন কাপড় দেখা যাচ্ছে। ওর দু'হাত আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বুকের ওপর। এমন এক কায়দায় কাজটা করা হয়েছে, যাত্রে মেয়েটার তালু দুটো ওপরের দিকে থাকে। তালু দুটোর ওপর এখন দেখা যাচ্ছে ছোট আর সাদা একটা বাক্স... বেঁধে রাখা হয়েছে কালো দড়ি দিয়ে।

‘মেয়েটা বেঁচে আছে কিন্তু জ্ঞান নেই ওর,’ বলতে শুরু করল ব্রোগান, আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটার মাথা। ‘শুকনো রক্ত দেখতে পেয়েছি আমি এখানে। তবে এই মেয়ের শরীরের কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নজরে পড়েনি।’ তাকাল ন্যাশের দিকে। ‘বেসমেন্টে আরেকটা মেয়েকে পেয়েছি আমরা। জ্ঞান নেই ওরও। এবং ওর শরীরেরও কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাইনি।’

সাদা ওই বাক্সের ওপর নজর স্থির হয়ে আছে ন্যাশের। ‘এ-রকম কি হতে পারে, বিশেষ কোনো একজাতের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে এই মেয়ে দুটোকে?’

‘হতে পারে।’

হুড়মুড় করে হাজির হয়ে গেল প্যারামেডিকরা। ঘিরে ধরল টেবিলের মেয়েটাকে। ওই দলে আছে একজন মহিলা, আর দু'জন পুরুষ। মুহূর্তের মধ্যে একটা ব্লাড প্রেশার কাফ পরিয়ে দেয়া হলো মেয়েটার হাতে। এক লোককে দেখা গেল জোর করে মেলে ধরেছে মেয়েটার এক চোখের পাতা। একটা পেনলাইট জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ দেখল মেয়েটার ওই চোখ। মহিলা ধরে রেখেছে মেয়েটার একটা কজি। বলল, ‘পাল্‌স তেষটি।’

‘প্রেশার ১০২-৭০।’

মেয়েটার ধড়, মাথা এবং শরীরের আরও কিছু জায়গা পরখ করা হলো আঙুলের সাহায্যে। ‘ফিজিকাল ট্রমার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় না এসব রক্ত এই মেয়ের। আমার মনে হয় রক্তটা লেগেছে এখান থেকে...’ মেঝের একজায়গায় রক্তের ছোট একটা জলাশয় আছে, ইঙ্গিতে সে-জায়গা দেখিয়ে দিল মহিলা। লিনোলিয়ামের ওপর দাগ তৈরি করে ফেলেছে ওই রক্ত।

এতক্ষণে রক্তের সেই দাগ নজরে পড়ল ন্যাশের।

দরজা দিয়ে হাজির করা হলো চাকা-লাগানো একটা স্ট্রেচার, লাগানো হলো টেবিলের পাশে।

‘একটু দাঁড়ান।’ পকেট থেকে একজোড়া লেটেক্স গ্লাভস বের করল ন্যাশ, পরল। সাদা বাক্সটা সাবধানে সরিয়ে নিল ওই মেয়ের হাতের তালু থেকে।

আর দেরি করতে রাজি না প্যারামেডিকরা; মেয়েটাকে ঝটপট তুলে ফেলল স্ট্রেচারে। বেল্ট বেঁধে দিতে আরম্ভ করেছে ওই মেয়ের শরীরে।

টেবিলের ওপর ছোট সেই বাক্স নামিয়ে রাখল ন্যাশ। কালো দড়িটা ধরে টান মারল। খুলে পড়ে গেল ওটা।

স্তব্ধ একটা নীরবতা যে নেমে এসেছে সারা ঘরে, খেয়াল করেনি সে। খেয়াল করেনি, নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে বাকি সবাই, এমনকী প্যারামেডিকরাও। বাক্সের ঢাকনা সরাল, রেখে দিল একপাশে।

এই বাক্স, কোনো সন্দেহ নেই, বিশপের অন্য বাক্সগুলোর মতোই আরেকটা।

বাক্সের ভেতরে দেখা যাচ্ছে রূপালি একটা চাবি। সেটার মাথার কাছে আছে নীল প্লাস্টিক। চাবির ধাতুর গায়ে ইংরেজিতে খোদাই করা আছে: জে.এইচ.এস.এইচ.। চাবিটা রাখা হয়েছে তুলোর একটা ছোট্ট বিছানায়। ওটা তুলল ন্যাশ, নামিয়ে রাখল বাক্সের পাশে। বাক্সের ভেতরে এখন আর অন্য কোনো কিছু নেই।

‘আমার মনে হয় ওই চাবি কোনো হাসপাতালের লকারের,’ বলল মহিলা প্যারামেডিকটা। যে-লোক এখনও ধরে রেখেছে ব্লাড প্রেশার কাফ, তাকাল তার দিকে। ‘রিক? কী মনে হয় তোমার, বলো তো? স্ট্রিজারের চাবি, তা-ই না? জে.এইচ.এস.এইচ.?’

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, তাকাল ব্রোগানের দিকে। ‘আপনি না বললেন আরও একটা মেয়েকে পাওয়া গেছে এই বাসায়?’

‘বেসমেন্টে আছে। ওরও একই অবস্থা। আমার মনে হয় কোনো একজাতের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে এই মেয়ে দুটোকে। দু’জনের মুখের চারপাশে দাগ দেখতে পাওয়া গেছে। তবে ওসব দাগ গভীর কোনো কিছু না।’

স্ট্রেচারে শায়িত মেয়েটার দিকে... বলা ভালো, মেয়েটার উরুর দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল প্যারামেডিক লোকটা। ‘এই মেয়ের উরুতে সুঁই ঢোকানোর চিহ্ন আছে। এবং কাজটা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। ওর শরীরের যে-অবস্থা দেখলাম, আমরা ধারণা, প্রোপোফল ইনজেক্ট করা হয়েছে। আবার অন্য কোনো ঘুমের ওষুধও হতে পারে। মেয়েটার অবস্থা এখন স্থিতিশীল। ট্রমার কারণে যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলত সে, তা হলে তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আচরণ অন্য রকম হতো।’ তাকাল তার দলের অন্যদের দিকে। ‘ক্যাট, তুমি আর ডায়াজ এই মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে তোলো। সোজা নিয়ে যাও স্ট্রিজার হাসপাতালে। আর মাইককে বোলো একটা ফ্ল্যাটবেড স্ট্রেচার নিয়ে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে এই বাড়ির বেসমেন্টে। অন্য মেয়েটাকে তুলে নিয়ে আসছি আমরা, তারপর রওনা হবো তোমাদের পেছন পেছন। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই নমুনা-রক্ত জোগাড় করে ফেলতে হবে এই মেয়ে দুটোর শরীর থেকে। রেডিয়োতে জানিয়ে দিয়ো টক্সিকোলোজি টেস্ট করতে হবে দু’জনেরই।’

বুঝতে পারার কায়দায় মাথা ঝাঁকাল মহিলা। ধরল স্ট্রেচারের একটা প্রান্ত। তার সহযোগী ধরল আরেক প্রান্ত। দু’জনে মিলে অচেতন মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে কিচেনের বাইরে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৬২



অরাজকতা



তিনজন প্যারামেডিক এসেছিল, দু'জন চলে গেছে; অন্য যে-লোক বাকি আছে, তার পেছন পেছন রওয়ানা হলো ন্যাশ ধীর পায়ে। কিচেনের পেছনদিক থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে বাড়ির বেসমেন্টের দিকে, সেখানে ইতোমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে ওই লোক। দূর থেকে ওই জায়গা অন্ধকার কোনো গহ্বরের প্রবেশমুখ বলে মনে হচ্ছে।

ন্যাশ টের পেল, ওর ঠিক পেছনেই আছে ব্রোগান।

১১৫.
ডায়েরি

পরের তিনটা দিন আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল
কাইনেসিক্লের চিন্তা।

ভাবছি বাবার কথা।

মনে পড়ছে মাকেও।

ডক্টর অগলেসবি পুলিশের ব্যাপারে যা-যা বলেছেন
আমাকে, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সেসবও। বার বার মনে পড়ে
যাচ্ছে কী কী বলেছেন তিনি ওই খারাপ জায়গার ব্যাপারে,
যেখানে নাকি নিয়ে যাওয়া হতে পারে আমাকে।

কখনও কখনও কান খাড়া করে শুনি ওই মেয়ের কান্নার
আওয়াজ। বিশেষ করে রাত যখন গভীর হয়, কান্নার আওয়াজটাও
তখন প্রকট হয় আমার কানে।

রাগ হয় আমার, মনমরা হয়ে পড়ি, তারপরও শান্ত রাখি
নিজেকে, স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করি। নিজেকে ছাড়া
বাকি সবকিছু যেন সিলগালা করে সরিয়ে দিই দূরে কোথাও।

মেয়েটার সেই ফোঁপানি কেমন যেন একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে
দেয় আমার ভেতরে। মনে হয়, সে যেন স্পর্শ করছে আমাকে।
আমার ঘর আর ওর ঘরের মাঝখানে যে-দূরত্ব আছে, সেটা
অতিক্রম করে আমার দিকে যেন এগিয়ে আসে ওর আঙুলগুলো;
মনে হয়, আমরা মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আছি। কল্পনার দৃষ্টিতে
দেখি, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে সে। আমার হুৎপিণ্ডের
ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছে। এবং বিশেষ এই আওয়াজ শোনার জন্য
অপেক্ষা করছে যেন। একমাত্র এই আওয়াজই ওকে মুক্তি দিতে
পারে সেসব নারকীয় চিন্তাভাবনা থেকে, যেসবের কারণে কেঁদে
বুক ভাসায় বেচারী।

কল্পনার চোখে আরও দেখি, আমাকে প্রতিদিনই নিয়ে
যাওয়া হয় ডক্টর অগলেসবির কাছে। কিন্তু এই ব্যাপারটা স্পষ্ট
মনে রাখতে পারি না। আসলে আমার মনের বাইরের যে-জগৎ,
সেটা ভরে গেছে কেমন এক অন্ধকারে। সেটা পরিণত হয়েছে
কালো একটা জায়গায়। পরিণত হয়েছে দূরবর্তী এক শূন্যতায়।
বাবা যেমনটা শিখিয়েছিলেন আমাকে... সময়কে বলতে গেলে
চাপা দিয়ে রেখেছি আমি... যেন সাঁতার কেটে চলেছি সময়ের
মধ্য দিয়ে। যেন হারিয়ে গিয়েছি সময় নামের কোনো স্রোতে।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৬৪



অরাজকতা



১১৬.

ন্যাশ

চতুর্থ দিন, বিকেল ৫:২৩

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আপচার্টের বাড়ির ভেতরে আছে ন্যাশ। ওর মনে হচ্ছে, এই বাড়ির দেয়ালগুলো যেন চেপে আসতে শুরু করেছে। জানে, এখন হাসপাতালে আছে ক্রেয়ার। ফোন করল মেয়েটাকে।

‘ক্রেয়ার, এখানে যা ঘটেছে, তা খারাপ। আসলেই খারাপ। বিশপ আর এই লোক মিলে...’ ফোনটা চেপে ধরেছে কানের সঙ্গে, ধীরেসুস্থে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বেসমেন্টে। একবার গিয়ে হাজির হচ্ছে ওই খাঁচার সামনে, তারপর নিজেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপস্থিত হচ্ছে সিঁড়ির পাশে রাখা বড় সেই ফ্রিজারের কাছে... পানির ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছিল যে-জিনিস। কোনো প্রমাণ যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য পা ফেলার উদ্দেশ্যে কয়েকটা স্টেপ-প্লেট বসিয়ে দেয়া হয়েছে বেসমেন্টের মেঝেতে; ওগুলোর ওপরই পা ফেলে ফেলে হাঁটছে সে। একসময় টের পেল, খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘষামাজার কাজ বলতে যা বোঝায়, ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশনের টেকনিশিয়ানরা ইতোমধ্যে শেষ করেছে ওসব। দেখতে পেল, রক্তমিশ্রিত বমির নমুনা সাবধানে সংগ্রহ করে নিচ্ছে একজন টেকনিশিয়ান।

ক্রেয়ারের কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন কথা বলে চলেছে বিরতিহীনভাবে... দমও নিতে পারছে না ঠিকমতো। ‘ওই বাড়ির ওপরতলায় যে-মেয়েকে পাওয়া গেছে, তার নাম-পরিচয় বের করে ফেলেছি আমরা। কেটি কুইগলি... পরমেশ্বরের সাক্ষী নামের একটা প্রতিষ্ঠানের একজন সক্রিয় সদস্য। গতকাল বিকেল থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না মেয়েটার। ওর সঙ্গে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল একটা ছেলেও... তার লাশ আমরা পেয়েছি সেই ট্রাকের ভেতরে... ওয়েজলি হার্টজলার। যা হোক, মেয়েটার অবস্থা আপাতত ভালো। আইসিইউ-তে আছে। জ্ঞান ফেরেনি এখনও। টক্সিকোলোজি টেস্ট করা হয়েছে ওর, শরীরে প্রোপোফলের উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ডাক্তাররা চাইছেন, ওই ওষুধের প্রভাব কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়েই থাকুক মেয়েটা। সে জেগে ওঠামাত্র আমি কথা বলবো ওর সঙ্গে। বেচারীর শরীরে বেশ কয়েকটা ইলেকট্রিক পোড়ার দাগ দেখতে পাওয়া গেছে। আপাতদৃষ্টিতে অত গভীর বলে মনে হচ্ছে না ওসব দাগ। মেয়েটার শরীরের স্থায়ী কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না।’

ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশে একসারিতে কয়েকটা গাড়ির-ব্যাটারি রাখা আছে, সেদিকে নজর গেল ন্যাশের। এই ব্যাপারে ক্রেয়ারকে ইতোমধ্যেই জানিয়েছে সে। এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে আর ইচ্ছা করছে না ওর। ‘ল্যারিসা বিয়েলের খবর কী?’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৬৫

অন্য কোনো একজনকে কিছু একটা বলল ক্লেয়ার। তারপর আবার ফিরে এল ফোনকলে। ‘এই মেয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চেতনানাশক ওষুধ দেয়া হয়েছে ওকেও। এবং সেটা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে মেয়েটার জন্য। মিনিট ত্রিশেক আগে অপারেশন শুরু হয়েছে ওর।’ নিচু হলো ক্লেয়ারের কণ্ঠ। ‘পল আপচার্চ এমন কিছু একটা করেছিল, যার ফলে বাধ্য হয়ে কাচ গিলে ফেলেছিল ল্যারিসা বিয়েল। ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে মেয়েটার মুখে, গলায় আর পাকস্থলীতে। ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, ওই মেয়ের শরীরের ভেতরটার অবস্থা হয়েছে ঠিক সে-রকম। এই ব্যাপারটা যে কতখানি কষ্টকর, কল্পনাও করতে পারছি না আমি।’

চোখ বন্ধ করে ফেলল ন্যাশ। ‘ক্লেয়ার, আমরা এখানে আসলে কী খুঁজছি, বলো তো? বিশপ অতীতে যা-কিছু করেছে, তার কোনোটাই সঙ্গেই কোনো যোগসূত্র নেই এই বাড়িতে যা-যা পাওয়া গেছে সেসবের। আপচার্চের সঙ্গে বিশপের সম্পর্কটা আসলে কী?’

‘পুলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু প্রতিবারই কল চলে যাচ্ছে তাঁর ভয়েস মেইলে। পল আপচার্চের নাম জানার পর থেকে ক্লোজ চেষ্টা করেছে এমন কিছু একটা খুঁজে বের করার, যার মাধ্যমে কোনো না কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করা যাবে বিশপ আর আপচার্চের মধ্যে। কিন্তু সে-ও এখন পর্যন্ত তেমন কিছু পায়নি। আমরা সেই শুরু থেকেই ধরে নিয়েছিলাম, বিশপ যা করেছে, একাই করেছে। এ-সবকিছুর কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না আসলে। আমরা এখন যা ভাবছি তা হলো, ওই ফ্রিজারকে একটা ডিপ্ৰাইভেশন ট্যাঙ্কে পরিণত করা হয়েছিল।’

‘কীসে পরিণত করা হয়েছিল? কিছুই তো বুঝলাম না।’

‘ডিপ্ৰাইভেশন ট্যাঙ্ক। পঞ্চাশের দশকে বেশ জনপ্রিয় ছিল ব্যাপারটা। লবণাক্ত পানি যদি উত্তপ্ত করে সেটার তাপমাত্রা ৯৩.৫ ডিগ্রিতে নিয়ে যাওয়া হয়... যে-তাপমাত্রাকে স্কিন টেম্পারেচার বলা হয়... তা হলে ওই পানিতে ডুবে গেলে অথবা ডুবিয়ে দেয়া হলে আপনার সংজ্ঞা আর কাজ করবে না। বাইরে থেকে আর কোনোকিছুই দেখতে পাবেন না আপনি, কোনোকিছুই শুনতে পাবেন না। পানির তাপমাত্রা আর আর চামড়ার তাপমাত্রা যখন সমান হয়ে যাবে, তখন আপনার মনে হবে, যেন ভাসছেন আপনাআপনি। দেহ-মন থেকে উদ্বেগ-উৎকর্ষা ধুয়ে ফেলার জন্য পদ্ধতিটা বেশ ভালো।’

ওই ট্যাঙ্কের পাশে রাখা মরচে-পড়া কিছু ধাতব জাম্পার কেবলের ওপর নজর পড়ল ন্যাশের। ‘কিন্তু আমার যা মনে হচ্ছে তা হলো, আর যে-কারণেই ব্যবহার করা হয়ে থাকুক না কেন ওই ট্যাঙ্ক, কারও উদ্বেগ-উৎকর্ষা দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি।’

বিপ বিপ একটা আওয়াজ শোনা গেল ক্লেয়ারের ফোনে। ‘একটু ধরুন তো। আরেকটা ফোনকল এসেছে আমার।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৬৬



অরাজকতা



তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ন্যাশ, সিএসআই-এর একজন টেকনিশিয়ান খাঁচার এক কোনা থেকে সবুজ একটা লেপ তুলে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করছে। তারপর লেপটা ঢুকিয়ে রাখল বড় একটা এভিডেন্স ব্যাগে।

ন্যাশ টের পাচ্ছে, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার ওর।

সিঁড়ি ধরে ফিরে এল কিচেনে। ধীরেসুস্থে পার হলো ঘরটা। অপেক্ষা করছে কখন মোবাইলে আবার শোনা যাবে ক্লেয়ারের কণ্ঠ। শেষপর্যন্ত যখন শোনা গেল, ন্যাশ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দ্বিতীয় তলায়... যে-ঘরে ম্যানিকুইন আর সেই ড্রয়িংগুলো পাওয়া গেছে, সেটার বাইরে।

‘ন্যাশ?’

‘হ্যাঁ, এখনও আছি এখানে।’

‘পুলিশের পেট্রোল টিম থেকে যোগাযোগ করেছিল আমার সঙ্গে। তারা আপচার্টকে নিয়ে যাচ্ছিল মেট্রো অফিসে। গাড়ির পেছনের সিটে বসে ছিল লোকটা, সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর তাই গাড়ির দিক বদল করতে বাধ্য হয়েছে অফিসাররা, এখন আসছে এই হাসপাতালের উদ্দেশ্যেই।’

‘জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে?’

‘আমাকে যা বলা হয়েছে তা হলো, চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল লোকটা। বার বার স্পর্শ করতে চাইছিল নিজের মাথা। কিন্তু পারছিল না... কারণ হ্যান্ডকাফ দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছিল তার হাত দুটো। শেষে বাধ্য হয়ে গাড়ির দরজার সঙ্গে বাড়ি দিতে আরম্ভ করে নিজের মাথাটা। পুলিশ অফিসারদের ধারণা, কোনো একজাতের খিঁচুনি শুরু হয়েছিল আপচার্টের।’

‘ওটা কি কোনো কৌশল হতে পারে? পালানোর ধান্দা আর কী?’

‘শুনে তো সে-রকম মনে হলো না আমার। কিন্তু তারপরও কোনো সুযোগ দিতে চাই না আমরা ওই লোককে। আমি ওই অফিসারদের বলে দিয়েছি, এখানে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত গাড়ির পেছনদিকের দরজা যাতে না খোলে। আপনি একটা চাবি দিয়ে যে-পেট্রোল কার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে, সেটা এইমাত্র পৌঁছেছে। আমি এখন যাচ্ছি নিচে... ওই চাবি আনতে। চেষ্টা করে দেখি এই হাসপাতালের কোনো লকারের সঙ্গে মেলাতে পারি কি না চাবিটা। আমি পুলিশ অফিসারদের বলবো, তারা যাতে আপচার্টের গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সঁটে থাকে... কিছুতেই যেন পালাতে না পারে লোকটা।’

‘ঠিক আছে। কী জানতে পারলে তুমি শেষপর্যন্ত, জানিয়ো আমাকে। সিএসআই তাদের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত এখানেই আছি আমি।’

ছোট সেই ঘরে ঢুকে পড়ল ন্যাশ।

ব্যাগে ভরে কোনো কোনো ড্রয়িং ইতোমধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রমাণ হিসেবে। কয়েকটা আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে বিছানার ওপর।

সারা ঘরের ছবি তুলে নিজেদের কাছে রেখে দিচ্ছে সিএসআই।

১১৭.
ক্রেয়ার
চতুর্থ দিন, সন্ধ্যা ৬:০৭

একজন আদালিকে অনুসরণ করে এলিভেটর থেকে হাসপাতালের তৃতীয় তলায় নামল ক্রেয়ার। করিডর ধরে এগিয়ে চলল বিল্ডিংয়ের পূর্বপ্রান্ত অভিমুখে। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রেয়ারের উদ্দেশ্যে এটা-সেটা বলছে ওই মহিলা। ‘আমাদের এখানে আর এই একটা লকার রুমই বাকি আছে কেবল। ওপরতলার কোনো লকার রুমের লকারে যদি না লেগে থাকে ওই চাবি, তা হলে এখানকার কোনো না কোনো লকারে লাগবেই।’

বলতে গেলে সারাটা হাসপাতাল ঘুরে তারপর এখানে হাজির হয়েছে ক্রেয়ার। কেটি কুইগলিকে দেখার জন্য একবার শুধু থেমেছিল (এখনও জ্ঞান ফেরেনি ওই মেয়ের)। পুলিশের গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছিল পল আপচার্টকে, সেটাও দেখে এসেছে। একটা গার্নির সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল লোকটাকে, ওই অবস্থাতেই তাকে ঢোকানো হয়েছিল হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় একটা ব্যক্তিগত কামরায়। সে-ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ে ইউনিফর্ম পরিহিত দু’জন পুলিশ অফিসার।

কোথাও যাতে যেতে না পারে পল আপচার্ট, নিশ্চিত করা হয়েছে সেটা।

ক্রেয়ারকে বলা হয়েছে, জ্ঞান আছে লোকটার, কিন্তু কথা বলার মতো অবস্থায় নেই সে। খিঁচুনি অথবা অন্য যা-ই হয়ে থাকুক না কেন লোকটার, আপাতত কথা বলতে পারছে না সে। কিন্তু যে-ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আছে লোকটা, তাঁকে পই পই করে বলে দেয়া হয়েছে, যে-মুহূর্তে মুখে কথা ফুটবে ওই লোকের, সঙ্গে সঙ্গে যেন খবর দেয়া হয় ক্রেয়ারকে।

হলের শেষমাথায় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, সেখানে থেমে দাঁড়াল আদালি মহিলাটা। তার হাতে একগোছা চাবি আছে, সেগুলোর একটা কাজে লাগিয়ে খুলে ফেলল ওই দরজা। আপনাআপনি জ্বলে উঠল ভেতরের সব লাইট। ক্রেয়ার যাতে ভেতরে ঢুকতে পারে, সেজন্য দরজাটা খুলে ধরে রাখল সে।

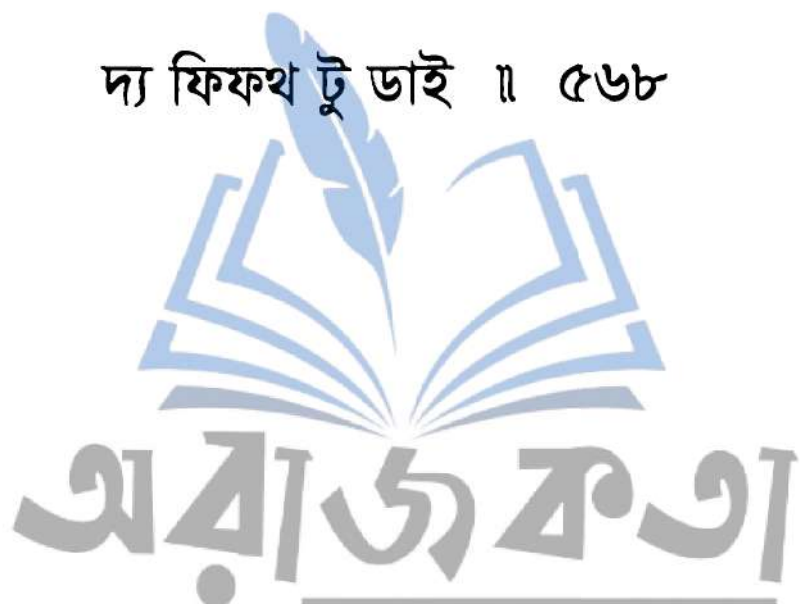
‘ধন্যবাদ, স্যু,’ বলল ক্রেয়ার।

‘হাতের বাঁ দিকের লকারগুলো মহিলাদের জন্য,’ বলল স্যু। ‘আর ডান দিকেরগুলো পুরুষদের জন্য।’

দেয়ালে লাইন ধরে অবস্থান করছে অনেক লকার। আরও দুই সারি লকার স্থাপন করা হয়েছে ঘরের মাঝখানে। সেগুলোর মাঝখানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বেঞ্চ। পুরুষ আর মহিলাদের লকারগুলো আলাদা করে দিয়েছে একটা দেয়াল।

পুলের সঙ্গে আরও একবার যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে নিজের মোবাইল ফোন বের করল ক্রেয়ার।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৬৮



অরাজকতা



‘ওই জিনিস কাজ করবে না এখানে,’ বলে উঠল স্যু। ‘আমাদের এই পুরো তলাটাই বলতে গেলে একটা মৃত এলাকা। কারণ এখানকার হলের আরেক মাথায় রেডিয়োলোজি যন্ত্রপাতি আছে। সুতরাং মোবাইলে কথা বলতে হলে আপনাকে হয় ওপরতলায় যেতে হবে, নয়তো যেতে হবে নিচতলায়।’

দ্রুত কুঁচকে গেল ক্রেয়ারের। মোবাইলটা পকেটে চালান করে দিল সে।

বিশেষ কিছু খবর জানার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে পুলকে।

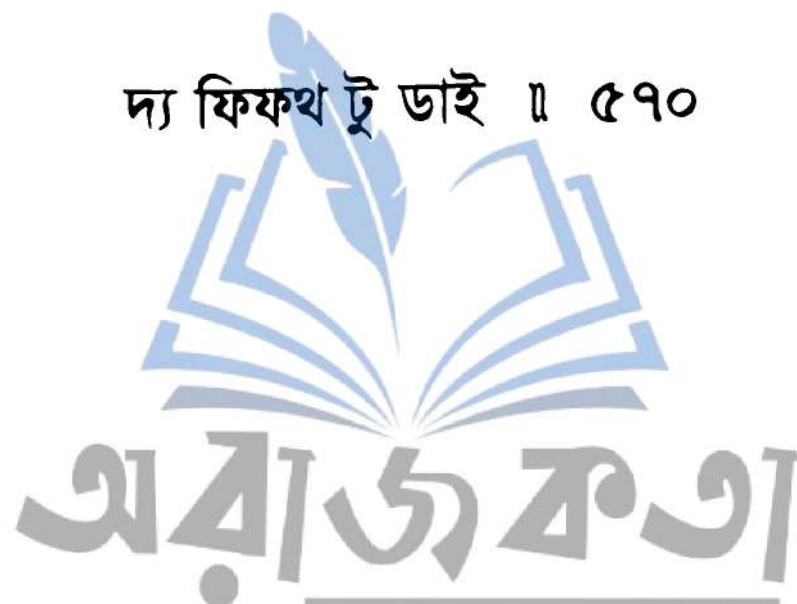
লকারগুলোর ওপর মনোযোগ দিল ক্রেয়ার। হাতের ডান দিকের প্রথম সারিটা দেখছে। একেবারে ওপরের ডান কোনার লকারে ঢুকিয়ে দিল বিশেষ সেই চাবি, মোচড় দিল। কাজ হলো না। চাবিটা টেনে বের করল সে। এগিয়ে গেল পাশের লকারটার দিকে।

মাত্র একটা লকার চেক করা শেষ হয়েছে। এ-রকম আরও বহু লকার বাকি পড়ে আছে।

১১৮.
ডায়েরি

ডক্টর অগলেসবি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।
আমরা আরও একবার বসে আছি তাঁর সেই অফিসে।
ডেস্কের এককোণায় পড়ে আছে আমার ছুরিটা।
ভারী কোনো একটা হাতের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি আমার কাঁধে।
তবে হাতটার মালিককে দেখতে পাচ্ছি না।
আমার দিকে আরেকটু ঝুঁকলেন ডাক্তার সাহেব।
তাঁর নিঃশ্বাসে পেঁয়াজের গন্ধ।
'অ্যানসন?'
ছুরিটা এখন নেয়া উচিত আমার।
যে-পরিকল্পনা করেছিলাম, সেটা হয়তো ভুলে যাওয়া উচিত
আমার। ছুরিটা নেয়া উচিত। এবং তারপর...
চৌঁচিয়ে উঠলাম।
গলা ফাটিয়ে করলাম কাজটা। এত জোরে যে, কেমন যেন
জ্বালাপোড়া করছে গলার ভেতরটা। মনে হচ্ছে, আমার অনুভূতি
বেয়ে ওঠা-নামা করছে হাজারটা রেজরব্লেড।
চেপে রাখা সময়।
কখন যেন নিজের ঘরে ফিরে এসেছি আমি।
শুয়ে আছি বিছানায়।
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ছাদের দিকে।
এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ওই মেয়ে তো
আর কাঁদছে না?
এভাবে আর কত দিন?
এভাবে আর কত রাত?
আমি আমার ছুরিটা সজ্জা করে নিয়ে এলাম না কেন?

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৭০



অরাজকতা



চতুর্থ দিন, সন্ধ্যা ৬:৩৮

ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক পুল। এই নিয়ে কতবার যে বের হয়ে এল ওই ঘর থেকে, নিজেও বলতে পারবে না। হলওয়ার একদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। জানে, সিভার ব্লকের এই দেয়ালে যদি সজোরে ঘুসি মারে এখন, নিজের হাতটাই ভাঙবে। যদি না জানত কথাটা, তা হলে হয়তো করত ওই কাজ।

‘ওই লোক মুখ খুলবে না,’ বলল ডিরেঞ্জো। ‘যদি কোনো কাজে লাগত, তা হলে আমিও হয়তো চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু ও-রকম লোক আরও অনেক দেখেছি আমি। আসলে আমাদের অবস্থা এখন দু’দিক দিয়ে খারাপ হয়ে গেছে। গার্ড হিসেবে এখানকার রুটিন অন্য অনেকের চেয়ে ভালো জানে সে। এবং ওকে ভাঙা যাবে না কিছুতেই। সে জানে, আপনি বড়জোর চাপাচাপি করতে পারবেন তাকে, তার বেশি কিছু করতে পারবেন না।’

‘আমাদের দলটা কি ওই লোকের অ্যাপার্টমেন্টে আর কিছু খুঁজে পেয়েছে?’

মাথা নাড়ল ডিরেঞ্জো। ‘খুব ছোট একটা জায়গায় থাকে ওই লোক। তার বাসার কোনো দেয়ালে ঝুলছে না কোনো ছবি। কোনো টেলিভিশন নেই। কিচেনে একটা ফোল্ডিং টেবিল আর একটা চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। বেডরুমের মেঝেতে আছে মাত্র একটা ম্যাট্রেস। আমার লোকেরা বলেছে, সে নাকি গোছগাছ করছিল, এমন সময় গিয়ে পাকড়াও করা হয়েছে তাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ, আগে থেকেই সব গুছিয়ে রেখেছিল সে। এবং যা-যা গুছিয়ে রেখেছিল, সেগুলো কখনও ব্যাগ থেকে বের করে কি না, সে-ব্যাপারেও সন্দেহ আছে আমার। ওই মহিলাকে আজ সকালে জেলখানা থেকে বের করে দিয়েছে সে। আমার মনে হয় কাজ শেষ লোকটার। আর তাই যেখানে যাওয়ার, চলে যাচ্ছিল।’

‘স্টেটভিলের খবর কী?’

‘স্টেটভিলের ওয়ার্ডেনের পেছন পেছন আজ সারাটা বিকেল বলতে গেলে ধাওয়া করেছেন আমাদের ওয়ার্ডেন ভিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত কপাল খোলেনি তাঁর। ওই লোক হয় সাংঘাতিক ব্যস্ত নয়তো ফোনকল এড়িয়ে চলছেন।’ জিভ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করল ডিরেঞ্জো। ‘আমি আজ পঁচিশ বছর ধরে এই চাকরি করছি। সত্যি কথাটা যদি বলি... সবাইকেই সন্দেহ হয় আমার। কাজেই আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো উপক্ষো করতে পারেন আমার যে-কোনো কথা। কিন্তু আমার মন বলেছে, আমার বস যেহেতু ফোন করছেন স্টেটভিলের ওয়ার্ডেনকে, আপনার বসও ফোন করছেন, এবং না জানি আর কে কে ফোন করছেন... ওই লোক তাই

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৭১

যেভাবে পারছেন সেভাবে ঘরদোর সাফ করছেন নিজের— মানে, তাঁর বিরুদ্ধে যেখানে যে-প্রমাণ আছে, সরিয়ে ফেলছেন। আমার মনে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ গিয়ে হাজির হচ্ছে সেখানে, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না উইডনারকে নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বানাচ্ছেন তিনি, ততক্ষণ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে।’

লিবি ম্যাকিনলে।

ওই ওয়ান-ওয়ে উইন্ডোর দিকে তাকাল ডিরেঞ্জো। উইডনারের চেহারায় যে-অভিব্যক্তি লেপ্টে ছিল, গত কয়েক ঘণ্টায় তা আরও আঁটসাঁট হয়েছে। ‘এবার শুনুন দ্বিতীয় সমস্যার কথা। ওই লোক একজন উকিল চেয়েছে দু’ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় আগে। নিউ অরলিন্সের আইন অনুযায়ী যদি বলি, উকিলের ব্যাপারে আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার অথবা আপনার কারও কিন্তু এখন আর জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত না ওই লোককে।’

‘আপনাকে তখন বলেছিলাম ওই মহিলার কথা। আপনি বলেছিলেন, মহিলাকে ফোন করেছেন। ঠিক না?’

‘ঠিক। কিন্তু মহিলা কোনো জবাব দেয়নি। আমার সেই কল সোজা চলে গেছে তার ভয়েস মেইলে।’

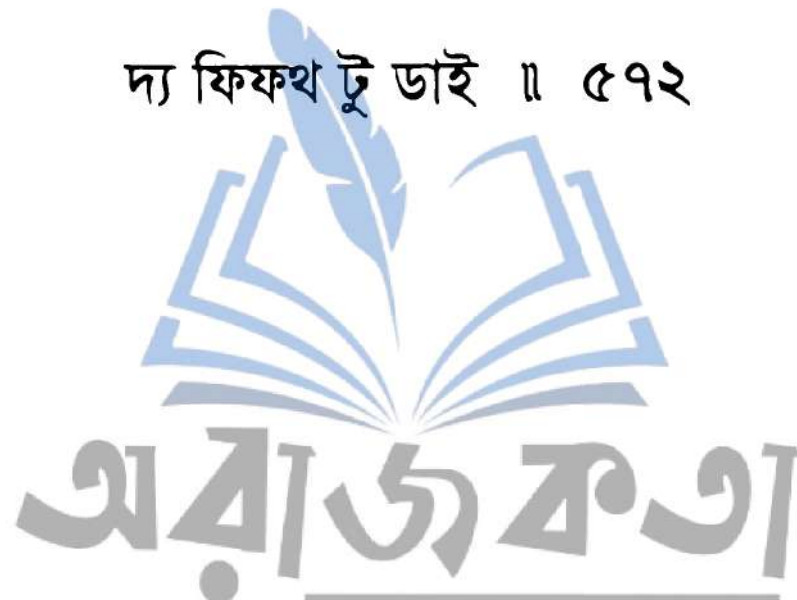
‘জেন ডো’র কী খবর?’

‘সে যেখানে যেভাবে আছে, তাকে সেখানে সেভাবেই থাকতে দিয়েছি আমরা... যেমনটা আপনি বলেছেন। উকিল সারা ওয়ার্নারের অফিস ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি সে। মহিলার অ্যাক্সেল মনিটরে একটা ট্র্যাকার আছে। সেটা জানান দিচ্ছে, সারা ওয়ার্নারের অফিস যে-রাস্তায়, সেখানেই কাছাকাছি কোথাও আছে সে। ওই জায়গায় পরিত্যক্ত কয়েকটা বাড়ি আছে... দেখার মতো কোনোকিছু না আসলে। আমার মনে হয়, ও-রকম কোনো একটা বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে আমাদের জেন ডো। কিছু একটা অথবা কোনো একজনের জন্য অপেক্ষা করছে। ওই জায়গা থেকে বের হওয়ার যে-ক’টা পয়েন্ট আছে, সবগুলোতে সাদা পোশাকের অফিসার বসিয়ে দিয়েছে নিউ অরলিন্স পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে তারা। যেসব গাড়ি বের হচ্ছে আর ঢুকছে, নজর রাখছে সেগুলোর ওপর। আমাদের ধারণা, বিশেষ যে-মানুষটার জন্য অপেক্ষা করছে জেন ডো, সে-মানুষটা গাড়ি নিয়ে হাজির হওয়ামাত্র ওই মনিটর বন্ধ করে দেবে সে। কিন্তু যা-ই করুক না কেন, বেশি দূর যেতে পারবে না।’

‘পোর্টারেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই, না?’

‘এখন পর্যন্ত না। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, ওই মহিলাকে ওখানে রেখে পোর্টার চলে গেছেন কোথাও। উকিল ওয়ার্নারের সঙ্গে কোথাও গেছেন খুব সম্ভব। এবং তারপর আর ফিরে আসেননি। আবার এমনও হতে পারে, ওয়ার্নার তার অফিসেই আছেন, স্টেটভিল ওয়ার্ডেনের পাঠানো কোনো একটা লেখা পড়ছেন মন

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৭২



অরাজকতা



দিয়ে, উপেক্ষা করছেন সব রকমের ফোনকল। আসলে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করে জানার কোনো উপায় নেই। তবে আমি নিশ্চিতভাবে যা জানি তা হলো, অফিসের ওপরতলায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, আর সেখানেই থাকেন ওই মহিলা। ওই জায়গাতেই টানা কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারেন তিনি, প্রয়োজন না হলে বাইরে আসার দরকারও হয় না।’

এসএআইসি হার্লসকে যখন এটা-সেটা বিভিন্ন হালনাগাদ খবর দিচ্ছিল পুল, হার্লস তখন বলেছে, পোর্টার জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে গেছে বিশপের মাকে, আর বিশপ দেখা করতে আসছে তার মায়ের সঙ্গে। মা-ছেলের এই সাক্ষাৎ খুব সম্ভব ঘটতে চলেছে উকিল সারা ওয়ার্নারের অফিসের পাশের গলিতে। সাক্ষাৎটা নিজের অফিসে ঘটুক, এ-রকম ঝুঁকি নিতে চাইবে না ওই উকিল। যদি অফিসের বাইরে কোথাও ঘটে ব্যাপারটা, তা হলে “আমি কিছু জানি না,” “আমি কিছু দেখিনি” জাতীয় অস্বীকৃতি জানানোর সুযোগ রয়ে যাচ্ছে ওই মহিলার। যা হোক, পুল যা বুঝতে পারছে না তা হলো, ওই মহিলা এসব কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে গেল কেন। ওকালতি ব্যবসা চালানোর একটা লাইসেন্স আছে তার, সেটা খোয়ানোর মতো ঝুঁকি কেন নিতে গেল? কেন ঝুঁকি নিল নিজের জীবিকার? এই যে মুক্ত-স্বাধীন জীবন যাপন করছিল সে, হতে পারে, সেটা হারানোর মতো ঝুঁকিও নিয়েছে সে।

একটা কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই... হার্লসের সব সন্দেহের ভিত্তি একটাই— বিশপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে পোর্টার। কিন্তু এই ব্যাপারটা কেন যেন যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না পুলের। ব্যাপারটা বিশ্বাস করার চেষ্টা করেছে সে। এই থিউরি যাতে কাজে লেগে যায়, সে-চেষ্টাও করেছে। কিন্তু কিছু একটা কেন যেন খাপে খাপে মিলছে না কিছুতেই।

কড়া আদেশ জারি করেছে হার্লস... নজর রাখো পোর্টারের ওপর, ওই কাজে দরকার হলে টোপ হিসেবে ব্যবহার করো বিশপের মাকে। নজর রাখো পুরো এলাকার ওপর। এবং বিশপকে দেখতে পাওয়ামাত্র ঘিরে ধরো। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত, একটু দূরে দূরেই থাকো।

পুল আসলে এই মুহূর্তে যা করছে তা হলো, চেষ্টা করছে অনেক বেশি, কিন্তু সেই তুলনায় ফল পাচ্ছে খুব কম। করার মতো আর কিছু নেইও ওর। বলল, ‘উকিল সারা ওয়ার্নারের অফিস পর্যন্ত একটা রাইড দিতে পারবেন আমাকে?’

১২০.
ক্রেয়ার
চতুর্থ দিন, রাত ৭:১৩

রূপালি চাবিটার গায়ে ইংরেজিতে খোদাই করা আছে জে.এইচ.এস.এইচ.। ওটা লকার নম্বর ১৮১২-এর তালায় ঢুকিয়ে দিল ক্রেয়ার, মোচড় দিল। কিছু যে ঘটবে, এমনটা আশা করছে না। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে অন্য আরও কিছু লকারে ওই চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়েছে সে, একচুলও নড়েনি চাবিটা, কোনো কাজ হয়নি। আর তাই সে আশা করছে, এবারও ও-রকম কিছু একটাই ঘটবে। ভাবেনি চাবিটা ঘুরবে, ভাবেনি তালাটা খুলে যাবে।

‘স্যু?’

নোরা রবার্টসের সর্বশেষ প্রকাশিত পেপারব্যাক বইটা পড়ছিল ক্রেয়ারের আদালি কাম লকার ট্যুর গাইড, মুখ তুলে তাকাল, ইয়ারবাদ বের করল কান থেকে। ‘জি, ম্যা’ম?’

‘এক হাজার আট শ’ বারো নম্বর লকারটা কার নামে বরাদ্দ করা আছে?’

সু’র চোখের ওপর নেমে এসেছে একগোছা সোনালি চুল, আঙুল দিয়ে চিরুনি চালানোর কায়দায় ওগুলো সরিয়ে দিল সে। হাতে নিল একটা তালিকা, পাতা উল্টাচ্ছে। আঙুল চালাচ্ছে বিশেষ একটা পাতায়। ‘ওটা বরাদ্দ করা হয়েছে... ধেং!’

‘কার নামে?’

‘ডক্টর র্যান্ডাল ডেভিস। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তিনি তো গত পরশুদিন মারা গেছেন। এবং এটা নিয়ে আলোচনা চলছে সারা হাসপাতালে। বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাঁর। অথচ মরার আগেও স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল মানুষটার। তাঁর মেয়ে...’

ক্রেয়ার কিছু শুনছে না।

লকারের দরজা ধরে আলতো টান মেরেছে। ধীরে ধীরে খুলছে ওটা।

ভেতরে পাওয়া গেল মোটা একটা ফোল্ডার, প্রায় দু’ইঞ্চি পুরু। ফোল্ডারটার ওপরে রাখা আছে উজ্জ্বল লাল একটা আপেল। ওটার একপাশ থেকে বেরিয়ে আছে একটা হাইপোডার্মিক সুঁই।

পকেট থেকে একজোড়া লেটেক্স গ্লাভস বের করল ক্রেয়ার। পরে নিল। ‘স্যু? আমার ব্যাগটা নিয়ে আসবে? আমার মনে হয় অ্যাডমিন অফিসে এখনও রয়ে গেছে ওটা।’ একটা এভিডেন্স ব্যাগ দরকার ওর।

দুটো আঙুলের সাহায্যে সাবধানে আপেলটা লকারের ভেতর থেকে বের করে আনল সে। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। সুঁইটা আপেলের যে-পাশে ঢোকানো হয়েছে, ঠিক সে-জায়গার আশপাশের খানিকটা অংশ কিছুটা রঙ

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৭৪





হারিয়েছে। এটুকু বাদ দিয়ে বললে আপেলের কোথাও বুড়িয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। ওর পাশে একটা বেঞ্চ আছে, সেখানে সাবধানে ওই আপেল নামিয়ে রাখল সে। ফোল্ডারটা বের করে আনার জন্য আরও একবার হাত ঢুকিয়ে দিল লকারের ভেতরে। এবার কাজে লাগিয়েছে দুটো হাতই। ঢাউস আকৃতির ফোল্ডারটা বের করে আনতে বেগ পেতে হলো ওকে। বেঞ্চের ওপর, আপেলের পাশে নামিয়ে রাখল ওটা।

একটা লেবেল সাঁটানো আছে ফোল্ডারের গায়ে। সেখানে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে: **পল এডওয়ার্ড আপচার্চ**।

ফোল্ডারের ভেতরে কম করে হলেও দু'শ' পাতা আছে। কোনো কোনো পাতার প্রান্তভাগ জোড়া লাগানো। কোনোটা আবার আলগা। রিপোর্ট আছে। বিভিন্ন নোট আছে। পরীক্ষানিরীক্ষা করানো হয়েছিল বেশকিছু, সেসবের রেজাল্ট আছে। আরও আছে কিছু ইমেজ। তারিখগুলোর ওপর নজর বোলাল ক্রেয়ার। প্রায় এক বছরের পুরনো। ফোল্ডারের ভেতরে, একেবারের সামনের দিকে, পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা আছে একটা নোট:

হ্যালো, ডিটেকটিভ নর্টন, নাকি বলবো ডিটেকটিভ ন্যাশ?
আমার ধারণা, আপনাদেরই কেউ একজন হবেন আর কী। আশা
করি ভালোই আছেন। অন্তত অন্যদের চেয়ে ভালো।
বি

১২১.
ডায়েরি

আমি কিছু লিখছি না গত কয়েকদিন ধরে।

আসলে দিন-তারিখের হিসেবটা গুলিয়ে ফেলেছি।

বাবা যদি থাকতেন এখন, শ্রেফ পাগল হয়ে যেতেন।

সত্যিই, পাগল হয়ে যেতেন তিনি।

এখন বিকেল ৩:২৪। আমার শরীরের ভেতরে যে-ঘড়ি আছে, সেটা ওই সময় জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু আজ কোন দিন, কী বার... সে-ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই আমার। কতদিন ধরে আছি এখানে, ধারণা নেই সে-ব্যাপারেও। প্রতিটা দিন এখন একই রকম লাগে আমার কাছে। এবং একই রকম লাগার এই যে অনুভূতি, এটা যেন অনেককিছু ঝাপসা করে দিয়েছে আমার।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো আমার ঘরের দরজার তালায়। মুখ তুলে তাকালাম সেদিকে। দেখি, খোলা দরজার গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর অগলেসবি।

‘আজ তুমি কেমন আছ, অ্যানসন?’

‘চমৎকার।’

কোমল আর নিচু কণ্ঠে কথাটা বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। শুনে, মনে হলো, আশ্চর্য হয়েছেন ডক্টর অগলেসবি। কারণ গত কয়েক দিনে এই প্রথমবার তাঁর সঙ্গে কথা বললাম আমি অথবা তাঁর কোনো কথায় সাড়া দিলাম।

বিছানায় এককোণায় উঠে বসলাম আমি। তারপর দাঁড়ালাম। টান টান করে দিলাম পা দুটো।

আমাদের সেশন যখন শুরু হয়, ডাক্তার সাহেব সাধারণত হাসেন। কিন্তু আজ তিনি তা করলেন না। খেয়াল করলাম, আমার ঘরের এখানে-সেখানে চঞ্চল চাহনিতে তাকাচ্ছেন তিনি বার বার। দেখতে পাচ্ছেন, ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে আমার খালি লাঞ্চ ট্রে-টা। চেয়ারের ওপর স্তূপ হয়ে আছে গতকালের নোংরা কাপড়। আমার ম্যাট্রেসের একটা কোণায় গুঁজে রেখেছি পেপার ক্লিপটা; মনে হলো, বিশেষ ওই জায়গায় যেন একটা মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থাকল তাঁর দৃষ্টি। যদিও ক্লিপটা যখন গুঁজেছিলাম সেখানে, ক্যামেরার কথাটা আমার মাথায় ছিল।

‘চলো, অ্যানসন, যাই।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৭৬





ঠেলে দরজার পাল্লাটা আরও খুলে দিলেন ডক্টর অগলেসবি।
ইশারায় প্রথমে বেরিয়ে যেতে বলছেন আমাকে।

নার্স স্টেশনটা যখন ছাড়িয়ে আসছি, আমাকে দেখে হাসল না
নার্স গিলম্যান। বরং তার ডেস্কের ওপর রাখা কিছু কাগজের দিকে
তাকাল। ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল ওগুলো নিয়ে।

ওই মেয়ের ঘরের দরজাটা আজ খোলা।

ভেতরে তাকালাম আমি। আশা করছিলাম, বালিশে হেলান
দিয়ে মেয়েটাকে আধশোয়া হয়ে থাকতে দেখবো। কিন্তু ঘরের
ভেতরে নেই সে। বিছানায় কোনো চাদরও দেখতে পাচ্ছি না।
ঘরটা সম্পূর্ণ খালি। কেউ নেই। কোনোকিছুরই কোনো আত্মা যেন
নেই সেখানে।

‘ওই মেয়ে কোথায়?’

আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন ডক্টর অগলেসবি, মৃদু ঠেলা
দিয়ে আগে বাড়ার ইঞ্জিত করছেন। ‘চলে এসো, অ্যানসন।’

ডাক্তার সাহেবের অফিসের বাইরে বসে আছে দু’জন লোক।
দু’জনের পরনেই স্যুট। তবে সেগুলো কুঁচকে আছে। আমাদেরকে
এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল দু’জনই।

উঠে দাঁড়াল একজন। ‘এ-ই কি সেই ছেলে?’

আমার কাঁধে আরও শক্ত হলো ডক্টর অগলেসবির হাতের
চাপ। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি ছেড়ে দিলেন আমাকে। ‘ডিটেকটিভ,
এ হচ্ছে অ্যানসন বিশপ। অ্যানসন, তোমাকে এই গোয়েন্দার
কথাই বলেছিলাম আমি। তাঁর নাম ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান।
আর তাঁর সঙ্গেই মানুষটা হচ্ছেন তাঁর পার্টনার... দুঃখিত,
আপনার নামটা ভুলে গেছি আমি।’

উঠে দাঁড়াল অন্য লোকটা। স্যুটের কোঁচকানো জায়গাগুলো
ডলে ডলে সমান করার চেষ্টা করছে। ‘স্টকস, এরজা স্টকস।’

‘ঘুরে দাঁড়াও, অ্যানসন। তোমার দু’হাত পিঠের কাছে নিয়ে
এসো,’ বলল ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান।

যা বলা হলো আমাকে, করলাম।

টের পেলাম, আর দুই কজি পেঁচিয়ে ধরল শীতল ইম্পাত।
ক্লিক করে একটা আওয়াজ তুলে কজির সঙ্গে এঁটে বসল ওগুলো।

হ্যান্ডকাফ।

হাতকড়ার প্রান্তভাগে আরও একবার চাপ দিল সেই
ডিটেকটিভ। এবার আমার কজিতে রীতিমতো কামড় বসিয়ে দিল
কড়া দুটো। ‘হুঁ, শক্ত হয়েছে।’

‘হ্যাঁ।’

ম্যাট্রেসে গুঁজে রাখা পেপারক্লিপের কথা মনে পড়ে গেল আমার। এখন যদি ক্লিপটা থাকত আমার সঙ্গে, হ্যান্ডকাফ খুলে ফেলতে পারতাম।

‘চলো, যাই।’ আবারও বলল ওয়েন্ডারম্যান। ধাক্কা মেরেছে আমার পিঠে।

গার্ডের ডেস্ক ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ডিটেকটিভ স্টকস, সে-ই আছে আগে। একটা ইলেকট্রনিক গুঞ্জন তুলে খুলে গেল ধাতব দরজাটা। পর পর কয়েকটা হলওয়ে ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। সওয়ার হতে হলো এলিভেটরে। শেষপর্যন্ত বেরিয়ে এলাম ট্রিটমেন্ট সেন্টারের সদর দরজা দিয়ে। শুনতে পাচ্ছি, আমার পেছনেই আছেন ডক্টর অগলেসবি। চাপা গলায় কী সব যেন বলছেন ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যানকে। কিন্তু কী বলছেন, ঠাহর করতে পারছি না।

সেন্টারের বাইরের রাস্তায়, এককোণায়, অপেক্ষমান অবস্থায় আছে একটা সাদা শেভি ম্যালিবু গাড়ি। ওটার রঙের ওপর ধুলোর আস্তর পড়েছে। জায়গায় জায়গায় ঝুলকালিও দেখতে পাচ্ছি। এগিয়ে গিয়ে পেছনদিকের দরজাটা খুলে দিল স্টকস।

রাস্তায় পা দুটো রীতিমতো গেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। হ্যান্ডকাফ ধরে টানা হেঁচড়া করছে ওয়েন্ডারম্যান। যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ার দশা আমার... হাত দুটো যেন মোচড় খাচ্ছে কাঁধের কাছে। ‘এই ছোকরা, কী হলো তোমার? এগোচ্ছ না কেন তুমি?’

গাড়িটা যেদিকে আছে, সেদিকে আমাকে ধাক্কা মারল লোকটা।

‘আমি কি ওই ছেলের সঙ্গে একটা সেকেন্ডের জন্য কথা বলতে পারি? ব্যক্তিগতভাবে?’ আমার পেছন থেকে বলে উঠলেন ডক্টর অগলেসবি।

‘যা করার তাড়াতাড়ি করুন,’ শব্দ করে আমার হ্যান্ডকাফ ধরে রেখেছিল ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান, ছেড়ে দিল। এগিয়ে গিয়ে যোগ দিল স্টকসের সঙ্গে। দুই গোয়েন্দাই এখন দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির সামনের দিকে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল স্টকস। মানা করার কায়দায় হাত তুলল ওয়েন্ডারম্যান। ‘সময় নেই,’ বলতে শুনলাম আমি লোকটাকে।

আমাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন ডক্টর অগলেসবি। ফুটপাথের ওপর বসে পড়লেন হাঁটু গেড়ে। ‘অ্যানসন, আমার সঙ্গে কথা বলার সব রকমের সুযোগ তোমাকে দিয়েছিলাম

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৭৮



অরাজকতা



আমি। সব রকমের সুযোগ। তোমার জন্য করার মতো এখন আর কিছু নেই আমার।’

‘ওই মেয়ে কোথায়?’ জানতে চাইলাম আমি। ‘কোথায় গেছে সে?’

প্রশ্নটার জবাব দিলেন না ডাক্তার সাহেব। বরং বললেন, ‘ওই লোকগুলোকে সহযোগিতা করা দরকার তোমার। বয়স যেহেতু কম, সেহেতু তুমি চাইলে সামলে উঠতে পারবে কঠিন এই পরিস্থিতি।’

‘ওই ছুরি... ওটা চাই আমি।’

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ডক্টর অগলেসবি। ভেবেছিলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরবেন হয়তো। কিন্তু তার বদলে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বললেন, ‘কীসের ছুরি?’

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, এক কদম দূরে সরে গেলেন আমার থেকে। ‘তোমার জন্য শুভকামনা, অ্যানসন। তোমার জন্য সেরাটা ছাড়া আর কোনোকিছু কামনা করছি না আমি।’

হাত নাচালেন দুই গোয়েন্দার উদ্দেশে। ফিরে এল লোক দুটো।

আমাকে রীতিমতো জোর করে গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে দিল স্টকস। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

১২২.
পোর্টার
চতুর্থ দিন, রাত ৮:০১

যা ভেবেছিল, আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, তার আরও আগেই পৌঁছে গেল ওরা।

পোর্টার একাধিকবার তাকিয়েছে স্পিডোমিটারের দিকে। দেখেছে, কাঁটাটা লাল ঘরে আছে। তবে সারা জোর দিয়ে বলেছে, পুলিশ নাকি কিছু বলবে না।

শিকাগো শহরের আলো যখন নজরে পড়ল, গাড়ির গতি কমাল সারা। এমন না যে, বাড়তি গতি নিয়ে চিন্তায় ভুগছে সে। বরং গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে রাস্তায়, তাই বাধ্য হয়েই ওই কাজ করতে হয়েছে ওকে।

‘এক্সিট টুয়েন্টি সিক্সএ ধরে এগিয়ে যান,’ বলল জেন ডো। সারাটা পথে এই প্রথমবার কথা বলল।

পোর্টার ওই মহিলার মুখে কথা ফোটানোর চেষ্টা করেছে কয়েকবার। বিশপের ডায়েরি থেকে এটা-সেটা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে। জানতে চেয়েছে কার্টার দম্পতির ব্যাপারে, ফ্র্যাঙ্কলিন কার্ভি আর রিগসের ব্যাপারে। এমনকী ওই মহিলার স্বামীর ব্যাপারেও জানতে চেয়েছে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে বিশপের ব্যাপারেও। কিন্তু জবাবে কিছু বলেনি ওই মহিলা। চেহারায় কঠোর এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে শুধু তাকিয়ে থেকেছে পোর্টারের দিকে। কখনও আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে দেখেছে গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য।

‘বাচাল মহিলাটা শেষপর্যন্ত কথা বলল তা হলে,’ বলল সারা, গাড়ির নাক ঘুরিয়েছে ডান দিকে। ‘আমরা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছি, বলুন তো?’

‘এক্সিট টুয়েন্টি সিক্সএ ধরে এগিয়ে যান,’ আবারও একই কথা বলল জেন ডো।

‘ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। টুয়েন্টি সিক্সএ। তারপর?’

আর কিছু বলল না মহিলা।

চোখ উল্টানোর কায়দা করল সারা। ‘দেখুন, আমি জ্যামে আটকা পড়তে চাই না। কাজেই ডান দিকের লেনে থাকবো কি না, সময় থাকতেই বলে দিయন আমাকে।’

দূরে আস্তে আস্তে যেন বড় হচ্ছে শহরটা। একসময় ওটা যেন ঘিরে ধরল ওদেরকে। আশপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু বিল্ডিং।

বাতাস ঠাণ্ডা।

বোঝাই যায়, কিছু সময় আগেও তুষারপাত হয়েছে। সব জায়গায় একটা উজ্জ্বল সাদা চকচকে ভাব। পোর্টার জানে, আগামীকাল সকাল নাগাদ হাইওয়ের ধারের তুষার অনুজ্জ্বল ধূসর রঙ ধারণ করবে। কোনো কোনো জায়গা আবার

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৮০





দেখাবে কালো। কিন্তু এখন সবকিছু কেমন যেন মচমচে লাগছে। সাদা দেখাচ্ছে। গাড়ির ট্রান্সে এখনও রয়ে গেছে ওর জ্যাকেট। নিউ অরলিন্সে যখন ছিল সে, ওই জিনিসের দরকারই হয়নি। সারার পরনে এখনও শর্ট স্লিভস।

গতি আরও কমছে বিএমডব্লু'র। হাইওয়ের অফ-র‍্যাম্পের কিনারা বেয়ে নামতে শুরু করেছে সারা। অনতিদূরে বাঁক নিয়েছে ওটা, হাইওয়ের নিচ দিয়ে নেমে গেছে। এগোতে কষ্ট হচ্ছে সারার, ওকে সময়ে সময়ে সতর্ক করেছে পোর্টার... এ-রকম কোনো অবস্থায় সারার ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা ঠিক কী রকম, নিশ্চিত না সে।

‘র‍্যাম্পের নিচে হাজির হয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স ধরে এগোবেন দক্ষিণ দিকে। হ্যামিল্টনের দিকে যাবেন।’

ওই এলাকা চেনা আছে পোর্টারের। বুঝতে পারল, ওরা আসলে পশ্চিম গারফিল্ড অভিমুখে যাচ্ছে। তারপর আছে কে-টাউন। বলল, ‘এই এলাকা খুব একটা ভালো না।’

‘কোনো দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য ওখানে যাচ্ছি না আমরা। তা ছাড়া আমাদের দেরিও হয়ে গেছে।’

‘আটটা বিশ বাজে এখন,’ বলল পোর্টার।

‘অ্যানসন যা বলার সোজাসুজিই বলে দিয়েছে।’

‘আমার এসব ভালো লাগছে না,’ বলল সারা। রাস্তার বিভিন্ন কোনায় দাঁড়িয়ে আছে কিছু লোক; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, গাড়িতে সওয়ার হয়ে চলে যাচ্ছে পোর্টাররা।

প্রথমে সাউথ ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলেভার্ডে হাজির হলো ওরা, তারপর সেখান থেকে নর্থ হ্যামিল্টন অ্যাভিনিউতে।

যা-যা করতে বলা হচ্ছে, ঠিক তা-ই করছে সারা।

‘ওই যে, ওখানে। গাড়িটা ওখানে নিয়ে রাখুন।’

জানালায় সঙ্গে মাথাটা ঠেস দিল পোর্টার, তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। ‘এটা গায়োন হোটেল, ঠিক না? যতদূর মনে পড়ছে, এই হোটেল নিয়ে কয়েক বছর আগে একটা ডেমো দেখানো হয়েছিল।’

এমন এক কায়দায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জেন ডো যে, দেখে মনে হচ্ছে, পুরনো কোনো বন্ধুর দেখা পেয়েছে যেন। ‘রাজ্য সরকার এই হোটেলকে একটা ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে ঘোষণা করেছে ৮৫ সালে।’

হোটেলের পেছনদিকে একজায়গায় গাড়ি থামাল সারা, পার্ক করল। ‘এবার?’

‘এবার ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হবে।’

‘কীভাবে করবো কাজটা? জায়গায় জায়গায় তো বোর্ড খাড়া করে দিয়ে চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।’

বিভিঙটা দেখছে পোর্টার। ঠিকই বলেছে সারা। প্লাইউডের তক্তা খাড়া করে দেয়া হয়েছে নিচতলা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম তলা পর্যন্ত; ফোকর বলতে যা-কিছু আছে, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সব। পঞ্চম তলায় যাওয়ার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। অনেক আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফায়ার এস্কেপ। পুরো স্থাপনা ঘিরে রেখেছে চেইনলিঙ্কের একটা ফেন্স। অপকর্মের সঙ্গে জড়িত কোনো না কোনো চক্র এবং গৃহহীনদের জন্য এই জায়গা বলতে গেলে স্বর্গ।

‘আগেও বলেছি, আবারও বলছি, দেরি করে ফেলেছি আমরা। এবার এই গাড়ি থেকে নামতে দিন আমাকে।’



‘আপনি নিশ্চিত মহিলা এখানেই আছে?’ নজরদারির কাজ আগেও করেছে পুল, কতবার করেছে তা গুনে বলতে পারবে না নিজেও, কিন্তু এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটান মতো অবস্থা হয়েছে ওর। টের পেল, গাড়ির প্যাসেঞ্জার ডোরের গায়ে আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাতে শুরু করেছে কখন যেন। ডিরেঞ্জো অলস কায়দায় একটা পেপারব্যাকের পাতা উল্টাচ্ছে।

‘যদি বলেন তো আরেকবার ফোন করে দেখতে পারি,’ বলল ডিরেঞ্জো। ‘কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, পনেরো মিনিট আগেও ওই গলির ভেতরে ছিল মহিলাটা। এবং সেখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো পথ নেই। সুতরাং ওখানেই আছে সে।’

এখানে হাজির হওয়ার পর এসএআইসি হার্লসকে দু’বার ফোন করেছে পুল। হার্লস প্রতিবারই জোর দিয়ে বলেছে, শুধু নজর রেখে যেতে হবে, এবং সেইসঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে বিশপের জন্য। বলেছে, মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এই গলিতে ছেড়ে দেয়ার জন্য জেলখানা থেকে বের করেনি পোর্টার। যেখানেই গিয়ে থাকুক না কেন পোর্টার, নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, ফিরে আসছে।

হার্লসের একটা কোনো কথা বিশ্বাস হয়নি পুলের। শুধু তা-ই না, সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, ধারেকাছে কোথাও নেই বিশপ। পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে, সবকিছু কেমন ভুল ঠেকছে। ‘আপনাদের সেই মনিটর... ওটা সরিয়ে ফেলতে কী কী লাগে, বলুন তো?’

‘ওটা সরিয়ে ফেলা সম্ভব না।’

‘যে-কোনোকিছুই করা সম্ভব। আমার প্রশ্নের জবাব দিন।’

‘প্রতিটা মনিটরেরই একটা করে স্বতন্ত্র চাবি আছে। ওটা নকল করা সম্ভব না। কেউ যদি মনিটরটা খুলে ফেলে, আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সিগনাল পেতে আরম্ভ করি। মানে, একটা অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে আর কী। জেন ডো’র মনিটরের চাবির নম্বর ২১৩৮। ওটা যে-জায়গায় থাকার কথা, সেখানেই আছে। আমরা চেক করে দেখেছি।’

‘ওসব চাবি যে-জায়গায় থাকে, সেখানে কি প্রবেশাধিকার আছে উইডনারের?’

‘আমাদের কাছে ওই মহিলার মনিটরের চাবি আছে,’ বলল ডিরেঞ্জো। ‘ও-রকম চাবি একটাই হয়।’

এই ব্যাপারটা যে আগে বুঝতে পারেনি, সেজন্য নিজেই নিজেকে গালমন্দ করল পুল। ‘মহিলার মনিটরের চাবিটা জায়গামতো আছে কি না, সেটা যে চেক

দ্য ফিফথ টু ডাই ৥ ৫৮৩

করবেন আপনারা, জানা ছিল উইডনারের। আর তাই, আমার ধারণা, বদলাবদলি করেছে সে চাবিটা। তা-ও আবার এমন কোনো চাবির সঙ্গে, যেটার খোঁজ করার কথা না আপনাদের। তার জায়গায় আমি থাকলেও একই কাজ করতাম।’

‘এখন আপনি যদি ওই গলিতে গিয়ে ঢোকেন, আমাদেরকে শ্রেফ উড়িয়ে দেয়া হবে। পিছু হটার কোনো উপায়ই কিন্তু নেই।’

এসব কথা শোনার মতো সময় নেই পুলের।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সে ইতোমধ্যেই।



ক্রেয়ার

চতুর্থ দিন, রাত ৮:০৮

ন্যাশের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে ফোনটা নামিয়ে রাখল ক্রেয়ার।

এখনও ওই বাড়িতেই রয়ে গেছে ন্যাশ।

একটা টেবিলের ওপর আপচার্চের পেশেন্ট ফাইল খুলে বিছিয়ে রেখেছে ক্রেয়ার আর ক্রোজ। যা-যা লেখা আছে, ভালোমতো পড়েছে সেসব। ক্যাফেটেরিয়ায় এ-মুহূর্তে যারাই উপস্থিত আছে, তাদের সবার সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে আপচার্চের। কিন্তু সেখানেই শেষ না। আরও এক ডজন অন্য নামও পাওয়া গেছে... ওই লোকের অন্য কিছু ডকুমেন্টে। বিশেষ ওই নামগুলো জানার পর আর একটা মুহূর্ত দেরি করেনি ক্রেয়ার, পুলিশের একাধিক পেট্রোল কার পাঠিয়ে দিয়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়... নতুনভাবে যে-মানুষটার পরিচয় জানা গেছে, তাকে তুলে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে।

‘এই যে, আরও একটা নাম পেলাম আমি এইমাত্র,’ বলে উঠল ক্রোজ। ‘অ্যাঞ্জেলিক ওয়াল্টিমায়ার। নিচতলায় যে-ইমার্জেন্সি আছে, সেখানকার একজন নার্স ওই মেয়ে। কাগজপত্র দেখে যা মনে হচ্ছে, এই হাসপাতালে মাসখানেক আগে এসেছিল আপচার্চ। তখন তাকে একটা রাত থাকতে হয়েছিল এখানে।’

পেছনে থাকা স্যুর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল ক্রেয়ার। টুকটাক কাজের জন্য স্যুকে সঙ্গে রাখা হয়েছে। ক্রেয়ার মাথা ঝাঁকানোর পর আর দেরি করল না স্যু, ফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল নিচতলায়।

‘ওই মেয়ে এখন কী করছে, সে-ব্যাপারে কোনো পরোয়া নেই আমার,’ বলল ক্রেয়ার। ‘আমি চাই, এই মুহূর্তে সে হাজির হবে এখানে।’ আবার মনোযোগ দিল আপচার্চের কাগজপত্রের ওপর।

‘তিনবার অপারেশন হয়েছে লোকটার,’ বলল ক্রোজ। ‘এবং তিনটা অপারেশনই করা হয়েছে এই হাসপাতালে।’

‘এমনও হতে পারে, বার বার যাতে অপারেশন করা যায় সেজন্য একটা জিপার লাগিয়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা ওই লোকের চাঁদিতে,’ মজা করে বলল ক্রেয়ার। ‘টিউমার হয়েছিল লোকটার, সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আবারও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে ওই লোকের মাথায়। প্রথম টিউমারটার আকার ছিল গন্ধ বলের মতো। বড় হতে হতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ও-রকম আকার ধারণ করেছিল জিনিসটা।’

‘লোকটাকে এখন নতুন আরেকটা অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে,’ বিড়বিড় করে বলল ক্রেয়ার। ‘আশা করছি শয়তানের বাচ্চাটা অপারেশন টেবিলেই মারা যাবে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ৷ ৫৮৫

‘ওই লোক বেঁচে আছে কী করে, আমি তো সে-ব্যাপারেই নিশ্চিত না। তার মস্তিষ্কের এত বড় একটা অংশ বের করে ফেলা হয়েছে... লোকটা তো ইচ্ছে করলেই রাজনীতিবিদ হয়ে যেতে পারত।’

‘ডিটেকটিভ?’

মুখ তুলে তাকাল ক্লেয়ার। খোলা দরজার গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার হার্শ। তাঁর সারা মাথা জুড়ে টাক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখে ছোট গোল চশমা। গলায় ঝুলছে উজ্জ্বল লাল রঙের টাই।

‘হ্যাঁ, বলুন?’

‘কেটি কুইগলির জ্ঞান ফিরেছে এইমাত্র। ওর সঙ্গে ওর বাবা-মা আছেন।’

ক্লোজের দিকে তাকাল ক্লেয়ার।

‘যান। আমি সামলাচ্ছি এসব,’ বলল ক্লোজ।

দরজা দিয়ে একছুটে বেরিয়ে গেল ক্লেয়ার। ডাক্তার হার্শ আছেন ওর পেছন পেছন।

এলিভেটরে ঢুকে ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল, ‘ল্যারিসা বিয়েলের ব্যাপারে কিছু বলবেন?’

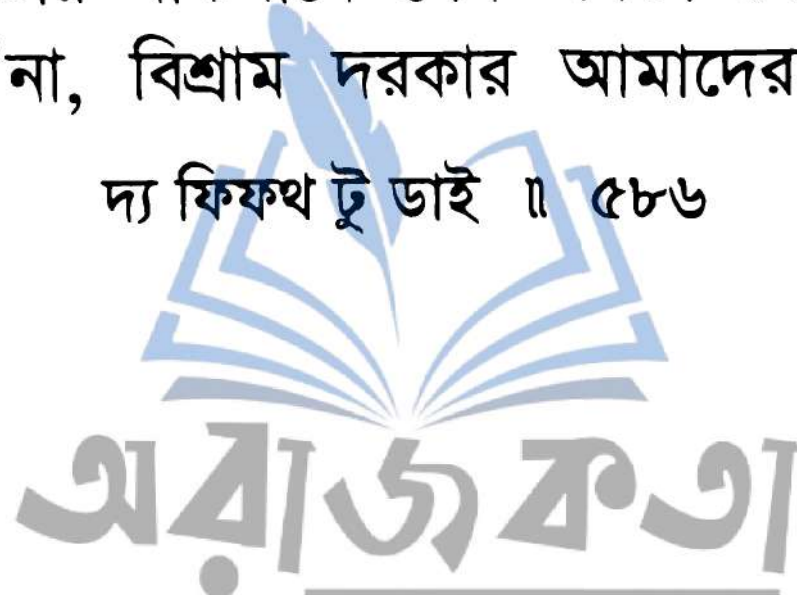
খুঁতনি চুলকালেন ডাক্তার হার্শ। ‘এখনও অপারেশন চলছে মেয়েটার। আমার ধারণা, সেরে উঠবে মেয়েটা। তবে যে-ক্ষতি হয়েছে ওর, তা সারতে সময় লাগে। ডক্টর ক্রেডালের তত্ত্বাবধানে আছে সে। তাঁর অপারেশনের হাত দারুণ। মেয়েটার গলা পরীক্ষানিরীক্ষা করানোর জন্য একজন বিশেষজ্ঞকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছেন তিনি। বিশেষ করে মেয়েটার ভোকাল কর্ডের কী অবস্থা, জানার জন্য। ওই মেয়ের যদি স্থায়ী কোনো ক্ষতি হয়ও, তা হলে সেটা হবে কথা বলা সংক্রান্ত। আসলে... এখনই যদি কোনো মন্তব্য করি আমি, ব্যাপারটা একটু জলদিই হয়ে যাবে। অপারেশন শেষ হোক ওর, তারপর জানতে পারবো কী অবস্থা দাঁড়াবে মেয়েটার শেষপর্যন্ত। আমার মনে হয় আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।’

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। বাঁ দিকে মোড় নিল ওরা। এগিয়ে চলেছে হল ধরে।

দ্বিতীয় তলার একটা প্রাইভেট রুমে আছে কেটি কুইগলি। সে-ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ইউনিফর্ম পরিহিত এক পুলিশ অফিসারকে। জানালার গায়ে পাতলা কাচের একটা অবজার্ভেশন উইন্ডো আছে, সেটা দিয়ে ওই মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে ক্লেয়ার। বসে আছে মেয়েটা। হাত নেড়ে নেড়ে কীসব যেন বলছে। ওর বিছানার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা আর মা। ঘরের দরজাটা খুললেন ডাক্তার হার্শ, ভেতরে যাওয়ার ইশারা করলেন ক্লেয়ারকে। মুখ তুলে তাকাল কেটি। তাকালেন ওর মা-বাবাও।

ক্লেয়ার আর বিছানাটার মাঝখানে যেন একটা দেয়াল রচনা করে দাঁড়িয়ে গেলেন কেটির বাবা। ‘না, বিশ্রাম দরকার আমাদের মেয়েটার। শক্তি ফিরে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৮৬



অরাজকতা



পাওয়ার পর যা বলার বলতে পারবে মেয়েটা, তার আগে না।’ লোকটার পরনে সুট। তবে কোট আর টাই খুলে কোনার একটা চেয়ারের ওপর রেখেছেন তিনি। ক্রাজ ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ক্লেয়ারকে, এই লোক একজন উকিল।

‘অসুবিধা নেই, বাবা। আমি ঠিক আছি। সাহায্য করতে চাইছি।’

ঝুঁকে পড়লেন কেটির মা, মেয়ের একটা হাত একটুখানি মুচড়ে দিলেন। ‘বুঝতে পেরেছি... অবশ্যই সাহায্য করতে চাইছ তুমি। কিন্তু তোমার বাবা যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন।’

সামনে দাঁড়ানো মানুষ দু’জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে ক্লেয়ারের। তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে আগে বাড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ও-রকম কিছুই করল না সে। বরং মনে মনে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনল। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। ‘বুঝতে পেরেছি, মিস্টার এবং মিসেস কুইগলি। কথা দিচ্ছি, মোটেও বেশি সময় নেবো না আপনাদের মেয়ের। কিন্তু... যখন এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটে, তখন যারা সেই ঘটনার শিকার হয়েছে তাদের মুখ থেকে যত জলদি সম্ভব কোনোকিছু জানা যায়, তত ভালো। ডক্টর হার্শ আছেন আমার সঙ্গে, তিনি খেয়াল রাখবেন আপনাদের মেয়ের। ওর যদি কোনো রকমের সমস্যা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেবো আমরা।’

‘বাবা, বাদ দাও তো। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ!’

‘কেটি!’ মেয়েটার মায়ের দু’চোখ যেন জ্বলছে।

‘আমি দুঃখিত, মা। প্লিজ আমাকে কথা বলতে দাও ওই মানুষটার সঙ্গে।’

আগের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়েননি কেটির বাবা। ‘যে-লোক এই হাল করেছে আমাদের মেয়েটার, তাকে পাকড়াও করতে পেরেছেন আপনারা, তা-ই না?’

‘আমাদের ধারণা, একজন না, ওই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল দু’জন।’

‘বাবা, প্লিজ?’

চোখ বুজলেন মিস্টার কুইগলি। মাথা নাড়ছেন। ‘ঠিক আছে। কিন্তু মাত্র এক মিনিট সময় দিলাম। তার বেশি একটা মুহূর্তও না।’

‘ধন্যবাদ।’ মিস্টার কুইগলিকে ছাড়িয়ে আগে বাড়ল ক্লেয়ার। বসে পড়ল বিছানার ডান কিনারায়, কেটির মায়ের বিপরীত দিকে। মোবাইল ফোনটা বের করল, রাখল বিছানার চাদরের ওপর। হাত বাড়িয়ে ধরল কেটির খালি হাতটা... মানে, যে-হাতে ইন্ট্রাভেনাস ক্যানুলা লাগানো হয়নি। ‘তুমি নিরাপদে আছ দেখে খুব ভালো লাগছে আমার। তোমার সঙ্গে যেসব কথা বলবো এখন, সেসব যদি রেকর্ড করে নিই, কিছু মনে করবে?’

‘না, অসুবিধা নেই।’

‘যা-যা মনে পড়ছে তোমার, সব বলো আমাকে প্লিজ। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করো। দরকার হলে সময় নাও। খুঁটিনাটি কোনোকিছুই বাদ দিয়ো না। কখনও কখনও ছোট কোনো বর্ণনাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।’

মাথা ঝাঁকাল কেটি । কুঁচকে উঠল ওর চোখমুখ, হাঁচি দিল সে ।
বিছানার পাশে একটা টেবিল আছে, সেখান থেকে একটা টিস্যু নিয়ে কেটিকে
দিল ক্লেয়ার ।
পানিতে ভরে উঠেছে ওই মেয়ের চোখ দুটো । টিস্যুটা কাজে লাগিয়ে চোখ
মুছল সে ।



একটা কোনা ঘুরে ওই গলিতে হাজির হলো পুল। গলির ভেতরে থাকা একডজন চোখের দৃষ্টি স্থির হলো ওর ওপর। জটপাকানো চুলে বর্ণিল পুঁতি লাগানো পঞ্চাশ বছর বয়সী এক মহিলা সরে গেল এক পাশে। বিল্ডিংয়ের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তার একপাশে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স আছে, পা দিয়ে আলতো লাথি মারছে সেটাতে।

নিজের ব্যাজটা তুলে ধরল পুল। ঘুরে তাকাল মহিলা, মাথা ঝাঁকিয়ে দেখিয়ে দিল গলির পেছনদিকটা।

গলিটা চওড়ায় আট ফুটের মতো। লম্বায় ফুট ত্রিশেক হবে। এখানে লাইন করে রেখে দেয়া হয়েছে কার্ডবোর্ডের বেশ কয়েকটা বাক্স। সম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু তাঁবুও খাটানো হয়েছে। সে-কাজে ব্যবহার করা হয়েছে চাদর থেকে আরম্ভ করে ময়লার বাক্স পর্যন্ত যা-যা পাওয়া গেছে হাতের কাছে, সব। কাজ চালিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ডাস্ট টেপের সাহায্যে জোড়া লাগানো হয়েছে ওসব। বাতাসে পেশাব এবং পচা খাবারের দুর্গন্ধ।

আরও একবার মাথা নাড়ল ওই মহিলা।

যেদিকে ইঙ্গিত করছে সে, সেদিকে তাকাল পুল।

ফুট বিশেক ভেতরে, দেয়াল ঘেঁষে, রেখে দেয়া হয়েছে একটা রেফ্রিজারেটরের বাক্স।

গলিতে উপস্থিত লোকজন সরে পড়ছে ওই বাক্সের কাছ থেকে। যে যেদিকে পারছে, সরে যাচ্ছে। পুলকে ছাড়িয়ে দৌড়ে গলির সামনের দিকে চলে গেল তিনজন। পুল শুনতে পেল, তাদেরকে পাকড়াও করল পুলিশের অফিসাররা।

পায়ে পায়ে ওই বাক্সের দিকে এগোচ্ছে পুল। একটা হাত দিয়ে খামচে ধরে রেখেছে নিজের পিস্তলের বাঁট। বাক্সটা যখন আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে, ওটার গায়ে পা দিয়ে লাথি মারল সে। ‘আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল, এফবিআই-এ আছি। আমি চাই, বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে তুমি।’

প্রথমে বেরিয়ে এল একটা হাত, তারপর আরেকটা।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পুল, নোংরা নীল শার্ট আর জিন্স পরিহিত এক লোক বেরিয়ে আসছে বাক্সের ভেতর থেকে। ‘গুলি করবেন না!’

নিজের পেছনে ডিরেঞ্জোর উপস্থিতি টের পেল পুল।

পিস্তল বের করে ফেলেছে ডিরেঞ্জো। ‘ধেং!’

গৃহহীন ওই লোকের পায়ে দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাক্সেল মনিটর।

পাঁই করল ঘুরল পুল, ছুট লাগাতে উদ্যত হয়েছে। ‘ওয়ানারের অফিসে! এখনই!’

১২৬.
পোর্টার
চতুর্থ দিন, রাত ৮:০৯

‘ট্রাক্টটা খুলুন,’ বলল পোর্টার।

হোটেলের পেছনদিকের এক কোনায়, চেইনলিঙ্কের ফেন্স ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করেছে ওরা।

গাড়ি থেকে সবার আগে নামল পোর্টার। পেছনের কোনা ঘুরে হাজির হলো ট্রাক্টের কাছে। নিজের এবং সারার কোটটা বের করে নিল। নিউ অরলিন্সের আবহাওয়া ছিল গরম, আর তাই এখন মনে হচ্ছে, এক বালতি বরফের ভেতরে পা রাখতে যাচ্ছে যেন। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সারা, ওর হাতে ওর কোটটা ধরিয়ে দিল সে। এরপর খুলল পেছনদিকের দরজা। ওদের প্যাসেঞ্জারকে বাইরে বেরিয়ে এসে দু’পায়ে খাড়া হতে সাহায্য করল। নিজের কোটটা জড়িয়ে দিল মহিলার কাঁধে।

‘আরে আপনি তো দেখছি নিখাদ ভদ্রলোক,’ মন্তব্য করল মহিলা।

মহিলার ঠাণ্ডা লাগছে কি না, তা নিয়ে মোটেও কোনো মাথাব্যথা নেই পোর্টারের। সে আসলে চাইছে, মহিলা যাতে তার দু’হাত ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারে। যদিও হ্যান্ডকাফ পরানো আছে, তারপরও একটুও বিশ্বাস করতে পারছে না এই মহিলাকে। ‘ভেতরে যাবো কী করে আমরা?’

‘আমার তো মনে হয় প্রশ্নটার জবাব ইতোমধ্যেই জানা হয়ে গেছে আপনাদের।’ চেইনলিঙ্ক ফেন্সের একজায়গার বড় একটা অংশ ভাঙা, মাথা নিচু করে সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ল মহিলা। বিল্ডিংয়ের পেছনদিকে যে-পার্কিংলট আছে, সেদিকে হাঁটা ধরেছে। তার পেছন পেছন রীতিমতো ছুটছে সারা।

ব্যাপারটা ঠাহর করে নিতে একটু সময় লাগল পোর্টারের। একছুটে চলে গেল গাড়ির সামনের দিকে, খুলল গ্লাভ বক্সটা। প্লাস্টিকের ব্যাগটা হাতে নিয়ে চেইন খুলল ওটার। ভেতর থেকে বের করে নিল লকেট আর চাবিটা।

দ্বিতীয় যে-ব্যাগের ভেতরে বিশপের ছুরি আছে, সেটার ওপর নজর পড়ল ওর।

ওই ব্যাগও খুলল সে। লকেট, চাবি আর ছুরি ঢুকিয়ে ফেলল পকেটের ভেতরে। তারপর লাগিয়ে দিল গাড়ির দরজা। আর একটা মুহূর্ত দেরি না করে ছুট লাগাল দুই মহিলার পেছন পেছন।



জমিনের ওপর জমে থাকা তুষার পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। আর তাই হোটেল গায়োনকে ঘিরে রাখা তুষারের স্তর গিয়ে ঠেকেছে বিস্ময়কর এক উচ্চতায়। বাতাস সেসব তুষারকণাকে উড়িয়ে এনে আছড়ে ফেলছে বিল্ডিংয়ের গায়ে। উড়ন্ত তুষারকণা কখনও কখনও পৌঁছে যাচ্ছে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত। মনে হচ্ছে, সাদা পাউডার দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়... সাদা কোনো লেকের ওপর মিহি কোনো কুয়াশার চাদর যেন।

একটা কথা বুঝে নিতে বেশি সময় লাগল না পোর্টারের। ওর সামনের তুষারে তিন জোড়া আলাদা জুতোর ছাপ আছে। একটা জোড়া সারার। অন্যটা বিশপের মায়ের। আর তৃতীয়টা... সন্দেহ নেই, বিশপ ইতোমধ্যেই হাজির হয়ে গেছে এখানে। এবং খুব সম্ভব একাই এসেছে সে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছে, কারণ ওই লোকের জুতোর ছাপগুলো আস্তে আস্তে ভরে উঠছে তুষারকণায়। আর কয়েক ঘণ্টা পর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না ওসব ছাপের।

বিল্ডিংয়ের একধারে একটা লোডিং ডক আছে, সেটার পাশে দেয়ালের গায়ে দেখা যাচ্ছে বড়সড় একটা কুলুঙ্গি। ধাতব ভারী একটা দরজা আড়াল করে রেখেছে কুলুঙ্গিটাকে। ওই দরজায় সারা এবং জেন ডো'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল পোর্টার।

একপাশে সরে দাঁড়াল সারা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেন ডো'র দিকে।

গুনগুন করে গান গাইছে বিশপের মা... “বেবি, ইট’স কোল্ড আউটসাইড”। বেড়ালের মতো দঁতো হাসি লেপ্টে আছে তার চেহায়ায়।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে দরজার ডেডবোল্টটা দেখিয়ে দিল ওই মহিলা। ‘তাড়াতাড়ি করুন, ডিটেকটিভ।’

দ্রুত কুঁচকে মহিলার দিকে তাকাল পোর্টার। তারপর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল পকেটে। বের করে আনল চেইনটা... লিবি ম্যাকিনলের লকেট আর চাবি আছে ওটাতে।

চাবিটা যখন ঢোকাচ্ছে তালায়, খেয়াল করল, হাত কাঁপছে ওর। সে-কারণেই হয়তো কয়েকবারের চেষ্টায় খুলতে পারল তালাটা। মনে মনে দোষ চাপিয়ে দিল ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ওপর।

যখন ঘুরল, মসৃণভাবেই ঘুরে গেল চাবিটা। কেউ একজন কিছুদিন আগে তেল দিয়েছে এই তালায়। খটাস আওয়াজ তুলে একপাশে সরে গেল ডেডবোল্ট। খানিকটা টানাহেঁচড়া করে ওই দরজা খুলে ফেলল পোর্টার। পাশে দাঁড়ানো দুই মহিলাকে ইঙ্গিতে ঢুকে পড়তে বলল ভেতরে। তারা ঢুকবার পর নিজেও ঢুকে পড়ল, লাগিয়ে দিল দরজাটা। এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে বাইরে যেন গৌঁ গৌঁ করে উঠল হিমশীতল বাতাস।

মোবাইল ফোন বের করল সারা। চালু করল ফ্ল্যাশলাইট।

এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে পোর্টার বুঝতে পারল, একটা কিচেনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। অথবা, বলা ভালো, আগে একসময় যে-জায়গা কিচেন হিসেবে ব্যবহৃত হতো, দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

রান্নাঘরের সামগ্রী বলতে যা বোঝায়, সেসব সর্পিয়ে ফেলা হয়েছে নষ্ট আগেই। স্টেইনলেস স্টিলের অনেক টেবিল ব্যবহৃত হতো এই জায়গায়, সর্পিয়ে ফেলা হয়েছে সেসবও। বাকি যা-কিছু আছে, সবই আছে বিশৃঙ্খল অবস্থায়। ছাদে ফাটল ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। প্লাস্টারের আবরণ দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। আবার, কোথাও বেরিয়ে পড়েছে পচন-ধরা তক্তা।

‘মনে হচ্ছে, নরকের কোনো গর্তে হাজির হয়েছি,’ বলল সারা। হাতেধরা আলোটা ফেলছে ঘরের এখানে-সেখানে।

মেঝেতে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে পড়ে থাকা জঞ্জাল এড়িয়ে ঘরের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল পোর্টার। ‘বিশপ কোথায়?’

‘এদিকে আসুন।’ আগে বাড়ল জেন ডো। কষ্টেস্টে কাজটা করতে হলো তাকে। এখনও শেকলে আটকানো আছে দু’পা।

মহিলার পিছু নিল পোর্টার আর সারা। একসারিতে পড়ে আছে মরচে-পড়া কয়েকটা স্টোভ, পার হলো সেগুলো। হাতের বাঁ দিকে, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে পুরনো বেশকিছু কাঠের বাক্স।

কোনো এককালে লবি থেকে কিচেনটাকে আলাদা করেছিল একটা সুইঙ্গিং ডাবল ডোর; চোখ বরাবর উচ্চতায় গোলাকার দুটো জানালা আছে ওটার গায়ে। কিন্তু এখন একটা দরজা যেন চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। অন্যটা অনিশ্চিত এক কায়দায় ঝুলছে দেয়ালের সঙ্গে, কজা বলতে যা-কিছু বাকি আছে সেসব খামচে ধরে রেখেছে যেন। খোলা জায়গাটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে মোমবাতির আলো... জ্বলছে মিটমিট করে।

লবিতে পা রাখল ওরা। একটা কাউন্টারের পেছনদিক ঘুরে হাজির হলো বড় আর খোলামেলা এক জায়গায়। নিতান্ত অবহেলায় একধারে পড়ে আছে একটা পপকর্ন মেশিন। পুরনো হয়ে গেছে। মাকড়সার জালে ভরে গেছে। দূরের এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

‘আপনারা জানেন কি না জানি না... মাখন-লাগানো মাঝারি সাইজের একটা পপকর্নে কিন্তু বেকন আর ডিম অথবা বিগ ম্যাক আর ফ্রাই সহকারে যে-ব্রেকফাস্ট সারি আমরা, তার তুলনায় বেশি চর্বি আছে। শুধু তা-ই না, আপনারা চাইলে ওই খাবারের সঙ্গে স্টেক ডিনারও যোগ করে নিতে পারেন, কিন্তু তাতে পপকর্নের চর্বির পরিমাণ কমবে না,’ ঘরের কোনো এক জায়গা থেকে শোনা গেল বিশপের গলার আওয়াজ। ‘হয়তো সে-কারণেই আমরা কখনও বিশপ হাউসে পপকর্ন খেতাম না। ঠিক না, মা?’

অন্ধকার ভেদ করে বার বার এখানে-সেখানে নজর হানছে পোর্টার, বিশেষ করে যেসব ছায়া নাচছে দূরের দেয়াল আর ছাদটার গায়ে, সেসবের ওপর। মনে হচ্ছে, কানে শোনা যাচ্ছে না এমন কোনো গানের তালে নাচছে যেন ওসব ছায়া।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৯২

‘এখানে, স্যাম। অন্ধকার সহিয়ে নেয়ার জন্য চোখ দুটোকে একটু সময় তো দিতে হবে, নাকি?’

টুং করে আওয়াজ দিল একটা ঘণ্টা। জুতোর তলায় ভর দিয়ে পাই করে সদর দরজার দিকে ঘুরল পোর্টার। এককালে দরজা ছিল সেখানে, এখন দাঁড়িয়ে আছে একটা তক্তা। ওই জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিশপকে। তার পাশেই বেলহপ’স স্টেশন। একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে তার হাতে। তবে সেটার নল তাক করে রাখা হয়েছে মেঝের দিকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, ওটা একটা .৩৮। শেষ যে-বার লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পোর্টারের, সে-সময়ের তুলনায় এখন তার চুল লম্বা দেখাচ্ছে। চেহারা ভরে উঠেছে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। কোনো একজাতের ছদ্মবেশ দেখতে পাওয়ার আশা করেছিল পোর্টার; যেমন রঙ করা চুল, কিন্তু না, সে-রকম কিছুই দেখা যাচ্ছে। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশপ... যাকে ভালোমতোই চেনে পোর্টার, যে-লোক ভূতের মতো তাড়া করে চলেছে ওকে।

কয়েক কদম আগে বাড়ল পোর্টার। আসলে বিশপ আর সারার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল নিজে। ‘তোমাকে পিস্তল-বন্দুকে ঠিক মানায় না।’

‘এটার কথা বলছেন?’ হাতেধরা অস্ত্র উঁচু করে দেখাল বিশপ, হাসল। নাচাল ওটা। ‘মঝে মঝে যখন মরিয়া হয়ে উঠি আমি, তখন একটু-আধটু ব্যবহার করি আর কী।’

পোর্টারকে ছাড়িয়ে দূরে তাকাল বিশপ। ‘হ্যালো, মা। কেমন ছিলে?’

বিশপের মা কিছু বলে ওঠার আগে আরও এক কদম আগে বাড়ল পোর্টার। ‘বোমাটা কোথায়, বিশপ? বলেছিলে, তোমার মাকে যদি এখানে নিয়ে আসি, তোমার মাকে যদি তোমার কাছে নিয়ে আসি, তা হলে তুমি আমাকে বলে দেবো, কোথায় পুঁতে রেখেছ ওই বোমা। বলেছিলে, মেয়ে দুটোকে ছেড়ে দেবে।’

‘বলেছিলাম, তা-ই না?’ .৩৮-এর হোঁতকা নল দিয়ে মাথার একটা পাশ চুলকাল বিশপ। ‘আমারও সে-রকমই বিশ্বাস... আপনাকে একটা সময়সূচী দিয়েছিলাম আমি। বলুন, দিইনি? কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি দেরি করে ফেলেছেন, স্যাম। দুঃখজনক হলেও সত্যি, দেরি করে ফেলেছেন আপনি। একজন বিনয়ী মানুষ কিন্তু কখনও কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে না, জানেন তো? বর্তমান যে-পরিস্থিতি, সেটা বিবেচনা করে যদি বলি, যে-কোনো রকমের দেরি কিন্তু মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। অথচ আমি আপনাকে সবসময়ই মিস্টার পাণ্ডুয়াল বলেই জেনে এসেছি।’

পকেটের ভেতরে পায়ের সঙ্গে ছুরিটার ওজন টের পেল পোর্টার।

‘আমরা এখানে যত জলদি সম্ভব হাজির হয়েছি,’ পোর্টারের পেছন থেকে বলে উঠল সারা।

পিস্তল নিচু করল বিশপ, বেলহপ স্টেশনটা ঘিরে চক্কর দিল একবার। ‘আমারও তা-ই মনে হয়। আপনাদের মধ্যে যে-ই গাড়ি চালিয়ে থাকুক না কেন,

সাংঘাতিক একটা কাজ করেছে সে, তা-ই না?’ হেলান দিল সে। কাঠের পুরনো ফ্রেমটা মচমচ করে উঠল তার ওজনের কারণে। ‘এবার চাইলে একটু আরাম করতে পারেন আপনারা। কেউ মারা যায়নি এখন পর্যন্ত। যদি কাউকে মারতে হয়, আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। তবে একটা কথা কী জানেন... এই যে দেরি করে ফেলেছেন আপনারা, এর ফলে একটা ক্ষতি হয়ে গেছে— কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটাতে পারতাম আমরা, সে-সময় কমে এসেছে এখন। সত্যি বলছি, আশা করেছিলাম, আপনাদের সঙ্গে মন খুলে একটু কথা বলতে পারবো। গত কয়েক দিনে যা-যা দেখেছেন আপনারা, সেসব নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু এখন, বলতে খারাপই লাগছে, সে-সুযোগ আর নেই... কাজটা করতে পারবো না আমরা। যা হোক, যে-বোমার কথা বললেন, সেটা এখনও টিক টিক করে চলেছে দূরে কোথাও। কিন্তু ওটা নিয়েও কথা বলবো না এখন, আরও জরুরি কিছু কাজ আছে করার মতো।’

কয়েক কদম আগে বাড়ল বিশপ। শরীরের একপাশে আলগোছে ঝুলছে .৩৮-টা। ‘আহা, এখনও শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন... আপনি তো চাইলেই ওটা খুলে দিতে পারতেন, স্যাম। কেমন নিষ্ঠুরের মতো হয়ে গেল না কাজটা? কী বলেন?’

আগে বাড়ল বিশপের মা, আরও কাছে গেল ছেলের। ‘তোমাকে দেখে ভালো লাগছে, অ্যানসন। খুব ভালো লাগছে।’

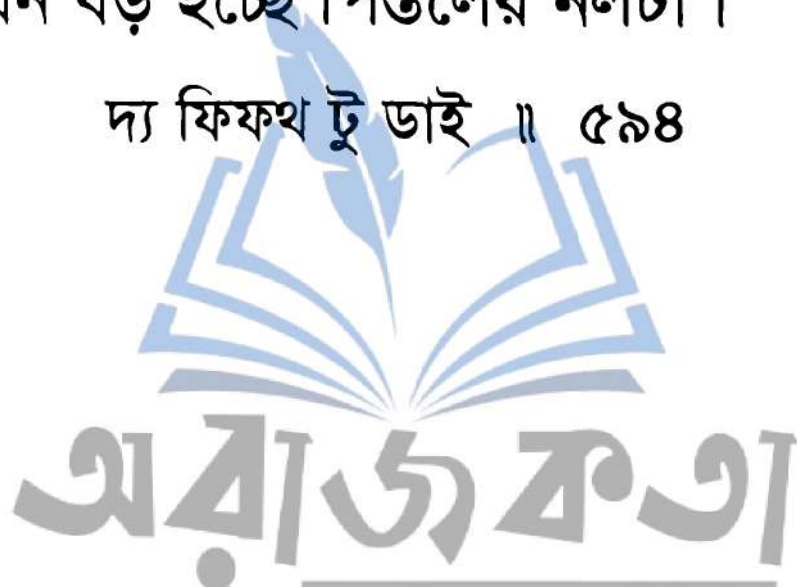
হাসল বিশপ। ‘এই জায়গার কথা মনে আছে তোমার, না? আমি নিশ্চিত, এখানে প্রিয় অনেক স্মৃতি আছে তোমার।’ ঘুরল সে, অলঙ্করণযুক্ত ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ‘স্যাম, এখানকার দেয়ালগুলোতে ভূত আছে। তারা যে চেষ্টাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আমি কিন্তু পাচ্ছি। যেমন ধরুন গতকালের কথা। গতকাল সবার চেয়ে জোরে কে চিৎকার করেছিল, জানেন? লিবি ম্যাকিনলে।’

হাত বাড়িয়ে দিল পোর্টার। চুল খামচে ধরে জেন ডোকে টেনে নিয়ে এল নিজের পাশে। শুনতে পাচ্ছে, ওর কোটের নিচে বনবন আওয়াজ তুলেছে মহিলার শেকল। খালি হাতটা মুহূর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল পকেটের ভেতরে, বলতে গেলে ছোঁ মেরে বের করে আনল ছুরিটা। চাপ দিয়ে খুলে ফেলল ফলা। ইস্পাতের ধারালো ফলাটা চেপে ধরল মহিলার পাগুর উন্মুক্ত গলায়। ‘বিশপ, পাগল কোথাকার, এই শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, কোথায় আছে ওই বোমা? মেয়ে দুটো কোথায়?’

হাসল বিশপ, পিস্তল তুলছে ধীরে ধীরে। ‘আমার ছুরিটা সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ, স্যাম। একটা বদলাবদলি করলে কেমন হয়, বলুন তো? কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আমার এই পিস্তল দিয়ে দেবো আপনাকে। আর আপনি বিনিময়ে আমাকে দেবেন ওই ছুরি। ওটা আবার ভীষণ পছন্দ আমার।’

এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে সে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, পাল্লা দিয়ে একটু একটু করে যেন বড় হচ্ছে পিস্তলের নলটা।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৯৪



অরাজকতা

স্যামের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে জেন ডো। ‘অ্যানসন, আমরা এখন সমান সমান একটা অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমাকে যা-যা করতে বলেছিলে, সব করেছি আমি। সব।’

‘তা-ই নাকি? হ্যাঁ, প্রায় সবকিছুই করেছ,’ বলল বিশপ।

বিস্ফোরণের আওয়াজ তুলে আগুন উগলাল .৩৮-টা। জানালাগুলোয় কাচ বলতে আর যা-কিছু বাকি ছিল, প্রচণ্ড সেই শব্দের কারণে চুরমার হয়ে গেল সব।

চিৎকার করে উঠল সারা।

ছিটকে এসে স্যামের বুকে সজোরে ধাক্কা খেল জেন ডো’র মাথাটা।

‘হ্যাঁ, সম্ভবত ঠিকই বলেছিলে তুমি,’ বলছে বিশপ, ‘এখন সমান সমান একটা অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।’

১২৭.
পুল
চতুর্থ দিন, রাত ৮:০৯

‘ওই যে, ওটাই!’ চিৎকার করে বলল ডিরেঞ্জো। ‘সবুজের মধ্যে সাদা রঙ করা বাড়িটাই!’

রাস্তা ধরে ছুটছে পুল। গলিটা এখন ওর পেছনে। টায়ারের বিশ্রী আওয়াজ তুলে থেমে গেল একটা ট্যাক্সি, মাছ যে-কায়দায় মোচড় কাটে সেভাবে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে কিছু একটা বলে উঠল ড্রাইভার। কিন্তু কী বলছে সে, বুঝতে পারল না পুল। বুঝতে চায় কি না, সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত না।

অন্ধকারে ডুবে আছে ওয়ানারের অফিস।

সেখানে পৌঁছে একটা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে তাকাল পুল। আবছামতো নজরে পড়ছে পরিত্যক্ত একটা ডেস্ক। ঘরের পেছনদিকে ঠাহর করা যাচ্ছে কয়েকটা চেয়ারের অস্তিত্ব।

কিন্তু কোথাও কোনো নড়াচড়া নেই।

সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলো পুল। সমানে কিল মারছে দরজার গায়ে। ‘সারা ওয়ানার। আমি স্পেশাল এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুল, এফবিআই। দরজা খুলুন!’

কোনো সাড়া নেই বাসার ভেতর থেকে।

কিছুটা পেছনে সরে গেল পুল, কিন্তু নামল না পোর্চ থেকে। দ্বিতীয় তলার জানালাগুলোয় নজর ফেলছে, যে-কোনো একটা জানালার কাচ ভেদ করে দেখে নেয়ার চেষ্টা করছে ভেতরটা। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না... ভেতরে অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

আবার দরজার কাছে ফিরে এল পুল। হাতল ধরে মোচড় দিল।

লক করা।

‘সারা ওয়ানার!’

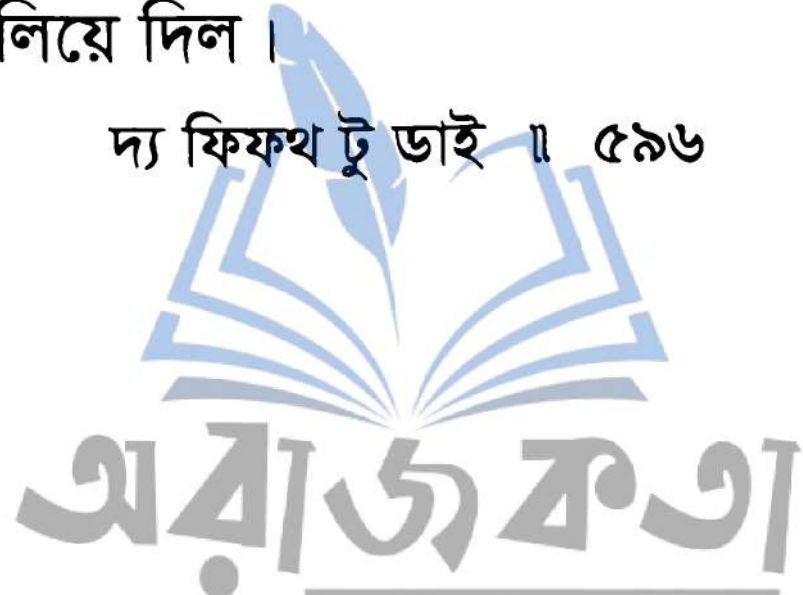
দরজার গায়ে কিল মারল আবার।

কিছুই হলো না। কোনো সাড়া নেই।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটানে গ্লকটা বের করে ফেলল পুল। পাল্লায় শার্সি লাগানো আছে একাধিক, পিস্তলের বাঁট ব্যবহার করে একটা শার্সি ভেঙে ফেলল। ভাঙা জায়গাটা দিয়ে খালি হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, ধারালো কাচের ব্যাপারে সাবধান আছে। হাতড়াতে হাতড়াতে ডেডবোল্টের স্পর্শ অনুভব করল একসময়, মোচড় দিল ওটাতে।

খুলে ফেলল দরজাটা, পা রাখল ভেতরে। একহাতে প্রস্তুত অবস্থায় আছে গ্লক। খালি হাত দিয়ে হাতড়াচ্ছে দেয়াল... লাইটের সুইচ খুঁজছে আসলে। ওটা হাতে পড়ামাত্র আলো জ্বালিয়ে দিল।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৯৬



অরাজকতা



‘সারা? স্যাম? আমি আসছি ভেতরে! আপনারা কেউ যদি থাকেন, আমি চাই, দু’হাত মাথার ওপরে তুলে নিচতলায় নেমে আসবেন।’

ওপরতলার কাঠের মেঝেতে শোনা গেল একটুখানি ক্যাচকোঁচ আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দের সেই উৎসের দিকে পিস্তল তাক করল পুল। কেউ হাঁটাচলা করছে কি না ওপরতলায়, নিশ্চিত হতে পারছে না। পুরনো কিছু বাড়িতে প্রায়ই অদ্ভুত সব আওয়াজ শোনা যায়, হতে পারে, একটু আগের সেই শব্দও সে-রকম কিছু একটা।

ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় হাজির হলো সে। প্রতিটা ছায়ার ওপর তীরের মতো বিদ্ধ হচ্ছে ওর দৃষ্টি। দেয়ালে ফাঁকফোকর বলতে যা-কিছু আছে, চকিত চাহনিতে দেখে নিচ্ছে সব। অফিসের ভেতরে লুকিয়ে থাকার জায়গা বলতে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না... ডজন ডজন ফাইল আর কাগজপত্রের স্তুপ জমে আছে এখানে-সেখানে, তারপরও না।

ছোট ওই অফিসের পেছনে হাজির হয়ে দেখা মিলল একটা হলওয়ার। ওটা যেন এগিয়ে গেছে আরও অন্ধকার কোনো এক জায়গার দিকে। হলের প্রবেশমুখ ছাড়িয়ে আর ভেতরে ঢুকতে পারছে না অফিসের আলোটা। দেয়ালে কিছু অলঙ্করণও আছে; সেসবও বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই আলোর জন্য। লম্বা করে দম নিল পুল। তারপর পা বাড়াল ওই অন্ধকারের উদ্দেশে। তবে প্রথমে দেয়ালের কোনাটা ঘুরল ওর হাতেধরা পিস্তল, বাকি শরীর যাচ্ছে পেছন পেছন। হলের অন্য প্রান্তে যে-মানুষটা অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য, সে-মানুষটাকে দেখামাত্র ট্রিগারে টান দেয়ার প্রস্তুত হয়ে আছে সে। কিন্তু জায়গামতো হাজির হয়ে একটা সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না। বাড়ির দ্বিতীয় তলা অভিমুখে উঠে গেছে ওই সিঁড়ি। পুল একবার ভাবল, এখানকার আলোও জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওপরতলায় যদি কেউ থাকে, তাকে জানানোর দরকার নেই, পুল হাজির হয়ে গেছে এখানে, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। মানুষটা বরং ভাবুক, এখনও নিচতলাতেই আছে পুল।

একটা পা সাবধানে সিঁড়ির প্রথম ধাপে রাখল সে। তারপর ধীরে ধীরে শরীরের ওজন চাপাল পা-টার ওপর। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো শব্দ উৎপন্ন হবে কি না, এবং সে-শব্দ কোনো বিপদ ডেকে আনবে কি না... এসব কোনোকিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না সে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। আগেও যেমন বাড়ির সবকিছু নীরব ছিল, এখনও সে-রকমই আছে।

সিঁড়ি বেয়ে একটু একটু করে উঠছে পুল, সময় খরচ করছে, একইসঙ্গে অন্ধকার সহিয়ে নিচ্ছে চোখে। অনতিদূরে খোলা একটা জায়গা হাজির হলো দৃষ্টিসীমায়। আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, কোনো একজাতের কুলুঙ্গির কাছে হাজির হয়েছে। ওটা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে বন্ধ একটা দরজা।

আরও আগে বাড়ল সে, খালি হাতটা দিয়ে মোচড় দিল দরজার হাতলে। ধীরে ধীরে, সাবধানে ঘোরাল ওটা। কোনো শব্দ যাতে না হয়, সতর্ক আছে সে-

ব্যাপারে। লক করা হয়নি দরজাটা। মৃদু একটা আওয়াজ তুলে চৌকাঠের স্ট্রাইক বক্স থেকে আলাগা হয়ে গেল হাতলের সিলিভার।

দরজাটা খুলে গেল। একটা ঘর দেখা যাচ্ছে।

এবং তৎক্ষণাৎ গন্ধটা এসে বাড়ি মারল পুলের নাকে।

পচনের গন্ধ।

ঘরের আলো নেভানো। অন্ধকার যেন ভিড় জমিয়েছে এই ঘরে।

ভেতরে পা রাখল পুল। হাতড়ে হাতড়ে জ্বলে দিল লাইটের সুইচ। চোখের সামনে যে-দৃশ্য দেখতে পেল, ভাবল, আলোটা না জ্বালালেই ভালো করত।

ঘরের একদিকে একটা কাউচ আছে, সেখান থেকে একজন মহিলা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে পুলের দিকে। কিন্তু মহিলার দৃষ্টি নিষ্প্রাণ। কেমন যেন অস্বচ্ছ হয়ে আছে চোখ দুটো। মনে হচ্ছে, মহিলা যেন বসে নেই সেখানে, বরং তাকে যেন ধপাস করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অদ্ভুত এক কায়দায় একদিকে কাত হয়ে আছে শরীরটা। চেহারা পাণ্ডুর। রক্ত যা পড়ার, অনেক আগেই গড়িয়ে পড়ে গেছে শরীর থেকে। ফেকাসে চেহারার কারণে আরও বেশি করে নজরে পড়ছে মহিলার কপালের গাঢ়, কালো একটা ফুটো। বোঝাই যায়, কোনো এক আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেট তৈরি করেছে ওই গর্তটা। তার ওপর যখন গুলিবর্ষণ করা হয়, তখন খাচ্ছিল বেচারী। খাবারের একটা প্লেট পড়ে আছে মহিলার কোলের ওপর। তবে তাতে ঠিক কী খাবার আছে, ঠাহর করা যাচ্ছে না। কিছু খাবার পড়ে আছে মহিলার পাশের কুশনের ওপরও।

যে-ই খুন করে থাকুক না কেন মহিলাকে, এখন যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পুল, ওই লোকও হয়তো দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক একই জায়গায়। গোবরাটের ঠিক এই জায়গায় হাজির হয়ে লোকটা চমকে দিয়েছিল মহিলাকে।

লাশের দিকে এগিয়ে গেল পুল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পাশে।

মনে পড়ে যাচ্ছে, জেলখানায় কোনো একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এই মহিলা। কিন্তু সেটা হতে পারে না। এই মরদেহ এখানে এভাবে পড়ে আছে কম করে হলেও একসপ্তাহ হবে। সময়টা দু'সপ্তাহ কিংবা তার কাছাকাছিও হতে পারে। একসময় যে-মানুষটার দেহে প্রাণ ছিল, পচন যেন নিতান্ত ক্ষুধার্ত কোনো কায়দায় খেয়ে শেষ করে ফেলছে সে-দেহ। মহিলার ডান হাতে একটা রূপার আংটি দেখা যাচ্ছে। ফুলে উঠেছে আঙুলটা। দেখে মনে হচ্ছে, ধাতুর ওই বলয় ঘিরে যেন বিশেষ কোনো কায়দায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে একটা হট ডগ।

‘ধেং,’ পুলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন ডিরেঞ্জো। ‘ওটা সারা ওয়ার্নার।’

কখন হাজির হয়েছে লোকটা, শুনতেই পায়নি পুল।



চতুর্থ দিন, রাত ৮:১৪

‘মা, স্যামকে তোমার ফোনটা দাও তো, প্লিজ,’ বলল বিশপ। ধোঁয়া বের হচ্ছে তার পিস্তলের নল থেকে, সে-ধোঁয়ায় একটু যেন বিকৃত দেখাচ্ছে চেহারাটা।

ফোনটা পোর্টারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সারা। ‘অ্যানসন, বাছা আমার, তোমার বাবা যে মরে গেছেন, সে-কথা এই লোককে বলতে গেলে কেন তুমি? বাবা ছাড়াও তো তোমাকে বেশ ভালোভাবেই বড় করেছি আমরা। ডায়েরির নামে তুমি যা লিখেছ, সেটা তো দেখছি মিথ্যায় ভরপুর।’

পোর্টারের হাত থেকে খসে পড়ে গেল জেন ডো’র নিখর শরীরটা। জুবুথুবু হয়ে পড়ে থাকল ওর পায়ের কাছে।

হাত থেকে ছুরিটা ছেড়ে দিল সে।

বুকের খাঁচায় একের পর এক বাড়ি অনুভব করছে হৃৎপিণ্ডের।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বিশপ। ছুরিটা তুলে নিল। পপকর্ন মেশিনের পাশে একটা কাউন্টার আছে, সেখানে রেখে দিল .৩৮-টা।

‘মা, ডায়েরির সব কথাই তো মিথ্যা না। কোনো কোনো কথা মিথ্যা। যাকে বলে কিনা ছোটখাটো মিথ্যা, সে-রকম আর কী। ওসব আবার তেমন গুরুত্বপূর্ণও কিছু না। কোথায় কীভাবে মিথ্যা বলতে হয়, সে-ব্যাপারে আমরা তো আবার বরাবরই ওস্তাদ।’

সারার বাড়িয়ে ধরা হাতের দিকে তাকাল পোর্টার। তারপর তাকাল ফোনটার দিকে। সবশেষে নজর বুলিয়ে নিল পায়ের কাছে পড়ে থাকা লাশটার ওপর।

‘স্যাম, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, সব রক্ত সরে গেছে আপনার চেহারা থেকে। আপনার বসে পড়া উচিত। জানেন, আপনাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে দূর্ভিত্তা হয় আমার।’ এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে একটা কাঠের চেয়ার দেখতে পেল বিশপ নষ্ট-হয়ে-যাওয়া কিছু আসবাবের মধ্যে, গিয়ে নিয়ে এল ওটা; ধুলো-ময়লা বলতে যা-কিছু আছে ওটার গায়ে, ঝাঁকিয়ে সাফ করে ফেলার চেষ্টা করল। চেয়ারটা রাখল পোর্টারের পেছনে। ওটাতে ধপাস করে বসে পড়ল পোর্টার। পা দুটো কেমন যেন অসাড় ঠেকছে ওর কাছে। মনে হচ্ছে, হাড়-মাংস নয়, যেন জেলি দিয়ে বানিয়ে দেয়া হয়েছে ওর দু’পা।

‘এসব কী?’ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই একটা গালি দিল সে, দম নেয়ার চেষ্টা করছে। ‘আমি তো...’

‘আহা, জিভটাকে একটু সামলে রাখলে এমন কী ক্ষতি হয়, বলুন তো?’

চোখ উল্টানোর কায়দা করল সারা। ‘অ্যানসন, তুমি তো দেখছি তোমার বাবার চেয়ে কোনো অংশে কম না।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৫৯৯

পায়ের কাছে পড়ে থাকা লাশটার দিকে আরও একবার তাকাল পোর্টার মহিলার কপালে ছোট আর গোলাকার একটা ফুটো তৈরি করে দিয়েছে বুলেট। রক্ত সামান্যই বেরিয়ে আসছে। বুলেটটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় মাথার কোন দিক দিয়ে গেছে, নজরে পড়ছে না। হলো-পয়েন্টের বুলেট বলতে যা বোঝায়... অর্থাৎ যেন বুলেটের মাথায় একটুখানি গর্ত থাকে... বিশপ মনে হয় সে-রকম কোনোকিছু ব্যবহার করেছে। বুলেটটা খুব সম্ভব রয়ে গেছে মহিলার মাথার ভেতরেই। সামনের দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেচারী। শেষের কথাগুলো যেন অন্ততকালের জন্য আটকা পড়ে গেছে তার ঠোঁটে।

অ্যানসন, আমরা এখন সমান সমান একটা অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমাকে যা-যা করতে বলেছিলে, সব করেছি আমি।

সব।

‘কে...?’ শব্দটা যেন জোর করে বেরিয়ে এল পোর্টারের মুখ দিয়ে। কিন্তু বের হতে পারল না পুরোপুরি, আটকে রয়ে গেল জিভের কিনারায়।

মেঝেতে পড়ে থাকা ওই মরদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বিশপ। তাকাল মহিলার শূন্য-দৃষ্টির দুই চোখের দিকে। ‘এই মহিলার নাম রোজ ফিনিকি। মৃত্যু পাওনা হয়ে ছিল মহিলা, সেটাই পেয়েছে। বরং আমি বলবো, শুধু একবার নয়, এক শ’বার মরা উচিত ছিল এই মহিলার।’

‘ফিনিকি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে... এই মহিলা কি খুন করেছে লিবিকে? আর সে-কারণেই কি...?’

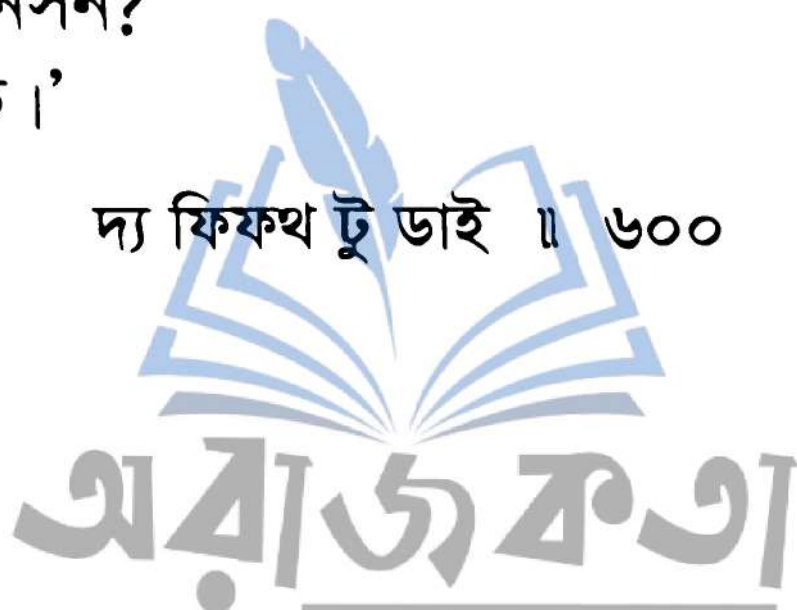
‘এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার মতো সময় যদি পাওয়া যেত, ভালো লাগত আমার নিজেরই। কিন্তু ওই যে একটু আগে বললাম... দেরি করে ফেলেছেন আপনারা। যা-যা বলতে চেয়েছিলাম আমি, সেসব এখন আর অপেক্ষা করছে না কারও জন্যই। ওদিকে করার মতো অনেক কাজ আছে আমাদের হাতে।’

পোর্টার টের পেল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে সারা। বিশপের মা। কিন্তু ওর পক্ষে আর তাকানো সম্ভব না ওই মেয়েমানুষটার দিকে। ওই চেহারা আর দেখা সম্ভব না। এখন তো না-ই, বরং কখনোই না। সে দেখছে না, তারপরও কোনো না কোনোভাবে জানে, হাসছে মহিলা। এবং তার ফলে সবকিছু আরও বিশ্রী ঠেকছে ওর কাছে। ‘তুমি কি ওই মহিলাকেও এবার শেষ করে দেবে?’

শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে বদল করল সারা। ‘আমাকে মারবে না সে। মারবে নাকি, অ্যানসন?’

‘জানি না। দেখা যাক।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৬০০



অরাজকতা



‘আমি কিন্তু ফিনিকিকে এখানে নিয়ে এসেছি... যেমনটা করতে বলেছিলে তুমি,’ বলল সারা।

মাথা একদিকে একটুখানি কাত করল বিশপ, হাসছে। ‘এবং ওই মহিলাও তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে... যেমনটা করতে বলেছিলাম আমি তাকে। মজা লাগছে আমার। কখনও কখনও কোনো কোনো কাজ আপনাআপনিই হয়ে যায়।’

ছুরির ফলা পরনের প্যান্টের পায়ে ঘষল বিশপ, তারপর ওটা ভাঁজ করে রেখে দিল পকেটে।

বলতে লাগল, ‘ফিনিকি জঘন্য কিছু কাজ করেছে। সেসবের কোনো কোনোটা করেছে এই বিল্ডিংয়ের ভেতরেই। তাকে অনেক লম্বা একটা সময় ধরে খুঁজছিলাম আমি... মাকে খুঁজে বেরিয়েছি যত সময়, প্রায় ততদিন। এই মহিলা এবং আমার মা... দু’জনেরই লুকিয়ে থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল— কারও বেশি, কারও কম। কিন্তু কথা হচ্ছে, সারাজীবনের জন্য লুকিয়ে থাকাটা সম্ভব না কারও পক্ষেই।’

কাউন্টারের ওপর রাখা পিস্তলটার দিকে নজর পড়ল পোর্টারের। মাত্র চার ফুট দূরে আছে ওটা। একটু চেষ্টাচরিত্র করলে জিনিসটা নেয়া সম্ভব ওর পক্ষে। বলল, ‘তোমার বাবা যদি এখনও বেঁচে থাকেন, কোথায় আছেন? তাঁর মৃত্যু নিয়ে ও-রকম একটা গল্প ফাঁদতে গেলে কেন?’

খিলখিল করে হেসে ফেলল বিশপ। ‘মা, এই লোক তো দেখা যাচ্ছে এখনও বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা।’

‘এখনও পারেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, পারবে,’ বলল সারা। হাজির হলো পোর্টারের পেছনে। ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল।

আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না পোর্টার। লাফ দিল পিস্তলের উদ্দেশে।

চেয়ার ছেড়ে উড়াল দিল ওর শরীরটা। মহিলা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই তাকে ছাড়িয়ে চলে এল। কাউন্টারের ওপর আছড়ে পড়ল সে, পরোয়া করল না, এক ছোঁ মেরে তুলে নিল পিস্তলটা। একটুও দেরি না করে চলে এল কাউন্টারের আরেক পাশে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের নল তাক করল বিশপ আর ওই মহিলার দিকে। ‘দু’জনের কেউই নড়বে না।’

হাসিটা মুছে যায়নি বিশপের। ‘স্যাম, আপনার এসব লাফঝাঁপ কোনো কাজেই লাগবে না...’

ট্রিগারে টান দিল পোর্টার। বিশপের মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট। গুলির আওয়াজ কিছুক্ষণ প্রতিধ্বনি তুলল ঘরের ভেতরে। বুলেটটা ভোঁতা একটা শব্দ তুলে বিদ্ধ হয়েছে দূরের এক দেয়ালে।

এতক্ষণ দম চেপে রেখেছিল বিশপের মা, এবার মৃদু আওয়াজ করে ছাড়ল সেটা। ‘আমি তোমাকে বলেছিলাম, অ্যানসন, ওই লোক কিন্তু সুযোগ পেলেই গুলি করবে তোমাকে।’

‘মা, লোকটা আমাকে গুলি করেনি।’

‘এই মহিলা,’ ধমক লাগাল পোর্টার, ‘তোমার ফোনটা দাও আমাকে।’

‘মা, তোমার ফোনটা দিয়ে দাও ডিটেকটিভ পোর্টারকে।’

‘আমি তো আমার ফোনটা তাকে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আগেও। কিন্তু সে-ই তো কী সব কাণ্ডকারখানা শুরু করে দিল।’ আগে বাড়ল মহিলা। নিজের মোবাইল ফোন ধরিয়ে দিল পোর্টারের হাতে।

ওটা ছোঁ মেরে মহিলার হাত থেকে নিয়ে নিল পোর্টার। একটা আঙুলের সাহায্যে আলতো ঠেলা মারল স্ক্রিনে। ‘গিয়ে দাঁড়াও ওই লোকের পাশে।’

মোবাইলে কোনো সিগনাল নেই।

‘দেখুন, আপনি যদি আপনার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করেন, তা হলে ভালো একটা কথা বলি আপনাকে। সিঁড়ি বয়ে চলে যান ওপরতলায়, ফোন করতে পারবেন। মোবাইল ফোন কখনও কখনও মোটেও কাজ করে না এ-রকম পুরনো বিল্ডিংগুলোতে। যা হোক, আপনার জন্য রুম নম্বর ৪০৫-এ কিছু একটা রেখেছি আমি। চলে যান সেখানে, নিজের চোখে দেখে আসুন কী রাখা আছে ওই রুমে। সেখানে মোবাইলটাও চমৎকার কাজ করবে, আর আপনিও যাকে খুশি লাগে তাকে ফোন করতে পারবেন।’

এদিকে-সেদিকে তাকাল পোর্টার। সিঁড়ি কোথায় আছে, ঠাহর করে নিল। দেখতে পেল, দূরের এক কোনায় পাক খেয়ে খেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে সিঁড়িটা। ‘গেলে আমরা সবাই যাবো একসঙ্গে। বিশপ, তুমি বাড়তি একটা কাজ করবে। আমাকে বলে দেবে, বোমা কোথায় রেখেছ। বলে দেবে, মেয়ে দুটো কোথায় আছে। আর তারপর তোমাদের দু’জনকেই জেলে ঢোকাবো আমি। যদি আমার কথামতো কাজ না করো, আবার গুলি করবো। এবং এবার হয়তো গুলি করবো এই মহিলাকেও। আগেরবার ইচ্ছাকৃতভাবে মিস করেছি, এবার হয়তো সে-রকম কিছু ঘটবে না।’

দু’হাত পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল বিশপ। ‘আমার মাকে এখানে নিয়ে এসেছেন আপনি, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি, স্যাম। ধন্যবাদ দিতে চাই ফিনিকির জন্যও। এরা দু’জন আমার জন্য... কী বলবো... দুটো পাখি আসলে। এখানে-সেখানে আসা-যাওয়া করাটা আমার জন্য আজকাল একটু মুশকিল হয়ে পড়েছে। আর তাই আপনাকে কাজে লাগিয়েছি। আপনি আমার বড় একটা উপকার করেছেন। গত কয়েকটা মাস বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার জন্য। তবে আস্তে আস্তে সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে বেশ ভালো একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার, সত্যিই।’

‘সিঁড়ির দিকে আগে বাড়ো। এক মুহূর্ত দেরি করবে না।’

হাসল বিশপ। ‘আমাদেরকে কিন্তু যেতে দিতে হবে আপনার, স্যাম। তারপর আপনি যা করবেন তা হলো, সিঁড়ির দিকে আগে এগোবেন, রওনা হবেন রুম নম্বর ৪০৫-এর উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে ফোন করবেন। তবে আমি একটা কথা বলে



দিতে পারি... আপনার মাথায় ওই ফোনকলের চিন্তা কাজ করছে না এই মুহূর্তে।
আপনার মাথায় এখন খেলা করছে সম্পূর্ণ অন্য কিছু একটা।

‘শেষবারের মতো বলছি। সিঁড়ির দিকে এগোও।’

হাত বাড়িয়ে দিল বিশপ। তার মায়ের একটা হাত ধরল। তারপর হাসল
আবারও। ‘স্যাম, আমি যা বলেছি, আপনাকে ঠিক তা-ই করতে হবে। কেন
করতে হবে, বলছি, ভালোমতো শুনুন।’

১২৯.
ক্লোজ
চতুর্থ দিন, রাত ৯:১১

জন এইচ. স্ট্রজার, জুনিয়র হাসপাতালে অস্থায়ী যে-অফিস বানিয়েছে ক্লোজ, কফি আনতে সেখান থেকে বাইরে গিয়েছিল সে, এখন আবারও ঢুকে পড়ল সেখানে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের কম্পিউটারের দিকে। দু'হাতে দু'কাপ কফি। পল আপচার্টের ফাইল থেকে যেসব কাগজ পাওয়া গেছে, এই ঘরে সমতল জায়গা বলতে যা-কিছু আছে, সবখানে বিছিয়ে রাখা হয়েছে ওসব।

গত দুটো ঘণ্টা ওই ফাইল নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে প্রতিটা পাতা। শনাক্ত করেছে প্রতিটা নাম। সেসব নাম ও ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে দলের সদস্যদের। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেসব মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে এই হাসপাতালে। বিশপের এ-রকম আরও বত্রিশজন সম্ভাব্য শিকারের খোঁজ পাওয়া গেছে। এদের স্বামী বা স্ত্রী অথবা সন্তানদেরকে ধরা হয়নি সে-গণনায়। হাসপাতালে এখন এত বেশি লোকের সমাবেশ ঘটেছে যে, অস্থায়ী “আশ্রয়-শিবির”-এর পরিধি ক্যাফেটেরিয়া থেকে বাড়াতে বাধ্য হয়েছে ক্লেয়ার। ওই ক্যাফে-সংলগ্ন দুটো এম্প্লয়ি লাউঞ্জও এখন ওর দখলে। এই মুহূর্তে সেখানেই আছে সে। বিশপের সম্ভাব্য শিকারদের বেশ বড় একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, শান্ত রাখার চেষ্টা করছে মানুষগুলোকে। সংগঠিত রাখার চেষ্টা করছে ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসারদেরও। ফাঁকেফোকরে এর-ওর সঙ্গে কথা বলছে, এটা-সেটা জানার চেষ্টা করছে।

পুলিশ যাদেরকে নিয়ে এসেছে এখানে, তাদের বেশিরভাগই জানে না, কাজটা করা হয়েছে কেন। ক্লেয়ার যা জানতে পারল তা হলো, এসব মানুষের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন নাম শুনে চিনতে পেরেছে আপচার্টকে। ওই লোকের অবস্থা যত ভয়াবহই হোক না কেন, অসুখটা অস্বাভাবিক কিছু না। কোনো একজন মানুষকে যদি প্রতিটা দিন লড়াই করে যেতে হয় মৃত্যুর বিরুদ্ধে, তা হলে মৃত্যুকে কী করে ভুলে থাকা যায়, সেটা শিখে ফেলে সে। প্রকোষ্ঠাবদ্ধ করে ফেলা বলতে যা বোঝায়, মৃত্যুকে সে-রকম এক উপায়ে আটকে ফেলে সে।

ঘুম ভেঙে গেছে কেটি কুইগলির। সমানে কথা বলছে এখন। ওই মেয়েকে, বলা ভালো, ওই মেয়ে দুটোকে কীসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সে-কথা ক্লোজকে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছিল ক্লেয়ার। ক্লোজ যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, শুনতে চায়নি।

মিনিট বিশেক আগে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করা হয়েছে ল্যারিসা বিয়েলকে। এই মুহূর্তে রিকভারি সেকশনে আছে সে, সঙ্গে আছে ওর বাবা। ওর জ্ঞান ফিরলে ওকে একটা ডাবল রুমে বদলি করে দেয়া হবে। সেখানে মায়ের সঙ্গে

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৬০৪



অরাজকতা



থাকতে পারবে মেয়েটা। জ্ঞান ফিরেছে ওই মহিলারও। আশা করা হচ্ছে, দু'জনই সেরে উঠবে পুরোপুরি।

কফির কাপ দুটো নামিয়ে রাখল ক্লোজ। আঙুল ফোটাল।

এবার শোকসংবাদগুলো শেষবারের মতো ঘাঁটাঘাঁটি করবে সে। তারপর ইতি টানবে কাজটার।

বিছানাটা যেন নিঃশব্দে ডেকেই চলেছে ওকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়ে চাদর টেনে দিয়ে সুখনিদ্রায় হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে ওর।

ক্লোজের ল্যাপটপের স্ক্রিনের এককোণায়, থেকে থেকে জ্বলছে-নিভছে লাল রঙের ছোট্ট একটা বাক্স।

ওটার গায়ে ক্লিক করল সে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটা অ্যালার্ট মেসেজ।

‘ধেং!’

অসংখ্য কাগজ যেন ঘিরে রেখেছে ওর কম্পিউটারকে; সেসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল সে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে। কাজটা করতে গিয়ে আরেকটু হলে উল্টে ফেলে দিয়েছিল কফির একটা কাপ। চট করে তুলে নিল নিজের ফোন, স্পিড ডায়ালের যে-বাটন বরাদ্দ করা আছে ক্লেয়ারের জন্য, চাপ দিল সেটাতে। কিন্তু কল সরাসরি চলে গেল ভয়েস মেইলে।

‘ধেং। ধেং। ধেং।’

এবার ন্যাশকে ডায়াল করল ক্লোজ।

একবার রিং হলো।

দু'বার।

তৃতীয়বার...

‘হ্যাঁ, বলো?’

‘আপনি কোথায়?’

‘আপচার্চের বাসায় আছি এখনও। এখানে মনে হয় আরও এক ঘণ্টা থাকতে হবে আমাকে। কেন?’

‘বিশপের ল্যাপটপটা ট্রেস করার জন্য বিশেষ একটা কৌশল খাটিয়েছিলাম আমরা, মনে আছে আপনার?’

‘আছে।’

‘এইমাত্র একটা অ্যালার্ট মেসেজ এসেছে আমার কম্পিউটারে।’

‘কী জানা গেছে?’

‘কাছাকাছিই কোথাও আছে বিশপ।’

‘যেখানে আছে লোকটা এখন, এই মুহূর্তে সে-ঠিকানা টেক্সট মেসেজ করে দাও আমাকে। এসপিনোজাকেও দিয়ো। এইমাত্র বেরিয়ে গেছে তার সোয়াট টিম।’

১৩০.
ক্লেয়ার
চতুর্থ দিন, রাত ৯:১৫

আর পারছে না ক্লেয়ার, আরেকটু পর গলা ফাটিয়ে চৈঁচিয়ে উঠবে সে।

এখন যে-রকম মাথাব্যথা করছে ওর, এই জীবনে সে-রকম আর কখনও হয়নি মনে হয়। মাথাব্যথার ওষুধ অ্যাড-ভিল গিলেছে তিনটা। কোনো কাজ হয়নি।

ক্যাফেটেরিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে এই মুহূর্তে। ওকে ঘিরে রেখেছে কম করে হলেও চল্লিশ কি পঞ্চাশজন মানুষ। তাদের মধ্যে আছে প্রাপ্তবয়স্করা, আছে বাচ্চাকাচ্চারা। আরও আছে মেডিকেল স্টাফরা। যে-কাগজপত্র একাট্টা করা সম্ভব হয়েছে, সেসব ঘেঁটে এই মানুষগুলোর সন্ধান বের করেছে ক্লেয়ার। বিশপ যেসব শোকসংবাদ ছাপিয়েছে অথবা ছাপানোর চেষ্টা করেছে, ঘাঁটতে হয়েছে সেসবও। এখন ওসব মানুষ হয় চৈঁচিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছে ক্লেয়ারকে, নয়তো উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

কেউই থাকতে চাইছে না এখানে।

ক্লেয়ারেরও এখন মনে হচ্ছে, এই মানুষগুলোকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে পারবে এখান থেকে, তত ভালো হবে।

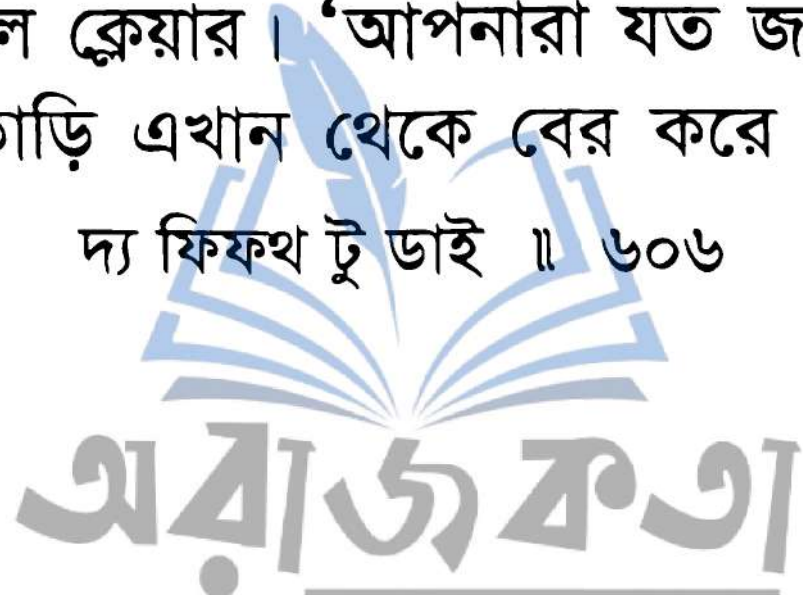
কেটি কুইগলির সঙ্গে একটা ঘণ্টা কাটিয়েছে সে। ওকে যেসব কথা বলেছে মেয়েটা, সেসব মুছে ফেলতে পারছে না মন থেকে। এইমাত্র একজন এসে ওকে বলে গেছে, জ্ঞান ফিরেছে ল্যারিসা বিয়েলের। মেয়েটার বাবা নাকি সারা হাসপাতালে খুঁজেছে ক্লেয়ারকে, কিন্তু পায়নি। মেয়েটা নাকি কথা বলতে পারছে না। ডাক্তাররা বিশ্রাম দিতে চাইছেন মেয়েটাকে, চাইছেন আপাতত কয়েকদিন যাতে কথা না বলে সে। তবে একইসঙ্গে এ-কথাও বলে দিয়েছেন, মেয়েটা চাইলে নিজের মনের কথা লিখে জানাতে পারবে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর থেকে সে-কাজই করছে মেয়েটা... লিখছে। সেসব লেখা পড়ে রীতিমতো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তার বাবা। সুতরাং ধারণা করে নেয়া যায়, ওই মেয়ের কাহিনি, কেটি যা-যা বলেছে, সেসবের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

‘আপনারা সবাই চুপ করুন! আমি চাই, আপনারা সবাই মুখটা বন্ধ করুন, প্লিজ।’

ক্লেয়ারের দিকে ঘুরে তাকাল মাত্র কয়েকটা মাথা। তারপর আবার আগেরবারের মতো বকবক করতে লাগল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রথমে সেটার ওপর, তারপর সেখান থেকে একটা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াল ক্লেয়ার। ‘আপনারা যত জলদি আমার কথা শুনবেন, আপনাদেরকে তত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের করে নেয়াটা সম্ভব হবে আমার

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৬০৬



অরাজকতা



পক্ষে।' একটা প্রশ্নমালা তৈরি করেছে সে, মাথার ওপর তুলে নাচাল সেনন কাগজ। 'আপনাদের সবাইকে একটা করে এই প্রশ্নমালা দিয়েছিলাম আমি। আপনারা যাঁরা এটা জমা দেননি, অথবা যাঁরা এখনও উত্তর লিখে শেষ করতে পারেননি, তাঁদেরকে কাজটা করার অনুরোধ করছি। লেখা শেষ হলে কাগজটা দিয়ে দিন যে-কোনো একজন পুলিশ অফিসারের কাছে।'

ক্লেয়ারের থেকে ফুট পাঁচেক দূরে থাকা ছোট একটা মেয়ে চেষ্টা করে উঠল গলা ফাটিয়ে। এবং সেটা করল কোনো কারণ ছাড়াই। চেষ্টাটা থামানোর জন্য মেয়েটার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরল তার মা, দোল দিতে লাগল মেয়েটাকে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ তেমন কিছুই হলো না।

চোখের কোনা দিয়ে ক্লেয়ার দেখতে পেল, ডক্টর মর্টন আবারও ঢুকছেন ক্যাফেটেরিয়ায়। ওই লোকও দেখতে পেল ক্লেয়ারকে। চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটা।

ক্লেয়ার কড়া আদেশ জারি করেছিল, এই ঘর ছেড়ে বের হতে পারবে না কেউ। কিন্তু অস্থায়ী এই নিরাপত্তামূলক হেফাজতে যে-ক'জন মেডিকেল প্রফেশনালকে হাজির করানো গেছে, তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে, ক্লেয়ার কোনো আদেশ দেয়নি, বরং পরামর্শ দিয়েছিল যেন। তাদের সবাই কম করে হলেও একবারের জন্য বাইরে আসা-যাওয়া করেছে। কেউ কেউ আবার আসা-যাওয়ার মধ্যেই আছে... কখনও বেজে উঠেছে তাদের পেজার, কখনও বেজে উঠেছে মোবাইল ফোন- হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক দেয়া হয়েছে তাদেরকে। এই ব্যাপারে আসলে করার মতো তেমন কিছু ছিল না ক্লেয়ারের। বেশিরভাগ কেসের বেলাতেই দেখা যায়, জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে হয়। তা ছাড়া এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছে ক্লেয়ারের আশপাশে, তাদের কাউকেই এখানে থাকতে বাধ্য করতে পারে না সে। সে-রকম কোনো আইনি অধিকার নেই ওর। সে মোটামুটি নিশ্চিত, কেউ কেউ চুপিসারে কেটেও পড়েছে ইতোমধ্যে, এবং তারা আর ফিরে আসবে না।

পকেটের ভেতরে আছে ওর মোবাইল ফোন, ভাইব্রেট করে উঠল সেটা।

ফোনটা বের করে নিল সে।

সারা ওয়ার্নার। কলার আইডি জানিয়ে দিচ্ছে নামটা।

ঞ্র কোঁচকাল ক্লেয়ার। এ নামে তো কাউকে চেনে না সে! যা হোক, কথা বলতে হলে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওই মেয়েমানুষটাকে।

ডিক্লাইন বাটনে চাপ দিল ক্লেয়ার, কেটে দিল লাইনটা। খেয়াল করল, ওকে ইতোমধ্যে দু'বার কল করেছিল ক্রোজ, কিন্তু দু'বারই কল রিসিভ করতে পারেনি সে।

সিদ্ধান্ত নিল, এখানকার কাজটা শেষ করে যাবে ক্রোজের সেই অস্থায়ী অফিসে।

আপচার্চের ফাইলটা নিয়ে গবেষণা করছে ক্লোজ। হতে পারে, কিছু একটা জানতে পেরেছে সে, আর তাই যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল। শিকাগো মেট্রো পুলিশের ল্যাবও অলস বলে নেই, কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আপেলের ভেতর থেকে যে-সুঁই বেরিয়ে ছিল, সেটার গা থেকে কিছু একটা পাওয়া গেছে। ক্লেয়ারের সঙ্গে যদি কোনো কারণে যোগাযোগ করতে না পারে ল্যাবের লোকেরা, তা হলে কী ফল পাওয়া গেল, জানিয়ে দেয়ার কথা ক্লোজকে।

আবারও বেজে উঠল ক্লেয়ারের ফোনটা।

সারা ওয়ানার।

এবার অ্যাসার বাটনে চাপ দিল ক্লেয়ার। ফোন ঠেকাল কানে। খালি হাত দিয়ে ঢেকে ফেলেছে অন্য কান। ‘ডিটেকটিভ নর্টন বলছি!’

আশ্চর্য, অপর প্রান্তে কথা বলছে একজন পুরুষমানুষ। তবে কী বলছে, এত হইচইয়ের কারণে ঠাহর করতে পারল না ক্লেয়ার। সত্যিই, বড় বেশি গুণ্গোল চলছে এখানে। ‘একটু ধরুন তো,’ বলল ক্লেয়ার অপর প্রান্তের লোকটাকে, ‘একটা মুহূর্ত সময় দিন আমাকে।’

নামল টেবিল থেকে। মানুষের ভিড় ঠেলে হাঁটাচলার পথ করে নিল নিজের জন্য। বেরিয়ে এল হলওয়াতে। এলিভেটরের কাছে পৌঁছানোর পর চেষ্টা করল আবার। ‘দুঃখিত, আমি ডিটেকটিভ নর্টন বলছি। কী করতে পারি আপনার জন্য?’

‘পল আপচার্চ নামের কেউ কি আছে তোমাদের কাছে?’

‘আপনি কে বলছেন?’

‘আমি, ক্লেয়ার।’

‘স্যাম?’

‘হ্যাঁ।’

ঘুরে তাকাল ক্লেয়ার। দেখতে পেল, ক্যাফেটেরিয়া পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে পুলিশের যে-ক’জন অফিসার, তাদের একজন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হলওয়াে ধরে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেল সে, দূরে সরে গেল ওই অফিসারের কাছ থেকে। একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল, উল্টো ঘুরে আছে অফিসারটার দিকে। ‘আপনি কোথায়?’

‘আমি... আমি ভেবেছিলাম, ওই লোক কোনো এক জায়গায় বোমা পুঁতে রেখেছে। আসলে আমাকে এই কথা ভাবতে বাধ্য করেছে লোকটা। কিন্তু কোথাও কোনো বোমা নেই...’

‘স্যাম, আপনার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। কার ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি? আপচার্চ? তাকে তো পাকড়াও করে ফেলেছি আমরা। এবং সে যে কোথাও কোনো বোমা পুঁতে রেখেছে, এ-রকম কোনো তথ্য নেই আমাদের কাছে।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৬০৮



অরাজকতা



‘ওই মেয়ে দুটোকে কি উদ্ধার করতে পেরেছ তোমরা? ল্যারিসা বিয়েল এবং অন্য মেয়েটা?’

‘হ্যাঁ, স্যাম। এখন নিরাপদেই আছে ওরা। দু’জনই। ডাক্তাররা বলেছেন, সেরে উঠবে ওরা।’

কোথাও কিছু একটা গুণ্ণগোল আছে।

ক্লেয়ারের কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে পোর্টারের কথাবার্তা।

‘স্যাম, ল্যারিসা বিয়েলের ব্যাপারে আপনি জানতে পারলেন কী করে? আপনি চলে যাওয়ার পর গায়েব হয়ে গিয়েছিল ওই মেয়ে। আর কুইগলির ব্যাপারে এখনও কাউকে কিছু বলিনি আমরা। আপনি কি ন্যাশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন? নাকি কথা বলেছেন সেই এফবিআই এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক পুলের সঙ্গে?’

‘ওহ, ক্লেয়ার। আমি সাংঘাতিক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে আমার ভেতরে।’

‘হচ্ছেটা কী, স্যাম? কথা বলুন আমার সঙ্গে।’

লম্বা করে দম নিল পোর্টার। ‘পল আপচার্ট কি বেঁচে আছে এখনও?’

‘হ্যাঁ। এসপিনোজার দল ওই লোককে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে, কোনো রকম ঘটনা-দুর্ঘটনা ছাড়াই। ন্যাশ বলেছে, পুরো ব্যাপারটা দেখে মনে হয়েছে, ওই লোক যেন অপেক্ষা করছিল এসপিনোজার দলটার জন্য। ধরা পড়ার সময় কোনো রকম বাধা দেয়নি সে, কোনো রকম ধস্তাধস্তি করেনি। যা ঘটেছে, শান্তিপূর্ণভাবেই ঘটেছে। তবে মেট্রো পুলিশ অফিসে নিয়ে আসার সময় গাড়িতে খিঁচুনি উঠেছিল লোকটার। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। তাই তাকে শেষপর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে এই স্ট্রজার হাসপাতালে। এখন অপারেশন চলছে তার। মস্তিষ্কে ক্যানসার হয়েছে লোকটার। চতুর্থ দশা চলছে। দেখে খুব একটা ভালো ঠেকছে না তার অবস্থা।’

‘গ্লায়োর্যাস্টোমা। ওই লোকের যে-অসুখ হয়েছে, সেটার নাম গ্লায়োর্যাস্টোমা,’ কোমল গলায় বলল পোর্টার।

‘আপনি কীভাবে জানতে পারলেন এই খবর? ওই লোকের নামটাই বা জানতে পারলেন কী করে? আপনি কার সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন এসব?’

লাইনের ও-প্রান্তে নীরবতা।

‘স্যাম?’

‘মেয়ে দুটো কোথায়?’

‘এই হাসপাতালেই আছে।’

‘ঈশ্বর।’

‘স্যাম? কী হয়েছে?’

লম্বা করে আবারও দম নিল পোর্টার। ‘ওই মেয়ে দুটোকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। আবারও বলছি, সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে মেয়ে দুটোকে। তাদের সংস্পর্শে যে বা যারা এসেছে, আলাদা করে

ফেলতে হবে তাদেরকেও। এবং এদের কাউকে কোনোখানে চলে যেতে দেয়া যাবে না।’

‘কেন?’

আবারও নীরবতা।

‘স্যাম, আপনি কিন্তু আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।’

‘বিশপ একটা কথা বলেছে আমাকে। বলেছে, ইনজেকশনের মাধ্যমে সার্স ভাইরাসের (SARS virus) একটা কনসেনট্রেটেড ভার্শন ঢুকিয়ে দিয়েছে সে ওই মেয়ে দুটোর শরীরে। ওই ভাইরাস কোথেকে জোগাড় করে নিয়েছে সে, সেটাও বলেছে আমাকে। এবং ওর কথা বিশ্বাস করেছি আমি। আরও বলেছে, ওই হাসপাতালে নাকি তোমার জন্য একটা নমুনা রেখে দিয়েছে সে, যাতে নিশ্চিত হতে পারো তুমি। আরও একটা কথা বলতে বলেছে তোমাকে... “এই ব্যাপারটা স্লো হোয়াইটও ভালো জানত না।” বলো তো, বিশেষ ওই লাইন শুনে কিছু কি বুঝতে পারলে?’

‘আমরা একটা আপেল খুঁজে পেয়েছি। সেটার ভেতরে গেঁথে রাখা হয়েছিল একটা সিরিঞ্জ,’ পোর্টারকে বলল ক্লেয়ার। বলার সময় খেয়াল করল, শব্দগুলো কেমন যেন আটকে আটকে যাচ্ছে ওর গলায়। ‘পল আপচার্চের যে-ফাইল পাওয়া গেছে, সেটার ওপর রাখা ছিল ওই আপেল।’

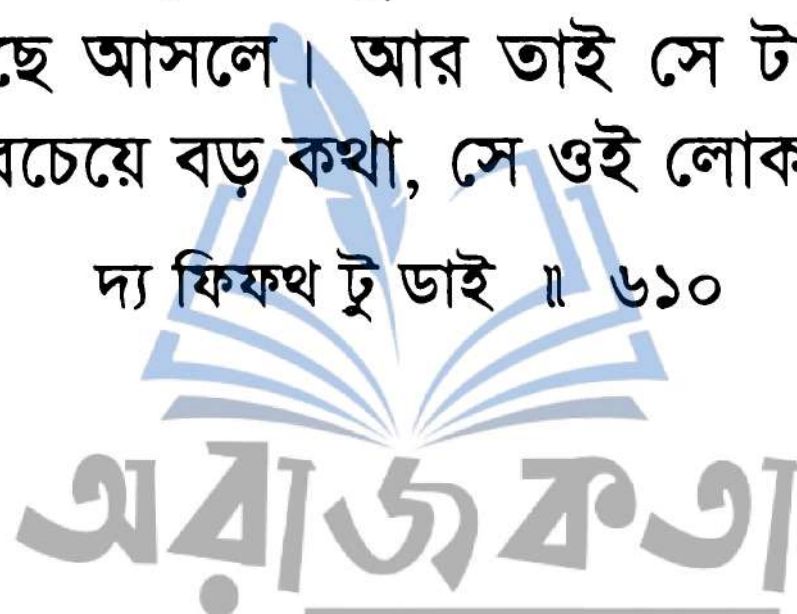
‘ক্লেয়ার, কিছু কথা বলি তোমাকে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। একটা নাম বলবো তোমাকে। তুমি প্রস্তুত তো?’

না।

জবাবটা মনে মনে দিল ক্লেয়ার। মুখে বলল, ‘বলতে থাকুন।’

‘ডক্টর রায়ান বেয়ার। তিনি জন হপকিন্স হাসপাতালের একজন নিউরোসার্জন। ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি নামের কোনো একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তিনি। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে তা হলো, বিশেষ এই চিকিৎসাব্যবস্থা কাজে লাগতে পারে আপচার্চের। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, লোকটা যে-বীমা করে রেখেছে, সেটার আওতায় নেই ওই চিকিৎসাপদ্ধতি। অথচ ওই পদ্ধতি কিন্তু আপচার্চের মতো রোগীদের বেলায় দারুণ কার্যকরী। সমস্যা একটাই... এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়েই রয়ে গেছে পদ্ধতিটা। বিশপের বিশ্বাস, ডাক্তাররা এ-পর্যন্ত যা-যা করেছেন আপচার্চের জন্য, সব ফালতু... সময়ের অপচয় করেছেন তাঁরা আসলে। তার ধারণা, আপচার্চের চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত সবাই আসলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে লোকটাকে। এখানে সবাই বলতে বোঝানো হচ্ছে ডাক্তারদের কথা, নার্সদের কথা, বীমা-প্রতিনিধি এবং ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের কথা। তার বিশ্বাস, এই পুরো চিকিৎসা-ব্যবস্থার মাধ্যমে আপচার্চকে ধীরে ধীরে খুন করা হয়েছে আসলে। আর তাই সে টার্গেট করেছে ওই ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সবাইকে। সবচেয়ে বড় কথা, সে ওই লোককে মরতে দিতে চায় না।’

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৬১০



অরাজকতা



‘আপনি এত কথা জানতে পারলেন কীভাবে?’

‘তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করে লাইন কেটে দেয়া মাত্র তুমি যা করবে তা হলো, খুঁজে বের করবে কোথায় আছেন ডক্টর বেয়ার। তাঁকে নিয়ে যাবে আপচার্চের কাছে। বিশপ বলেছে...’

কিছুটা যেন ভেঙে গেল পোর্টারের কণ্ঠ, কিছুক্ষণ পর শোনা গেল আবার। ‘বিশপ বলেছে, তার কাছে ওই ভাইরাস আরও আছে। যদি আপচার্চ মারা যায়, তা হলে এই শহরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে সে, এখানকার যাকে ইচ্ছা তার গায়ে ইনজেক্ট করে দেবে ওই ভাইরাস। সুতরাং খুঁজে বের করো ওই ডাক্তারকে। আর ওই মেয়ে দুটোর সংস্পর্শে যে বা যারা গিয়েছে, আলাদা করে ফেলো তাদেরকে। আমার কথামতো কাজ করা দরকার তোমার, নইলে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে পারে ভাইরাসটা।’

‘আপনি কি এখন বিশপের সঙ্গেই আছেন?’

‘আমাকে এবার যেতে হবে, ক্লেয়ার। দুঃখিত। বিশ্বাস করো, সবকিছুর জন্য আমি দুঃখিত।’

লাইন কেটে দিল পোর্টার। মনে হলো, ও-প্রান্তটা যেন মরে গেল ছুট করেই।

ক্যাফেটেরিয়ার সমস্ত আওয়াজ, সমস্ত কণ্ঠ যেন এতক্ষণ পর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লেয়ারের ওপর। মনে হলো, ত্রুদ্র বেশকিছু কণ্ঠ ক্যাফেটেরিয়া পার হয়ে হাজির হয়ে গেল হলওয়াতে... ওসব কণ্ঠের মালিকদের আটকে রাখার দায়িত্বে আছে পুলিশের যেসব অফিসার, তাদেরকে ছাড়িয়ে চলে এল ক্লেয়ারের কাছে।

হাতেধরা প্রশ্নমালার-কাগজগুলোর দিকে তাকাল ক্লেয়ার। কেটি কুইগলির সংস্পর্শে এক ঘণ্টারও বেশি সময় কাটিয়ে দেয়ার পর, ওই ক্যাফেটেরিয়ায় উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে একটা করে প্রশ্নমালা ধরিয়ে দিয়েছিল সে নিজে।

ওর আঙুলের ফাঁক গলে পিছলে গেল কাগজগুলো। শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

টের পেল, অদ্ভুত একটা ব্যথা যেন পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর সারা শরীরে... ওর হাড়গুলোর গভীর থেকে আরও গভীরে।

জোরে হাঁচি দিয়ে উঠল সে।

১৩১.
ন্যাশ
চতুর্থ দিন, রাত ৯:৪৩

একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় মাথার ওপর তুলে ধরেছে এসপিনোজা। ওই হাতের আঙুলগুলো একে একে খুলছে— নীরবে গুনছে পাঁচ থেকে এক পর্যন্ত...

চার

তিন

দুই

এক

দরজার গায়ে ব্যাটারিং র‍্যাম নিয়ে আছড়ে পড়ল ব্রোগান। দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ফাটল ধরেছে দরজার ভারী কাঠে, মাঝামাঝি জায়গায় ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেছে সেটা।

‘যাও!’

‘যাও!’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ন্যাশ, সোয়াট টিমের সদস্যরা একে একে ঢুকে পড়ছে গায়োন হোটেলের রুম নম্বর ৪০৫-এর ভেতরে। শেষপর্যন্ত জীর্ণশীর্ণ হলওয়াতে একাই রয়ে গেল সে। লবিতে একটা লাশ পেয়েছে ওরা। একজন মহিলা মানুষ, পরনে কয়েদিদের জাম্পসুট, পায়ে শেকল। কপালে একটা বুলেটের মৃত্যুচুম্বন আঁকা।

বিশেষ সেই সিগনাল ট্রেস করতে করতে এই হোটেলের খোঁজ পেয়ে যায় ক্লোজ। এসপিনোজা তখন বিশেষ একজাতের যন্ত্র ব্যবহার করে এই বিল্ডিংয়ের একমাত্র ইলেকট্রিকাল সিগনাল কোথেকে আসছে, নির্ণয় করে ফেলে... রুম নম্বর ৪০৫ থেকে।

‘হাত ওপরে তুলে ফেলো!’

‘একটুও নড়বে না!’

‘ওই লোকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে!’

কোনটা কার কণ্ঠ, নিশ্চিত না ন্যাশ। খোলা দরজা দিয়ে আসা এবং ইয়ারপিসে শোনা কণ্ঠগুলো যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে একটা আরেকটাকে।

কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল আবার। দ্বিতীয় আরেকটা দরজা আছে নাকি?

‘ন্যাশ! এখানে আসুন। এখনই!’

হলওয়াতে পার হয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল ন্যাশ। বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা এঁটে বসেছে ওর শরীরে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, হাজির হলো রুম নম্বর ৪০৫-এ। এই ঘরে বারোটা কিংবা তারও বেশি মোমবাতি জ্বলছে। সোয়াট টিমের সদস্যদের আধ ডজন অ্যাসল্ট রাইফেলের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মিও দেখা যাচ্ছে। সব অস্ত্র তাক করা আছে একই জায়গায়।

একজন পুরুষমানুষ।

তার পিঠটা দরজার দিকে। দু'হাত মাথার ওপর তুলে ফেলেছে সে। লোকটার সামনে একটা অ্যান্টিক ডেস্ক, সেটার ওপর চালু অবস্থায় রাখা আছে একটা ল্যাপটপ। আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওটার স্ক্রিন থেকে। কম্পিউটারের পাশে স্তূপ করে রাখা আছে একডজন কিংবা তারও বেশি সাদা-কালো কম্পোজিশন নোটবুক। সেগুলোর একপাশে যেন আলগোছে রেখে দেয়া হয়েছে একটা .৩৮ পিস্তল।

‘স্যাম?’

চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই ঘুরে তাকাতে আরম্ভ করল পোর্টার।

‘না...’ চিৎকার করে উঠল টিবিডো।

‘সরুন আপনারা!’ এবার গলা ফাটাল ন্যাশ। ‘স্যাম? তুমি কী করছ এখানে?’

ডেস্কের একটা কিনারার দিকে তাকাল পোর্টার। তারপর চোখ বুজে ফেলল।

এসপিনোজা আর টমাস দু'জনই তাদের রাইফেল তাক করে রেখেছে দেয়াল বরাবর। দেয়ালের গায়ে সাঁটানো আছে ফুলের ওয়ালপেপার, মলিন আর জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে; ওসব বেয়ে বেয়ে যেন ওপরের দিকে উঠছে ওই দু'জনের রাইফেলের ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি। এই ঘরে ফ্রেমে বাঁধাই করা অবস্থায় আছে কিছু ছবি, সেগুলোর ওপরও থেকে থেকে গিয়ে পড়ছে আলোটা।

ওই আলো অনুসরণ করে আগে বাড়ল ন্যাশ। মনোযোগ একটা ফ্রেমের বিশেষ একটা ছবির ওপর।

ছবিটা স্যামের। ওই ছবিতে ওর বয়স এখনকার চেয়ে অনেক কম। চল্লিশের ঘরে হবে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে একটা ছেলেও। ছেলেটার বয়স চোদ্দ কি বেশি হলে পনেরো।

জ্র কুঁচকে গেছে এসপিনোজার। ‘ওটা...?’

‘আমার মনে হয় ছবির ওই ছেলেই অ্যানসন বিশপ,’ বলল ন্যাশ, কণ্ঠ নিচু। আরও দুটো ছবির দিকে তাকাল। ‘এখানকার সব ছবিতেই দেখা যাচ্ছে বিশপকে।’

ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে এল ন্যাশ, এগিয়ে গেছে পোর্টারের দিকে। ‘স্যাম? এসব কী?’

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল স্যাম, কিন্তু একটা কোনো শব্দ বেরিয়ে এল না ওর মুখ দিয়ে।

চলন্ত ল্যাপটপের স্ক্রিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে পোর্টারের চেহারা।
সে-স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বিশেষ একটা লেখা:

হ্যালো স্যাম,
আমার মনে হয় আপনি দ্বিধায় পড়ে গেছেন।
আমার ধারণা, আপনার মনে কিছু প্রশ্ন আছে।



পুলিশ স্টেশনটা কোথায়, জানা নেই আমার।

আমি এমনকী এ-ও জানি না, ক্যামডেন ট্রিটমেন্ট সেন্টারটা কোথায় অবস্থিত। গত কয়েকটা সপ্তাহ ঠিক কোথায় কাটিয়েছি আমি, সে-ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই আমার।

শুধু যা জানি তা হলো, গাড়িতে সওয়ার হয়ে লম্বা একটা সময় ধরে চলতে হয়েছিল আমাদেরকে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আমি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, জানালার বাইরে দিয়ে যেন দ্রুত গতিতে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে চার্লসটন শহরের কিছু খণ্ড চিত্র। এই শহরের কোনো বিল্ডিংই বেশি উঁচু না। বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, যঁারা শহরের ভাগ্যবিধাতা, তাঁরা নাকি চান না, এখানকার দালানকোঠা মাথা উঁচু করে চলে যাক আকাশটার কাছাকাছি কোথাও।

ডাক্তার অগলেসবির ওপর প্রাণঘাতী কোনো আঘাত হানতে ইচ্ছে করছে আমার।

টের পাচ্ছি, একটা ক্রোধ যেন পাক খেয়ে খেয়ে বেড়ে উঠছে আমার ভেতরে। টের পাচ্ছি, আজ পর্যন্ত যেসব ক্রোধ নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে আমার ভেতরে, তাদের মধ্যে ওই ক্রোধই সবচেয়ে ভয়ানক। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন ওটা চাপা দিয়ে রাখতে পারছি আমি। সময়ের মতো ক্রোধকেও অবদমিত করে রাখা সম্ভব। বোতলে ভরে রাখা সম্ভব, গুদামে ভরে রাখা সম্ভব। এবং যখন সবচেয়ে বেশি দরকার, তখন সেই বোতল খুলে ফেলাটাও সম্ভব।

সময় যখন সঞ্জ দেবে আমাকে, আমি নিশ্চয়ই সেই বোতল খুলবো। তখন ফটাস করে আওয়াজ তুলে বোতলের মুখ থেকে আলগা হয়ে যাবে কৰ্কটা।

দুই ডিটেকটিভের কেউই কোনো কথা বলছে না।

ভেবেছিলাম, প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ করে ফেলা হবে আমাকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমার সঞ্জো এখন পর্যন্ত একটা কোনো কথা বলেনি ওই দু'জনের কেউ। এমনকী কথা বলেনি নিজেদের মধ্যেও।

আমিও আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাইনি। বরং সুযোগ দিয়েছি নীরবতাকে... একসময় মুখ খুলবে সে-ই।

দ্য ফিফথ টু ডাই ॥ ৬১৫

বাইরের পৃথিবীর কথা যদি বলি... কোথায় আছি এখন, কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। পুরো শহর আমার জন্য অচেনা।

রিয়ারভিউমিররে আমার দিকে একবারের বেশি তাকিয়েছে ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান। সেখানে তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে আমার।

শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা একসময়, হাজির হলাম দুই লেনের একটা রাস্তায়, এগোলাম মিনিট ত্রিশেক। তারপর নেমে পড়লাম সে-রাস্তা থেকেও। এবার হাজির হলাম নুড়িপাথরে ছাওয়া একটা রাস্তায়। দু'ধারে বড় বড় নলখাগড়ার ঝোপ।

পুলিশ স্টেশনে যে থামিনি আমরা, সে-ব্যাপারে চিন্তার ভাঁজ পড়ার কথা ছিল আমার কপালে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটেনি। দুশ্চিন্তাকে আমার ওপর সওয়ার হতে দিইনি আমি।

নুড়িপাথরে ছাওয়া যে-রাস্তার কথা বললাম একটু আগে, সেটা যখন ফুরিয়ে গেল, তখন খেয়াল করলাম, বেশ বড় একটা ফার্মহাউসের সামনে থেমেছে আমাদের গাড়ি। মায়ের সমান বয়সী একটা মহিলা দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে, হাত নাড়ছে। গাড়ির দিকে এগিয়ে এল মহিলা। মাথার বাদামি চুল ছোট করে কাটিয়ে রেখেছে সে। সাদা ফুটকিওয়ালা হলুদ একটা জামা পরে আছে।

রিয়ারভিউমিররে আরও একবার আমাকে দেখে নিল ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান। তারপর তার পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে।

এই গাড়ির পেছনদিকে যে-দুটো দরজা আছে, কোনোটাতেই কোনো হাতল নেই। আমার হাতে যদি হ্যান্ডকাফ না-ও পরানো থাকত, নিজে নিজে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারতাম না।

ওই মহিলার দিকে এগিয়ে গেছে দুই ডিটেকটিভ। তারা তিনজন কী যেন বলাবলি করছে। তাদের কথাবার্তা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তবে সেই আলোচনার বিষয়বস্তু যে আমি, ঠাহর করে নিতে পারলাম। কারণ সময়ে সময়ে গাড়ির দিকে তাকাচ্ছে তারা, আমার দিকে তাকাচ্ছে।

ডিটেকটিভ স্টকস শেষপর্যন্ত এগিয়ে এসে গাড়ির পেছনদিকের একটা দরজা খুলে দিল, আমাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল। ওয়েন্ডারম্যান তখনও দাঁড়িয়ে আছে ওই মহিলার পাশে।

চেপে রাখা দম মৃদু আওয়াজ তুলে ছাড়ল মহিলা। ‘আহা রে, হাতকড়ার কি কোনো দরকার ছিল?’



লাল হয়ে গেল ডিটেকটিভ স্টকসের চেহারা। ‘এই ছোকরা, ঘোরো।’

হ্যান্ডকাফ খুলে দিল সে।

কজি দুটো ডলতে লাগলাম আমি।

গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলল ওয়েন্ডারম্যান। বের করল সবুজ রঙের একটা ডুফেল ব্যাগ। ওই মহিলার হাতে ধরিয়ে দিল ব্যাগটা। ‘হাসপাতাল থেকে কিছু কাপড় দিয়ে দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু দিতে পারেনি তারা... এই ছোকরার আকারের সঙ্গে মেনে এমন কিছু বেশি ছিলও না তাদের কাছে। ওই আঙনে সবকিছু হারিয়েছে ছোকরাটা।’

আমার দিকে এগিয়ে এল মহিলা। আমার মুখোমুখি দাঁড়াল, মুখে হাসি। ‘অ্যানসন, আমার নাম মিস ফিনিকি। তুমি আগামী কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকবে।’

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে কোনো এক জায়গার দিকে তাকাল মহিলা। উঁচু গলায় ডাকল, ‘পল? এখানে এসো। তোমার নতুন রুমমেটের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাও।’

পল যে দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে, খেয়ালই করিনি। পোর্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। বেশ লম্বা। দুবলাপাতলা শরীর। মাথার ওপর একটু একটু করে চড়ছে সূর্য, একটামাত্র ছায়া আড়াল করে রেখেছে রোদটাকে, সে-ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওই ছেলে। নুড়িপাথরের ওপর শব্দ তুলে দ্রুত এগিয়ে এল সে, মহিলার হাত থেকে ব্যাগটা নিল। খালি হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। ‘হাই, অ্যানসন। আমি পল আপচার্চ। এখানে ভালো লাগবে তোমার।’

কথাটা শোনামাত্র জোর খাটিয়ে হাসি চাপল ডিটেকটিভ স্টকস।

সবু হলো ওই মহিলার চোখ। তারপর হাসিটা আবারও ফিরে এল তার চেহায়ায়। ‘পল, অ্যানসনকে ওপরতলায় নিয়ে যাও। ওর নতুন ঘরটা দেখাও ওকে।’

‘জি, ম্যা’ম।’

‘অ্যানসন?’ ডাক দিল ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান।

মুখ তুলে তাকালাম ওই লোকের দিকে। চোখমুখ কেমন যেন কুঁচকে রেখেছে সে।

‘তুমি কী কাণ্ডটা করেছ, ভালোমতোই জানা আছে আমাদের। আমরা সবাই জানি সেটা। এবং সেটা প্রমাণ করতে বেশি সময় লাগবে না আমাদের। শুধু কয়েকটা টুকরো জোড়া দিতে হবে

বাইরের পৃথিবীর কথা যদি বলি... কোথায় আছি এখন, কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। পুরো শহর আমার জন্য অচেনা।

রিয়ারভিউমিররে আমার দিকে একবারের বেশি তাকিয়েছে ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান। সেখানে তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে আমার।

শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা একসময়, হাজির হলাম দুই লেনের একটা রাস্তায়, এগোলাম মিনিট ত্রিশেক। তারপর নেমে পড়লাম সে-রাস্তা থেকেও। এবার হাজির হলাম নুড়িপাথরে ছাওয়া একটা রাস্তায়। দু'ধারে বড় বড় নলখাগড়ার ঝোপ।

পুলিশ স্টেশনে যে থামিনি আমরা, সে-ব্যাপারে চিন্তার ভাঁজ পড়ার কথা ছিল আমার কপালে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটেনি। দুশ্চিন্তাকে আমার ওপর সওয়ার হতে দিইনি আমি।

নুড়িপাথরে ছাওয়া যে-রাস্তার কথা বললাম একটু আগে, সেটা যখন ফুরিয়ে গেল, তখন খেয়াল করলাম, বেশ বড় একটা ফার্মহাউসের সামনে থেমেছে আমাদের গাড়ি। মায়ের সমান বয়সী একটা মহিলা দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে, হাত নাড়ছে। গাড়ির দিকে এগিয়ে এল মহিলা। মাথার বাদামি চুল ছোট করে কাটিয়ে রেখেছে সে। সাদা ফুটকিওয়ালা হলুদ একটা জামা পরে আছে।

রিয়ারভিউমিররে আরও একবার আমাকে দেখে নিল ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান। তারপর তার পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে।

এই গাড়ির পেছনদিকে যে-দুটো দরজা আছে, কোনোটাতেই কোনো হাতল নেই। আমার হাতে যদি হ্যান্ডকাফ না-ও পরানো থাকত, নিজে নিজে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারতাম না।

ওই মহিলার দিকে এগিয়ে গেছে দুই ডিটেকটিভ। তারা তিনজন কী যেন বলাবলি করছে। তাদের কথাবার্তা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তবে সেই আলোচনার বিষয়বস্তু যে আমি, ঠাহর করে নিতে পারলাম। কারণ সময়ে সময়ে গাড়ির দিকে তাকাচ্ছে তারা, আমার দিকে তাকাচ্ছে।

ডিটেকটিভ স্টকস শেষপর্যন্ত এগিয়ে এসে গাড়ির পেছনদিকের একটা দরজা খুলে দিল, আমাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল। ওয়েন্ডারম্যান তখনও দাঁড়িয়ে আছে ওই মহিলার পাশে।

চেপে রাখা দম মৃদু আওয়াজ তুলে ছাড়ল মহিলা। ‘আহা রে, হাতকড়ার কি কোনো দরকার ছিল?’

লাল হয়ে গেল ডিটেকটিভ স্টকসের চেহারা। ‘এই ছোকরা, ঘোরো।’

হ্যান্ডকাফ খুলে দিল সে।

কর্জি দুটো ডলতে লাগলাম আমি।

গাড়ির ট্রান্স খুলল ওয়েন্ডারম্যান। বের করল সবুজ রঙের একটা ডুফেল ব্যাগ। ওই মহিলার হাতে ধরিয়ে দিল ব্যাগটা। ‘হাসপাতাল থেকে কিছু কাপড় দিয়ে দেয়া হয়েছে। বেশি কিছু দিতে পারেনি তারা... এই ছোকরার আকারের সঙ্গে মেলে এমন কিছু বেশি ছিলও না তাদের কাছে। ওই আগুনে সবকিছু হারিয়েছে ছোকরাটা।’

আমার দিকে এগিয়ে এল মহিলা। আমার মুখোমুখি দাঁড়াল, মুখে হাসি। ‘অ্যানসন, আমার নাম মিস ফির্নিকি। তুমি আগামী কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকবে।’

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে কোনো এক জায়গার দিকে তাকাল মহিলা। উঁচু গলায় ডাকল, ‘পল? এখানে এসো। তোমার নতুন রুমমেটের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাও।’

পল যে দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে, খেয়ালই করিনি। পোর্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। বেশ লম্বা। দুবলাপাতলা শরীর। মাথার ওপর একটু একটু করে চড়ছে সূর্য, একটামাত্র ছায়া আড়াল করে রেখেছে রোদটাকে, সে-ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওই ছেলে। নুড়িপাথরের ওপর শব্দ তুলে দ্রুত এগিয়ে এল সে, মহিলার হাত থেকে ব্যাগটা নিল। খালি হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। ‘হাই, অ্যানসন। আমি পল আপচার্চ। এখানে ভালো লাগবে তোমার।’

কথাটা শোনামাত্র জোর খাটিয়ে হাসি চাপল ডিটেকটিভ স্টকস।

সবু হলো ওই মহিলার চোখ। তারপর হাসিটা আবারও ফিরে এল তার চেহারায়। ‘পল, অ্যানসনকে ওপরতলায় নিয়ে যাও। ওর নতুন ঘরটা দেখাও ওকে।’

‘জি, ম্যা’ম।’

‘অ্যানসন?’ ডাক দিল ডিটেকটিভ ওয়েন্ডারম্যান।

মুখ তুলে তাকালাম ওই লোকের দিকে। চোখমুখ কেমন যেন কুঁচকে রেখেছে সে।

‘তুমি কী কাণ্ডটা করেছ, ভালোমতোই জানা আছে আমাদের। আমরা সবাই জানি সেটা। এবং সেটা প্রমাণ করতে বেশি সময় লাগবে না আমাদের। শুধু কয়েকটা টুকরো জোড়া দিতে হবে

জায়গামতো। ওই ব্যাগ থেকে তোমার জামাকাপড় বের করে নিয়ো, দ্বিধা কোরো না। তবে একটা কথা মনে রেখো... তোমাকে ধারে দেয়া হয়েছে ওসব। আজ বাদে আগামীকাল নতুন কাপড় পাবে তুমি। নতুন একটা ঘরও পাবে। এবং সেখানে নতুন কোনো রুমমেট থাকবে তোমার।’

হাসলাম ওই লোকের উদ্দেশে। হাসলাম ডিটেকটিভ স্টকসের উদ্দেশেও। ‘আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন আপনারা, সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদের দু’জনের সঙ্গেই পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি।’

কথা আর বাড়ালাম না। অনুসরণ করতে লাগলাম পল আপচার্চকে।

ফার্মহাউসের প্রবেশমুখটা যেন হাঁ করে আছে আমাদেরকে গিলে খাওয়ার অপেক্ষায়; পলকে অনুসরণ করে সেদিকে এগিয়ে চলেছি আমি।

বাইরে থেকে দেখে এই ফার্মহাউস যতটা বড় লাগে, আসলে এটা তার চেয়ে আরও বড়। হতে পারে, এখানে অনেক ঘর আছে, এবং সেগুলোর একটাকে আরেকটার থেকে আলাদা করে রেখেছে অনেক দেয়াল, আর সে-কারণেই ও-রকম মনে হয়। আবার এমনও হতে পারে, এই বাসা যতটা না চওড়া, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত, ফলে ও-রকম দেখায়। আবার দুটো কারণই হতে পারে। কিন্তু যে-মুহূর্তে এখানে পা দিলাম আমি, মনে হলো, কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছি।

লিভিং রুমটা ছোট, সেখানে একটুখানি থামলাম। যে-হলঘর পেরিয়ে এসেছি, সেটা ছাড়িয়ে তাকালাম পেছনে, সদর দরজা দিয়ে বাইরে। আমাকে দরজাটা খোলা রাখতে বলেছিল পল।

এখনও আগের জায়গাতেই আছে দুই ডিটেকটিভ। মিস ফিনিকির সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন। বাইরের পৃথিবীটা কেমন যেন আরও উজ্জ্বল ঠেকছে আমার কাছে... কেবল ওই সদর দরজা পার হলেই হলো। এই বাসার ভেতরের বাতাসে কেমন যেন একটা আবদ্ধতার অনুভূতি কাজ করছে। কিন্তু বাতাসটা বাসি অথবা ছাতলাপড়া গন্ধযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। শুধু বদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা না ভেবে পারলাম না আমি। পেরেক ঠুকে ঠুকে যখন লাগিয়ে দেয়া হয় কোনো কফিনের ঢাকনা, তখন সেটার ভেতরে যে-বাতাস আটকা পড়ে, সেটাও কি এ-রকম বদ্ধ হয়ে যায়?

জানতে চাইলাম, ‘মিস ফিনিকির নামের প্রথম অংশটা কী?’
একধারে সিঁড়ি আছে, সেটার গোড়ায় হাজির হয়ে গিয়েছিল
পল, প্রশ্নটা শুনে থমকে দাঁড়াল। ‘কী আসে-যায় তাতে?’

‘আমার কিছু না কিছু আসে-যায়।’

কাঁধ ঝাঁকাল পল। ‘জানি না। সবাই মিস ফিনিকি বলেই
ডাকে ওই মহিলাকে। সবসময় তা-ই ডাকছে। ফিনিকি, ফিনিকি,
ফিনিকি। ফিন না। আবার মিসেস ফিনিকিও না। কেউ কেউ
ম্যা’মও বলে। গত কয়েক বছরে অন্য যেসব ছেলেপেলে এসেছে
এখানে, তাদের কেউ কেউ হয়তো আরও কিছু নামে ডেকেছে ওই
মহিলাকে। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, ওসব নাম মহিলার
মুখের ওপর উচ্চারণ করার সাহস নেই কারও।’

‘অন্য ছেলেপেলে?’

সিঁড়ি বেয়ে পাঁচ ধাপ ওপরে উঠে গিয়েছিল পল, আরও
একবার থমকতে হলো তাকে। ল্যান্ডিং হাজির হতে আর দুটো
ধাপ বাকি আছে তার। ‘তুমি কোথায় হাজির হয়েছ, সেটা
ভালোমতোই জানো, ঠিক না? তোমাকে বলা হয়েছে কথাটা, ঠিক
কি না? আবার বলা না-ও হয়ে থাকতে পারে... কখনও কখনও
কারও কারও বেলায় করা হয় কাজটা, কখনও আবার কারও
কারও বেলায় করা হয় না। ওই যে দরজাটা খোলা অবস্থায়
দেখতে পাচ্ছ... ওটা দিয়ে স্টেফ ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা
সবাই, তারপর পা টেনে টেনে এগিয়ে গিয়েছি যার যার পথে।
পুরনো পাপী বলে একটা কথা আছে না? এই বাড়ির বাসিন্দাদের
কেউ কেউ ঠিক সে-রকম। আবার কেউ কেউ এই খেলায় সম্পূর্ণ
নতুন। জঙ্গলের পাশের রাস্তা পার হতে গিয়ে কোনো কোনো
হরিণের চেহারায় ভীত একটা চাহনি দেখা যায় না... এই বুঝি
কোনো গাড়ি ছুটে এল, এই বুঝি ওই গাড়ির বাম্পারের সঙ্গে
বাড়ি লাগল... কই, তোমার চেহারায় তো সে-রকম কোনো
অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না? কাজেই ধারণা করে নিচ্ছি, তুমি
অনিভিজ্ঞ কেউ না।’

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। আমার একটা হাত ধরল। একটু
জোরেই টিপে দিল তালুটা। ‘বন্ধু, তুমি আসলে ঢুকে পড়েছ
একটা সিস্টেমের মধ্যে। অভিনন্দন! বলতে খারাপই লাগছে...
তোমার মুখে তুলে দেয়ার মতো কোনো কেক নেই এখানে।
কোনো ওয়েলকাম ওয়্যাগনও নেই। শুধু আছি আমি... আরেক
পুরনো পাপী।’ লাফিয়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছাল আবারও, এবার
সোজা গিয়ে হাজির হলো ল্যান্ডিং। চক্র দিয়ে ঘুরছে, দু’হাত

তুলে দিয়েছে ওপরের দিকে। নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলতে লাগল, ‘মানুষের মাত্রাজ্ঞান ক’টা, জানো তো? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর সময়ের পর পঞ্চম একটা মাত্রাও যে আছে, জানো নাকি? বিশেষ এই মাত্রা মহাকাশের মতো বিশাল। অন্তহীনতার মতো নিরবধি। আলো আর ছায়ার মাঝখানে যে-জমিন আছে, সেটাই এই মাত্রা। বিজ্ঞান আর কুসংস্কারের মাঝখানে যা-কিছু আছে, সেসবই এই মাত্রা। মানুষের ভয় যে-গর্তে থাকে, এবং তার জ্ঞান যে-চুড়ায় থাকে, বিশেষ এই মাত্রার অবস্থান ওই দু’জায়গার মাঝখানে কোথাও। এই মাত্রার নাম কল্পনাশক্তি।’ ঘোরা বন্ধ করল, রেলিং আঁকড়ে ধরে সামলে নেয়ার চেম্বা করছে নিজেকে। ‘আমরা এই জায়গার নাম দিয়েছি বিপথগামী বাচ্চাদের জন্য ফিনিকি হাউস।’

না হেসে পারলাম না আমি। কোনো একজনের মুখ দিয়ে এত দ্রুত এত বেশি কথা এই প্রথমবার শুনলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল পল। ‘চলো এগোই।’

দেয়ালে এত বেশি বাচ্চার ছবি ঝুলছে যে, সেগুলোর নিচে ফুলওয়ালা যে-ওয়ালপেপার সাঁটানো আছে, তা বলতে গেলে নজরেই পড়ে না। ওসব ছবির সংখ্যা কম করে হলেও এক শ’ হবে। আরও বেশিও হতে পারে। সব বয়সের ছেলে এবং মেয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি আমি। তাদের কেউ কেউ হাসছে। কেউ আবার মুখ বেজার করে রেখেছে। ছবিতে সবাই দাঁড়িয়ে আছে সেই ড্রাইভওয়েতে, যেখানে একটু আগে গাড়ি থেকে নেমেছি আমি। এবং সবার পেছনেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়ি।

ইঞ্জিতে একটা বাদামি রঙের ফ্রেম দেখিয়ে দিল পল। ‘চিন্তা কোরো না, আমিও আছি। খুব জলদিই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সময় এসে যাবে তোমার। আমরা সবাই সে-কাজ করেছি।’

ওর বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা আছে। কিছু একটা আছে ওর কণ্ঠে। কথাটা বলে যেভাবে থেমে গেল সে, বোঝা যায়, যা বলেছে, তার চেয়েও বেশি কিছু রয়ে গেছে ওর ভাবনায়।

‘এখানে ছেলে-মেয়ে আছে ক’জন?’

একেবারে ওপরের দিকের সিঁড়িতে হাজির হয়ে গেছে পল। ঘুরে তাকাল। ‘তোমার নম্বরটা আট, বন্ধু। তিনটা মেয়ে আছে এখানে। ছেলে আছে পাঁচজন। তাদের বয়স সাত থেকে আরম্ভ করে ষোলো বছর পর্যন্ত। আমার বয়স পনেরো। আর তিনটা বছর। তারপর, যে-শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছে আমাকে, সেটা

খুলে দিতে বাধ্য হবে এখানকার কর্তৃপক্ষ। তখন এমন কোনো পৃথিবীতে গিয়ে হাজির হবো, যেখানে সন্দেহ বা সংশয় বলে কোনো কিছু নেই। কর্তৃপক্ষ বলতে যারা আছেন এখানে, তাঁদের সবাইকে দয়া করুক ঈশ্বর।’

সিঁড়ির শেষমাথায় হাজির হয়ে গেলাম আমিও। অন্যদূরে যেন উন্মুক্ত হয়ে আছে লম্বা আর সরু একটা হলওয়ে। এখানে আরও কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি। দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি যেন বোঝাই করে ফেলা হয়েছে ওসব ছবি দিয়ে। ওই ছবিগুলোর মাঝখানে-মাঝখানে স্যান্ডউইচের মাংসের মতো যেন চাপা পড়ে আছে কয়েকটা বন্ধ দরজা। হাতের দু’দিকেই দেখতে পাচ্ছি ও-রকম দরজা।

বাঁ দিকের একটা দরজা ইঞ্জিতে দেখিয়ে দিল পল। ‘ওই ঘরের বর্তমান বাসিন্দার নাম ভিনসেন্ট উইডনার। ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে। তা হলে সে-ও কোনো ঝামেলা পাকাতে আসবে না তোমার সঙ্গে। যদি জানতে চাও... এখানে যারা থাকে, তাদের সবার প্রতি সবচেয়ে ভালো ব্যবহার কোনটা, তা হলে জবাবে আমি বলবো, এড়িয়ে এড়িয়ে চলাটা।’

হল পার হলো সে। ডান দিকের দ্বিতীয় দরজাটা খুলল। ‘আমাদের ঘর এটা। একটা কথা জানিয়ে রাখি তোমাকে। এই বাড়িতে একটা ঘরে একা থাকে, এ-রকম বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র দু’জন। আমরা আমাদের বেশিরভাগ ঘরই ভাগাভাগি করি আরেকজনের সঙ্গে। তারপরও বলবো, আমি আগে যেসব জায়গায় থেকেছি, সেসব জায়গায় তুলনায় এই বাড়ি অনেক ভালো। একবার এমন এক ঘরে ছিলাম, যে-ঘর আরও ছ’টা বাচ্চার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হয়েছিল আমাকে। এবং সেটা ছিল এই ঘরের চেয়েও ছোট। তুমি ঘুমিয়ে থাকবে ও-রকম কোনো ঘরে, আর কারও পা এসে লাগবে না তোমার নাকে-মুখে... ব্যাপারটা শ্রেফ অসম্ভব।’ মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। কিন্তু বেরিয়ে এল কয়েক মুহূর্ত পরই। ‘হল বরাবর শেষমাথায় একটা দরজা আছে, ওটা বাথরুম। ওই জায়গার ডান দিকটা ছেলেদের জন্য, বাঁ দিকটা মেয়েদের জন্য। বাথরুম থেকে যখন বের হবে, দরজা খুলে রাখবে, যাতে অন্যরা বুঝতে পারে, খালি আছে ওটা। ও-রকম কোনো জায়গায় গন্ধ কেমন হতে পারে, বুঝতেই পারছ। আর তাই মেডিসিন কেবিনেটের ভেতরে প্রচুর ম্যাচকাঠি রাখি আমরা। বোলের ভেতরে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে মেয়েলি কিছু ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। যদি কখনও ঘাঁটাঘাঁটি

করো ওসব, পরে ব্যাগের জিপলকটা আটকে দিতে ভুলে যেয়ো না। পর্নোগ্রাফির ভেজা-ভেজা ম্যাগাজিন ঘাঁটতে ভালো লাগে না কারও। বাথরুমে যেখানে যা-কিছু পাবে, ঘাঁটাঘাঁটি করে বেরিয়ে আসার আগে আবার জায়গামতো রেখে দিয়ে ওসব। নইলে দেখবে, তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। যা হোক, এখানে সাফসুতরো করার দায়িত্ব আমাদের সবারই... পালা করে কাজটা করি আমরা। নিচতলায় একটা রেফ্রিজারেটর আছে, সেটার গায়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে সময়সূচী।’

মাথা নিচু করে আবারও ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল পল। ‘কই, আসবে না তুমি?’

ওই ঘরের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম আরও কিছুক্ষণ। হলের দেয়ালজুড়ে যেসব ছবি টাঙানো আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি সেসব। মিস ফিনিকির বয়স যে খুব বেশি, তা কিন্তু না। কত বছর ধরে এই কাজ করছেন তিনি, ভাবলাম। কত বাচ্চা তাদের জীবনের কিছু সময় অতিবাহিত করে গেছে এখানে, ভাবলাম সে-কথাও।

ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে।

প্রথমেই নজরে পড়ল একটা বাঙ্কবেড।

আমার ইচ্ছায় সবসময়ই ছিল ও-রকম দোতলা কোনো বিছানা।

আমাকে ধারে যেসব কাপড় দেয়া হয়েছে, আগেও উল্লেখ করেছি, সেসব রাখা আছে একটা ডুফেল ব্যাগে। ওই ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি বাঙ্কবেডের নিচতলায়।

‘এখানে থাকার দিক দিয়েই বলো, অথবা বয়সের দিক দিয়েই বলো, আমি তোমার সিনিয়র। কাজেই আমি ওপরের বাঙ্কে থাকার দাবি করতেই পারি, ঠিক কি না?’ বলল পল। ‘যদি এখানে টিকতে পারো তুমি, যদি এমন হয় আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে অথচ তুমি রয়ে গেছে এখানে, তা হলে একদিন হয়তো ওপরের এই বাঙ্ক তোমার হবে। স্বপ্ন দেখার মতো সাহস রাখো, বন্ধু আমার। স্বপ্ন দেখার মতো সাহস রাখো।’

হলওয়েতে যেমনটা দেখেছি, এই ঘরের দেয়ালেও ঝুলছে সারি সারি ফ্রেম। তবে পার্থক্য একটাই... এসব ফ্রেমে বাঁধাই করা হয়নি কোনো ব্যক্তিবিশেষের ছবি। বরং এসবে ঠাঁই পেয়েছে কারও ড্রয়িং, কাটুন, আর স্কেচ। ‘এসব কি তোমার আঁকা?’ জানতে চাইলাম।

কেমন একটু গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পল। ‘এখানে যা-কিছু দেখতে পাচ্ছ, সবই পল আপচার্চের আসল চিত্রকর্ম।’ গিয়ে

হাজির হলো ঘরের আরেক প্রান্তে, ছোট একটা ডেস্কের কাছে।
তুলে নিল একটা স্কেচপ্যাড, ওটা হাতে নিয়েই এগিয়ে এল আমার
দিকে। ‘আমি আসলে কাজ করছি আমার নিজস্ব একটা কমিক
নিয়ে। কাহিনিটা ছোট একটা মেয়ের। ওর দোষ একটাই... বার
বার শুধু জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন রকমের ঝামেলায়। একটা মেয়েকে
নিয়ে এসব আঁকছি বলে আমাকে আবার অদ্ভুত অথবা ওই জাতীয়
কোনোকিছু ভেবে বোসো না। গেছো মেয়ে বলে একটা কথা
আছে না? আমার এই কল্পচরিত্র ঠিক সে-রকম। সে আবার
একটু সেক্সিও, বুকেছ? এসব কাজ করার আগে এখনকার মার্কেট
নিয়ে বেশ ভালোই পড়ালেখা করেছি আমি। তারপর সিদ্ধান্ত
নিয়েছি, প্রধান চরিত্র হিসেবে যদি একটা মেয়েকে ব্যবহার করি,
সব ধরনের বাচ্চার কাছে বিশেষ একটা আবেদন তৈরি করতে
পারবে কমিক বইটা।’ টাকা দিল মাথার একটা পাশে।
‘সবসময়ই কিছু না কিছু ভাবছি আমি। এবং আমার এই
চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তোমাকে।’

ওই মেয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে আছি আমি। মেয়েটা, যাকে
বলে কিনা লক্ষ্মী আর সুন্দর, ঠিক সে-রকম। বয়স আমাদের
সমানই হবে। মুখের এককোণায় লেপ্টে আছে শয়তানি একটা
হাসি। আজব এক দ্যুতিতে চকচক করছে চোখ। কমিক বই প্রচুর
পড়েছি আমি। এবং এসব ব্যাপারে আমাকে মোটামুটি একজন
পণ্ডিত বলা চলে। পলের আঁকার হাতও বেশ ভালো। অন্তত আমি
যত ড্রয়িং দেখেছি, সেসবের বেশিরভাগের তুলনায় ভালো।

‘তোমার কমিক বইয়ের কোনো নাম দিয়েছ?’

উজ্জ্বল হয়ে উঠল পলের চোখ দুটো। ‘নাম দিয়েছি কি না?
অবশ্যই দিয়েছি। দ্য মিসঅ্যাডভেঞ্চার্স অভ মেবেল মার্কেল।’

‘খুব ভালো।’

স্কেচপ্যাডটা মুখের কাছে তুলল পল, চুমু খেল। ‘এই মেয়ে
আমার কাছে কেমন, জানো? এই মেয়ে আমার কাছে এমন কারও
মতো, যার বাবা হতে পারিনি আমি, কখনও পারবো কি না তা-
ও জানি না। বাচ্চা এই মেয়ে একদিন ওর বাবাকে অনেক
পয়সাওয়ালা একজন মানুষ বানিয়ে দেবে।’

একটা ফোঁপানি এমন সময় ভেসে এল আমার কানে। নিচু
গলায় কাঁদছে কে যেন। মনে হচ্ছে, কান্নার আওয়াজটা চাপা দিয়ে
রাখতে চাইছে সে। হলের কোনো এক বন্ধ দরজা ভেদ করে
বেরিয়ে আসছে বিশেষ ওই শব্দ।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি আমি।

ওই আওয়াজ... ওই কান্না আমার পরিচিত।

ডেস্কের ওপর স্কেচপ্যাডটা নামিয়ে রাখল পল। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল দরজার দিকে। ‘মেয়েটা গতকাল এসেছে। ঘরের বাইরে বের হওয়া বলতে যা বোঝায়, বলতে গেলে সে-রকম কিছু করেনি এখন পর্যন্ত। গতকাল রাতে আমাদের প্রায় সবাইকে জাগিয়ে রেখেছিল সে... ওর সেই অদ্ভুত অশ্রুবিসর্জন-কর্মের মাধ্যমে। আমরা আবার করি কী... নতুন কেউ যখন আসে এখানে, নতুন কোনো না কোনো ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকি আগে থেকেই, এবং সে-কাজ করতে দিই তাকে। অন্য যে-দুটো মেয়ে আছে এখানে, তারা পালা করে থাকছে ওই মেয়ের সঙ্গে, যাতে মেয়েটা একাকিত্বে না ভুগে।’ একটুখানি থামল সে, আনমনা হয়ে পড়েছে। ‘এতিমখানা বলো অথবা কিশোর সংশোধন কেন্দ্র... এ-রকম কোনো কোনো জায়গা কখনও কখনও খুব খারাপ হয়। কিন্তু আমাদের এই বাসা ভালো লাগবে ওই মেয়ের। তোমারও ভালো লাগবে।’

‘নাম কী মেয়েটার?’

‘মিস ফিনিকিকে তো লিবি নামে ডাকতে শুনলাম মেয়েটাকে।’

দরজার দিকে এক কদম এগিয়ে গেলাম আমি।

টের পেলাম, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরেছে পল। ওর আঙুলের বাঁধনটা শক্ত হলো।

নিচু গলায়, শোনা যায় কি যায় না এমন এক কায়দায় বলল, ‘এখানে কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে। যখন যা বলবে, সে-ব্যাপারে সাবধান থেকো।’

(পরের খণ্ডে সমাপ্য)



সায়েম সোলায়মানের জন্ম ১৯৭৯ সালের ২৩ জুলাই। লেখালেখিতে তাঁর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ কিশোর-পত্রিকার মাধ্যমে, ১৯৯২ সালে। ২০০৪ সাল থেকে রহস্যপত্রিকায় নিয়মিত হওয়ার পাশাপাশি অনুবাদধর্মী উপন্যাসের কাজে নিয়োজিত হন।

পেশাজীবনে তিনি একজন ব্যাংকার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিজ্ঞানে অনার্স এবং মৎস্যবিজ্ঞানে মাস্টার্স করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিজিডিআইটি সমাপ্ত করেন। এরপর একটি আইএসপি-তে কিছুদিন কাজ করার পর যোগ দেন বেসরকারি একটি ব্যাংকে।

বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন রকম বইয়ের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৬০-এর বেশি।